নাহ্‌জ আল-বালাঘা

মূল ঃ আমিরুল মোমেনিন আলী ইবনে আবি তালিব
সঙ্কলন ঃ আশ-শরীফ আর-রাজী
ইংরেজী অনুবাদ ঃ সৈয়দ আলী রেজা

বাংলা অনুবাদ
জেহাদুল ইসলাম

র‍্যামন পাবলিশার্স
ঢাকা

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০০০

গ্রন্থস্বত্ব : বাংলা অনুবাদকের

ISBN : 984-8161-104-2

র‍্যামন পাবলিশার্স-এর পক্ষে সৈয়দ রহমত উল্লাহ্ কর্তৃক
২৬ বাংলাবাজার (২য় তলা) ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত
মোবারক কম্পিউটার, ১৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ কর্তৃক বর্ণ সংযোজন
গতিয়া প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশন, ১৬৪ আরামবাগ, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত

মূল্য ঃ ৪০০.০০ টাকা মাত্র।

অনুবাদকের নিবেদন

আমিরুল মোমেনিন আলী ইবনে আবি তালিব ৬০০ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ রজব অর্থাৎ ২৩ হিজরী-পূর্ব সনের ১৩ রজব শুক্রবার জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি রাসুলের (সঃ) চাচা আবি তালিবের পুত্র। রাসুলের (সঃ) দাদা আবদুল মুত্তালিব মৃত্যু বরণ করার পর তাঁর শৈশব ও কৈশোরে আবি তালিব তাঁকে অতি যত্নে লালন-পালন করেছিলেন। হযরত খাদিজাকে (রাঃ) বিয়ে করার পর হতে রাসুলের (সঃ) আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য এসেছিল। এসময় আরবে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়ার কারণে আবি তালিবের সংসারের অসচ্ছলতার কথা বিবেচনা করে রাসুল (সঃ) শিশু আলীকে তাঁর সংসারে এনে পরম যত্নে লালন-পালন করতে লাগলেন। এমনিতেই জন্মের পর হতে আলীর প্রতি রাসুলের (সঃ) অগাধ ভালবাসা ছিল। এখন নিজের সংসারে এনে তিনি আলীকে নিজের মনোমত করে গড়ে তুলতে লাগলেন। ফলে আলী রাসুলের (সঃ) আচার, আচরণ ও আখলাক রপ্ত করে এক সুমহান চরিত্রের অধিকারী হয়েছেন। তিনি ছিলেন রেসালত প্রকাশ-পূর্ব সময় হতে রাসুলের (সঃ) সার্বক্ষণিক সহচর। তাই তিনি দাবী করে বলেছেন "হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন অবস্থায় আমি ও খোদেজা ব্যতীত আর কোন সাহাবা রাসুলকে (সঃ) দেখেনি"। রেসালত প্রকাশের সাথে সাথেই তিনি রাসুলের বক্তব্যে ইমান এনে তাঁকে আল্লাহ্‌র রাসুল বলে স্বীকার করেন। কালক্রমে তিনি একজন মহাবীর হিসাবে শুধুমাত্র তাবুকের যুদ্ধ ব্যতীত রাসুলের (সঃ) জীবদ্দশায় ইসলামের সকল যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছেন এবং বিরোধী বাহিনীর বীরগণকে পরাভূত করে ইসলামের ঝান্ডা সমুন্নত রেখেছিলেন । সাহবাদের মধ্যে তিনি ছিলেন সব চাইতে জ্ঞানী। তাই রাসুল (সঃ) বলেছিলেন, "আমি জ্ঞানের মহানগরী এবং আলী উহার দরজা।" তিনি আরবী ব্যাকরণ শাস্ত্রের প্রবর্তক এবং ইসলামে সর্বপ্রথম লেখক হিসাবে গণ্য। তাঁর পুস্তকের নাম "কিতাবে আলী" ও "জামেয়া"। এতে তিনি সমগ্র দুনিয়ায় যে সব ঘটনা সংঘটিত হবে উহার বিবরণ দিয়েছিলেন (দৈনিক ইনকিলাব, ১২ জুন, ১৯৯৩)।

১১ হিজরী সনে রাসুলের (সঃ) তিরোধানের পর হজরত আবু বকর (রাঃ) মুসলিম জাহানের খলিফা মনোনীত হন। তাঁর মৃত্যুর পর ১৩ হিজরী সনে হজরত ওমর (রাঃ) খলিফা মনোনীত হন। তাঁর মৃত্যুর পর ২৩ হিজরী সনে হজরত উসমান (রাঃ) খলিফা মনোনীত হন। ৩৫ হিজরী সনের ১৮ জিলহজ্জ উসমানকে (রাঃ) হত্যা করার পর ২১ জিলহজ্জ জনগণের চাপের মুখে আলী ইবনে আবি তালিব খেলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি ৪ বছর ৯ মাস খেলাফত পরিচালনা করেছিলেন। এসময়ে তিনি কখনো নির্বিঘ্নভাবে খেলাফতের দায়িত্ব পালন করতে পারেননি। প্রথমেই তালহা ও জুবায়রের বিদ্রোহ, তৎপর মুয়াবিয়ার বিদ্রোহ ও খারিজীদের বিদ্রোহের কারণে জামালের যুদ্ধ, সিফফিনের যুদ্ধ ও নাহরাওয়ানের যুদ্ধসহ আরো অনেক যুদ্ধে তাঁকে জড়িয়ে পড়তে হয়েছিল। তদুপরি তাঁর কঠোর নৈতিক মূল্যবোধের কারণে অনেক সুবিধাবাদী লোক তাঁর বিপক্ষে চলে যায়। এতে তিনি অসুবিধার সম্মুখীন হলেও কুরআন ও সুন্নাহ্‌র বিধান সমুন্নত রাখার ব্যাপারে কখনো কোন প্রকার আপোষ করেননি। ফলে ৪০ হিজরী সনের ১৯ রমজান কুফার মসজিদে ফজর সালাতের সময় গুপ্তঘাতকের মারণাঘাতে আহত হয়ে ২১ রমজান ৬৩ বছর বয়সে শহীদ হন।

রাসুলের (সঃ) 'জ্ঞান নগরীর দ্বার' আমিরুল মোমেনিন আলী ইবনে আবি তালিব ছিলেন তত্ত্বজ্ঞানী, দার্শনিক, সুলেখক ও বাগ্মী। আলঙ্কারিক শাস্ত্রে তাঁর পান্ডিত্য ও নৈপুন্য অসাধারণ। তিনি নুবুওয়াতী জ্ঞান ভান্ডার হতে

সরাসরি জ্ঞান আহরণ করেন এবং সাহাবাদের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী পন্ডিত ছিলেন। এতে কারো দ্বিমত নেই। আরবী কাব্যে ও সাহিত্যে তাঁর অনন্যসাধারণ অবদান ছিল। খেলাফত পরিচালনা কালে তিনি বিভিন্ন বিষয়ে ভাষণ (খোৎবা) দিয়েছিলেন এবং বিভিন্ন এলাকার প্রশাসকগণকে প্রশাসনিক বিষয়ে উপদেশ ও নির্দেশ দিয়ে পত্র লিখেছিলেন। এমনকি বিভিন্ন সময়ে মানুষের অনেক প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়েছিলেন। তাঁর এসব বাণী কেউ কেউ লিখে রেখেছিল, কেউ কেউ মনে রেখেছিল, আবার কেউ কেউ তাদের লিখিত পুস্তকে উদ্ধৃত করেছিল। মোটকথা তাঁর অমূল্য বাণীসমূহ মনুষের কাছে ছড়ানো ছিটানো অবস্থায় ছিল।

আমিরুল মোমেনিন আলী ইবনে আবি তালিবের অনন্যসাধারণ অবদান সম্পর্কে আশ-শরীফ আর-রাজীর পূর্বে কেউ গবেষণা করেছেন বলে জানা যায় না। তাঁর পূর্ণ নাম আস-সাঈদ আবুল হাসান আলী ইবনে হুসাইন আর-রাজী আল-মুসাবী। তিনি ৩৫৯ হিজরী সনে বাগদাদে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি আব্বাসীয় খলিফা বাহাউদ্দোলা বুইয়া-এর যুগ পেয়েছিলেন। তার উপাধি ছিল "নাকিবুল আশরাফ আত-তালেবিন।" তিনি আমিরুল মোমেনিন আলী ইবনে আবি তালিবের ভাষাণসমূহ (খোৎবা), পত্রাবলী, নির্দেশাবলী ও উক্তিসমূহ সংগ্রহ করে "নাহ্জ আল-বালাঘা" এবং কবিতাসমূহ সংগ্রহ করে "দেওয়ানে আলী" নামক দু'টি গ্রন্থ সঙ্কলন করেন। এ গ্রন্থদ্বয় অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ও জনপ্রিয়। শরীফ রাজী কর্তৃক সঙ্কলিত "নাহ্জ আল-বালাঘা"-এর বহু টীকা ও ভাষ্যগ্রন্থ রচিত হয়েছে। এসব ভাষ্য গ্রন্থের মধ্যে ইবনে আবিল হাদীদ ও মীছাম আল-বাহারাণীর ভাষ্য গ্রন্থদ্বয় প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। "নাহ্জ-আল বালাঘা" গ্রন্থটি উর্দু, ফারসী ও ইংরেজী ভাষায় অনূদিত হয়েছে। আল্লামা শরীফ রাজী ৪০০ হিজরী সনে উক্ত গ্রন্থটি সঙ্কলন সমাপ্ত করেন এবং ৪০৬ হিজরী সনের ৫ মহররম তিনি বাগদাদে ইন্তেকাল করেন (দৈনিক ইনকিলাব, ৭ জুলাই, ১৯৯২)।

"নাহ্জ আল-বালাঘা" গ্রন্থটি ইংরেজী ভাষায় প্রকাশ করেছে World Organisation for Islamic Services, Tehran (WOFIS). ইংরেজী অনুবাদ ৩ খন্ডে সমাপ্ত করা হয়েছে। ইংরেজী অনুবাদ পড়ে আমি এতবেশী আকৃষ্ট হয়েছি যে, হেদায়েতের এ মহান বাণীসমূহ বাংলা ভাষাভাষী ভাই-বোনদের হাতে পৌঁছানোর জন্য মনোস্থির করে এর বাংলা অনুবাদ করা আরম্ভ করলাম। চাকুরী জীবনের ব্যস্ত সময়ের ফাঁকে এ কাজটি ব্রত হিসাবে গ্রহণ করে প্রায় দু'বছরে সম্পূর্ণ অনুবাদ সম্পন্ন করলাম। এতে রয়েছে ২৩৯টি ভাষণ (খোৎবা), ৭৯টি পত্র ও নির্দেশনামা এবং ৪৮৯টি উক্তি। অতঃপর আমি "নাহ্জ আল-বালাঘা"-এর আরবী ও ফারসী Version সংগ্রহ করে কতিপয় আরবী জানা ব্যক্তির সাথে অধিকাংশ ভাষণ আরবীতে পড়ে আমার বাংলা অনুবাদ মিলিয়ে উহার সঠিকতা নিরূপণ করেছি। এতে প্রায় এক বছর সময় লেগে গেছে।

"নাহ্জ আল-বালাঘা" গ্রন্থটি ইংরেজীতে তিন খন্ড হলেও আমি বাংলা অনুবাদ এক খণ্ডে প্রকাশ করেছি এবং ভাষণ (খোৎবা), পত্রাবলী ও উক্তিসমূহের জন্য তিনটি অধ্যায় করেছি। আমি গ্রন্থখানার আক্ষরিক অনুবাদ করেছি–একটি বাক্যও বাদ দেইনি; এমনকি প্রচ্ছদও অবিকল রেখেছি প্রায় প্রতিটি ভাষণ ও পত্রের শেষে যে টীকা রয়েছে তা WOFIS-এর টীকা। আমি শুধুমাত্র অনুবাদ করেছি। খেলাফত সংক্রান্ত ভাষণ ও পত্রাবলীর যে সব টীকা রয়েছে তাতে তৎকালীন রাজনৈতিক বিষয় রয়েছে। এ ব্যাখ্যাগুলো শিয়া মতাবলম্বীদের দৃষ্টিকোণে লেখা। এগুলো সম্বন্ধে সুন্নীদের ভিন্নমত আছে। ফলে গবেষণার অনেক সুযোগ রয়েছে। আমিরুল মোমেনিন আলী ইবনে আবি তালিব নিজেই বলেছেন, "আমাকে নিয়ে দু'শ্রেণীর লোক ধ্বংস হয়ে যাবে। এক শ্রেণী হলো যারা আমাকে

ভালবেসে অতিরঞ্জিত করবে এবং অপর শ্রেণী হলো যারা আমাকে ঘৃনাভরে অবজ্ঞা করবে।" আমি বাংলা অনুবাদে এ বিতর্কিত বিষয়গুলোও বাদ দেইনি। কারণ অনুবাদকের বেলায় আমানতদারীর প্রশ্নটি নৈতিকভাবে জড়িত। ফলে পরবর্তী সংস্করণে আমি সুন্নী মতাবলম্বীদের দৃষ্টিতে যুক্তিতর্ক দিয়ে টীকাগুলোকে বিতর্ক মুক্ত করার চেষ্টা করবো এবং সে উদ্দেশ্যে কিছু তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। সহৃদয় পাঠকদের মধ্যে কেউ যদি তাঁর অভিমত ও ব্যাখ্যা প্রেরণ করেন তবে পরবর্তী সংস্করণের টীকায় তাঁর নামে উহা ছাপিয়ে দেয়া হবে।

আমি আগেই বলেছি আমি গ্রন্থখানা word by word অনুবাদ করতে চেষ্টা করেছি কিন্তু গ্রন্থখানার নামের পরিবর্তন করিনি। "নাহ্জ আল-বালাঘা" অর্থ বাগ্মীতার ঝর্ণাধারা হওয়া সত্ত্বেও গ্রন্থখানার নামকরণ অবিকল রেখেছি। শুধুমাত্র গ্রন্থপঞ্জিতে কিছুটা পরিবর্তন করেছি। ইংরেজী অনুবাদে গ্রন্থসূত্র হিসাবে গ্রন্থের নাম ছিল। আমি তা পরিবর্তন করে আধুনিক পদ্ধতিতে করেছি। তাতে লেখকের নামের শেষাংশ লিখে উহার ওপর গ্রন্থপঞ্জির ক্রমিক নম্বর ব্যবহার করেছি; যেমন–আছীর[১], কাছীর[৩৯], শাফী[১২৮], হাদীদ[১৫২] অর্থাৎ গ্রন্থপঞ্জির উক্ত ক্রমিকে লেখকের পূর্ণ নাম ও গ্রন্থের নাম পাওয়া যাবে। আমি পবিত্র কুরআনের আয়াতসমুহের অনুবাদে ইসলামী ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত 'আল-কুরআনুল করীম' অনুসরণ করেছি এবং বাংলা একাডেমীর বানান-রীতি অনুসরণ করেছি। আমি ভাষাবিদ নই। ভাষার ওপর তেমন দখল নেই। তবুও এ দুরূহ কাজটি সমাপ্ত করেছি। গ্রন্থখানার প্রুফ আমি নিজেই দেখেছি। কাজেই কিছু ভুল-ভ্রান্তি থেকে যেতে পারে, সেজন্য ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার আকুল আবেদন জানাচ্ছি।

কর্ম জীবনের ব্যস্ততার মাঝে এ দুরূহ কাজটি সম্পন্ন করতে আমার স্ত্রী মমতাজ বেগম আমাকে বিভিন্ন ভাবে সহায়তা করেছেন। সেজন্য তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে ছোট করতে চাইনা। হেদায়েতের বাণীপূর্ণ এ গ্রন্থখানা পড়ে যদি মুসলিম ভাই-বোনগণ একটুখানি সত্য, সঠিক ও হেদায়েতের পথ দেখতে পান তবেই আমার এ কঠোর শ্রম সার্থক হবে এবং যেন এর বিনিময়ে মহিমান্বিত আল্লাহ্ আমার পিতা-মাতা, আমার স্ত্রী ও আমাকে তাঁর সান্নিধ্য দান করেন—এটাই আমার একমাত্র কামনা।

তারিখ, ঢাকা
১৫ সেপ্টেম্বর, ২০০০

জেহাদুল ইসলাম

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়
আমিরুল মোমেনিনের খোৎবাসমূহ

খোৎবা নম্বর	বিষয়	পৃষ্ঠা নম্বর
১	আকাশ, পৃথিবী ও আদম সৃষ্টি সম্পর্কে আল্লাহ্‌তত্ত্ব, নিখিল বিশ্ব সৃষ্টি, ফেরেশতা সৃষ্টি, আদম সৃষ্টি, পয়গম্বর মনোনয়ন, নবী মুহাম্মদ (সঃ), পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ্‌ এবং হজ্জ সম্পর্কে	৩
২	সিফফিন থেকে ফেরার পর প্রদত্ত খোৎবা আল্লাহ্‌র প্রশংসা, ইমানের ভিত্তি, রাসুলের (সঃ) আগমন, রাসুলের (সঃ) পরবর্তী অবস্থা ও আহ্‌লুল বাইত সম্পর্কে	১২
৩	খোৎবায়ে শিক্‌শিকিয়্যাহ্‌ খেলাফত সম্পর্কে	১৪
৪	আমিরুল মোমেনিনের দূরদর্শিতা ও ইমানের দৃঢ় প্রত্যয় সম্পর্কে	২৪
৫	আবু বকর খলিফা হবার পর খেলাফতের জন্য আবু সুফিয়ান কর্তৃক আমিরুল মোমেনিনকে সাহায্য করার প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে প্রদত্ত খোৎবা	২৫
৬	তালহা ও জুবায়রের পশ্চাদ্ধাবন না করার উপদেশের প্রেক্ষিতে প্রদত্ত খোৎবা	২৭
৭	মোনাফিক সম্পর্কে	২৭
৮	জুবায়র সম্পর্কে	২৮
৯	জামালের যুদ্ধে শত্রুদের কাপুরুষতা সম্পর্কে	২৮
১০	তালহা ও জুবায়র সম্পর্কে	২৯
১১	জামালের যুদ্ধে মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়ার হাতে পতাকা অর্পনকালে প্রদত্ত খোৎবা	২৯
১২	ন্যায়ের পথে চিরন্তন উপস্থিতি সম্পর্কে	৩১
১৩	বসরার জনগণকে তিরস্কার	৩১
১৪	বসরাবাসীদের প্রতি ভর্ৎসনা	৩৬
১৫	উসমান ইবনে আফফান কর্তৃক অনুদানকৃত ভূমি পুনঃগ্রহণ করার পর প্রদত্ত খোৎবা	৩৭
১৬	মদিনায় আমিরুল মোমেনিনের হাতে বায়াত গ্রহণের পর প্রদত্ত খোৎবা	৩৭
১৭	অযোগ্য ব্যক্তি কর্তৃক মানুষের মধ্যে ন্যায়ের বিধান প্রয়োগ সম্পর্কে	৩৮
১৮	ফেকাহ্‌বিদগণের মধ্যে অমর্যাদাকর মতদ্বৈধতা সম্পর্কে	৩৯
১৯	আশআছ ইবনে কায়েস সম্পর্কে	৪২
২০	মৃত্যু হতে শিক্ষা গ্রহণ সম্পর্কে	৪৪
২১	দুনিয়াতে নিজেকে হাল্‌কা রাখার উপদেশ	৪৫
২২	উসমানের হত্যার জন্য যারা আমিরুল মোমেনিনকে দোষী করেছিল তাদের সম্পর্কে	৪৫
২৩	ঈর্ষা পরিহার করা এবং আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করা সম্পর্কে	৪৬

২৪ জনগণকে জিহাদের জন্য প্রেরণা প্রদান ৪৭
২৫ জিহাদের প্রতি জনগণের বিমুখীতা ও মতদ্বৈধতা করার কারণে প্রদত্ত খোৎবা ৪৭
২৬ নবুয়ত প্রকাশের পূর্বে আরবের অবস্থা সম্পর্কে ৪৮
২৭ জনগণকে জিহাদে উদ্বুদ্ধকরণ ৪৯
২৮ ইহজগতের ক্ষণস্থায়ীত্ব ও পরকালের গুরুত্ব সম্পর্কে ৫১
২৯ জিহাদে মিথ্যা ওজর দেখানো সম্পর্কে ৫২
৩০ উসমানের হত্যার প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে ৫৩
৩১ জামালের যুদ্ধের সময় জুবায়রের কাছে আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসকে প্রেরণকালে প্রদত্ত খোৎবা ৫৮
৩২ দুনিয়ার অবমূল্যায়ন ও মানুষের প্রকারভেদ সম্পর্কে ৫৮
৩৩ জামালের যুদ্ধের জন্য বেরিয়ে আসার পর যিকার নামক স্থানে প্রদত্ত খোৎবা ৫৯
৩৪ সিরিয়দের বিরুদ্ধে জিহাদে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে প্রদত্ত খোৎবা ৬০
৩৫ সিফফিনের সালিশীর পর প্রদত্ত খোৎবা ৬১
৩৬ নাহ্রাওয়ানের জনগণকে তাদের ভাগ্য সম্পর্কে সতর্কীকরণ ৬৪
৩৭ দ্বীনে ও ইমানে নিজের অগ্রণী ভূমিকা সম্পর্কে ৬৬
৩৮ সংশয়ের নামকরণ ৬৬
৩৯ জিহাদে যাদের অনীহা তাদের প্রতি ভর্ৎসনা ৬৬
৪০ খারিজীদের শ্লোগানের প্রত্যুত্তরে প্রদত্ত খোৎবা ৬৭
৪১ বিশ্বাসঘাতকতার প্রতি ঘৃণা ৬৮
৪২ হৃদয়ের আশা ও উচ্চাকাঙ্খা সম্পর্কে ৬৮
৪৩ মুয়াবিয়ার সাথে যুদ্ধে প্রস্তুতি গ্রহণের পরামর্শের প্রেক্ষিতে প্রদত্ত খোৎবা ৬৯
৪৪ মাস্কালাহ্ ইবনে হুবায়রাহ্ আশ-শায়বাণী মুয়াবিয়ার নিকট পালিয়ে যাবার পর প্রদত্ত খোৎবা ৬৯
৪৫ আল্লাহ্র মহত্ব ও দুনিয়ার হীনাবস্থা সম্পর্কে ৭০
৪৬ সিরিয়া অভিমুখে যাত্রাকালে প্রদত্ত খোৎবা ৭১
৪৭ কুফায় দুর্যোগ আপতন সম্পর্কে ৭১
৪৮ সিরিয়া অভিমুখে যাত্রার প্রাক্কালে প্রদত্ত খোৎবা ৭১
৪৯ আল্লাহ্র মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে ৭২
৫০ ন্যায় ও অন্যায়ের অপমিশ্রণ সম্পর্কে ৭২
৫১ সিফফিনে মুয়াবিয়া আমিরুল মোমেনিনের লোকদের পানি বন্ধ করে দেয়ায় প্রদত্ত খোৎবা ৭৩
৫২ পরকালের পুরস্কার ও শাস্তি এবং কুরবানীর পশুর গুণাগুণ সম্পর্কে ৭৩
৫৩ আমিরুল মোমেনিনের বায়াত গ্রহণ সম্পর্কে ৭৪
৫৪ সিফফিনের যুদ্ধ আরম্ভ করার অনুমতি প্রদানে বিলম্বের কারণে লোকজনের অধৈর্যের প্রেক্ষিতে প্রদত্ত খোৎবা ৭৪
৫৫ যুদ্ধক্ষেত্রে অটলতা সম্পর্কে ৭৫
৫৬ মুয়াবিয়া সম্পর্কে ৭৬

৫৭ খারিজীদের সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী ৭৭
৫৮ খারিজীদের পরাজয় সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী ৭৭
৫৯ খারিজীদের পতন সম্পর্কে আমিরুল মোমেনিনকে অবহিত করা হলে প্রদত্ত খোৎবা ৭৮
৬০ খারিজীদের সম্পর্কে ৭৯
৬১ প্রতারক কর্তৃক নিহত হবার বিষয়ে সতর্ক করা হলে আমিরুল মোমেনিনের প্রদত্ত খোৎবা ৮০
৬২ দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ীত্ব সম্পর্কে ৮০
৬৩ দুনিয়ার ক্ষয় ও ধ্বংস সম্পর্কে ৮০
৬৪ আল্লাহ্‌র গুণরাজী সম্পর্কে ৮১
৬৫ সিফ্‌ফিনের যুদ্ধের সময় সহচরদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত খোৎবা ৮২
৬৬ সকিফা-ই-সাঈদার ঘটনা প্রবাহ শুনে প্রদত্ত খোৎবা ৮২
৬৭ মুহাম্মদ ইবনে আবু বকরের মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে প্রদত্ত খোৎবা ৮৪
৬৮ অসতর্ক আচরণ সম্পর্কে অনুচরদেরকে উপদেশ ৮৫
৬৯ মারণাঘাতের দিন ভোরে প্রদত্ত খোৎবা ৮৬
৭০ ইরাকের জনগণকে ভর্ৎসনা ৮৬
৭১ রাসুলের (সঃ) ওপর সালাম পেশ করার পদ্ধতি সম্পর্কে ৮৭
৭২ হাসান ও হোসাইন যুদ্ধ-বন্দী মারওয়ান ইবনে হাকামের জন্য সুপারিশ করায় প্রদত্ত খোৎবা ৮৭
৭৩ পরামর্শক কমিটি (শূরা) উসমানের হাতে বায়াত গ্রহণের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে প্রদত্ত খোৎবা ৮৮
৭৪ উমাইয়াগণ উসমান হত্যার জন্য আমিরুল মোমেনিনকে দায়ী করলে প্রদত্ত খোৎবা ৮৯
৭৫ ধর্মের শিক্ষা ও উপদেশ সম্পর্কে ৮৯
৭৬ উমাইয়াদের সম্পর্কে ৮৯
৭৭ আমিরুল মোমেনিনের প্রার্থনা ৯০
৭৮ জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে ৯০
৭৯ নারীর দৈহিক ত্রুটি সম্পর্কে ৯১
৮০ সংযম সম্পর্কে ৯২
৮১ দুনিয়া সম্পর্কে ৯২
৮২ খোৎবাতুল ঘার্‌রা (ব্রিলিয়্যান্ট খোৎবা) ৯৩
আল্লাহ্‌র প্রশংসা, তাকওয়া, দুনিয়া, মৃত্যু ও কেয়ামত, জীবনের সীমাবদ্ধতা, সুখ, আল্লাহ্‌র নেয়ামত, বিচার দিন, শয়তান, মানুষ সৃষ্টি এবং মৃতদের কাছে শিক্ষণীয় সম্পর্কে
৮৩ আমর ইবনে আ'স সম্পর্কে ৯৮
৮৪ আল্লাহ্‌র উৎকর্ষ সম্পর্কে ৯৮
৮৫ পরকালের জন্য প্রস্তুতি ও আল্লাহ্‌র আদেশ পালন সম্পর্কে ৯৯
৮৬ মোমিনের গুণাবলী ১০০
বেঈমানের বৈশিষ্ট্য, রাসুলের ইতরাহ ও বনি উমাইয়া সম্পর্কে

৮৭ উম্মাহ্‌র বিভেদ ও দলাদলি সম্পর্কে ১০২
৮৮ রাসুল (সঃ) সম্পর্কে ১০৩
৮৯ আল্লাহ্‌র গুণাবলী সম্পর্কে ১০৪
৯০ খোৎবাতুল আশবাহ্‌ ১০৪
আল্লাহ্‌র বর্ণনা, আল্লাহর গুণাবলী, আল্লাহর সৃষ্টি, সৃষ্টির পরিপূর্ণতা, আকাশ, ফেরেশতা, পৃথিবী ও মানুষ সৃষ্টি এবং নবী প্রেরণ সম্পর্কে
৯১ আমিরুল মোমেনিনের হাতে বায়াত গ্রহণের সময় প্রদত্ত খোৎবা ১১৪
৯২ খারিজীদের ধ্বংস ও উমাইয়াদের ফেতনা এবং তাঁর নিজের জ্ঞানের বিশালতা সম্পর্কে ১১৫
৯৩ নবীগণের প্রশংসা ১১৭
৯৪ নবুয়ত প্রকাশকালে মানুষের অবস্থা সম্পর্কে ১১৮
৯৫ রাসুলের (সঃ) প্রশংসা ১১৮
৯৬ অনুচরদেরকে ভর্ৎসনা ও আহলুল বাইত সম্পর্কে ১১৯
৯৭ উমাইয়াদের অত্যাচার সম্পর্কে ১২১
৯৮ দুনিয়ার প্রতি বিমুখীতা ও সময়ের উত্থানপতন সম্পর্কে ১২২
৯৯ রাসুল (সঃ) ও তাঁর বংশধর সম্পর্কে ১২২
১০০ সময়ের উত্থানপতন সম্পর্কে ১২৩
১০১ বিচারদিন ও ভবিষ্যৎ ফেতনা সম্পর্কে ১২৪
১০২ মিতাচারিতা, আল্লাহ্‌র ভয়, বিদ্বান লোকের গুণাবলী ও ভবিষ্যৎ সময় সম্পর্কে ১২৪
১০৩ নবুয়ত প্রকাশের পূর্বে মানুষের অবস্থা সম্পর্কে ১২৫
১০৪ রাসুলের (সঃ) প্রশংসা, উমাইয়াদের সম্পর্কে এবং ইমামদের কাজ সম্পর্কে ১২৬
১০৫ ইসলাম, রাসুল (সঃ) ও নিজের অনুচরদের সম্পর্কে ১২৭
১০৬ সিফফিনের যুদ্ধ চলাকালে প্রদত্ত খোৎবা ১২৮
১০৭ সময়ের উত্থানপতন, রাসুল (সঃ) ও মুসলিমদেরকে দোষারোপ সম্পর্কে ১২৮
১০৮ আল্লাহ্‌র কুদরত, ফেরেশতা, আল্লাহ্‌র নেয়ামত, মৃত্যু, বিচার দিবস, রাসুল (সঃ) ও আহলুল বাইত সম্পর্কে ১২৯
১০৯ ইসলাম, পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ্‌ সম্পর্কে ১৩৩
১১০ দুনিয়া সম্পর্কে সতর্কোপদেশ ১৩৩
১১১ রুহের প্রস্থান সম্পর্কে ১৩৫
১১২ দুনিয়া ও এর মানুষ সম্পর্কে ১৩৫
১১৩ সংযম, আল্লাহ্‌র ভয় ও পরকালের রসদ সম্পর্কে ১৩৬
১১৪ বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা ১৩৮
১১৫ ভবিষ্যতের বিপদ সম্পর্কে ১৩৯
১১৬ কৃপণদের প্রতি তিরস্কার ১৪০
১১৭ বিশ্বস্ত সাথীদের প্রশংসা ১৪০

১১৮ জিহাদের আহ্বানে অনুচরদের নিশ্চুপতার কারণে প্রদত্ত খোৎবা ১৪০
১১৯ আহলুল বাইতের মহত্ত্ব সম্পর্কে ১৪১
১২০ সালিশী সম্পর্কে একজন অনুচরের প্রশ্নোত্তর ১৪১
১২১ সালিশী প্রত্যাখ্যানের জন্য খারিজীগণের অনঢ় অবস্থানের প্রেক্ষিতে প্রদত্ত খোৎবা ১৪২
১২২ সিফফিনের যুদ্ধক্ষেত্রে অনুচরদের প্রতি উপদেশ ১৪৩
১২৩ অনুচরগণকে যুদ্ধে উদ্বুদ্ধকরণ ১৪৩
১২৪ সালিশী সম্পর্কে খারিজীগণের অভিমতের প্রেক্ষিতে প্রদত্ত খোৎবা ১৪৯
১২৫ বায়তুল মালের সুষম বন্টন সম্পর্কে কুৎসার প্রেক্ষিতে প্রদত্ত খোৎবা ১৪৯
১২৬ খরিজীদের সম্পর্কে ১৫০
১২৭ বসরায় সংঘটিত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী সম্পর্কে ১৫১
১২৮ দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ীত্ব ও দুনিয়াদারের অবস্থা সম্পর্কে ১৫৪
১২৯ মদিনা হতে আবু যরের বহিষ্কারের সময় প্রদত্ত খোৎবা ১৫৪
১৩০ খেলাফত গ্রহণের কারণ সম্পর্কে ১৫৬
১৩১ মৃত্যু সম্পর্কে সতর্কাদেশ ১৫৭
১৩২ আল্লাহ্‌র মহিমা সম্পর্কে ১৫৮
১৩৩ খলিফা উমর মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে বাইজান্টইন অভিমুখে যাবার বিষয়ে পরামর্শ চাইলে প্রদত্ত খোৎবা ১৫৯
১৩৪ উসমানের সাথে কথা কাটাকাটির সময় মুঘিরাহ্‌ হস্তক্ষেপ করলে প্রদত্ত খোৎবা ১৬০
১৩৫ নিজের ইচ্ছার অকৃত্রিমতা সম্পর্কে ১৬০
১৩৬ তালহা ও জুবায়র সম্পর্কে ১৬১
১৩৭ ভবিষ্যৎ ঘটনা প্রবাহ সম্পর্কে ১৬১
১৩৮ খলিফা উমরের মৃত্যুর পর পরামর্শক কমিটি (শূরা) উপলক্ষে প্রদত্ত খোৎবা ১৬২
১৩৯ গীবত সম্পর্কে ১৬৩
১৪০ উৎপথগামীর ওপর বিশ্বাস স্থাপনের বিরুদ্ধে ১৬৫
১৪১ অপাত্রে উদারতা দেখানোর বিরুদ্ধে ১৬৫
১৪২ বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা ১৬৫
১৪৩ পয়গম্বর প্রেরণ, আহলুল বাইতের মর্যাদা ও আহলুল বাইতের বিরোধীদের সম্পর্কে ১৬৬
১৪৪ দুনিয়া ও বিদা'ত সম্পর্কে ১৬৭
১৪৫ পারস্যের যুদ্ধে স্বয়ং খলিফা উমর অংশ গ্রহণের পরামর্শ চাইলে প্রদত্ত খোৎবা ১৬৮
১৪৬ রাসুল প্রেরণ, ভবিষ্যৎ বিষয় ও আহলুল বাইত সম্পর্কে ১৭০
১৪৭ তালহা, জুবায়র ও বসরার জনগণ সম্পর্কে ১৭১
১৪৮ মৃত্যুর পূর্বক্ষণে প্রদত্ত খোৎবা ১৭১
১৪৯ ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী ও মোনাফিকদের কর্মকান্ড সম্পর্কে ১৭২
১৫০ জুলুম ও হারাম উপার্জন সম্পর্কে ১৭৩

১৫১ আল্লাহ্‌র মহত্ত্ব ও ইমাম সম্পর্কে ১৭৪
১৫২ অমনোযোগী ব্যক্তি সম্পর্কে ১৭৫
১৫৩ আহলুল বাইত ও তাঁদের বিরোধীদের সম্পর্কে ১৭৭
১৫৪ বাদুরের আশ্চর্যজনক সৃষ্টি সম্পর্কে ১৭৭
১৫৫ আয়শার বিদ্বেষ ও বসরার জনগণের প্রতি সতর্কবাণী ১৭৮
১৫৬ তাকওয়ার প্রতি আহ্বান ১৮৪
১৫৭ রাসুল (সঃ), পবিত্র কুরআন ও উমাইয়াদের স্বৈরাচার সম্পর্কে ১৮৫
১৫৮ মানুষের সাথে সদাচরণ সম্পর্কে ১৮৬
১৫৯ আল্লাহ্‌র প্রশংসা, আল্লাহর মহত্ত্ব, আল্লাহর ভয় ও আশা, রাসুলের উপমা, মুসার উপমা, দাউদের উপমা, ঈশার উপমা, এবং আমিরুল মোমেনিনের নিজের উপমা ১৮৬
১৬০ রাসুল (সঃ) প্রেরণ ও দুনিয়া হতে শিক্ষা গ্রহণ সম্পর্কে ১৮৯
১৬১ খেলাফত হতে বঞ্চিত হওয়া সম্পর্কে ১৯০
১৬২ আল্লাহ্‌র গুণাবলী, আল্লাহ্‌ নঞ হতে উদ্ভাবক ও মানুষ সৃষ্টি সম্পর্কে ১৯১
১৬৩ জনগণের অভিযোগের প্রেক্ষিতে উসমানের সাথে কথোপকথন ১৯৩
১৬৪ ময়ূর ও পাখীর বিস্ময়কর সৃষ্টি সম্পর্কে ১৯৫
১৬৫ উমাইয়াদের স্বৈরশাসন ও অত্যাচার সম্পর্কে ১৯৭
১৬৬ দায়িত্ব ও কর্তব্য পরিপূরণের জন্য খেলাফতের প্রারম্ভে প্রদত্ত ভাষণ ১৯৮
১৬৭ উসমানের হত্যাকারীদেরকে শাস্তি প্রদানের দাবীর প্রেক্ষিতে প্রদত্ত খোৎবা ১৯৮
১৬৮ জামালের যুদ্ধের জন্য বসরা অভিমুখে যাত্রাকালে প্রদত্ত খোৎবা ১৯৯
১৬৯ আমিরুল মোমেনিন ও বসরার জনগণের অবস্থান সম্পর্কে এক ব্যক্তির প্রশ্নের প্রেক্ষিতে প্রদত্ত খোৎবা ১৯৯
১৭০ সিফফিনে শত্রুর মুখোমুখী যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর প্রদত্ত খোৎবা ২০০
১৭১ উমরের মৃত্যুর পর গঠিত পরামর্শক পর্ষদ ও জামালের যুদ্ধের লোকদের সম্পর্কে ২০০
১৭২ খেলাফতের যোগ্যতা, মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিচার-বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা ও দুনিয়ার আচরণ সম্পর্কে ২০২
১৭৩ তালহা ইবনে উবায়দিল্লাহ্‌ সম্পর্কে ২০৪
১৭৪ গাফেলদের প্রতি সতর্কবাণী ও তার নিজের জ্ঞানের গভীরতা সম্পর্কে ২০৪
১৭৫ ধর্মোপদেশ, পবিত্র কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব, মোমিন ও মোনাফিক, সুন্নাহ্‌র অনুসরণ ও বিদা'ত পরিত্যাগ, কুরআন হতে হেদায়েত গ্রহণ এবং অত্যাচারের প্রকারভেদ সম্পর্কে ২০৭
১৭৬ সিফ্‌ফিনের সালিশদ্বয় সম্পর্কে ২১০
১৭৭ আল্লাহ্‌র প্রশংসা, দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ীত্ব ও আল্লাহ্‌র আশীর্বাদ হ্রাসের কারণ সম্পর্কে ২১১
১৭৮ আল্লাহ্‌কে দেখা সম্পর্কে ২১১
১৭৯ অবাধ্য লোকদের প্রতি নিন্দা ২১২
১৮০ কুফার একটি সৈন্যদল খারিজীদের সঙ্গে যোগ দেয়ার প্রেক্ষিতে প্রদত্ত খোৎবা ২১৩

১৮১ আল্লাহ্র গুণরাজী, তাঁর সত্তা ও তাঁর বান্দা, অতীত লোকদের থেকে শিক্ষা গ্রহণ, ইমাম মাহ্দী, নিজের শাসন পদ্ধতি এবং অনুচরদের জন্য শোকপ্রকাশ সম্পর্কে ২১৪
১৮২ আল্লাহর প্রশংসা, পবিত্র কুরআনের গুরুত্ব ও বিচার দিনের শাস্তির সতর্কতা সম্পর্কে ২২১
১৮৩ খারিজীদের শ্লোগানের প্রত্যুত্তরে প্রদত্ত খোৎবা ২২৪
১৮৪ আল্লাহ্র বিস্ময়কর সৃষ্টি, রাসুল (সঃ), প্রাণী সৃষ্টি, বিশ্বচরাচর সৃষ্টি, পঙ্গপাল সৃষ্টি ও আল্লাহর মহত্ব সম্পর্কে ২২৪
১৮৫ আল্লাহ্র একত্ব সম্পর্কে ২২৬
১৮৬ সময়ের উত্থানপতন সম্পর্কে ২২৯
১৮৭ দুনিয়া ও আখিরাত সম্পর্কে ২২৯
১৮৮ দৃঢ় ও দুর্বল ঈমান, তাঁকে হারাবার আগে জেনে নেওয়া এবং উমাইয়াদের সম্পর্কে ২৩০
১৮৯ আল্লাহ্র ভয়ের গুরুত্ব, কবরের নির্জনতা ও আহ্লুল বাইতের অনুরাগীর মৃত্যু শহীদের সমতুল্য হওয়া সম্পর্কে ২৩২
১৯০ আল্লাহ্র প্রশংসা ও ভয় সম্পর্কে ২৩৩
১৯১ খোৎবাতুল কাসিআহ্ ২৩৫
ইবলীসের আত্মম্ভরিতা, শয়তানের বিরুদ্ধে সতর্কতা, অজ্ঞতা ও আত্মগর্ব, আত্মম্ভরী নেতা, পয়গম্বরগণের বিনয়, পবিত্র কা'বা, বিদ্রোহ ও জুলুম, অনুচরদের তিরস্কার এবং ইসলামে তাঁর উচ্চ মর্যাদা সম্পর্কে
১৯২ পরহেজগারের গুণাবলী ও তাকওয়া অবলম্বন সম্পর্কে ২৪৬
১৯৩ মোনাফিকের বর্ণনা ২৪৯
১৯৪ আল্লাহ্র প্রশংসা, আল্লাহ্কে ভয় করার উপদেশ ও বিচার দিনের বর্ণনা ২৫০
১৯৫ নবুয়ত ঘোষণাকালে পৃথিবীর অবস্থা সম্পর্কে ২৫১
১৯৬ রাসুলের প্রতি আমিরুল মোমেনিনের অনুরাগ সম্পর্কে ২৫১
১৯৭ আল্লাহ্ সর্বজ্ঞাতা, ইসলাম, রাসুল (সঃ) ও পবিত্র কুরআন সম্পর্কে ২৫৩
১৯৮ সালাত, জাকাত, ও আমানতের দায়িত্ব পরিপূরণ সম্পর্কে ২৫৬
১৯৯ মুয়াবিয়ার শঠতা ও বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে ২৫৭
২০০ ন্যায় পথের অনুসারীর স্বল্পতা সম্পর্কে ২৫৮
২০১ সাইয়্যেদুন্নিছা খাতুনে জান্নাত ফাতিমার দাফনের সময় প্রদত্ত খোৎবা ২৬০
২০২ পরকালের রসদ সংগ্রহের উপদেশ ২৬১
২০৩ বিচার দিনের বিপদ সম্পর্কে ২৬১
২০৪ রাষ্ট্রীয় কার্যে তালহা ও জুবায়রের পরামর্শ গ্রহণ না করার অভিযোগের জবাবে প্রদত্ত খোৎবা ২৬১
২০৫ সিফফিনে সিরিয়দেরকে গালি-গালাজ সম্পর্কে ২৬২
২০৬ সিফফিনে ইমাম হাসান যুদ্ধ করতে দ্রুত এগিয়ে যাওয়ার প্রেক্ষিতে প্রদত্ত খোৎবা ২৬২
২০৭ শালিসী সম্পর্কে আমিরুল মোমেনিনের মনোভাবে অনুচরগণের অসন্তোষের প্রেক্ষিতে প্রেদত্ত খোৎবা ২৬৩

২০৮ আমিরুল মোমেনিনের অনুচর আ'লা ইবনে জিয়াদ আল-হারিছির বিশাল বাড়ী দেখে প্রদত্ত খোৎবা ২৬৩
২০৯ হাদীসে পরস্পর বিরোধী বক্তব্যের কারণ ও রাবীদের প্রকারভেদ সম্পর্কে ২৬৭
২১০ আল্লাহ্‌র মহত্ব ও বিশ্বচরাচর সৃষ্টি সম্পর্কে ২৭২
২১১ যারা ন্যায়ের সমর্থন পরিত্যাগ করে তাদের সম্পর্কে ২৭৩
২১২ আল্লাহ্‌র মহিমা ও রাসুলের (সঃ) প্রশংসা সম্পর্কে ২৭৩
২১৩ রাসুলের অধঃবংশের মহত্ব ও যাদের হেদায়েত মেনে চলতে হবে তাদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ২৭৩
২১৪ আমিরুল মোমেনিনের প্রার্থনা ২৭৪
২১৫ শাসক ও শাসিতের পারস্পরিক অধিকার সম্পর্কে ২৭৫
২১৬ কুরাইশদের বাড়াবাড়ি সম্পর্কে ২৭৮
২১৭ জামালের যুদ্ধের পর তালহা ও আবদার রহমানের লাশের পাশ দিয়ে যেতে আমিরুল মোমেনিনের খোৎবা ২৭৮
২১৮ খোদা-ভীরু ও দ্বীনদারের গুণাবলী সম্পর্কে ২৭৯
২১৯ প্রাচুর্যের দম্ভ সম্পর্কে ২৭৯
২২০ আল্লাহ্‌র জেকের সম্পর্কে ২৮১
২২১ আল্লাহ্‌কে ভুলে থাকা সম্পর্কে ২৮২
২২২ জুলুম ও তসরুফ হতে দূরে থাকা সম্পর্কে ২৮৪
২২৩ মোনাজাত ২৮৫
২২৪ দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ীত্ব ও কবরের অসহায়ত্ব সম্পর্কে ২৮৫
২২৫ মোনাজাত ২৮৬
২২৬ দুর্যোগপূর্ণ অবস্থার আগেই মৃত সহচরদের সম্পর্কে ২৮৬
২২৭ খেলাফাত গ্রহণ করার জন্য বায়াত সম্পর্কে ২৮৯
২২৮ আল্লাহ্‌কে ভয় করার উপদেশ ২৮৯
২২৯ রাসুল (সঃ) সম্পর্কে ২৯০
২৩০ একজন অনুচর বায়তুল মাল হতে কিছু টাকা চাইলে আমিরুল মোমেনিনের খোৎবা ২৯১
২৩১ জা'দাহ্ ইবনে হুবায়রাহ আল-মখযুমির খোৎবা প্রদানের অক্ষমতা সম্পর্কে ২৯১
২৩২ মানুষের বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতির বিভিন্নতা সম্পর্কে ২৯২
২৩৩ রাসুলকে (সঃ) শেষ গোসলের পর কাফন পরিয়ে প্রদত্ত খোৎবা ২৯৩
২৩৪ হিজরতের সময় রাসুলকে(সঃ) অনুসরণ সম্পর্কে ২৯৪
২৩৫ মৃত্যুর পূর্বে আখিরাতের রসদ সংগ্রহ সম্পর্কে ২৯৫
২৩৬ সিফফিনের সালিশদ্বয় ও সিরিয়দের হীনমন্যতা সম্পর্কে ২৯৫
২৩৭ আহ্‌লুল বাইত সম্পর্কে ২৯৬
২৩৮ মদিনা ত্যাগ করার জন্য উসমানের অনুরোধের প্রেক্ষিতে প্রদত্ত খোৎবা ২৯৬
২৩৯ জিহাদে উদ্বুদ্ধ করার জন্য নিজের লোকদেরকে উপদেশ ২৯৬

দ্বিতীয় অধ্যায়
আমিরুল মোমেনিনের পত্রাবলী ও নির্দেশাবলী

পত্র নম্বর	বিষয়	পৃষ্ঠা নম্বর
১	মদিনা হতে বসরাভিমুখে যাত্রাকালে কুফার জনগণকে লিখিত পত্র	২৯৯
২	জামালের যুদ্ধে জয়লাভের পর কুফাবাসীদেরকে লিখিত পত্র	৩০০
৩	কুফার কাজী শুরাইয়াহ্ ইবনে হারিছের জন্য লিখিত দলিল	৩০১
৪	সেনাবাহিনীর অফিসারকে লিখিত পত্র	৩০২
৫	আজারবাইজানের গভর্ণর আশআছ ইবনে কায়েসকে লিখিত পত্র	৩০৩
৬	মুয়াবিয়াকে লিখিত পত্র	৩০৩
৭	মুয়াবিয়ার প্রতি প্রেরিত পত্র	৩০৪
৮	মুয়াবিয়ার নিকট প্রেরিত আবদিল্লাহ্ আল-বাজালীকে লিখিত পত্র	৩০৪
৯	মুয়াবিয়ার প্রতি প্রেরিত পত্র	৩০৫
১০	মুয়াবিয়ার প্রতি প্রেরিত পত্র	৩০৭
১১	সৈন্যবাহিনীর প্রতি নির্দেশ	৩০৮
১২	সিরিয়া অভিমুখে প্রেরিত তিন হাজারের একটি অগ্রগামী বাহিনীর কমান্ডার মাকিল ইবনে কায়েস আর-রিয়াহির প্রতি নির্দেশ	৩০৮
১৩	সৈন্যবাহিনীর অফিসারের প্রতি প্রেরিত পত্র	২০৯
১৪	সিফফিনে যুদ্ধ শুরু করার পূর্বে সেনাবাহিনীকে প্রদত্ত নির্দেশ	৩০৯
১৫	শত্রুর মোকাবেলা করার পূর্বে আমিরুল মোমেনিনের প্রার্থনা	৩১১
১৬	যুদ্ধের সময় অনুচরদেরকে প্রদত্ত নির্দেশ	৩১১
১৭	মুয়াবিয়ার একটি পত্রের প্রত্যুত্তর	৩১১
১৮	বসরার গভর্ণর আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসকে লিখিত পত্র	৩১৩
১৯	একজন অফিসারকে লিখিত পত্র	৩১৪
২০	জিয়াদ ইবনে আবিহ্‌কে লিখিত পত্র	৩১৪
২১	জিয়াদের প্রতি	৩১৫
২২	আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের প্রতি	৩১৫
২৩	মৃত্যুশয্যার নির্দেশনামা	৩১৫
২৪	আমিরুল মোমেনিনের সম্পত্তি বন্টন বিষয়ক নির্দেশনামা	৩১৬
২৫	যাকাত ও দান সংগ্রহের জন্য যাকেই নিয়োগ করতেন তাকে আমিরুল মোমেনিন এ নির্দেশ দিতেন	৩১৬
২৬	জাকাত ও দান সংগ্রহের জন্য প্রেরিত একজন অফিসারারের প্রতি নির্দেশ	৩১৭
২৭	মুহাম্মদ ইবনে আবু বকরকে মিশরের শাসনকর্তা নিয়োগ করার পর প্রদত্ত নির্দেশ	৩১৮
২৮	মুয়াবিয়ার পত্রের প্রত্যুত্তর	৩১৯

২৯ বসরার জনগণের প্রতি ৩২৪
৩০ মুয়াবিয়ার প্রতি ৩২৪
৩১ সিফফিন হতে ফেরার পথে হাসান ইবনে আলীর উদ্দেশ্যে লিখিত পত্র ৩২৪
৩২ মুয়াবিয়ার প্রতি ৩৩২
৩৩ মক্কার গভর্ণর কুছাম ইবনে আব্বাসের প্রতি ৩৩৩
৩৪ মিশরের পথে মালিক আশতারের মৃত্যুর পর মুহাম্মদ ইবনে আবু বকরকে লিখেছেন ৩৩৩
৩৫ মুহাম্মদ ইবনে আবু বকরের হত্যার পর আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের প্রতি ৩৩৪
৩৬ আমিরুল মোমেনিনের ভ্রাতা আকীলের প্রতি ৩৩৪
৩৭ মুয়াবিয়ার প্রতি ৩৩৫
৩৮ মালিক আশতারকে মিশরের গভর্ণর নিয়োগ করার পর মিশরের জনগণের প্রতি ৩৩৫
৩৯ আমর ইবনে আসের প্রতি ৩৩৬
৪০ আমিরুল মোমেনিনের একজন অফিসারের প্রতি ৩৩৬
৪১ আমিরুল মোমেনিনের একজন অফিসারের প্রতি ৩৩৭
৪২ উমর ইবনে আবি সালামাহ্ মাখজুমীর প্রতি ৩৩৮
৪৩ আদ্রাশির খুররাহ (ইরান)-এর গভর্ণর মাসকালাহ্ ইবনে হুবায়রাহ্-শায়াবানীর প্রতি ৩৩৮
৪৪ জিয়াদ ইবনে আবিহ্র প্রতি ৩৩৮
৪৫ বসরার গভর্ণর জনগণের আমন্ত্রণে ভোজোৎসবে যোগদান করায় তার প্রতি ৩৩৯
৪৬ একজন অফিসারের প্রতি ৩৫১
৪৭ ইমাম হাসান ও হুসাইনের প্রতি ৩৫১
৪৮ মুয়াবিয়ার প্রতি ৩৫২
৪৯ মুয়াবিয়ার প্রতি ৩৫৩
৫০ সেনাবাহিনীর অফিসারদের প্রতি ৩৫৩
৫১ ভূমিকর আদায়কারীদের প্রতি ৩৫৪
৫২ সালাত সম্পর্কে বিভিন্ন স্থানের গভর্ণরদের প্রতি ৩৫৪
৫৩ মালিক ইবনে হারিছ আশতারকে মিশরের গভর্ণর নিয়োগ করে প্রদত্ত নির্দেশনামা ৩৫৪
গভর্ণরের গুনাবলী ও দায়িত্ব, সর্বসাধারণের স্বার্থে প্রশাসন, উপদেষ্টা নিয়োগ, বিভিন্ন শ্রেণীর লোক, সেনাবহিনী, বিচারপতি, নির্বাহী অফিসার, রাজস্ব প্রশাসন, কর্মচারীদের সংস্থাপন, ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি, নিম্ন শ্রেণীর লোক, আল্লাহর ধ্যান এবং শাসকের আচরণ ও কর্ম সম্পর্কে
৫৪ তালহা ও জুবায়রের প্রতি ৩৬৬
৫৫ মুয়াবিয়ার প্রতি ৩৬৭
৫৬ একটি বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে শুরাইয়া ইবনে হানীকে সিরিয়া প্রেরণ কালে প্রদত্ত নির্দেশনামা ৩৬৮
৫৭ বসরাভিমুখে যুদ্ধ যাত্রাকালে কুফাবাসীদের প্রতি ৩৬৮
৫৮ সিফাফিনের ঘটনা প্রবাহ বর্ণনা করে বিভিন্ন এলাকার লোকের কাছে লিখেছিলেন ৩৬৮
৫৯ হালওয়ানের গভর্ণর আল- আসওয়াদ ইবনে কুতায়বাহ্র প্রতি ৩৬৯

৬০ সেনাবাহিনীর অফিসারদের প্রতি ৩৬৯
৬১ হিত-এর গভর্ণর কুমায়েল ইবনে জিয়াদ আন-নাখাই এর প্রতি ৩৬৯
৬২ মালিক আশতারকে মিশরের গভর্ণর নিয়োগ করার পর মিশরের জনগণের প্রতি ৩৭০
৬৩ কুফার গভর্ণর আবু মুসা আশআরী জামালের যুদ্ধে যোগদান না করার জন্য জনগণকে প্ররোচিত করার সংবাদ পেয়ে তাকে লিখেছিলেন ৩৭২
৬৪ মুয়াবিয়ার পত্রের জবাব ৩৭৩
৬৫ মুয়াবিয়ার প্রতি ৩৭৫
৬৬ আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের প্রতি ৩৭৫
৬৭ মক্কার গভর্ণর কুছাম ইবনে আল- আব্বাসের প্রতি ৩৭৬
৬৮ সালমান আল-ফারিসীর প্রতি ৩৭৬
৬৯ আল-হারিছ আল হামদানীর প্রতি ৩৭৬
৭০ মদিনা হতে কতিপয় ব্যক্তির মুয়বিয়ার নিকট গমনের সংবাদ পেয়ে মদিনার গভর্ণর শাহ্‌ল ইবনে হুনায়েফ আনসারীর প্রতি ৩৭৭
৭১ কিছু জিনিস আত্মসাতের কারণে মনছুর ইবনে জারুদ আল-আবদীর প্রতি ৩৭৮
৭২ আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের প্রতি ৩৭৮
৭৩ মুয়াবিয়ার প্রতি ৩৭৮
৭৪ রাবিয়াহ্ গোত্র ও ইয়েমেনবাসীদের মধ্যে প্রটোকল দলিল ৩৭৯
৭৫ মুয়াবিয়ার প্রতি ৩৭৯
৭৬ আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসকে বসবার গভর্ণর নিয়োগ করে প্রদত্ত নির্দেশনামা ৩৮০
৭৭ খারিজীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেতৃত্ব প্রদান কালে আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের প্রতি ৩৮০
৭৮ সিফফিনের সালিশদ্বয় সম্পর্কে নির্দেশনামা ৩৮০
৭৯ সেনাবাহিনীর অফিসারদের প্রতি নির্দেশ ৩৮০

তৃতীয় অধ্যায়
আমিরুল মোমেনিনের উক্তি, উপদেশ ও প্রবাদ

১-৪৮৯ উক্তি, উপদেশ ও প্রবাদ ৩৮৩—৪৩৪
গ্রন্থপঞ্জি ৪৩৫—৪৪০

খোৎবা-১

আকাশ, পৃথিবী ও আদম সৃষ্টি সম্পর্কে

প্রতিষ্ঠিত প্রশংসা আল্লাহ্‌র। তাঁর গুণরাজী কোন বর্ণনাকারী বর্ণনা করে শেষ করতে পারে না। তাঁর নেয়ামতসমূহ গণনাকারীগণ গনে শেষ করতে পারে না। প্রচেষ্টাকারীগণ তাঁর নেয়ামতের হক আদায় করতে পারে না। আমাদের সমুদয় প্রচেষ্টা ও জ্ঞান দ্বারা তাঁর পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করা সম্ভব নয় এবং আমাদের সমগ্র বোধশক্তি দ্বারা তাঁর মাহাত্ম্য অনুভব করা সম্ভব নয়। তাঁর সিফাত বর্ণনার কোন পরিসীমা নির্ধারিত নেই এবং সেজন্য কোন লেখা বা বক্তব্য, কোন সময় বা স্থিতিকাল নির্দিষ্ট করা হয়নি। তিনি নিজ কুদরতে সৃষ্টিকে অস্তিত্বশীল করেছেন, আপন করুণায় বাতাসকে প্রবাহিত করেছেন এবং শিলীভূত পাহাড় দ্বারা কম্পমান পৃথিবীকে সুদৃঢ় করেছেন।

আল্লাহ্‌র মা'রেফাতই দ্বীনের ভিত্তি[১]। এ মা'রেফাতের পরিপূর্ণতা আসে তাঁকে সত্য বলে সাক্ষ্য দেয়ায়; সাক্ষ্যের পরিপূর্ণতা হয় তাঁর এককত্বের বিশ্বাসে; বিশ্বাসের পরিপূর্ণতা হয় তাঁকে পরম পবিত্ররূপে নিরীক্ষণ করার জন্য আমল করায়; আমলের পরিপূর্ণতা অর্জিত হয় তাঁর প্রতি কোন সিফাত (গুণ) আরোপ না করায়। কারণ কোন কিছুতে গুণ আরোপিত হলে এটাই প্রমাণিত হয় যে, আরোপিত বিষয় হতে গুণ পৃথক এবং যার ওপর গুণ আরোপিত হয় সে গুণ হতে পৃথক। যারা আল্লাহ্‌তে সত্তা বহির্ভূত কোন সিফাত বা গুণ আরোপ করে তারা তাঁর সদৃশতার স্বীকৃতি দেয়; যারা তাঁর সদৃশতা স্বীকার করে তারা দ্বৈতবাদের স্বীকৃতি দেয়; যারা তাঁর দ্বৈতের স্বীকৃতি দেয় তারা তাঁকে খন্ডভাবে দেখে; যারা তাঁকে খন্ডভাবে দেখে তারা তাঁকে ভুল বুঝে; যারা তাঁকে ভুল বুঝে তারা তাঁকে চিনতে অক্ষম; যারা তাঁকে চিনতে অক্ষম তারা তাঁর ত্রুটি স্বীকার করে; যারা তাঁর ত্রুটি স্বীকার করে তারা তাঁকে সীমাবদ্ধতায় আবদ্ধ করে।

যদি কেউ বলে তিনি কি, সে জেনে রাখুক, তিনি সবকিছু ধারণ করে আছেন; এবং যদি কেউ বলে তিনি কিসের ওপর আছেন, সে জেনে নাও, তিনি নির্দিষ্ট কোন কিছুর ওপর নেই। যদি কেউ তাঁর অবস্থিতি নির্দিষ্ট কোন স্থানে মনে করে সে কিছু কিছু স্থানকে আল্লাহ্‌বিহীন মনে করলো। তিনি ঐ সত্তা যার আগমন সৃষ্টি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঘটেনি। তিনি অস্তিত্বশীল, কিন্তু অনস্তিত্ব হতে অস্তিত্বে আসেননি। তিনি সব কিছুতেই আছেন, কিন্তু কোন প্রকার ভৌত নৈকট্য দ্বারা নয়। তিনি সব কিছু হতে ভিন্ন, কিন্তু বস্তুগত দ্বান্দ্বিকতা ও বিচ্ছেদের মধ্য দিয়ে নয়। তিনি কর্ম সম্পাদন করেন কিন্তু বিচলন ও হাতিয়ারের মাধ্যমে নয়। তিনি তখনও দেখেন যখন তাঁর সৃষ্টির মধ্যে কেউ দেখার মত থাকে না। তিনিই একমাত্র একক, কেন না এমন কেউ নেই যার সাথে তিনি সঙ্গ রাখতে পারেন অথবা যার অনুপস্থিতি তিনি অনুভব করেন।

নিখিল বিশ্ব সৃষ্টি

তিনি সৃষ্টির সূত্রপাত করলেন একান্তই মৌলিকভাবে— কোন প্রকার প্রতিরূপ ব্যতীত, কোন প্রকার পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ ব্যতীত, কোনরূপ বিচলন ব্যতীত এবং ফলাফলের জন্য কোনরূপ ব্যাকুলতা ব্যতীত। সব কিছুকে তিনি নির্দিষ্ট সময় দিলেন, তাদের বৈচিত্র্যে সামঞ্জস্য বিধান করলেন এবং তাদের বৈশিষ্ট্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন। সৃষ্টির পূর্বেই তিনি সব কিছুর প্রবণতা, জটিলতা, সীমাবদ্ধতা ও দুর্বলতা সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন।

অতঃপর পবিত্র সত্তা অনন্ত শূন্য সৃষ্টি করলেন এবং প্রসারিত করলেন নভোমন্ডল ও বায়ু স্তর। তিনি উচ্ছল তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ পানি প্রবাহিত করলেন। তরঙ্গগুলো এত ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ ছিল যে, একটি আরেকটির ওপর দিয়ে গড়িয়ে যেতো। তরঙ্গাঘাতের সাথে তিনি প্রবল বায়ুপ্রবাহ যুক্ত করলেন এবং প্রবল ঘূর্ণিঝড়ের প্রকম্পন সৃষ্টি করলেন। পানির বাষ্পীয় অবস্থাকে তিনি বৃষ্টিরূপে পতিত হবার নির্দেশ দিলেন এবং বৃষ্টির প্রাবল্যের ওপর বায়ুকে

নিয়ন্ত্রণাধিকার দিলেন। মেঘের নীচে বাতাস প্রবাহিত হতে লাগলো এবং পানি বাতাসের ওপর প্রচণ্ড বেগে প্রবাহিত হতে লাগলো।

অতঃপর সর্বশক্তিমান বাতাস সৃষ্টি করে উহাকে নিশ্চল করলেন, উহার অবস্থান স্থায়ী করলেন, উহার গতিতে প্রচন্ডতা দিলেন এবং উহাকে সর্বত্র ছড়িয়ে দিলেন। তৎপর তিনি বাতাসকে আদেশ করলেন গভীর পানিকে গতিশীল ও চঞ্চল এবং সমুদ্র তরঙ্গকে তীব্রতর করার জন্য। ফলে বাতাস দধি তৈরীর মত পানিকে মন্থন করতে লাগলো এবং সজোরে উহাকে মহাশূন্যে এমনভাবে প্রক্ষেপ করলো যাতে সম্মুখ পশ্চাতে ও পশ্চাত সম্মুখে চলে গেলো। এতে ওপরের স্তরে বিপুল ফেনপুঞ্জ সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত স্থিরকে অস্থির করে রাখলো। সর্বশক্তিমান তখন ফেনপুঞ্জকে অনন্ত শূন্যে উত্তোলন করে উহা হতে সপ্ত আকাশ সৃষ্টি করলেন যার সর্বনিম্ন স্তর স্ফীত অথচ অনড় এবং ওপরের স্তর আচ্ছাদনের মত বিদ্যমান যেন এক সুউচ্চ বৃহৎ অট্টালিকা যাতে কোন স্তম্ভ নেই অথবা একত্রে জোড়া লাগাবার পেরাক নেই। তখন তিনি ওপরের স্তরকে তারকা ও উজ্জ্বল উল্কা দ্বারা সুশোভিত করলেন এবং আবর্তিত আকাশ, চলমান আচ্ছাদন ও ঘূর্ণায়মান নভোমন্ডলে তিনি দেদীপ্যমান সূর্য ও দীপ্তিশীল চন্দ্রকে স্থাপন করলেন।

ফেরেশতা সৃষ্টি

তৎপর পরম বিধাতা বিভিন্ন আকাশের মধ্যে উন্মুক্ততা বিধান করলেন এবং বিভিন্ন শ্রেণীর ফেরেশতা দ্বারা সেই উন্মুক্ততা পরিপূর্ণ করলেন। তাদের মধ্যে কতেক সেজদাবনত যারা কখনো রুকু করে না, কতেক রুকু অবস্থায় যারা কখনো দাঁড়ায় না এবং কতেক সুবিন্যস্তভাবে অবস্থান করছে যারা কখনো তাদের স্থান পরিত্যাগ করে না। অন্যরা সর্বক্ষণ আল্লাহ্‌র তসবীহ্ পাঠ করে এবং তারা ক্লান্ত হয় না। নয়নের নিদ্রা, বুদ্ধির বিভ্রান্তি, শরীরের অবসন্নতা অথবা বিস্মৃতির প্রভাব এদেরকে স্পর্শ করে না।

ফেরেশতাদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁর বিশ্বস্ত অহিবাহক যারা নবীদের নিকট আল্লাহ্‌র মুখপাত্র হিসাবে কাজ করে এবং তাঁর আদেশ নির্দেশকে সর্বত্র পৌঁছে দেয়। কেউ কেউ আল্লাহ্‌র সৃষ্টি রক্ষার কাজে নিযুক্ত। আবার কেউ কেউ বেহেশতের দরজার প্রহরী হিসাবে নিযুক্ত। আরো অনেক আছে যাদের পদদ্বয় ভূ-মন্ডলের সর্বনিম্ন স্তরে স্থিরভাবে স্থাপিত এবং তাদের শিরোদেশ আকাশের সর্বোচ্চ স্তরে প্রসারিত এবং তাদের বাহু চতুর্দিকে সম্প্রসারিত। তাদের স্কন্ধ আরশের স্তম্ভের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাদের চোখ আরশের প্রতি নিবদ্ধ এবং তাদের পাখা আরশের নীচে বিস্তৃত। তাদের নিজেদের মধ্যে এবং অন্য সকল কিছুর মধ্যে সম্মানিত পর্দা ও কুদরতের আবরণ সৃষ্টি করা হয়েছে। তারা তাদের মহান স্রষ্টাকে আকৃতির মাধ্যমে ধারণা করে না। তারা স্রষ্টার প্রতি সৃষ্টির কোন গুণারোপ করে না, তাঁকে কোন নির্দিষ্ট স্থানে সীমাবদ্ধ করে না এবং উপমার মাধ্যমে তাঁর প্রতি ইঙ্গিত করে না।

আদম সৃষ্টি

আল্লাহ্ কঠিন, কোমল, মধুর ও তিক্ত মৃত্তিকা সংগ্রহ করলেন। তিনি এ মৃত্তিকায় পানি দিয়ে কর্দমে পরিণত করলেন এবং পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত ফোঁটায় ফোঁটায় পানির পতন ঘটালেন এবং আঠাল না হওয়া পর্যন্ত আদ্রতা দ্বারা পিন্ড প্রস্তুত করলেন। এ পিন্ড হতে তিনি আদল, জোড়াসমূহ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও বিভিন্ন অংশসহ একটি আকৃতি তৈরী করলেন। একটা নির্দিষ্ট সময় ও জ্ঞাত স্থায়িত্ব পর্যন্ত তিনি এটাকে শুকিয়ে কাঠিন্য প্রদান করলেন। অতঃপর এ আকৃতির মধ্যে তিনি তাঁর রূহ্ ফুৎকার করে দিলেন। ফলে এটা প্রাণ-চৈতন্য লাভ করে মানবাকৃতি ধারণ করলো এবং এতে মন সন্নিবেশ করা হলো যা তাকে নিয়ন্ত্রণ করে, বুদ্ধিমত্তা দেয়া হলো যা তার উপকারে আসে,

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেয়া হলো যা তার কাজে লাগে, ইন্দ্রিয় দেয়া হলো যা তার অবস্থার পরিবর্তন ঘটায় এবং জ্ঞান দেয়া হলো যা সত্য-অসত্য, স্বাদ-গন্ধ ও বর্ণ-প্রকারের পার্থক্য বুঝাতে শেখালো। আদম হলো বিভিন্ন বর্ণের, আসঞ্জক পদার্থের, বিভিন্ন পরস্পর বিরোধী উপকরণের এবং বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য যেমন-উষ্ণতা, শীতলতা, কোমলতা, কাঠিন্য, খুশী-অখুশী ইত্যাদির সংমিশ্রনের কর্দম।

আল্লাহ্ তখন ফেরেশতাদের প্রতি তাঁর প্রতিশ্রুতি পূরণার্থে এবং তাদের প্রতি তাঁর নির্দেশের আনুগত্য পরিপূরণ করণার্থে আত্মসমর্পণের স্বীকৃতি স্বরূপ ও তাঁর মহিমার প্রতি সম্মান স্বরূপ সেজদাবনত হতে বললেন। তিনি বলেন ঃ

আদমকে সেজদা কর এবং ইবলীস ব্যতীত সকলেই সেজদা করলো। (কুরআন -২:৩৪, ৭:১১, ১৭:৬১, ১৮:৫০, ২০:১১৬)

আত্মম্ভরিতা ইবলীসকে আল্লাহ্র আদেশ পালনে বারিত করলো এবং ঔদ্ধত্য দ্বারা সে আক্রান্ত হয়েছিল। সুতরাং সে আগুনের তৈরী বলে অহংবোধ করলো এবং মাটির তৈরী বলে আদমের প্রতি অবজ্ঞাভরে ব্যবহার করলো। ফলে আল্লাহ্ ইবলীসকে তাঁর রোষের পূর্ণ প্রতিফল প্রদানের এবং মানুষকে পরীক্ষা করার ও শয়তানের প্রতি তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করার জন্য যথেষ্ট সময় দিলেন। আল্লাহ্ বলেন ঃ

তা হলে নিশ্চয় তুমি অবকাশ প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত—নির্ধারিত সময়ের দিন পর্যন্ত (কুরআন - ১৫:৩৭-৩৮, ৩৮ : ৮০-৮১)

তৎপর আল্লাহ্ আদমকে একটি ঘরে অধিষ্ঠান করলেন যেখানে তিনি মহানন্দে ও পূর্ণ নিরাপত্তায় বসবাস করতে লাগলেন। তিনি আদমকে ইবলীস ও তার শত্রুতা সম্পর্কে সাবধান করে দিলেন। কিন্তু ইবলীস আদমের বেহেশ্ত-বাস ও ফেরেশতাদের সংসর্গের জন্য ঈর্ষান্বিত হলো। সুতরাং সে আদমের 'ইয়াকিন' শিথিল করলো এবং তার প্রতিশ্রুতি দুর্বল করলো। এতে আদমের আনন্দ ভয়ে পরিণত হলো এবং মর্যাদা লজ্জায় পরিণত হলো। তখন আল্লাহ্ আদমকে 'তওবা' করার সুযোগ দিলেন এবং তাঁর রহমতের বাক্য শিখালেন। তিনি আদমকে বেহেশ্তে প্রত্যাবর্তনের ওয়াদা দিলেন এবং তাঁকে কষ্টভোগ করা ও বংশ বিস্তারের স্থলে অবতরণ করালেন।

পয়গম্বর মনোনয়ন

আল্লাহ্ আদমের বংশধর হতে অনেক পয়গম্বর মনোনীত করলেন এবং তাঁর প্রত্যাদেশ ও বাণী বিশ্বস্ততার সাথে মানুষের নিকট পৌছানোর জন্য তাঁদের নিকট হতে অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন। কালক্রমে অনেক লোক আল্লাহ্কে দেয়া প্রতিশ্রুতি পরিবর্তন করে ফেললো এবং আল্লাহ্র প্রতি কর্তব্য বিষয় ভুলে গিয়ে তাঁর সমকক্ষ দাঁড় করাতে লাগলো। শয়তান তাদেরকে আল্লাহ্র মা'রেফাত হতে ফিরিয়ে নিল এবং তাঁর ইবাদত হতে বিচ্ছিন্ন করলো। তখন আল্লাহ্ তাদের কাছে রাসুলগণকে প্রেরণ করেছিলেন এবং একের পর এক নবী পাঠালেন যেন তাঁরা পূর্ব-প্রতিশ্রুতি পরিপূর্ণ করার দিকে মানুষকে আহবান করেন এবং ভুলে যাওয়া নেয়ামতসমূহকে স্মরণ করিয়ে দেন; যেন তাঁরা তবলীগের মাধ্যমে মানুষকে আল্লাহ্র দিকে প্রণোদিত করেন, যেন তাদের কাছে প্রজ্ঞার গুপ্ত রহস্য উন্মোচন করে দেন এবং আল্লাহ্র কুদরতের নিদর্শনসমূহ যেমন-সমুচ্চ আকাশ, বিছানো পৃথিবী, তাদের বাঁচিয়ে রাখার জীবনোপকরণ, মৃত্যু, বার্ধক্যের জ্বরা ও ক্রমান্বয়ে আগত ঘটনা প্রবাহ—তাদেরকে দেখিয়ে দেন।

আল্লাহ্ তাঁর সৃষ্টিকে কখনো পয়গম্বরবিহীন অথবা নাজেলকৃত বাণী অথবা বাধ্যতামূলক প্রত্যাদেশ অথবা সরল সহজ পথ ব্যতীত রাখেননি। পয়গম্বরগণ এমনভাবে তাঁদের দায়িত্বে অটল ছিলেন যে, তাঁদের সহচরের সংখ্যাল্পতা বা তাঁদেরকে মিথ্যা প্রমাণকারীর দল অধিক হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের মিশন হতে কখনো তাঁরা বিরত হননি এবং কোন কিছুই তাঁদেরকে কর্তব্য হতে বারিত রাখতে পারেনি। পয়গম্বরগণের প্রত্যেকেই তাঁর পূর্ববর্তী জনের কথা বলে গেছেন এবং পরবর্তী জনের আগমনী বার্তা জ্ঞাপন করেছেন।

নবী মুহাম্মদ (সঃ)

এভাবে সময় গড়িয়ে যুগের পর যুগ অতিক্রান্ত হলো—পিতারা মৃত্যুবরণ করলো এবং সন্তানেরা তাদের স্থানে এলো—সুদীর্ঘ সময় পার হবার পর আল্লাহ্ তাঁর অঙ্গীকার পূরণার্থে ও পয়গম্বর-ধারা সমাপ্তি করে মুহাম্মদকে (সঃ) নবী ও রাসুল করে পৃথিবীতে প্রেরণ করলেন। অন্যান্য পয়গম্বরগণ হতে মুহাম্মদ (সঃ) সম্পর্কে অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয়েছিল। মুহাম্মদের (সঃ) জন্ম ছিল অতীব সম্মানজনক এবং চরিত্র বৈশিষ্ট্য ছিল সুখ্যাতিপূর্ণ। সে সময়ে পৃথিবীর মানুষ বিভিন্ন ধর্মে দলভুক্ত (মাজহাব) ছিল—তাদের মত ও পথ ছিল বিবিধ—চিন্তাধারা ছিল বিক্ষিপ্ত এবং একে অপরের সাথে বিবাদমান ছিল। তারা সৃষ্টিকে আল্লাহ্র সাদৃশ্য করতো অথবা তাঁর মহিমান্বিত নামসমূহ বিকৃত করতো অথবা তিনি ব্যতীত অন্য কিছুকে ক্রিয়া-কর্ম সম্পাদনকারী মনে করতো। মুহাম্মদের (সঃ) মাধ্যমে আল্লাহ্ তাদেরকে সুপথ দেখালেন এবং তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টা দ্বারা তিনি তাদেরকে অজ্ঞতা হতে ফিরিয়ে আনলেন।

অতঃপর আল্লাহ্ মুহাম্মদকে (সঃ) তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য মনোনীত করে তাঁর মহিমান্বিত নৈকট্য দান করলেন এবং এ পৃথিবীতে থাকার অনেক অনেক উর্দ্ধের মর্যাদাশীল বিবেচনা করে তাঁকে এ পৃথিবী হতে তুলে নিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। ফলে তিনি মহাসম্মানের সাথে তাঁকে নিজের সান্নিধ্যে নিয়ে গেলেন। মুহাম্মদ (সঃ) ও তাঁর বংশধরগণের ওপর আল্লাহ্র রহমত বর্ষিত হোক।

পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ্

মুহাম্মদ (সঃ) তোমাদের মাঝে ঐ একই জিনিস রেখে গেছেন যা অন্য পয়গম্বরগণও তাঁদের উম্মতের কাছে রেখে গিয়েছিলেন। পয়গম্বরগণ মানুষকে অন্ধকারে রেখে যাননি। তাঁরা সুনির্দিষ্ট সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছিলেন এবং আল্লাহ্র স্থায়ী নিদর্শনাবলীর তত্ত্বাবধান করেছিলেন। মুহাম্মদ (সঃ) তোমাদের কাছে রেখে গেছেন তোমাদের প্রতিপালকের কিতাব যা নির্ধারিত হালাল ও হারাম বর্ণনা করে; ফরজ ও মোস্তাহাবসমূহ বর্ণনা করে; মনসুখ ও নাসেখ বর্ণনা করে; বাধ্যতামূলক ও ঐচ্ছিক বিষয়াদি, বিশেষ ও সাধারণ বিষয়াদি, উপদেশ ও উপমা, সীমিত ও অসীম, স্পষ্ট ও অস্পষ্ট বর্ণনা করে এবং শব্দ সংক্ষেপের (মুকাত্তাআত) ব্যাখ্যা ও গুপ্ত বিষয়ের স্পষ্ট বর্ণনা করে।

কুরআনে কিছু কিছু আয়াত আছে যে বিষয়ে জ্ঞানার্জন বাধ্যতামূলক আবার এমন কিছু আয়াত আছে যেগুলোর রহস্য বিষয়ে মানুষের অজ্ঞতা মার্জনীয়। রাসুলের সুন্নাহ্ কুরআনের বাধ্যতামূলক বিষয়াদির প্রকাশক। রাসুলের সুন্নাহ্র মাধ্যমে বাধ্যতামূলক বিষয়ের রদ-বদলও প্রতিফলিত হয়েছে অথবা সুন্নাহ্তে এমন বিষয়াদি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে যা পবিত্র গ্রন্থে হয়ত অনুসরণ না করার অনুমতি রয়েছে। এছাড়াও কিছু কিছু আয়াত আছে যা একটা বিশেষ সময় পর্যন্ত বাধ্যতামূলক ছিল কিন্তু ঐ সময়ের পর তদ্রুপ নেই। কুরআনের নিষেধাজ্ঞাসমূহও বিভিন্ন—কতেক এমন যাতে জাহান্নামের ভীতি প্রকট এবং কতেক এমন যাতে ক্ষমার প্রত্যাশা অধিক ব্যক্ত হয়েছে। কুরআনে এমন আয়াতও আছে যার একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রাংশও আল্লাহ্র নিকট বর্ধিতাকারে গ্রহণযোগ্য।

হজ্জ সম্পর্কে

আল্লাহ্ তাঁর পবিত্র গৃহে হজ্জ করা তোমাদের জন্য ফরজ করেছেন এবং সে গৃহকে মানুষের জন্য ক্বেবলা হিসাবে নির্ধারিত করেছেন। প্রাণীকূল অথবা কবুতর তৃষিত অবস্থায় যেভাবে ঝর্ণার পানির দিকে ছুটে যায় মানুষও তেমনি যেন কাবার দিকে ধাবমান হয়। মহিমান্বিত আল্লাহ্ তাঁর আজমতের সামনে বান্দাদের তাওয়াজু (বিনয়) প্রকাশের জন্য এবং তাঁর ইজ্জতের প্রতি তাস্দিক (দৃঢ় বিশ্বাস) প্রকাশের জন্য সম্মানিত ঘরকে প্রতীক হিসাবে নির্ধারিত করেছেন। সৃষ্টির মধ্য হতে তিনি এমন কতেক শ্রবণকারী মনোনীত করেছেন যারা তাঁর ডাকে সাড়া প্রদান করে এবং তাঁর বাণী বাস্তবে পরিণত করেন। এসব লোকেরা পয়গম্বরগণের মর্যাদার পর্যায়ে অবস্থান করে

এবং তারা ঐ সমস্ত ফেরেশতাগণের প্রতিরূপ যারা আরশের চতুর্দিকে তওয়াফ করে আল্লাহ্র ইবাদতের সার্বিক মর্যাদা ও তাঁর প্রতিশ্রুত ক্ষমার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। মহিমান্বিত আল্লাহ্ পবিত্র গৃহকে ইসলামের জন্য একটি প্রতীক করেছেন এবং তথায় আশ্রয় গ্রহণকারীদের জন্য উহা নিরাপত্তার স্থান করেছেন। তিনি কাবার হক্ক আদায়কে ওয়াজেব করেছেন এবং উহার দিকে সফরকে বাধ্যতামূলক করেছেন। আল্লাহ্ বলেনঃ

... এবং আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে এ গৃহের হজ্জ করা সেসকল লোকের জন্য বাধ্যতামূলক যারা উহা পর্যন্ত যাবার সামর্থ রাখে। কিন্তু কেহ অস্বীকার করলে, জেনে রাখুক, আল্লাহ্ বিশ্ব-জগতের মুখাপেক্ষী নন (কুরআন - ৩:৯৭)।

১। "আল্লাহ্র মা'রেফাতই দ্বীনের ভিত্তি।" দ্বীনের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে আনুগত্য স্বীকার করা এবং সাধারণভাবে দ্বীন বলতে বিধান বুঝায়। যে কোন অর্থই গ্রহণ করা হোক না কেন অন্তর যদি আল্লাহ্র মা'রেফাতের ধারণাবিহীন হয় তবে আনুগত্যের প্রশ্নই ওঠেনা এবং সেক্ষেত্রে বিধান অনুসরণের প্রশ্নও বাতুলতা মাত্র। কারণ যখন কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকে না তখন লক্ষ্যে পৌছার জন্য অগ্রযাত্রারও কোন দিক নির্দেশনা থাকে না। কোন লক্ষ্য বিষয়ের ধারণা না থাকলে তা পাবার প্রচেষ্টা করা যায় না। এতদসত্ত্বেও মানুষ যখন কোন উন্নত ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে আসে তখন তাঁর আনুগত্যের উপলব্ধি ও প্রেরণা মানুষের স্বভাব ও ব্যক্তিগত গুণাবলীকে প্রভাবিত করে চালিকাশক্তি হিসাবে মানুষের বাতেনকে উচ্চ পর্যায়ে উন্নীত করে।

"আল্লাহ্র মা'রেফাত" সম্পর্কীয় অত্যাবশ্যকীয় বিষয়সমূহ বর্ণনার পর আমিরুল মোমেনিন উহার মূল উপাদান ও শর্তসমূহ ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেন যে, মানুষ যদিও মা'রেফাত জ্ঞানকে উঁচু স্তরের চিন্তা-ভাবনা মনে করে এড়িয়ে যেতে চায় তবুও এর প্রাথমিক ধাপ হলো অজানাকে জানার সহজাত আকাঙ্ক্ষা ও বিবেকের তাড়না অথবা মোমিনের নিকট হতে দীক্ষা গ্রহণ করে অদৃশ্য সত্তা সম্পর্কে একটা ধারণা মনের মধ্যে গড়ে তোলা। বস্তুতঃ এ ধারণাটাই আল্লাহ্র মা'রেফাত অন্বেষণের চিন্তা-চেতনার পথিকৃত হিসাবে কাজ করে। কিন্তু যারা গাফেল অথবা পারিপার্শ্বিক অবস্থার কারণে গবেষণায় নিমগ্ন হতে পারে না তাদের মনে ধারণার সৃষ্টি হলেও তারা মা'রেফাতের গভীর সমুদ্রে ডুব দিতে পারে না এবং তাদের নিকট মা'রেফাতের ধারণা বদ্ধমূল হতে পারে না। এক্ষেত্রে তারা আল্লাহ্র অস্তিত্ব জ্ঞান হতে বঞ্চিত থাকে এবং এ পর্যায়ে যেহেতু সাক্ষ্য বহনের স্তর তাদের কাছে অনভিগম্য সেহেতু এ বিষয়ে তারা প্রশ্নযোগ্য হয়ে পড়ে। কিন্তু যদি কেউ মা'রেফাত সম্পর্কে অর্জিত মানসচিত্র দ্বারা পরিচালিত হয়ে এগিয়ে যায় সে বুঝতে পারে এতে গভীর চিন্তা ও গবেষণা অত্যাবশ্যকীয়। এভাবেই মানুষ আল্লাহ্র মা'রেফাত লাভের পরবর্তী স্তরে উপনীত হয়। এ স্তর হলো সৃষ্টির বৈচিত্র্যের মাঝে স্রষ্টার খোঁজ করা। কারণ প্রতিটি শিল্পকর্ম শিল্পীর অস্তিত্বের সর্বসম্মত ও দৃঢ় প্রমাণ এবং প্রতিটি ক্রিয়ায় কোন না কোন প্রতিক্রিয়া বিদ্যমান। মানুষ যেদিকে দৃষ্টিপাত করুক না কেন সে এমন কোন কিছুর অস্তিত্ব বের করতে পারবে না যা কেউ না কেউ তৈরি করেনি; এমন কোন পদচিহ্ন দেখাতে পারবে না যেখানে কেউ হাঁটেনি; এমন কোন নির্মাণ কাজ দেখাতে পারবে না যার কোন নির্মাতা নেই। এরপরও মানুষ কিভাবে ভাবতে পারে চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র খচিত বিস্তীর্ণ নীলাকাশ ও তৃণ-ফুল সুশোভিত এ সুন্দর পৃথিবী সৃষ্টিকর্তা ছাড়াই সৃষ্টি হয়েছে? সুতরাং বস্তুনিচয় আর সৃষ্টির নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া দেখার পরও কি কেউ এ কথা বলতে পারে যে, এ বৈচিত্র্যময় বিশ্বচরাচরের সৃষ্টিকর্তা নেই? কারণ বস্তুসত্তা অনস্তিত্ব হতে আসতে পারে না বা অসত্তাত্ব (nothingness) অস্তিত্বের কারণ হতে পারে না। এ বিষয়ে পবিত্র কুরআনের যুক্তিবিন্যাস হলো ঃ

আল্লাহ্ সম্বন্ধে কি কোন সন্দেহ আছে যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর মৌলিক সৃষ্টিকর্তা? (১৪:১০)

কিন্তু মা'রেফাতের এ স্তরটিও অপর্যাপ্ত হয়ে পড়ে যখন আল্লাহ্র অস্তিত্বের সাক্ষ্যবহন তাগুতের প্রতি বিশ্বাস দ্বারা কলঙ্কিত করা হয়।

মা'রেফাতের পথে তৃতীয় স্তর হলো আল্লাহ্র ঐক্য ও এককত্বে গভীর বিশ্বাসসহ তাঁর অস্তিত্বের স্বীকৃতি অর্থাৎ তৌহিদে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। তৌহিদে প্রতিষ্ঠিত হতে না পারলে আল্লাহ্র অস্তিত্বের সাক্ষ্য বহন পরিপূর্ণ হয় না, কারণ তাগুতে বিশ্বাস

করলে আল্লাহ্তে বহুত্ব আরোপ করা হয়। অথচ মা'রেফাত অর্জনের জন্য আল্লাহ্কে একক হিসাবে গ্রহণ করা অপরিহার্য। একাধিক আল্লাহ্র ধারণা করলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠে যে, এ বিশ্বচরাচর কি তাদের একজন সৃষ্টি করেছে নাকি তারা সকলে সম্মিলিতভাবে করেছে? যদি তাদের কেউ একজন সৃষ্টি করতো তা'হলে অপরজন নিজকে প্রভেদ করে দেখানোর জন্য অন্য রকম সৃষ্টি করতো। আবার যদি তারা সকলে সমষ্টিগতভাবে সৃষ্টি করতো তা হলে দু'টো অবস্থার সৃষ্টি হতো— হয় তারা একে অপরের সহায়তা ব্যতীত কর্ম সম্পাদন করতে পারতো না, না হয় কারো অপরের সহায়তার প্রয়োজন হতো না। প্রথম অবস্থাটি অক্ষমতা প্রকাশক যাতে দেখা যায় একজন অপরজনের উপর নির্ভরশীল এবং অপর অবস্থাটিতে দেখা যায় তারা প্রত্যেকে নিয়মিত আলাদা আলাদা ক্রিয়া সম্পাদক। ধরা যাক, সকল স্রষ্টা সৃষ্টিকর্ম তাদের নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে সম্পাদন করছেন। সেক্ষেত্রে অবস্থাটা এমন হতো যে, প্রতিটি সৃষ্টি শুধুমাত্র তার নিজস্ব স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখতো —সমগ্র সৃষ্টি একই স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক রক্ষা করতো না। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা তা নয়। প্রতিটি সৃষ্টজীব স্রষ্টার সাথে একই সম্পর্ক রক্ষা করে চলছে এবং বিশ্বচরাচরের সবকিছু একই নিয়মে চলছে। মোট কথা, আল্লাহ্র একত্বের স্বীকৃতি না দিয়ে কোন উপায় নেই, কারণ একাধিক সৃষ্টিকর্তার ধারণা গ্রহণ করলে কোন কিছুর অস্তিত্বের সম্ভাব্যতা থাকে না এবং নিঃসন্দেহে পৃথিবী ও নভোমন্ডলসহ সৃষ্টির সবকিছু ধ্বংস হয়ে যেত। মহিমান্বিত আল্লাহ্ নিম্নরূপ যুক্তি প্রদর্শন করেন ঃ

> *যদি আল্লাহ্ ব্যতীত আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যে বহু ইলাহ্ থাকতো, তবে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেতো ...(কুরআন- ২১ : ২২) ।*

মা'রেফাতের চতুর্থ স্তর হলো আল্লাহ্কে সকল দোষ-ত্রুটি-বিচ্যুতি মুক্ত, দেহ ও আকার নিরপেক্ষ, বস্তুমোহ নিরপেক্ষ, কোন প্রকার উপমা ও সাদৃশ্য মুক্ত, স্থান ও কালের সীমাবদ্ধতা মুক্ত, গতি ও নিশ্চলতা মুক্ত এবং অক্ষমতা ও অজ্ঞতা মুক্ত মনে করতে হবে। কারণ পরম পবিত্র সত্তায় কোন দোষ-ত্রুটি থাকতে পারে না বা কেউ তার সদৃশ হতে পারে না। এসব অবস্থা স্রষ্টার মহান মর্যাদা হতে একটি সত্তাকে সৃষ্টির পর্যায়ে নামিয়ে আনে। এ কারণেই আল্লাহ্ তার একত্বসহ সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি হতে পরম পবিত্রতা ধারণ করেছেন। আল্লাহ্ বলেন ঃ

> *... তিনিই আল্লাহ্, একক। আল্লাহ্ কারো মুখাপেক্ষী নন। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও কেউ জন্ম দেয়নি। এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই। (কুরআন- ১১২ : ১-৪)*
>
> *তিনি দৃষ্টির অধিগম্য নহেন কিন্তু দৃষ্টিশক্তি তাঁর অধিগত এবং তিনিই সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক পরিজ্ঞাতা। (কুরআন- ৬:১০৩)*
>
> *সুতরাং আল্লাহ্র কোন সদৃশ উদ্ভাবন করো না। আল্লাহ্ (সর্ব বিষয়ে) পরিজ্ঞাত এবং তোমরা তা নও। (কুরআন- ১৬:৭৪)*
>
> *... কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। (কুরআন - ৪২ : ১১)*

মা'রেফাতের পঞ্চম স্তর হলো আল্লাহ্র প্রতি বাহির থেকে কোন গুণারোপ করা যাবে না পাছে তাঁর এককত্বে দ্বৈততা এসে যায় এবং একের মধ্যে তিন ও তিনের মধ্যে একের গোলক ধাঁধাঁয় এককত্বের গূঢ়ার্থ হারিয়ে যায়। কারণ তাঁর সত্তা আকার ও সত্তাসারের সংমিশ্রণ নয়। সে কারণে আল্লাহ্তে গুণ এমনভাবে জড়ানো থাকতে পারে যেমন ফুলে ঘ্রাণ অথবা তারকারাজীতে দীপ্তি। বরং তিনিই সকল গুণের ঝরণাধারা এবং তাঁর যথার্থ গুণাবলী প্রকাশের জন্য কোন মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না। তাঁকে সর্বজ্ঞ বলা হয় কারণ জ্ঞানের চিহ্নসমূহ স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান। তাঁকে সর্বশক্তিমান বলা হয় কারণ প্রতিটি অণু পরমাণু তাঁর সর্বশক্তিমান হওয়া ও সক্রিয়তার নির্দেশক। যদি আল্লাহ্র প্রতি এ গুণারোপ করা হয় যে, তাঁর শ্রবণ ও দর্শন করার ক্ষমতা আছে তবে এটা যথার্থ যে দর্শন ও শ্রবণ ব্যতীত সমগ্র সৃষ্টির সুসঙ্গত প্রশাসন রক্ষা করা সম্ভব নয়। কিন্তু এসব গুণাবলী সৃষ্টজীবে যেভাবে আছে (যেমন কর্ণ দ্বারা শুনা বা চক্ষু দ্বারা দেখা) আল্লাহ্র ক্ষেত্রে অনুরূপ মনে করা যাবে না। তদুপরি এমনটিও ধারণা করা যাবে না যে, তিনি জ্ঞানার্জনের পর জানতে সক্ষম হয়েছেন বা তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে শক্তি সঞ্চালনের পর তিনি শক্তিমান হয়েছেন। আল্লাহ্র সত্তা হতে গুণকে আলাদা চিন্তা করলে দ্বিত্ব প্রকাশ করা হয়, আর যখনই দ্বিত্ব প্রকাশ পাবে তখনই একত্ব অন্তর্ধান হবে। এ কারণে আমিরুল মোমেনিন আল্লাহ্র সত্তা হতে গুণ আলাদা এমন ধারণা বাতিল করে দিয়েছেন। তিনি এককত্বকে উহার প্রকৃত গূঢ়ার্থে ব্যক্ত করেছেন এবং বহুত্বের কলঙ্ক দ্বারা

এককত্বকে কলঙ্কিত করেননি। এ কথায় এটা বুঝায় না যে, আল্লাহ্র প্রতি কোন বিশেষণ প্রয়োগ করা যাবে না। নাস্তিক্যের অতল অন্ধকারে যারা ডুবে আছে তারাই আল্লাহ্র বিশেষণহীনতার ধারণা পোষণ করে। অথচ সৃষ্টিচরাচর আল্লাহ্র গুণরাজীতে কানায় কানায় পরিপূর্ণ; সৃষ্টির প্রতিটি অণু সাক্ষ্য দেয়— তিনি সর্বজ্ঞ— তিনি সর্বশক্তিমান— তিনি সর্বশ্রোতা— তিনি সর্বদ্রষ্টা এবং তিনি সযত্নে সৃষ্টিকে প্রতিপালন করেন ও অনুকম্পা দ্বারা ক্রমবৃদ্ধি করেন। বিষয়টি হলো এই যে, কোন কিছু করার জন্য অন্যের পরামর্শ তাঁর প্রয়োজন হয় না কারণ নিজ সত্তায় তিনি গুণ পরিবেষ্টিত এবং তাঁর গুণরাজীই তাঁর সত্তার জাত্যর্থ। ইমাম জাফর আস-সাদিক অন্যান্য ধর্মে বর্ণিত আল্লাহ্র এককত্বের বিষয়টি তুলনা করে বলেন ঃ

> *আমাদের মহিমান্বিত ও পরম দয়ালু আল্লাহ্ নিজ সত্তায় জ্ঞানান্বিত ছিলেন যখন জানার মত কিছুই ছিল না, নিজ সত্তায় দৃষ্টিমান ছিলেন যখন দেখার মত কোন কিছুই ছিল না, নিজ সত্তায় শ্রুতিমান ছিলেন যখন শুনার মত কোন কিছু ছিল না, নিজ সত্তায় শক্তিমান ছিলেন যখন তাঁর শক্তির অধীন কোন কিছুই ছিল না। যখন তিনি বস্তুনিচয় সৃষ্টি করলেন এবং জ্ঞানেন্দ্রিয় অস্তিত্বশীল হলো তখন তাঁর জ্ঞান জ্ঞায়ের সাথে, শ্রুতি শ্রাব্যের সাথে, দৃষ্টি দৃশ্যমানের সাথে এবং শক্তি বস্তুর সাথে সম্বন্ধযুক্ত হলো (সাদুক,[১৩৮] পৃঃ ১৩৯)।*

আহলুল বাইতের ইমামদের এ বিশ্বাস সর্বসম্মত। কিন্তু ইমামগণ ব্যতীত বিভিন্ন দল আল্লাহ্র জাত ও সিফাতের মধ্যে পার্থক্যের ধারণা সৃষ্টি করে ভিন্ন ধারা গ্রহণ করেছে। আবুল হাসান আল-আশারীর মতে আল্লাহ্ জ্ঞানের মাধ্যমে জানেন; ক্রিয়ার মাধ্যমে শক্তিশালী, উক্তির মাধ্যমে কথা বলেন; শ্রুতির মাধ্যমে শোনেন এবং দৃষ্টির মাধ্যমে দেখেন (শাহরাস্তানী,[১৩৪] ১ম খন্ড, পৃ ঃ ৪২)।

আশারীর উপরোক্ত ধারণানুযায়ী যদি জাত আর সিফাতকে আলাদা ধরা হয় তবে দু'টি বিকল্প দাঁড়ায়— হয় সিফাত আদি হতেই আল্লাহ্তে রয়েছে, না হয় তা পরবর্তীতে সংঘটিত হয়েছে। প্রথম ক্ষেত্র মেনে নিলে একথাই স্বীকার করা হবে যে, আল্লাহ্র অনাদি-অনন্ত অস্তিত্বকাল হতেই গুণরাজীর সমসংখ্যক বস্তুনিচয় বিরাজিত ছিল যা তাঁর অনন্ততার অংশীদার হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু "মানুষ তাঁকে যা কিছুর সমতুল্য মনে করুক না কেন তিনি এসবের উর্ধ্বে" (কুরআন)। দ্বিতীয় ক্ষেত্র মেনে নিলে আল্লাহ্কে শুধুমাত্র পরিবর্তনের শর্তাধীনই করা হয় না বরং এটাও বুঝানো হয় যে, গুণরাজী অর্জনের পূর্বে তিনি বিজ্ঞানপ্রাপ্ত ছিলেন না; শক্তিশালী অথবা শ্রোতা অথবা দ্রষ্টা ছিলেন না। এহেন ধারণাসমূহ ইসলামের মূল দর্শনের বিপরীত।

বাংলা অনুবাদকের মন্তব্য

আমিরুল মোমেনিন আলী ইবনে আবি তালিবের এ খোৎবাটি অত্যন্ত তাত্ত্বিক। এতে তিনি আল্লাহ্তত্ত্ব, মহাবিশ্ব সৃষ্টিতত্ত্ব, মানব সৃষ্টিতত্ত্ব, নবীতত্ত্ব, ফেরেশতাতত্ত্ব অতি চমৎকার আলঙ্কারিক ভাষায় সংক্ষিপ্তাকারে ব্যক্ত করেছেন। এ বিষয়গুলো দর্শনশাস্ত্রের মৌলিক বিষয় বলে চিহ্নিত। প্রাগৈতিহাসিক কাল হতেই দার্শনিকগণ এ বিষয় গুলোর ওপর নানা প্রকার মত ও তত্ত্ব প্রদান করে আসছেন। আধুনিক বিশ্বের মহান দার্শনিকগণও তাদের চিন্তা, ধ্যান-ধারণা ও অভিমত এ বিষয়গুলোর ওপর ব্যক্ত করে যাচ্ছেন। কিন্তু প্রত্যেক দার্শনিকের প্রদত্ত তত্ত্ব অন্যজন হয় পরিমার্জিত করেন না হয় বাতিল করে দেন। কেউ এখনো এ বিষয়গুলোতে সুনির্দিষ্ট কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেননি। এটা মনে হচ্ছে একটা Endless Belt. আজ থেকে প্রায় ১৪০০ বছর পূর্বে আমিরুল মোমেনিন স্রষ্টা-জগৎ-জীবনের যে তত্ত্বগত দার্শনিক যুক্তি প্রদর্শন করে গেছেন এ বিষয়গুলো সারা বিশ্বের দার্শনিকগণের তাত্ত্বিক দর্শনের প্রধান উদ্দেশ্য বলে স্বীকৃতি লাভ করেছে। শুধু এ খোৎবাতেই নয়, তাঁর অধিকাংশ খোৎবায় তিনি এমনভাবে আল্লাহ্তত্ত্ব প্রকাশ করেছেন যা দার্শনিকগণের উপজীব্য।

আল্লাহ্তত্ত্ব ঃ সক্রেটিস প্রাকৃতিক নিয়মানুবর্তিতা এবং জগৎসমূহের সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা ও রূপবৈচিত্র্যের পেছনে এক প্রজ্ঞাবান ঐশী সত্তার সন্ধান পেয়েছেন। জগতের প্রতীয়মান উদ্দেশ্য থেকে তিনি পরম জ্ঞানবান ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুমান করেছেন। তিনি বলেছিলেন, "রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদের দ্বারা নয়, ঈশ্বর দ্বারাই আমি পরিচালিত হবো।" ঈশ্বর বলতে তিনি এক সর্বব্যাপক পরিণামদর্শী আধ্যাত্মিক সত্তাকে বুঝেছেন, কোন জড়ীয় সত্তাকে নয় (ইসলাম[১৭১], পৃঃ ১৮১)। সক্রেটিসের Know thyself তত্ত্ব পরবর্তীতে ইসলামের 'মান আরাফা নাফসাহু, ফাকাদ আরাফা রাব্বাহু" (যে নিজকে চিনেছে সে তার

প্রভুকে চিনিছে) তত্ত্বে রূপান্তরিত হয়ে এক গভীর অন্তর্ব্যাপী সূক্ষ্ম পরিণামদর্শী ভাবধারার জন্ম দিয়েছে। প্লেটো স্রষ্টাকে অনন্ত বর্ণনা করেছেন। তিনি হোমারীয় দেবতাতত্ত্ব বাতিল করে দিয়ে বলেছেন, "নক্ষত্রপুঞ্জ ও দেবতাগণ একই ঈশ্বরের সৃষ্টি।" এরিষ্টটল ঈশ্বর বলতে বুঝেছেন অচালিত চালক জড়াতীত চেতনা বা উপাদানহীন পরম সত্তাকে। তাঁর মতে ঈশ্বর নিরপেক্ষ ফর্ম বা রূপ। আর রূপ মানেই সার্বিক বা অতিবর্তী উপাদানহীন রূপ। স্টোয়িক দার্শনিকগণ জগৎ সৃষ্টি ও নিয়ন্ত্রণের মূলে ঈশ্বর এবং তিনি সর্বদর্শী, সর্বশক্তিমান ও প্রেমময় বলে বর্ণনা করেন। তাদের মতে জগৎ এক পরম কল্যাণগুণনিদান সত্তা তথা এক মহান উদ্দেশ্যের অভিব্যক্তি স্বরূপ। মানবাত্মা যেমন ব্যক্তির সারা দেহ জুড়ে বিদ্যমান, তেমনি স্টোয়িকদের ঈশ্বরও জগতের সর্বত্র বিদ্যমান (ইসলাম[১৭১], পৃঃ ১৮২)। এ মতবাদই মুসলিম দার্শনিকদের 'ওয়াহ্‌দাতুল ওজুদ' (সত্তার ঐক্য বা সর্বেশ্বরবাদ) তত্ত্বের রূপ পরিগ্রহ করেছে।

মধ্যযুগের দার্শনিক অগাষ্টিন যুক্তিবুদ্ধির চেয়ে অনাবিল বিশ্বাসের ওপর বেশি জোর দেন। তাঁর মতে, ঈশ্বর ছাড়া অন্য কোন চূড়ান্ত বাস্তবসত্তা নেই। ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া মাত্রই মানুষ চির অভিশাপে নিপতিত হয়। তাঁর মতে, শুধু ঈশ্বরকে জানাই যথেষ্ট নয়, ঈশ্বর প্রাপ্তির জন্য ঐশী প্রেম ও ভক্তি অপরিহার্য। প্লোটিনাসের মতে, ঈশ্বর দেহ ও মনের, রূপ ও উপাদানের তথা সব অস্তিত্বের উৎস। তবে তিনি নিজে বহুত্বের উর্ধ্বে। তিনি পরম একক সত্তা এবং সবকিছুই তাঁর মহা একত্বের অন্তর্ভুক্ত। ঈশ্বর থেকেই সব কিছুর উৎপত্তি ও বিকিরণ। আমরা ঈশ্বরে সৌন্দর্য, মহত্ব, চিন্তা, বাসনা, ইচ্ছা, অভীপ্সা ইত্যাদি কোন গুণই আরোপ করতে পারি না; কারণ এসব গুণ সীমিতশক্তির ও অপূর্ণতার আকর। ঈশ্বর যে আসলে কী তা আমরা বলতে পারি না। আমরা তাকে অচিন্তনীয় সত্তা বলতে পারি। তিনি চিন্তনীয় নন। যা চিন্তনীয় তার সঙ্গে বিষয় ও বিষয়ীর দ্বৈততা বিজড়িত। সুতরাং ঈশ্বরে কোন গুণ আরোপ করা যায় না। কারণ সসীম গুণ আরোপের মানেই অসীম সত্তাকে সীমিত করে ফেলা (ইসলাম [১৭১], পৃঃ ১৮৩)।

এভাবে ভাববাদী দার্শনিক হেগেল ঈশ্বরকে পরম ধারণা বা সার্বিক প্রজ্ঞা বলে অভিহিত করেন। তিনি বলতেন ঈশ্বর জগতে নিমজ্জিত নন, আবার জগৎ ঈশ্বরে নিমজ্জিত নয়। জগৎকে বাদ দিয়ে ঈশ্বর আর ঈশ্বর থাকেন না। একইভাবে বার্কলে, ব্র্যাডলি, রয়েস জেমস প্রভৃতি ভাববাদী দার্শনিকগণ আল্লাহ্‌কে পরম সত্তা, প্রান্তিক একত্ব, অনুত্তর পরমসত্তা, অসীম পরমসত্তা ইত্যাদি রূপে ব্যাখ্যা করে আল্লাহ্‌র একত্বের প্রকাশ করেছেন (ইসলাম[১৭১], পৃঃ ১৮৪-১৮৫)। মুসলিম ভাববাদী ও প্রেমবাদী দার্শনিকগণের ধ্যান-ধারণায় একই কথা অর্থাৎ "আমি তুমি নই, আবার তোমা হতে জুদা (আলাদা) নই" তত্ত্বের সমাবেশ ঘটেছে।

খৃষ্টপূর্ব ৫৪৮ অব্দে থেলিস নামক এক গ্রীক পন্ডিত প্রকৃতির মধ্যে পরম ঐক্যনীতি বা পরম একত্বের সন্ধান লাভ করেন। তিনি বলেন যে, বিশ্বজগতে কোন কিছুর কারণ হিসাবে কোন কিছুকে ধরা হলে দেখা যায় তা প্রকৃত কারণ নয়, তার পশ্চাতে অন্য একটি কারণ রয়েছে। এভাবে কারণ পরম্পরা শৃঙ্খলের ন্যায় প্রসারিত হতে থাকে। তিনি বলেন, এভাবে কারণ অনুসন্ধান করে যতই মূলের দিকে যাওয়া যায় ততই কারণের পিরামিডের চূড়া সরু হয়ে আসছে। এতে তিনি মনে করেন যে, কারণ খুঁজতে গিয়ে সর্বশেষে একটি মাত্র কারণ হতে সকল বস্তুর উৎপত্তি আরম্ভ হয়েছে যাকে তিনি 'মূল কারণ' বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাঁর এ সূত্র ধরে এনাক সিমেনিস, পিথাগোরাস এবং পরবর্তীতে ডেমোক্রিটাস, হিউম, লক ও বার্কলে 'অবিভাজ্য পরমাণু' এর মধ্যে পরম ঐক্যের সন্ধান পান (সরকার[১৭২], পৃঃ৪৮-৪৯)। এ ধারণা থেকেই মুসলিম দার্শনিকগণ আল্লাহ্‌ সম্পর্কে Cause of all causes তত্ত্বের উন্নতি সাধন করেন। বিংশ শতাব্দীর দার্শনিক বার্ট্র্যান্ড রাসেল অভিজ্ঞতাবাদী ও বাস্তববাদী হওয়া সত্ত্বেও জড়বাদ ও আধ্যাত্মবাদের মাঝামাঝি 'নিরপেক্ষ একত্ববাদ'-এর প্রচারক ছিলেন। তিনি প্রেমকে জীবন- দর্শনের মৌল নৈতিক প্রেরণা হিসাবে মেনে নিয়ে এক কল্যাণমুখী বিশ্বমানবতাবাদের বাণী বাহক ছিলেন। (মতীন[১৭৩], পৃঃ ৫)।

মুসলিম দর্শনে আল্লাহ্তত্ত্ব কুরআন হতেই উদ্ভূত। সাহাবাদের মধ্যে আমিরুল মোমেনিন ব্যতীত আর কেউ সৃষ্টিতত্ত্ব, আল্লাহ্তত্ত্ব ইত্যাদি গূঢ় রহস্যাবৃত বিষয়গুলো নিয়ে দার্শনিক দৃষ্টি ভঙ্গী সম্বলিত বর্ণনা প্রদান করেননি। কুরআনের রহস্যাবৃত আয়াতগুলোতে এসব বিষয়ের ইঙ্গিত রয়েছে। রাসুল (সঃ) এ বিষয়গুলো সবিশেষ অবহিত ছিলেন। তাঁর জ্ঞান-নগরীর দ্বার আলী ইবনে আবি তালিবকে তিনি নিশ্চয়ই এসব তাত্ত্বিক বিষয়গুলো শিক্ষা দিয়েছিলেন। আলী তাঁর সময়ে এসব তত্ত্ব অতি সংক্ষিপ্তাকারে ব্যক্ত করেছে। এরপর আলীর শিষ্যগণ তাত্ত্বিক বিষয়গুলোর আলোচনায় ব্যাপৃত হতে লাগলো। কুরআনের বেশ কিছু সংখ্যক আয়াতের আধ্যাত্মিক ও ভাববাদী মর্মার্থ নিয়েই তাসাউফের সূচনা হয় এবং তাতে সুফী দর্শনের ধ্যান-ধারণা কতিপয় সাধকের মাধ্যমে তাদের ভক্তগণের তালিমের মধ্য দিয়ে এঁকে বেঁকে চলছিল। অষ্টম শতকের শেষ দিকে জুননুন মিসরী ও জুনায়েদ বাগদাদী নামক দু'জন সুফী সাধক এসব বিক্ষিপ্ত ভাবধারাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে সুবিন্যস্ত করেন (রশীদ[১৭৪], পৃঃ ১০৬-১১১)। নবম শতকের প্রথম দিকে বায়েজীদ বোস্তামী ও মনসুর হাল্লাজ সুফী দর্শনের উৎকর্ষ সাধন করেন। বায়েজীদের ফানাতত্ত্ব (বিনাশন) ও হাল্লাজের আনালহকতত্ত্ব আল্লাহ্তত্ত্ব সম্পর্কে আলোড়ন সৃষ্টি করে (সরকার[১৭২], পৃঃ ৫-৭; আলম[১৭৫], পৃঃ ৪৮-৬৪)।

এরপর শায়খুল আকবর ইবনুল আরাবী ওয়াহ্দাতুল ওজুদ তত্ত্ব ও লগসতত্ত্ব দ্বারা আল্লাহ্তত্ত্ব ও প্রজ্ঞাতত্ত্বের ব্যাপক যুক্তিতর্ক সম্বলিত আলোচনা তুলে ধরে মুসলিম চিন্তাবিদদের মাঝে প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি করেন। তাঁর পূর্বে কোন মুসলিম চিন্তাবিদ লগসতত্ত্ব প্রকাশ করেনি। ইবনুল আরাবীর মতে, সমগ্র অস্তিত্বশীল সত্তাসমূহের মূলসত্তা একটি—যা ধর্মীয় ভাষায় আল্লাহ্। আল্লাহ্ একমাত্র পরম সত্তা। তাঁর মতবাদ সর্বেশ্বরবাদ বলে খ্যাত। তিনি বলেন, এ বিশ্ব জগৎ আল্লাহ্-সত্তাময়, আল্লাহ্র নাম ও গুণের প্রকাশ এবং আল্লাহ্ ও বিশ্বজগৎ অভিন্ন (সরকার[১৭২], পৃঃ ৪৬-১২০; রশীদ[১৭৪], পৃঃ ২৪২-২৪৮; আলম[১৭৫], পৃঃ ৫০১-৫১৯; ইসলাম[১৭১], পৃঃ ১৮৯-১৯০)।

অতঃপর জালালুদ্দিন রুমী প্রেমতত্ত্বের মাধ্যমে সুফী দর্শনের উৎকর্ষ সাধন করে বলেন, আল্লাহ্ সৃষ্টিতে লীন, কি সৃষ্টি বহির্ভূত, কি এ দু'য়ের মধ্যাবস্থা—এসব কিছুই নয়। এসব তত্ত্ব দিয়ে আল্লাহ্র পূর্ণ স্বরূপ জানা যায় না। এসব বিষয়ে বিচার-বুদ্ধি ও বিতর্কমূলক জ্ঞানের প্রয়োজন হয়। ফলে আল্লাহ্র পূর্ণ স্বরূপ খন্ডভাবে প্রতিভাত হয়। তাই তিনি জ্ঞানের পথ পরিত্যাগ করে প্রেমের পথ ধরে পরম সত্তার সন্ধান লাভ করেছেন। তিনি বলেন প্রেম ছাড়া আল্লাহ্কে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা অসম্ভব। তাকে পরম প্রেমসত্তারূপেই দেখা যায় (সরকার[১৭২], পৃঃ ৩৫৫)। মুসলিম দার্শনিকগণের মধ্যে যাঁরা আল্লাহ্তত্ত্ব ও সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে বিভিন্নভাবে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন তাদের মধ্যে আল-কিন্দি, আল-ফারাবী, ইবনে মাশকাওয়াহ্, ইবনে সিনা, ইবনে আল- হায়ছাম, ইবনে হাজম, ইবনে বাজা, ইবনে রুশদ, ইমাম গাজ্জালী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

মধ্যযুগে এ উপমহাদেশে খাজা মঈন উদ্দিন হাসান চিশতী প্রেমতত্ত্বের চূড়ান্ত পর্যায়ে তাঁর 'বাকা' (One with Allah) তত্ত্ব প্রচার করেন। তাঁর পরবর্তী সাধক কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকী, ফরিদ উদ্দিন গঞ্জে শকর, নিজামুদ্দিন মাহবুবে এলাহী একই তত্ত্ব প্রচার করেন। খাজা মঈন উদ্দিন হাসান চিশতী এসব তত্ত্ব সর্ব সাধারণ্যে প্রকাশ না করে বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের নিকট প্রকাশ করার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বলেনঃ

খাল গুইয়ান্দাম মঈন ইন রমজ বর মিম্বার মাগো,
আকিন হাজারান ওয়ায়েজ ওয়া মিম্বার বেচুখত।

অর্থ ঃ আমি মঈন পৃথিবীকে বলে দিলাম, মিম্বারে ওঠে এসব রহস্য প্রকাশ করোনা,
কারণ এ আগুনেই হাজার হাজার বক্তা ও মিম্বার পুড়ে ছাই হয়ে গেছে (চিশতী[১৭৭], দেওয়ান-১৫)।

বিংশ শতাব্দীর মুসলিম দার্শনিক আল্লামা মোহাম্মদ ইকবাল আল্লাহ্কে বর্ণনা করেছেন অনন্ত আধ্যাত্মিক পরম অহং (ego) বলে। এ জগত তাঁর আংশিক অভিব্যক্তি মাত্র। তাঁর মতে আল্লাহ্ একাধারে পরমসত্তা ও পরম স্রষ্টা। আল্লাহ্ নিজেই

পরিপূর্ণ অহং ও পরম আত্মসত্তা স্বরূপ (ইসলাম[৭১], পৃঃ ১৮৬)। বাংলাদেশের দার্শনিক মোহাম্মদ বরকতুল্লাহর ভাষ্যে আল্লামা ইকবালের আল্লাহ্‌তত্ত্বের চমৎকার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। তিনি বলেন, মানুষ সসীম জ্ঞানের মধ্য দিয়ে অসীমে আত্মসম্প্রসারণের জন্য বড়ই ব্যাকুল। একই বিদ্যুৎপ্রবাহ যেভাবে নগরীর লক্ষ প্রদীপের ভেতর দিয়ে আপনাকে ব্যক্ত করে তেমনি একই মহাপ্রেরণা সমগ্র মানব সমষ্টির ভেতর দিয়ে এক দূর লক্ষ্যের পানে ছুটে চলছে। এই একই চেতনা সত্তা দেশ কালের প্রেক্ষিতে পরিগ্রহ করেছে বহু রূপ ও বিচিত্র প্রকাশ ভঙ্গিমা। একেই নবী-পয়গম্বর ও ভাবুক-সাধকেরা সনাক্ত করেছে সব কিছুর আদি উৎস ও চূড়ান্ত লক্ষ্য বলে। (ইসলাম[৭১], পৃঃ ১৮৬)।

যা হোক, আল্লাহ্‌তত্ত্ব নিয়ে দার্শনিকগণের তত্ত্বকথার পর্যালোচনা করা এখানকার বিষয়বস্তু নয় এবং এখানে তা সম্ভবও নয়। এখানে বিষয়টি এজন্য উপস্থাপন করা হয়েছে যে, নাহ্‌জ আল-বালাঘার বিভিন্ন খোৎবায় আমিরুল মোমেনিন আলী ইবনে আবি তালিব যেভাবে আল্লাহ্‌তত্ত্ব ব্যক্ত করেছেন উহারই সারকথা বিভিন্ন আঙ্গিকে দার্শনিকগণ ব্যক্ত করেছেন।

★★★★★

খোৎবা-২

সিফফিন থেকে ফেরার পর এ খোৎবা দিয়েছিলেন

আমি আল্লাহ্‌র প্রশংসা করি তাঁর পরিপূর্ণ নেয়ামতের আশায়, তাঁর ইজ্জতের প্রতি আত্মসমর্পণের জন্য এবং পাপ থেকে নিরাপত্তা পাওয়ার আশায়। আমি তাঁর সাহায্যের জন্য মিনতি করি যেহেতু প্রয়োজনে তাঁর সাহায্যই যথেষ্ট। তিনি যাকে হেদায়েত প্রদান করেন সে কখনো বিপথগামী হয় না; আর যার প্রতি তিনি বিরূপ হন তার কোন প্রতিরক্ষা নেই। যাকে তিনি দয়া করেন সে সকল প্রয়োজনের উর্ধ্বে থাকে। তাঁর প্রশংসা সব কিছু হতে গুরুত্বপূর্ণ এবং সকল সম্পদ হতে মূল্যবান।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এক আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন মা'বুদ নেই। তাঁর কোন সাদৃশ্য নেই। এ সাক্ষ্য এমন এক ব্যক্তির যার এখলাছ পরীক্ষিত এবং ইহার মূল উপাদান আমাদের ইমান যা বিশ্বস্ত (মো'তাকাদ) হয়েছে। যত দিন তিনি আমাদের জীবিত রাখেন ততদিন আমরা এ বিশ্বাস আঁকড়ে ধরে রাখবো এবং কঠোর দুঃখ-দুর্দশা দ্বারা আমরা আক্রান্ত হলে তা মোকাবেলা করার জন্য এ বিশ্বাস পুঞ্জিভূত করে রাখবো। কারণ এটা ইমানের মূল ভিত্তি এবং কল্যাণকর কর্ম ও ঐশী সন্তুষ্টির প্রথম সোপান। এটা শয়তানকে দূরে সরিয়ে রাখার উপায়।

আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর বান্দা ও রাসুল। অতি বিশিষ্ট দ্বীন, মো'জেজা, সংরক্ষিত দলিল, দীপ্তিশীল নূর, জ্বলজ্বলে ঔজ্জ্বল্য, সন্দেহ-নাশক চূড়ান্ত নির্দেশাবলী, বিদ্যমান সুস্পষ্ট প্রমাণাদি, আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ দ্বারা ভীতি প্রদর্শন ও পাপের শাস্তির সতর্কাদেশসহ আল্লাহ্ তাঁকে প্রেরণ করেছেন। সে সময়ে মানুষ ছিল ফেতনা-ফ্যাসাদে লিপ্ত এবং তাতে দ্বীনের রজ্জু ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল, ইয়াকিনের স্তম্ভসমূহ আলোড়িত হয়ে পড়েছিল, নৈতিক মূল্যবোধ অন্ধকারের অতল তলে তলিয়ে গিয়েছিল, নিয়ম-শৃংখলা ওলট-পালট হয়ে পড়েছিল, প্রারম্ভ ছিল ক্ষীণ, পথ ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন, হেদায়েত ছিল অজানা এবং অজ্ঞতা (জাহেলিয়াত) ছিল বিরাজমান।

মানুষ আল্লাহ্‌র অবাধ্য হয়ে শয়তানের সমর্থক হয়ে পড়েছিল এবং ইমান পরিত্যক্ত বিষয় ছিল। ফলতঃ দ্বীনের স্তম্ভ ধ্বসে পড়েছিল। ইমানের সামান্য চিহ্নও দেখা যাচ্ছিলো না—এর সকল পথ বিনষ্ট হয়ে পড়েছিল এবং প্রকাশ্য রাস্তাসমূহ ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছিল। মানুষ আল্লাহ্‌র নাফরমানি করে শয়তানের অনুগত হয়ে পড়েছিল এবং শয়তানের পথ অনুসরণ করতেছিলো। শয়তানের জলাধার থেকে পানি সংগ্রহে মানুষ আগ্রহান্বিত ছিল। এ সকল

মানুষের মাধ্যমে শয়তানের বিজয় পতাকা উড্ডিয়মান হয়েছিল এবং এরাই মানুষকে ফেতনা-ফ্যাসাদের দিকে ঠেলে দিয়েছিলো। ফলে মানুষ এদের খুরের নীচে দলিত হয়েছিল এবং এরা মানুষের ওপর দাম্ভিক পদভরে দাঁড়িয়েছিলো। অনৈতিকতা পায়ের আঙ্গুলে ভর করে দাঁড়িয়েছিলো। মানুষ সম্পূর্ণরূপে পথভ্রষ্ট, জটিল, অজ্ঞ ও বিপথগামী হয়ে পড়েছিল যেন তারা কল্যাণকর ঘরের (কাবা) কুপ্রতিবেশী (কুরাইশ)। নিদ্রার পরিবর্তে তারা ছিল জাগ্রত এবং তাদের চোখে সুর্মার পরিবর্তে ছিল পানি। তারা এমন এক সমাজ ব্যবস্থায় ছিল যেখানে জ্ঞানীগণ ছিল লাগাম পরিহিত এবং অজ্ঞরা ছিল সম্মানিত।

জেনে রাখো, রাসুলের আহ্লুল বাইত হলো আল্লাহ্‌র গুপ্ত বিষয়ের (সির্‌র) ধারক, আল্লাহ্ সম্পর্কীয় জ্ঞানের মূলাধার, প্রজ্ঞার কেন্দ্রবিন্দু, আল্লাহ্‌র কিতাবের উপত্যকা ও তাঁর দ্বীনের পর্বত। তাঁদের মাধ্যমেই আল্লাহ্ তাঁর দ্বীনের বক্রপিঠ সোজা করলেন এবং দ্বীনের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কম্পমান অবস্থা দূরীভূত করলেন।

মনে রেখো, মোনাফেকগণ পাপ কর্ম ও অধার্মিকতা বপন করেছে এবং তাতে প্রবঞ্চনারূপ পানি সিঞ্চন করেছে; ফলতঃ নিজেদের ধ্বংসরূপ ফসল কর্তন করেছে। ইসলামী উম্মাহ্‌র কাউকে আহ্লুল বাইতের[১] সমকক্ষ হিসাবে গ্রহণ করা যাবে না। কেউ তাঁদের অনুগ্রহভাজন হয়ে থাকলেও তাকে তাঁদের সমতুল্য মনে করা যাবে না। তাঁরা হলেন দ্বীনের ভিত্তিমূল ও ইমানের স্তম্ভ। তাঁদেরকে কেউ ডিঙ্গিয়ে যেতে চাইলে আবার ফিরে আসতে হয় তাঁদের কাছে। আবার যারা পশ্চাদে পড়ে থাকে তারা তাঁদেরকে অনুসরণ করতে হয়। মূলতঃ তাঁরা রাসুলের বেলায়েতের অধিকারের প্রধান বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন। রাসুলের আমানত ও উত্তরাধিকার তাঁদেরই অনুকূলে। কাজেই ন্যায় ও সত্যের অনুসারীগণকে তাঁদের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

১। রাসুলের (সঃ) আহলুল বাইত সম্পর্কে আমিরুল মোমেনিন বলেন যে, বিশ্বের কোন ব্যক্তিকে আহ্লুল বাইতের সমকক্ষতায় আনা যাবে না এবং মহত্ত্বে তাঁদের সমতুল্য কাউকে মনে করা যাবে না। কারণ এ বিশ্ব তাঁদের অনুগ্রহে ভরপুর। তাঁদের নিকট হতে প্রাপ্ত হেদায়েত ও দিক নির্দেশনার মাধ্যমেই বিশ্ব চিরন্তন নেয়ামত পেতে পারে। তাঁরা হলেন দ্বীনের ভিত্তি ও দু'দেয়ালের সংযোগ স্থাপক প্রস্তর। তাঁরা হলেন দ্বীনের বাঁচার জন্য পুষ্টিকর খাদ্য স্বরূপ। তাঁরা ইমান ও প্রজ্ঞার এমন শক্তিধর স্তম্ভ যে, সংশয় ও অজ্ঞতার যে কোন ঝড় ফিরিয়ে দিতে পারে। তাঁরা অতিবর্তী ও পশ্চাদবর্তী পথ সমূহের মধ্যে এমন এক মধ্যপথ যে পথে না আসা পর্যন্ত কেউ ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। বেলায়েত ও নেতৃত্বের অধিকারের বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব তাঁদের আছে। ফলে উম্মার অভিভাবকত্ব ও পৃষ্ঠপোষকতা করার অধিকার আর কারো নেই। এ কারণেই রাসুল (সঃ) তাঁদেরকে তাঁর উত্তরাধিকারী ও তাঁর বেলায়েতের অধিকারী বলে ঘোষণা করেছিলেন। ইবনে আবিল হাদীদ লিখেছেন যে, আমিরুল মোমেনিনের বেলায়েত সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই কিন্তু উত্তরাধিকার বলতে রাষ্ট্রক্ষমতার উত্তরাধিকার বুঝায় না যদিও শিয়াগণ এরকম ব্যাখ্যাই করে থাকেন। এ উত্তরাধিকার দ্বারা রাসুলের শিক্ষার উত্তরাধিকার বুঝায়। হাদীদের মত গ্রহণ করলেও রাসুলের শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনের প্রয়োজনীয়তার কারণে খেলাফতের দায়িত্ব অন্য কারো ওপর বর্তায় না। কারণ শিক্ষা প্রদান খেলাফতের অত্যাবশ্যকীয় শর্ত। রাসুলের (সঃ) খলিফার প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো ন্যায় বিধান করা, ধর্মীয় আইনের সমস্যাদির সমাধান করা, জটিল বিষয়ের ব্যাখ্যা প্রদান ও ধর্মীয় দন্ডসমূহের প্রয়োগ। যদি রাসুলের ডেপুটি হতে এ সমস্ত বিষয় সরিয়ে নেয়া হয় তবে তার অবস্থান রাজ্য শাসকের (দুনিয়াদার শাসক) পর্যায়ে নেমে আসবে। ধর্মীয় কর্তৃত্বের কিলক হিসাবে তাকে আর গ্রহণ করা যাবে না। সুতরাং হাদীদের ব্যাখ্যা ভিত্তিহীন। রাসুলের (সঃ) অছিয়ত খেলাফত ব্যতীত অন্য কিছুর জন্য নয়। বেলায়েত দ্বারা সম্পদ ও জ্ঞানের উত্তরাধিকার বুঝায় না—সঠিক নেতৃত্বকে বুঝায় যা আহলুল বাইত হওয়ার কারণে আল্লাহ্ নিজেই গুণাবলীর পরিপূর্ণতা দান করেছেন।

★★★★★

খোৎবা-৩

এটা খোৎবায়ে শিক্‌শিকিয়্যাহ্[১] নামে খ্যাত

সাবধান! আল্লাহ্‌র কসম, আবু কুহাফার পুত্র (আবু বকর)[২] নিজে নিজেই উহা (খেলাফত) পরিধান করে নিয়েছিল। সে নিশ্চিতভাবেই জ্ঞাত ছিল যে, খেলাফতের জন্য আমার অবস্থান এমন যেন যাঁতার কেন্দ্রিয় শলাকা। বন্যার পানি আমা হতে প্রবাহিত হয় এবং পাখী আমা পর্যন্ত উড়ে আসতে পারে না। আমি খেলাফতের সামনে একটা পর্দা টেনে দিলাম এবং নিজকে উহা হতে নির্লিপ্ত রাখলাম।

অতঃপর আমি প্রবল বেগে আক্রমণ করা অথবা ধৈর্য সহকারে চোখ বুঁজে অন্ধকারের সকল দুঃখ-দুর্দশা সহ্য করার বিষয়ে চিন্তা করতে লাগলাম। এরই মধ্যে বয়স্কগণ দুর্বল হয়ে পড়লো, যুবকেরা বৃদ্ধ হয়ে গেল এবং মোমেনগণ চাপের মুখে আমরণ কষ্ট করে কাজ করতেছিল। আমি দেখলাম এ অবস্থায় ধৈর্য ধারণ করাই বুদ্ধিমানের কাজ। সুতরাং আমি ধৈর্য ধারণ করলাম যদিও তাদের কর্মকান্ড কাঁটার মত চোখে বিঁধতেছিল এবং সামগ্রিক অবস্থা শ্বাসরুদ্ধকর হয়ে পড়েছিল। প্রথম জনের মৃত্যু পর্যন্ত আমার লুণ্ঠিত উত্তরাধিকারের জন্য আমি অপেক্ষা করতেছিলাম। কিন্তু সে উহা ইবনে খাত্তাবের হাতে তুলে দিয়ে গেল। অতঃপর আমার দিন উটের পিঠে (অতি দুঃখ-কষ্টে) কাটতে লাগল। শুধুমাত্র জাবিরের ভ্রাতা হাইয়ানের[৩] সহচর্যে ক'টি দিন ভাল গেল।

এটা এক অদ্ভুত ব্যাপার যে, জীবদ্দশায় সে খেলাফত হতে অব্যাহতি পাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল। কিন্তু মৃত্যুকালে সে উহা অন্য একজনের হাতে তুলে দিয়ে গেল। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এরা দু'জনই পরিকল্পিতভাবে একই স্তনের বাঁটগুলো নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিয়েছিল। এজন (উমর) খেলাফতকে একটা শক্ত বেষ্টনীর মধ্যে রাখলো যেখানে কথাবার্তা ছিল উদ্ধত এবং স্পর্শ ছিল রূঢ়; অনেক ভুল-ভ্রান্তি ও ত্রুটি-বিচ্যুতি ছিল এবং তদ্রূপ ওজরও দেখানো হতো। খেলাফতের সংস্পর্শে আসা ব্যক্তি মাত্রই অবাধ্য উটের সওয়ারের মত হয়ে যেতে হতো—লাগাম টেনে ধরলে নাসারন্ধ্র কেটে যায় আবার টেনে না ধরলে সওয়ার নিক্ষিপ্ত হয়। আল্লাহ্‌র কসম, ফলতঃ, মানুষ বলগাহীনতা, ভিন্নরূপীতা, অদৃঢ়তা ও পথভ্রষ্টতায় জড়িয়ে পড়েছিল।

এতদসত্ত্বেও কালের দৈর্ঘ্য আর কঠোর পরিশ্রমের মধ্যে তার (উমর) মৃত্যু পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করে রইলাম। সে খেলাফতের বিষয়টি একটি দলের[৪] হাতে ন্যস্ত করলো এবং আমাকেও তাদের একজন মনে করলো। হায় আল্লাহ্! এ "মনোনয়ন বোর্ড" দিয়ে আমি কি করবো? তাদের প্রথম জনের তুলনায় আমার শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে কি কখনো কোন সংশয় ছিল যে, এখন আমাকে এসকল লোকের সমপর্যায়ের মনে করা হলো? কিন্তু তারা শান্ত থাকলে আমিও শান্ত থাকতাম এবং তারা উঁচুতে উড়লে আমিও উঁচুতে উড়তাম। তাদের একজন আমার প্রতি হিংসাপরায়ণতার কারণে আমার বিরোধী হয়ে গেল এবং অপর একজন তার বৈবাহিক আত্মীয়তা ও এটা-সেটা নিয়ে আমার বিরুদ্ধে চলে গেল। ফলে এদের তৃতীয় জন বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়েছিল। তার সাথে তার পিতামহের সন্তানেরা (উমাইয়াগণ) দাঁড়িয়ে গেল এবং এমনভাবে আল্লাহ্‌র সম্পদ[৫] গলাধঃকরণ করতে লাগলো যেভাবে বসন্তের বৃক্ষপাতা ক্ষুধার্ত উট গোগ্রাসে গিলতে থাকে। তার ক্রিয়াকলাপ তাকে মৃত্যুর দিকে নিয়ে গেল এবং তার অতিভোজন তাকে অবনত করলো।

সে সময় আমার দিকে জনতার দ্রুত আগমন ছাড়া আর কোন কিছুই আমাকে বিস্মিত করেনি। চতুর্দিক হতে হায়নার কেশরের মত এত অধিক জনতা এগিয়ে আসলো যে, হাসান ও হোসাইন পদদলিত হবার অবস্থায় পড়েছিল এবং আমার উভয় স্কন্ধের কাপড় ছিঁড়ে গিয়েছিল। ভেড়া ও ছাগলের পালের মত তারা আমার চারদিকে জড়ো হয়েছিল। যখন আমি শাসনভার গ্রহণ করেছিলাম তখন একদল কেটে পড়লো, আরেক দল বিদ্রোহী হয়ে পড়লো এবং অবশিষ্টগণ এমন অন্যায়ভাবে ক্রিয়াকলাপ করতে লাগলো যেন তারা কখনো আল্লাহ্‌র এবাণী শুনতে পায়নি—

এটা আখিরাতের সে আবাস যা আমরা তাদের জন্যই অবধারিত করি যারা পৃথিবীতে ঔদ্ধত্য প্রকাশ এবং ফ্যাসাদ সৃষ্টি করতে চাহে না। এবং উত্তম পরিণাম মুত্তাকীদের জন্যই (কুরআন - ২৮ : ৮৩)।

হাঁ, আল্লাহ্র কসম, তারা আল্লাহ্র বাণী শুনেছিল এবং উহার অর্থও বুঝেছিল কিন্তু দুনিয়ার চাকচিক্য তাদের চোখে অধিক প্রিয় হয়ে পড়েছিল এবং দুনিয়ার জাঁক-জমক ও বিলাসিতা তাদেরকে প্রলুব্ধ করে পথভ্রষ্ট করে দিয়েছিল। মনে রেখো, যিনি শস্যকণা ভেঙ্গে চারা গজান ও জীবিত সত্তা সৃষ্টি করেন তাঁর কসম করে বলছি, যদি মানুষ আমার কাছে না আসতো এবং সমর্থনকারীগণ যুক্তি নিঃশেষ না করতো এবং জ্ঞানীগনের সঙ্গে এ মর্মে আল্লাহ্র কোন অঙ্গীকার না থাকতো যে, জালিমের অতিভোজন আর মজলুমের ক্ষুধায় তাঁরা মৌন সম্মতিও দিতে পারবে না; তাহলে আমি খেলাফতের রশি উহার নিজের কাঁধে নিক্ষেপ করে ফেলে দিতাম এবং শেষ জনকে প্রথম জনের পেয়ালা দ্বারা পানি পান করাতাম। তখন তোমরা দেখতে পেতে যে, তোমাদের এ দুনিয়া আমার মতে ছাগলের হাঁচির চেয়েও নিকৃষ্টতর।

(কথিত আছে যে, আমিরুল মোমেনিন তাঁর খোৎবায় এ পর্যন্ত বলার পর ইরাকের একজন লোক দাঁড়িয়ে গেল এবং আমিরুল মোমেনিনের হাতে একটি চিরকুট দিলেন। আমিরুল মোমেনিন উহার দিকে তাকিয়ে রইলেন। এমন সময় ইবনে আব্বাস বললেন, "হে আমিরুল মোমেনিন, আপনার খোৎবা যেখানে বন্ধ করেছেন সেখান থেকে আবার আরম্ভ করুন।" উত্তরে তিনি বললেন, "হে ইবনে আব্বাস, এটা উটের বুদ্বুদের (শিকশিকিয়্যাহ্) মত যা প্রচুর পরিমাণে নিঃসৃত হয় কিন্তু অল্পক্ষণেই মিটে যায়।" ইবনে আব্বাস বলেছিলেন যে, তিনি কোনদিন আমিরুল মোমেনিনের কোন কথায় এত দুঃখ পাননি যা পেয়েছিলেন সেদিন, কারণ অনুরোধ সত্ত্বেও আমিরুল মোমেনিন তাঁর খোৎবা শেষ করলেন না।)

১। এ খোৎবাটি খোৎবায়ে শিকশিকিয়্যাহ্ নামে অভিহিত এবং এটাকে আমিরুল মোমেনিনের প্রসিদ্ধ খোৎবার অন্যতম বলে গণ্য করা হয়। এটা আর-রাহ্বাহ্ নামক স্থানে প্রদান করা হয়। কোন কোন লোক এ খোৎবাটি আমিরুল মোমেনিনের নয় বলে মনে করেন। তারা আশ-শরীফ আর-রাজীর স্বীকৃত সততার ওপর দোষারোপ করে এ খোৎবাটি তাঁর বুনন বলে মন্তব্য করেন। কিন্তু সত্যপ্রিয় পন্ডিতগণ এরূপ মন্তব্যের সকল প্রকার সত্যতা অস্বীকার করেছেন। কারণ খেলাফতের ব্যাপারে আলী ভিন্নমত পোষণ করতেন একথা আদৌ গোপনীয় নয়। সুতরাং খোৎবার ইঙ্গিতসমূহ বাস্তব অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ খোৎবায় যে সমস্ত ঘটনাবলী পরোক্ষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে তা বর্ষানুক্রমিক ইতিহাসে লিপিবদ্ধ ছিল যা প্রতিটি কথার সত্যতা অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণিত করে। যেখানে এসব কথা ইতিহাসে বর্ণিত আছে আবার আমিরুল মোমেনিনও বিশদভাবে বলেছেন সেখানে এসব কথা অস্বীকার করার মত ক্ষেত্র থাকতে পারে না। রাসুলের (সঃ) ইনতিকালের পরবর্তী দুঃখজনক অবস্থা যদি তার স্মৃতিকে বিস্বাদিতভাবে নাড়া দিয়ে থাকে তবে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এ খোৎবাটি কতিপয় ব্যক্তিত্বের সম্ভ্রমে আঘাত হেনেছে কিন্তু খোৎবাটি আমিরুল মোমিনের বক্তব্য নয় বললেই সম্ভ্রম রক্ষা করা যাবে না। কারণ এ ধরণের সমালোচনা অন্যান্য ঐতিহাসিকগণও উল্লেখ করেছেন। আমর ইবনে বাহ্র আল-যাহিজ (আবু উসমান) আমিরুল মোমেনিনের খোৎবার যে শব্দগুলি রেকর্ড করেছিলেন তা খোৎবায়ে শিকশিকিয়্যার সমালোচনা হতে কম গুরুত্ব বহন করে না। যাহিজের রেকর্ড করা শব্দগুলি নিম্নরূপ ঃ

ঐ দু'জন সরে গেল এবং তৃতীয়জন কাকের মত উঠে দাঁড়ালো যার সাহস ছিল পেটে আবদ্ধ। যদি তার উভয় ডানা কেটে ফেলা হতো এবং তার মাথা দ্বিখন্ডিত করা হতো তবে তা উত্তম হতো।

ফলতঃ এ খোৎবার কথাগুলো আশ-শরীফ আর-রাজী বানিয়েছেন এমন ধারণা সত্যের অপলাপ মাত্র এবং এহেন ধারণা স্বজনপ্রীতি ও দলপ্রীতির বহিঃপ্রকাশ ছাড়া আর কিছু নয়। এহেন ধারণা যদি কোন গবেষণালব্ধ হয়ে থাকে তবে সে গবেষণা সর্বসমক্ষে প্রকাশ করা কি উচিত নয়? একথা স্বীকার্য যে, ইচ্ছাকৃতভাবে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে সত্যকে গোপন করা যায় না। কোন ব্যক্তি বা দলের অস্বীকৃতি ও অসন্তোষের কারণে এহেন চূড়ান্ত যুক্তিগ্রাহ্য সত্যের মুখে লাগাম পরিয়ে দেয়া যাবে না।

এখন আমরা এমন কতিপয় পন্ডিত ও হাদীসবেত্তার বক্তব্য তুলে ধরবো যারা এ খোৎবাকে আমিরুল মোমেনিনের বক্তব্য বলে উল্লেখ করেছেন। তাদের কেউ কেউ শরীফ রাজীর অনেক পূর্বেকার, কেউ কেউ তার সমসাময়িক আবার কেউ কেউ তার পরবর্তীকালের। তারা হলেন ঃ

(১) ইবনে আবিল হাদীদ লিখেছেন যে, তার শিক্ষক আবুল খায়ের মুসাদ্দিক ইবনে শাবিব আল-ওয়াসিতি (মৃত্যু ৬০৫ হিঃ) তাকে বলেছেন যে, তিনি এ খোৎবাটি শায়েখ আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ ইবনে আহমদ আল-বাগদাদীর (মৃত্যু ৫৬৭ হিঃ) নিকট শুনেছেন। আল-ওয়াসিতি আরও বলেছেন যে, আল-বাগদাদী তাকে বলেছেন যদি তিনি ইবনে আব্বাসের দেখা পেতেন তাহলে জিজ্ঞেস করতেন যে, তাঁর চাচাত ভাই তো কাউকে ছাড়েনি— এরপরও এমন কি কথা রয়ে গেল যাতে ইবনে আব্বাস দুঃখ পেয়েছেন? আল-ওয়াসিতি যখন জিজ্ঞেস করলেন যে, খোৎবাটি অন্য কারো বানানো উক্তি কিনা আল-বাগদাদী তখন বললেন, "আল্লাহ্র কসম, আমি বিশ্বাস করি খোৎবাটি আমিরুল মোমেনিনের উক্তি যেরূপ আমি বিশ্বাস করি তুমি মুসাদ্দিক ইবনে শাবিব। শরীফ রাজীর জন্মের দু'শ বছর পূর্বে লিখিত পুস্তকেও আমি এ খোৎবাটি দেখেছি যা বিখ্যাত পন্ডিতগণ সংকলন করেছিলেন এবং সে সময় শরীফ রাজীর বাবা আবু আহম্মদ আন-নকীবও জন্মগ্রহণ করেনি।"

(২) ইবনে আবিল হাদীদ তৎপর লিখেছেন যে, তার শিক্ষক আবুল কাসিম মুতাজিলা ইমাম আল-বলখীর (মৃত্যু ৩১৭ হিঃ) সংকলনে এ খোৎবাটি দেখেছেন যখন মুক্তাদির বিল্লাহ্র রাজত্বকাল ছিল। শরীফ রাজী মুক্তাদির বিল্লাহ্র রাজত্ব কালের অনেক পরে জন্মগ্রহণ করেছেন।

(৩) তিনি আরও লিখেছেন যে, আবু জাফর ইবনে কিবাহ্ বিরচিত 'আল-ইনসাফ' গ্রন্থে তিনি এ খোৎবাটি দেখেছেন। ইবনে কিবাহ্ ছিলেন, ইমামত বিষয়ে বিশেষজ্ঞ আল বলখীর ছাত্র (হাদীদ[১৫২], ১ম খন্ডঃ পৃ ঃ ২০৫-২০৬)।

(৪) ইবনে মায়ছাম বাহরানী (মৃত্য ৬৭৯ হিঃ) লিখেছেন যে, মুক্তাদির বিল্লাহ্র মন্ত্রী আবুল হাসান আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আল-ফুরাতের (মৃত্যু ৩১২ হিঃ) এক লেখায় তিনি এ খোৎবাটি দেখেছেন (বাহারানী,[১০১] ১ম খন্ড, পৃঃ ২৫২-২৫৩)।

(৫) শায়েখ কুতুবুদ্দিন রাওয়ান্দির সংকলিত "মিন্হাজ আল বারাআহ্ ফি শারহ্ নাহাজ আল-বালাঘা" গ্রন্থে এ খোৎবার নিম্নরূপ ধারাবাহিকতা উল্লেখ করা হয়েছে যা আল্লামা মুহাম্মদ বাকির মজলিসী তার "বিহার আল-আনওয়ার"- গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন ঃ

> *শায়েখ আবু নসর হাসান ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইব্রাহিম খোৎবাটি আমাকে অবহিত করেছেন। তিনি হাজিব আবুল ওয়াফা মুহাম্মদ ইবনে বাদী, হুসাইন ইবনে আহমদ ইবনে বাদী ও হুসাইন ইবনে আহমদ ইবনে আবদার রহমানের নিকট থেকে খোৎবাটি পেয়েছেন। তারা হাফিজ আবু বকর ইবনে মরদুইয়্যা ইস্পাহানী (মৃত্যু ৪১৬ হিঃ) থেকে, তিনি হাফিজ আবুল কাসিম সুলায়মান ইবনে আহমদ তাবারানী (মৃত্যু ৩৬০ হিঃ) থেকে, তিনি আহমদ ইবনে আলী আল-আব্বার থেকে, তিনি ইসহাক ইবনে সাঈদ আবু সালামা দামাস্কী থেকে, তিনি খুলাইদ ইবনে দালাজ থেকে, তিনি আতা ইবনে আবি রাবাহ থেকে এবং তিনি ইবনে আব্বাস থেকে খোৎবাটি পেয়েছেন" (মজলিসী[১০৩], ৮ম খন্ড, পৃ ঃ ১৬০)।*

(৬) আল্লামা মজলিসী আরো উল্লেখ করেন যে, আবু আলী (মুহাম্মদ ইবনে আবদাল ওহাব) আল-জুব্বাই (মৃত্যু ৩০৩ হিঃ) এর সংকলনে এ খোৎবাটি ছিল।

(৭) আল্লামা মজলিসী এ খোৎবার সত্যতা সম্পর্কে আরো লিখেছেন ঃ

> *কাজী আবদাল জব্বার ইবনে আহম্মদ আল-আসাদ আবাদী (মৃত্যু ৪১৫ হিঃ) তার রচিত গ্রন্থ 'আল-মুঘানি'-তে এ খোৎবার কতিপয় বক্তব্য ব্যাখ্যা করে বলেছেন এতে আমিরুল*

মোমেনিন পূর্ববর্তী খলিফাগণকে আঘাত করে কিছু বলেননি। তিনি খোৎবাটি আমিরুল মোমেনিনের বক্তব্য বলে অস্বীকার করেননি। (মজলিসী[১০৩], ৮ম খন্ড, পৃঃ ১৬১।)

(৮) আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে বাবাওয়াহ (মৃত্যু ৩৮১ হিঃ) লিখেছেন ঃ

আমিরুল মোমেনিনের এ খোৎবাটি মুহাম্মদ ইবনে ইব্রাহীম ইবনে ইসহাক তালাকাশী আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি আবদুল আজিজ ইবনে ইয়াহিয়া জালুদি (মৃত্যু ৩৩২ হিঃ) থেকে, তিনি আবদিল্লাহ্ আহমদ ইবনে আম্মার ইবনে খালিদ থেকে, তিনি ইয়াহিয়া ইবনে আবদাল হামিদ হিম্মানী (মৃত্যু ২২৮ হিঃ) থেকে, তিনি ঈসা ইবনে রশিদ থেকে, তিনি আলী ইবনে হুজায়ফা থেকে, তিনি ইকরামা থেকে এবং তিনি ইবনে আব্বাস থেকে খোৎবাটি বর্ণনা করেছেন। (বাবাওয়াহ[৯৬], ১ম খন্ড, পৃঃ ১৪৪; বাবাওয়াহ[৯৫] পৃঃ ৩৬০-৩৬১।)

(৯) ইবনে বাবাওয়াহ্ তার উক্ত গ্রন্থদ্বয়ে আমিরুল মোমেনিনের এ খোৎবার আরো একটি বরাত সূত্র উল্লেখ করেছেন যা নিম্নরূপ ঃ

মুহাম্মদ ইবনে আলী মাজিলাওয়াহ্ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি তার চাচা মুহাম্মদ ইবনে আবিল কাসিম থেকে, তিনি আহম্মদ ইবনে আবি আবদিল্লাহ্ আল-বারকী থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি ইবনে আবি উমায়র থেকে, তিনি আবান ইবনে উসমান থেকে, তিনি আবান ইবনে তাঘলিব থেকে, তিনি ইকরামা থেকে এবং তিনি ইবনে আব্বাস থেকে এ খোৎবা প্রাপ্ত হয়েছেন (বাবাওয়াহ[৯৬], ১ম খন্ড, পৃঃ ১৪৬; বাবাওয়াহ[৯৫], পৃঃ ৩৬১)

(১০) আবু আহমদ হাসান ইবনে আবদিল্লাহ্ ইবনে সাঈদ আসকারী (মৃত্যু ৩৮২ হিঃ) একজন বিখ্যাত সুন্নী পন্ডিত ছিলেন। তিনি আমিরুল মোমেনিনের এ খোৎবাটির টীকা ও ব্যাখ্যা লিখেছিলেন যা ইবনে বাবাওয়াহ্ তার উক্ত গ্রন্থদ্বয়ে উদ্ধৃত করেছেন।

(১১) আবু ইসহাক ইব্রাহীম ইবনে মুহাম্মদ আছ-ছাকাফী[৬১] তার রচিত "আল-ঘারাত" গ্রন্থে এ খোৎবা প্রাপ্তির নিজস্ব ধারাবাহিকতা বিবৃত করেছেন। তিনি ২৮৩ হিঃ সনে মারা যান। ২৫৫ হিঃ সনের ১৩ই শাওয়াল মঙ্গলবার তার গ্রন্থখানা লেখা সমাপ্ত হয়েছিল এবং এ বছরই আশ-শরীফ আর-রাজীর জ্যৈষ্ঠ ভ্রাতা মুরতাজা মুসাবী জন্মগ্রহণ করেছিল (জাজাইরী,[৬৩] পৃঃ ৩৭)

(১২) সৈয়দ রাদী উদ্দিন আবুল কাসেম আলী ইবনে মূসা ইবনে তাউস আল-হুসাইনী আল-হুল্লি (মৃত্যু ৬৬৪ হিঃ) "আল ঘারাত"- গ্রন্থের বরাত দিয়ে এ খোৎবার নিম্নরূপ ধারাবাহিকতা বর্ণনা করেছেন ঃ

মুহম্মদ ইবনে ইউছুফ এ খোৎবাটি আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি আল-হাসান ইবনে আলী ইবনে আবদাল করিম আজ-জাফরানী থেকে, তিনি মুহাম্মদ ইবনে জাকারিয়া আল-ঘাল্লাবী থেকে, তিনি ইয়াকুব ইবনে জাফর ইবনে সুলায়মান থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি তার নানা থেকে এবং তিনি ইবনে আব্বাস থেকে খোৎবাটি পেয়েছিলেন (তাউস[৭২], পৃঃ ২০২)।

(১৩) শায়েখ আত-তায়ফা মুহাম্মদ ইবনে আল-হাসান আত-তুসী (মৃত্যু ৪৬০ হিঃ) লিখেছেন ঃ

আল-হাফ্ফার (আবুল ফাত্ব হিলাল ইবনে মুহাম্মদ ইবনে জাফর) আমাদের কাছে এ খোৎবাটি বলেছেন। তিনি আবুল কাসিম (ইসমাঈল ইবনে আলী ইবনে আলী) আজ-জিবিলী থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি তার ভ্রাতা জিবিল (ইবনে আলী আল-কুজাই) থেকে, তিনি মুহাম্মদ ইবনে সালামাহ্ আশ-শামী থেকে, তিনি জুরারাহ্ ইবনে আয়ান থেকে, তিনি আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে আলী (আশা-শায়েখ আস-সাদুক) এবং তিনি ইবনে আব্বাস থেকে খোৎবাটি পেয়েছিলেন (তুসী[৮১], পৃঃ ২৩৭)।

(১৪) শরীফ রাজীর শিক্ষক শায়েখ আল-মুফিদ (মৃত্যু ৪১৩ হিঃ) এ খোৎবার সনদ সম্পর্কে লিখেছেন ঃ

ইবনে আব্বাস থেকে প্রাপ্ত হয়ে অনেক রাবী বিভিন্ন ধারা পরম্পরায় এ খোৎবাটি বিবৃত করেছেন (মুফিদ[১১১], পৃঃ ১৩৫)।

(১৫) শরীফ রাজীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আলম আল-হুদা আস-সাঈদ আল-মুরতাজা তার গ্রন্থে এ খোৎবাটি রেকর্ড করেছিলেন (মুরতাজা[১১৪], পৃ ঃ ২০৩- ২০৪)।

(১৬) আবু মনসুর আত-তাবারসী লিখেছেন ঃ

অনেক রাবী ইবনে আব্বাস হতে বিভিন্ন ধারায় এ খোৎবা বর্ণনা করেছেন। ইবনে আব্বাস বলেছেন তিনি নিজেই রাহ্বায় (কুফার একটি স্থান) আমিরুল মোমেনিনের মুখ নিঃসৃত এ খোৎবা শুনেছেন। তিনি বলেন যে, খেলাফত ও পূর্ববর্তী খলিফাগণ সম্পর্কে আলোচনা উঠলে আমিরুল মোমেনিন একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে খোৎবাটি প্রদান করেন (তাবারসী[৭৭], পৃঃ ১০১)।

(১৭) আবুল মুজাফ্ফর ইউছুফ ইবনে আবদিল্লাহ্ এবং সিবত ইবনে আল-জাওজী (মৃত্যু ৬৫৪ হিঃ) লিখেছেন ঃ

আমাদের মোর্শেদ আবুল কাসিম আন-নাফিস আল-আনবারী আমাদের কাছে এ খোৎবা বর্ণনা করেছেন। তিনি সহী সনদের মাধ্যমে ইবনে আব্বাস হতে এ খোৎবা অবহিত হয়েছেন। ইবনে আব্বাস বলেছেন যে, খলিফা হিসাবে আমিরুল মোমেনিনের বায়াত নেয়ার পর তিনি মিম্বারে উপবিষ্ট হলে এক ব্যক্তি জানতে চাইলো তিনি এতদিন নিশ্চুপ ছিলেন কেন। তদুত্তরে আমিরুল মোমেনিন এ খোৎবা প্রদান করেন (জাওজী[৬২], পৃঃ ৭৩)।

(১৮) শায়েখ আলা-আদ্দৌলা আস-সিমনানী লিখেছেনঃ সাইয়্যেদাল আরেফীন আমিরুল মোমেনিনের খোৎবাগুলোর মধ্যে শিক্শিকিয়্যাহ্ একটি চমৎকার খোৎবা যাতে তাঁর হৃদয়াবেগ বিস্ফোরিত হয়েছে (সিমনানী[১৪৫], পৃঃ৩)।

(১৯) 'শিকশিকিয়্যাহ্' শব্দটি সম্পর্কে আবুল ফজল আহমদ ইবনে মুহাম্মদ আল-মায়দানী (মৃত্যু ৫১৮ হিঃ) লিখেছেনঃ

আমিরুল মোমেনিন আলী ইবনে আবি তালিবের একটি খোৎবা 'খোৎবা আশ-শিক্শিকিয়্যাহ্' নামে অভিহিত (মায়দানী[১০৮], ১ম খন্ড, পৃঃ ৩৬৯)।

(২০) ইবনে আল-আছীর[৪] (মৃত্যু ৬০৬ হিঃ) তার নিহায়া গ্রন্থে এ খোৎবার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে পনের স্থানে বিভিন্ন দলিলাদি দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, খোৎবাটি নিঃসন্দেহে আমিরুল মোমেনিনের বক্তব্য।

(২১) শায়েখ মুহাম্মদ তাহির পাটনী তার 'মাজমা বিহার আল-আনওয়ার গ্রন্থে এ খোৎবার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বহু প্রমাণাদি উপস্থাপন করেছেন যে, খোৎবাটি আমিরুল মোমেনিনের বক্তব্য। প্রতিটি বাক্যের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি "আলী বলেন" লিখে শুরু করেছেন।

(২২) মাজদুদ্দিন আল ফিরুজ আবাদী (মৃত্যু ৮১৭ হিঃ) তার গ্রন্থে রেকর্ড করেছেন ঃ

আলীর এ খোৎবাটির নামকরণ 'খোৎবা আশ-শিক্শিকিয়্যাহ' করা হয়েছে এ জন্য যে, খোৎবার এক পর্যায়ে আমিরুল মোমেনিন নিশ্চুপ হয়ে গেলে ইবনে আব্বাস পুনরায় শুরু করার অনুরোধ করেন। তখন আমিরুল মোমেনিন বলেন, "হে ইবনে আব্বাস, এটা উটের মুখের ফেনার (শিকশিকাহ) মত বেরিয়ে এসেছে আবার প্রশমিত হয়ে পড়েছে" (আবাদী[১], ৩য় খন্ড, পৃ ঃ ২৫১)।

(২৩) আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ভাষা অনুষদের প্রফেসর মুহাম্মদ মুহীউদ্দিন আবদ-আল-হামিদ "নাহাজ আল-বালাঘা"-এর ওপর গবেষণামূলক টীকা লিখেছেন। উক্ত টীকার মুখবন্ধে তিনি মন্তব্য করেছেন যে, খোৎবাগুলোর প্রতিটি বাক্য আমিরুল মোমেনিনের বক্তব্য। এমনকি মর্যাদাহানিকর উক্তিগুলোও তাঁরই বক্তব্য।

২। আবু বকরের খেলাফতে অধিষ্ঠিত হওয়াকে আমিরুল মোমেনিন চমৎকার রূপকালঙ্করিকভাবে ব্যক্ত করে বলেছেন যে, তিনি নিজে নিজেই উহা (খেলাফত) পরিধান করে নিয়েছেন। এটা আরবী ভাষায় ব্যবহার্য একটা রূপক। যখন উসমানকে খেলাফত ছেড়ে দিতে বলা হয়েছিল (অবরোধ অবস্থায়) তখন তিনি বলেছিলেন, "যে শার্ট আল্লাহ্ আমাকে পরিয়ে দিয়েছেন তা আমি কখনো খুলবো না।" নিঃসন্দেহে খেলাফত পরিয়ে দেওয়ার বিষয়টি আমিরুল মোমেনিন আল্লাহ্তে আরোপ করেননি। আবু বকর নিজেই তা পরেছেন কারণ তথাকথিত সর্বসম্মত ঐকমত্য অনুযায়ী আবু বকরের

খেলাফত গ্রহণ আল্লাহ্র মনোনয়ন নয়—এটা তার নিজস্ব ব্যাপার। সে কারণেই আমিরুল মোমেনিন বলেছেন যে, আবু বকর খেলাফত পরিধান করে নিয়েছেন। আমিরুল মোমেনিন জানতেন, এ পোষাক তাঁরই জন্য সেলাই করা হয়েছিল এবং খেলাফতের জন্য তাঁর অবস্থান ছিল যাঁতার মধ্য-শলাকার ন্যায় যা না হলে যাঁতার পাথর সঠিক অবস্থানে থাকতে পারে না; ফলে যাঁতাও কোন কাজে আসে না। তাই আমিরুল মোমেনিন বলেছিলেন, "আমি হলাম খেলাফতের কিলক। আমাকে খেলাফত হতে সরিয়ে রাখার কারণে এর সকল নিয়ম-নীতি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। সকল বিপদাপদ মাথায় নিয়ে আমিই ছিলাম এসব নিয়ম-নীতির অতন্দ্র প্রহরী। আমিই এসব সংগঠিত করে শৃঙ্খলা বিধান ও সঠিক দিক নির্দেশনায় পরিচালিত করেছিলাম। জ্ঞানের প্রবাহ আমার বক্ষ হতেই নিঃসরিত হয় এবং আমিই নিয়ম-নীতিকে জল সিঞ্চনে উজ্জীবিত করেছি। আমার অবস্থান কল্পনাতীত উচ্চতর ছিল। কিন্তু দুনিয়াদারদের ক্ষমতা লিপ্সা আমার জন্য হয়ে গেল উল্টে পড়া পাথরের সামিল এবং আমি নিঃসঙ্গতায় নিজকে আবদ্ধ করতে বাধ্য হলাম। চারদিকে অন্ধকারাচ্ছন্নতা আর তীব্র হতাশা বিরাজ করছিলো। যুবকেরা বৃদ্ধ হয়ে গেল এবং বৃদ্ধরা কবরে চলে গেল তবুও যেন ধৈর্যধারণকাল শেষ হচ্ছিলো না। আমার উত্তরাধিকার কিভাবে লুটপাট করে নিয়েছে আমি তা নিজ চোখে দেখছিলাম এবং দেখছিলাম কিভাবে খেলাফত এক হাত হতে অন্য হাতে হাত বদল হচ্ছিলো। আমি ধৈর্যধারণ করে রইলাম। কারণ তাদের লুটপাট বন্ধ করতে হলে যে উপায়-উপকরণের প্রয়োজন তা আমার ছিল না।"

খলিফাতুর রাসুলের প্রয়োজনীয়তা ও উহার নিয়োগ প্রণালী

রাসুলের (সঃ) তিরোধানের পর এমন এক ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছিল যিনি ইসলামী উম্মাহ্র অনৈক্য এবং ইসলামী আইন-কানুনের পরিবর্তন ও প্রক্ষেপ রোধ করতে সমর্থ ছিলেন। কারণ এমন অনেকে ছিল যারা আপন কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার জন্য উম্মাহর ঐক্যে ফাটল ধরাতে ও আইন-কানুন পরিবর্তন করে তাতে নিজেদের ধ্যান-ধারণা প্রক্ষেপণে সদা চেষ্টিত ছিল। যদি এহেন ব্যক্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা হয় তা হলে রাসুলের উত্তরাধিকারিত্বের কোন গুরুত্ব থাকে না এবং সেক্ষেত্রে রাসুলের দাফন বাদ দিয়ে সকিফাহ্-ই-সাঈদার সম্মেলনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ নেহায়েত বাতুলতা মাত্র। আর যদি রাসুলোত্তরকালে একজন খলিফাতুর রাসুলের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয় তাহলে প্রশ্ন এসে পড়ে রাসুল (সঃ) কি এমন অবশ্যম্ভাবীতা অনুভব করতে পেরেছিলেন? যদি ধরা হয় তিনি এদিকে মনোযোগ দেননি বা এর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেননি তাহলে এটা একটা বিরাট প্রমাণ হয়ে দাঁড়ায় যে, স্বধর্ম ত্যাগ, উম্মাহর খন্ড-বিখন্ডতা (বিভক্তি) ও দুষ্ট প্রক্ষেপ রোধ করার উপায় সম্পর্কে রাসুলের মন শূন্য ছিল। অথচ বাস্তবে এমনটি ছিল না। এহেন অবস্থা সম্পর্কে তিনি বারংবার সতর্কতা উচ্চারণ করেছেন। যদি ধরা হয় তিনি এটা অনুভব করতে পেরেছিলেন কিন্তু কোন সুবিধার কারণে উহা অমীমাংসিত রেখে গেছেন তাহলে গুপ্ত রাখার পরিবর্তে তিনি ঐ সুবিধার প্রতি স্পষ্ট ইঙ্গিত দিতেন। কারণ উদ্দেশ্যবিহীন নীরবতা নবুয়তের দায়িত্ব পালনে অবহেলার সামিল। যদি কোন বাধা থাকত তবে তা প্রকাশিত হয়ে পড়তো। যেহেতু রাসুল (সঃ) দ্বীনের কোন বিষয় অসম্পূর্ণ রেখে যাননি সেহেতু তার অবর্তমানে তার প্রাণপ্রিয় ইসলামের এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় (খলিফাতুর রাসুল) অসম্পূর্ণ বা অমীমাংসিত রেখে যেতে পারেন না, এটাই সর্বসম্মত মত। হয়ত তিনি এমন কর্মপন্থা প্রস্তাব করে গেছেন যা কার্যকর হলে অন্যদের হস্তক্ষেপ থেকে দ্বীন নিরাপদ থাকত।

এখন প্রশ্ন হলো সেই কর্মপন্থাটি কি? যদি মনে করা হয় উহা উম্মাহ্র ঐকমত্য তাহলে তা সত্যিকারভাবে প্রতিফলিত হতে পারে না কারণ এতে প্রত্যেক ব্যক্তির সম্মতি প্রয়োজন। কিন্তু মানব প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য করলে সহজেই অনুমিত হবে যে, কোন একটা নির্দিষ্ট বিষয়ে সকল মানুষের সম্মতি সম্পূর্ণ অসম্ভব। এমন একটা বিষয়ের উদাহরণ দেয়া যাবে না যাতে কোন না কোন ব্যক্তি ভিন্নমত পোষণ করেনি। খেলাফতের মত একটি মৌলিক বিষয় কিভাবে উম্মাহর সর্বসম্মত ঐক্য নামক অসম্ভব কর্মপন্থার উপর নির্ভর করতে পারে? অথচ ইসলামের ভবিষ্যত আর মুসলিমের কল্যাণ এ মৌলিক বিষয়টির মুখাপেক্ষী। সুতরাং মৌলিক বিষয়ের জন্য একটা অসম্ভব প্রক্রিয়া গ্রহণ করতে বিবেক সাড়া দেয় না। এ প্রক্রিয়ার স্বপক্ষে রাসুলের (সঃ) কোন হাদীস কেউ দেখাতে পারবে না। ইজি[২৭] যথার্থই লিখেছেনঃ

> *জেনে রাখো, খেলাফত নির্বাচনের ঐকমত্যের উপর নির্ভরশীল হতে পারে না। কারণ ইহার স্বপক্ষে কোন ন্যায়সঙ্গত যুক্তি অথবা হাদীস দেখাতে পারবে না।*

বস্তুতঃ সর্বসম্মত ঐকমত্যের সমর্থকগণ যখন দেখলো নির্বাচনে সকলের সম্মতি একটা দুরূহ ব্যাপার তখন তারা সর্বঐকমত্যের বিকল্প হিসাবে সংখ্যাগরিষ্ঠের ঐকমত্য গ্রহণ করলো এবং তাতে সংখ্যালঘিষ্ঠের মতামত দারুণভাবে উপেক্ষিত হলো।

এমতক্ষেত্রে অনেক সময় সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত এমন গতি পরিগ্রহ করে যাতে ন্যায়-অন্যায়, শুদ্ধ-অশুদ্ধ, ব্যক্তির গুণাগুণ ও উপযুক্ততা বিচার করার কোন সুযোগ থাকে না। এতে প্রকৃত উপযুক্ত ব্যক্তি অগোচরে থেকে যায় এবং অনুপযুক্ত ব্যক্তি মাথাচাঁড়া দিয়ে ওঠে। যেখানে মানুষের যোগ্যতাকে সংখ্যাগরিষ্ঠের অযৌক্তিক প্রবাহ দ্বারা প্রদমিত করা হয় এবং প্রভাবশালীদের ব্যক্তিগত লক্ষ্য ন্যায়ের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় সেখানে যোগ্য ব্যক্তি নির্বাচিত করা দুরাশা মাত্র। যদি ধরাও হয় যে, ভোটারগণ পক্ষপাতবিহীন দৃষ্টিকোণ থেকে নির্বাচন বিবেচনা করেছে এবং তাদের কারো কোন বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল না তবুও সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্ত সঠিক বা তা বিপথে যেতে পারে না এমন মনে করার যৌক্তিক কারণ নেই। বাস্তবে দেখা গেছে, পরীক্ষানিরীক্ষার পর সংখ্যাগরিষ্ঠগণ নিজেদের মতামত ভুল হয়েছে বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। সংখ্যাগরিষ্ঠগণের প্রতিটি সিদ্ধান্ত যদি সঠিক বলে মনে করা হয় তবে শেষোক্ত সিদ্ধান্ত যদ্দারা অন্য একটি সিদ্ধান্তকে ভুল বলে স্বীকার করা হয়েছে— তা নিশ্চয়ই ভুল। এ অবস্থায় ইসলামের খলিফা নির্বাচন যদি ভুল হয়ে থাকে তবে সে ভুলের জন্য দায়ী কে? এবং ইসলামী প্রশাসনিক ব্যবস্থা ধ্বংসের জন্য কাকে দোষী সাব্যস্ত করা হবে? একইভাবে খলিফা নির্বাচনোত্তর বিক্ষোভ ও সন্ত্রাসে যে রক্তপাত ও হত্যাকান্ড সংঘটিত হয়েছে তার দায়-দায়িত্ব কার? যে সমস্ত লোক সর্বদা রাসুলের (সঃ) সম্মুখে বসে থাকতো তারা যেখানে পরস্পর ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হয়ে পড়েছে সেখানে অন্য লোক বাদ পড়ার কথা চিন্তা করা যায় কিভাবে?

যদি ধরা হয় যে, ভবিষ্যত অমঙ্গল এড়ানোর জন্য রাসুল (সঃ) খলিফা নির্বাচন দায়িত্ববান লোকদের হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন যেন তারা তাদের পছন্দ মত একজনকে নির্বাচিত করে নেয় তা হলেও একই দ্বন্দ্ব ও সাংঘর্ষিক অবস্থা বিরাজমান থেকে যায়। কারণ সবলোক ব্যক্তিগত স্বার্থ ও লক্ষ্যের উর্দ্ধে উঠে একই বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করে কোন কিছু মেনে নিতে পারে না। বস্তুতঃ এক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের সম্ভাবনা বেশী ছিল, কারণ সকলে না হলেও অধিকাংশ লোক খলিফা পদে প্রার্থী হয়ে বিপক্ষকে পরাজিত করার সর্বাত্মক চেষ্টা চালাতো। এ চেষ্টার অবশ্যম্ভাবী ফল হতো পারস্পরিক হানাহানি ও সার্বিক অমঙ্গল। সর্বঐকমত্য প্রক্রিয়ায় বিশেষ ব্যক্তির স্বার্থ রক্ষা করা সম্ভব ছিল না বলেই "সংখ্যাগরিষ্ঠ" পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছিল। এতে একজন যোগ্য ব্যক্তি বেছে নেয়ার পরিবর্তে সংখ্যাগরিষ্ঠগণ তাদের মধ্যকার কারো ব্যক্তিগত সুবিধা অর্জনে যন্ত্রের মত কাজ করেছিল। আবার, এসব কর্তৃত্বকারী লোকদের যোগ্যতার মাপকাঠি কি ছিল? তাদের যোগ্যতা তা-ই ছিল যা সচরাচর প্রচলিত অর্থাৎ ক'জন অন্ধ সমর্থক জোগাড় করে জোরালো বক্তব্য দ্বারা সভায় উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারলেই কর্তৃত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বলে সবাই গণ্য করে। কিন্তু প্রথম খলিফা নির্বাচনের রীতি দ্বিতীয় খলিফা উমরের বেলায় নজির হিসাবে গ্রহণ করা হয়নি। অথচ সর্বসম্মতভাবে কোন নীতি গৃহীত হলে তা স্থায়ী নীতি হিসাবে ভবিষ্যতের জন্য পালনীয় হয়ে থাকে।

সকিফাহ্-ই-সাঈদাহ্‌র তথাকথিত সর্বসম্মত নির্বাচনের অবস্থা এরূপ ছিল যে, এক ব্যক্তির (উমর) কর্মতৎপরতাকে সর্বসম্মত নির্বাচন এবং এক ব্যক্তির কার্যাবলীকে আলোচনা সভা নামে চালিয়ে দেয়া হয়েছে। আবু বকর ভালভাবেই জানতেন যে, নির্বাচন মানে দু'একজন লোকের ভোট নয়— সাধারণ জনগণের ভোট। তাই তিনি সুকৌশলে সর্বসম্মত নির্বাচন বা সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোট বা নির্বাচনী সভার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণকে উপেক্ষা করে উমরকে মনোনয়ন করেছিলেন। আয়শাও মনে করতেন জনগণের ভোটের উপর খেলাফতের বিষয়টি ছেড়ে দিলে অকল্যাণ ও সমস্যার সৃষ্টি হবে। তাই উমরের মৃত্যুকালে তিনি বাণী পাঠালেন—

> *ইসলামী উম্মাহ্‌কে নেতাবিহীন অবস্থায় রেখে যাবেন না। একজন খলিফা মনোনয়ন করুন। অন্যথায় আমি অমঙ্গল ও সমস্যার আশঙ্কা করছি।*

নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের দ্বারা যখন নির্বাচন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো তখন "জোর যার মুল্লুক তার" নিয়ম-নীতিতে পরিণত হলো। যে কেউ অন্যদেরকে বশে আনতে পেরেছে, তাদের আনুগত্য আদায় করে তাদেরকে নিয়ন্ত্রণাধীন করতে পেরেছে সে-ই রাসুলের প্রকৃত উত্তরাধিকারী ও খলিফারূপে গৃহীত হয়েছে। এসব রীতি প্রভাবশালীদের স্ব-রচিত। এসব

রীতি-নীতি রাসুলের (সঃ) বাণীর বিপরীত যা তিনি তাবুকের যুদ্ধে হিজরাহ্র রাতে পারিবারিক ভোজে সুরা আল-বারায়াহ্ (সুরা তওবা) জ্ঞাত করতে গিয়ে এবং গাদির-ই- খুমের ভাষণে বলেছিলেন। আশ্চর্যের বিষয় হলো, যেখানে প্রথম তিন জন খলিফার প্রত্যেকেই একে অপরের পছন্দ দ্বারা মনোনীত হয়েছেন সেখানে রাসুলের এহেন পছন্দের কথা স্বীকার করার কোন যুক্তি থাকতে পারে না। বিশেষতঃ মতবিরোধ রোধ করার জন্য এটাই ছিল একমাত্র উপায়। রাসুল (সঃ) বিষয়টি কারো হাতে ছেড়ে না দিয়ে নিজেই সমাধান করে গেছেন। এটা অত্যন্ত যুক্তিগ্রাহ্য সঠিক প্রক্রিয়া এবং রাসুলের (সঃ) সুনির্দিষ্ট বাণী দ্বারা সমর্থন পুষ্টও বটে।

৩। ইয়ামামাহ্র হাইয়্যান ইবনে সামিন আল-হানাফি ছিলেন হানিফা গোত্রের প্রধান। তিনি দুর্গাধিপতি এবং সেনাবাহিনীর প্রধানও ছিলেন। জাবির ছিলেন তার অনুজ এবং আল-আ'শা (প্রকৃত নাম সাইমুন ইবনে কায়েস ইবনে জন্দল) তার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল। হাইয়্যানের বদান্যতায় আমিরুল মোমেনিন সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে ছিলেন। এ খোৎবায় তিনি তার বর্তমান জীবন যাপনকে পূর্ববর্তী অবস্থার সাথে তুলনা করেছেন। বস্তুতঃ আমিরুল মোমেনিন বর্তমান সমস্যা সঙ্কুল অবস্থার সাথে রাসুলের (সঃ) তত্ত্বাবধানে শান্তিময় অবস্থার তুলনা করেছেন। বর্তমানে যারা ক্ষমতা দখল করে আছে রাসুলের জীবদ্দশায় তাদের কোন গুরুত্বই ছিল না। তখন আলীর ব্যক্তিত্বের কারণে তাদের প্রতি কারো তেমন মনোযোগ ছিল না। রাসুলের (সঃ) তিরোধানের পর সময় বদলে গেছে। তাই এক সময়ের অগুরুত্বপূর্ণ লোকগুলোই মুসলিম বিশ্বের প্রভু হয়ে বসেছে।

৪। আবু লুলআহ্ কর্তৃক আহত হবার পর উমর যখন বুঝতে পারলেন যে, তিনি আর বাঁচবেন না তখন তিনি খেলাফত বিষয়ে একটি পরামর্শক কমিটি গঠন করলেন। এ কমিটিতে তিনি আলী ইবনে আবি তালিব, উসমান ইবনে আফ্‌ফান, আবদুর রহমান ইবনে আউফ, জুবায়র ইবনে আওয়ান, সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস ও তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ্কে সদস্য মনোনীত করলেন। তিনি পরামর্শক কমিটিকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করলেন যেন তার মৃত্যুর তিন দিন পর তাদের মধ্য হতে একজনকে খলিফা হিসাবে নিয়োগ করেন এবং এ তিন দিন সুহাইব খলিফার কাজ চালিয়ে নেবে। এসব নির্দেশাবলী পাওয়ার পর কমিটির কয়েকজন সদস্য তাকে অনুরোধ করেছিল যেন তিনি প্রত্যেক সদস্য সম্পর্কে তার অভিমত ব্যক্ত করেন যাতে তারা খলিফা নির্বাচনে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে। উমর প্রত্যেক সদস্য সম্পর্কে তার ব্যক্তিগত মতামত ব্যক্ত করে বললেন, "সাদ রূঢ় মেজাজের ও উগ্র মস্তিষ্কের লোক; আবদুর রহমান উম্মাহ্র ফেরাউন; জুবায়র স্বার্থে তুষ্ট হলে সত্যিকার ইমানদার কিন্তু স্বার্থ সিদ্ধিতে ব্যাঘাত ঘটলে কট্টর বেঈমান হয়ে পড়ে; তালহা অহঙ্কারী ও উদ্ধত প্রকৃতির— তাকে খলিফা নিয়োগ করলে সে খেলাফতের আংটি তার স্ত্রীর আঙ্গুলে পরিয়ে দেবে; উসমান তার জ্ঞাতি গোষ্ঠির বাইরে আর কিছুই দেখতে পায় না এবং আলী যদিও খেলাফতের প্রতি বেশী অনুরক্ত তবুও (আমার মতে) শুধুমাত্র তিনিই খেলাফতকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারবেন।" আলীর যোগ্যতা সম্পর্কে এরূপ স্পষ্ট ধারণা থাকা সত্ত্বেও উমর পরামর্শক কমিটি গঠন করেছিলেন। তার উদ্দেশ্য ছিল খেলাফত যেন তার ইচ্ছার অনুকূলে যেতে পারে (অর্থাৎ আলীকে বঞ্চিত করা) এবং সেভাবেই তিনি পরামর্শক কমিটির সদস্য মনোনয়ন ও কমিটির কার্যপ্রণালী নির্ধারণ করেছেন। একজন সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরও এ কথা বুঝতে কষ্ট হবে না যে, পরামর্শক কমিটির গঠন ও উহার কার্যপ্রণালীর মধ্যেই উসমানের জয়ের সকল উপাদান নিহিত আছে। কমিটির সদস্যগণের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, আবদুর রহমান ইবনে আউফ উসমানের ভগ্নীপতি; সাদ ইবনে ওয়াক্কাস আবদুর রহমানের আত্মীয় ও জ্ঞাতি এবং সে সর্বদা আলীর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতো। তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ উসমানের প্রতি অনুরক্ত ছিল এবং সে আলীর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতো। কারণ তালহা ছিল তায়মী গোত্রের। আবু বকরের খেলাফত দখলের ফলে তায়মী ও হাশেমী গোত্রের মধ্যে সম্পর্ক ভাল ছিল না। এমতাবস্থায় জুবায়র আলীর পক্ষে ভোট দিলেও উসমানের জয়ের জন্য তার একটি ভোট কোন বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। কেউ কেউ লিখেছেন পরামর্শক কমিটির বৈঠকের দিন তালহা মদিনায় উপস্থিত ছিল না। তার অনুপস্থিতি এমনকি তাকে যদি আলীর পক্ষেও ধরা হয় তবুও উসমানের জয় অনিবার্য। কারণ উমর তার বিচক্ষণতা দিয়ে যে কার্যপ্রণালী করে দিয়েছেন তা উসমানের জয় সুনিশ্চিত করে দিয়েছে। কার্যপ্রণালীটি নিম্নরূপ ঃ

যদি দু'জন সদস্য একজন প্রার্থীর পক্ষে যায় এবং অপর দু'জন সদস্য অন্য প্রার্থীর পক্ষে যায় তবে আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর মধ্যস্থতা করবে। আবদুল্লাহ্ যে পক্ষকে নির্দেশ দেবে সে পক্ষ খলিফা নিয়োগ

করবে। আবদুল্লাহ্ ইবনে উমরের রায় যদি তারা মেনে না নেয় তবে আবদুর রহমান ইবনে আউফ যার পক্ষে থাকবে আবদুল্লাহ্ সে পক্ষ সমর্থন করবে অপরপক্ষ এ রায় অমান্য করলে তাদের মাথা কেটে হত্যা করা হবে। (তাবারী[৭৫], ১ম খন্ড, পৃঃ ২৭৭৯-২৭৮০; আছীর[২], ৩য় খন্ড, পৃঃ ৬৭)

এখানে আবদুল্লাহ্ ইবনে উমরের রায়ে অসম্মতির কোন অর্থ হয় না। কারণ আবদুর রহমান ইবনে আউফ যার পক্ষে থাকবে তাকে সমর্থন দেয়ার জন্য আবদুল্লাহ্‌কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। উমর তার পুত্র আবদুল্লাহ্ ও সুহাইবকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে,

যদি মানুষ মতভেদ করে তোমরা সংখ্যাগরিষ্ঠের পক্ষাবলম্বন করো, কিন্তু যদি তিনজন একদিকে এবং অপর তিনজন অপরদিকে থাকে তবে আবদুর রহমান ইবনে আউফ যে দিকে থাকবে তোমরা সেদিকে থেকো। (তাবারী[৭৫] ১ম খন্ড, পৃঃ ২৭২৫; আছীর[২], ৩য় খন্ড, পৃঃ ৫১)

এ নির্দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ বলতে আবদুর রহমান ইবনে আউফকেই বুঝানো হয়েছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ অন্য কারো পক্ষে হবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। কারণ আবদুর রহমানের আদেশের অপেক্ষায় পঞ্চাশটি রক্ত-পিপাসু তরবারি বিরোধী পক্ষের জন্য প্রস্তুত ছিল। অবস্থাদৃষ্টে আমিরুল মোমেনিন আগেই তাঁর চাচা আব্বাসকে বলেছিলেন যে, উসমান খলিফা হতে যাচ্ছে, কারণ উমর সে পথই পরিষ্কার করে দিয়ে গেছে।

যাহোক উমরের মৃত্যুর পর আয়শার ঘরে নির্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সভা চলাকালে আবু তালহা আল-আনসারীর নেতৃত্বে পঞ্চাশ জন লোক উন্মুক্ত তরবারি হাতে দরজায় দাঁড়িয়েছিল। তালহা সভার কার্য শুরু করলেন এবং উপস্থিত সকলকে সাক্ষী রেখে নিজের ভোট উসমানের পক্ষে প্রদান করলেন। এতে জুবায়রের আত্মসম্মানবোধে আঘাত লেগেছে কারণ তার মা সাফিয়াহ্ ছিলেন আবদুল মুত্তালিবের কন্যা ও আমিরুল মোমেনিনের ফুফু। সুতরাং তিনি আলীর পক্ষে ভোট দিলেন। অতঃপর সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস তার ভোট আবদুর রহমানের পক্ষে প্রদান করলো। এতে তিনজনের প্রত্যেকেই এক ভোট করে পেয়ে সমান হলো। সুচতুর আবদুর রহমান এ অবস্থায় একটি ফাঁদ পেতে বললো, "আলী ও উসমান তাদের দু'জন থেকে একজনকে খলিফা মনোনয়ন করার ক্ষমতা যদি আমাকে অর্পণ করে তবে আমি আমার প্রার্থীতা প্রত্যাহার করে নেব। অথবা, তাদের দু'জনের একজন প্রার্থীতা প্রত্যাহার করে খলিফা মনোনয়নের ক্ষমতা অর্জন করতে পারে।" আবদুর রহমানের এ ফাঁদ আলীকে সব দিক থেকে জড়িয়ে ফেললো। কারণ এ প্রস্তাবে হয় তাঁকে নিজের অধিকার ছেড়ে দিয়ে খলিফা মনোনীত করতে হবে, না হয় আবদুর রহমান ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে তার ইচ্ছামত যা করে তা-ই মেনে নিতে হবে। নিজের ন্যায্য অধিকার ছেড়ে দিয়ে উসমান অথবা আবদুর রহমানকে খলিফা মনোনীত করা আলীর পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভব ছিল না। প্রথম হতেই তিনি বঞ্চিত হয়েও তাঁর অধিকারের দাবী কখনো ছেড়ে দেননি। কাজেই এবারও তিনি নিজের অধিকার আঁকড়ে ধরে রাখলেন। তা না হলে তার মনোনীত খলিফা কর্তৃক ইসলামী উম্মাহ্‌র ক্ষতির জন্য তিনিই দায়ী হতেন। সুতরাং আবদুর রহমান নিজেই তার প্রার্থীতা প্রত্যাহার করে মনোনয়নের ক্ষমতা গ্রহণ করলো এবং আমিরুল মোমেনিনকে বললো, "আপনি যদি কুরআন, সুন্নাহ্ ও পূর্ববর্তী দু'খলিফার রীতি-নীতি ও কর্মকান্ড মেনে চলার প্রতিশ্রুতি দেন তাহলে আমি আপনার বায়াত নেব।" প্রত্যুত্তরে আলী বললেন, "আমি কুরআন ও সুন্নাহ্‌র আলোকে আমার বিচার বিবেচনা অনুযায়ী কাজ করবো।" তিনি তিনবার জিজ্ঞাসিত হলেন এবং তিনবারই একই উত্তর দিলেন। এরপর আবদুর রহমান উসমানের দিকে ফিরে বললো, "আপনি কি শর্তগুলো মেনে চলতে পারবেন।" উসমান খুশী চিত্তে তা মেনে নিলেন এবং আবদুর রহমান তার বায়াত গ্রহণ করলো। এভাবে আমিরুল মোমেনিনের অধিকার ও দাবি পদদলিত হলে তিনি বললেনঃ

এটা প্রথম দিন নয় যে, তোমরা আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করেছো। আমাকে শুধু ধৈর্য ধারণই করতে হবে। তোমরা যা কিছু বল আল্লাহ্ তার বিরুদ্ধে সাহায্যকারী। আল্লাহ্‌র কসম, তুমি এ আশা ব্যতীত উসমানকে খলিফা বানাওনি যে সে তোমাকে খেলাফত ফিরিয়ে দেবে।

ইবনে আবিল হাদীদ লিখেছেন যে, উসমানকে খলিফা নিয়োগ করে সভার কার্য সমাপ্ত করার পর আলী উসমান ও আবদুর রহমানকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "আল্লাহ্ তোমাদের দু'জনের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করুন।" আলীর একথা অক্ষরে

অক্ষরে বাস্তবায়িত হয়েছিল। উসমান ও আবদুর রহমান একে অপরের এরূপ শত্রুতে পরিণত হয়েছিল যে, জীবদ্দশায় তারা একে অপরের সাথে কথা পর্যন্ত বলেনি। এমনকি উসমানের মৃত্যুশয্যায় আবদুর রহমান তাকে দেখতেও যায় নি।

ঘটনা প্রবাহ হতে স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে শূরা (পরামর্শক কমিটি) বলতে বিষয়টি প্রথমত ছয় জন, তৎপর তিনজন এবং সর্বশেষে একজনের হাতে ন্যস্ত করাকে বুঝিয়েছে কি? তদুপরি পূর্বের দু'খলিফার কর্মকান্ড অনুসরণ করার শর্ত কি উমর আরোপ করেছিল; না কি আলী ও খেলাফতের মধ্যে একটা অন্তরায় সৃষ্টি করার জন্য আবদুর রহমান এ শর্ত জুড়ে দিয়েছিল? আবু বকর তার স্থলে উমরকে মনোনীত করার সময় তো তার পদাঙ্ক অনুসরণের শর্ত উমরকে দেয়নি? তাহলে আলীর ক্ষেত্রে এহেন শর্ত আরোপের উদ্দেশ্য কি?

৫। তৃতীয় খলিফার রাজত্বকাল সম্পর্কে আমিরুল মোমেনিন বলেন যে, উসমান ক্ষমতায় আসার পর পরই উমাইয়া গোত্র সুবিধা পেয়ে গেল এবং বায়তুল মাল লুটপাট শুরু করে দিল। খরায় শুকিয়ে যাওয়া অঞ্চলের গরুর পাল সবুজ ঘাস দেখলে যেভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে উমাইয়া গোত্রও তদ্রূপ আল্লাহ্‌র সম্পদের (বায়তুল মাল) উপর পড়লো এবং গোগ্রাসে উহা নিঃশেষ করতে লাগল। অবশেষে উসমানের প্রশ্রয় ও স্বজনপ্রীতি এমন এক পর্যায়ে গেল যখন মানুষ তার ঘর অবরোধ করে তরবারি দ্বারা তাকে আঘাত করলো এবং সে যা গলাধঃকরণ করেছিল তা বমি করায়ে ছাড়লো।

উসমানের সময়ে কু-শাসন এমনভাবে বিরাজ করছিলো যে, উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন সাহাবাগণের অকদর ও দারিদ্র দেখে কোন মুসলিম স্থির থাকতে পারতো না। অথচ সমুদয় বায়তুল মাল উমাইয়া গোত্রের নিয়ন্ত্রণে ছিল; সরকারী পদসমূহ তাদের অনভিজ্ঞ যুবক শ্রেণীর দখলে ছিল, মুসলিমদের বিশেষ সম্পদ (রাষ্ট্রয়াত্ব সম্পদ) তাদের মালিকানায় ছিল; চারণভূমি তাদের পশুপালের জন্য নির্ধারিত ছিল। গৃহ নির্মিত হয়েছিল কিন্তু শুধুমাত্র তাদের দ্বারা এবং ফলের বাগান ছিল কিন্তু তা শুধু তাদের জন্য। যদি কোন সহৃদয় ব্যক্তি এসব বাড়াবাড়ির কথা বলতো তবে তার পাঁজর ভেঙ্গে দেয়া হতো। এহেন আত্মসাতের জন্য কেউ ক্ষোভ প্রকাশ করলে তাকে দেশ ত্যাগে বাধ্য করা হতো। দরিদ্র ও দুঃস্থদের জাকাত এবং সর্বসাধারণের বায়তুল মালের কি অবস্থা উসমান করেছিল তার নমুনা নিম্নের গুটিকতেক উদাহরণ হতে অনুমান করা যাবে ঃ

(১) হাকাম ইবনে আবুল আ'সকে রাসুল (সঃ) মদিনা হতে বহিস্কার করেছিলেন। রাসুলের সুন্নাহ্ ও পূর্ববর্তী খলিফাদ্বয়ের নীতি ভঙ্গ করে উসমান তাকে মদিনায় এনে বায়তুল মাল হতে তিন লক্ষ দিরহাম দিয়েছিলেন (বালাজুরী[১০০], পৃঃ ২৭, ২৮, ১২৫)।

(২) পবিত্র কুরআনে মোনাফেক বলে ঘোষিত অলিদ ইবনে উকবাহ্‌কে বায়তুল মাল হতে এক লক্ষ দিরহাম দেয়া হয়েছে (রাব্বিহ্[১১৮], ৩য় খন্ড, পৃঃ ৯৪)।

(৩) উসমান তার কন্যা উম্মে আবানকে মারওয়ান ইবনে হাকামের নিকট বিয়ে দিয়ে বায়তুল মাল হতে তাকে এক লক্ষ দিরহাম দিয়েছিলেন (হাদীদ[১৫২], ১ম খন্ড, পৃ ঃ ১৯৮-১৯৯)।

(৪) উসমান তার কন্যা আয়শাকে হারিছ ইবনে হাকামের নিকট বিয়ে দিয়ে তাকে বায়তুল মাল হতে এক লক্ষ দিরহাম দিয়েছিলেন (প্রাগুপ্ত)।

(৫) তিনি আবদুল্লাহ্ ইবনে খালিদকে চার লক্ষ দিরহাম দিয়েছিলেন (কুতায়বাহ্[৪৮], পৃঃ ৮৪)।

(৬) আফ্রিকা থেকে খুমস্ হিসেবে প্রাপ্ত অর্থ হতে পাঁচ লক্ষ দিরহাম মারওয়ান ইবনে হাকামকে দিয়েছিলেন (প্রাগুপ্ত)।

(৭) সাধারণ বদান্যতার কারণ দেখিয়ে রাসুলের প্রাণপ্রিয় কন্যার রাষ্ট্রায়ত্ব 'ফদক' মারওয়ান ইবনে হাকামকে দান করেছিলেন (প্রাগুপ্ত)।

(৮) মদিনার মাহজুব নামক বাণিজ্য এলাকা জনগণের ট্রাস্ট হিসাবে রাসুল (সঃ) ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু উসমান উহা তার জামাতা হারিছ ইবনে হাকামকে দান করেছিলেন (প্রাগুপ্ত)।

(৯) মদিনার চারপাশের তৃণভূমিতে উমাইয়া গোত্র ছাড়া অন্য কারো উটকে চরতে দেয়া হতো না (হাদীদ[১৫২], ১ম খন্ড, পৃ ঃ ১৯৯)।

(১০) উসমানের মৃত্যুর পর তার ঘরে পঞ্চাশ হাজার দিনার (স্বর্ণ মুদ্রা) ও দশ লক্ষ দিরহাম (রৌপ্য মুদ্রা) পাওয়া গিয়েছিল। তার নাখারাজ জমির কোন সীমা ছিল না। ওয়াদি-আল কুরা ও হুনায়েনে তার মালিকানাধীন ভূ-

সম্পত্তির মূল্য ছিল এক লক্ষ দিনার। তার উট ও ঘোড়ার কোন হিসাব ছিল না (মাসুদী[১০৯], ১ম খন্ড, পৃঃ ৪৩৫)।

(১১) প্রধান নগরীগুলো উসমানের আত্মীয়-স্বজনদের শাসনাধীন ছিল। কুফার শাসনকর্তা ছিল অলিদ ইবনে উকবা। কিন্তু মদাসক্ত অবস্থায় সে ইমামতি করতে গিয়ে ফজরের সালাত দুই রাকাতের পরিবর্তে চার রাকাত পড়ায় জনগণ উত্তেজিত হয়ে পড়ে। এতে খলিফা তাকে সরিয়ে অন্যতম চিহ্নিত মোনাফেক সাঈদ ইবনে আসকে কুফার শাসনকর্তা নিয়োগ করেছিলেন। এভাবে মিশরে আবদুল্লাহ্ ইবনে সাদ, সিরিয়ায় মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান ও বসরায় আবদুল্লাহ্ ইবনে আমিরকে শাসনকর্তা নিয়োগ করে স্বজন-প্রীতির মাধ্যমে প্রশাসনে অরাজকতা সৃষ্টি করেছিলেন(প্রাগুপ্ত)।

★★★★★

খোৎবা-৪
আমিরুল মোমেনিনের দূরদর্শিতা এবং তাঁর ইমানের দৃঢ় প্রত্যয় সম্পর্কে

তোমাদের অন্ধকার যুগে আমাদের কাছ থেকে হেদায়েত লাভ করে তোমরা আলোর পথ দেখতে পেয়েছো এবং তোমরা উচ্চ মর্যাদা লাভ করেছো। আমাদের দ্বারাই তোমরা অন্ধকার রাত হতে বের হয়ে আসতে পেরেছো। যে কান কান্নার শব্দ শুনতে পায় না তা বধির হয়ে গেছে। কুরআন ও রাসুলের কান্নায় (কুরআন ও সুন্নাহ্ পরিত্যাগের কারণে) যে ব্যক্তি বধির রয়ে গেল সে কি করে আমার ক্ষীণ স্বর শুনতে পাবে? যে হৃদয় আল্লাহ্র ভয়ে প্রকম্পিত হয় সে প্রশান্তি প্রাপ্ত হবে।

আমি সর্বদা শঙ্কিত থাকি তোমাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের পরিণতির জন্য এবং আমি তোমাদেরকে ধোঁকাবাজদের চাকচিক্যে জড়িয়ে পড়তে দেখেছিলাম। দ্বীনের পর্দা তোমাদের কাছ থেকে আমাকে গোপন করে রেখেছিল কিন্তু আমার নিয়্যতের সঠিকতা তোমাদের সবকিছু আমার নিকট ফাঁস করে দিল। তোমরা বিপথে চলে গেলে অথচ আমি তোমাদের জন্য সত্য পথে দাঁড়িয়েছিলাম। আমা হতে মুখ ফিরিয়ে যখন তোমরা রাস্তার সন্ধান করছিলে তখন কোন পথ প্রদর্শক ছিল না। ফলে তোমরা কূপ খনন করেছো সত্য কিন্তু একটুও পানি পাওনি।

আজ আমি যেসব মূক জিনিসকে (অর্থাৎ আমার সুচিন্তিত সুপারিশসমূহ ও গভীর বেদনাগাথা) তোমাদের সাথে কথা বলাচ্ছি তা নিদারুণভাবে উপেক্ষিত হয়েছিল। যে ব্যক্তি আমা হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় তার মতামত বা অভিমত ধ্বংস হয়ে যায়। যখন থেকে আমাকে সত্য দেখানো হয়েছে তখন থেকে আমি কখনো সত্যের প্রতি সন্দিহান হইনি। মুসা[১] নিজের জন্য ভীত বিহ্বল হননি। বরং তিনি অজ্ঞদের পথভ্রষ্টতার ভয়ে ভীত হয়ে পড়েছিলেন। আজ আমরা সত্য ও অসত্যের মিলন স্থলে উপনীত। কেউ পানি পাবার বিষয়ে নিশ্চিত হলে তৃষ্ণা-কাতর হয় না।

১। আমিরুল মোমেনিন এ খোৎবায় মুসার ভয় পাবার বিষয়টি এজন্য বলেছেন যে, যখন যাদুকরগণকে মুসার মোকাবেলা করার জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল তখন তারা দড়ি ও লাঠি মাটিতে নিক্ষেপ করে যাদুবিদ্যা দেখাতে লাগলো। এতে মুসা ভীত হয়ে গেলেন। কুরআন বলেন ঃ

মুসার মনে হলো যাদুর প্রভাবে উহারা (দড়ি ও লাঠি) ছুটাছুটি করছে। মুসার অন্তরে একটু ভয়ের সঞ্চার হলো। আমরা বললাম, ভয় করো না। নিশ্চয়ই তুমিই প্রবল (২০:৬৬-৬৮)।

আমিরুল মোমেনিন বলেন যে, মুসার ভয়ের কারণ এ ছিল না যে দড়ি ও লাঠির ছুটাছুটিতে তিনি জীবনের আশঙ্কা করেছিলেন; বরং তার ভয়ের কারণ ছিল পাছে মানুষ যাদুর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ধ্বংস হয়ে যায় এবং এ কৌশলে মিথ্যা ও অলীক প্রতিষ্ঠিত হয়ে পড়ে। এ কারণেই কুরআনে মুসার জীবন রক্ষার সান্ত্বনা বাণী না শুনিয়ে বলা হয়েছে যে, তিনিই শ্রেষ্ঠ হিসাবে প্রমাণিত হবেন এবং তাঁর দাবিই টিকে থাকবে। মুসার ভয় যেমন ছিল সত্যের পরাজয় ও মিথ্যার বিজয় বিষয়ে তাঁর নিজের জীবনের জন্য নয় - আমিরুল মোমেনিনের ভয়ও তদ্রূপ ছিল অর্থাৎ মানুষ যেন সেসব লোকের (তালহা, জুবায়র, মুয়াবিয়া ইত্যাদি) ফাঁদে আট্‌কা পড়ে বিপথে গিয়ে ইমান হারিয়ে ধ্বংস হয়ে না যায়। অন্যথায় তিনি নিজের জীবনের ভয়ে কখনো ভীত ছিলেন না।

★★★★★

খোৎবা-৫

আবু বকর কর্তৃক খেলাফত দখলের পর আব্বাস ও আবু সুফিয়ান খেলাফতের জন্য আমিরুল মোমেনিনকে সাহায্য করার প্রস্তাব করায় এ খোৎবা প্রদান করেন

হে জনমন্ডলি[১]!

ফেতনার তরঙ্গ মাঝে শক্ত হাতে হাল ধরে মুক্তির নৌকা চালিয়ে যাও; বিভেদের পথ হতে ফিরে এসো; এবং অহঙ্কারের মুকুট নামিয়ে ফেলো। সে ব্যক্তি সফলকাম যে ডানার সাহায্যে উড়ে (যখন তার ক্ষমতা থাকে) অথবা সে শান্তিপূর্ণভাবে থাকে এবং তাতে অন্যরা সুখে-শান্তিতে থাকতে পারে। ইহা (খেলাফতের লালসা) পঙ্কিল পানি অথবা শক্ত খাদ্য টুকরার মত— যে কেউ গলাধঃকরণ করবে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে যাবে। যে ব্যক্তি পাকার আগেই ফল তোলে সে ওই ব্যক্তির মত যে অন্যের জমিতে চাষাবাদ করেছে।

যদি আমি বলেই ফেলি (খেলাফতের কথা) তবে তারা আমাকে বলবে ক্ষমতালোভী; আর যদি আমি নিশ্চুপ হয়ে থাকি তবে তারা বলবে আমি মৃত্যুর ভয়ে ভীত। দুঃখের বিষয় যে, সকল উত্থান-পতনের মধ্যেও আমি টিকে আছি। আল্লাহ্‌র কসম, আবু তালিবের পুত্র[২] মৃত্যুর সাথে এমনভাবে পরিচিত যেমন একটি শিশু তার মায়ের স্তনের সাথে। আমি নীরব রয়েছি আমার গুপ্ত জ্ঞানের কারণে যা আমাকে দান করা হয়েছে। যদি আমি তা প্রকাশ করি তবে গভীর কূপ হতে পানি উত্তোলনরত রশির মত তোমরা কাঁপতে থাকবে।

১। রাসুলের (সঃ) ইন্তিকালের সময় আবু সুফিয়ান মদিনায় ছিল না। তার গন্তব্যে যাবার পথিমধ্যে সে রাসুলের (সঃ) দেহত্যাগের খবর শুনে মদিনায় ফিরে এসেছিল। মদিনায় আসা মাত্রই সে জানতে চাইল কে নেতা মনোনীত হয়েছে। তাকে বলা হলো যে, জনগণ আবু বকরের বায়াত গ্রহণ করেছে। এটা শুনামাত্রই আরবের চিহ্নিত কলহ-পসারি এ লোকটি গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হলো এবং তৎক্ষণাৎ আব্বাস ইবনে আবদুল মোত্তালিবের কাছে গিয়ে বললো, "দেখ, এসব লোকেরা ফন্দি করে বনি তায়েমের নিকট খেলাফত হস্তান্তর করে দিয়েছে এবং বনি হাশিম চিরতরে বঞ্চিত হলো। এ ব্যক্তি (আবু বকর) তার পরে বনি আদির কোন উদ্ধত ব্যক্তিকে আমাদের মাথার ওপর বসিয়ে দেবে। চল, আমরা আলী ইবনে আবি তালিবের নিকট যাই এবং তার অধিকার আদায়ের জন্য ঘর হতে বের হয়ে অস্ত্র হাতে তুলে নিতে বলি।" এরপর সে আব্বাসকে সঙ্গে নিয়ে আলীর কাছে এসে বললো, "আপনার হাত দিন— আমি বায়াত গ্রহণ করি এবং যদি কেউ এর বিরুদ্ধাচরণ করে তবে পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য দিয়ে আমি মদিনার রাস্তা ভরে দেব।" এ মুহূর্তটুকু আমিরুল মোমেনিনের জন্য অত্যন্ত নাজুক ছিল। তিনি নিজেকে রাসুলের সত্যিকার উত্তরাধিকারী মনে করতেন। তদুপরি আবু

সুফিয়ানের মত গোত্র-নেতা তার গোত্রসহ তাঁকে সমর্থন দেয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল। এ অবস্থায় যুদ্ধের শিখা জ্বালিয়ে দেয়ার জন্য একটা ইঙ্গিতই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু আমিরুল মোমেনিনের দূরদর্শিতা ও সঠিক বিচার ক্ষমতা মুসলিমগণকে গৃহযুদ্ধ হতে রক্ষা করেছিল। তাঁর সুতীক্ষ্ম দৃষ্টিতে ধরা পড়লো যে, এ ব্যক্তি গোত্রিয় আবেগ ও কৌলন্যের ধুয়া তুলে গৃহযুদ্ধ ঘটাতে চায় যাতে প্রবল আলোড়নে ইসলামের মূলভিত্তিসহ আলোড়িত হয়ে পড়ে। আমিরুল মোমেনিন তাই তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন এবং তাকে কঠোরভাবে সতর্ক করে দিলেন। মানুষ যেন কলহ সৃষ্টির প্রস্তাব নিয়ে তার কাছে আসতে না পারে সে জন্য তিনি তাঁর অবস্থা সম্পর্কে স্পষ্ট ঘোষণা দিয়ে বলেন যে, তাঁর জন্য শুধুমাত্র দু'টি পথই খোলা ছিল—হয় অস্ত্রধারণ করা, না হয় নিশ্চুপ ঘরে বসে থাকা। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, যুদ্ধে নামলে তাঁর কোন সমর্থক থাকবে না; ফলে তিনি বিদ্রোহ দমন করতে পারবেন না। কাজেই নিশ্চুপ থেকে অনুকূল অবস্থা পর্যন্ত অপেক্ষা করার পথ তিনি বেছে নিয়েছিলেন।

এ পর্যায়ে আমিরুল মোমেনিনের নিশ্চুপতা তাঁর দূরদর্শিতা ও উচ্চমানের পলিসির ইঙ্গিতবহ। কারণ সে সময়ে মদিনা যুদ্ধকেন্দ্রে পরিণত হলে এর শিখা ছড়িয়ে পড়ে সারা আরবকে গ্রাস করে ফেলতো। মুহাজের ও আনসারদের মধ্যে যে বিরোধ ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল তা চরমে উঠে যেতো এবং মোনাফেকগণের খেলার ষোলকলা পূর্ণ হতো। এতে ইসলামের তরী এমন এক জলঘূর্ণিতে পড়ে যেতো যার সমতা সাধন করা কষ্টসাধ্য হতো। এসব চিন্তা করে আমিরুল মোমেনিন অভাবনীয় দুঃখ-কষ্ট ও যন্ত্রণা ভোগ করেছেন কিন্তু হস্ত উত্তোলন করেননি। ইতিহাস সাক্ষ্য বহন করে যে, মক্কী জীবনে রাসুল (সঃ) বিভিন্ন প্রকার দুঃখ কষ্ট সহ্য করেছিলেন কিন্তু তিনি ধৈর্য পরিহার করে সংগ্রাম ও বিরোধে লিপ্ত হননি। কারণ তিনি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে, সে সময় যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে ইসলামের প্রসার বন্ধ হয়ে যেতে পারে। অবশ্য, যখন তাঁর সমর্থক ও সাহায্যকারীর সংখ্যা আল্লাহ্‌দ্রোহীদের দমনে যথেষ্ট বিবেচিত হলো তখন তিনি শত্রুর মুখোমুখী হলেন। অনুরূপভাবে আমিরুল মোমেনিন রাসুলের জীবনকে আলোক বর্তিকা হিসেবে গ্রহণ করে শক্তি প্রদর্শনে বিরত ছিলেন। কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন সমর্থক ও সাহায্যকারী ছাড়া শত্রুর মোকাবেলা করলে জয়ের পরিবর্তে পরাজয় অনিবার্য। এ পরিস্থিতিতে আমিরুল মোমেনিন খেলাফতকে পঙ্কিল পানি বা শ্বাসরুদ্ধকর খাদ্য মনে করেছিলেন। অপরদিকে যে সমস্ত লোক এ খাদ্য জোরপূর্বক কেড়ে নিয়েছিল এবং জোরপূর্বক উহা গলাধঃকরণ করতে চেয়েছিল; উহা তাদের গলায় আটকে পড়লো। তারা উহা গিলতেও পারছিলো না, বমিও করতে পারছিলো না। অর্থাৎ ইসলামী বিধি-নিষেধে তারা যে সব ভুল-ভ্রান্তি করেছিল তা শুধরে নিয়ে তারা খেলাফত চালাতে পারেনি। আবার তাদের ঘাড় হতে এ রশির বাঁধ খুলেও ফেলতে পারেনি।

একই কথা তিনি অন্যভাবেও ব্যক্ত করেছেন ঃ "খেলাফতের কাঁচা ফল যদি আমি পাড়তে চেষ্টা করতাম তবে বাগান উৎসাদিত হতো এবং আমিও কিছুই পেতাম না; যেরূপ অন্যের জমি কর্ষণকারী না পারে একে পাহারা দিতে, না পারে এতে যথাসময়ে পানি দিতে, না পারে এর ফসল কাটতে। এসব লোকের অবস্থা এমন ছিল যে, যদি আমি দখল ছেড়ে দিতে বলতাম যাতে মালিক নিজেই চাষ করতে ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারে তবে তারা বলবে আমি কতইনা লোভী। আবার আমি নিশ্চুপ থাকলে তারা ভাবে আমি মৃত্যু ভয়ে ভীত। তারা বলুক তো জীবনে আমি কখনো ভীতি অনুভব করেছি কিনা অথবা প্রাণভয়ে যুদ্ধক্ষেত্র হতে পালিয়ে এসেছি কিনা? ছোট বড় যে কেউ যুদ্ধে আমার সন্মুখীন হয়েছে সে-ই আমার বীরত্ব, সাহসিকতা ও নির্ভীকতার পরিচয় পেয়েছে। যে ব্যক্তি সারা জীবন তরবারি নিয়ে খেলা করেছে আর পাহাড়গুলোকে আঘাত করেছে সে মৃত্যুকে ভয় করতে পারে না। আমি মৃত্যুর সাথে এতটুকু পরিচিত যতটুকু একটা শিশু তার মায়ের স্তনের সাথে নয়। শোন! আমার নীরবতার একমাত্র কারণ হলো আমার জ্ঞান যা রাসুল (সঃ) আমার বক্ষে রেখে গেছেন। যদি আমি তা ফাঁস করি তবে তোমরা হতবুদ্ধি হয়ে বিভ্রান্ত হয়ে পড়বে। কিছুদিন গেলেই তোমরা আমার নিষ্ক্রিয়তার কারণ জানতে পারবে। তখন তোমরা নিজ চোখে দেখতে পাবে যে, ইসলামের নামে কি ধরণের লোকেরা খেলাফতের মঞ্চে এসেছিল এবং কতটুকু ধ্বংস তারা সংঘটিত করেছিল। এমনটি ঘটবে সেজন্যই আমার নীরবতা। এটা কারণবিহীন নীরবতা নয়।"

একজন ফারসী কবি বলেছেন ঃ

নীরবতা এমন অর্থ বহন করে যা অক্ষর দ্বারা শেখানো যায় না।

২। মৃত্যু সম্পর্কে আমিরুল মোমেনিন বলেন যে, মৃত্যুকে তিনি যতটুকু ভালবাসেন একটি শিশু তার মায়ের কোলে থেকেও তার পুষ্টিকর উৎসকে (মায়ের স্তন) ততটুকু ভালবাসে না। মায়ের স্তনের সাথে একটি শিশুর সংযোগ হয় প্রাকৃতিক প্রেরণায়। কিন্তু বয়সের সাথে সাথে এ প্রকৃতিক প্রেরণা পরিবর্তিত হয়। সীমিত শিশুকাল শেষ হলেই তার মানসিকতা বদলে যায়—এত প্রিয় মায়ের স্তনের দিকে সে ফিরেও তাকায় না। কিন্তু নবী ও আউলিয়াগণের প্রেম আল্লাহ্‌র সঙ্গে মিলনের জন্য এবং এটা সম্পূর্ণ মানসিক ও আধ্যাত্মিক। মানসিক ও আধ্যাত্মিক অনুভূতি কখনো বদলায় না এবং দুর্বলতা ও ধ্বংস একে স্পর্শ করে না। যেহেতু মৃত্যুই এ মিলনের উপায় সেহেতু মৃত্যুর প্রতি তাদের ভালবাসা এত বৃদ্ধি পায় যে তারা উহার ভয়াবহতায় আনন্দ এবং তিক্ততায় সুস্বাদ অনুভব করে। মৃত্যুর প্রতি তাদের ভালবাসা এমন যেমন তৃষ্ণার্ত ব্যক্তির কূপের প্রতি বা পথ হারানো পথিকের গন্তব্যস্থলের প্রতি। তাই আবদুর রহমান ইবনে মুলজামের (তার ওপর আলাহ্ লা'নত) মারণাঘাতের পর আমিরুল মোমেনিন বলেছিলেন, "আমি সেই পথিকের মত যে গন্তব্যস্থলে পৌঁছেছে অথবা সেই অনুসন্ধানকারীর মত যে উদ্দিষ্ট বস্তু খুঁজে পেয়েছে এবং আল্লাহ্‌র সাথে মিলনের জন্য সকল কিছুই উত্তম।" রাসুলও (সঃ) বলেছিলেন, "আল্লাহ্‌র সাথে মিলন অপেক্ষা অধিক আনন্দদায়ক আর কিছু নেই।"

★★★★★

খোৎবা-৬

তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ্ ও জুবায়র ইবনে আওয়ামের পশ্চাদ্ধাবন না করার জন্য কেউ কেউ উপদেশ দিলে আমিরুল মোমেনিন এ খোৎবা প্রদান করেন

আল্লাহ্‌র কসম, আমি 'দাবু' (ভোঁদড় জাতীয় নিশাচর প্রাণী) এর মত হব না, যা অনবরত পাথর নিক্ষেপের শব্দেও ঘুমের ভান করে পড়ে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না শিকারী উহাকে দেখতে পায় এবং আটক করে। বরং সত্যের পথে অগ্রগামীগণের সহায়তায় আমি পথভ্রষ্টগণকে এবং যারা আমার কথা শুনে ও মানে তাদের সহায়তায় পাপী ও সন্দেহ পোষণকারীগণকে আঘাত করে যাবো যে পর্যন্ত না আমার দিন ফুরিয়ে যায়। আল্লাহ্‌র কসম, আমাকে আমার অধিকার থেকে রাসুলের (সঃ) ইনতিকালের পর হতে আজ পর্যন্ত বঞ্চিত রাখা হয়েছে।

★★★★★

খোৎবা-৭

মোনাফেক সম্পর্কে

তারা শয়তানকে তাদের কর্মকান্ডের বিধায়ক হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং শয়তানও তাদেরকে তার অংশীদার হিসেবে গ্রহণ করেছে। তাদের বক্ষেই শয়তান ডিম পাড়ে ও বাচ্চা ফুটায়। তাদের কোলেই শয়তান হামাগুড়ি দিয়ে চলে। সে তাদের চোখ দিয়েই দেখে এবং তাদের জিহবা দিয়েই কথা বলে। এভাবেই সে তাদেরকে পাপের পথে পরিচালিত করেছে এবং ক্লেদপূর্ণ জিনিস তাদের জন্য সুসজ্জিত করেছে। তাদের কর্মকান্ড সেই ব্যক্তির মত যাকে শয়তান তার রাজ্যে অংশীদার করে এবং যার জবানে সে কথা বলে।

★★★★★

খোৎবা-৮

জুবায়র সম্পর্কে

সে বলে বেড়ায় যে, সে আমার হাতে হাত রেখেই বায়াত গ্রহণ করেছে কিন্তু অন্তর দিয়ে তা করেনি[১]। সুতরাং সে এমন বায়াত স্বীকার করে না। সে বায়াত গ্রহণ করেছে; এখন যদি দাবী করে যে তার অন্তরে বিপরীত ভাব লুক্কায়িত ছিল তা হলে সে স্পষ্ট দলিল নিয়ে আসুক। অন্যথায়, যেখান থেকে সে বেরিয়ে এসেছে সেখানে ফিরে যাক (অর্থাৎ বায়াত মেনে চলুক)।

১। জুবায়র ইবনে আওয়াম আমিরুল মোমেনিনের হাতে হাত রেখে বায়াত গ্রহণ করেছিল। যখন সে বায়াত ভঙ্গ করে আমিরুল মোমেনিনের বিরোধীতা শুরু করলো তখন সে নানা প্রকার ওজর দেখাতে লাগলো। কখনো সে বলতো তাকে জবরদস্তি করে বায়াত করা হয়েছে; আবার কখনো বলতো সে লোক দেখানো বায়াত গ্রহণ করেছে, তার অন্তরে বিপরীত ধারণা ছিল। কাজেই এরূপ বায়াত সে স্বীকৃতি দেয় না। সে নিজের ভাষায় তার বাহির ও ভেতরের কপটতা স্বীকার করেছে। যদি জুবায়র সন্দেহ পোষণ করে থাকে যে, আমিরুল মোমেনিনের জেদের কারণে উসমান নিহত হয়েছে তবে বায়াত গ্রহণের জন্য হাত বাড়াবার সময় তা তার মনে থাকার কথা। আসলে আমিরুল মোমেনিনের হাতে বায়াত গ্রহণের পেছনে তার অনেক প্রত্যাশা ছিল। উসমানের জ্ঞাতি-গোষ্ঠি জনগণের সম্পদ যে ভাবে লুটপাট করেছে এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করেছে আমিরুল মোমেনিনের সময় তা অসম্ভব দেখে জুবায়র হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে তার আশার প্রভাত দেখা দেয়াতে সে অমূলক উসমান হত্যার ধুয়া তুলেছে।

★★★★★

খোৎবা-৯

জামাল-যুদ্ধে শত্রুদের কাপুরুষতা সম্পর্কে

তারা[১] মেঘের মত গর্জন করেছিল বিজলীর মত চমক দিয়েছিল। লম্ফ-ঝম্ফ ছাড়া তাদের সবটুকুই কাপুরুষতা। তীব্রবেগে শত্রুকে আক্রমণ না করা পর্যন্ত আমরা গর্জন করি না এবং কথার ঢল প্রবাহিত করি না যতক্ষণ পর্যন্ত বৃষ্টি বর্ষণ না করি।

১। জামালের যুদ্ধে যারা আমিরুল মোমেনিনের মোকাবেলা করার জন্য এসেছিল তাদের সম্পর্কে তিনি বলেন যে, তারা গর্জন আর হৈ চৈ করে বিক্ষিপ্তভাবে ধাবিত হয়েছিল কিন্তু যখন মোকাবেলা হলো তখন তারা খড়ের মত উড়ে গেল। এক সময়ে তারা জোর গলায় দাবী করেছিল যে, তারা এটা করবে সেটা করবে কিন্তু এখন তারা এমন কাপুরুষতা দেখালো যে যুদ্ধক্ষেত্র হতে পালিয়ে গেল। নিজের সম্পর্কে আমিরুল মোমেনিন বলেন, "আমরা যুদ্ধের পূর্বে শত্রুকে ভীতি প্রদর্শন করি না, দম্ভোক্তি করি না, অযথা চিৎকার করে শত্রুকে আতঙ্কিত করি না; কারণ হাতের পরিবর্তে জিহবা ব্যবহার করা বীরের কাজ নয়।" এজন্যই তিনি তাঁর সাথীদেরকে বলেছিলেন, "সাবধান, প্রয়োজনাতিরিক্ত কথা বলো না, কারণ এটা কাপুরুষতা।"

★★★★★

খোৎবা-১০

তালহা ও জুবায়র সম্পর্কে

সাবধান! শয়তান[১] তার দল জড়ো করেছে এবং তার অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যদল সমবেত করেছে। নিশ্চয়ই, আমার সূক্ষ্ম দৃষ্টি সম্পন্ন জ্ঞান আছে। আমি কখনো নিজের সাথে প্রতারণা করিনি বা প্রতারিতও হইনি। আল্লাহ্‌র কসম, আমি তাদের জন্য একটা জলাধার কানায় কানায় ভরে রাখবো যেখান থেকে শুধু আমিই পানি তুলবো। যারা সেই জলাধারে পা রাখবে তারা বের হয়ে আসতে পারবে না। আর যদি বের হয়ে আসে তাহলে দ্বিতীয়বার উহার দিকে ফিরে যেতে পারবে না।

১। যখন তালহা ও জুবায়র বায়াত ভঙ্গ করে বিদ্রোহ করলো এবং আয়শার সঙ্গে বসরা গেল তখন আমিরুল মোমেনিন এ কথাগুলো বলেছিলেন যা একটা দীর্ঘ খোৎবার অংশমাত্র। ইবনে আবিল হাদীদ লিখেছেন এ খোৎবায় শয়তান বলতে মুয়াবিয়াকে বুঝানো হয়েছে। কারণ মুয়াবিয়া গোপনে তালহা ও জুবায়রের সাথে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল এবং আমিরুল মোমেনিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য তাদেরকে প্ররোচিত করেছিল।

★★★★★

খোৎবা-১১

জামাল-যুদ্ধে আমিরুল মোমেনিন তাঁর পুত্র মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়া[১]-এর হাতে পতাকা অর্পণকালে এ খোৎবা প্রদান করেন

পর্বতমালা [২] উহার স্থান থেকে সরে পড়তে পারে কিন্তু তুমি তোমার অবস্থান থেকে নড়তে পারবে না। দাঁতে দাঁত কামড়ে ধরো। তোমার মাথা আল্লাহ্‌কে ধার দাও (আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করতে নিজকে উৎসর্গ করো)। তোমার পদদ্বয় শক্তভাবে জমিনে স্থাপন করো। বহুদূরবর্তী শত্রুর প্রতিও দৃষ্টি রেখো। শত্রুর সংখ্যাধিক্যের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করো না। নিশ্চিত মনে রেখো, সাহায্য ও বিজয় মহিমান্বিত আল্লাহ্ থেকেই হয়ে থাকে।

১। মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়া আমিরুল মোমেনিনের পুত্র কিন্তু মায়ের নামানুসারে তাঁকে ইবনে হানাফিয়া বলা হতো। তাঁর মায়ের নাম খাওলা বিনতে জাফর। বনি হানিফা গোত্রদ্ভুত বলে তাঁকে হানাফিয়া বলা হতো। যখন ইয়ামামার জনগণ ধর্মত্যাগ করে জাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানালো এবং মুসলিম বাহিনীর হাতে পর্যুদস্ত ও নিহত হলো তখন তাদের নারীগণকে কৃতদাসী হিসেবে মদিনায় আনা হয়েছিল। খাওলা বিনতে জাফরও তাদের সাথে মদিনায় নীত হয়েছিল। বনি হানিফার লোকেরা একথা জানতে পেরে আমিরুল মোমিনের নিকট আবেদন করলো যেন খাওলার পারিবারিক ইজ্জতের খাতিরে তাকে কৃতদাসী হওয়ার কলঙ্ক হতে রক্ষা করা হয়। ফলে আমিরুল মোমেনিন তাকে ক্রয় করে মুক্ত করে দিলেন এবং তাকে বিয়ে করলেন। অতঃপর তার গর্ভে মুহাম্মদ জন্মগ্রহণ করলেন।

অধিকাংশ ঐতিহাসিক লিখেছেন তাঁর লকব ছিল আবুল কাসিম। বার[৯৭] (৩য় খন্ড, পৃঃ ১৩৬৬-১৩৭২) লিখেছেন যে, রাসুলের (সঃ) সাহাবাদের মধ্যে চার জনের পুত্রের নাম ছিল মুহাম্মদ এবং তাদের সকলের লকব ছিল আবুল কাসিম। তারা হলো- (১) মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়া (২) মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর, (৩) মুহাম্মদ ইবনে তালহা ও (৪) মুহাম্মদ ইবনে সা'দ। অতঃপর তিনি লিখেছেন যে, মুহাম্মদ ইবনে তালহার নাম ও লকব রাসুল (সঃ) রেখেছিলেন। ওয়াকিদী[৩৭] লিখেছেন যে, মুহাম্মদ ইবনে আবু বকরের নাম ও লকব আয়শা রেখেছিলেন। মূলতঃ রাসুল (সঃ) কর্তৃক মুহাম্মদ ইবনে তালহার নাম রাখার বিষয়টি সঠিক হতে পারে না। কয়েকটি হাদীস হতে জানা যায় যে, আমিরুল মোমেনিনের একটা পুত্রের জন্য রাসুল (সঃ) এ নামটি নির্ধারণ করে গিয়েছিলেন এবং তিনিই হলেন মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়া। রাসুল (সঃ) বলেছিলেন —

> *"আলী, আমার পরে তোমার ঔরসে এক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করবে। তাকে আমার নাম ও লকব প্রদান করলাম এবং এখন হতে কারো জন্য একত্রে আমার নাম ও লকব ব্যবহারের অনুমতি রইলো না।"*

রাসুলের (সঃ) উপরোক্ত বাণী সামনে রেখে তালহার পুত্রের নাম রাসুল (সঃ) রেখেছিলেন এ কথা সঠিক হতে পারে না। এ ছাড়া কোন কোন ঐতিহাসিক ইবনে তালহার লকব আবু সুলায়মান (আবুল কাসেম নয়) লিখেছেন। একইভাবে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকরের লকব আবুল কাসিম যদি এজন্য হয়ে থাকে যে তার পুত্রের নাম ছিল কাসিম (যিনি মদিনার আল্লাহ্‌তত্ত্ববিদদের অন্যতম ছিলেন) তা হলে আয়শা কিভাবে তার লকব দিয়েছিলেন? মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর আমিরুল মোমেনিনের যত্নে লালিত পালিত হয়েছেন। আমিরুল মোমেনিন তার কাছে রাসুলের (সঃ) বাণী গোপন রাখার কথা নয়। সে ক্ষেত্রে আয়শা কর্তৃক প্রদত্ত নাম ও লকব একত্রে তিনি নিজেই সহ্য করতেন না। তদুপরি অনেক ঐতিহাসিক তার লকব লিখেছেন আবু আবদার রহমান। খাল্লিকান[৫৬] (৪র্থ খন্ড, পৃঃ ১৭০) লিখেছেন যে, আমিরুল মোমেনিনের পুত্র মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়ার জন্য রাসুল (সঃ) "আবুল কাসিম" লকব নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। কিন্তু আশরাফ[১৭] (৩য় খন্ড, পৃঃ ১১২) লিখেছেন ঃ

> *মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়ার প্রতি এ লকব প্রয়োগ করতে গিয়ে খাল্লিকান বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছেন। কারণ আমিরুল মোমেনিনের যে পুত্রকে রাসুল (সঃ) তাঁর নাম ও লকব একত্রে দান করেছেন এবং যা অন্য আর কারো জন্য অনুমোদিত নয়, তিনি হলেন প্রতিক্ষীত শেষ ইমাম—মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়া নয়। হানাফিয়ার "আবুল কাসেম" লকব প্রতিষ্ঠিত হয় না। কতেক লোক অজ্ঞতা বশতঃ রাসুলের আসল উদ্দেশ্য বুঝতে না পেরে ইবনে হানাফিয়াকে বুঝেছে।*

যা হোক, মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়া ন্যায়পরায়ণতা, দয়া, আত্মত্যাগ, ইবাদতে শ্রেষ্ঠত্ব, জ্ঞান ও কীর্তিতে অতি উচ্চ মর্যাদা অর্জন করেছিলেন এবং তিনি তার পিতার বীরত্বের উত্তরাধিকারী ছিলেন। জামাল ও সিফফিনের যুদ্ধে তার কৃতিত্ব এমন প্রভাব ফেলেছিল যে, বড় বড় যোদ্ধাগণও তার নাম শুনলে কেঁপে উঠতো। আমিরুল মোমেনিন তার সাহস ও শৌর্যে গর্বিত ছিলেন এবং সর্বদা যুদ্ধক্ষেত্রে তাকে সন্মুখভাগে দিতেন। আমিলী[১১] লিখেছেন যে, আলী ইবনে আবি তালিব যুদ্ধক্ষেত্রে মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়াকে সন্মুখভাগে রাখতেন কিন্তু হাসান ও হুসাইনকে সন্মুখে এগিয়ে যেতে দিতেন না এবং প্রায়শই বলতেন, "এ হচ্ছে আমার পুত্র আর ওরা দু'জন আল্লাহ্‌র রাসুলের পুত্র।" একজন খারিজী ইবনে হানাফিয়াকে বলেছিল যে, আলী তাকে যুদ্ধের দাবানলে ঠেলে দেয় অথচ হাসান ও হুসাইনকে দূরে সরিয়ে রেখে রক্ষা করতে চায়। তখন হানাফিয়া জবাবে বললেন, "আমি তাঁর দক্ষিণ হস্ত এবং তারা তাঁর চক্ষু। সুতরাং তিনি তাঁর চক্ষুকে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা রক্ষা করেন।" আশরাফ [১৭] লিখেছেন যে, একজন খারিজীর প্ররোচনায় ইবনে হানাফিয়া নালিশের স্বরে এ বিষয়টি আমিরুল মোমেনিনকে বললে, প্রত্যুত্তরে তিনি বলেছিলেন, "তুমি আমার দক্ষিণ হস্ত। অপরপক্ষে হাসান ও হুসাইন আমার চক্ষু এবং চক্ষুকে রক্ষা করা হাতের কর্তব্য।" এ দু'টি মতের মধ্যে কোন অমিল নেই। তবে বাগ্মীতার বিবেচনায় এটা আমিরুল মোমেনিনের উক্তি বলেই অধিক যুক্তিযুক্ত। হয়ত আমিরুল মোমেনিনের কথাই ইবনে হানাফিয়া অন্যের কথার জবাবে বলেছিলেন।

মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়া দ্বিতীয় খলিফার রাজত্বকালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের রাজত্বকালে ৬৫ বছর বয়সে ইনতিকাল করেন। কোন কোন ঐতিহাসিক ৮০ হিজরীতে তার মৃত্যু হয়েছে বলে লিখেছেন, আবার কেউ কেউ লিখেছেন ৮১ হিজরীতে। তার মৃত্যুর স্থান সম্পর্কে মতভেদ আছে। কেউ বলেন মদিনায়, কেউ বলেন আয়লাতে এবং কেউ বলেন তায়েফে।

২। জামাল-যুদ্ধে আমিরুল মোমেনিন মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়াকে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণকালে বলেছিলেন যে, তিনি যেন শত্রুর সন্মুখে পর্বত প্রমাণ স্থির-সংকল্প ও দৃঢ়তা সহকারে অবস্থান করেন যাতে করে শত্রুর প্রচন্ড আক্রমণও যেন তাকে স্থানচ্যুৎ করতে না পারে এবং তিনি যেন দাঁতে দাঁত কামড়ে ধরে শত্রুকে আঘাত করতে থাকেন। তৎপর তিনি বললেন, "বৎস আমার, তোমার মাথা আল্লাহ্‌কে ধার দাও। এতে তুমি শাশ্বত জীবন লাভ করবে, কারণ কোন কিছু ধার দিলে তা ফেরত পাবার অধিকার থাকে। তাই তুমি জীবনের দিকে না তাকিয়ে যুদ্ধ করো। যদি তোমার মনে জীবনের মায়া এসে যায় তবে মৃত্যুর মুখোমুখী হবার জন্য অগ্রবর্তী হতে তুমি দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে পড়বে। এতে তোমার বীরত্বের সুনাম ক্ষুন্ন হবে। দেখ, কখনো পশ্চাৎপদ হয়ো না, কারণ পশ্চাৎপদ হলে শত্রুর সাহস বেড়ে যায় এবং তাদের পদক্ষেপ দ্রুত হয়। শত্রুর সর্বশেষ সারিকে তোমার লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করো। এতে শত্রু তোমার উচ্চাকাঙ্খা অনুধাবন করে ভীত হয়ে পড়বে। তাতে শত্রু ব্যুহ ভেদ করা সহজ হয়ে যাবে এবং তাদের গতিবিধিও তোমার কাছে গোপন থাকবে না। দেখ, শত্রুর সংখ্যাধিক্যের প্রতি

নজর দিয়ো না—এতে তোমার সাহস ও শৌর্য অক্ষুন্ন থাকবে।" তিনি আরো বলেছিলেন, যুদ্ধক্ষেত্রে চোখ এত বেশী খোলা উচিত নয় যাতে শত্রুর অস্ত্রের চাকচিক্যে চোখ ধেঁধে যায় এবং সে সুযোগে শত্রু আক্রমণ করে বসে। সর্বদা মনে রেখো বিজয় আল্লাহ্র হাতে। "যদি আল্লাহ্ তোমাকে সাহায্য করেন তবে কেউ পরাভূত করতে পারে না।" সুতরাং বস্তু-উপকরণাদির ওপর নির্ভর না করে আল্লাহ্র সাহায্য ও সমর্থন অনুসন্ধান করো।

আল্লাহ্ তোমাদেরকে সাহায্য করলে তোমাদের ওপর জয়ী হবার কেউ থাকবে না (কুরআন—৩ : ১৬০)।

★★★★★

খোৎবা-১২

জামালের যুদ্ধে যখন আল্লাহ্ আমিরুল মোমেনিনকে শত্রুপক্ষের ওপর বিজয়ী করলেন তখন তাঁর একজন অনুচর বললেন, "হায়! আমার ভাই অমুক যদি যুদ্ধে উপস্থিত থাকতো তাহলে সেও দেখতে পেতো আল্লাহ্ আপনাকে কিরূপ সাফল্য ও বিজয় দান করেছেন।"

একথা শুনে আমিরুল মোমেনিন জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার ভাই কি আমাকে বন্ধু বলে জানে?"

সে বললো, "জ্বি হাঁ।"শত্র

আমিরুল মোমেনিন তখন বললেন, "তাহলে সে আমাদের সঙ্গেই ছিল[১]। আমাদের এ সৈন্যবাহিনীতে তারাও উপস্থিত ছিল যারা এখনো পুরুষের ঔরসে ও নারীর জরায়ুতে রয়েছে। সহসাই সময় তাদেরকে বের করে নিয়ে আসবে এবং তাদের মাধ্যমে ইমান শক্তি লাভ করবে।"

১। উপায় ও উপকরণ থাকা সত্ত্বেও যদি কেউ কর্মসাধনে ব্যর্থ হয় তা তার ঐকান্তিকতার অভাব নির্দেশক। কিন্তু কর্মসাধনে যদি কোন প্রতিবন্ধকতা থাকে অথবা জীবনের সমাপ্তিতে কর্ম অসমাপ্ত থেকে যায় সেক্ষেত্রে কর্মের জন্য পুরস্কার হতে আল্লাহ্ তাকে বঞ্চিত করবেন না। কারণ কর্ম নিয়্যত দ্বারাই বিচার্য হয়। যেহেতু তার নিয়্যত ছিল কর্ম সম্পাদনের জন্যই সেহেতু সে কিছুটা পুরস্কার পাবার যোগ্য।

কোন কোন ক্ষেত্রে কর্মের পুরস্কার নাও থাকতে পারে কারণ কর্ম লোক দেখানো (রিয়া) অথবা ভান হতে পারে। কিন্তু নিয়্যত হৃদয়ের গভীরে লুক্কায়িত থাকে। ফলে এতে একফোটাও রিয়া অথবা মোহ থাকতে পারে না। প্রতিবন্ধকতার কারণে কর্মসাধন সম্ভব না হলেও নিয়্যতে সর্বদা একই স্তরের অকপটতা, সততা, পরিপূর্ণতা ও সঠিকতা থাকতে হবে। নিয়্যত করার অবস্থা না থাকলেও কর্ম সাধনের জন্য যদি হৃদয়ে আবেগ ও উচ্ছ্বাস থাকে তবে হৃদয়ের সে অনুভূতির জন্য পুরস্কার পেতে পারে। এ কারণেই আমিরুল মোমেনিন বলেছেন," যদি তোমার ভাই আমাকে ভালবেসে থাকে তবে সে তাদের সঙ্গে পুরস্কারের অংশ পাবে যারা আমাদের সমর্থন করে শহীদ হয়েছে।"

★★★★★

খোৎবা-১৩

বসরার জনগণকে তিরস্কার ১

তোমরা ছিলে একজন রমণীর সৈন্য এবং একটা চতুষ্পদ জন্তুর নিয়ন্ত্রণাধীন। যখন জন্তুটি রোষে গর্জে উঠলো, তোমরাও উহার সঙ্গে সাড়া দিলে। আবার যখন জন্তুটির পায়ের শিরা কেটে দেয়া হয়েছিল, তোমরা তখন পালিয়ে গেলে। তোমাদের চরিত্র নিম্নমানের এবং তোমরা অঙ্গীকার ভঙ্গকারী। তোমাদের হৃদয় হচ্ছে মোনাফেকীপূর্ণ। তোমাদের পানি হচ্ছে লবনাক্ত। যারা তোমাদের সঙ্গে থাকে তারা পাপে ডুবে থাকে এবং যারা তোমাদের পরিত্যাগ করে তারা আল্লাহ্র রহমতের অধিকারী হয়। যদিও আমি তোমাদের মসজিদকে নৌকার উপরিভাগের মত দীপ্যমান দেখছি তবুও আল্লাহ্ উহার ওপর ও নীচের দিক হতে শাস্তি প্রেরণ করলে তোমরা যারা এতে রয়েছো প্রত্যেকেই অতলে তলিয়ে যাবে[২]। অন্য এক বর্ণনায় বলা হয়েছে ঃ

আল্লাহ্র কসম, তোমাদের শহর নিশ্চয়ই, এতোখানি ডুবে যাবে যে এর মসজিদকে আমি নৌকার উপরিভাগ অথবা বসে থাকা উটপাখীর মত দেখতে পাচ্ছি। অন্য এক বর্ণনায় বলা হয়েছে ঃ

তোমাদের মসজিদকে গভীর সমুদ্রে একটা পাখীর বক্ষের মত দেখতে পাচ্ছি।

অন্য এক বর্ণনানুযায়ী ঃ

তোমাদের শহর অতীব পুতিগন্ধময়। শহরটি পানির অত্যন্ত নিকটবর্তী এবং আকাশ থেকে অনেক দূরে। এ শহরের দশ ভাগের নয় ভাগই পাপে পঙ্কিল। যে কেউ এতে প্রবেশ করে সে পাপের মধ্যে প্রবেশ করে এবং যে এ শহর থেকে বেরিয়ে যায় সে আল্লাহ্‌র ক্ষমা লাভ করে। তোমাদের এ জনপদের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, পানি এমনভাবে এটাকে গ্রাস করেছে কেবলমাত্র মসজিদের চূড়া গভীর সমুদ্রে ভাসমান পাখীর বক্ষের মত ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না।

১। বাহ্‌রানী[১০১] লিখেছেন যে, জামালের যুদ্ধ সমাপ্ত হবার পর তৃতীয় দিনে আমিরুল মোমেনিন বসরার কেন্দ্রীয় মসজিদে ফজর সালাত সমাপ্ত করে সালাত স্থানের ডান দিকের দেয়ালে হেলান দিয়ে এ খোৎবা প্রদান করেন। এতে তিনি বসরার জনগণের চরিত্রের নীচতা ও ধূর্ততা বর্ণনা করেন। তারা নিজেদের বিচার বিবেচনা বাদ দিয়ে অন্যের প্ররোচনায় ধুমায়িত হয়ে তাদের নিয়ন্ত্রণভার উটের পিঠে বসে থাকা একজন রমণীর হাতে তুলে দিয়েছিল। তারা তাদের বায়াত ভঙ্গ করেছিল এবং দ্বিমুখী কর্ম দ্বারা তাদের চরিত্রের নীচতা ও বদস্বভাব প্রকাশ করেছিল। এ খোৎবায় 'রমণী' বলতে আয়শাকে এবং চতুষ্পদ জন্তু বলতে আয়শার উটকে বুঝানো হয়েছে। সেজন্যই এ যুদ্ধের নামকরণ করা হয়েছে "জামালের (উটের) যুদ্ধ।"

এ যুদ্ধের সূত্রপাত এভাবে হয়েছিল যে, যদিও উসমানের জীবদ্দশায় আয়শা তার ঘোর বিরোধিতা করতেন এবং তাকে অবরোধের মধ্যে ফেলেই মক্কায় চলে গিয়েছিলেন তবুও মক্কা হতে মদিনায় ফেরার পথে তিনি আবদুল্লাহ্ ইবনে সালামার কাছে জানতে পারলেন যে, উসমানের পর খলিফা হিসেবে সকলেই আলীর হাতে বায়াত গ্রহণ করেছে। একথা শুনামাত্রই আয়শা দুঃখ সহকারে বললেন, "আলীর বায়াত গ্রহণের পূর্বে পৃথিবীর ওপর আকাশ ভেঙ্গে পড়া ভাল ছিল। আমি মক্কায় ফিরে চলে যাব।" তিনি মক্কায় ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন এবং বললেন, "আল্লাহ্‌র কসম, উসমান অসহায়ভাবে নিহত হয়েছে। নিশ্চয়ই আমি তার রক্তের বদলা নেব।" আয়শার এহেন পরিবর্তন দেখে ইবনে সালামা তাজ্জব হয়ে বললেন, "আপনি এসব কি বলছেন! আপনি নিজেই তো বলতেন এ 'নাছাল' টিকে হত্যা করে ফেল; সে বেঈমান হয়ে গেছে।" প্রত্যুত্তরে আয়শা বললেন, "শুধু আমি একা নই, সকলেই এ কথা বলতো। সে সব কথা বাদ দাও। এখন আমি যা বলি মনোযোগ দিয়ে শ্রবন কর। এটা অতীব দুঃখজনক যে উসমানকে তওবা করে শোধরানোর কোন সুযোগ না দিয়ে হত্যা করা হয়েছে।" এ কথা শোনা মাত্রই ইবনে সালামা আয়শাকে উদ্দেশ্য করে নিম্নের পংক্তি ক'টি আবৃত্তি করতে লাগলেন ঃ

আপনি এটা শুরু করেছিলেন, এখন হঠাৎ বদলে গিয়ে
গোলযোগের ঝড়-তুফান তুলছেন,
আপনি তাকে হত্যা করার আদেশ দিয়েছিলেন
সে বেঈমান হয়ে গেছে বলে আমাদেরকে বলেছেন।
আমরা মেনে নিলাম তাকে হত্যা করা হয়েছে
সে হত্যা কিন্তু আপনার নির্দেশেই হয়েছে
এবং প্রকৃত খুনী সে যে আদেশ করেছে।
এতদসত্ত্বেও আমাদের ওপর আকাশ ভেঙ্গে পড়েনি
অথবা চন্দ্র-সূর্যেও গ্রহণ লাগেনি।
নিশ্চয়ই, মানুষ এমন একজনের বায়াত গ্রহণ করেছে
যিনি শক্তিমত্তা ও মহানুভবতা দিয়ে শত্রুকে
প্রতিহত করতে পারবেন
যিনি কখনো কখনো 'সোরা'গণকে কাছে
ভিড়তে দেবেন না
যিনি কখনো রশির পাক খুলবেন না
শত্রুগণও তাতে দমিত থাকবে।
তিনি সর্বদা যুদ্ধের জন্য অস্ত্রধারণ করে আছেন
ইমানদার কখনো বিশ্বাসঘাতকের মত নয়।

যা হোক, প্রতিশোধের একটা উন্মত্ততা নিয়ে আয়শা মক্কায় ফিরে গিয়ে উসমানের হত্যার বদলা নেয়ার জন্য তার হত্যা সম্পর্কে নানা প্রকার কল্পকাহিনী ছড়িয়ে জনমত গঠন করতে লাগলো। তার ডাকে প্রথমেই সাড়া দিল উসমানের সময়কার মক্কার গভর্ণর আবদুল্লাহ্ ইবনে আমির আল-হাদরামী। সে সাথে মারওয়ান ইবনে হাকাম, সা'দ ইবনে আ'স এবং উমাইয়া গোত্রের আরো অনেকে। ইতোবসরে তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ্ ও জুবায়র ইবনে আওয়াম মদিনা হতে মক্কায় পৌছে গিয়েছিল। অপর দিকে উসমানের রাজত্বকালে ইয়েমেনের গভর্ণর ইয়ালা ইবনে মুনাব্বিহ্ ও বসরার গভর্ণর আবদুল্লাহ্ ইবনে আমির ইবনে কুরায়েজ মক্কায় পৌছে গিয়েছিল। তারা সকলে মিলিতভাবে পরিকল্পনা তৈরী করতে লাগলো। তারা আমিরুল মোমেনিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্র নির্ধারণে আলোচনা অব্যাহত রাখলো। মদিনাকে যুদ্ধক্ষেত্র হিসেবে নির্ধারণ করার জন্য আয়শা অভিমত ব্যক্ত করলেও কতিপয় লোক তাতে অমত প্রকাশ করেছিল। তারা বললো যে, মদিনাবাসীদের বাগে আনা বড়ই কঠিন ব্যাপার। কাজেই অন্য কোথাও যুদ্ধক্ষেত্র নির্ধারণ করার জন্য তারা বললো। অবশেষে অনেক শলা-পরামর্শের পর বসরার দিকে মার্চ করার সিদ্ধান্ত তারা গ্রহণ করলো। কারণ যুদ্ধের কারণের প্রতি সমর্থন দেয়ার মত লোকের অভাব বসরায় হবে না বলে তাদের বিশ্বাস ছিল। ফলে আবদুল্লাহ্ ইবনে আমিরের অগণিত সম্পদ আর ইয়ালা ইবনে মুনাব্বির ছয় লক্ষ দিরহাম ও ছয় শত উট অনুদান দ্বারা তারা তিন হাজার সৈন্যের একটা বাহিনী গঠন করে বসরা অভিমুখে প্রেরণ করলো। পথিমধ্যে একটা ছোট্ট ঘটনার কারণে আয়শা অগ্রসর হতে চাইলেন না। ঘটনাটি হলো—একটা জায়গায় উপনীত হলে আয়শা কুকুরের ঘেউ ঘেউ শুনতে পেলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি তার উট চালকের কাছে সে জায়গার নাম জানতে চাইলেন। চালক বললো যে, এ জায়গার নাম হাওয়াব। জায়গাটির নাম শুনামাত্রই আয়শা আঁতকে উঠলেন। কারণ তার মনে পড়ে গেল রাসুলের (সঃ) ভবিষ্যদ্বাণী। একদিন রাসুল (সঃ) তাঁর স্ত্রীগণকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, "আমি জানি না, তোমাদের কাকে দেখে হাওয়াবের কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ করে উঠবে।" আয়শা বুঝতে পারলেন যে, তিনিই সেই স্ত্রী; তখন তিনি অগ্রযাত্রা বন্ধ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কিন্তু জুবায়র শপথ করে তাকে বললো সে জায়গা হাওয়াব নয়। তালহা জুবায়রের কথা সমর্থন করলো। তারা উভয়ে আরো পঞ্চাশজন লোক নিয়ে এলো যারা জুবায়রের কথার সত্যতার সাক্ষ্য দিল। ফলে আয়শা পুনরায় অগ্রযাত্রা শুরু করলেন।

এ সৈন্যবাহিনী যখন বসরায় পৌছলো, লোকেরা আয়শাকে বহনকারী প্রাণীটি দেখে বিস্ময়-বিহবল হয়ে পড়লো। জারিয়া ইবনে কুদাসা বললো, ওগো, উম্মুল মোমেনিন, উসমানের হত্যা একটা হৃদয় বিদারক ঘটনা। কিন্তু তার চেয়েও হৃদয় বিদারক হলো আপনি এ অভিশপ্ত উটে চড়ে বেরিয়ে এসেছেন এবং আপনার সম্মান ও মর্যাদা ধ্বংস করেছেন। এখান থেকে ফিরে যাওয়াই আপনার পক্ষে অধিকতর ভাল।" হাওয়াবের ঘটনা, কুরআনের নিষেধাজ্ঞা (তোমরা স্বগৃহে অবস্থান করবে- ৩৩:৩৩) কোন কিছুই যখন তাকে নিবৃত্ত করতে পারেনি তখন জারিয়ার কথা তার কর্ণ কুহরে প্রবেশ করবে কেন?

আয়শার সৈন্যবাহিনী যখন বসরা নগরীতে প্রবেশ করার চেষ্টা করলো তখন বসরার গভর্ণর উসমান ইবনে হুনায়ফ বাধা প্রদান করলো। উভয় পক্ষই অসি কোষমুক্ত করে একে অপরের ওপর আঘাত হানতে শুরু করলো—উভয় পক্ষেই বেশ কিছু সংখ্যক লোক হতাহত হলো। তৎপর আয়শা তার প্রভাবের সুযোগ গ্রহণ করে হস্তক্ষেপ করলেন। তাতে উভয় পক্ষ এ মর্মে সম্মত হলো যে, আমিরুল মোমেনিন বসরায় আসা অবধি উসমান ইবনে হুনায়ফ গভর্ণর থাকবে এবং বর্তমান প্রশাসন কাজ চালিয়ে যাবে। কিন্তু মাত্র দু'দিন পরেই এক গভীর রাতে আয়শার বাহিনী উসমান ইবনে হুনায়ফকে আক্রমণ করে চল্লিশ জন নিরপরাধ লোককে হত্যা করেছিল এবং উসমান ইবনে হুনায়ফকে বন্দী করে বেদম প্রহারে আহত করেছিল। এমনকি তার প্রতিটি দাড়ি টেনে তুলে ফেলেছিল। অতঃপর তারা বায়তুল মালের গুদাম আক্রমণ করলো। বায়তুল মাল লুটের সময় বিশজন লোক হত্যা করেছিল এবং পঞ্চাশজনকে গ্রেফতার করে শিরোচ্ছেদ করেছিল। তৎপর তারা বসরার শস্যভান্ডার আক্রমণ করেছিল। এতে বসরার একজন বয়োঃবৃদ্ধ গণ্যমান্য ব্যক্তি হুকায়ম ইবনে জাবালা তার লোকজনসহ জুবায়রের কাছে এসে বললো, "নগরবাসীদের জন্য কিছু খাদ্যশস্য রেখে দিন। অত্যাচারেরও তো একটা সীমা আছে। সীমালঙ্ঘনকারীকে আল্লাহ্ পছন্দ করেন না। আল্লাহ্র দোহাই, এ ধ্বংসযজ্ঞ বন্ধ করুন এবং উসমান ইবনে হুনায়ফকে ছেড়ে দিন। আপনার হৃদয়ে কি আল্লাহ্র ভয় নেই?" জুবায়র বললো, "এটা উসমান হত্যার প্রতিশোধ।" ইবনে জাবালা প্রত্যুত্তরে বললো, "আপনারা এখানে যাদের হত্যা করেছেন তাদের কেউ কি উসমানের হত্যার সাথে জড়িত ছিল? আল্লাহ্র কসম, যদি আমার সমর্থক ও অনুচর থাকতো তবে যেসব মুসলিমকে বিনা অপরাধে আপনারা হত্যা করেছেন তাদের রক্তের বদলা নিতাম।" জুবায়র বললো, "আমরা এক কণা শস্যও ফেরত দেব না এবং উসমান ইবনে হুনায়ফকেও ছাড়বো না।" অবশেষে দু'পক্ষে যুদ্ধ বেঁধে গেল। কিন্তু এত বড় বাহিনীর সম্মুখে মুষ্টিমেয় ক'জন লোক কতক্ষণ টিকতে

পারে? ফলে হুকায়ম ইবনে জাবালা, তার পুত্র আশরাফ ইবনে হুকায়ম ও ভ্রাতা রিল ইবনে জাবালাসহ এ গোত্রের সত্তরজন নিহত হয়েছিল। মোটকথা, আয়শার বাহিনী হত্যা আর লুটপাট করে বসরায় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল। তথায় না ছিল কারো জীবনের নিরাপত্তা, না ছিল কারো ইজ্জত আর সম্পদ রক্ষার উপায়।

আমিরুল মোমেনিন এ সব অত্যাচারের সংবাদ পেয়ে সত্তরজন বদরী (বদর যুদ্ধে যারা অংশগ্রহণ করেছিল) ও চার শত রিদওয়ানী (যারা রিদওয়ানের বায়াতের সময় উপস্থিত ছিল) সমন্বয়ে একটা বাহিনী গঠন করে বসরা অভিমুখে যাত্রা করলেন। যখন তিনি যিকর নামক স্থানে পৌছলেন তখন তাঁর পুত্র হাসান ও আম্মার ইবনে ইয়াসিরকে কুফায় পাঠালেন যেন কুফাবাসীগণ তাঁর সহায়তায় এগিয়ে আসে। আবু মুসা আশারীর বিরোধিতা সত্ত্বেও এ আমন্ত্রণে সাত হাজার কুফী যোদ্ধা আমিরুল মোমেনিনের বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল। সৈন্যগণকে বিভিন্ন কমান্ডারের অধীনে ভাগ করে দিয়ে তিনি সে স্থান ত্যাগ করলেন। চাক্ষুষদর্শী সাক্ষীদের বর্ণনা হতে জানা যায় যে, আমিরুল মোমেনিনের সৈন্যবাহিনী বসরার নিকটবর্তী হলে সর্বপ্রথমেই আনসারদের একটি দল নজরে পড়েছিল। আবু আইয়ুব আনসারী ছিলেন এ দলের পতাকা বাহক। এরপর এক হাজার সৈন্যের আরেকটি বাহিনী নজরে পড়েছিল যাদের কমান্ডার ছিলেন খুজায়মা ইবনে ছাবিত আনসারী। তৎপর আরেকটি বাহিনী দৃষ্টিগোচর হয়েছিল যাদের পতাকা বহন করছিলেন আবু কাতাদাহ্ ইবনে রাবি। তৎপর এক হাজার বৃদ্ধ ও যুবকের একটি বাহিনী নজরে পড়েছিল যাদের প্রত্যেকের কপালে সেজদার চিহ্ন এবং মুখমন্ডলে আল্লাহ্‌র ভয়ের ছাপ ছিল। তাদের দেখে মনে হয়েছিল যেন তারা শেষ বিচারের দিনে আল্লাহ্‌র মহত্বের সামনে দন্ডায়মান। তাদের কমান্ডার সাদা পোষাক ও মাথায় কালো পাগড়ী পরে একটা কালো ঘোড়ায় চড়ে উচ্চস্বরে কুরআন তেলওয়াত করতেছিলেন। ইনিই হলেন আম্মার ইবনে ইয়াসির। তৎপর আরেকটি বাহিনী নজরে এলো। এদের পতাকা কায়েস ইবনে সাদ ইবনে উবাদার হাতে ছিল। অতঃপর এক বাহিনী নজরে এলো। এদের কমান্ডার সাদা পোষাক ও মাথায় কালো পাগড়ী পরিহিত ছিল। তিনি এত সুদর্শন ছিলেন যে সকলের দৃষ্টি তাঁর প্রতি নিপতিত হয়েছিল। ইনি হলেন আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস। তারপর রাসুলের সাহাবাগণের বাহিনী এগিয়ে এলো। এঁদের পতাকা কুছাম ইবনে আব্বাসের হাতে ছিল। এভাবে কয়েকটি বাহিনী অতিক্রম করার পর একটা বিশাল বাহিনী দেখা গেল। তাদের অধিকাংশের হাতে ছিল বর্শা। তাদের সঙ্গে ছিল বিভিন্ন রঙের অনেক পতাকা। তন্মোধ্যে একটা বিরাট পতাকা বিশেষ বৈশিষ্ট্য সহকারে দেখা গেল। এ পতাকার পেছনে একজন ঘোড়-সওয়ারকে দেখা গেল যার মধ্যে মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের ছাপ রয়েছে। তাঁর পেশী ছিল সুউন্নত এবং দৃষ্টি ছিল নীচের দিকে। তাঁর সম্ভ্রম ও মর্যাদা এত প্রখর ছিল যে, কেউ তাঁর দিকে তাকাতে পারছিলো না। ইনিই হলেন চির বিজয়ী বীর শেরে খোদা আলী ইবনে আবি তালিব। তাঁর ডানে হাসান, বামে হুসাইন, সম্মুখে মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়া এবং পেছনে বদরীগণ, হাশেমী বংশের যুবকগণ ও আবদুল্লাহ্ ইবনে জাফর ইবনে আবি তালিব। মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়া বিজয় ও মর্যাদার পতাকা হাতে ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। এ বাহিনী যাওয়াইয়াহ্ নামক স্থানে পৌছলে আমিরুল মোমেনিন ঘোড়া হতে অবতরণ করে চার রাকাত সালাত আদায় করলেন এবং দীর্ঘক্ষণ সেজদায় পড়ে রইলেন। যখন তিনি মাথা তুললেন তখন দেখা গেল তাঁর অশ্রুতে মাটি ভিজে গিয়েছিল এবং তিনি মুখে বলতেছিলেন ঃ

> *হে আকাশ, পৃথিবী ও মহাশূন্যের ধারক, এটা বসরা। এর কল্যাণ দ্বারা আমাদের বুক ভরে দাও এবং মন্দ হতে আমাদের রক্ষা কর।*

অতঃপর তিনি সম্মুখে অগ্রসর হয়ে জামালের যুদ্ধক্ষেত্রের যে স্থানে শত্রুপক্ষ পূর্ব হতেই ক্যাম্প করেছিল সেখানে নেমে পড়লেন। সর্বপ্রথমে আমিরুল মোমেনিন নিজের সৈন্যবাহিনীকে নির্দেশ দিলেন, "কেউ অন্যকে আক্রমণ করবে না বা আক্রমণের ইন্ধনও যোগাবে না।" তৎপর তিনি সোজাসুজি শত্রু সৈন্যের সম্মুখে এগিয়ে গিয়ে তালহা ও জুবায়রকে ডেকে বললেন, "তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের নামে শপথ করে আয়শাকে বল আমি কি উসমানের হত্যার দোষ থেকে মুক্ত নই? উসমান সম্পর্কে তোমরা যা বলতে আমি কি তা বলিনি? বায়াতের জন্য আমি কি তোমাদের ওপর কোন চাপ দিয়েছিলাম নাকি তোমরা স্বেচ্ছায় আমার বায়াত গ্রহণ করেছিলে?" আমিরুল মোমেনিনের এসব কথা শুনে তালহা ক্ষুদ্ধ হয়ে গেল এবং জুবায়র কিছুটা কোমল হয়েছিল। অতঃপর আমিরুল মোমেনিন ফিরে এসে মুসলিম নামক আবদ কায়েস গোত্রের একজন যুবকের হাতে কুরআন দিয়ে পাঠালেন যেন তিনি শত্রুপক্ষকে কুরআনের নির্দেশ শুনিয়ে দেন। কিন্তু শত্রুপক্ষ এ পূত-পবিত্র লোকটিকে তীর দ্বারা ঢেকে ফেললো। তৎপর আম্মার ইবনে ইয়াসির এগিয়ে এসে যুদ্ধের ভয়াবহতা সম্পর্কে তাদেরকে বুঝিয়ে বলতে লাগলেন কিন্তু তাকেও তীর দ্বারা জবাব দেয়া হলো। এ পর্যন্ত আমিরুল মোমেনিন কোন আক্রমণের অনুমতি দেননি। তাই শত্রুপক্ষ তীর-বৃষ্টি ঝরাতে উৎসাহ বোধ করছিলো। শেষ পর্যন্ত কয়েকজন সাহসী

যোদ্ধার মুমূর্ষু অবস্থা আমিরুল মোমেনিনের বাহিনীতে আতঙ্কের সৃষ্টি করলো এবং তারা তাকে বললো, "হে, মাওলাল মোমেনিন, আপনি আমাদেরকে আক্রমণ করতে দিচ্ছেন না অথচ তারা আমাদেরকে তীর দ্বারা ঢেকে ফেলছে। আর কতক্ষণ আমরা আমাদের বক্ষকে তাদের তীরের লক্ষ্যস্থল হিসেবে রাখবো এবং তাদের হঠকারিতায় হাত গুটিয়ে থাকবো।" এসব কথায় আমিরুল মোমেনিন রাগান্বিত হলেও সংযম আর ধৈর্য ধারণ করে কোন প্রকার যুদ্ধের পোষাক না পরে খালি হাতে শত্রুর সম্মুখে উপস্থিত হয়ে চিৎকার করে বললেন, "জুবায়র কোথায়?" প্রথমতঃ জুবায়র এগিয়ে আসতে ইতস্ততঃ করতেছিল কিন্তু যখন দেখলো যে, আমিরুল মোমেনিনের হাতে কোন অস্ত্র নেই তখন সে বেরিয়ে এসেছিল। আমিরুল মোমেনিন বললেন, "ওহে জুবায়র তোমার কি মনে পড়ে একদিন রাসুলে খোদা তোমাকে বলেছিলেন যে, তুমি আমার সাথে যুদ্ধ করবে এবং তাতে অন্যায় ও বাড়াবাড়ি তোমার দিক থেকেই হবে।" প্রত্যুত্তরে জুবায়র বললো তিনি এরূপই বলেছিলেন। তখন আমিরুল মোমেনিন জিজ্ঞেস করলেন, "তাহলে কেন আমার সাথে যুদ্ধ করতে এসেছো?" উত্তরে জুবায়র বললো যে, তার স্মৃতিতে রাসুলের কথা হারিয়ে গিয়েছিল; আগে স্মরণ থাকলে সে বসরায় আসতো না। আমিরুল মোমেনিন বললেন, "ভাল কথা, এখন তো তুমি স্মরণ করতে পেরেছো?" জুবায়র হাঁ বলেই আয়শার কাছে গিয়ে বললো, "আমি ফিরে যাচ্ছি, কারণ আলী আমাকে রাসুলের একটি কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। আমি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলাম। এখন সঠিক পথ পেয়েছি। আমি আলীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো না।" আয়শা বললেন, "তোমাকে আবদাল মুত্তালিবের পুত্রগণের তরবারির ভয়ে ধরেছে।" জুবায়র 'না' বলেই তার ঘোড়া ফিরিয়ে যুদ্ধের জন্য রুখে দাঁড়ালো।

এদিকে আমিরুল মোমেনিন জুবায়রের সাথে কথোপকথন শেষে ফিরে এসেই দেখলেন শত্রুপক্ষ তাঁর বাহিনীর ডান ও বাম বাহু আক্রমণ করে ফেলেছে। এ অবস্থা লক্ষ্য করে তিনি বললেন, "সকল ওজর শেষ হয়ে গেল। আমার পুত্র মুহাম্মদকে ডাক।" মুহাম্মদ এলে তিনি বললেন, "পুত্র আমার, এখন শত্রুকে আক্রমণ কর।" মুহাম্মদ মস্তক অবনত করলেন এবং পতাকা হাতে নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে এগিয়ে গেলেন। কিন্তু এত বিপুল পরিমাণ তীর নিক্ষিপ্ত হচ্ছিলো যে, তাকে থেমে যেতে হলো। এ অবস্থা দেখে আমিরুল মোমেনিন চিৎকার দিয়ে বললেন, "মুহাম্মদ, এগিয়ে যাচ্ছো না কেন? "তিনি বললেন, "পিতা, এহেন তীর-বৃষ্টিতে এগিয়ে যাবার উপায় নেই। তীর-বৃষ্টি একটু থেমে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।" আমিরুল মোমেনিন বললেন, "না, তীর আর বর্শা ঠেলেই প্রবল বেগে এগিয়ে যাও এবং শত্রুকে আক্রমণ কর।" এতে মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়া একটুখানি অগ্রসর হলেন কিন্তু তীরন্দাজগণ এমনভাবে তাকে ঘিরে ফেললো যে, তার পদচারণা বন্ধ করতে হলো। এ অবস্থা লক্ষ্য করে আমিরুল মোমেনিনের কপালে কুঞ্চন দেখা দিল এবং তিনি সজোরে এগিয়ে গিয়ে মুহাম্মদের তরবারির বাঁটে আঘাত করে বললেন, "তোমার এ ভীরুতা তোমার মায়ের রক্তের ফল।" একথা বলেই মুহাম্মদের হাত থেকে পতাকা নিজের হাতে নিলেন এবং আস্তিন গুটিয়ে এভাবে আক্রমণ করলেন যে, শত্রুব্যূহের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত কোলাহল শুরু হয়ে গেল। যে সারির দিকে তিনি যেতেন তা পরিষ্কার হয়ে যেত এবং যে দিকেই যেতেন দেহের পর দেহ পড়ে যেত এবং মাথাগুলো ঘোড়ার খুরের আঘাতে গড়াগড়ি দিত। শত্রুর সারিকে প্রবলভাবে প্রকম্পিত করে স্বস্থানে ফিরে এসে মুহাম্মদকে বললেন, "দেখ পুত্র, যুদ্ধ এভাবে করতে হয়।" এ বলে তিনি তার হাতে পতাকা দিয়ে এগিয়ে যেতে বললেন। মুহাম্মদ একটি আনসার বাহিনী নিয়ে শত্রুর দিকে এগিয়ে গেলেন। শত্রুপক্ষও বর্শা তাক করে তার দিকে এগিয়ে এলো। কিন্তু শৌর্যবান পিতার সাহসী পুত্র শত্রুর সারির পর সারি ছত্রভঙ্গ করে দিল এবং যুদ্ধক্ষেত্রে মৃতদেহ স্তূপাকার হয়ে পড়লো।

অপরদিকে শত্রুপক্ষও তাদের সৈন্যগণকে ত্যাগের মহিমা শোনাচ্ছিল। একটির ওপর আরেকটি মৃতদেহ গড়িয়ে পড়ছিলো তবুও উটটিকে ঘিরে তারা জীবন বিসর্জন দিয়ে যাচ্ছিলো। বিশেষ করে বনি দাব্বার লোকদের অবস্থা এমন ছিল যে, উটটির লাগাম ধরে রাখার কারণে কনুই পর্যন্ত তাদের হাত কেটে ফেলা হয়েছিল তাদের বক্ষ বিদীর্ণ করা হয়েছিল তবুও তাদের মুখে নিম্নের যুদ্ধের গান শোনা যাচ্ছিল ঃ

মৃত্যু আমাদের কাছে মধুর চেয়ে মিষ্টি,
আমরা বনু দাব্বাহ—উটের রাখাল,
আমরা মৃত্যুর পুত্র যখন মৃত্যু আসে,
আমরা বর্শার ফলায় উসমানের মৃত্যু ঘোষণা করি,
আমাদের নেতাকে ফিরিয়ে দাও, তবেই এ যুদ্ধ শেষ হবে।

বনি দাব্বার লোকদের অজ্ঞতা ও হীন চরিত্র সম্বন্ধে একটা ঘটনা থেকেই অনুমান করা যায় যা আবুল হাসান আলী ইবনে মুহাম্মদ মাদায়নী বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন বসরায় একজন কানকাটা লোকের সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল। তিনি তাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বললো, "জামালের যুদ্ধে আমি মৃতদেহের দৃশ্য দেখছিলাম হঠাৎ এক মুমূর্ষু ব্যক্তিকে দেখলাম তার মাথা মাটিতে আছড়াচ্ছে। আমি তার কাছে গিয়ে শুনলাম সে নিম্নের পদ ক'টি বলছেঃ

আমাদের মাতা আমাদেরকে মৃত্যুর গভীর জলে ঠেলে দিল
আমরা পুরোপুরি ডুবেছি, তিনি ফিরে এলেন না
ভাগ্যের হেরফেরে আমরা বনু তায়ামকে মেনেছি
আসলে তারা ক্রীতদাস আর ক্রীতদাসী ছাড়া কিছুই নয়।

আমি তাকে বললাম এটা কবিতা বলার সময় নয়; বরং তুমি আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর ও কালিমা শাহাদাত পড়। সে ক্রোধান্বিত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আমাকে গালিগালাজ শুরু করে দিল। সে বললো কালিমা শাহাদাত পড়ে জীবনের শেষ মূহুর্তে তুমি আমাকে ভীত আর অধৈর্য হতে বলছো। আমি তার কথায় স্তম্ভিত হয়ে ফিরে চললাম। সে আমাকে ডাক দিয়ে বললো দোহাই তোমার আমাকে কালিমা শিখিয়ে দাও। আমি তাকে কালিমা শেখানোর জন্য কাছে গেলাম। সে তার কানের কাছে মুখ নিয়ে কালিমা বলতে অনুরোধ করলো। আমি মাথা নামাতেই সে আমার কান কামড়ে ধরলো এবং দাঁত দিয়ে আমূল কেটে ফেললো। একজন মুমূর্ষু লোক থেকে প্রতিশোধ নেয়া আমি সমীচীন মনে করলাম না। তাই তাকে অভিশাপ দিয়ে চলে যেতে উঠে দাঁড়ালাম; সে বললো, যদি তোমার মা জিজ্ঞেস করে কে তোমার কান কেটেছে তবে বলো উমায়র ইবনে আহলাব দাব্বি যে একজন মহিলা কর্তৃক প্রতারিত হয়েছে এবং সে মহিলা তাকে ইমানদারগণের কমান্ডার বানানোর আশা দিয়েছিল।"

যা হোক এ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে যখন হাজার হাজার প্রাণ বিনষ্ট হলো এবং বনি আযদ ও বনি দাব্বার শত শত লোক উটটির লাগাম ধরে রাখার কারণে নিহত হলো তখন আমিরুল মোমেনিন আদেশ করলেন, "উটটিকে হত্যা কর। কারণ এটা শয়তান।" একথা বলেই তিনি এমন ভীমবেগে আক্রমণ রচনা করলেন যে, "শান্তি! শান্তি!!" "বাঁচাও! বাঁচাও!!" বলে চারিদিক থেকে চিৎকার উঠেছিল। উটটির নিকটবর্তী হয়ে উহাকে হত্যা করার জন্য তিনি বুজায়র ইবনে দুলজাকে নির্দেশ দিলেন। বুজায়র তৎক্ষণাৎ এমন সজোরে আঘাত করলো যে উটটির বুক মাটিতে লেগে গেল। উটটি পড়ে যাওয়া মাত্রই শত্রুপক্ষ আয়শাকে একাকী ও নিরাপত্তাহীন অবস্থায় ফেলে পলায়ন করলো। সঙ্গে সঙ্গে আমিরুল মোমেনিনের অনুচরগণ আয়শাকে বহনকারী হাওদা নিয়ন্ত্রণে নিয়ে গেল। আমিরুল মোমেনিনের নির্দেশে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর (আয়শার ভ্রাতা) আয়শাকে মাফিয়া বিনতে হারিসের ঘরে নিয়ে গেল।

৩৬ হিজরী সনের ১০ই জমাদি-উস-সানী দ্বিপ্রহরে জামালের যুদ্ধ শুরু হয়েছিল এবং একই দিন সন্ধ্যায় সমাপ্ত হয়েছিল। এ যুদ্ধে আমিরুল মোমেনিনের বাইশ হাজার সৈন্যের মধ্যে এক হাজার সত্তর জন (মতান্তরে পাঁচ শতজন) শহীদ হয়েছিল এবং আয়শার ত্রিশ হাজার সৈন্যের মধ্যে সতের হাজার নিহত হয়েছিল। (কুতায়বাহ্[৪৭], তাবারী[৭৫], মাসুদী[১০৯], রাব্বিহ্[১১৮])।

২। হাদীদ [১৫২] লিখেছেন, আমিরুল মোমেনিনের ভবিষদ্বাণী অনুযায়ী বসরায় দু'বার বন্যা হয়েছিল—একবার কাদির বিল্লাহ্‌র রাজত্বকালে এবং আরেকবার আল-কাইম বি আমরিল্লাহ্‌র রাজত্বকালে। উভয় বন্যায় বসরা নগরী এমনভাবে পানিতে ডুবে গিয়েছিল যে, শুধুমাত্র মসজিদের মিনার ভাসমান পাখীর মতো দেখা গিয়েছিল।

★★★★★

খোৎবা-১৪

বসরাবাসীদের প্রতি ভর্ৎসনা

তোমাদের মাটি সমুদ্রের নিকটবর্তী এবং আকাশ হতে অনেক দূরে। তোমাদের বোধশক্তি খুবই ক্ষীণ, ধৈর্য মূর্খতাপূর্ণ এবং তোমাদের মন পাপে পূর্ণ। তোমরা তীরন্দাজের লক্ষ্যবস্তু, খাদকের গ্রাস এবং শিকারীর সহজলভ্য শিকার।

★★★★★

খোৎবা-১৫

উসমান ইবনে আফফান কর্তৃক অনুদানকৃত ভূমি পুনঃগ্রহণ করার পর বলেন

আল্লাহ্‌র কসম, যদিও আমি দেখেছিলাম এ অর্থ দ্বারা নারী বিয়ে করা যায় অথবা ক্রীতদাসী ক্রয় করা যায় তবুও আমি উহা ফেরত প্রদান করতাম। আমি এ কারণে উহা গ্রহণ করেছিলাম যে, এতে ন্যায় বিচার বিধান করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। যদি কেউ ন্যায় কাজ করাকে কঠিন মনে করে তবে অন্যায় কাজ করাকে অধিকতর কঠিন মনে করা উচিত।

★★★★★

খোৎবা-১৬

মদিনায় তাঁর হাতে বায়াত গ্রহণের পর এ ভাষণ দেন

আমি যা বলি উহার দায়-দায়িত্বের নিশ্চয়তা আমার এবং সে জন্য আমিই জবাবদিহি করবো। যার নিকট অতীতের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির (আল্লাহ্‌ কর্তৃক প্রদত্ত) অভিজ্ঞতা পরিষ্কারভাবে প্রকাশ করা হয়ে থাকে, সন্দেহে পতিত হওয়া থেকে তাকওয়া তাকে বিরত রাখে। জেনে রাখো, রাসুলের (সঃ) আগমন কালে যেসব বিপদাপদ বিরাজমান ছিল সেসব আবার ফিরে এসেছে।

সে-ই আল্লাহ্‌র কসম, যিনি সত্যের সাথে রাসুলকে পাঠিয়েছেন, তোমরা মারাত্মকভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে, চালনি দিয়ে চালার মত আলোড়িত হবে এবং রান্না করার পাত্রে চামচ দিয়ে মিশানোর মত সম্পূর্ণরূপে মিশ্রিত হয়ে যাবে। কারণ তোমাদের নীচু শ্রেনীর লোকেরা উচ্চ মর্যাদা লাভ করেছে এবং উচ্চ শ্রেনীর লোকেরা হতমান হয়ে পড়েছে, তোমাদের পেছনে-পড়া লোকেরা অগ্রগামী হয়েছে এবং অগ্রগামীগণকে পেছনে ফেলে রাখা হয়েছে। আল্লাহ্‌র কসম, আমি একটা শব্দও গোপন করিনি বা কোন মিথ্যা কথা বলিনি। এ ঘটনা এবং এ সময় সম্পর্কে আমাকে অবহিত করা হয়েছে।

সাবধান, পাপ হলো অবাধ্য ঘোড়ার মত। সেই ঘোড়ার ওপর উহাদের আরোহীকে সওয়ার করিয়ে দেয়া হয়েছে এবং উহাদের লাগামও ঢিলা করে দেয়া হয়েছে। সুতরাং সেই ঘোড়া আরোহীসহ দোযখে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। মনে রেখো, তাকওয়া হলো অনুগত ঘোড়ার মত। উহাদের ওপর আরোহীকে সওয়ার করিয়ে দিয়ে লাগাম হাতে ধরিয়ে দেয়া হয় যাতে উহারা আরোহীকে বেহেশতে নিয়ে যেতে পারে। পৃথিবীতে ন্যায় আছে, অন্যায়ও আছে এবং উভয়ের অনুসারীও আছে। যদি অন্যায় প্রাধান্য বিস্তার করে (অতীতে এমনই ছিল) এবং সত্য লাঞ্চিত হয় (যা প্রায়শই ঘটেছে) তাহলে মানুষ যথার্থ পথে অগ্রসর হতে পারে না। একবার পেছনে পড়ে গেলে, সামনে এগিয়ে আসতে পেরেছে এমন ঘটনা বিরল।

যাদের চিন্তা-চেতনায় বেহেশ্‌ত ও দোযখ দৃশ্যমান তাদের অন্য কোন লক্ষ্য থাকে না। যে ব্যক্তি প্রচেষ্টা চালিয়ে যায় ও দ্রুত কর্মসাধন করে সে নাজাত পায় এবং যে ব্যক্তি সত্যের অনুসন্ধানকারী সে ধীর হলেও আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের আশা পোষণ করতে পারে। আর যে ব্যক্তি কর্মসাধন করে না সে দোযখে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ডানে ও বামে বিভ্রান্তিকর পথ রয়েছে। শুধুমাত্র মধ্যবর্তী পথই যথার্থ যা রয়েছে চিরস্থায়ী গ্রন্থে ও রাসুলের তরিকায়। সে পথ থেকেই সুন্নাহ্‌ প্রসার লাভ করেছে এবং পরিণামে সে দিকেই প্রত্যাবর্তন।

যে ব্যক্তি অন্য পথ অবলম্বন করে সে ধ্বংসপ্রাপ্ত এবং যে মিথ্যা আরোপ করে সে হাতাশাগ্রস্ত। যে ব্যক্তি মুখে ন্যায়ের বিরোধিতা করে সে ধ্বংস হয়ে যায়। নিজেকে না জানাই একজন লোকের যথেষ্ট অজ্ঞতা। যার তাকওয়ার ভিত্তি শক্তিশালী[১] সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না এবং তাকওয়ার ভিত্তিতে করা চাষাবাদ কখনো পানিবিহীন থাকে না। তোমরা নিজেদেরকে ঘরের মধ্যে লুকিয়ে ফেল এবং সংস্কার কর। অতীতের জন্য তওবা কর। নিজেকে তিরস্কার করে কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র প্রশংসা কর।

১। তাকওয়া মানে হৃদয় ও মন আল্লাহ্‌র মহিমা ও মহত্ত্বে আপ্লুত হওয়া যার ফলে আল্লাহ্‌র ভয়ে মানুষের হৃদয় পরিপূর্ণ থাকে এবং এ অবস্থার অনিবার্য ফল হলো ইবাদতে নিমগ্নতা বৃদ্ধি পাওয়া। আল্লাহ্‌র ভয়ে হৃদয় পরিপূর্ণ থাকবে অথচ কাজে

কর্মে উহার বহিঃপ্রকাশ ঘটবে না, এটা একেবারেই অসম্ভব। যেহেতু ইবাদত ও আনুগত্য হৃদয়কে সংস্কার করে ও চেতনাকে পরিশুদ্ধ করে সেহেতু ইবাদত বৃদ্ধি পেলে হৃদয়ের পবিত্রতাও বৃদ্ধি পায়। সে জন্যই পবিত্র কুরআনে 'তাকওয়া' দ্বারা কখনো ভয়, কখনো ইবাদত ও ধ্যান এবং কখনো হৃদয় ও চেতনার পবিত্রতা বুঝানো হয়েছে। যেমন-

(১) আনা ফাত্তাকুন (সুতরাং আমাকে ভয় কর-১৬ : ২-এখানে তাকওয়া অর্থ ভয় করা।

(২) ইত্তাকুল্লাহা হাক্কা তুকাতিহি (আল্লাহ্‌র ইবাদত কর কারণ তিনিই ইবাদতের যোগ্য-৩ : ১০২-এখানে তাকওয়া অর্থ ইবাদত ও আরাধনা।

(৩) ওয়া ইয়াখ্‌শাল্লাহা ওয়া ইত্তাক্‌হি ফাউলায়েকা হুমুল ফায়েজুন (২৪ : ৫২) -এখানে তাকওয়া দ্বারা চেতনার পবিত্রতা ও হৃদয়ের পরিচ্ছন্নতা বুঝানো হয়েছে।

হাদীস অনুযায়ী তাকওয়ার তিনটি স্তর রয়েছে। প্রথমতঃ আদেশ পালন করতে হবে এবং নিষেধাজ্ঞা হতে নিজকে দূরে রাখতে হবে। দ্বিতীয়তঃ সুপারিশকৃত বিষয় অনুসরণ করতে হবে এবং অপছন্দকৃত বিষয় বাদ দিতে হবে। তৃতীয়তঃ সন্দেহযুক্ত বিষয় অনুমোদিত হলেও বাদ দিতে হবে। প্রথম স্তর সাধারণ মানুষের জন্য, দ্বিতীয় স্তর মহৎ ব্যক্তির জন্য এবং তৃতীয় স্তর উচ্চ-মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তির জন্য।

আমিরুল মোমেনিন বলেন যে, তাকওয়া ভিত্তিক কর্ম স্থায়ী হয়। যে কর্মে তাকওয়ার জল সিঞ্চন করা হয় উহা ফুলে ফলে সুশোভিত হয় কারণ কেবলমাত্র আনুগত্যের অনুভূতি থাকলেই প্রকৃত ইবাদত হয়। অনুরূপভাবে জ্ঞান ও দৃঢ় প্রত্যয় ভিত্তিক না হলে ইমান ভিতবিহীন ইমারতের মত যার কোন স্থায়িত্ব নেই।

★★★★★

খোৎবা-১৭

অযোগ্য ব্যক্তি কর্তৃক মানুষের মধ্যে ন্যায়ের বিধান প্রয়োগ সম্পর্কে

মানুষের মধ্যে দু'ব্যক্তিকে[১] আল্লাহ্ অতিশয় ঘৃণা করেন। এদের একজন হলো সে যে আত্মস্বার্থ চরিতার্থ করতে ব্যস্ত থাকে। সে ব্যক্তি সত্যপথ থেকে সরে চলে এবং মিথ্যা কোন কিছু উদ্ভাবন করে বলে বেড়াতে আনন্দ পায়। সে ব্যক্তি মানুষকে ভুল পথের দিকে আমন্ত্রণ জানায়। যারা তার প্রতি অনুরক্ত হয় তাদের জন্য সে অত্যন্ত ক্ষতিকর। সে নিজেই তার পূর্ববর্তীগণের নির্দেশিত পথ থেকে সরে গিয়ে বিপথে পরিচালিত। কাজেই সে জীবদ্দশায় তার অনুসারীদের গোমরাহীর দিকে পরিচালিত করে এবং মৃত্যুর পর নিজের ও অনুসারীদের পাপের বোঝা বহন করে।

অপর ব্যক্তি সে যাকে মূর্খতা ও অজ্ঞতা ঘিরে আছে। সে অজ্ঞদের মাঝেই চলাফেরা করে এবং সে অমঙ্গল বিষয়ে জ্ঞানহীন ও শান্তিপূর্ণ অবস্থার সুবিধা সম্পর্কে অন্ধ। সাধারণ মানুষ তাকে পন্ডিত মনে করে কিন্তু আসলে সে তা নয়। সে অতি প্রত্যুষে এমন কিছু সংগ্রহ করতে বেরিয়ে পড়ে যার প্রাচুর্য থেকে স্বল্পতা অনেক ভাল। সে দূষিত পানি দ্বারা তৃষ্ণা নিবারণ করে এবং যা অর্জন করে তা অর্থহীন।

জনগণের নিকট যা বিভ্রান্তিকর বলে মনে হয় উহার সমাধান দেয়ার দায়িত্ব নিয়ে সে বিচারকের আসনে বসে। যদি কোন দ্ব্যর্থক সমস্যা তার সামনে তুলে ধরা হয় তবে সে তার মনগড়া খোড়া যুক্তি দাঁড় করিয়ে উহার ভিত্তিতে রায় প্রদান করে। এভাবে সে ন্যায়-অন্যায় ও সত্য-মিথ্যা না বুঝে মাকড়সার জালের মত সন্দেহ ও ভ্রান্তির জালে জড়িয়ে পড়ে। যখন সে সঠিক কাজ করে তখন সে ভয় করে পাছে ভুল হয়ে গেল কিনা। আবার যখন সে ভুল করে তখন মনে করে সে ঠিকই করেছে। সে জাহেল, অজ্ঞতার মাঝেই ধ্বংস খুঁজে বেড়াচ্ছে এবং সে এমন বাহনের সওয়ার যা লক্ষ্যহীনভাবে অন্ধকারে চলছে। মজবুত দাঁত দ্বারা সে কখনো জ্ঞানকে আঁকড়ে ধরেনি। সে হাদীসকে এমন বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে দেয় যেন বাতাস শুকনো পাতাকে ছড়িয়ে ফেলে।

আল্লাহ্‌র কসম, যেসব সমস্যা তার কাছে আসে সেগুলোর সমাধান দেয়ার মত যোগ্যতা তার নেই এবং যে মর্যাদাকর অবস্থানে তাকে অধিষ্ঠিত করা হয়েছে উহার উপযুক্ত সে নয়। যা কিছু সে জানে না উহা জানার দরকার

বলেও সে মনে করে না। এ কথা সে অনুভব করতে পারে না যে, যা তার নাগালের বাইরে তা অন্যের নাগালের মধ্যে হতে পারে। যে বিষয় তার কাছে অস্পষ্ট মনে হয় সে বিষয়ে সে নিশ্চুপ থাকে কারণ সে নিজের অজ্ঞতা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। হারানো জীবনগুলো তার অন্যায় রায়ের বিরুদ্ধে চিৎকার দিচ্ছে এবং সম্পদরাজী (যা অন্যায়ভাবে হস্তান্তর করা হয়েছে) তার বিরুদ্ধে অসন্তোষভরে বিড়বিড় করছে।

যে সব লোক জীবনে অজ্ঞ ও মৃত্যুতে বিপথগামী তাদের বিরুদ্ধে আমি আল্লাহ্র কাছে ফরিয়াদ করি। তাদের কাছে কুরআন অপেক্ষা মূল্যহীন আর কিছু নেই—কুরআনের আয়াত যথাস্থান হতে সরিয়ে ফেলা অপেক্ষা মূল্যবান কিছু নেই—ধার্মিকতা অপেক্ষা খারাপ কিছু নেই–পাপ অপেক্ষা সুনীতিসম্পন্ন কিছু নেই।

১। আমিরুল মোমেনিন দু'শ্রেণীর লোককে আল্লাহ্র অপছন্দনীয় ও জনগণের মধ্যে নিকৃষ্ট মনে করেছেন। প্রথমতঃ যারা মৌলিক বিষয়েও বিপথগামী এবং মন্দ বা পাপ ছড়াবার কাজে ব্যস্ত। দ্বিতীয়তঃ যারা কুরআন ও সুন্নাহ্কে পরিত্যাগ পূর্বক নিজের ইচ্ছামত বিধি-নিষেধ জারী করে। তারা তাদের অনুরাগীর একটা পরিমন্ডল তৈরী করে নেয় এবং তাদের নিজেদের বানানো ধর্মীয় বিধান জনপ্রিয় করে তোলে। এসব লোকের বিপথগামীতা ও ভ্রান্তি তাদের নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। বিপথগামীতার যে বীজ তারা বপন করে তা প্রকান্ড গাছে পরিণত হয়ে ফল দেয় এবং বিপথগামীদের আশ্রয় প্রদান করে। এভাবে বিপথগামীর সংখ্যা বেড়েই চলে। যেহেতু এসব লোক ভ্রান্তি ও বিপথ সৃষ্টির হোতা সেহেতু অন্যদের পাপের বোঝা এরাই বহন করবে। কুরআন বলে ঃ

এবং নিশ্চয়ই তারা তাদের পাপের বোঝা বহন করবে এবং নিজেদের বোঝার সাথে অন্যের বোঝাও (২৯ :১৩)।

★★★★★

খোৎবা-১৮

ফেকাহ্‌বিদগণের মধ্যে অমর্যাদাকর মতদ্বৈধতা[১] সম্পর্কে

তাদের কোন একজনের কাছে যখন একটা সমস্যা উপস্থাপন করা হয় তখন সে অনুমান ভিত্তিক রায় প্রদান করে। একই সমস্যা যখন তাদের অন্য একজনের কাছে উপস্থাপন করা হয় তখন সে আগের জনের রায়ের বিপরীত সিদ্ধান্ত প্রদান করে। এ বিচারকদ্বয় যখন তাদের পরস্পরবিরোধী সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রধান বিচারকের কাছে যায় (যিনি প্রথমোক্তগণকে নিয়োগ করেছিলেন) তখন তিনি উভয়ের সিদ্ধান্তকেই সমর্থন ও অনুমোদন করেন। অথচ তাদের সকলের আল্লাহ্ এক, রাসুল এক ও পবিত্র গ্রন্থ এক।

তাদের এহেন মত পার্থক্যের কারণ কি? এটা কি এ জন্য যে, আল্লাহ্ তাদেরকে মতদ্বৈধতা করতে নির্দেশ দিয়েছেন আর তারা তা পালন করছে? অথবা তিনি মতদ্বৈধতা করতে নিষেধ করেছেন কিন্তু তারা তাঁর অবাধ্যতা করছে? অথবা আল্লাহ্ একটা অসম্পূর্ণ দ্বীন পাঠিয়েছেন এবং এখন তা সম্পূর্ণ করতে তাদের সহায়তা চান? অথবা এসব বিষয়ে তারা কি আল্লাহ্র অংশীদার যে, ভিন্ন ভিন্ন মত তুলে ধরা তাদের কর্তব্য আর তা সমর্থন করা আল্লাহ্র কর্তব্য? অথবা এটা কি এমন যে, মহিমান্বিত আল্লাহ্ পরিপূর্ণ দ্বীন প্রেরণ করেছেন কিন্তু রাসুল (সঃ) তা পরিপূর্ণভাবে মানুষের নিকট পৌছে দিতে পারেননি? বস্তুতঃ মহামহিম আল্লাহ্ বলেন ঃ

"আমরা এ কিতাবে কোন কিছুই বাদ দেই নি" (কুরআন-৬ ঃ ৩৮)। আল্লাহ্ আরো বলেন যে, কুরআনে প্রত্যেক বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে এবং কুরআনের এক অংশ অন্য অংশকে সত্যায়ন করে এবং কুরআনে কোন এখতেলাপ (অপসরণ) নেই। আল্লাহ্ বলেন ঃ

> *এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো কাছ থেকে এ কিতাব এলে তারা নিশ্চয়ই এতে অনেক গরমিল দেখতে পেতো (কুরআন-৪ ঃ ৮২)।*

নিশ্চয়ই কুরআনের বাহ্যিক দিক বিস্ময়কর এবং এর অভ্যন্তর দিক গভীর অর্থবোধক। কুরআনের বিস্ময় কখনো হারিয়ে যাবে না। এবং এর রহস্য কখনো বিলুপ্ত হবে না। কুরআনের জটিল বিষয়গুলো কুরআন (কুরআনিক জ্ঞান) ব্যতীত কেউ সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারবে না।

১। এটা একটা বিতর্কিত বিষয় যে, কোন বিষয়ে ধর্মীয় বিধানে স্পষ্ট কিছু বলা না থাকলে বাস্তব ক্ষেত্রে উহা নিস্পত্তির উপায় সম্পর্কে কোন আদেশ-নির্দেশ আছে কিনা। আবুল হাসান আশারী ও তার শিক্ষক আবু আলী যুব্বাই যে মত পোষণ করেন তা হলো, এরূপ বিষয়ে আল্লাহ্ কোন নির্দিষ্ট কর্মপদ্ধতির আদেশ দান করেননি তবে গবেষণা করে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে তদ্বিষয়ে রায় প্রদানের ক্ষমতা শাস্ত্রজ্ঞগণের ওপর অর্পণ করা হয়েছে যাতে করে যা তারা নিষিদ্ধ বলবেন তা নিষিদ্ধই মনে করতে হবে এবং যা তারা অনুমোদন করবেন তা জায়েজ মনে করতে হবে। এসব শাস্ত্রজ্ঞগণের একজনের অভিমত যদি অন্যজনের বিপরীত হয় তবে একই বিষয়ে যতগুলো রায় পাওয়া যাবে উহার প্রত্যেকটি চূড়ান্ত ও সঠিক বলে মেনে নিতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ, যদি একজন শাস্ত্রজ্ঞ রায় দেন যে, যবের সীরা হারাম এবং অন্যজন বলেন এটা হালাল তবে এটাকে হারাম ও হালাল উভয়ই মেনে নিতে হবে। অর্থাৎ যে এটাকে হারাম মনে করবে তার জন্য হারাম আর যে হালাল মনে করবে তার জন্য হালাল। শাহরাস্তানী [১৩৪] লিখেছেন ঃ

> *একদল চিন্তাবিদ মনে করেন যে, কোন বিষয়ে ইজতিহাদ (গবেষণা) করার অনুকূলে কোন স্বতঃসিদ্ধ মতবাদ নেই। কিন্তু মুজতাহিদ (গবেষক) কোন বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তা-ই আল্লাহ্র আদেশ, কারণ মুজতাহিদের রায়ের ওপর আল্লাহ্র অভিপ্রায়ের অবধারণ নির্ভর করে। যদি এমনটি না হতো তবে রায়ের মোটেই কোন প্রয়োজন থাকতো না। এ মতানুযায়ী প্রত্যেক মুজতাহিদ তার মতামতে সঠিক ও শুদ্ধ (পৃঃ ৯৮)।*

এক্ষেত্রে মুজতাহিদগণকে সকল ভুলের উর্দ্ধে বলে মনে করা হচ্ছে। কারণ তখনই ভুল সংঘটিত হয়েছে বলে মনে করা যায় যখন বাস্তবতার বিপরীতে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। যেখানে রায়ের বাস্তব অস্তিত্ব নেই সেখানে ভুল হয়েছে মনে করা অর্থহীন। তাছাড়া মুজতাহিদকে তখনই ভুল-ভ্রান্তির উর্দ্ধে মনে করা যাবে যখন ধরে নেয়া হবে যে, আল্লাহ্ তাদের সকল মতামত জ্ঞাত হয়ে অনেকগুলো চূড়ান্ত আদেশ দান করেছেন যার ফলে তাদের প্রত্যেকের অভিমত কোন না কোন আদেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। অথবা আল্লাহ্ এ মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করেছেন যে, মুজতাহিদগণের যে কোন সিদ্ধান্ত আল্লাহ্র নির্দেশ বহির্ভূত হয় না। অথবা দৈবক্রমে তাদের প্রত্যেকের অভিমত কোন না কোন ঐশী নির্দেশের সাথে মিলে যায়।

ইমামিয়া দলের অবশ্য ভিন্ন মতবাদ আছে। তারা মনে করে ধর্মীয় বিধি-বিধান প্রনয়নের অধিকার আল্লাহ্ কাউকে অর্পণ করেননি বা কোন বিষয়কে মুজতাহিদদের অভিমতের অধীন করে দেননি বা তাদের মতদ্বৈধতা সমন্বয় করার জন্য বিভিন্ন বাস্তব আদেশ দান করেননি। অবশ্য, যদি মুজতাহিদ একটা বাস্তব আদেশে উপনীত হতে না পারে তখন সে গবেষণা ও অনুসন্ধান করে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তা মেনে আমল করা তার নিজের ও তার অনুসারীদের জন্য যথেষ্ট। মুজতাহিদের এহেন সিদ্ধান্ত প্রকৃত আদেশের বিকল্প হিসেবে ধরে নেয়া যায়। এক্ষেত্রে প্রকৃত আদেশ হতে সরে যাবার জন্য সে ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে কারণ সে মুক্তা আহরণের জন্য তার সাধ্যমত গভীর সমুদ্রে ডুব দিয়েছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় সে মুক্তার বদলে ঝিনুক পেয়েছে। সে মানুষকে একথা বলে না যে, সে যা পেয়েছে উহাই মুক্তা হিসেবে গ্রহণ করতে হবে বা সে ঝিনুককে মুক্তা বলে বিক্রি করে না। এটা ভিন্ন কথা যে, আল্লাহ্ তার প্রচেষ্টার প্রতিদান প্রদান করতে পারেন কারণ কোন প্রচেষ্টাই বৃথা যায় না।

বিশুদ্ধতা-মতবাদ যদি মেনে নেয়া হয় তাহলে প্রত্যেক রায় ও অভিমত শুদ্ধ বলে গ্রহণ করতে হবে। হুসায়েন মাবুদী তার ফাওয়াতিহ্ গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

> *এ বিষয়ে আশারীর অভিমত সঠিক। তার অভিমত অনুযায়ী পরস্পরবিরোধী সিদ্ধান্তের সব ক'টিই সঠিক। সাবধান, শাস্ত্রজ্ঞদের সম্পর্কে কোন খারাপ ধারণা পোষণ করো না এবং তাদের প্রতি কখনো কুবাক্য প্রয়োগ করো না।*

যখন পরস্পরবিরোধী মতবাদ ও বিপথগামী অভিমতকে শুদ্ধ বলে গ্রহণ করা হয় তখন কতেক বিশিষ্ট ব্যক্তির কর্মকান্ডকে সিদ্ধান্তের ভুল বলে ব্যাখ্যা দেয়া অদ্ভুত ব্যাপার। কারণ মুজতাহিদের সিদ্ধান্তের ভুল কল্পনাই করা যায় না। যদি

বিশুদ্ধতা-মতবাদ মেনে নেয়া হয় তাহলে মুয়াবিয়া ও আয়শার কর্মকান্ডগুলো সঠিক বলে ধরে নিতে হয়। যদি তাদের কর্মকান্ড ভুল বলে মনে করা হয় তাহলে মেনে নিতে হবে যে, ইজতিহাদও ভুল হতে পারে। কাজেই বিশুদ্ধতা-মতবাদও ভুল। যা হোক, বিশুদ্ধতা-মতবাদ প্রচারিত হয়েছিল ভুলকে ধামাচাপা দেয়ার জন্য এবং এ মতবাদকে আল্লাহ্র আদেশের সাথে জড়িয়ে দেয়া হয়েছে যেন উদ্দেশ্য হাসিলে কোন বাধা না আসে বা কোন কুকর্মের বিরুদ্ধে যেন কেউ কোন কথা না বলতে পারে।

এ খোৎবায় আমিরুল মোমেনিন সে সব লোকের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যারা আল্লাহ্র পথ হতে সরে পড়ে, আলোতে চোখ বুঁজে কল্পনার অন্ধকারে হাতড়িয়ে বেড়ায়, ইমানকে অভিমত ও সিদ্ধান্তের শিকারে পরিণত করে, নতুন রায় ঘোষণা করে, নিজেদের কল্পনার ওপর ভিত্তি করে আদেশ জারী করে এবং বিপথগামী ফলাফল সৃষ্টি করে। তৎপর তারা বিশুদ্ধতা-মতবাদের ভিত্তিতে সকল বিপরীত ও বিপথগামী আদেশকে আল্লাহ্ হতে প্রাপ্ত বলে চালিয়ে দেয়। এ মতবাদকে মিথ্যা প্রমাণ করে আমিরুল মোমেনিন বলেন ঃ

(১) যেখানে আল্লাহ্ এক, রাসুল এক ও কুরআন এক সেখানে অনুসরণীয় ধর্মও এক হতে হবে। যখন ধর্ম এক তখন তাতে একটা বিষয়ে বিভিন্ন আদেশ থাকবে কেমন করে? একটা আদেশে বিভিন্নতা থাকতে পারে শুধুমাত্র তখন, যখন আদেশদাতা তার আদেশ ভুলে যায় অথবা বিস্মরণশীল হয় অথবা জ্ঞানহীনতা তাকে আঁকড়ে ধরে অথবা তিনি ইচ্ছা করে গোলক ধাঁধাঁয় জড়িয়ে পড়েন। কিন্তু আল্লাহ্ ও রাসুল এসব কিছুর উর্দ্ধে। সুতরাং বিভিন্নতা ও বিপথগামীতা তাঁদের প্রতি আরোপ করা যায় না। এসব বিভিন্নতা বরং তাদের চিন্তা ও অভিমতের ফল যারা নিজেদের কল্পনাপ্রসূত কর্মপদ্ধতি দ্বারা দ্বীনের সহজ পথে জটিলতার সৃষ্টি করে।

(২) এসব বিপথ হয় আল্লাহ্ নিষিদ্ধ করেছেন না হয় এগুলো সৃষ্টির জন্য তিনি আদেশ দিয়েছেন। যদি তিনি এগুলোর অনুকূলে কোন আদেশ দিয়ে থাকেন তবে তা কোথায়, কোন্খানে আছে। এগুলো নিষিদ্ধকরণ সম্পর্কে কুরআন বলে ঃ

বল, আল্লাহ্ কি তাঁর সম্বন্ধে মিথ্যারোপ করতে তোমাদের অনুমতি দিয়েছেন? (১০ : ৫৯)

আল্লাহ্র আদেশ অনুযায়ী না হলে সবকিছুই বানোয়াট উদ্ভাবন বই কিছু নয় এবং এহেন বানোয়াট উদ্ভাবন নিষিদ্ধ। যারা বানোয়াটকারী পরকালে তাদের কোন কৃতকার্যতা ও কল্যাণ নেই। আল্লাহ্ বলেন ঃ "তোমাদের জিহবা মিথ্যারোপ করে বলে আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যারোপ করার জন্য 'এটা হালাল এবং ওটা হারাম'-বলো না। আল্লাহ্ সম্বন্ধে যারা মিথ্যা উদ্ভাবন করে তারা সফলকাম হয় না" (কুরআন -১৬ : ১১৬)।

(৩) আল্লাহ্ যদি দ্বীনকে অসম্পূর্ণ রাখতেন এবং সে অসম্পূর্ণতার কারণ যদি এটা হতো যে, ধর্মীয় বিধান সম্পূর্ণ করতে তিনি মানুষের সহায়তা এবং বিধান প্রণয়নে তাঁর সাথে মানুষের অংশগ্রহণ আশা করেছিলেন, তাহলে এহেন বিশ্বাস বহু-আল্লাহ্বাদ ছাড়া আর কিছুই নয়। আর যদি আল্লাহ্ পূর্ণাকারে দ্বীনের বিধান প্রেরণ করে থাকেন তা হলে রাসুল তা সঠিকভাবে মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে ব্যর্থ হয়েছেন যে জন্য অন্যদের কল্পনা ও মতামত প্রয়োগের সুযোগ রয়েছে। এমন ধারণায় রাসুলের দুর্বলতা বুঝায় এবং রাসুল হিসেবে তাঁর মনোনয়নের প্রতি এটা কলঙ্কারোপ (নাউজুবিল্লাহ্)।

(৪) পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ বলেছেন যে, তিনি কুরআনে কোন কিছুই বাদ দেননি এবং প্রতিটি বিষয় তাতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এখন যদি কোন আদেশ কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক করে বক্র করা হয় তবে তা হবে ধর্মের বিধি বহির্ভূত। এহেন বক্রতার ভিত্তি জ্ঞান বা কুরআন ও সুন্নাহ্ হতে পারে না। এটা কারো ব্যক্তিগত অভিমত বা বিচার-বিবেচনা হতে পারে যা ধর্ম ও ইমানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে গ্রহণ করা যায় না।

(৫) কুরআন ধর্মের উৎস ও ভিত্তি এবং শরিয়তের আইনের ঝরণাধারা। যদি শরিয়তের বিধানে মতদ্বৈধতা থাকতো তাহলে কুরআনেও তা থাকতো। কুরআনে মতদ্বৈধতা থাকলে তা আল্লাহ্র বাণী বলে গ্রহণ করা যেতো না। যেহেতু কুরআন আল্লাহ্র বাণী বলে সর্ব স্বীকৃত সেহেতু শরিয়তের বিধানে কোন মতদ্বৈধতা থাকতে পারে না।

★★★★★

খোৎবা-১৯

কুফার মসজিদের মিম্বার থেকে আমিরুল মোমেনিন খোৎবা প্রদান করছিলেন। এমন সময় আশআছ ইবনে কায়েস[১] বাধা দিয়ে বললো, "হে, আমিরুল মোমেনিন, এ কথা আপনার অনুকূলে নয়, বরং আপনার বিরুদ্ধে যাবে।"[২]

আমিরুল মোমেনিন রাগত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ

তুমি কি করে জান কোন্ বিষয় আমার অনুকূলে আর কোন্‌টি আমার প্রতিকূলে। আল্লাহ্ ও অভিশাপকারীদের অভিশাপ তোমার ওপর। তুমি তাঁতির পুত্র তাঁতি। তুমি একজন মোশরেকের পুত্র এবং নিজেও একজন মোনাফিক। তুমি মোশরেক থাকাকালে একবার এবং ইসলাম গ্রহণের পর আরেকবার গ্রেফতার হয়েছিলে। তোমার সম্পদ ও জন্ম পরিচয় তোমাকে রক্ষা করতে পারেনি। যে ব্যক্তি নিজের লোকজনকে তরবারির নীচে ঠেলে দিয়ে তাদের মৃত্যু ও ধ্বংসের ফন্দি আঁটে সে নিকটবর্তীগণের ঘৃণা আর দূরবর্তীজনের অবিশ্বাসেরই যোগ্য।

১। আশআছ ইবনে কায়েসের আসল নাম সা'দি কারিব এবং লকব আবু মুহাম্মদ। তার অবিন্যস্ত চুলের জন্য সে আশআছ নামেই সমধিক পরিচিত। নবুয়ত প্রকাশের পর সে একবার তার গোত্রের লোকজন নিয়ে মক্কায় এসেছিল। রাসুল (সঃ) তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কিন্তু তারা সকলেই ইসলাম গ্রহণ না করেই ফিরে গিয়েছিল। হিজরতের পর যখন ইসলাম প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল এবং দলে দলে লোক মদিনায় আসতেছিল তখন আশআছ বনি কিন্‌দাহ্‌র সাথে রাসুলের নিকট হাজির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। বার[৯৭] লিখেছেন যে, রাসুলের (সঃ) তিরোধানের পর এ লোকটি ইসলাম ত্যাগ করে মোশরেক হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আবু বকরের খেলাফতকালে তাকে বন্দী করে মদিনায় আনা হলে সে পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করেছিল। এবারও তার ইসলাম গ্রহণ লোক দেখানো বই কিছু নয়। আবদুহ্[৭] লিখেছেন ঃ

> *রাসুলের সাহাবিদের মধ্যে আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই ইবনে সালুল যেমন ছিল, আলীর সাথীগণের মধ্যেও আশআছ তদ্রূপ ছিল। এরা দুজনই কুখ্যাত মোনাফিক ছিল।*

ইয়ারমুকের যুদ্ধে আশআছ তার একটা চোখ হারিয়েছিল। কুতায়বাহ[৪৮] তাকে একচোখওয়ালা লোকদের তালিকার অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। আশআছের গোত্রের লোকেরা তাকে নাম দিয়েছিল "উরফ্-আন-নার" অর্থাৎ বিশ্বাসঘাতক। ইয়ামামার যুদ্ধে সে ফন্দি করে তার গোত্রকে খালেদ ইবনে অলিদ দ্বারা আক্রান্ত করিয়েছিল। সে আবু বকরের বোন উম্মে ফারওয়াহর তৃতীয় স্বামী হিসেবে তাকে বিয়ে করেছিল। ফারওয়াহ্‌র প্রথম স্বামী ছিল আল-আজদি এবং দ্বিতীয় স্বামী ছিল তামীম যারিমী। জীবনী গ্রন্থসমূহে দেখা যায় ফারওয়াহ্ অন্ধ ছিল এবং তার গর্ভে তিনটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করেছিল। তারা হলো-মুহাম্মদ, ইসমাঈল ও ইসহাক। হাদীদ[১৫২] আবুল ফারাজের উদ্ধৃতি দিয়ে যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে দেখা যায় আলীকে নিহত করার বিষয়ে আশআছও সমভাবে জড়িত। তিনি লিখেছেন ঃ

> *আলীকে নিহত করার রাতে ইবনে মুলজাম আশআছ ইবনে কায়েসের নিকট এসেছিল। উভয়ে আলাদাভাবে মসজিদের এক কোণে চুপচাপ বসেছিল। হাজর ইবনে আদি তাদের পাশ দিয়ে যেতে শুনতে পেলো আশআছ মুলজামকে বলছে, "তাড়াতাড়ি কর; না হয় ভোরের আলো তোমার প্রতি নির্দয় হতে পারে।" এ কথা শুনে হাজর আশআছকে বললো, ওহে এক চোখা লোক, তুমি আলীকে নিহত করার পরিকল্পনা করছো।" এ বলেই হাজর তাড়াতাড়ি আলীর দিকে এগিয়ে যেতে লাগল কিন্তু ইবনে মুলজাম হাজরের আগেই দৌড়ে গিয়ে আলীকে আঘাত করেছিল।*

এই আশআছের কন্যাই ইমাম হাসানকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করেছিল। মাসুদী[১০৯] লিখেছেন ঃ

> *ইমাম হাসানের স্ত্রী জায়েদাহ্ বিনতে আশআছ মুয়াবিয়ার ষড়যন্ত্রে ইমামকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করেছিল। এক লক্ষ দিরহাম ও ইয়াজিদের সাথে বিয়ে দেয়ার কথা বলে মুয়াবিয়া জায়েদাহ্‌কে প্রলুব্ধ করেছিল (২য় খন্ড, পৃঃ ৬৫০)।*

আশআছের পুত্র মুহাম্মদ মুসলিম ইবনে আকিলের সাথে কুফায় প্রতারণা করেছিল এবং কারবালায় ইমাম হুসাইনের হৃদয় বিদারক শাহাদাতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিল। কিন্তু এতসব সত্ত্বেও বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিজী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ্ হাদীস গ্রন্থে আশআছের রিওয়াত গ্রহণ করা হয়েছে।

২। নাহ্রাওয়ানের যুদ্ধের পর একদিন আমিরুল মোমেনিন কুফার মসজিদে সালিশীর কুফল সম্বন্ধে খোৎবা প্রদান করছিলেন। তখন একজন লোক (আশআছ) দাঁড়িয়ে বললো, "হে আমিরুল মোমেনিন, প্রথমে আপনি আমাদিগকে এ সালিশী মানতে নিবৃত্ত করেছিলেন কিন্তু পরবর্তীতে আপনি নিজেই উহা মঞ্জুর করেছেন। আমরা বুঝতে পারছিনে আপনার এ দু'টো অবস্থার কোনটি সঠিক ও শুদ্ধ।" এ কথা শুনে আমিরুল মোমেনিন তাঁর এক হাতের ওপর অন্য হাত দিয়ে তালি বাজিয়ে বললেন, "এটাই সে ব্যক্তির পুরস্কার যে দৃঢ় মতামত পরিহার করে " অর্থাৎ এটা তোমাদের কৃতকর্মের ফল কারণ তোমরা দৃঢ়তা ও সতর্কতা পরিহার করে সালিশীর জন্য গোঁ ধরেছিলে।" আমিরুল মোমেনিনের কথার মর্মার্থ বুঝতে না পেরে আশআছ বললো, "হে আমিরুল মোমেনিন, এতে আপনার নিজের ওপরই দোষ আসবে।" আশআছের এ কথার প্রেক্ষিতে আমিরুল মোমেনিন কর্কশভাবে বললেন ঃ

> *তুমি কি জান আমি কি বলতেছি? তুমি কি করে বুঝলে কোন্‌টা আমার অনুকূলে আর কোন্‌টা আমার প্রতিকূলে? তুমি তাঁতির পুত্র তাঁতি এবং মোশরেক দ্বারা লালিত পালিত। তুমি একজন মোনাফিক। তোমার ওপর আল্লাহ্ ও সারা জাহানের অভিশাপ।*

আশআছকে তাঁতি বলাব অনেক কারণ টীকাকারগণ লিখেছেন। প্রথমতঃ তার জন্মভূমির অধিকাংশ লোকের মত আশআছ ও তার পিতা কাপড় বুনতো। এ পেশায় অত্যন্ত নীচ শ্রেণীর লোকেরা নিয়োজিত ছিল। ইয়েমেনের অধিকাংশ লোক এ পেশায় নিয়োজিত ছিল। জাহীজ[৬৯] লিখেছেন ঃ

> *এ জনগোষ্ঠি সম্পর্কে আমি কি আর বলব যাদের অধিকাংশই তাঁতি, মুচি-চামার, বানর পালক ও গাধার সওয়ার। মাথায় ঝুঁটিওয়ালা পাখী তাদেরকে খুঁজে বের করে, ইঁদুর তাদের চারপাশে অজস্র সংখ্যায় এবং তারা একজন নারী দ্বারা শাসিত (পৃঃ ১৩০)।*

দ্বিতীয়তঃ 'হিকায়া' শব্দের অর্থ হলো শরীরকে একদিকে বাঁকা করে হাঁটা। যেহেতু আশআছ গর্ব ও অহঙ্কার বশতঃ কাঁধ ঝাঁকিয়ে শরীর বাঁকিয়ে হাঁটতো সেহেতু তাকে 'হাইক' বলা হয়েছে।

তৃতীয়তঃ আশআছের বোকামি ও নীচতা বুঝানোর জন্যই তাকে তাঁতি বলা হয়েছে। কারণ যে কোন নীচ প্রকৃতির লোককে আরবদেশে তাঁতি বলা হতো। এটা উক্ত পেশার কারণে প্রবাদে পরিণত হয়েছিল।

চতুর্থত ঃ এ শব্দটি দ্বারা সেসব লোককে বুঝানো হয়েছে যারা আল্লাহ্ ও রাসুলের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে; বিশেষ করে মোনাফেকীর জাল বুনে। আমিলী[৭০] লিখেছেন ঃ

> *ইমাম জাফর সাদিকের সম্মুখে যখন বলা হয়েছিল যে, 'হাইক' কে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে তখন তিনি ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন, 'হাইক' সে ব্যক্তি যে আল্লাহ্ ও রাসুলের বিরুদ্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করে (খন্ড ১২, পৃঃ ১০১)।*

মূলতঃ আমিরুল মোমেনিন 'হাইক' বা 'তাঁতি' শব্দ দ্বারা মোনাফিক বুঝিয়েছেন। সেজন্যই তিনি আশআছের ওপর আল্লাহ্ ও অন্য সকলের অভিশম্পাত দিয়েছেন। মহিমান্বিত আল্লাহ্ বলেন ঃ

> *আমরা মানুষের জন্য যে সব স্পষ্ট নিদর্শন ও হেদায়েত কিতাবে নাজেল করেছি তা যারা গোপন করে আল্লাহ্ তাদের লা'নত দেন এবং অভিশাপকারীগণও অভিশাপ দেয় (কুরআন-২ঃ১৫৯)।*

এরপর আমিরুল মোমেনিন বললেন, 'মোশরেক থাকাকালে বন্দী হবার অবমাননাকর অবস্থা তুমি মুছে ফেলতে পার নি। এমন কি ইসলাম গ্রহণের পরও বন্দী হবার কলঙ্কের ছাপ তোমাকে ত্যাগ করনি।' ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তার বন্দী হবার কাহিনী হলো- বনি মুরাদ যখন তার পিতা কায়েসকে হত্যা করলো সে বনি কিনদাহ্ হতে যোদ্ধা সংগ্রহ করে তাদের তিন দলে বিভক্ত করলো। এক দলের নেতৃত্ব সে নিজে গ্রহণ করলো, আরেক দলকে কাব ইবনে হানীর নেতৃত্বাধীন এবং অন্য দলকে কাশআম ইবনে ইয়াজিদ আল-আরকামের নেতৃত্বাধীন দিয়েছিল। তৎপর সে বনি মুরাদের সাথে যুদ্ধ করতে যাত্রা করলো। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সে বনি মুরাদের পরিবর্তে বনি হারিছ ইবনে কাবকে আক্রমণ করে বসলো। ফলে কাব ইবনে হানী ও কাশআম ইবনে ইয়াজিদ নিহত হলো এবং সে জীবিত বন্দী হলো। সে তিন হাজার উট মুক্তিপণ দিয়ে পরবর্তীতে মুক্তিলাভ করলো।

আশআছের দ্বিতীয়বার বন্দী হবার ঘটনা হলো— রাসুলের ইহধাম ত্যাগের পর খলিফা আবু বকরের একটা আদেশ বাতিলের জন্য হাদ্রামাউত অঞ্চলে বিদ্রোহ হয়েছিল। উক্ত আদেশে খলিফা হাদ্রামাউত অঞ্চলের গভর্ণর জিয়াদ ইবনে লাবিদ আল-বায়াদি আল আনসারীকে লিখেছিলেন সে যেন লোকদের নিকট হতে তার বায়াত ও জাকাত আদায় করে। জিয়াদ জাকাত আদায় করতে গিয়ে শায়তান ইবনে হাজরের একটা মোটাতাজা ও সুন্দর উষ্ট্রির ওপর লাফিয়ে ওঠে বসে পড়লো। শায়তান তার এ উষ্ট্রিটি ছাড়তে চাইলো না এবং এটির বদলে যে কোন উষ্ট্রি নিয়ে যেতে অনুরোধ করলো। কিন্তু জিয়াদ তাতে রাজী হলো না। শায়তান তার ভ্রাতা আদ্দা ইবনে হাজরকে ডেকে পাঠালো। সে এসে জিয়াদের সঙ্গে কথা বললো কিন্তু জিয়াদ কিছুতেই উষ্ট্রিটির লাগাম হতে হাত সরাতে রাজী হলো না। অবশেষে উভয় ভ্রাতা সাহায্যের জন্য মাসরুক ইবনে মাদি কারিবের নিকট আবেদন করলো। মাসরুকও তার প্রভাব খাটিয়ে চেষ্টা করে উষ্ট্রিটি জিয়াদের দখল হতে ছাড়াতে ব্যর্থ হলো। এতে মাসরুক ভীষণ রাগান্বিত হয়ে গেল এবং উষ্ট্রিটির বাঁধন খুলে দিয়ে উহা শায়তানের হাতে দিয়ে দিল। মাসরুকের এহেন ব্যবহারে জিয়াদ অপমান বোধ করলো এবং রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে গেল। সে লোকজন সংগ্রহ করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলো। অপরদিকে বনি ওয়ালিয়াহ্ও তাদেরকে মোকাবেলা করার জন্য জড়ো হলো কিন্তু জিয়াদকে পরাজিত করতে পারেনি বরং তার হাতে ভীষণ মার খেয়েছিল। জিয়াদ তাদের নারীগণকে নিয়ে গিয়েছিল এবং সমস্ত সম্পদ লুট-পাট করে নিয়েছিল। দৈবক্রমে যারা বেঁচে গিয়েছিল তারা আশআছের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। আশআছ এক শর্তে তাদের সাহায্য করতে সম্মত হলো যে, তারা তাকে সে এলাকার শাসনকর্তা বলে স্বীকৃতি দেবে। জনগণ উক্ত শর্ত মেনে নিয়ে আশআছের অভিষেক উদ্‌যাপন করলো। তৎপর আশআছ সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করে জিয়াদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যাত্রা করলো। অপরপক্ষে জিয়াদকে সাহায্য করার জন্য আবুবকর ইয়েমেনের প্রধান মুহাজির ইবনে আবি উমাইয়াকে পত্র দিয়েছিল। মুহাজির তার বাহিনীসহ জিয়াদের দিকে এগিয়ে যাবার সময় পথিমধ্যে যুরকান নামক স্থানে আশআছের বাহিনীর সাথে মুখোমুখী হয়ে যায় এবং উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ বেধে যায়। আশআছ বেশীক্ষণ টিকতে পারলো না। সে তার লোকজনসহ নুজায়র নামক দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করলো। মুহাজিরও পিছু ধাওয়া করে দূর্গ অবরোধ করলো। আশআছ ভাবলো অস্ত্র আর জনবল ছাড়া এভাবে কতদিন সে দূর্গে আবদ্ধ হয়ে থাকবে। ফলে সে এক রাতে চুরি করে দূর্গের বাইরে এসে জিয়াদ ও মুহাজিরের সাথে দেখা করলো এবং তাদের সঙ্গে এ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলো যে, যদি তারা তার পরিবারের নয়জনের নিরাপত্তা বিধান করে তবে সে দূর্গের ফটক খুলে দেবে। জিয়াদ ও মুহাজির এতে রাজী হলো। আশআছ উক্ত নয়জনের নাম লিখে তাদের হাতে দিল কিন্তু তার নিজের নাম লিখতে ভুলে গিয়েছিল। এদিকে সে দূর্গে ফিরে গিয়ে বললো যে, সে সকলের জীবনের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছে। সে দূর্গের ফটক খুলে দেয়ার নির্দেশ দিল। যেই মাত্র ফটক খোলা হলো অমনি জিয়াদের বাহিনী তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। দূর্গের জনতা বললো তাদের জীবনের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। জিয়াদের সৈন্যরা বললো আশআছ যে নয়জনের নিরাপত্তা চেয়েছে সে নয়জনের তালিকা তাদের কাছে রয়েছে। এ দূর্গে আটশত লোক হত্যা করা হয়েছিল এবং বেশ ক'জন মহিলার হাত কেটে ফেলা হয়েছিল। চুক্তি অনুযায়ী নয় জনকে মুক্তি দেয়া হয়েছিল। কিন্তু আশআছের নাম তালিকায় না থাকায় তার বিষয়টি জটিল হয়ে পড়লো। অবশেষে তাকে শিকল দিয়ে বেঁধে এক হাজার নারী বন্দিনীর সাথে মদিনায় আবু বকরের নিকট প্রেরণ করা হয়েছিল। পথিমধ্যে নারী-পুরুষ, আত্মীয়-স্বজন সকলে তাকে অভিশম্পাত দিয়েছিল এবং মহিলারা তাকে "উরফ-আন-নার"(অর্থাৎ এমন বিশ্বাসঘাতক যে নিজের লোকদের তরবারির নীচে ঠেলে দেয়) বলে গালি দিয়েছিল। যাহোক মদিনায় পৌঁছার পর আবু বকর তাকে মুক্তি দিয়েছিল। এরপর সে আবু বকরের বোন উম্মে ফারওয়াহ্‌কে বিয়ে করেছিল।

★★★★★

খোৎবা-২০

মৃত্যু ও উহার শিক্ষা

যারা তোমাদের পূর্বে মৃত্যুবরণ করেছে তারা যা দেখেছে তা যদি তোমরা দেখতে পেতে তাহলে তোমরা বিচলিত ও অস্থির হয়ে পড়তে এবং তখন তোমরা কর্ণপাত করতে ও মান্য করতে। কিন্তু মৃতরা যা দেখেছে তা তোমাদের নিকট রহস্যাবৃত করা হয়েছে। সহসাই এ রহস্যের পর্দা উন্মোচন করা হবে। তোমাদেরকে সবকিছু দেখানো হয়েছে যদি তোমরা দেখে থাক, সবকিছু শুনানো হয়েছে যদি তোমরা শুনে থাক এবং হেদায়েতের পথ

দেখানো হয়েছে যদি তোমরা হেদায়েত গ্রহণ কর। আমি তোমাদের সঙ্গে যেসব কথা বলেছি তা সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। বহু রকম নির্দেশমূলক দৃষ্টান্ত দিয়ে তোমাদের উচ্চস্বরে ডাকা হয়েছে এবং পরিপূর্ণ সাবধানবাণীর মাধ্যমে সাবধান করা হয়েছে। স্বর্গীয় বার্তাবাহকের (জিব্রাইল) পর শুধুমাত্র মানুষই আল্লাহ্‌র বার্তা পৌছে দিতে পারে। (সুতরাং আমি যা পৌছে দিচ্ছি তা আল্লাহ্‌র কাছ থেকেই প্রাপ্ত)।

★★★★★

খোৎবা-২১

দুনিয়াতে নিজকে হাল্‌কা রাখার উপদেশ

নিশ্চয়ই, তোমার লক্ষ্যবস্তু (পুরস্কার অথবা শাস্তি) তোমার সম্মুখে। তোমার পেছনে কেয়ামতের মুহূর্ত (মৃত্যু) যা তোমাকে দ্রুত অনুসরণ করে চলছে। নিজকে হাল্‌কা রাখো (পাপভার হতে) তাহলে সামিল হতে পারবে (অগ্রবর্তীগণের সাথে)। তোমার পূর্ববর্তীগণ তোমার জন্য প্রতীক্ষারত আছে।

★★★★★

খোৎবা-২২

উসমানের হত্যার জন্য যারা তাঁকে দোষী করেছিল তাদের সম্বন্ধে

সাবধান! শয়তান তার সেনাবাহিনী সংগ্রহ করে নিশ্চয়ই তাদের প্ররোচিত ও সুসজ্জিত করতে আরম্ভ করেছে যেন অত্যাচার শেষ সীমায় পৌছায় এবং ভুল-বিভ্রান্তি আসন গেড়ে বসতে পারে। আল্লাহ্‌র কসম, তারা আমার ওপর যে দোষ আরোপ করছে তা সঠিক নয় এবং আমার ও তাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করছে না।

তারা আমার কাছে একটি অধিকার দাবী করছে যা তারা প্রত্যাখ্যান করেছে। তারা আমার কাছে এমন একটি রক্তপণ চাচ্ছে যা তারা নিজেরাই ঘটিয়েছে[১]। আমি যদি সে রক্তপাতে তাদের অংশীদার হতাম তাহলেও উহাতে তাদের অংশ রয়েছে। কিন্তু তারা আমাকে ছাড়াই সে রক্তপাত ঘটিয়েছে। কাজেই উহার ফলাফলও তাদের ভুগতে হবে। আমার বিরুদ্ধে সবচাইতে জোরালো যে যুক্তি তারা দাঁড় করিয়েছে প্রকৃত অর্থে তা তাদের নিজেদের বিরুদ্ধে যায়। তারা এমন মায়ের স্তন চুষতেছে যার দুধ আগেই শুকিয়ে গেছে। এবং এমন বানোয়াট বিষয়কে জীবন দান করতে চায় যা আগেই মরে গেছে। কত হতাশাব্যঞ্জক যুদ্ধের জন্য তাদের এ চ্যালেঞ্জ? কে এই চ্যালেঞ্জার এবং কিসের জন্য সে সাড়া দিচ্ছে? আমি খুশী এ জন্য যে, তাদের সম্মুখে সকল যুক্তি নিঃশেষ করা হয়েছে এবং তাদের সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবকিছু অবগত আছেন। (আমার নির্দোষ হবার যুক্তি মানতে) যদি তারা অস্বীকৃতি জানায় তবে আমার তরবারি উন্মুক্ত রইল যা ভুলের চিকিৎসক ও ন্যায়ের সমর্থক হিসেবে যথেষ্ট।

এটা বিস্ময়কর যে, বর্শা-যুদ্ধের জন্য এগিয়ে যেতে এবং তরবারি-যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকতে তারা আমাকে খবর পাঠিয়েছে। শোক প্রকাশকারী রমণীকূল তাদের জন্য ক্রন্দন করুক! আমি কি কখনো এমন ছিলাম যে, আমি যুদ্ধকে ভয় করেছি বা সংঘর্ষে আতঙ্কিত হয়েছি। আল্লাহ্ চিরকাল আমার সহায় এবং আমার ইমানে কোন প্রকার সংশয় নেই।

১। উসমান নিহত হবার জন্য যখন আমিরুল মোমেনিনকে দোষারোপ করা হলো তখন তিনি অভিযোগ খন্ডন করে এ খোৎবা প্রদান করেন। যারা তাঁকে দোষারোপ করেছিলো তাদের সম্বন্ধে তিনি বলেন, "এ প্রতিশোধ গ্রহণেচ্ছুগণ একথা বলতে পারে না যে, আমি একাই হত্যা করেছি এবং অন্য কেউ এতে অংশগ্রহণ করেনি। প্রত্যক্ষভাবে দেখা ঘটনা প্রবাহ তারা এ বলে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে পারবে না যে, তারা এ হত্যার সঙ্গে জড়িত ছিল না। তাহলে কেন তারা প্রতিশোধ গ্রহণে আমাকে সর্বাগ্রে ধরেছে? আমার সাথে তাদের নিজদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। যদি আমি এ অপবাদ থেকে মুক্তও হই তবু তারা মুক্ত বলে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে না। সুতরাং তারা কিভাবে শাস্তি থেকে নিজেদেরকে রক্ষা

করবে? সত্যি কথা কি, তারা আমাকে এ অভিযোগে অভিযুক্ত করার পেছনে তাদের উদ্দেশ্য হলো আমি যেন তাদের প্রতি সেভাবে আচরণ করি যে আচরণ পেয়ে তারা অভ্যস্ত হয়েছে। কিন্তু এটা তারা আমার কাছ থেকে আশা করতে পারে না যে, পূর্ববর্তী সরকারগুলোর নতুন প্রবর্তনগুলো আমি পুনরুজ্জীবিত করবো। যুদ্ধের বিষয়ে আমি পূর্বেও কখনো ভীত ছিলাম না, এখানো ভীত নই। আমার মনোভাব সম্বন্ধে আল্লাহ্ জ্ঞাত আছেন। আর আল্লাহ্ এও অবহিত আছেন যে, আজ যারা প্রতিশোধ গ্রহণের ওজর দেখিয়ে আমার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে তারাই তার হত্যাকারী।" ইতিহাসে বিধৃত আছে যে, গোলযোগ সৃষ্টি করে যারা উসমানকে হত্যা করার ব্যবস্থা করেছিল এমনকি তার মৃতদেহের ওপর পাথর নিক্ষেপ করে মুসলিমদের কবরস্থানে তার দাফন প্রতিহত করেছিল তারাই তার রক্তের বদলা নেয়ার অগ্রণী ভূমিকা পালনে তৎপর হয়েছিল। এদের মধ্যে তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ্, জুবায়র ইবনে আওয়াম ও আয়শা বিনতে আবু বকরের নাম তালিকার শীর্ষে রয়েছে। হাদীদ [১৫২] লিখেছেঃ

> *যে সকল ঐতিহাসিক উসমান হত্যার বিস্তারিত লিখেছেন তাদের বর্ণনামতে উসমানকে হত্যা করার দিন নিজকে লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখার জন্য তালহা কালো আবরণ দিয়ে মুখ ঢেকে উসমানের গৃহের দিকে তীর নিক্ষেপ করেছিল। ঐতিহাসিকগণ আরো বর্ণনা করেছেন যে, জুবায়র বলেছিল, "উসমানকে হত্যা কর। সে আমাদের ইমান পরিবর্তন করে দিয়েছে।" তখন লোকরা বলেছিল, "হে জুবায়র, তোমার পুত্র উসমানের দুয়ারে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে।" উত্তরে জুবায়র বলেছিল, "আমার পুত্রকে হারালেও কোন দুঃখ নেই, কিন্তু উসমানকে হত্যা করতেই হবে। আগামীকাল যেন উসমান লাশ হয়ে সিরাতে পড়ে থাকে" (খন্ড-৯, পৃঃ ৩৫-৩৬)।*

আয়শা সম্পর্কে রাব্বিহ্ [১১৮] লিখেছেনঃ

> *মুঘিরাহ্ ইবনে শুবাহ্ একদিন আয়শার কাছে এসেছিল। তখন আয়শা বললেন, 'হে আবু আবদিল্লাহ্, আমার মনে হয় জামালের যুদ্ধের দিনে তুমি আমার সঙ্গে ছিলে। তুমি নিশ্চয়ই দেখেছো কি হারে তীর আমার হাওদা ভেদ করে চলে গিয়েছিল। কয়েকটি তীর আমার শরীরে সামান্য আঘাতও করেছে" মুঘিরাহ্ বললো, "সেসব তীরের আঘাতে তোমার মৃত্যু হলে ভাল হতো।" আয়শা বললেন, "আল্লাহ্ না করুন, তুমি অমন কথা বলছো কেন?" উত্তরে মুঘিরাহ বললো, "উসমানের বিরুদ্ধে তুমি যা করেছো তাতে তার কিছুটা প্রায়শ্চিত্ত হতো" (খন্ড-৪, পৃঃ২৯৪)।*

★★★★★

খোৎবা-২৩

ঈর্ষা পরিহার করে চলা এবং আত্মীয়-স্বজনের সাথে ভাল ব্যবহার করা সম্বন্ধে

নিশ্চয়ই, আল্লাহ্‌র আদেশাবলী আকাশ থেকে বৃষ্টি-বিন্দুর মত পৃথিবীতে নেমে আসে। পূর্বনির্ধারিত ভাগ্য-লিপি অনুযায়ী কারো জন্য বেশী কারো জন্য কম রহমত ও নেয়ামত এতে বয়ে আসে। সুতরাং যদি কেউ তার ভাইয়ের সন্তান-সন্ততি ও সম্পদের প্রাচুর্য আসতে দেখে তবে তার হতাশাগ্রস্ত বা উদ্বিগ্ন হবার কিছু নেই। এমনকি নিজের সন্তান-সন্ততি ও সম্পদের প্রাচুর্যের জন্য গর্ববোধ করার কিছু নেই। নীচ লোকেরাই এসব নিয়ে আত্ম-অহম বোধ করে। সম্পদের প্রাচুর্য বাড়তে দেখলে যতদিন পর্যন্ত একজন মুসলিম (লজ্জায়) চক্ষুবন্ধ না করবে ততদিন পর্যন্ত সে একজন জুয়াড়ী সদৃশ যে প্রথমবারের তীর নিক্ষেপেই লাভবান হয়ে পূর্বের লোকসান পুষিয়ে নেয়ার আশা পোষণ করে।

একইভাবে যে মুসলিম খেয়ানত মুক্ত সে দু'টো ভাল জিনিসের একটা আশা করতে পারে। জিনিস দু'টো হলো—(এক) আল্লাহ্‌র আহ্বান এবং সেক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র নিকট হতে যা কিছু আসে তাই তার জন্য সর্বোত্তম ধরে নিতে হবে; (দুই) আল্লাহ্‌র রেজেক। তার সন্তান-সন্ততি ও বিষয়-সম্পদ যতই থাকুক না কেন তার ইমান ও সম্মান তার সাথেই থাকবে। নিশ্চয়ই, সন্তান-সন্ততি ও ঐশ্বর্য ইহজগতের চাষাবাদ এবং আমলে সালেহা পরকালের চাষাবাদ। কখনো কখনো মহিমান্বিত আল্লাহ্ এর উভয়টাই কোন কোন কওমকে একত্রে দান করে থাকেন।

যেসব বিষয়ে আল্লাহ্ তোমাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন সেসব বিষয়ে সাবধান থেকো এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর। কারণ এ বিষয়ে কোন ওজর কার্যকর হবে না। বে-রিয়া (লোক দেখানোর জন্য নয়) আমল কর: বাহ্‌বা শোনার জন্য করো না। কোন মানুষ যদি গায়রুল্লাহ্‌র আমল করে তবে যার উদ্দেশ্যে সে আমল করেছে তার নিকট আল্লাহ্ তাকে ন্যস্ত করেন। আমরা আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করি যেন আমাদেরকে শহীদের মর্যাদা, পরহেযগারগণের সাথে জীবনযাপন ও রাসুলগণের বন্ধুত্ব প্রদান করেন।

হে জনমন্ডলী, কেউ তার আপনজনের সহায়তা ব্যতীত চলতে পারে না (যদি সে ঐশ্বর্যবানও হয়)। তাদের সহায়তা হস্ত দ্বারা অথবা মুখের কথায়ও হতে পারে। শুধুমাত্র আপনজনই পেছন থেকে সমর্থনকারী এবং আপদে-বিপদে পক্ষ বিস্তার করে রক্ষাকারী। দুঃখ-দুর্দশায় নিপতিত হলে আপনজনই সদয় দৃষ্টিতে তাকায়। কোন মানুষের মঙ্গলময় স্মৃতি, যা মানুষের মাঝেই আল্লাহ্ সংরক্ষণ করে রাখেন, যেকোন ঐশ্বর্য হতে উত্তম।

মনে রেখো, তোমরা যদি তোমাদের আপনজনকে অভাবগ্রস্ত অবস্থায় অথবা উপোস করতে দেখ তাহ্‌লে তাদের সাহায্য করা থেকে একথা ভেবে বিরত থেকো না যে, তুমি সাহায্য না করলে তাদের অভাব বেড়ে যাবে না অথবা তোমার সাহায্যে তাদের দুঃখ-দুর্দশা সামান্যই লাঘব হবে। যারা আপনজনকে সাহায্য করা হতে হাত গুটিয়ে রাখে তারা প্রয়োজনের সময় অনেক হাত গুটানো দেখতে পাবে। যে কেউ মিষ্টি স্বভাবের হবে তার প্রতি জনগণের শ্রদ্ধা-ভালবাসা চিরস্থায়ী হয়ে থাকে।

★★★★★

খোৎবা-২৪

জনগণকে জিহাদের জন্য প্রেরণাদান

আমার জীবনের কসম, যারা ন্যায়ের বিরোধিতা করে অথবা বিপথে হাতড়িয়ে বেড়ায় তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আমার কোন শীথিলতা নেই এবং তাদের প্রতি আমার সামান্যতম শ্রদ্ধাবোধও নেই। হে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ, তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর; তাঁর রোষে পতিত হওয়া থেকে দূরে সরে থাক এবং তাঁর করুণা যাচ্‌না কর। তিনি তোমাদের জন্য যে সকল নির্দেশ করেছেন সে পথে চল এবং যা তোমাদের আদেশ করেছেন তাতে দৃঢ়ভাবে অবস্থান কর। যদি তোমরা সেভাবে চল তবে এ আলী তোমাদের মুক্তির নিশ্চয়তা দিচ্ছে; হতে পারে ইহজগতে তোমরা তা নাও পেতে পার, কিন্তু পরকালের চিরস্থায়ী সুখ অবধারিত।

★★★★★

খোৎবা-২৫

যখন আমিরুল মোমেনিন উত্তরোত্তর সংবাদ পেতে লাগলেন যে, মুয়াবিয়ার জনগণ একের পর এক শহর[১] দখল করে নিয়ে যাচ্ছে এবং ইয়েমেন হতে তাঁর অফিসার উবায়দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস ও সাঈদ ইবনে নিমরান মুয়াবিয়ার লোক বুসর ইবনে আরতাতের নিকট পরাজিত হয়ে পিছু হটে এসেছে, তখন আমিরুল মোমেনিন তাঁর লোকদের জিহাদ বিমুখীতা ও তাঁর সাথে মতদ্বৈধতা করার কারণে বিচলিত হলেন। তিনি মিম্বারে উঠে এ খোৎবা প্রদান করেন

কুফা ব্যতীত আমার জন্য আর কিছুই রইল না যা আমি সংকীর্ণ ও প্রশস্ত করতে পারি। (হে কুফা) তোর দশা যদি এ রকমই হয় যে, তোর ওপর দিয়ে ঘূর্ণিঝড় বইতেই থাকবে তবে আল্লাহ্ তোকে ধ্বংস করুক। তৎপর তিনি একটি কবিতার দুটি পংক্তি আবৃত্তি করলেন ঃ

হে আমর! তোমার পরম পিতার দোহাই, এ পাত্র থেকে আমি সামান্য একটুখানি চর্বি পেয়েছি,
যা পাত্র খালি করার পর পাত্রের গায়ে লেগেছিল।

আমি জানতে পারলাম যে, বুসর ইয়েমেন দখল করে নিয়েছে। আল্লাহ্‌র কসম, এসব লোক সম্পর্কে আমি চিন্তা করে দেখেছি এরা সহসাই সারা দেশ কেড়ে নিয়ে যাবে। কারণ তারা বাতিলের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকেও একতাবদ্ধ। অথচ তোমরা সত্য ও ন্যায়ের পথে থেকেও ঐক্যবদ্ধ নও— তোমরা দ্বিধাবিভক্ত। ন্যায়ের পথে থাকা সত্ত্বেও তোমরা তোমাদের ইমামকে অমান্য কর। আর বাতিল পথে থাকা সত্ত্বেও তারা তাদের নেতাকে মান্য করে। তারা তাদের নেতার প্রতি সম্পূর্ণরূপে আস্থাবান; আর তোমরা তোমাদের ইমামের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা কর। তাদের শহরে তারা কল্যাণকর কাজ করে; আর তোমরা তোমাদের শহরে অকল্যাণকর কাজ কর। যদি আমি তোমাদেরকে একটা কাঠের গামলার দায়িত্বও দেই, আমার মনে হয়, তোমরা উহার হাতল নিয়ে পালিয়ে যাবে।

হে আমার আল্লাহ্, তারা আমার প্রতি নিদারুণভাবে বিরক্ত; আমিও তাদের প্রতি বিরক্ত। তারা আমাকে নিয়ে ক্লান্ত; আমিও তাদেরকে নিয়ে ক্লান্ত। তাদের চেয়ে ভাল কোন জনগোষ্ঠি আমাকে দিন এবং আমার চেয়ে মন্দ কোন নেতা তাদেরকে দিন। হে আল্লাহ্, তাদের হৃদয়কে বিগলিত করুন যেরূপ বিগলিত হয় লবন পানিতে। হায়! আল্লাহ্, যদি আমি এদের পরিবর্তে বনি ফিরাস ইবনে ঘানম-এর মাত্র এক হাজার অশ্বারোহীও পেতাম। কবি বলেছিলেন;

যদি তুমি তাদের আহবান কর
অশ্বারোহীগণ ধেয়ে আসবে
গ্রীষ্মের মেঘমালার মত।

১। সিফফিনের ছল-চাতুরিপূর্ণ সালিশীর পর মুয়াবিয়ার অবস্থান মজবুত হয়ে উঠলো এবং সে আমিরুল মোমেনিনের শহরসমূহ একের পর এক দখল করে তার রাজত্ব বৃদ্ধির চিন্তা করতে লাগল। সে তার সৈন্যবাহিনী বিভিন্ন এলাকায় প্রেরণ করে জোরপূর্বক তার অনুকূলে জনগণ থেকে বায়াত আদায় করতে লাগল। এ উদ্দেশ্যে সে বুসর ইবনে আবি আরতাতকে হিজাজ এলাকায় প্রেরণ করেছিল। বুসর হিজাজ হতে ইয়েমেন পর্যন্ত হাজার হাজার নিরীহ-নিরপরাধ মানুষের রক্তপাত ঘটিয়েছিল। গোত্রের পর গোত্র সমূহের জীবিত লোকদের আগুনে পুড়ে মেরেছিল এবং অসংখ্য শিশু হত্যা করেছিল। তার অত্যাচার এতদূর পর্যন্ত পৌঁছেছিল যে, ইয়েমেনের গভর্ণর উবায়দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের দু'টি শিশুপুত্রকে জুহায়রিয়া বিনতে খালিদ ইবনে কারাজ এর সম্মুখে জবাই করে হত্যা করা হয়েছিল।

যখন আমিরুল মোমেনিন বুসরের এহেন নৃশংস হত্যাযজ্ঞ ও রক্তপাতের সংবাদ পেলেন তখন তাকে খতম করার জন্য একটি বাহিনী প্রেরণের বিষয় চিন্তা-ভাবনা করে স্থির করলেন। কিন্তু অনবচ্ছিন্ন যুদ্ধের ফলে মানুষ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। আমিরুল মোমেনিনের আহ্বানে তারা আগ্রহের পরিবর্তে হৃদয়হীনতা দেখিয়েছিল। তাদের অনীহা লক্ষ্য করে তিনি এ খোৎবা প্রদান পূর্বক তাদের উদ্দীপনা ও আত্ম-সম্মানবোধ জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করলেন। তিনি তাদের সম্মুখে শত্রুর ভ্রান্ত দিকসমূহ ও তাদের নিজেদের দোষ-ক্রুটি বর্ণনা করে তাদেরকে জিহাদে উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা করলেন।

অবশেষে যারিয়াহ ইবনে কুদামাহ্ আমিরুল মোমেনিনের আহবানে সাড়া দিয়ে দু'হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী নিয়ে বুসরের মোকাবেলা করেছিল এবং তাকে আমিরুল মোমেনিনের এলাকা হতে পালিয়ে যেতে বাধ্য করেছিল।

★★★★★

খোৎবা-২৬

নবুয়ত প্রকাশের পূর্বে আরবের অবস্থা সম্বন্ধে

আল্লাহ্ মুহাম্মদকে (সঃ) জগতের সকল পাপের বিরুদ্ধে সতর্ককারী এবং তাঁর সকল প্রত্যাদেশের আমানতদার হিসেবে পাঠিয়েছিলেন। সে সময়ে তোমরা আরবের লোকেরা একটা কদর্য ধর্মের অনুসারী ছিলে এবং তোমরা কদর্য পাথর (মূর্তি) ও বিদ্বেষ ভাবাপন্ন বিশ্বাসঘাতকদের মাঝে বাস করতে। তোমরা নোংরা পানি (মদ) পান করতে এবং অপবিত্র খাবার খেতে। তোমরা একে অপরের রক্তপাত ঘটাতে এবং আত্মীয়তার বন্ধনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে না। তোমরা সকলে প্রতিমা পূজা করতে এবং সর্বদা পাপে ডুবে থাকতে।

রাসুলের ইনতিকালের পর আমি লক্ষ্য করে দেখলাম আমার পরিবার পরিজন ছাড়া আমার আর কোন সমর্থক নেই, তাই আমার অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমি তাদেরকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিতে বিরত রইলাম। পরিস্থিতি আমার চোখে ধূলিকণার মত বেঁধা সত্ত্বেও আমি আমার চোখ বন্ধ রাখলাম, গলার শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা সত্ত্বেও আমি পান করলাম, আমার শ্বাস-প্রশ্বাসে বিঘ্ন হওয়া এবং তিক্ত খাদ্য পাওয়া সত্ত্বেও আমি ধৈর্য ধারণ করলাম।

মুয়াবিয়া যথেষ্ট মূল্য[১] দিয়ে আমর ইবনে আ'সের বায়াত আদায় করেছে। এহেন বায়াত ক্রেতার হাত কৃতকার্য নাও হতে পারে এবং বিক্রেতাগণের চুক্তি অসম্মানজনকও হতে পারে। এখন তোমরা যুদ্ধের জন্য অস্ত্র ধারণ কর এবং নিজেদের সাজ-সরঞ্জামের ব্যবস্থা কর। যুদ্ধের শিখা অনেক উঁচুতে উঠেছে এবং উহার ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। নিজকে ধৈর্যের পোষাক পরাও কারণ ধৈর্য জয় অপেক্ষা উত্তম।

১। নাহ্রাওয়ানের যুদ্ধে যাত্রার প্রাক্কালে আমিরুল মোমেনিন এ খোৎবা প্রদান করেছিলেন। আমর ইবনে আসের বিষয়টি হলো আমিরুল মোমেনিনের অনুকূলে মুয়াবিয়ার বায়াত গ্রহণের জন্য তিনি যারীর ইবনে আবদুল্লাহ্ বাযালীকে মুয়াবিয়ার নিকট প্রেরণ করেছিলেন। মুয়াবিয়া যারীরকে জবাব দানের কথা বলে বিলম্ব করিয়েছিল। সিরিয়ার জনগণ মুয়াবিয়াকে কতটুকু সমর্থন করে তা ইতোমধ্যে সে পরীক্ষা করতে লাগলো। মুয়াবিয়া উসমানের রক্তের বদলা নেয়ার কথা বলে সিরিয়ার জনগণকে তার সমর্থক করতে সক্ষম হলো। তখন সে তার ভাই উতবাহ্ ইবনে আবু সুফিয়ানকে ডেকে আলোচনা করলো। উত্বাহ্ পরামর্শ দিল, "যদি আমর ইবনে আস তোমার সাথে যোগ দেয় তবে সে তার বিচক্ষণতা দ্বারা অনেক সমস্যার সমাধান করতে পারবে। কিন্তু উচ্চ মূল্য না পেলে সে তোমার কর্তৃত্ব মেনে নেবে না। যদি তুমি যথেষ্ট মূল্য প্রদান কর তবে সে সেরা সাহায্যকারী ও পরামর্শদাতা হবে।" উতবাহ্র পরামর্শ মুয়াবিয়ার ভাল লেগেছিল। সে আমর ইবনে আসকে ডেকে পাঠালো এবং উভয়ের মধ্যে আলোচনা হলো। উভয়ের মধ্যে এ শর্তে চুক্তি হলো যে, ইবনে আসকে মিশরের গভর্ণর করা হবে; বিনিময়ে সে উসমানের হত্যার জন্য আমিরুল মোমেনিনকে দায়ী করে সিরিয়ায় মুয়াবিয়ার কর্তৃত্ব অক্ষুন্ন রাখবে এবং তারা এ চুক্তি পরিপূর্ণ করেছিল।

★★★★★

খোৎবা-২৭

জনগণকে জিহাদে উদ্বুদ্ধকরণ

নিশ্চয়ই, জিহাদ বেহেশ্তের দ্বারসমূহের একটি যা আল্লাহ্ তাঁর বিশেষ বন্ধুদের জন্য খুলে রেখেছেন। জিহাদ হচ্ছে তাকওয়ার পোষাক এবং আল্লাহ্র নিরাপত্তামূলক বর্ম ও বিশ্বস্ত ঢাল। কেউ জিহাদ থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকলে আল্লাহ্ তাকে অসম্মানের পোষাকে আবৃত করেন এবং বালা-মুসিবতের কাপড় পরিয়ে দেন। তখন নিদারুণ অপমান ও ঘৃণা তার সঙ্গী হয়ে পড়ে এবং তার হৃদয়কে (অজ্ঞতার) পর্দাবৃত করে দেয়া হয়। জিহাদের প্রতি বিমুখীতার কারণে তার নিকট হতে মহাসত্য অপসারণ করা হয়। ফলে সে কলঙ্কিত হয়ে পড়ে এবং সে ন্যায়-বিচার হতে বঞ্চিত হয়।

সাবধান, এসব লোকের বিরুদ্ধে দিনে-রাতে, গোপনে-প্রকাশ্যে সংগ্রাম করার জন্য আমি তোমাদের দৃঢ়কণ্ঠে আহবান করেছিলাম। তোমরা আক্রান্ত হবার পূর্বেই আক্রমণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছিলাম। কারণ, আল্লাহ্র কসম, যারা নিজেদের ঘরের মধ্যে আক্রান্ত হয়েছে তারা দারুণভাবে অমর্যাদাকর অবস্থায় পড়েছে। তোমরা নিজের দায়িত্ব অন্যের দিকে ঠেলে দিয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়া পর্যন্ত একে অপরকে অপদস্থ করছো। তোমাদের

নগরীসমূহ শত্রু দখল করে নিয়েছে। বনি ঘামিদের[১] অশ্বারোহীগণ আল-আনবারে পৌঁছে গেছে এবং তারা হাসান ইবনে হাসান বকরীকে হত্যা করেছে। তোমাদের অশ্বারোহীগণকে তারা দুর্গ হতে বিতাড়িত করেছে।

আমি জানতে পেরেছি তারা মুসলিম রমণী ও ইসলামের নিরাপত্তাধীন রমণীদের ইজ্জত হরণ করেছে এবং হাত-পা-গলা-কান থেকে অলঙ্কারাদি ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন (২ঃ১৫৬) -কুরআনের এ আয়াত উচ্চারণ করা ছাড়া রমণীকুল কোন কিছুই করতে পারেনি। নিজেদের কোন প্রকার ক্ষয়ক্ষতি বা প্রাণহানি ব্যতিরেকে তারা ধন-সম্পদ নিয়ে চলে গেছে। এ ঘটনার কারণে কোন মুসলিম যদি শোকে মরে যায় তাহলে তাকে দোষ দেয়া যাবে না; বরং আমার কাছে তার মৃত্যু ওজর হয়ে থাকবে।

কি আশ্চর্য! কি আশ্চর্য! আল্লাহ্‌র কসম, অন্যায় সাধনের জন্য তাদের একতা আর ন্যায়ের পথে তোমাদের অনৈক্য দেখে আমার হৃদয় ব্যাথাতুর হয়ে পড়ে। শোক আর দুর্দশা তোমাদেরকে ঘিরে ধরেছে, তোমরা এমন নিশানা হয়ে গেছ যেখানে তীর নিক্ষেপ করা যায়, তোমরা নিহত হচ্ছো অথচ হত্যা কর না। তোমরা আক্রান্ত হচ্ছো অথচ আক্রমণ কর না। আল্লাহ্‌কে অমান্য করা হচ্ছে অথচ তোমরা তাতে রাজী হয়ে রয়েছো। যখন আমি গ্রীষ্মকালে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদে এগিয়ে যেতে বলি তখন তোমরা বল এখন আবহাওয়া গরম—উত্তাপ প্রশমিত হওয়া পর্যন্ত সময় দিন। যখন আমি শীতকালে যাত্রা করতে বলি তখন তোমরা বল এখন খুব ঠান্ডা—শীত যাওয়া পর্যন্ত সময় দিন। এভাবে শীত-গ্রীষ্ম এড়ানোর চেষ্টা ওজর মাত্র। আল্লাহ্‌র কসম, ঠান্ডা আর গরম থেকে তোমরা যেভাবে পালিয়ে যাচ্ছো, তরবারি (যুদ্ধ) হতে তোমরা আরো অধিক পালিয়ে যাবে।

ওহে, তোমরা মনুষ্যরূপী, আসলে মানুষ নও, তোমাদের বুদ্ধিমত্তা শিশুর মত এবং তোমাদের জ্ঞানের পরিধি পর্দার অন্তরালে আবদ্ধ নারীর মত (যারা বহির্জগতের কোন খোঁজ রাখে না)। তোমাদের সঙ্গে আমার দেখা না হলে বা তোমাদেরকে আমি না চিনলে কতই না ভাল হতো। আল্লাহ্‌র কসম, তোমাদের সাথে পরিচিতি আমার কাছে লজ্জা আর অনুশোচনার কারণ হয়ে রইলো। আল্লাহ্ তোমাদের সাথে যুদ্ধ করুন! তোমরা আমার হৃদয়কে দুঃখ ভারাক্রান্ত করেছো এবং আমার বক্ষে রোষের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছো। তোমরা আমাকে একের পর এক দুঃখের শরাব পান করিয়েছো। তোমরা আমার অবাধ্য হয়ে আমার সকল উপদেশ অমান্য করছো এবং এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করেছো যাতে কুরাইশগণ বলাবলি করছে যে, আবি তালিবের পুত্র বীর বটে কিন্তু যুদ্ধ-কৌশল জানে না। তাদের ওপর আল্লাহ্‌র আর্শীর্বাদ! যুদ্ধক্ষেত্রে আমা অপেক্ষা অধিক ক্ষিপ্র আর অভিজ্ঞ তাদের কেউ আছে কি? জিহাদের ময়দানে আমা অপেক্ষা পুরাতন কোন ব্যক্তি আছে কি? বিশ বছর বয়স না হতেই আমি অস্ত্রধারণ করেছি। আজ ষাটত্তোর বয়সেও একই রকম শৌর্য নিয়ে আছি; কিন্তু যাকে মান্য করা হয় না তার অভিমতের মূল্য কি?

১। সিফফিনের যুদ্ধের পর মুয়াবিয়া চতুর্দিকে হত্যাকান্ড ও রক্তপাত ঘটাতে থাকে। আমিরুল মোমেনিনের শাসনাধীন শহরগুলোতে অনধিকার প্রবেশ করে সে আক্রমণ করতে থাকে। হাইত, আনবার ও মাদাইন আক্রমণ করার জন্য আমিরুল মোমেনিন সুফিয়ান ইবনে আউফ ঘামিদীর নেতৃত্বে ছয় হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী প্রেরণ করেছিলেন। সুফিয়ান প্রথমে মাদাইন গমন করে শহরটি পরিত্যক্ত দেখে আনবারের দিকে অগ্রসর হন। আনবারে পাঁচশত সৈন্যের একটি রক্ষীবাহিনী রেখে সুফিয়ান চলে যান। কিন্তু মুয়াবিয়ার দুর্ধর্ষ বাহিনীর গতিরোধ করা এত ছোট বাহিনীর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তবুও তাদের সাধ্যমত তারা চেষ্টা করেছে। কিন্তু শত্রুর আক্রমণ এত তীব্র ছিল যে, রক্ষীবাহিনীর প্রধান হাসান ইবনে হাসান বকরী ও অন্য ত্রিশজন নিহত হন। মুয়াবিয়ার বাহিনী আনবার লুণ্ঠন করে শহরটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে।

আমিরুল মোমেনিন এসব সংবাদ অবগত হয়ে মিম্বারে উঠে জনগণকে জিহাদে অনুপ্রাণিত করার মানসে এ খোৎবা প্রদান করেন। কিন্তু তাঁর আহবানে কেউ সাড়া না দেয়ায় তিনি বিরক্তি প্রকাশ করে মিম্বার থেকে নেমে পদব্রজে শত্রুর উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন এবং নুখায়লা নামক স্থান পর্যন্ত চলে গিয়েছিলেন। এ অবস্থা দেখে জনগণের আত্মসম্মানবোধ জাগ্রত হলো এবং তারা আমিরুল মোমেনিনকে অনুসরণ করে নুখায়লায় উপস্থিত হলো। জনগণ আমিরুল মোমেনিনকে ঘিরে ধরলো এবং তাঁকে ফিরে যাবার জন্য অনুরোধ করতে লাগলো। অবশেষে তারা শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদে যাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে চাপ প্রয়োগ করলে আমিরুল মোমেনিন ফিরে আসতে রাজী হলেন। তখন সাঈদ ইবনে কায়েস আট হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী নিয়ে আনবারের দিকে অগ্রসর হলেন। কিন্তু সুফিয়ান আনবার ত্যাগ করে চলে গেছে বলে সাঈদ শত্রুর মোকাবেলা না করেই ফিরে এসেছে। হাদীদ[১৫২] বর্ণনা করেছেন— সাঈদ কুফায় ফিরে আসাতে আমিরুল মোমেনিন এত মর্মাহত হয়েছেন যে, কয়েকদিন তিনি মসজিদেও যাননি এবং মসজিদ সংলগ্ন ঘরের বারান্দায় বসে এ খোৎবা লিখে তাঁর চাকর সা'দকে দিয়েছিলেন যেন সে জনগণকে পড়ে শুনিয়ে দেয়। অপরপক্ষে মুবারবাদ[১১২] বর্ণনা করেছেন যে, আমিরুল মোমেনিন যখন পদব্রজে নুখায়লাহ্ পৌছেন তখন তিনি একটা উঁচুস্থানে দাঁড়িয়ে এ ভাষণ দিয়েছিলেন (১ম খন্ড, পৃঃ ১০৪-১০৭)। ইবনে মায়ছামও এটা যুক্তিযুক্ত মনে করেন।

★★★★★

খোৎবা-২৮

ইহজগতের ক্ষণস্থায়ীত্ব ও পরকালের গুরুত্ব সম্পর্কে

নিশ্চয়ই, ইহকাল পেছন ফিরে উহার প্রস্থান ঘোষণা করছে এবং পরকাল অগ্রসরমান হয়ে উহার উপস্থিতির জানান দিচ্ছে। মনে রাখবে, আজই পরকালের জন্য প্রস্তুতি নেয়ার দিন এবং আগামীকাল যাত্রা করতে হবে। যারা আল্লাহ্র পথে অগ্রসর হয় তাদের স্থান বেহেশ্ত আর যারা পেছনে পড়ে থাকে তাদের স্থান হলো দোযখ। এমন কেউ কি নেই যে মৃত্যুর পূর্বে তওবা করে? এমন কেউ কি নেই যে কিয়ামতের পূর্বে কল্যাণকর কর্মসাধন করে?

সাবধান, তোমরা হয়তো আশায় বুক বেঁধে দিন গনছো কিন্তু তোমাদের আশার পেছনে মৃত্যুদূত দন্ডায়মান। যে ব্যক্তি আশায় কালক্ষেপণ না করে মৃত্যুর পূর্বেই আমল করে তার আমল তার উপকারে আসে এবং মৃত্যু তার ক্ষতি সাধন করতে পারে না। আবার যে ব্যক্তি মৃত্যুর আগমনের পূর্বে আমল করতে ব্যর্থ হয় মৃত্যু তার জন্য ক্ষতিকর এবং তার লোকসানের অন্ত নেই। সাবধান, মহাতঙ্কের সময় যেরূপ আমল কর, সুখের সময়েও ঠিক তদ্রূপ আমল করো। নিশ্চয়ই, কোন বেহেশ্ত কামনাকারী ও দোযখের ভয়ে আতঙ্কগ্রস্থকে আমি ঘুমিয়ে থাকতে দেখিনি। মনে রেখো, হক যার উপকারে আসেনি, বাতিলের ভোগান্তি সে পোহাবে এবং হেদায়েত যাকে দৃঢ় রাখতে পারেনি, গোমরাহী তাকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে নিয়ে যাবে।

সাবধান, (সত্যের পথে থাকার জন্য) দৃঢ়ভাবে তোমাদেরকে আদেশ দেয়া হয়েছে এবং কিভাবে তোমরা যাত্রাপথের রসদ সংগ্রহ করবে সে পথ সুস্পষ্ট করে দেখানো হয়েছে। আমার ভীষণ ভয় হচ্ছে তোমরা তোমাদের কামনা-বাসনা সম্প্রসারিত করে উহার অনুবর্তী হয়ে পড় কিনা। ইহকালেই রসদ সংগ্রহ কর যা তোমাদেরকে পরকালে রক্ষা করবে।

★★★★★

খোৎবা-২৯

জিহাদের সময় যারা মিথ্যা ওজর দেখিয়েছিল তাদের সম্বন্ধে

হে লোকসকল, তোমরা শারীরিকভাবে ঐক্য দেখালেও তোমাদের মন-মানস ও কামনা বিবিধমুখী। তোমাদের কথায় কঠিন পাথর গলে যায় এবং তোমাদের কার্য-কলাপ দেখে শত্রুপক্ষ প্রলুব্ধ হয়। তোমরা বসে বসে বাগাড়ম্বর কর, এটা করবে— ওটা করবে। অথচ যুদ্ধ আরম্ভ হলেই নিরাপদ দূরত্বে শটকে পড়। কেউ সাহায্যের জন্য আহবান করলে তোমরা কর্ণপাত কর না। তোমাদের সাথে কঠোর আচরণ করেও কোন লাভ হয় না। তোমরা এমন সব ভ্রান্ত ওজর দাঁড় করাও যেন খাতক তার ঋণ পরিশোধ করতে চায় না। অপদস্ত লোক কখনো নির্যাতন প্রতিহত করতে পারে না। কঠোর প্রচেষ্টা ছাড়া সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। এ ঘর ছাড়া আর কোন্‌টি তোমরা রক্ষা করবে? আমার পরে কোন্ ইমামের নেতৃত্বে তোমরা যুদ্ধ করবে?

আল্লাহ্‌র কসম, তোমরা আমাকে প্রতারণা করতে গিয়ে নিজেরাই প্রতারিত হচ্ছো এবং সেও তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হবে যে যুদ্ধক্ষেত্রে অকেজো তীর কুড়িয়ে জড়ো করে। তোমরা হলে শত্রুর উপর নিক্ষিপ্ত ভাঙ্গা তীরের মত। আল্লাহ্‌র কসম, বর্তমানে আমার অবস্থা এমন হয়েছে যে, আমি না পারি তোমাদের অভিমত গ্রহণ করতে, না পারি তোমাদের সাহায্য-সমর্থনের আশা করতে, আর না পারি তোমাদেরকে নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে। তোমাদের হয়েছেটা কি, শুনি? তোমরা কি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েছো? তোমাদের রোগ নিরাময়ের উপায় কি? বিরুদ্ধপক্ষও তোমাদের মতই মানুষ কিন্তু বৈশিষ্ট্যে তারা তোমাদের থেকে ভিন্ন প্রকৃতির। তোমরা কি কাজের চেয়ে কথাই বেশী বলতে থাকবে? পরহেজগারী ছেড়ে গাফেল হয়ে থাকবে? তোমরা কি (ন্যায়ের পথে) কাজ না করার প্রতি আসক্ত হয়েই থাকবে?[১]

১। নাহ্‌রাওয়ানের যুদ্ধের পর মুয়াবিয়া দাহ্‌হাক ইবনে কায়েস ফিহ্‌রীকে চার হাজার সৈন্যসহ কুফা এলাকায় প্রেরণ করে নির্দেশ দেয় যে, তারা যেন ঐ এলাকায় সন্ত্রাস সৃষ্টি করে সর্বদা গোলযোগ লাগিয়ে রাখে, যাকে পায় হত্যা করে, রক্তপাত ও ধ্বংসযজ্ঞ এমনভাবে অব্যাহত রাখে যাতে আমিরুল মোমেনিন শান্তি ও মানসিক স্বস্তি না পান। দাহ্‌হাক এ উদ্দেশ্য সাধনে তৎপর হয়ে নিরীহ জনগণের রক্তপাত ঘটিয়ে একের পর এক এলাকা ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে আছ-ছালাবিয়া নামক স্থানে উপনীত হলো। এখানে সে একটি হজ্বযাত্রী কাফেলার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের সর্বস্ব লুণ্ঠন করে নিয়ে গেল। তৎপর সে কুত্‌কুতানাহ্ এলাকায় প্রবেশ করে রাসুলের (সঃ) সাহাবা আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসুদের ভ্রাতুষ্পুত্র আমর ইবনে উয়ায়েজ ও তার সঙ্গীগণকে হত্যা করেছিল। এভাবে সে চতুর্দিকে রক্তপাত ও ব্যাপক ধ্বংস সাধন করে চলেছিল। আমিরুল মোমেনিন সংবাদ পেয়ে নিজের লোকদের ডেকে এহেন বর্বরতা প্রতিহত করার জন্য যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে বললেন। কিন্তু তারা এমন ভাব দেখালো যেন তারা যুদ্ধ এড়িয়ে চলতে চায়। তাদের আচরণে আমিরুল মোমেনিন বিরক্ত হয়ে এ ভাষণ দেন। ভ্রান্ত ও খোড়া ওজর না দেখিয়ে মাতৃভূমি রক্ষার পবিত্র দায়িত্ব তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেন। অবশেষে হাজর ইবনে আল-কিন্দি চার হাজার সৈন্য নিয়ে তাদমুর নামক স্থানে শত্রুকে রুখে দাঁড়ালো। অল্পক্ষণ মোকাবেলার পর শত্রুপক্ষ পালিয়ে গেল। এ যুদ্ধে শত্রুপক্ষের উনিশ জন নিহত হয়েছে এবং আমিরুল মোমেনিনের পক্ষের দু'জন শহীদ হয়েছে।

★★★★★

খোৎবা-৩০

উসমানের [১] হত্যার প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ করে আমিরুল মোমেনিন বলেনঃ

আমি যদি তাকে হত্যা করার আদেশ দিয়ে থাকি তা হলে আমিই হত্যাকারী। আর আমি যদি হত্যাকান্ডে অন্যদের বাধা দিয়ে থাকি তবে আমি তার সাহায্যকারী ছিলাম। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে, যে ব্যক্তি তাকে সাহায্য করেছে সে এখন আর বলতে পারে না যে, সে ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা উত্তম যে তাকে পরিত্যাগ করে চলে গিয়েছিল। আবার যে তাকে পরিত্যাগ করেছিল সেও বলতে পারে না যে, সে তার সাহায্যকারী অপেক্ষা উত্তম। আমি তার বিষয়াবলী তোমাদের কাছে খুলে বলছি। সে ক্ষমতা কুক্ষিগত করেছে এবং সম্পদ আত্মসাত করেছে। এ কাজগুলো সে অত্যন্ত ন্যাক্কারজনকভাবে করেছিল। তোমরা তার এসব কর্মকান্ডের প্রতিবাদ করেছো কিন্তু তাতে অনেক বাড়াবাড়ি করে ফেলেছো। সম্পদ আত্মসাৎকারী ও প্রতিবাদীদের মধ্যে যা ঘটেছে তার প্রকৃত সত্য আল্লাহ্ই জানেন।

১। উসমান ইবনে আফফান উমাইয়া বংশের প্রথম খলিফা। তিনি সত্তর বছর বয়সে ১লা মুহরাম, ২৪ হিজরী সনে খেলাফতে আরোহণ করেন। বার বছর মুসলিমদের শাসনকার্য পরিচালনার পর ৩৫ হিজরী সনের ১৮ই জিলহাজ্ব তারিখে জনগণের হাতে নিহত হন। হাশ্‌শ কাওকাবে তাকে সমাধিস্থ করা হয়।

এ সত্য অস্বীকার করার কোন যো নেই যে, উসমানের দুর্বলতা এবং তার অফিসারগণের (যাদের প্রায় সকলেই ছিল উমাইয়া গোত্রের) কুকর্ম মূলতঃ তার হত্যার কারণ। উসমানকে হত্যা করার জন্য মুসলিমগণের সর্বসম্মত ঐকমত্যের পেছনে আর কোন কারণ ছিল না। মুসলিমগণের মধ্যে তার ঘরের মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছাড়া আর কেউ তাকে রক্ষার্থে এগিয়ে আসেনি। তাকে হত্যার সিদ্ধান্তকালে মুসলিমগণ তার বয়স, তার জ্যেষ্ঠত্ব, তার মান-সম্ভ্রম এমনকি রাসুলের বিশিষ্ট সাহাবা হওয়ার বিষয়টিও বিবেচনা করেছিল। কিন্তু তার কর্মকান্ড পরিস্থিতিকে এমনভাবে ঘোলাটে করেছিল যে, তার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে একটি লোকও তার পক্ষে মত প্রকাশ করেনি। রাসুলের উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবাগণের প্রতি যে হারে নির্যাতন আর বাড়াবাড়ি করা হয়েছিল তা বর্ণনাতীত এবং তাতেই আরব গোত্রগুলোর মধ্যে শোক ও ক্রোধের উত্তাল ঊর্মি বয়ে চলেছিল। প্রত্যেককেই ক্রুদ্ধ করা হয়েছিল এবং সকলেই ঘৃণাভরে তার ঔদ্ধত্য ও ভ্রান্ত ক্রিয়াকলাপ দেখে যাচ্ছিলো। আবু জর গিফারীকে নির্মমভাবে অপমান করা হয়েছিল এবং গিফার গোত্রকে বহিষ্কার করার ফলে তাদের বন্ধু-গোত্রগুলো ক্ষিপ্ত হয়েছিল। আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসুদকে নির্দয়ভাবে প্রহার করায় হুজায়েল গোত্র ও তাদের বন্ধু গোত্রগুলো রুষ্ট ছিল। আম্মার ইবনে ইয়াসিরের পাঁজরের হাড় ভেঙ্গে দেয়ায় বনি মখজুম ও তাদের বন্ধু বনি জুহরাহ ক্রোধে বারুদ হয়েছিল। মুহাম্মদ ইবনে আবি বকরকে হত্যার ষড়যন্ত্র করায় বনি তায়েম ক্ষিপ্ত ছিল। এসব গোত্রের হৃদয়ে সর্বদা প্রতিশোধের ঝড় বইতো। অন্যান্য শহরের মুসলিমগণ উসমানের অফিসারদের হাতে নিগৃহীত হয়ে অসংখ্য অভিযোগ করেছিল কিন্তু অভিযোগগুলোকে কখনো পাত্তা দেওয়া হয়নি। অফিসারগণ সম্পদ আর জাকজমকের নেশায় যা ইচ্ছে তা করে বসতো। এমন কি যাকে খুশী যখন তখন অপমানিত, লাঞ্ছিত ও ধ্বংস করে দিত। রাষ্ট্রের কেন্দ্র হতে কোন প্রকার তদন্ত বা শাস্তির ভয় তাদের ছিল না। তাদের অত্যাচারের যাঁতাকল থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য মানুষ চিৎকার করে কেঁদেছিলো কিন্তু তাদের কান্না শোনার মত কেউ ছিল না। মানুষের মাঝে ঘৃণা আর অসন্তোষ ধুমায়িত হয়ে উঠেছিল কিন্তু এ রোষানল প্রশমিত করার মত কেউ ছিল না। রাসুলের সাহাবাগণ যখন দেখলেন শান্তি বিনষ্ট হয়ে গেছে, প্রশাসনে মারাত্মক বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে এবং ইসলামের মূল বৈশিষ্ট্য পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে তখন তারা ক্ষোভে-দুঃখে দারুণভাবে বিরক্ত হয়ে পড়লেন। দীনহীন ও বুভুক্ষু লোকেরা যখন এক টুকরা রুটির জন্য হাহাকার করছিল উমাইয়া গোত্রের লোকেরা তখন সম্পদের স্তূপে গড়াগড়ি খাচ্ছিলো। খেলাফত পরিণত হয়েছিল উদর-পূর্তি আর সম্পদ স্তূপীকরণের হাতিয়ারে। ফলে এসব অত্যাচারিত, নির্যাতিত, নিগৃহীত ও বুভুক্ষু জনগণ উসমানের হত্যার ক্ষেত্র তৈরী করতে পিছে পড়ে থাকেনি। খলিফার বিভিন্ন পত্র ও বার্তায় দেখা

যায় যে, কুফা, বসরা ও মিশর হতে বহু মানুষ তাদের সমস্যা নিয়ে মদিনায় জড়ো হয়েছিল এবং মদিনাবাসীদের সহানুভূতি অর্জনে সমর্থ হয়েছিল। মদিনাবাসীদের এহেন আচরণ দেখে উসমান মুয়াবিয়াকে লিখেছিলঃ

মদিনার জনগণ মতবিরোধী হয়ে গেছে; আমার অনুগত থাকার বিশ্বাস ভঙ্গ করেছে এবং আনুগত্যের শপথ ভঙ্গ করেছে। কাজেই তুমি আমাকে দ্রুতগামী বলিষ্ঠ অশ্বারোহী সৈন্য পাঠাও।

এ পত্র পেয়ে মুয়াবিয়াহ্ যে কার্যক্রম গ্রহণ করেছে তা হতে সাহাবাগণের অবস্থা অনেকটা অনুমেয়। ঐতিহাসিক তারাবী লিখেছেনঃ

যখন মুয়াবিয়ার হাতে উসমানের পত্রখানা পৌছলো তখন সে বিষয়টি গভীরভাবে চিন্তা করে দেখলো এবং রাসুলের সাহাবাগণের বিরোধিতা প্রকাশ্যে করা সঠিক পদক্ষেপ বলে বিবেচনা করেনি। কারণ মদিনায় সাহাবাগণের ঐকমত্য সম্পর্কে সে ভালভাবে অবগত ছিল।

এ সকল অবস্থার বিবেচনায় উসমানের হত্যাকে কতিপয় অতি উৎসাহী লোকে তাৎক্ষণিক অনুভূতির ফল মনে করে মুষ্টিমেয় বিদ্রোহীর উপর দায়িত্ব চাপিয়ে দিলে সত্যকে অবগুণ্ঠিত করা হবে মাত্র। উসমানের বিরোধিতা করার মত ক্ষেত্রসমূহ মদিনাতেই তিনি সৃষ্টি করেছিলেন। যারা বাহির হতে এসেছিল তারা শুধু তাদের দুর্দশা লাঘবের দাবী নিয়েই মদিনায় জড়ো হয়েছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল অবস্থার উন্নতি সাধন করা—রক্তপাত বা হত্যা নয়। যদি তাদের অভিযোগ শোনা হতো তাহলে হয়তো রক্তপাত ঘটতো না।

প্রকৃতপক্ষে যা ঘটেছিল তা হলো- উসমানের বৈমাত্রেয় ভাই আবদুল্লাহ্ ইবনে সা'দ ইবনে আবি সারাহ্র (মিশরের গভর্ণর) অত্যাচারে মিশরের জনগণ অতিষ্ঠ হয়ে মদিনায় এসে শহরের অদূরে জাকুশুব নামক উপত্যকায় অবস্থান নিয়েছিল। তাদের স্মারকলিপিসহ তারা একজন নেতৃস্থানীয় লোককে উসমানের নিকট প্রেরণ করে সা'দের অত্যাচার বন্ধ করার দাবী জানিয়েছিল। কিন্তু উসমান মিশরবাসীর প্রেরিত লোকটিকে কোন জবাব না দিয়ে ঘর থেকে বের করে দেয় এবং এহেন বিষয় দেখার যোগ্য নয় বলে মনে করে। এ ঘটনার পর মিশরবাসীগণ চিৎকার করতে করতে মদিনা শহরে ঢুকে পড়েছিল এবং উসমানের অহঙ্কার ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ ও দুর্ব্যবহারের কথা মদিনাবাসীকে জানিয়ে প্রতিকার চাইতে লাগলো। অপরদিকে বসরা ও কুফার যেসব লোক অভিযোগ নিয়ে মদিনায় এসেছিল তারাও মিশরবাসীদের সাথে যোগ দিয়েছিল। এমনিতেই মদিনাবাসীগণ ক্ষুব্ধ ছিল। ফলে মদিনাবাসীদের সহায়তায় বহিরাগতগণ উসমানের ঘরের দিকে অগ্রসর হয়ে ঘর অবরোধ করে ফেলেছিল।

অবশ্য এ অবরোধে খলিফার মসজিদে যাওয়া-আসায় কোন বাধা ছিল না। এ অবরোধের প্রথম শুক্রবারে উসমান তার খোৎবায় অবরোধকারীগণকে সাংঘাতিকভাবে তিরস্কার করে তাদের সন্ত্রাসী ও অপরাধীচক্র বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। এতে জনগণ ক্ষিপ্ত হয়ে তার প্রতি নুড়ি-টিল নিক্ষেপ করেছিল যাতে তিনি মিম্বার থেকে পড়ে গিয়েছিলেন। কয়েকদিন পর অবরোধকারীগণ তার মসজিদে আসা-যাওয়া নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল।

পরিস্থিতি ক্রমেই অবনতির দিকে যাচ্ছে দেখে, যেভাবে পারা যায়, অবরোধকারীদের সরিয়ে দিয়ে তাকে উদ্ধার করার জন্য উসমান আমিরুল মোমেনিনকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করেছিলেন। আমিরুল মোমেনিন বললেন, "যেখানে দেখা যাচ্ছে তাদের দাবী-দাওয়া ন্যায়সঙ্গত সেখানে কি শর্তে তাদেরকে সরে যেতে বলবো।" উসমান বললেন, "এ বিষয়ে আমি আপনাকে সর্বময় ক্ষমতা অর্পণ করলাম। আপনি যে শর্তে নিষ্পত্তি করবেন আমি তা-ই মেনে নিতে বাধ্য থাকবো।" ফলে আমিরুল মোমেনিন মিশরীয়দের সাথে সাক্ষাত করে বিস্তারিত আলোচনা করলেন। আলোচনায় স্থির হলো মিশরে স্বেচ্ছাচারিতা বন্ধের লক্ষ্যে আবদুল্লাহ্ ইবনে সা'দের পরিবর্তে মুহাম্মদ ইবনে আবি বকরকে মিশরের গভর্ণর করা হলে তারা মিশরে ফিরে যাবে। আমিরুল মোমেনিন উসমানের কাছে ফিরে এসে তাদের দাবীর কথা জানালেন। উসমান নির্দ্বিধায় তাদের দাবী মেনে নিতে স্বীকৃত হলেন এবং বললেন, "এসব বাড়াবাড়ি ও ঝামেলা-ঝক্কি সামলিয়ে উঠতে দিন কয়েক সময় লাগবে।" আমিরুল মোমেনিন বললেন, "মদিনাবাসীদের দাবী-দাওয়া সংক্রান্ত বিষয়ে সময় চাওয়া অবান্তর হবে; তবে

অন্যান্য এলাকার বিষয়ে খলিফার নির্দেশ পৌঁছানো পর্যন্ত সময় নেয়া যাবে।" উসমান বললেন, "মদিনার জন্যও অন্ততঃ তিন দিন সময়ের প্রয়োজন।" যা হোক, মিশরীয়দের সাথে আলাপ-আলোচনা করে আমিরুল মোমেনিন সকল শর্তের দায়-দায়িত্ব নিজেই গ্রহণ করলেন এবং তাঁর নির্দেশে তারা অবরোধ তুলে নিয়ে জাকুশুব উপত্যকায় ফিরে গেল। তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক মুহাম্মদ ইবনে আবি বকরকে সঙ্গে নিয়ে মিশরের উদ্দেশ্যে চলে গেল। বিষয়টি এখানে নিষ্পত্তি হয়ে গেল।

অবরোধ তুলে নেয়ার দ্বিতীয় দিনে মারওয়ান ইবনে হাকাম উসমানকে বললো, "আপদ দূর হয়ে গেছে, ভালই হলো। কিন্তু অন্যান্য শহর হতে লোকজন আসা বন্ধ করার জন্য এখন আপনাকে একটি বিবৃতি দিতে হবে যে, কিছু অবান্তর কথা শুনে কতিপয় লোক মদিনায় জড়ো হয়েছিল। যখন তারা জানতে পারলো তারা যা শুনেছে তা সম্পূর্ণ ভুল তখন তারা সন্তুষ্ট হয়ে ফিরে চলে গেছে।" উসমান প্রথমতঃ এমন একটা ডাহা মিথ্যা কথা বলতে রাজী হননি কিন্তু মারওয়ানের প্ররোচনায় শেষ পর্যন্ত তিনি মসজিদ-ই-নব্বীতে বললেনঃ

> *মিশরীয়গণ তাদের খলিফা সম্পর্কে কতিপয় সংবাদ পেয়েছিল এবং যখন তারা সন্তোষজনকভাবে জানতে পারলো যে, এসব কথা মিথ্যা ও ভিত্তিহীন তখন তারা নিজ শহরে ফিরে চলে গেছে।"*

উসমানের বক্তব্য শোনা মাত্র মসজিদে হৈ চৈ পড়ে গেল এবং মানুষ চিৎকার দিয়ে উসমানকে বলতে লাগলো, "তওবা করুন; আল্লাহ্‌কে ভয় করুন, একি ডাহা মিথ্যা আপনার মুখ দিয়ে বের হচ্ছে।" জনগণের চাপের মুখে সেদিন উসমান তওবা করে কাবার দিকে মুখ ফিরিয়ে বিলাপ করে আল্লাহ্‌র দরবারে কান্না-কাটি করে ঘরে ফিরে গেলেন।

এ ঘটনার পর আমিরুল মোমেনিন উসমানকে উপদেশ দিয়ে বললেন, "তোমার অতীত কুকর্মের জন্য সর্বসমক্ষে তওবা করা উচিত। তাতে এহেন বিদ্রোহ চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে। নচেৎ আগামীতে অন্য কোন এলাকার জনগণ বিদ্রোহী হয়ে এলে তোমাকে উদ্ধার করার জন্য তুমি আমার ঘাড়ে চেপে পড়বে।" ফলতঃ উসমান মসজিদ-ই-নব্বীতে একটা খোৎবা প্রদান করে নিজের ভুল স্বীকার করে তওবা করলেন এবং ভবিষ্যতে সতর্ক থাকার প্রতিশ্রুতি দিলেন। তিনি জনগণের প্রতিনিধিকে তার সাথে দেখা করার পরামর্শ দিলেন। জনগণের দাবী পূরণ ও তাদের দুঃখ-দুর্দশা দূরীভূত করার অঙ্গীকার তিনি করলেন। এতে জনগণ সন্তুষ্ট হয়ে তাদের মনের খারাপ অনুভূতি মুছে ফেলে উসমানের এ কাজের প্রশংসা করতে লাগলো। মসজিদ থেকে ঘরে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে মারওয়ান উসমানকে কিছু বলার জন্য এগিয়ে গেলে উসমানের স্ত্রী নাইলাহ্ বিনতে ফারাফিসাহ্ বাধা দিয়ে বললো, "আল্লাহ্‌র দোহাই, তুমি চুপ কর। তুমি এমন সব কথা বলবে যা ওনার মৃত্যু ডেকে আনবে।" মারওয়ান বিরক্ত হয়ে বললো, "এসব বিষয়ে আপনার মাথা ঘামানো উচিত নয়। আপনি এমন এক লোকের কন্যা যে কোন দিন অজু করতেও শেখেনি।" তাদের উভয়ের কথাবার্তা তিক্ততার দিকে যাচ্ছে দেখে উসমান উভয়কে থামিয়ে দিয়ে মারওয়ানকে তার কথা বলার অনুমতি দিলেন। মারওয়ান বললো, "মসজিদে আপনি এসব কি কথা বললেন আর কিসেরই বা তওবা করলেন? আমার মতে এ ধরনের তওবা অপেক্ষা পাপে লিপ্ত থাকা হাজার গুণ শ্রেয়। কারণ পাপ যত বেশীই হোক না কেন তাতে তওবার পথ সর্বদা খোলা আছে কিন্তু চাপের মুখে তওবা করা কোন তওবা-ই নয়। আপনি সরল বিশ্বাসে কথা বলেছেন কিন্তু আপনার প্রকাশ্য ঘোষণার ফলাফল দেখুন-জনতা আপনার দুয়ারে হাজির হয়েছে-এখন তাদের দাবী-দাওয়া পূরণ করুন।" উসমান বললেন, "ঠিক আছে, আমি যা বলেছি-বলেছিই; এখন তুমি জনগণকে ঠেকাও। তাদের সাথে কথা বলা আমার সাধ্যাতীত।" মারওয়ান এ সুযোগ হাত ছাড়া করলো না। সে বেরিয়ে এসে জনগণকে সম্বোধন করে বললো, "তোমরা কেন এখানে জড়ো হয়েছ? তোমরা কি লুটপাট করার জন্য আক্রমণ করতে চাও? মনে রেখো, তোমরা এত সহজে আমাদের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিতে পারবে না। তোমরা আমাদেরকে পরাভূত করতে পারবে, এ ধারণা তোমাদের মন থেকে মুছে ফেল। কেউ বল প্রয়োগ করে আমাদেরকে অধীনস্থ করতে পারবে না তোমাদের কৃষ্ণকায় চেহারা নিয়ে এখান থেকে চলে যাও। আল্লাহ্ তোমাদেরকে অপমানিত করুন এবং তাঁর অনুগ্রহ হতে তোমরা বঞ্চিত হও।"

জনগণ এহেন পরিবর্তিত রূপ দেখে রোষে ফেটে পড়লো এবং সোজা আমিরুল মোমেনিনের কাছে গিয়ে হাজির হলো। আমিরুল মোমেনিন সব কথা শুনে অত্যন্ত বিরক্ত হলেন এবং তৎক্ষণাৎ উসমানের নিকট গিয়ে বললেন, "হায় আল্লাহ্, তুমি মুসলিমদের সাথে একি দুর্ব্যবহার করলে! একজন বেঈমান ও চরিত্রহীনের জন্য তুমি নিজেই ইমান পরিত্যাগ করলে!! তোমার সব বোধশক্তি যেন হারিয়ে গেছে। অন্ততঃপক্ষে তুমি তোমার প্রতিশ্রুতির মর্যাদা রক্ষা করতে। এটা কেমন কথা যে, মারওয়ানের সকল কুকর্ম তুমি চোখ বুজে মেনে নিচ্ছ। মনে রেখো, সে তোমাকে এমন অন্ধকার কুপে নিক্ষেপ করবে যেখান থেকে তুমি আর বেরিয়ে আসতে পারবে না। তুমি মারওয়ানের বাহনে পরিণত হয়েছ। কাজেই সে তোমাতে চড়ে যেমন খুশী তেমন করছে। তার ইচ্ছানুযায়ী তোমাকে ভুল পথে পরিচালিত করছে। ভবিষ্যতে আমি তোমার এসব কাজ কারবার সম্বন্ধে কোন কথাই বলবো না। এখন তুমি তোমার কাজ সামাল দাও"।

এসব কথা বলে আমিরুল মোমেনিন চলে এলেন এবং নাইলাহ্ সুযোগ পেয়ে উসমানকে বললো, "আমি কি তোমাকে মারওয়ান হতে দূরে থাকতে বলিনি? সে তোমাকে এমন ফাঁদে আটকিয়ে দিতে সর্বশক্তি প্রয়োগ করছে যেটা থেকে তুমি বের হয়ে আসতে পারবে না। যে লোকটি সমাজে নিকৃষ্ট ও হীন প্রকৃতির তার পরামর্শ গ্রহণ করে তোমার কোন কল্যাণ হতে পারে না। এখনো সময় আছে আলীর শরনাপন্ন হও, তার পরামর্শ গ্রহণ কর। তা না হলে এ বিশৃংখল অবস্থা সামলানো তোমার অথবা মারওয়ানের ক্ষমতা বহির্ভূত।" উসমান এতে প্রভাবিত হলেন এবং আমিরুল মোমেনিনের নিকট একজন লোক পাঠালেন কিন্তু আমিরুল মোমেনিন তার সাথে সাক্ষাত করতে রাজী হননি। এসময় কোন অবরোধ ছিল না কিন্তু চারিদিকে লোকজন ঘৃণায় রি রি করছিলো। কোন মুখে উসমান বাইরে আসবে? অথচ বাইরে না এসে তার কোন উপায়ও ছিল না। ফলতঃ গভীর রাতে তিনি চুপি চুপি আমিরুল মোমেনিনের নিকট এসে কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে তার সহায়হীনতা ও একাকীত্বের কথা বলে রোদন করতে লাগলেন। আমিরুল মোমেনিন বললেন, "তুমি মসজিদ-ই-নব্বীতে জনগণের সম্মুখে দাঁড়িয়ে ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করেছ। জনগণ তোমার নিকট গেলে তাদেরকে গালি-গালাজ করে তাড়িয়ে দিয়েছো। এটাই যখন তোমার প্রতিশ্রুতির অবস্থা তখন আমি কি করে তোমার ভবিষ্যৎ কথায় আস্থা রাখতে পারি। আমাকে তুমি বাদ দাও। তোমার কোন দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নয়। তোমার সামনে অনেক পথ খোলা আছে। তোমার ইচ্ছানুযায়ী যে কোন পথ অবলম্বন করতে পার।" আমিরুল মোমেনিনের এসব কথা শুনে উসমান ফিরে এলেন এবং তার বিরুদ্ধে গোলযোগের জন্য আমিরুল মোমেনিনকে দোষারোপ করতে লাগলেন। তিনি প্রচার করতে লাগলেন, "সকল গোলযোগ প্রশমিত করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও আলী কিছুই করছেন না।

ওদিকে যারা মুহাম্মদ ইবনে আবি বকরকে নিয়ে মিশর অভিমুখে চলে গিয়েছিল তারা হিজাজ সীমান্ত অতিক্রম করে লোহিত সাগর উপকূলে আয়েলা নামক স্থানে পৌছে দেখতে পেল একজন লোক বহুদূরে এত দ্রুত উট হাঁকিয়ে যাচ্ছে যেন শত্রু তাকে তাড়া করছে। লোকটির চালচলন ও হাবভাব দেখে সকলের সন্দেহের উদ্রেক হয়। তারা তাকে কাছে ডেকে এনে পরিচয় জিজ্ঞেস করলো। উত্তরে সে বললো সে উসমানের দাস। তারা জিজ্ঞেস করলো কোথায় সে যাচ্ছিলো। সে বললো, মিশরে। তারা আবার জিজ্ঞেস করলো, কার কাছে যাচ্ছো। সে বললো, মিশরের শাসনকর্তার কাছে। তারা বললো, শাসনকর্তা তাদের সাথেই রয়েছে; তবু কার কাছে সে যাচ্ছিলো। সে বললো, আবদুল্লাহ্ ইবনে সা'দের কাছে। তারা জিজ্ঞেস করলো, কোন পত্র আছে কিনা। সে অস্বীকার করলো। তারা জিজ্ঞেস করলো, কি উদ্দেশ্যে সে যাচ্ছিলো। সে বললো, তা তার জানা নেই। তারা লোকটির কাপড়-চোপড় তল্লাশি করে কিছুই পেল না। তাদের মধ্যে কিনানাহ্ ইবনে বিশর তুজিবী বললো, "লোকটির পানির মশক দেখ।" অন্যরা হেসে উঠে বললো, "তাকে ছেড়ে দাও। পানিতে কি করে পত্র রাখবে।" কিনানাহ বললো, "তোমরা জান না, এরা কত ধূর্ত চাল চালতে পারে।" ফলে পানির মশক তল্লাশি করে তাতে একটি সীসার নল পাওয়া গেল এবং সেই নলে একটি পত্র পাওয়া গেল। এ পত্রে খলিফার নির্দেশ লিখা ছিল, "যখন মুহাম্মদ ইবনে আবি বকর ও তার দল তোমার নিকট উপস্থিত হবে তখন তাদের মধ্যে অমুক অমুককে হত্যা করো, অমুক অমুককে গ্রেপ্তার করো এবং অমুক অমুককে জেলে রেখো। তুমি তোমার পদে অধিষ্ঠিত থেকো।" পত্র পড়ে সকলে হতভম্ব হয়ে গেল এবং তাজ্জব বনে গিয়ে একে অপরের মুখের দিকে তাকাতে লাগলে।

তারা ভাবলো মিশরের দিকে এগিয়ে যাওয়া মানেই মৃত্যুর মুখোমুখী হওয়া। কাজেই তারা উসমানের দাসকে নিয়ে মদিনায় ফিরে এলো। মদিনায় এসেই তারা সাহাবাগণকে উসমানের পত্রখানা দেখালো। পত্র দেখে সকলেই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল এবং এমন কেউ বাকী রইল না যে উসমানকে গাল-মন্দ না করেছে। তৎপর কয়েকজন সাহাবা মিশরীয়দের সঙ্গে নিয়ে উসমানের কাছে গেল। তারা জানতে চাইলো পত্রের গায়ে সীলটি কার। উসমান নির্দ্বিধায় বললো ওটা তার নিজের সীল। তারা জানতে চাইলো পত্রখানা কার হাতের লেখা। উসমান জবাব দিলো ওটা তার সচিবের হাতের লেখা। তারা জিজ্ঞেস করলো ধৃত লোকটি কার দাস। তিনি বললেন, দাসটি তার নিজের। তারা জিজ্ঞেস করলো, লোকটিকে বহনকারী উটটি কার। তিনি জবাব দিলেন, উটটি সরকারের। তারা জিজ্ঞেস করলো, কে একে প্রেরণ করেছিল। তিনি উত্তর দিলেন তার জানা নেই। উপস্থিত জনগণ বললো, " আশ্চর্য, সব কিছু আপনার; আর আপনি জানেন না কে উহা প্রেরণ করেছে। আপনি যদি এতই অসহায় হয়ে থাকেন তবে খেলাফত ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে যান, যাতে করে এমন একজন লোক আসতে পারেন যিনি মুসলিমদের বিষয়াদি পরিচালনা করতে পারবেন। তিনি বললেন, "খেলাফতের এ পোষাক যেখানে আল্লাহ্ আমাকে পরিয়েছেন সেখানে এটা খুলে ফেলা কোনক্রমেই আমার পক্ষে সম্ভব নয়। অবশ্য, আমি তওবা করবো।" লোকেরা বললো," কেন আপনি তওবার কথা বলেন; এইতো সেদিন আপনি অবজ্ঞাভরে তওবা ভঙ্গ করেছেন যে দিন আপনার দরজায় উপস্থিত জনগণকে আপনার প্রতিনিধি মারওয়ান গালাগালি দিয়ে অপমান করেছে। আপনি যা চেয়েছেন তা তো আপনার পত্রেই রয়েছে। আমরা আর কোন ধাপ্পাবাজিতে পড়তে চাই না। আপনি খেলাফত ছেড়ে দিন। আমাদের ভ্রাতৃগণ যদি আমাদের দাবী সমর্থন করে তবে আমরাও তাদেরকে সম্মান ও মর্যাদার আসনে বসাবো। আর যদি তারা যুদ্ধ করতে চায় তবে আমরাও প্রস্তুত আছি। আমাদের হাত এখানো অচল হয়ে যায়নি, তরবারিও ভোতা হয়ে পড়েনি। যদি সকল মুসলিমের প্রতি আপনার সম্মানবোধ থেকে থাকে এবং ন্যায়ের প্রতি যদি আপনার সামান্যতম মনোযোগ থেকে থাকে তবে মারওয়ানকে আমাদের হাতে তুলে দিন। আমরা তাকে জিজ্ঞেস করে দেখি কার শক্তি ও সমর্থনে সে মুসলিমদের মূল্যবান জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলে এহেন পত্র লিখেছে।" উসমান তাদের দাবী প্রত্যাখ্যান করে মারওয়ানকে তাদের সম্মুখে হাজির করতে অস্বীকৃতি জানালেন। এতে জনতার মনে বদ্ধমূল ধারণা হলো যে, পত্রখানা উসমানের নির্দেশে লিখা হয়েছে।

শান্ত পরিবেশ আবার অশান্ত হয়ে উঠলো। যে সকল বহিরাগত জাখুশুব উপত্যকায় অবস্থান করছিলো তারা স্রোতের মত ছুটে এসে মদিনার রাস্তায় রাস্তায় ছড়িয়ে পড়লো এবং উসমানের ঘরে প্রবেশের পথ চতুর্দিক হতে অবরোধ করে ফেললো। এ অবরোধ চলাকালে রাসুলের সাহাবা নিয়ার ইবনে ইয়াদ উসমানের সাথে কথা বলার ইচ্ছা পোষণ করে তার ঘরের সামনে গিয়েছিল। উসমান উপর থেকে উঁকি দিলে নিয়ার বললো, "ওহে উসমান, আল্লাহ্র দোহাই খেলাফত ছেড়ে দিয়ে মুসলিমদেরকে রক্তপাত হতে রক্ষা করুন।" এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে উসমানের লোক তীর নিক্ষেপ করে নিয়ারকে নিহত করলো। এতে জনতা আরো ক্ষিপ্ত হয়ে গেল এবং নিয়ারের হত্যাকারীকে তাদের হাতে সোপর্দ করার জন্য চিৎকার দিতে লাগলো। উসমান সোজা জবাব দিলেন যে, তার নিজের সমর্থককে তিনি তাদের হাতে তুলে দিতে পারবেন না। উসমানের এহেন একগুঁয়েমি আগুনে পাখার বাতাসের মত কাজ করলো এবং প্রচন্ড উত্তেজনায় জনতা তার দরজায় আগুন লাগিয়ে দিল এবং ভেতরে প্রবেশ করার জন্য এগিয়ে যেতে লাগলো। এ অবস্থায় মারওয়ান ইবনে হাকাম, সাইদ ইবনে আস ও মুঘিরাহ ইবনে আখনাস তাদের কিছু সৈন্য নিয়ে অবরোধকারীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং উসমানের দরজায় হত্যা ও রক্তপাত শুরু হয়ে গেল। একদিকে জনতা ঘরে প্রবেশ করার চেষ্টা করছে, অপরদিকে উসমানের সৈন্যরা তাদের পেছনে হটিয়ে দিচ্ছে। উসমানের ঘর সংলগ্ন ঘরটি ছিল আমর ইবনে হাজম আল-আনসারীর। আমর তার ঘরের দরজা খুলে দিয়ে সেদিক দিয়ে অগ্রসর হবার জন্য অবরোধকারীদেরকে বললো। তারা সে পথে উসমানের ঘরের ছাদে উঠে গেল এবং উন্মুক্ত তরবারি হাতে ছাদ হতে ভেতরে প্রবেশ করলো। কয়েক মুহূর্ত বিশৃংখল যুদ্ধের পর উসমানের তথাকথিত শুভাকাঙ্ক্ষীগণ তাকে ফেলে দৌড়ে রাস্তায় পালিয়ে গেল এবং কেউ কেউ উম্মে হাবিবা বিনতে আবি সুফিয়ানের ঘরে আত্মগোপন করলো। উসমানের পাশে যারা ছিল তাদের সকলকে উসমানের সাথে হত্যা করা হয়েছে। (সা'দ[১৩৭], ৩য় খন্ড, পৃঃ৫০-৫৮; তাবারী[৭৫], ১ম খন্ড, পৃঃ ২৯৯৮-৩০২৫; আছীর[২]. ৩য় খন্ড, পৃঃ ১৬৭-১৮০; হাদীদ[১৫২], ২য় খন্ড, পৃঃ ১৪৪-১৬১)

এসব ঘটনা প্রবাহ হতে আমিরুল মোমেনিনের অবস্থান সহজেই অনুমেয়। তিনি হত্যাকীদেরকে সমর্থনও দেননি আবার উসমানের প্রতিরক্ষার জন্য দন্ডায়মানও হননি। কারণ তিনি যখন দেখলেন উসমানের কথা ও কাজ এক নয়, তখন তিনি নিজকে সম্পূর্ণ পৃথক করে রাখলেন।

★★★★★

খোৎবা-৩১

জামালের যুদ্ধের প্রাক্কালে আমিরুল মোনেনিন আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসকে জুবায়র ইবনে আওয়ামের নিকট প্রেরণ করেছিলেন যেন আনুগত্যে ফিরে আসার জন্য জুবায়রকে সে উপদেশ দেয়। আবদুল্লাহ্‌কে তখন বলেছিলেন;

তালহা ইবনে উবায়দিল্লাহ্‌র সঙ্গে দেখা করো না। যদি তুমি দেখা কর তবে দেখবে সে একটা অবাধ্য ষাঁড়ের মত, যার শিং বাঁকা হয়ে কানের দিকে চলে এসেছে। সে ভয়ানক অবাধ্য বাহনে চড়ে এবং বলে এটাকে পোষ মানানো হয়েছে। তুমি জুবায়রের সাথে দেখা করো, কারণ সে তুলনামূলকভাবে কোমল মেজাজের। তাকে বলো যে, তোমার মামাত ভাই বলেন, "হিজাজে তুমি আমাকে চিনেছিলে বা গ্রহণ করেছিলে, কিন্তু ইরাকে তুমি আমাকে চেন না। তুমি আগে যা দেখিয়েছিলে কিসে তোমাকে তা হতে বিরত করেছে।"

★★★★★

খোৎবা-৩২

দুনিয়ার অবমূল্যায়ন ও মানুষের প্রকারভেদ সম্বন্ধে

হে লোকসকল, আমরা এমন একটা বিভ্রান্তিকর ও অপ্রশংসনীয় সময়ে দিন কাটিয়ে যাচ্ছি যখন ধার্মিকগণকে দুশ্চরিত্র মনে করা হয় এবং অত্যাচারী সীমালঙ্ঘন করে চলে। আমরা যা জানি তদ্বারা যথাযথভাবে উপকৃত হই না আর যা জানি না সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে জেনে নিতে চাই না। বালা মুসিবত আপতিত হবার পূর্বে আমরা দুর্যোগকে ভয় করি না।

মানুষ চার শ্রেণীর হয়ে থাকে। প্রথম শ্রেণী হচ্ছে তারা যারা সম্পদের অভাবে, উপায়-উপকরণের অভাবে ও সমাজে নিম্ন অবস্থানের (ক্ষমতার অভাবে) কারণে ফ্যাসাদ-বিবাদ সৃষ্টি করা হতে বিরত থাকে।

দ্বিতীয় শ্রেণী হচ্ছে তারা যারা তরবারি উন্মুক্ত করে প্রকাশ্যে অন্যায় অবিচার করে এবং পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য সংগ্রহ করে এবং সম্পদ আহরণ, ক্ষমতা দখল ও মিম্বারে আরোহণের জন্য নিজের দ্বীনকে বরবাদ করেছে। আল্লাহ্‌র নিকট যা রয়েছে উহার পরিবর্তে দুনিয়া ক্রয় করা কতই না নিকৃষ্ট লেনদেন।

তৃতীয় শ্রেণী হচ্ছে তারা যারা পরকালের জন্য আমলের মাধ্যমে দুনিয়া অন্বেষণ করে (অর্থাৎ পার্থিব সুযোগ লাভের জন্য ধর্ম-কর্ম করে)। এরা ইহকালের ক্রিয়াকর্মের মাধ্যমে পরকালের মঙ্গল অন্বেষণ করে না। এরা নিজেদের দেহকে শান্ত-শিষ্ট রাখে, ধীর পদক্ষেপে চলাফেরা করে, বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জনের জন্য পোশাক-পরিচ্ছদে

দেহকে সাজিয়ে রাখে এবং পাপ করার উপায় হিসেবে এমন অবস্থা দেখায় যেন সে আল্লাহ্র সাথে সম্পর্কযুক্ত (অর্থাৎ প্রকাশ্যে সাধু সেজে সৎ ব্যক্তির ছদ্মবেশে পাপে লিপ্ত থাকে)।

চতুর্থ শ্রেণী হচ্ছে তারা যারা দুর্বলতা ও উপায়-উপকরণের অভাবে রাজত্ব চাওয়া হতে পিছিয়ে রয়েছে। এতে তাদের অবস্থান হীন হয়ে রয়েছে, আর তারা এ অবস্থাকে তৃপ্তি নাম দিয়েছে। তারা পরহেজগার ব্যক্তিদের আলখেল্লা পরিধান করে যদিও পরহেজগারের গুণাবলীর সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই।

এরপরও কিছু লোক থেকে যায় যারা ফেরত যাওয়াকে স্মরণ করে দৃষ্টি আনত রাখে এবং কেয়ামতের ভীতি তাদের চোখকে অশ্রুসিক্ত রাখে। তাদের কতেক লোক সমাজ হতে ভয়ে সরে পড়েছে ও অদৃশ্য হয়ে রয়েছে, কতেক ভয় বিহ্বলিত ও দমিত, কতেক নিশ্চুপ যেন জন্তুর মুখ-বন্ধ মুখে আঁটা, কতেক এখলাছের সাথে মানুষকে সত্যের দিকে আহবান করে এবং কতেক শোকাভিভূত ও দুঃখ-দুদর্শাগ্রস্ত। আত্মগোপনতা এদেরকে নামবিহীন করে দিয়েছে এবং সমাজে এদের কোন কদর নেই। সুতরাং তারা তিক্ত পানিতে বাস করে। তাদের মুখ বন্ধ এবং হৃদয় ভগ্ন ও ক্ষত বিক্ষত। তারা ক্লান্ত না হওয়া পর্যন্ত মানুষকে নছিহত করেছে। তারা অপমানিত না হওয়া পর্যন্ত অত্যাচারিত হয়েছে এবং সংখ্যায় নগণ্য না হওয়া পর্যন্ত নিহত হয়েছে।

দুনিয়া তোমাদের চোখে বাবলা গাছের বাকল অথবা পশমের কর্তিত টুকরা অপেক্ষা মূল্যহীন হওয়া উচিত। তোমাদের পরবর্তীগণ তোমাদের নিকট হতে উপদেশ গ্রহণ করার পূর্বে তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীগণ হতে উপদেশ গ্রহণ কর এবং দুনিয়াকে নিকৃষ্ট মনে করে উহা হতে দূরে থাকো। মনে রেখো, দুনিয়ার সাথে যারা তোমাদের চেয়েও অধিক বন্ধুত্ব করেছে, দুনিয়া তাদের সাথেও সম্পর্ক ছেদ করেছে।

★★★★★

খোৎবা-৩৩

আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেন যে, আমিরুল মোমেনিন যখন বসরার লোকদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য বেরিয়ে এলেন তখন তিনি (আবদুল্লাহ্) যিকার নামক স্থানে আমিরুল মোমেনিনের বক্তব্য শুনতে এসে দেখলেন আমিরুল মোমেনিন তাঁর জুতা সেলাই করছেন। তিনি আমাকে (আবদুল্লাহ্কে) বললেন, "এ জুতার দাম কত? আমি বললাম, এটার এখন কোন মূল্য নেই।" তিনি বললেন, "আল্লাহ্র কসম, আমি ন্যায় প্রতিষ্ঠিত করেছি এবং ভ্রান্তি প্রতিহত করেছি; শুধুমাত্র এ বিষয়টি ব্যতীত তোমাদের শাসনকার্য চালনা অপেক্ষা এ জুতা আমার কাছে অনেক বেশী প্রিয়।" এরপর তিনি মানুষের সম্মুখে বেরিয়ে এসে বললেন ঃ

নিশ্চয়ই, আল্লাহ্ মুহাম্মদকে (সঃ) যখন পাঠিয়েছিলেন তখন আরবদের মধ্যে কেউ বই পড়তে পারতো না অথবা কেউ নবুয়ত দাবী করেনি। তিনি মানুষকে পথ প্রদর্শন করেছিলেন যে পর্যন্ত না তারা সঠিক পথে এসে মুক্তির সন্ধান পেয়েছে। ফলে, তাদের নেতাগণ সোজা হয়ে গেল এবং তাদের অবস্থা নিরাপদ হলো।

আল্লাহ্র কসম, আমি তাদের নেতৃত্বে ছিলাম যতক্ষণ পর্যন্ত না দেওয়ালসহ (ঘরটি) সুন্দর আকৃতি সম্পন্ন হয়েছিল। আমি কখনো কোন প্রকার দুর্বলতা বা ভীরুতা প্রদর্শন করিনি। আমার বর্তমান পদচারণাও পূর্ববৎ

রয়েছে। আমি ভ্রান্তি আর অন্যায়কে ততক্ষণ পর্যন্ত ভেদ করতে থাকবো যতক্ষণ পর্যন্ত না উহার পার্শ্বদেশ হতে ন্যায় বেরিয়ে আসে।

কুরাইশদের সাথে আমার বিবাদের কারণ কি? আল্লাহ্র কসম, যখন তারা ইমানহারা ছিল তখন আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি এবং যদি তারা এখনো ভ্রান্ত পথ অনুসরণ করে তবে আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো। তাদের জন্য বিগত দিনে আমি যেমন ছিলাম আজো তেমনই থাকবো।

আল্লাহ্র কসম, আমাদের প্রতি কুরাইশগণের বিদ্বেষপরায়ণতার কারণ হলো আল্লাহ্ আমাদেরকে (রাসুল ও তাঁর আহ্লুল বাইত দ্বারা) তাদের ওপর প্রাধান্য ও মর্যাদা প্রদান করেছেন। সুতরাং আমরা তাদেরকে আমাদের রাজ্যে প্রবেশ করার অনুমতি দিয়েছিলাম এবং তাতে তাদের অবস্থা এমন হলো যেমন এক কবি বলেছেনঃ

আমার জীবনের কসম, তুমি প্রতিভোরে তাজা দুধ পান করতে থাকো, এবং মাখন দিয়ে উত্তম মানের খেজুর খেতে থাকো; আমরা তোমাকে মহত্ব দিয়েছি যা তোমার কোনদিন ছিল না, এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ঘোড়া আর শক্ত তীর দ্বারা তুমি এখন প্ররক্ষিত[১]।

১। আমিরুল মোমেনিনের এ খোৎবাটি ফদক রাষ্ট্রায়ত্ব করায় রাসুলের (সঃ) পবিত্র কন্যা ফাতিমা যে ভাষণ দিয়েছিলেন উহার মতই। ফাতিমা বলেছিলেনঃ

হে লোক সকল, তোমরা দোযখের অগ্নিকুন্ডের প্রান্তে ছিলে (কুরআন, ৩ঃ১০৩)। তোমরা এক ঢোক পানির মত নগণ্য ছিলে। তোমরা ছিলে মুষ্টিমেয় লোভী এবং দ্রুতগামীর ঝলকের মত সংখ্যালঘিষ্ট। তোমরা ছিলে পায়ের নীচের ধুলিকণার মত পদদলিত। তোমরা নোংরা পানি পান করতে। তোমরা টেনিং না করা চামড়া খেতে। তোমরা ছিলে হীনমনা ও ঘৃণিত। আল্লাহ্ তোমাদেরকে আমার পিতা মুহাম্মদের (সঃ) মাধ্যমে উদ্ধার করেছেন।

★★★★★

খোৎবা-৩৪

সিরিয়ার (শ্যাম) জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রস্তুতির জন্য নিজের লোকদেরকে আমিরুল মোমেনিন বলেন ঃ

দুর্ভাগ্য তোমাদের। তোমাদেরকে তিরস্কার করতে করতে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। তোমরা কি পরকালের পরিবর্তে ইহকালের জীবনকেই অধিক পছন্দ করে বসেছো? তোমরা কি মর্যাদাকর অবস্থার স্থলে অমর্যাদাকর অবস্থাকে অধিক ভালবেসেছো? শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য যখন আমি তোমাদেরকে আহ্বান করি তখন তোমরা এমনভাবে ছানাবড়া চোখ কর মনে হয় যমদূতকে দেখেছো এবং মুমূর্ষু লোকের মত সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়। আমি যতই তোমাদেরকে যুক্তিতর্ক দিয়ে বুঝাই তা তোমাদের বোধগম্য হয় না; তোমরা হতবুদ্ধি আস্থাতেই থাকো। তোমাদের হৃদয় যেন মত্ততায় আচ্ছন্ন, তাই তোমরা কিছুই বোঝ না। তোমরা চিরতরে আমার আস্থা হারিয়ে ফেলেছো। না তোমরা এমন অবলম্বন যাতে নির্ভর করা যায়, আর না তোমরা এমন উপায় যদ্বারা সম্মান ও বিজয় অর্জন করা যায়। তোমাদের উপমা হচ্ছে সেই উটের পালের মত যার রাখাল পালিয়ে গেছে, ফলে এ দিকে ওগুলোকে একত্রিত করলে ওদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

আল্লাহ্র কসম, যুদ্ধানল প্রজ্জ্বলনের জন্য তোমরা বড়ই মন্দ লোক। তোমরা গুপ্ত চক্রান্তের শিকার হচ্ছো কিন্তু শত্রুকে তোমাদের চক্রান্তের শিকার করতে পারছো না। তোমাদের এলাকার সীমানা ক্রমেই সংকীর্ণ হয়ে আসছে

অথচ তোমরা তাতে ক্রুদ্ধ হচ্ছো না। তোমাদের বিরুদ্ধ পক্ষের চোখে ঘুম নেই অথচ তোমরা অমনোযোগী। আল্লাহ্র কসম, অন্যলোকে করবে বলে যারা কর্মসাধনে লিপ্ত হয় না তাদের জন্য পরাজয় অবধারিত। আল্লাহ্র কসম, তোমাদের হাবভাব দেখে আমার এ বিশ্বাস জন্মেছে যে, যদি যুদ্ধ বাঁধে এবং তোমরা তোমাদের চারিদিকে মৃত লাশ দেখো তবে তোমরা আবি তালিবের পুত্রকে ধড় থেকে দ্বিখন্ডিত মস্তকের মত পরিত্যাগ করে কেটে পড়বে।

আল্লাহ্র কসম, যে ব্যক্তি প্রতিপক্ষের জন্য এরূপ সুযোগ সৃষ্টি করে যাতে শত্রু তাকে পরাভূত করে তার মাংশ হাড় থেকে আলাদা করে ফেলে, তার হাড়গোড় বিচূর্ণ করে দেয় ও তার চামড়া তুলে নেয়, তার মত নিঃসহায় আর কেউ নেই এবং বক্ষস্থলের অতি দুর্বল দিকে তার হৃদয় স্থাপিত। তোমরা ইচ্ছা করলে সেরকম দুর্বল ও নিঃসহায় হতে পার। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে আমি আল-মাশরাফিয়ার ধারালো তরবারির সদ্ব্যবহার করবো যা মাথার খুলি উড়িয়ে দেবে এবং হস্ত-পদ ব্যবচ্ছেদ করবে। তারপর আল্লাহ্ তাঁর ইচ্ছানুযায়ী যা করার তাই করবেন।

হে লোকসকল, তোমাদের ওপর আমার অধিকার আছে আর আমার ওপরও তোমাদের অধিকার আছে। আমার ওপর তোমাদের অধিকার হচ্ছে তোমাদেরকে সৎপরামর্শ প্রদান, তোমাদের ন্যায্য পাওনা সম্পূর্ণ পরিশোধ করা, তোমাদেরকে শিক্ষা দেওয়া যেন তোমরা অজ্ঞ না থাকো এবং আচরণের কার্যকারণ-নীতি বিষয়ে নির্দেশনা দেওয়া যাতে তোমরা আমল করতে পার। তোমাদের ওপর আমার অধিকার হচ্ছে তোমরা আনুগত্যে অটল থাকবে, আমার সামনে অথবা পেছনে আমার শুভাকাঙ্খী হয়ে থাকবে, আমার আহ্বানে সাড়া দেবে এবং আমার আদেশ মান্য করবে।

★★★★★

খোৎবা-৩৫

সালিশীর[১] পর আমিরুল মোমেনিন এ ভাষণ দিয়েছিলেন

প্রতিষ্ঠিত প্রশংসা আল্লাহ্র যদিও সময় আমাদের জন্য চরম দুর্যোগ ও অপ্রত্যাশিত ঘটনা বয়ে এনেছে। এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন মাবুদ নেই, তাঁর কোন অংশীদার নেই, তাঁর সাথে আর কারো তুলনা হয় না এবং মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর বান্দা ও রাসুল।

সমবেদী উপদেষ্টার জ্ঞান আর অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও তার অবাধ্যতা আমাদের জন্য নৈরাশ্য ও দুঃখজনক ফলাফল ডেকে আনলো। এ সালিশী সম্পর্কে আমি পূর্বাহ্নেই তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলাম এবং আমার গোপন মনোভাব তোমাদের কাছে ব্যক্ত করেছিলাম কিন্তু তোমরা রূঢ় প্রতিপক্ষ ও জঘন্য অবাধ্যের মত আমার আদেশ প্রত্যাখ্যান করেছো। আহা! যদি কাসিরের[২] আদেশ প্রতিপালিত হতো!! উপদেষ্টা নিজেই তার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সন্দেহে পতিত হয়েছিল এবং তার বুদ্ধিমত্তা নিস্তেজ হয়ে গিয়েছিল। ফলে আমার ও তোমাদের অবস্থা যা কবি হাওয়াজিন বলেনঃ

> *মুনারাজিল লিওয়াদে আমি তোমাদেরকে আমার আদেশ দিয়েছিলাম, কিন্তু তোমরা পরদিন দুপুরের পূর্ব পর্যন্ত আমার উপদেশের কল্যাণ দেখতে পাওনি[৩]।*

১। সিফফিনের যুদ্ধে ইরাকীদের রক্ত-পিপাসু তরবারি যখন সিরীয়দের উদ্দীপনা ও মনোবল ভেঙ্গে দিয়েছিল এবং আল-হারিরের রাতের অবিরাম আক্রমণে তাদের উচ্চাকাঙ্খা গুড়িয়ে দিল তখন আমর ইবনে আস মুয়াবিয়াকে একটা কুটচালের পরামর্শ দিয়ে বললো, "বর্শার আগায় পবিত্র কুরআন তুলে ধরে ইরাকীদের কাছে দাবী করতে হবে— এ

কুরআনকেই সালিশ মেনে নাও—কুরআনই তোমাদের ও আমাদের মধ্যে ফয়সালা। এতে কিছু লোক যুদ্ধ বন্ধ করতে চেষ্টা করবে এবং কিছু লোক যুদ্ধ চালিয়ে যেতে চাইবে। ফলে তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয়ে যুদ্ধ স্থগিত হয়ে যাবে।"

আমরের পরামর্শ অনুযায়ী বর্শার অগ্রভাগে কুরআন বেঁধে উর্ধ্বে তুলে ধরা হলো। ফলে কিছু সংখ্যক জ্ঞানহীন লোক হৈ চৈ শুরু করে বিভেদ সৃষ্টি করে ফেললো এবং প্রায় জয়ের মুখে আমিরুল মোমেনিনের সৈন্যদের ক্ষিপ্রতা শ্লথ হয়ে গেল। তারা কিছুই না বুঝে চিৎকার দিয়ে বলতে লাগলো, "যুদ্ধাপেক্ষা আমরা কুরআনের ফয়সালা অধিক ভাল বলে মনে করি।" আমিরুল মোমেনিন যখন দেখলেন কুরআনকে চালাকির হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে তখন তিনি বললেনঃ

"হে সৈন্যগণ, এ প্রতারণা ও চাতুরির ফাঁদে পড়ো না। পরাজয়ের গ্লানি হতে রক্ষা পাবার জন্য তারা এ কৌশল অবলম্বন করেছে। তাদের প্রত্যেকের চরিত্র আমার জানা আছে। তারা প্রকৃতপক্ষে কুরআনের অনুগামী নয়; দ্বীন বা ইমানের সাথে তাদের কোন সংশ্রব নেই। আমাদের জিহাদের মূল কারণই হলো—তাদেরকে কুরআন মেনে চলতে এবং কুরআনের আদেশ-নিষেধ অনুযায়ী কাজ করতে বাধ্য করা। আল্লাহর দোহাই, তোমরা তাদের প্রতারণামূলক কৌশলের শিকার হয়ো না। তোমরা এগিয়ে চলো তোমাদের উদ্দম, সংকল্প ও সাহস নিয়ে। তোমাদের শত্রুর অবস্থা মুমূর্ষু প্রায়—তাদের নিশ্চিহ্ন করা পর্যন্ত থেমে যেয়ো না।" এতদসত্ত্বেও প্রতারণামূলক ও বিভ্রান্তিকর এ হাতিয়ার কার্যকর হলো। কতিপয় লোক অবাধ্য হয়ে বিদ্রোহের পথ বেছে নিল। এদের মধ্যে মিসার ইবনে ফদকী আত-তামিমী ও জায়েদ ইবনে হুসাইন আত-তাঈ বিশ হাজার সৈন্য নিয়ে এগিয়ে এসে আমিরুল মোমেনিনকে বললো, "হে আলী, আপনি যদি কুরআনের ডাকে সাড়া না দেন তবে আমরা উসমানের সাথে যেরূপ ব্যবহার করেছি আপনার সাথেও তদ্রূপ ব্যবহার করবো। আপনি এখনি যুদ্ধ বন্ধ করুন এবং কুরআনের ফয়সালা মেনে নিন।" আমিরুল মোমেনিন তাদেরকে বুঝাতে আপ্রাণ চেষ্টা করলেন কিন্তু শয়তান তাদেরকে বুঝতে দেয়নি। মালিক ইবনে হারিছ আশতার বিপুল বিক্রমে তখন শত্রু নিধন করে এগিয়ে যাচ্ছিলো। মালিককে যুদ্ধক্ষেত্র হতে ফেরত আনার জন্য কাউকে পাঠাতে তারা আমিরুল মোমেনিনকে বাধ্য করলো। ফলে ইয়াজিদ ইবনে হানিকে দিয়ে মালিককে ডেকে পাঠানো হলো। মালিক এ আদেশ শোনামাত্র হতভম্ব হয়ে বললেন, "তাঁকে (আমিরুল মোমেনিনকে) আমার সালাম জানিয়ে বলো এখন অবস্থান ত্যাগ করার সময় নয়। তাঁকে একটু অপেক্ষা করতে বলো। অল্পক্ষণের মধ্যেই বিজয়ের সংবাদ নিয়ে আমি তাঁর কাছে হাজির হবো।" ইবনে হানি এ বার্তা নিয়ে আমিরুল মোমেনিনের নিকট পৌঁছলে লোকেরা চিৎকার দিতে লাগলো যে, যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য তিনি গোপনে খবর দিয়েছেন। অথচ তিনি যা বলেছিলেন তাদের সামনেই বলেছেন। লোকেরা তখন বললো, যদি মালিক ফিরে আসতে বিলম্ব করে তবে আমিরুল মোমেনিন তাঁর জীবনের আশা ত্যাগ করতে পারেন। এরপর ইবনে হানিকে আবার পাঠানো হলো। তিনি মালিককে বললেন, "তোমার কাছে কি আমিরুল মোমেনিনের জীবন অপেক্ষা বিজয় বেশী প্রিয়? যদি তাঁর জীবন বেশী প্রিয় হয়ে থাকে তবে যুদ্ধ ছেড়ে তাঁর কাছে চলে যাও।" বিজয়ের সুযোগ ছেড়ে দিয়ে হতাশা আর দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে মালিক আমিরুল মোমেনিনের সম্মুখে উপস্থিত হলেন। তিনি দেখলেন সেখানে গোলযোগ চলছে। তিনি সেখানে উপস্থিত লোকদেরকে অনেক তিরস্কার করলেন কিন্তু ব্যাপরটা এমনভাবে মোড় নিয়েছিল যা আর ঠিক করা সম্ভব হয়নি।

অবশেষে স্থির হলো যে, উভয়ে একজন করে সালিশ মনোনীত করবে যারা কুরআন অনুযায়ী খেলাফতের বিষয় নিষ্পত্তি করবে। মুয়াবিয়ার পক্ষ হতে আমর ইবনে আসকে মনোনয়ন দেয়া হলো। আমিরুল মোমেনিনের পক্ষ হতে আবু মুসা আশআরীর নাম প্রস্তাব করা হলো। এ ভুল মনোনয়ন দেখে আমিরুল মোমেনিন বললেন, "সালিশীর ব্যাপারে তোমরা

আমার আদেশ অমান্য করেছো। এখন অন্ততঃ আমার এ কথাটি মান্য কর যে, আবু মুসাকে সালিশ মনোনীত করো না। সে বিশ্বস্ত লোক নয়। আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস অথবা মালিক আশতার—এ দু'জনের একজনকে সালিশ মনোনীত কর।" কিন্তু তারা তাঁর কথা মানলো না এবং তাঁর দেয়া নাম বাদ দিয়ে দিল। আমিরুল মোমেনিন বললেন, "ঠিক আছে, তোমরা যা খুশী করো। তবে সেদিন বেশী দূরে নয় যখন তোমরা বুঝতে পারবে যে, নিজেদের পায়ে নিজেরাই কুড়াল মেরেছো"।

সালিশ মনোনয়নের পর যখন এতদসংক্রান্ত চুক্তিপত্র দলিল লেখা হলো তখন আলী ইবনে আবি তালিবের পর "আমিরুল মোমেনিন" শব্দগুলো লেখা হয়েছিল। এতে আমর ইবনে আস বললো, "আমিরুল মোমেনিন মুছে ফেলো। যদি আমরা তাকে আমিরুল মোমেনিন বলেই স্বীকার করি তবে কেন এ যুদ্ধ লড়ছি?" প্রথমতঃ আমিরুল মোমেনিন আমরের প্রস্তাবে অস্বীকৃতি জানালেন কিন্তু তারা কোনভাবেই এ শব্দগুলো চুক্তিতে রাখতে রাজী হয় না দেখে আমিরুল মোমেনিন তা মুছে ফেলে বললেন, "এ ঘটনা হুদায়বিয়ার সন্ধির মতোই যখন কাফেরগণ আল্লাহ্‌র রাসুল লেখা মানলো না এবং রাসুল (সঃ) তা কেটে দিলেন।" এ কথায় আমর ইবনে আস রাগান্বিত হয়ে বললো, "আপনি কি আমাদেরকে কাফের মনে করেন?" আমিরুল মোমেনিন বললেন, "তুমি কি কোনদিন মোমেনদের সাথে কিছু করেছিলে? তুমি কি কোনদিন মোমেনদের সমর্থক ছিলে?" যা হোক এ চুক্তির পর জনতা চলে গেল এবং সালিশদ্বয় পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে সাব্যস্ত করলো যে, আলী ও মুয়াবিয়া উভয়কে খেলাফত থেকে সরিয়ে দিয়ে যাকে ইচ্ছা মনোনীত করার ক্ষমতা জনগণকে দেয়া হবে। এ সিদ্ধান্ত ঘোষণার জন্য ইরাক ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী দুমাতুল জান্দাল নামক স্থানে একটি সভা আহবান করা হলো। সালিশদ্বয়ও তাদের রায় ঘোষণার জন্য সেখানে উপস্থিত হলেন। আমর ইবনে আস চাতুর্যের পথ অবলম্বন করে আবু মুসাকে বললো, "আপনি বয়ঃজ্যেষ্ঠ, আপনার আগে কথা বলা আমি বেয়াদবি মনে করি। কাজেই আপনি আগে ঘোষণা করুন।" আবু মুসা আমরের তোষামোদে অভিভূত হয়ে জনতার সামনে গর্বভরে দাঁড়িয়ে বললেন, "হে মুসলিমগণ, আমরা উভয়ে যুগ্মভাবে সাব্যস্থ করেছি যে, আলী ও মুয়াবিয়া খেলাফত থেকে সরে দাঁড়াবে এবং আপনারা আপনাদের পছন্দমত একজন খলিফা নিয়োগ করবেন।" একথা বলে আবু মুসা বসে পড়লেন এবং আমর ইবনে আস দাঁড়িয়ে বললো, "হে মুসলিমগণ, আপনারা শুনলেন যে, আবু মুসা আলী ইবনে আবি তালিবকে অপসারণ করেছেন। আমি তার সাথে একমত পোষণ করি। মুয়াবিয়াকে অপসারণ করার প্রশ্ন উঠে না (কারণ সে খলিফা নয়)। সুতরাং আলীর স্থলে আমি মুয়াবিয়াকে নিয়োগ করলাম।" আমর ইবনে আস একথা বলা মাত্র চতুর্দিকে হৈ হুল্লোড় শুরু হয়ে গেল। আবু মুসা চিৎকার দিয়ে বলতে লাগলেন যে, এটা চাতুরি-এটা প্রতারণা। কিন্তু কে শোনে কার কথা! তিনি ইবনে আসকে বললেন. "তুমি চাতুরি করেছো। তোমার উপমা সেই কুকুরের মত যার কাছে কোনকিছু রাখলে সে আত্মসাৎ করে।" আমর ইবনে আস বললো, "তোমার উপমা সেই গাধার মত যার পিঠে পুস্তক বোঝাই করা হয়।" আমরের এ চাতুর্যের ফলে মুয়াবিয়ার কম্পিত পা আবার কিছুটা শক্ত হলো।

সংক্ষিপ্তাকারে সালিশীর ফলাফল এটাই যা কুরআনের নামে করা হয়েছে। এহেন প্রতারণা কি কুরআনের শিক্ষা? ইতিহাসের এ পাতাগুলো ভবিষ্যতে পথ-নির্দেশক হিসেবে গ্রহণ করা যায় কি? আমিরুল মোমেনিন সালিশীর এ দুঃখদায়ক সংবাদ পেয়ে মিম্বারে উঠে এ খোৎবা প্রদান করেছিলেন।

২। এটা একটা আরবী প্রবাদ। কোন পরামর্শদাতার উপদেশ অমান্য করে পরে অনুশোচনা করলে এ প্রবাদ প্রয়োগ করা হয়। এ প্রবাদের ঘটনা হলো—হীরা অঞ্চলের শাসনকর্তা যাযিমাহ্ আল আব্রাশ জামিরাহ্ অঞ্চলের শাসনকর্তা আমর ইবনে যারিবকে হত্যা করে তার কন্যা যাব্বাহ্‌কে জামিরাহ্‌র শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। সিংহাসনে আরোহণ করেই যাব্বাহ্ তার পিতার রক্তের বদলা নেয়ার পরিকল্পনা করে। ফলে সে যাযিমাহ্‌র নিকট এ বলে বার্তা প্রেরণ করলো যে, একাকিনী অবস্থায় শাসনকার্য পরিচালনা করা তার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। সুতরাং যাযিমাহ্ যদি তাকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করে শাসনকার্যে তার পৃষ্ঠপোষকতা করে তবে সে কৃতজ্ঞ থাকবে। যাযিমাহ্ এ প্রস্তাবে উৎফুল্ল হয়ে এক হাজার অশ্বারোহী নিয়ে জাযিরাহ্ অঞ্চলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলো। যাযিমাহ্‌র ক্রীতদাস কাসির তাকে উপদেশ দিয়েছিল যে, এ প্রস্তাব প্রতারণা ও

চাতুরি ছাড়া আর কিছুই নয়। কাজেই যাযিমাহ্ এ বিপদে নিজকে ঠেলে না দেয়াই মঙ্গল। কিন্তু যাযিমাহ্র বুদ্ধিমত্তা এমনভাবে লোপ পেয়েছিল যে, সে চিন্তাই করতে পারেনি কেন যাব্বাহ্ তার পিতার হত্যাকারীকে স্বামী হিসাবে বরণ করবে? যখন সে জাযিরাহ্ রাজ্যের সীমান্তে পৌছে দেখলো যাব্বাহ্র সৈন্য তাকে সম্বর্ধনা দেয়ার অপেক্ষা করছে কিন্তু কোন বিশেষ সম্বর্ধনা বা অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করা হয়নি। এতে কাসিরের সন্দেহ আরো ঘনীভূত হলো। সে যাযিমাহ্কে ফিরে যেতে বললো। যাযিমাহ্ তার উপদেশ কর্ণপাত করলো না। ফলে শহরে পৌছা মাত্রই যাযিমাহ্কে হত্যা করা হলো। এতে কাসির বললো, "আহা, যদি কাসিরের উপদেশ মান্য করা হতো।" এ থেকেই আরবী ভাষায় এ প্রবাদ প্রচলিত হয়েছে।

৩। হাওয়াজিনের কবি বলতে দুরায়েদ ইবনে সিম্মাহকে বুঝানো হয়েছে। তার ভ্রাতা আবদুল্লাহ্ ইবনে সিম্মাহর মৃত্যুতে এ কবিতা লিখেছিল। ঘটনাটি হলো—আব্দুল্লাহ্ ও তার ভাই হাওয়াজিনের বনি জুশাম ও বনি নসর এর নেতৃত্ব দিয়ে একটি আক্রমণ পরিচালনা করে অনেক উট তাড়িয়ে নিয়ে এসেছিল। ফেরার পথে মুন আরাজিল লিওয়া নামক স্থানে বিশ্রাম গ্রহণের জন্য আবদুল্লাহ্ মনস্থির করলো। দুরায়েদ তাকে নিষেধ করলো কারণ পেছন থেকে শত্রু আক্রমণ করতে পারে। কিন্তু আবদুল্লাহ্ কর্ণপাত না করে সেখানে রয়ে গেল। ফলে ভোরবেলা শত্রু আক্রমণ করে আবদুল্লাহ্কে হত্যা করলো। দুরায়েদ আহত হয়ে প্রাণে বাঁচলো। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুরায়েদ বেশ কয়েকটি কবিতা লিখেছিল। তন্মধ্যে খোৎবায় উল্লেখিত কবিতাটি জনপ্রিয়।

★★★★★

খোৎবা-৩৬

নাহ্রাওয়ানের জনগণকে তাদের ভাগ্য সম্পর্কে সতর্কীকরণ

আমি তোমাদেরকে সতর্ক করে দিচ্ছি যে, আল্লাহ্র কাছে যখন তোমাদের কোন স্পষ্ট ওজর থাকবে না এবং যখন তোমরা কোন প্রকাশ্য প্রামাণ্য দলিল উপস্থাপন করতে পারবে না (যা বল সে সম্পর্কে) তখন তোমরা এ খালের বাঁকের নীচু এলাকার বাঁধের ধারে নিহত হবে। তোমরা ঘর হতে বেরিয়ে এসেছো (মিথ্যামিথ্যি বিরুদ্ধাচরণ করার জন্য) এবং তাতে আল্লাহ্র ফয়সালা তোমাদেরকে ঘিরে ধরেছে। আমি এ সালিশীর বিপক্ষে তোমাদেরকে উপদেশ দিয়েছিলাম। কিন্তু তোমরা অঙ্গীকার ভঙ্গকারী বিরুদ্ধবাদীর মত আমার উপদেশ প্রত্যাখ্যান করেছো। তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত আমার উপর চাপ প্রয়োগ করেছো যতক্ষণ পর্যন্ত না আমার মতামত তোমাদের ইচ্ছার অনুকূলে এনেছি। তোমরা এমন একটা দল যাদের মাথা বোধশক্তি ও বুদ্ধিবিহীন। তোমাদের পিতা না থাকুক! (আল্লাহ্র অভিশাপ তোমাদের উপর!) আমি তোমাদেরকে কোন বিপর্যয়ে ফেলিনি বা তোমাদের কোন ক্ষতি কামনা করিনি।

১। নাহ্রাওয়ানের যুদ্ধের কারণ হলো—সিফফিনের সালিশীর পর আমিরুল মোমেনিন যখন দুঃখভারাক্রান্ত মনে কুফায় ফিরে যাচ্ছিলেন তখন যারা সালিশ মান্য করার জন্য আমিরুল মোমেনিনের উপর চাপ প্রয়োগে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল তারা বলাবলি করতে লাগলো যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে সালিশ মান্য করা ইমান হারানোর সামিল। আল্লাহ্ মাফ করুন, সালিশ মান্য করে আমিরুল মোমেনিন ইমানহারা হয়ে গেছেন। ফলে "আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো কোন কর্তৃত্ব নেই"—এ আয়াতের অর্থ বিকৃত করে তারা সাধারণ মুসলিমগণকে তাদের মতাবলম্বী করে হানিরা নামক স্থানে অবস্থিত আমিরুল মোমেনিনের ক্যাম্প হতে বের করে নিয়ে যায়। আমিরুল মোমেনিন তাদের এহেন দুরভিসন্ধির কথা জানতে পেরে সা'সাআহ্ ইবনে সুহান আল-আবদি এবং যিয়াদ ইবনে নাদর আল-হারিছীকে ইবনে আব্বাসের সাথে তাদের কাছে প্রেরণ করেছেন এবং পরবর্তীতে নিজেই তাদের অবস্থান স্থলে গিয়ে আলাপ-আলোচনা করে তাদেরকে ছত্রভঙ্গ করে দিলেন।

এসব লোক কুফায় পৌঁছে ছড়াতে লাগলো যে, আমিরুল মোমেনিন সালিশীর চুক্তি ভঙ্গ করে সিরিয়দের বিরুদ্ধে পুনরায় যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। আমিরুল মোমেনিন তাদের এসব প্রচারণার প্রতিবাদ করলে তারা বিদ্রোহ করলো এবং বাগদাদ হতে বার মাইল দূরবর্তী নাহ্‌রাওয়ান নামক খালের নীচু এলাকায় ক্যাম্প স্থাপন করেছিল।

অপরপক্ষে আমিরুল মোমেনিন সালিশীর রোয়েদাদ শুনে সিরীয় সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য মনস্থির করলেন। তিনি খারিজীদেরকে পত্র দ্বারা জানালেন যে, সালিশদ্বয় কুরআন ও সুন্নাহ্‌র পরিবর্তে তাদের ইচ্ছামাফিক যে রোয়েদাদ দিয়েছে তা তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। ফলে তিনি তাদের সাথে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। সুতরাং শত্রুকে নির্মূল করার জন্য তাঁকে সমর্থন করতে তিনি তাদেরকে অনুরোধ করেন। প্রত্যুত্তরে খারিজীগণ বললো, "আমাদের মতে, সালিশ মান্য করে আপনি ইমানহারা হয়ে গেছেন। এখন যদি আপনি ইমান হারানোর কথা স্বীকার করে তওবা করেন তবেই আমরা চিন্তা করে দেখবো কি করা যায়।" তাদের এহেন উত্তর থেকে আমিরুল মোমেনিন বুঝতে পারলেন যে, তাদের অবাধ্যতা ও বিপথগামিতা চরমে উঠেছে। এ অবস্থায় তাদের কোন প্রকার সহায়তা গ্রহণ করা বিপদের কারণ হবে বলে তিনি বিবেচনা করলেন। ফলে তাদেরকে উপেক্ষা করে সিরিয়া অভিমুখে যাত্রার উদ্দেশ্যে তিনি নুখায়লাহ্ উপত্যকায় ক্যাম্প স্থাপন করলেন। সৈন্যবাহিনী সজ্জিত করার পর আমিরুল মোমেনিন জানতে পারলেন যে, তারা চায় প্রথমে নাহ্‌রাওয়ানের বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে, তৎপর সিরিয়া অভিমুখে যাত্রা করতে। আমিরুল মোমেনিন বললেন, "নাহ্‌রাওয়ানের লোকেরা যেভাবে আছে সেভাবেই থাক্। তোমরা প্রথমে সিরিয়া অভিমুখে যাত্রা কর এবং পরে নাহ্‌রাওয়ানের লোকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করো।" লোকেরা বলল যে, তারা আমিরুল মোমেনিনের প্রতিটি আদেশ তাদের সর্বশক্তি দিয়ে পালন করার জন্য ওয়াদাবদ্ধ; কাজেই তিনি যেদিকে বলবেন সেদিকেই তারা চলবে। এরই মধ্যে সংবাদ এলো যে, খারিজী বিদ্রোহীগণ নাহ্‌রাওয়ানের গভর্ণর আবদুল্লাহ্ ইবনে খাব্বাহ্ ইবনে আরাত ও তার গর্ভবতী কৃতদাসীকে হত্যা করেছে এবং বনি তাঈ ও উম্মে সিনান আস-সাইদাইয়াহ্ গোত্রের অপর তিনজন মহিলাকে হত্যা করেছে। এ সংবাদে আমিরুল মোমেনিনের সৈন্যগণ আর সিরিয়া অভিমুখে নড়াচড়া করেনি। তিনি বিষয়টি তদন্ত করে দেখার জন্য হারিছ ইবনে মুররাহ্ আল-আবদিকে প্রেরণ করলেন। কিন্তু খারিজীগণ হারিছকেও হত্যা করেছে। ফলে আমিরুল মোমেনিন কাল বিলম্ব না করে সসৈন্যে নাহ্‌রাওয়ান পৌঁছলেন এবং তাদেরকে বার্তা প্রেরণ করলেন যে, যারা আবদুল্লাহ্ ইবনে খাব্বাহ ও নির্দোষ মহিলাগণকে হত্যা করেছে কিসাসের জন্য তাদেরকে আমিরুল মোমেনিনের হাতে তুলে দিতে হবে। উত্তরে খারিজীগণ জানালো যে, তারা সকলেই একযোগে এ হত্যাকান্ড ঘটিয়েছে এবং তারা মনে করে যে, আমিরুল মোমেনিনের পক্ষের সকল লোককে হত্যা করা জায়েজ। এতেও আমিরুল মোমেনিন যুদ্ধের পদক্ষেপ না নিয়ে আবু আইউব আল-আনসারীকে শান্তির প্রস্তাব নিয়ে তাদের কাছে প্রেরণ করেছেন। আবু আইউব তাদের কাছাকাছি গিয়ে উচ্চঃস্বরে বললেন, "যে কেউ সেপক্ষ ত্যাগ করে এ পতাকা তলে আসবে এবং কুফা অথবা মাদায়েন যাবে তাকেই সাধারণ ক্ষমার অন্তর্ভুক্ত করা হবে এবং কোন কিছুই জিজ্ঞেস করা হবে না।" এতে ফারওয়া ইবেন নাওফাল আল-আশজাঈ বললো, "তবে কেন আর আমিরুল মোমেনিনের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবো।" এ বলে সে তার পাঁচশত লোকসহ বেরিয়ে এলো। এরপর কয়েকটি দল বেরিয়ে এসেছে এবং তাদের কেউ কেউ আমিরুল মোমেনিনের দলে যোগ দিয়েছে। কিন্তু চার হাজার লোক (তাবারীর মতে দুই হাজার আট শত) বিদ্রোহী রয়ে গেল। এসব লোক কোনমতেই বেরিয়ে আসতে রাজী হলো না। তারা প্রতিজ্ঞা করে বসলো, "হয় মারবো, না হয় মরবো।" আমিরুল মোমেনিন এসব বিদ্রোহীকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে বের করে আনার কথা চিন্তা করে নিজের সৈন্যদের প্রদমিত করে রাখলেন। কিন্তু খারিজীগণ ধনুকে শর যোজনা করে এবং বর্শা ও তরবারি উন্মুক্ত করে প্রস্তুত হয়ে রইলো। এ সংকট মুহূর্তেও আমিরুল মোমেনিন এ ভাষণে তাদেরকে সতর্ক করে দেন। কোন উপদেশ কার্যকর হয়নি; তারা আচমকা আমিরুল মোমেনিনের সৈন্যদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। তাদের আক্রমণ এত তীব্র ছিল যে, আমিরুল মোমেনিনের পদাতিক বাহিনী দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই ধকল সামলিয়ে নিয়ে তারা পাল্টা আক্রমণ করলে মাত্র নয়জন পলাতক ব্যতীত সকলেই নিহত হলো।এ যুদ্ধে আমিরুল মোমেনিনের আটজন সৈন্য শহীদ হয়েছে। ৩৮ হিজরী সনের ৯ই সফর এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল।

★★★★★

খোৎবা-৩৭

দ্বীনে ও ইমানে আমিরুল মোমেনিনের নিজের দৃঢ়তা ও অগ্রণী ভূমিকা সম্পর্কে।

আমি আমার কর্তব্য পালনে তৎপর ছিলাম যখন অন্যরা নিজেদের কর্তব্য পালনের সাহস হারিয়ে ফেলেছিল। আমি এগিয়ে এসেছিলাম যখন অন্যরা নিজেদেরকে গোপন করে রেখেছিল। আমি কথা বলেছিলাম যখন অন্যরা নীরবে মুখ বন্ধ করে বসেছিল। যখন আমি আল্লাহ্‌র নূর নিয়ে চলেছিলাম তখন অন্যরা বিফল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাদের মধ্যে কণ্ঠস্বরে আমিই ছিলাম সবচেয়ে নিম্ন; কিন্তু অগ্রগামীতায় আমি ছিলাম সর্বোর্ধে। একটা পর্বতকে যেমন বাতাস উড়িয়ে নিতে পারে না বা ঝঞ্ঝা-বাতাস নাড়াতে পারে না তদ্রূপ আমি অটলভাবে দ্বীনের রজ্জু ধরে রেখেছিলাম এবং নিজকে সম্পূর্ণরূপে দ্বীনের জামানত হিসাবে নিয়োজিত করেছিলাম। আমার কোন দোষ কেউ দেখতে পায়নি এবং কেউ আমার কোন বদনাম করতে পারেনি।

আমার মতে একজন নীচ ব্যক্তিও সম্মানের যোগ্য যদি আমি তার অধিকার সংরক্ষণ করি; আবার প্রতাপান্বিত ব্যক্তিও হীন বলে বিবেচিত হয় যদি আমি তার অধিকার তুলে নেই। আমরা আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত ভাগ্যেই সন্তুষ্ট এবং তাঁর আদেশের প্রতি বিনয়াবনত রয়েছি। তোমরা কি মনে কর আমি আল্লাহ্‌র রাসুল (সঃ) সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলবো? আল্লাহ্‌র কসম, আমিই সর্বপ্রথম রাসুলকে স্বীকার করেছি। কাজেই তাঁর সম্পর্কে মিথ্যা বর্ণনাকারীদের প্রথম হতে চাই না। আমি আমার কার্যাবলীর প্রতি খেয়াল করে দেখলাম যে, আমার আনুগত্য ও তাঁর সাথে আমার অঙ্গীকার আমার ঘাড়ে বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

★★★★★

খোৎবা-৩৮

সংশয়ের নামকরণ ও সংশয়াসক্তকে অবজ্ঞা প্রসঙ্গে

সংশয়কে সংশয় বলা হয় এ জন্য যে, এটা সত্যের সদৃশ বা সমরূপ। যারা অলি-আল্লাহ্ তাদের ইয়াকিন তাদের জন্য আলোর কাজ করে এবং সত্য পথের দিকে তাদের মনোযোগ দেশনা হিসাবে কাজ করে। অপরপক্ষে যারা আল্লাহ্‌র শত্রু তাদের সংশয় তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে সন্দেহের অন্ধকারে নিয়ে যায় এবং অন্ধত্ব তাদের দেশনা। মৃত্যুকে ভয় করে এড়ানো যায় না, আবার অনন্ত জীবন আশা করলেও তা পাওয়া যায় না।

★★★★★

খোৎবা-৩৯

জিহাদে যাদের অনীহা তাদের প্রতি ভর্ৎসনা সম্পর্কে

আমি এমন সব লোক নিয়ে আছি যারা আমার আদেশ অমান্য করে এবং আমার ডাকে সাড়া দেয় না। তোমরা পিতৃবিহীন হও (তোমাদের উপর লা'নত) আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে উঠে দাঁড়াতে কিসে তোমাদেরকে বিলম্বিত করছে? তোমাদের দ্বীন কি তোমাদেরকে একত্রিত করবে না? তোমাদের লজ্জাবোধ কি তোমাদেরকে উত্তোলিত করবে না? আমি তোমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে চিৎকার দিয়ে সাহায্যের আহ্বান করছি, কিন্তু তোমরা আমার কথা শোন না এবং অবস্থা বেগতিক না হলে তোমরা আমার আদেশ মান্য কর না। তোমাদের দ্বারা কোন রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণ করা যায় না এবং কোন উদ্দেশ্য সাধন করা যায় না। তোমাদের ভ্রাতৃগণকে সাহায্য করার জন্য

আমি আহ্বান করেছিলাম; কিন্তু তোমরা পেটের ব্যাথায় কাতর উটের মত গোঙ্গাতে লাগলে এবং পাছা-মরা উটের মত দুর্বল হয়ে পড়লে। অতঃপর তোমাদের মধ্য হতে কম্পমান-দুর্বল একদল সৈন্য আমার কাছে এলো ঃ "যেন তাদেরকে মৃত্যুর দিকে তাড়িয়ে নেয়া হচ্ছে এবং তারা যেন মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করছে।"[১] (কুরআন-৮ ঃ ৬)

১। আয়নুত-তামর আক্রমণ করার জন্য নুমান ইবনে বশিরের নেতৃত্বে মুয়াবিয়া দু'হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী প্রেরণ করেছিলেন। কুফার নিকটবর্তী এ স্থানটি ছিল আমিরুল মোমেনিনের সামরিক ঘাটি এবং মালিক ইবনে কা'ব আল আরহাবী ছিল এ ঘাটির ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। যদিও তার অধীনে এক হাজার যোদ্ধা ছিল তবুও ঐ মুহূর্তে একশত লোক সেখানে উপস্থিত ছিল। আক্রমণকারী সৈন্যদেরকে এগিয়ে আসতে দেখে মালিক সাহায্যের জন্য আমিরুল মোমেনিনকে পত্র লিখেছিল। বার্তা পাওয়ামাত্র মালিকের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসার জন্য আমিরুল মোমেনিন জনগণকে অনুরোধ করলেন। এতে মাত্র তিনশত লোক প্রস্তুতি নিয়েছিল। আমিরুল মোমেনিন বিরক্ত হয়ে এ ভাষণ দেন। ভাষণ শেষে আমিরুল মোমেনিন ঘরে পৌছার পর আদি ইবনে হাতিম তাঈ এসে বললো, "হে আমিরুল মোমেনিন, আমার অধীনে বনি তাঈ-এর এক হাজার লোক আছে। আপনি আদেশ দিলে আমি তাদের প্রেরণ করতে পারি।" আমিরুল মোমেনিন বললেন, "এটা খারাপ দেখায় যে শুধুমাত্র একটা গোত্রের লোক শত্রুর মোকাবেলা করবে। তুমি নুখায়ালা উপত্যকায় তোমার বাহিনী প্রস্তুত রাখো।" সে তার লোকজনকে জিহাদের জন্য ডাক দিয়েছিল। ইতিমধ্যে বনি তাঈ ছাড়া আরো এক হাজার সৈন্য সেখানে প্রস্তুত হলো। এমন সময় মালিক সংবাদ দিল যে, সে শত্রুকে বিতাড়িত করেছে—সাহায্যের প্রয়োজন নেই।

এর কারণ হলো— কুফা হতে সাহায্য পেতে বিলম্ব হতে পারে ভেবে মালিক তৎক্ষণাৎ আবদুল্লাহ্ ইবনে হাওয়ালা আল-আজদীকে কারাজাহ্ ইবনে কা'ব আল-আনসারী ও মিখনাফ ইবনে সুলায়মান আল আজদী-এর নিকট সাহায্যের জন্য প্রেরণ করলেন। কারাজাহ্ কোন সাহায্য করেনি। মিখনাফ তার পুত্র আবদার রহমানের নেতৃত্বে পঞ্চাশ জন সৈন্য প্রেরণ করেছিল এবং তারা সন্ধ্যা নাগাদ মালিকের কাছে পৌছলো। সে পর্যন্ত শত্রুর দু'হাজার লোক মালিকের একশত সৈন্যকে পরাভূত করতে পারেনি। আবদার রহমানের পঞ্চাশজন সৈন্য দেখেই নুমান মনে করলো মালিকের বাহিনী আসা আরম্ভ করেছে। ফলে সে যুদ্ধ ক্ষেত্র হতে পালিয়ে গেলো। এমনকি পালিয়ে যাবার সময়ও মালিক তাড়া করে তাদের তিন জনকে হত্যা করেছে।

★★★★★

খোৎবা-৪০

আমিরুল মোমেনিন যখন খারিজীদের চিৎকার শুনলেন যে, "নির্দেশ শুধু আল্লাহ্‌রই" তখন তিনি বললেন ঃ

তারা যে বাক্যটি উচ্চারণ করছে তা সঠিক কিন্তু এর দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য ভ্রান্ত। এ কথা সত্য যে, আদেশ শুধু আল্লাহ্‌র। কিন্তু এ কথা দ্বারা এসব লোক বোঝাতে চায় শাসনকার্য শুধু আল্লাহ্‌র। বাস্তবক্ষেত্রে, ভাল হোক আর মন্দ হোক, শাসনকর্তা ব্যতীত মানুষের নিস্তার নেই। শাসক ভাল হলে ইমানদারগণ উত্তম আমল সাধন করে সমাজের জন্য কল্যাণ বয়ে আনে। অপরদিকে মন্দ শাসকের শাসনকার্য হতে ইমানহীনগণ জাগতিক ফায়দা লুট করে। শাসনকাল ভাল হোক আর মন্দ হোক আল্লাহ্ সবকিছুরই সমাপ্তি টানেন। শাসক দ্বারা কর আদায় হয়, শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হয়, রাস্তা-ঘাট রক্ষা করা হয়, শক্তিমানদের হাত হতে দুর্বলদের অধিকার আদায় করা হয়, পরহেজগারগণ শান্তিতে থাকে এবং দুষ্টের অত্যাচার হতে প্রতিরক্ষা লাভ করে।

অন্য একটি বর্ণনায়ঃ

আমিরুল মোমেনিন যখন খারিজীদের চিৎকার শুনলেন তখন তিনি বললেন ঃ

তোমাদের ওপর আমি আল্লাহ্‌র রায় প্রত্যাশা করছি। তৎপর তিনি বললেনঃ

কল্যাণকর সরকার হলে পরহেজগারগণ কল্যাণকর আমল সাধন করতে পারে; অপরপক্ষে অকল্যাণকর সরকারের শাসনে দুষ্ট লোকেরা আমৃত্যু ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকে।

★★★★★

খোৎবা-৪১

বিশ্বাসঘাতকতার প্রতি ঘৃণা

হে লোকসকল, নিশ্চয়ই অঙ্গীকার পূর্ণ করা সত্যের যমজ। পাপের আক্রমণ হতে রক্ষা পাবার জন্য অঙ্গীকার পালন করা অপেক্ষা ভাল কোন ঢাল আছে বলে আমার জানা নেই। যে ব্যক্তি ফেরত আসার বাস্তবতা উপলব্ধি করতে পারে সে কখনো বিশ্বাসঘাতকতা করে না। আমরা এমন এক যুগে বাস করছি যখন বিশ্বাসঘাতকতাকে বুদ্ধিমত্তা বলে আখ্যায়িত করা হয়। একালে অজ্ঞগণ বিশ্বাসঘাতকতাকে চাতুর্যের কৃতিত্ব বলে মনে করে। তাদের হয়েছে কি? আল্লাহ্ তাদের ধ্বংস করুন! যে ব্যক্তি জীবনের সকল অবস্থাতেই নীতির প্রতি অটল থাকে সে আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধ পালনে বাধার সম্মুখীন হয়, কিন্তু ক্ষমতা না থাকা সত্ত্বেও সে এসব বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করে চলে (বাধা-বিপত্তির চাপে মরে গেলেও আল্লাহ্‌র আদেশ অনুসরণ করে)। অপরপক্ষে যে ব্যক্তি ধর্মের বাঁধনের অধীন নয় সে এ সুযোগ থেকে বঞ্চিত (এবং সে আল্লাহ্‌র আদেশ অনুসরণ না করার যে কোন ওজর গ্রহণ করে)।

★★★★★

খোৎবা-৪২

হৃদয়ের আশা ও উচ্চাকাঙ্খা সম্পর্কে

হে লোকসকল, তোমাদের ব্যাপারে আমি দু'টি বিষয়কে বড় ভয় করি—কামনা-বাসনার বশবর্তী হয়ে আমল করা এবং আশা-আকাঙ্ক্ষাকে প্রলম্বিত করা। কামনা-বাসনার বশবর্তী হয়ে কাজ করলে সত্যকে পাওয়া যায়না এবং আশা প্রলম্বিত করলে পরকালকে ভুলে থাকে। জেনে রাখো, দুনিয়া অতি দ্রুত অন্তের দিকে চলে যাচ্ছে এবং শেষ কণিকা ছাড়া এতে আর কিছুই থাকছে না; যেমন—কেউ ভান্ড নিঃশেষ করে ফেললে একটু তলানি থাকে। সাবধান, পরকাল দ্রুত এগিয়ে আসছে। দুনিয়া ও পরকাল উভয়েরই পুত্র (অর্থাৎ অনুসারী) আছে। তোমরা পরকালের পুত্র হয়ো-ইহকালের পুত্র হয়ো না। কারণ শেষ বিচারের দিন প্রত্যেক পুত্র তার মায়ের সাথে থাকবে। আজ হলো আমলের দিন— কোন হিসাব নেয়া হবে না, আর আগামীকাল হলো হিসাব-নিকাশের দিন— কোন আমল থাকবে না।

★★★★★

খোৎবা-৪৩

জারীর ইবনে আবদিল্লাহ্ আল-বাজালীকে বায়াত আদায়ের জন্য মুয়াবিয়ার নিকট প্রেরণ করার পর আমিরুল মোমেনিনের কয়েকজন অনুসারী মুয়াবিয়ার সাথে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণের পরামর্শ দিলে তিনি বলেন ঃ

যেখানে জারীর ইবনে আবদিল্লাহ্ আল-বাজালী এখনো সিরিয়ায় সেখানে সিরিয়ার জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিলে সিরিয়ার দরজা চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে এবং সিরিয়ার জনগণ যদি বায়াত গ্রহণের ইচ্ছা পোষণ করে থাকে তাও রুদ্ধ হয়ে যাবে। যাহোক, আমি জারীরকে একটা সময়সীমা বেঁধে দিয়েছি। প্রতারিত অথবা অবাধ্য না হলে সে সময় সীমার বেশী সেখানে অবস্থান করবে না। আমার অভিমত সর্বদাই ধৈর্যের অনুকূলে। সুতরাং একটু ধৈর্যধারণ কর। ইতোমধ্যে তোমাদের প্রস্তুতি গ্রহণ আমাদের অপছন্দনীয় নয়।

এ বিষয়টি আমি সবদিক থেকে পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণ করেছি কিন্তু যুদ্ধ অথবা মুহাম্মদ (সঃ) যা এনেছেন উহার অবাধ্যতা করা ছাড়া অন্য কোন পথ দেখি না। নিশ্চয়ই, আমার পূর্বেও জনগণের শাসক ছিল যারা অনৈসলামিক নতুন অনেক কিছু প্রবর্তন করেছিল যা সমালোচনা করতে জনগণ বাধ্য হয়েছিল। সুতরাং জনগণ সমালোচনা করলো, তৎপর রুখে দাঁড়ালো এবং তাতে শাসন ক্ষমতা পরিবর্তিত হলো।

★★★★★

খোৎবা-৪৪

মাস্কালাহ্[১] ইবনে হুবায়রাহ আশ-শায়বানী আমিরুল মোমেনিনের একজন নির্বাহী অফিসারের নিকট হতে বনি নাজিয়াহ্র কয়েকজন বন্দী ক্রয় করেছিল। যখন ক্রয়মূল্য দাবী করা হয়েছে তখন সে মুয়াবিয়ার কাছে সিরিয়ায় পলায়ন করলে আমিরুল মোমেনিন বলেনঃ

আল্লাহ্ মাসকালাহ্র মুখ মলিন (অমঙ্গল) করুন। সে উচ্চ মর্যাদাশীল ভদ্র লোকের মত কাজ করে নেহায়েত ক্রীতদাসের মত পালিয়ে গেল। তার প্রশংসাকারীকে সে কথা বলার পূর্বেই থামিয়ে দিল এবং তার প্রশংসাসূচক কবিতার ছন্দ বাঁধার আগেই সে কবির মুখ বন্ধ করে দিল। সে পালিয়ে না গিয়ে সাধ্যমত যা দিত আমরা তা-ই গ্রহণ করতাম এবং অবশিষ্ট টাকার জন্য ততদিন অপেক্ষা করতাম যতদিন পর্যন্ত না তার আর্থিক অবস্থা ভাল হয়।

১। সিফফিনের সালিশীর পর যখন খারিজীগণ মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো তখন নাযিয়াহ্ গোত্রের খিব্রীট ইবনে রশিদ আন-নাযি নামক এক ব্যক্তি মাদায়েনে হত্যা ও লুণ্ঠন শুরু করে দিয়েছিল। তাকে বাধা দেয়ার জন্য আমিরুল মোমেনিন জিয়াদ ইবনে খোসাফাহ্র নেতৃত্বে তিন শত লোকের একটি বাহিনী প্রেরণ করলেন। মাদায়েনে দু'পক্ষ তরবারি নিয়ে মোকাবেলা করলো, কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই সন্ধ্যা নেমে এলো। পরদিন ভোরে জিয়াদ দেখলেন যে, খারিজীদের পাঁচটি লাশ পড়ে আছে এবং তারা যুদ্ধক্ষেত্র হতে পালিয়ে গেছে। এ অবস্থা দেখে জিয়াদ তার লোকজন নিয়ে বসরা অভিমুখে রওয়ানা করলো। বসরায় সে জানতে পারলো খারিজীগণ আহ্ওয়াজ নামক স্থানে চলে গেছে। সৈন্যের স্বল্পতাহেতু জিয়াদ আর অগ্রসর না হয়ে আমিরুল মোমেনিনকে এ বিষয় অবহিত করলো। আমিরুল মোমেনিন জিয়াদকে ফিরে যেতে বললেন এবং সাকিল ইবনে কায়েস আর-রিয়াহীর নেতৃত্বে দু'হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী আহ্ওয়াজ অভিমুখে প্রেরণ করলেন। তদুপরি বসরার গভর্ণর আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসকে লিখে পাঠালেন যে, সাকিলকে সহায়তা করার জন্য তিনি যেন দু'হাজার বসরী সৈন্য প্রেরণ করেন। বসরা থেকে প্রেরিত সৈন্যদল আহ্ওয়াজে সাকিলের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল। তারা আক্রমণ রচনার জন্য

প্রস্তুত হলো। ততক্ষনে খির্‌রীট তার লোকজন নিয়ে রামহুরমুয নামক পাহাড়ীয়া অঞ্চলে চলে গিয়েছিল। সাকিল পিছু ধাওয়া করে সেই পাহাড়গুলোর নিকটবর্তী এলাকায় তাদের ধরে ফেললো। উভয়পক্ষ নিজেদের সৈন্য বিন্যস্ত করে একে অপরকে আক্রমণ করলো। এ যুদ্ধে তিন শত সত্তরজন খারিজী নিহত হলো এবং অবশিষ্টরা পালিয়ে গেল। সাকিল এ সংবাদ আমিরুল মোমেনিনকে জানালো। শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করে তাদের শক্তি নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার জন্য তিনি সাকিলকে নির্দেশ দিলেন। আদেশ পাওয়ামাত্র সাকিল খির্‌রীটের পশ্চাদ্ধাবন করে পারস্য উপসাগরের উপকূলে তাকে ধরে ফেলে। এ এলাকার লোকজনকে প্রলুব্ধ করে খিররীট তাদের সহযোগিতা লাভ করেছিল। সেখানে পৌছেই সাকিল শান্তির পতাকা তুলে ধরে ঘোষণা করলেন যে, যারা এদিক সেদিক থেকে এসেছে তারা বেরিয়ে যেতে পারে—তাদেরকে কোন শাস্তি দেয়া হবে না। এ ঘোষণার ফলে খিররীটের নিজস্ব গোত্র ছাড়া অন্য সকলে তাকে ত্যাগ করে চলে গেল। খিররীট অবশিষ্ট লোক নিয়ে যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়লো এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই তার দলের একশত সত্তর জন নিহত হলো। নুমান ইবনে সুহ্‌বান খিররীটের মোকাবেলা করে তাকে নিহত করে। খিররীট নিহত হবার পর শত্রুপক্ষ যুদ্ধক্ষেত্র হতে পালিয়ে যায়। সাকিল শত্রুপক্ষের সকল নারী-পুরুষ ও শিশুকে ক্যাম্প থেকে এনে একস্থানে জড়ো করলো। তাদের মধ্যে যারা মুসলিম ছিল তাদেরকে বায়াতের শপথের পর মুক্ত করে দিয়েছিল। যারা মুসলিম ছিল না তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের জন্য বলা হলো। ফলে একজন বৃদ্ধ খৃষ্টান ব্যতীত সকলেই ইসলাম গ্রহণ করে মুক্তি পেল এবং বৃদ্ধ লোকটিকে হত্যা করা হলো। অতঃপর সাকিল বনি নাজিয়াহ্‌র যে সব খৃষ্টান এ বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেছিল তাদের পরিবার-পরিজনসহ কুফা অভিমুখে ফিরে চললো। পথিমধ্যে আরদাশির খুর্‌রাহ (ইরানের একটি শহর) নামক স্থানে পৌছলে বন্দীগণ সেখানকার গভর্ণর মাসকালাহ্ ইবনে হুবায়রাহ আশ-শায়বানীর সম্মুখে চিৎকার করে রোদন করতে লাগলো যেন তিনি তাদের মুক্তির জন্য কিছু করেন। মাসকালাহ্ যুহল ইবনে হারিছকে সাকিলের নিকট প্রেরণ করে প্রস্তাব দিল যে, সে বন্দীগণকে ক্রয় করতে ইচ্ছুক। উভয়ের মধ্যে কথা হলো এবং বন্দীর মুক্তির পণ পাঁচ লক্ষ দিরহাম সাব্যস্ত হলো। পণের অর্থ আমিরুল মোমেনিনের নিকট প্রেরণ করতে বললে মাসকালাহ্ বললো যে, সে প্রথম কিস্তি তখনই পাঠিয়ে দেবে এবং সহসাই অবশিষ্ট অর্থ পাঠিয়ে দেবে। কুফায় পৌছে সাকিল আমিরুল মোমেনিনকে সবিস্তারে ঘটনাবলী অবহিত করলে তিনি সাকিলের কার্যক্রম অনুমোদন করলেন। কিন্তু দীর্ঘদিন অপেক্ষা করেও মাসকালাহ্‌র কোন সাড়া না পেয়ে তার কাছে বার্তাবাহক প্রেরণ করে খবর দেয়া হলো যে, সে যেন পণের অর্থ প্রেরণ করে, না হয় নিজে এসে দেখা করে। মাসকালাহ্ কুফা এসে আমিরুল মোমেনিনকে দু'লক্ষ দিরহাম দিয়ে গেল এবং অবশিষ্ট অর্থ না দেয়ার কৌশল হিসাবে মুয়াবিয়ার কাছে চলে গেল। মুয়াবিয়া তাকে তাবারাস্তানের শাসনকর্তা হিসাবে নিয়োগ করলো। এ ঘটনা জানতে পেরে আমিরুল মোমেনিন এ ভাষণ দিয়েছিলেন।

★★★★★

খোৎবা-৪৫

আল্লাহ্‌র মহত্ব ও দুনিয়ার হীনাবস্থা সম্পর্কে

প্রতিষ্ঠিত প্রশংসা আল্লাহ্‌র যাঁর রহমত থেকে কেউ নিরাশ হয় না, যাঁর নেয়ামত থেকে কেউ বঞ্চিত হয় না, যাঁর ক্ষমা থেকে কেউ হতাশ হয় না এবং যাঁর ইবাদত হতে অহঙ্কার বশতঃ কেউ বিরত থাকতে পারে না। তাঁর রহমত কখনো নিরুদ্ধ হয় না এবং তাঁর নেয়ামত কখনো হারিয়ে যায় না। এ দুনিয়া এমন এক জায়গা যার ধ্বংস অবধারিত এবং দুনিয়াবাসীগণের জন্য এখান থেকে প্রস্থান অনিবার্য। এ স্থান মধুর ও সবুজ। যারা দুনিয়াকে অন্বেষণ করে তাদের দিকে দুনিয়া দ্রুত এগিয়ে যায় এবং যারা দুনিয়াকে প্রত্যক্ষ করে তাদের কাছে দুনিয়া হৃদয়গ্রাহী হয়ে থাকে। সুতরাং তোমাদের কাছে উত্তম যা আছে তা নিয়ে এখান থেকে প্রস্থান কর এবং গন্তব্যে পৌছা পর্যন্ত যতটুকু প্রয়োজন তার বেশী চেয়ো না।

★★★★★

খোৎবা-৪৬

সিরিয়া অভিমুখে যাত্রাকালে আমিরুল মোমেনিন বলেন ঃ

হে আল্লাহ্, পথ চলার কষ্ট থেকে আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি। প্রত্যাবর্তনের মর্মযন্ত্রণা ও পরিবার-পরিজন এবং সম্পদ ও সন্তানাদির ধ্বংস ও খারাপ দৃশ্য থেকে আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি। হে আল্লাহ্, তুমিই ভ্রমণকালের সহচর এবং আমাদের পরিজনদের রক্ষার জন্য তুমিই রয়েছ। তুমি ব্যতীত এ দু'য়ের সঙ্গী, আর কেউ নেই, কারণ যাদেরকে পেছনে ফেলে আসা হয় তারা যাত্রাপথে সহচর হতে পারে না। আবার যারা যাত্রা পথের সহচর তারা একই সময়ে পরিজনদের দেখাশুনাকারী হতে পারে না।

★★★★★

খোৎবা-৪৭

কুফায় দুর্যোগ আপতন সম্পর্কে

হে কুফা, যদিও আমি দেখতে পাচ্ছি বাজারে 'উকাযী'[১]-এর পাকা চামড়ার মত তুমি আকর্ষিত হচ্ছো তবুও তুমি দুর্যোগ কবলিত ও সাংঘাতিক বিপদসঙ্কুল। আমি নিশ্চিতভাবে[২] জানি যে, কোন স্বেচ্ছাচারী যদি তোমার মন্দ করতে চায় তবে আল্লাহ্ তাকে উদ্বিগ্নতার নিদারুণ যন্ত্রণা দেবেন এবং তার হত্যাকারী নিয়োজিত করে দেবেন।

১। প্রাক-ইসলামিক যুগে মক্কার সন্নিকটে প্রতি বছর একটি হাট বসতো। এর নাম ছিল 'উকায' এবং এ হাটে বেশীর ভাগ চামড়া বেচাকেনা হতো। এছাড়া সাহিত্য সভাও এ হাটে অনুষ্ঠিত হতো এবং আরবগণ তাদের সাহিত্যকর্ম এতে আবৃত্তি করতো। ইসলামের যুগে হজ্জ্ব সমাবেশের ফলে এ হাট উঠে গেছে।

২। আমিরুল মোমেনিনের এ ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবে প্রতিফলিত হয়েছিল। সারা দুনিয়া দেখেছে যারা ক্ষমতার দম্ভে স্বেচ্ছাচারিতা ও অত্যাচার করেছিল তারা কি মর্মন্তুত ফল ভোগ করেছিল এবং রক্তপাত আর গণহত্যার দ্বারা তাদের ধ্বংস এসেছিল। জিয়াদ ইবনে আবিহ (পিতৃ পরিচয়হীন পুত্র) আমিরুল মোমেনিনের বিরুদ্ধে মানহানিকর বক্তৃতা দেয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করলে পক্ষাঘাতগ্রস্থ হয়ে পড়ে এবং সে জীবনে আর বিছানা ত্যাগ করতে পারেনি। উবায়দুল্লাহ্ ইবনে জিয়াদ শেষ রক্তপাত সংঘটিত করেছিল। সে কুষ্ঠরোগের শিকার হয়েছিল এবং পরিণামে রক্ত পিপাসু তরবারি তার মৃত্যু ডেকে আনলো। হাজ্জাজ ইবনে ইউছুফ আছ-ছাকাফীর নিষ্ঠুরতা তার ভাগ্যকে এমন দুরবস্থায় টেনে নিয়ে গেল যে, তার পেটে অপ্রত্যাশিতভাবে সাপ আবির্ভূত হলো এবং নিদারুণ যন্ত্রণায় মারা গেল। উমর ইবনে হুবায়রাহ্ আল-ফাজারী শ্বেতীরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেল। খালিদ ইবনে আবদিল্লাহ্ আল-কাসরী বন্দী অবস্থায় দুর্ভাগ্যজনকভাবে নিহত হলো। মুসাব ইবনে যুবায়ের এবং ইয়াযিদ ইবনে মুহাল্লাব তরব্যারির আঘাতে নিহত হয়েছিল।

★★★★★

খোৎবা-৪৮

সিরিয়া অভিমুখে যাত্রার প্রাক্কালে আমিরুল মোমেনিন বলেন ঃ

প্রতিষ্ঠিত প্রশংসা আল্লাহ্র যখন অন্ধকার নেমে আসে ও রাত্রি প্রসারিত হয়। প্রতিষ্ঠিত প্রশংসা আল্লাহ্র যখন তারকারাজী উদয় ও অস্তমিত হয়। প্রতিষ্ঠিত প্রশংসা আল্লাহ্র যাঁর রহমত হতে কেউ বঞ্চিত হয় না এবং যাঁর নেয়ামতের প্রতিদান দেয়া কখনো সম্ভব নয়।

আমি আমার অগ্রবাহনী[১] পাঠিয়ে দিয়েছি এবং তাদের আদেশ করেছি যেন নদীর এ তীরে ক্যাম্প করে অবস্থান করে যে পর্যন্ত না আমার পুনরাদেশ পায়। আমার অভিপ্রায় হলো—দজলার (টাইগ্রিস) ওপারে যে এলাকায় লোকবসতি কম সে এলাকা দিয়ে অতিক্রম করবো এবং সেসব লোকদেরকে তোমাদের সাথে শত্রুর দিকে এগিয়ে নিয়ে গেলে তারা তোমাদের সহায়ক বাহিনী হিসাবে কাজে লাগবে।

১। সিফফিনে যাত্রার জন্য নুখায়লাহ্ উপত্যকায় যে ক্যাম্প করা হয়েছিল সে ক্যাম্পে ৩৭ হিজরী সনের ৫ই শাওয়াল বুধবার আমিরুল মোমেনিন এ ভাষণ দেন। অগ্রবাহিনী ছিল বার হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী যারা জিয়াদ ইবনে নদর ও সুরাইয়াহ্ ইবনে হানির নেতৃত্বে সিফফিনে প্রেরিত হয়েছিল।

★★★★★

খোৎবা-৪৯

আল্লাহ্‌র মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে

প্রতিষ্ঠিত প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি সকল গুপ্ত বিষয় অবগত আছেন এবং সকল প্রকাশ্য বস্তু তাঁর অস্তিত্ব প্রমাণ করে। দর্শকের চক্ষু দ্বারা তাঁকে দর্শন করা যায় না, কিন্তু দর্শন করা যায় না বলে তাঁকে অস্বীকারও করা যায় না। যে হৃদয় তাঁর অস্তিত্ব প্রমাণ করে সে হৃদয়ও তার সীমারেখা নির্ধারণ করতে পারে না। মহত্ত্বে তিনি এত উঁচু যে, কোন কিছুই তিনি অপেক্ষা মহান হতে পারে না। নৈকট্যে তিনি এত নিকটে যে, কোন কিছুই তিনি অপেক্ষা নিকটতম হতে পারে না। কিন্তু তাঁর মহত্ব তাঁকে সৃষ্টির কোন কিছু হতেই দূরত্বে রাখে না; আবার তাঁর নৈকট্য সৃষ্টির কোন কিছুকেই তাঁর সমপর্যায়ে আনে না। মানুষের বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞান তাঁর গুণাবলী প্রকাশে অক্ষম। এতদসত্ত্বেও তাঁর সম্পর্কে অত্যাবশ্যকীয় জ্ঞানার্জনে তিনি বাধার সৃষ্টি করেননি। সুতরাং তিনি যে অস্তিত্ববান সকল বস্তু (আয়াত) এ সাক্ষ্য বহন করে। যে মন তাঁকে স্বীকার করে না সেও তাঁকে বিশ্বাস করে। যারা তাঁকে বস্তুর সদৃশতায় বর্ণনা করে অথবা তাঁকে অস্বীকার করে আল্লাহ্ তাদের বর্ণনার অনেক উর্দ্ধে।

★★★★★

খোৎবা-৫০

ন্যায় ও অন্যায়ের অপমিশ্রণ সম্পর্কে

ফেতনা-ফ্যাসাদ সংঘটিত হবার ভিত্তি হলো সেসব কামনা-বাসনা যা অনুসরণ করা হয় এবং সেসব আদেশ যা নব্য প্রবর্তিত। এ দু'টোই আল্লাহ্‌র কেতাবের বিপরীত। আল্লাহ্‌র দ্বীনের বিপরীত হওয়া সত্ত্বেও মানুষ একে অপরকে এ দু'টোতে সহযোগিতা করে। অন্যায় যদি নিরেট অন্যায় এবং অমিশ্রিত থাকে তবুও যারা এর অন্বেষণকারী তাদের কাছে গোপন থাকে না (অর্থাৎ তারা তা আঁকড়ে ধরে)। আর ন্যায় যদি অন্যায়ের অপমিশ্রণ থেকে খাঁটিও থাকে তবুও ন্যায়ের প্রতি যাদের অবজ্ঞা রয়েছে তারা নিশ্চুপ হয়ে থাকে (অর্থাৎ ন্যায়কে গ্রহণ করে না)। যা করা হয় তা হলো—এটা থেকে কিছু ওটা থেকে কিছু নিয়ে দু'টোর সংমিশ্রণ করা। এ পর্যায়ে শয়তান তার বন্ধুদের শক্তিশালী করে তোলে এবং শুধুমাত্র তারাই রক্ষা পায় যাদের জন্য পূর্ব হতেই আল্লাহ্ মঙ্গল নির্ধারিত করে রেখেছেন।

★★★★★

খোৎবা-৫১

সিফফিনে যখন মুয়াবিয়ার লোকেরা আমিরুল মোমেনিনের লোকদের পরাভূত করে ইউফ্রেটিস নদীর তীর দখল করে নেয় এবং তাদের পানি বন্ধ করে দেয় তখন আমিরুল মোমেনিন বলেনঃ

তারা[১] তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে চায়। সুতরাং হয় তোমরা কলঙ্ককর ও হীন অবস্থায় থাকো না হয় তোমাদের তরবারিকে রক্ত পান করাও এবং পানি দ্বারা তোমাদের তৃষ্ণা নিবারণ কর। প্রকৃত মৃত্যু পরাভব জীবনে এবং প্রকৃত জীবন অন্যকে পরাভূত করায় বা বিজয় লাভ করায়। সাবধান, মুয়াবিয়া বিদ্রোহীদের একটি ছোট দলের নেতৃত্ব দিচ্ছে এবং সত্য ঘটনা হতে কৌশলে তাদেরকে অন্ধকারে রাখা হয়েছে। ফলে তারা তাদের বক্ষকে মৃত্যুর লক্ষ্যস্থলে পরিণত করেছে।

১। আমিরুল মোমেনিন সিফফিনে পৌছার আগেই মুয়াবিয়া নদীর তীরে চল্লিশ হাজার লোক মোতায়েন করলো যেন সিরিয়গণ ছাড়া আর কেউ পানি নিতে না পারে। আমিরুল মোমেনিনের বাহিনী যখন সেখানে পৌছলো তখন তারা দেখতে পেল অবরুদ্ধ স্থানটি ছাড়া পানি পাওয়ার আর কোন পথ নেই। অন্য একটি স্থান তারা বের করেছিল কিন্তু অনেক উঁচু টিলা অতিক্রম করে সেখানে যাওয়া বড়ই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। আমিরুল মোমেনিন সা'সা'আহ্ ইবনে সুহান আল-আবদিকে মুয়াবিয়ার নিকট প্রেরণ করে অনুরোধ জানালেন যে, সে যেন পানির ওপর হতে এহেন নিয়ন্ত্রণ তুলে নেয়। কিন্তু মুয়াবিয়া আমিরুল মোমেনিনের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলো। এতে আমিরুল মোমেনিনের বাহিনী তৃষ্ণা কাতর হয়ে পড়লো। আমিরুল মোমেনিন এ অবস্থা দেখে বললেন, "উঠ এবং তরবারির সাহায্যে পানি সংগ্রহ কর।" ফলে এসব তৃষ্ণার্ত লোক অসি কোষমুক্ত করলো— ধনুকে শর যোজনা করলো এবং মুয়াবিয়ার লোকদেরকে ছত্রভঙ্গ করে সোজা নদীতে চলে গেল এবং শত্রুকে বিতাড়িত করে পানি সংগ্রহের স্থান দখল করে নিল।

এসময় আমিরুল মোমেনিনের লোকেরা ইচ্ছা প্রকাশ করলো যে, তারাও মুয়াবিয়ার লোকদের জন্য পানি বন্ধ করে দিয়ে তাদেরকে উচিত শিক্ষা দেবে যাতে করে সিরিয়রা তৃষ্ণায় মারা যায়। আমিরুল মোমেনিন বললেন, "তোমরা কি একই নিষ্ঠুর পদক্ষেপ নিতে চাও যা সিরিয়গণ করেছে? কখনো কারো পানি বন্ধ করো না। যে কেউ পান করতে চায়— করুক, যে কেউ নিয়ে যেতে চায়— নিয়ে যাক।" ফলতঃ নদীর তীর দখল করা সত্ত্বেও কাউকে পানি গ্রহণে বাধা দেয়া হয়নি এবং পানি গ্রহণে সকলের পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল।

★★★★★

খোৎবা-৫২

পরকালের পুরস্কার ও শাস্তি সম্পর্কে

সাবধান, দুনিয়া নিজকে গুটিয়ে আনছে এবং প্রস্থান ঘোষণা করছে। এর পরিচিত বস্তুনিচয় অপরিচিত হয়ে গেছে এবং এটা দ্রুতবেগে পশ্চাতে সরে যাচ্ছে। দুনিয়া তার অধিবাসীদেরকে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এবং এর প্রতিবেশীগণকে মৃত্যুর দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এর মধুর জিনিসগুলোকে (ভোগ-বিলাস) তিক্ত করে দিয়েছে এবং স্বচ্ছ জিনিষগুলো মলিন হয়ে গেছে। ফলে এর থেকে যা অবশিষ্ট রয়েছে তা পাত্রের গায়ে লেগে থাকা পানির মত অথবা পরিমাপে এক কুলি পানি। যদি তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি এটুকু পান করে তবে তার তৃষ্ণা নিবারিত হয় না।

হে আল্লাহ্র বান্দাগণ, এ দুনিয়া পরিত্যাগের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও, কারণ দুনিয়াবাসীদের ধ্বংস অবধারিত। সাবধান, মনের কামনা-বাসনা ও লালসা যেন তোমাদেরকে বশীভূত না করে এবং তোমরা মনে করো না যে এখানে তোমরা চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে। আল্লাহ্র কসম, যদি তোমরা শাবকহারা উষ্ট্রির মত কাঁদো, কবুতরের মত কুজন করো, অনুরক্ত নির্জনবাসীর (দরবেশ) মত আওয়াজ করো এবং আল্লাহ্র নৈকট্য ও বাকা প্রাপ্তির জন্য তোমাদের সন্তান-সন্ততি ও সম্পদ পরিত্যাগ করে আল্লাহ্র দিকে মুখ ফেরাও তবুও তাঁর পুরষ্কারের তুলনায় তা কিছুই নয় যা আমি তোমাদের জন্য প্রত্যাশা করি অথবা তাঁর শাস্তির তুলনায় কিছুই নয় যা আমি তোমাদের জন্য আশঙ্কা করি।

আল্লাহ্র কসম, যদি তোমাদের হৃদয় সম্পূর্ণরূপে বিগলিত হতো, তাঁকে পাবার আশায় অথবা তাঁর ভয়ে তোমাদের চোখ দিয়ে রক্তাশ্রু বের হতো এবং পৃথিবী বিলীন হওয়া পর্যন্ত তোমাদেরকে বেঁচে থাকতে দেয়া হতো তবুও তোমাদের আমল তাঁর রহমতের এক কণার সমতুল্য হবে না এবং তোমাদেরকে ইমানের পথে পরিচালনার প্রতিদান হবে না।

এ খোৎবায় কুরবাণীর পশুর গুণাগুণ সম্পর্কে বলেন ঃ

কুরবাণীর পরিপূর্ণ উপযোগী পশুর জন্য অত্যাবশ্যকীয় হলো—এর কানগুলো ওপরের দিকে খাড়া হতে হবে এবং চোখগুলো সুস্থ (ভাল) হতে হবে। যদি চোখ আর কান সুস্থ হয় তবেই কুরবাণীর পশু অটুট ও যথার্থ বলে ধরা যায়; হোক না এর শিং ভাঙ্গা অথবা পা হেঁচড়ে হেঁচড়ে উহা কুরবাণীর জায়গায় যায়।

★★★★★

খোৎবা-৫৩

বায়াতের অঙ্গীকার সম্পর্কে

তারা এত প্রচন্ড বেগে আমার দিকে ধাবিত হয়েছিল যে, মনে হলো যেন তৃষ্ণার্ত উটের পাল ছাড়া পেয়ে একে অপরের ওপর পড়ে পানীয় পানির দিকে ধাবিত হচ্ছে। আমার মনে হয়েছিল হয় তারা আমাকে হত্যা করবে না হয় একে অপরকে আমার সামনে হত্যা করবে। আমি ব্যাপারটি নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে এত বেশী চিন্তা করেছিলাম যে, আমার ঘুমের ব্যাঘাত হয়েছিল। কিন্তু হয় তাদের সাথে যুদ্ধ, না হয় মুহাম্মদ (সঃ) যা এনেছিলেন তা পরিত্যাগ করা ছাড়া আর কোন পথ দেখতে পেলাম না। আমি বিবেচনা করে দেখলাম যে, আল্লাহ্র শাস্তি অপেক্ষা যুদ্ধ করা আমার জন্য সহজতর এবং ইহকালের দুঃখ-কষ্ট পরকালের দুঃখ-কষ্ট অপেক্ষা সহজতর।

★★★★★

খোৎবা-৫৪

সিফফিনে যুদ্ধ আরম্ভ করার অনুমতি দিতে আমিরুল মোমেনিন বিলম্ব করায় তার লোকজন অধৈর্য হয়ে পড়লে তিনি বলেন ঃ

বেশ, যদি তোমরা মনে কর এ বিলম্ব এজন্য যে, আমি মৃত্যুবরণ করতে অনিচ্ছুক, তবে আল্লাহ্র কসম, আমি মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছি নাকি মৃত্যু আমার দিকে তেড়ে আসছে এ বিষয়টি আমি থোড়াই পরোয়া করি। যদি তোমরা ধারণা কর যে, এ বিলম্বের কারণ সিরিয়দের সম্পর্কে আমার সংশয় আছে, তবে আল্লাহ্র কসম, জেনে

রাখো, আমি এ কারণে বিলম্ব করেছিলাম যদি আরো কোন দল আমার সাথে যোগদান করে, যদি আমার মাধ্যমে তারা পথের দিশা পায় এবং যদি তাদের দুর্বল চোখে আমার আলো দেখতে পায়। বিভ্রান্তিতে নিপতিত অবস্থায় হত্যা করা হতে আলোর পথে আসার সুযোগ দেয়া আমার কাছে অধিক প্রিয়। এরপর তারা তাদের নিজেদের পাপের ভার বহন করতে থাকবে।

★★★★★

খোৎবা-৫৫

যুদ্ধক্ষেত্রে অটলতা সম্পর্কে

আল্লাহ্‌র রাসুলের (সঃ) সাথে থাকাকালে আমরা আমাদের পিতা-মাতা, পুত্র, ভ্রাতা ও চাচাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতাম এবং এ দৃঢ়তা বহাল ছিল আমাদের ইমানে, আনুগত্যে, সত্য পথ অনুসরণে, দুঃখ-যন্ত্রণা সহ্য করাতে এবং শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে। আমাদের পক্ষ থেকে একজন এবং শত্রুর পক্ষ হতে একজন একে অপরের ওপর ষাঁড়ের মতো ঝাঁপিয়ে পড়তো—লক্ষ্য শুধু কে কাকে হত্যা করতে পারে। কখনো আমাদের লোক প্রতিপক্ষকে আবার কখনো শত্রু আমাদের লোককে অতিক্রম করতো।

আল্লাহ্ যখন আমাদেরকে সততা ও সত্যের প্রতি অটলতা দেখলেন তখন তিনি আমাদের প্রতি তাঁর সাহায্য প্রেরণ করে আমাদের শত্রুকে পরাজয়ের কলঙ্কে কলঙ্কিত করেছিলেন যতক্ষণ পর্যন্ত না ইসলাম প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল যেমন করে উট মাটিতে ঘাড় এলিয়ে দিয়ে বিশ্রাম গ্রহণ করে। আমার জীবনের কসম, আমরা যদি তোমাদের মত আচরণ করতাম তবে দ্বীনের স্তম্ভ দাঁড় করানো যেত না এবং ইমানের বৃক্ষেও পাতা গজাতো না। আল্লাহ্‌র কসম, তোমরা এখন দুধের পরিবর্তে আমাদের রক্ত দোহন করবে এবং পরিণামে তোমরা লজ্জিত হবে[১]।

১। যখন মুহাম্মদ ইবনে আবি বকর নিহত হলেন তখন মুয়াবিয়া আবদুল্লাহ্ ইবনে আমির আল-হাদ্রামিকে বসরায় প্রেরণ করলো। উসমানের রক্তের বদলা নেয়ার জন্য আবদুল্লাহ্ বসরার লোকজনকে উত্তেজিত করে তুলতে লাগলো। কারণ অধিকাংশ বসরাবাসী বিশেষ করে বনি তামিমের আনুকূল্য ছিল উসমানের প্রতি। এ সময় বসরার গভর্ণর আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস জিয়াদ ইবনে উবায়েদকে দায়িত্বভার দিয়ে মুহাম্মদ ইবনে আবি বকরের শেষকৃত্যে যোগদানের জন্য কুফায় গিয়েছিলেন। বসরার পরিস্থিতির যখন অবনতি ঘটলো তখন জিয়াদ আমিরুল মোমেনিনকে সকল ঘটনা অবহিত করলেন। আমিরুল মোমেনিন কুফার বনি তামিমকে প্রস্তুত করতে চেষ্টা করলেন কিন্তু তারা নিশ্চুপ হয়ে রইলো—কোন জবাব দিল না। আমিরুল মোমেনিন তাদের এহেন দুর্বলতা ও লজ্জাহীনতা দেখে এ ভাষণ দেন, "রাসুলের জমানায় আমরা কখনো দেখতাম না যারা আমাদের হাতে নিহত হয়েছে তারা আমাদের আত্মীয় স্বজন কিনা—যে কেউ সত্যের সাথে সংঘাত করতো আমরা তার সথে সংঘাত করতাম। আমরাও যদি তোমাদের মত অসতর্কভাবে কাজ করতাম বা তোমাদের মত নিষ্ক্রিয় থাকার অপরাধ করতাম তাহলে দ্বীন কখনো শিকড় গাড়তে পারতো না এবং ইসলাম কখনো উন্নতি লাভ করতে পারতো না।" এর ফলে আ'য়ন ইবনে দাবিয়াহ্ আল-মুজামী প্রস্তুত হয়ে বসরায় চলে গেল, কিন্তু তথায় পৌছা মাত্রই শত্রুর তরবারিতে নিহত হলো। এরপর আমিরুল মোমেনিন জারিয়াহ্ ইবনে কুদামাহ্ আস্-সা'দিকে বনি তামিমের পঞ্চাশজন লোকসহ প্রেরণ করলেন। প্রথমতঃ জারিয়াহ্ নিজ গোত্রকে বোঝাতে সাধ্যমত চেষ্টা করলেন, কিন্তু তারা সত্যপথ অনুসরণের পরিবর্তে বিশ্বাস ভঙ্গ ও যুদ্ধের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। অতঃপর জারিয়াহ্ জিয়াদ ও অজ্‌দ গোত্রকে তার সাহায্যের জন্য ডেকে পাঠালো। অপরদিকে আবদুল্লাহ্ও তার লোকজন নিয়ে বেরিয়ে আসলো। উভয়পক্ষে তরবারি দ্বারা যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই আবদুল্লাহ্ সত্তরজন লোক নিয়ে পালিয়ে গেল এবং সাবিল আস-সা'দির ঘরে আশ্রয় গ্রহণ করলো। শত্রুদের বের করার অন্য কোন পথ না পেয়ে জারিয়াহ্ সে ঘরে আগুন লাগিয়ে দিল। তখন তারা ঘর হতে বেরিয়ে এসেছিল কিন্তু একজনও পালিয়ে যেতে পারে নি—সকলেই নিহত হলো।

★★★★★

খোৎবা-৫৬

মুয়াবিয়া সম্পর্কে আমিরুল মোমেনিন তাঁর অনুচরদের বলেছিলেন ঃ

আমার অব্যবহিত পরেই এমন একলোক তোমাদের ওপর আপতিত হবে যার মুখ-গহ্বর প্রশস্ত এবং পেট বিশালাকার। সে যা পাবে তা-ই গলাধঃকরণ করবে এবং যা পাবে না তার জন্য উদগ্র বাসনা পোষণ করবে। তাকে হত্যা করা তোমাদের উচিত হবে কিন্তু আমি জানি, তাকে তোমরা হত্যা করবে না। আমাকে গালিগালাজ করতে এবং আমার আদর্শ পরিত্যাগ করতে সে তোমাদেরকে আদেশ দেবে। গালিগালাজ সম্বন্ধে, আমি বলবো, তোমরা আমাকে গালিগালাজ করো, কারণ তা আমার জন্য হবে মর্যাদাকর আর তোমাদের জন্য হবে তার অত্যাচার হতে মুক্তির পথ। আমার আদর্শ ত্যাগ বিষয়ে বলবো—আমার আদর্শ ত্যাগ করা তোমাদের উচিত হবে না কারণ আমি ইসলামের ফিতরাতে জন্মগ্রহণ করেছি এবং ইসলাম গ্রহণ ও হিজরতে সর্বাগ্রণী ছিলাম[১]।

১। আমিরুল মোমেনিন এ খোৎবায় যার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন তার সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেউ বলে জিয়াদ ইবনে আবিহ্, কেউ বলে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ আছ-ছাকাফী, আবার কেউ বলে মুঘিরাহ্ ইবনে শুবাহ্। কিন্তু অধিকাংশ টীকাকার মন্তব্য করেছেন যে, ইঙ্গিতকৃত ব্যক্তিটি হলো মুয়াবিয়া এবং এটাই সঠিক কারণ আমিরুল মোমেনিন যা বর্ণনা করেছেন তা মুয়াবিয়াতে প্রমাণিত হয়েছে। মুয়াবিয়ার অতিভোজ সম্পর্কে ইবনে আবিল হাদীদ লিখেছেন যে, একদিন রাসুল (সঃ) তাকে ডেকে পাঠালেন। লোক ফিরে এসে রাসুলকে (সঃ) বললো, "সে ভোজনে ব্যস্ত।" দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার লোক পাঠিয়ে একই জবাব পাওয়া গেল। এতে রাসুল (সঃ) বললেন, "আল্লাহ্ তার পেটকে তৃপ্ত না করুন।" এ অভিশাপ তার ওপর কার্যকর হয়েছিল। যখন সে খেতে খেতে ক্লান্ত হয়ে পড়তো তখন বলতো, "নিয়ে যাও; আল্লাহ্‌র কসম, আমি ক্লান্ত ও বিরক্ত—তৃপ্ত নই।" সে আমিরুল মোমেনিনকে গালিগালাজ করতো এবং তার অফিসারগণকেও তা করতে আদেশ দিত যা ইতিহাস স্বীকৃত। ইতিহাসে একথাও উল্লেখ আছে যে, মুয়াবিয়া মিম্বারে বসে আমিরুল মোমেনিনকে গাল-মন্দ করতে এমন সব শব্দ ব্যবহার করতো তাতে আল্লাহ্ ও রাসুল (সঃ) পর্যন্ত কটাক্ষপাতে পতিত হতো। উম্মোল মোমেনিন উম্মে সালমাহ্ মুয়াবিয়াকে এক পত্রে লিখেছিলেন, "তোমাদের কথায় যদিও মনে হয় তোমরা আলী এবং তাকে যারা ভালবাসে তাদের গালিগালাজ করছো কিন্তু নিশ্চয়ই তোমরা আল্লাহ্ ও রাসুলকে গালাগালি কর। আল্লাহ্ ও রাসুল যে আলীকে ভালবাসতেন তার জন্য আমি নিজেই সাক্ষী" (রাব্বিহ,[১১১] ৩য় খন্ড, পৃঃ ১৩১)।

উমর ইবনে আবদিল আজিজকে এ জন্য ধন্যবাদ যে, তিনি মুয়াবিয়া কর্তৃক প্রবর্তিত গালিগালাজ বন্ধ করে তৎস্থলে খোৎবায় নিম্নের আয়াত বলার প্রচলন চালু করেছিলেন ঃ

আল্লাহ্ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন এবং নিষেধ করেন অশ্লীলতা, অসৎকার্য ও সীমালজ্ঘন; তিনি তোমাদের উপদেশ দেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর (কুরআন-১৬ঃ৯০)।

এ খোৎবায় আমিরুল মোমেনিন মুয়াবিয়াকে হত্যা করার আদেশ দিয়েছিলেন। এ আদেশ রাসুলের (সঃ) একটি আদেশের ভিত্তিতেই তিনি করেছেন। রাসুল (সঃ) বলেছিলেন, "হে মুসলিম, তোমরা যখন মুয়াবিয়াকে আমার মিম্বারে দেখবে তখন তাকে হত্যা করো।" (মিনকারী[১১০], পৃঃ২৪৩-২৪৮; হাদীদ[১৫২], ১ম খন্ড, পৃঃ ৩৪৮; বাগদাদী[৯৪], ১২ শ খন্ড, পৃঃ ১৮১; জাহাবী[৬৬], ২য় খন্ড, পৃঃ ১২৮; আসকালানী[২৫], ২য় খন্ড, পৃঃ ৪২৮; ৫ম খন্ড, পৃঃ ১১০; ৭ম খন্ড, পৃঃ ৩২৪)

★★★★★

খোৎবা-৫৭

খারিজীদের উদ্দেশ্যে আমিরুল মোমেনিন বলেন ঃ

ঝড় তোমাদেরকে অতর্কিতে অভিভূত করতে পারে যখন তোমাদেরকে খোঁচা দেয়ার (সংস্কারের জন্য) মত কেউ থাকবে না। ইমানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে এবং রাসুলের সাথী হয়ে যুদ্ধ করেও কি আমি আমার ধর্মত্যাগের সাক্ষী হব? "সে ক্ষেত্রে আমি বিপথগামী হব এবং সৎপথ প্রাপ্তদিগের অন্তর্ভুক্ত থাকব না" (কুরআন, ৬ঃ৫৬)। সুতরাং তোমাদের পাপের স্থানসমূহে ফিরে যেতে পার এবং তোমাদের পদাঙ্ক তোমরা ফিরে পাবে। সাবধান, নিশ্চয়ই আমার পরে তোমরা নিদারুণ অসম্মান ও ধারালো তরবারিতে বিপর্যপ্ত হবে এবং অত্যাচারীগণ কর্তৃক গৃহীত হাদিস তোমাদের প্রতি মানদন্ড হিসাবে ব্যবহৃত হবে[১]।

১। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, আমিরুল মোমেনিনের পর খারিজীগণ সর্বপ্রকার অমর্যাদা ও অসম্মান ভোগ করেছিল এবং যেখানেই তারা মাথা তুলতে চেষ্টা করেছে সেখানেই তরবারি ও বর্শার মুখোমুখী হয়েছে। জিয়াদ ইবনে আবিহ, উবায়দুল্লাহ্ ইবনে জিয়াদ, হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ, মুসা'ব ইবনে জুবায়র ও মুহাল্লাব ইবনে আবি মুফ্রাহ খারিজীগণকে ভূ-পৃষ্ঠ হতে নির্মূল করার জন্য সর্বোপায় অবলম্বন করেছিল; বিশেষ করে মুহাল্লাব ঊনিশ বছর ধরে তাদের তাড়া করেছে এবং তাদেরকে ধ্বংস করে ক্ষান্ত হয়েছিল।

তাবারী লিখেছেন যে, দশ হাজার খারিজী সিল্লাওয়া সিল্লিব্রা (আহওয়াজ পার্বত্য এলাকার একটি পর্বত) পর্বতে জড়ো হয়েছিল। তখন মুহাল্লাব তাদেরকে এত তীব্র আক্রমণ করেছিল যে, সাত হাজার খারিজী নিহত হয়েছিল। অবশিষ্ট তিন হাজার খারিজী জীবন বাঁচানোর জন্য কিরমান এলাকায় পালিয়ে গেল। কিন্তু পারস্যের গভর্ণর তাদের বিদ্রোহাত্মক কার্যকলাপ লক্ষ্য করে সাবুর এলাকায় তাদের ঘিরে ফেললো এবং অধিকাংশ খারিজীকে হত্যা করলো। যারা রক্ষা পেলো তারা ইসফাহানে ও কিরমানে পালিয়ে গেল। সেখানে তারা একটা বাহিনী গঠন করে বসরা হয়ে কুফা অভিমুখে অগ্রসর হলো। হারিছ ইবনে আবি রাবিয়াহ্ আল-মখজুমি এবং আবদার রহমান ইবনে মিখনাফ আল-আজদি ছয় হাজার যোদ্ধা নিয়ে তাদের গতিরোধ করলো এবং তাদেরকে ইরাকের সীমানার বাহিরে তাড়িয়ে দিয়েছিল। এভাবে বার বার আক্রমণের ফলে খারিজীগণ তাদের সামরিক শক্তি হারিয়ে ফেলে এবং শহরাঞ্চল হতে বিতাড়িত হয়ে মরুভূমিতে ঘুরে বেড়াতে থাকে। এরপরও যেখানেই তারা দল বেঁধেছে সেখানেই তাদের ধ্বংস করা হয়েছে (তাবারী[৭৫], ২য় খন্ড,পৃঃ৫৮০-৫৯১;আছীর[২], ৪র্থ খন্ড, পৃঃ১৯৬-২০৬)।

★★★★★

খোৎবা-৫৮

আমিরুল মোমেনিন যখন খারিজীদের সাথে যুদ্ধ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন তখন তাঁকে অবহিত করা হলো যে, খারিজীগণ নাহ্রাওয়ান সেতু পার হয়ে ওপারে চলে গেছে। তখন তিনি বললেনঃ

নদীর এপাড় তাদের পতন স্থল। আল্লাহ্র কসম, তাদের দশজনও বাঁচতে পারবে না, অপরদিকে তোমাদের দশজনও শহীদ হবে না[১]।

১। এ ভবিষ্যদ্বাণী শুধুমাত্র বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শিতা দ্বারা সম্ভব নয় কারণ দূরদর্শী চোখ জয় বা পরাজয় পূর্বানুমান করতে পারে, যুদ্ধের ফলাফল ধারণা করতে পারে। উভয় পক্ষের নিহতের সংখ্যা পূর্বাহ্নেই বলে দেয়া দূরদর্শীজনের ক্ষমতার বাইরে। এমন ভবিষ্যদ্বাণী তার পক্ষেই সম্ভব যিনি অজানা ভবিষ্যতকে উন্মোচন করতে পারেন এবং জ্ঞানের নূরের সাহায্যে

ভবিষ্যতের পর্দায় আসন্ন দৃশ্যাবলী দেখতে পান। তাই রাসুলের জ্ঞানের উত্তরাধিকারী যা বলেছিলেন বাস্তবেও তা-ই হয়েছিল। খারিজীগণের পলাতক নয় জন ছাড়া বাকী সকলেই এ যুদ্ধে নিহত হয়েছিল এবং আমিরুল মোমেনিনের পক্ষের আটজন শহীদ হয়েছিল।

★★★★★

খোৎবা-৫৯

যখন আমিরুল মোমেনিনকে জানানো হলো যে, খারিজীগণের সকলেই নিহত হয়েছে, তিনি বললেনঃ

আল্লাহ্‌র কসম, তারা এখনো সম্পূর্ণ শেষ হয়নি। তারা এখনো পুরুষের ঔরসে ও নারীর গর্ভাশয়ে রয়েছে। যখনই তাদের মধ্য হতে কোন নেতা গজিয়ে উঠবে তখনই তাকে কেটে ফেলা হবে যে পর্যন্ত না তাদের শেষ জন চোর ও ডাকাত হয়ে যায়[১]।

১। আমিরুল মোমেনিনের এ ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। খারিজীগণের প্রত্যেক নেতাকে হত্যা করা হয়েছে—তাদের কয়েক জনের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

(১) নাফি ইবনে আজরাক আল-হানাফি— সে আজারিকাহ্ নামক বিশাল খারিজী বাহিনী গড়ে তুলেছিল। মুসলিম ইবনে উবায়েস-এর সাথে যুদ্ধে সালামাহ আল-বাহিলির হাতে সে নিহত হয়েছিল।

(২) নাজদাহ্ ইবনে আমির— খরিজীদের নাজাদাত আল আযিরিয়াহ সম্প্রদায় তার নামানুসারেই গঠিত। আবু ফুদায়েক আল-খারিজী তাকে হত্যা করেছিল।

(৩) আবদুল্লাহ্ ইবনে ইবাদ আত-তামিমী–তার নামানুসারেই খারিজীদের ইবাদিয়াহ সম্প্রদায়ের নামকরণ করা হয়। আবদুল্লাহ্ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আতিয়ার সাথে যুদ্ধে সে নিহত হয়।

(৪) আবু বায়হাস্ হায়সাম ইবনে জাবির আদ-দুবাই— তার নামানুসারে বায়হাসিয়াহ্ সম্প্রদায়ের নামকরণ করা হয়। মদীনার গভর্ণর উসমান ইবনে হায়ান আল-মুররী তার হাত ও পা কেটে ফেলে এবং পরে তাকে হত্যা করে।

(৫) উরওয়াহ্ ইবনে উদায়হ্ আত-তামিমী– মুয়াবিয়ার রাজত্বকালে জিয়াদ ইবনে আবিহ্ তাকে হত্যা করে।

(৬) কাতারি ইবনে ফুজাহ্ আল-মাজিনি আত-তামিমী— সুফীয়ান ইবনে আবরাদ আল-কালবীর সৈন্যদের সাথে তাবারিস্থানের যুদ্ধে সে মাওরাহ ইবনে হুরর আদ-দারিমীর হাতে নিহত হয়েছে।

(৭) আবু বিলাল মিরদাস ইবনে উদায়হ্ আত-তামিমী— আব্বাস ইবনে আখদার আল-মাজিনির সাথে যুদ্ধে নিহত হয়েছিল।

(৮) শাওয়াব আল-খারিজী আল-ইয়াশকুরী— সাঈদ ইবনে আমর আল-হারাশীর সাথে যুদ্ধে নিহত হয়েছে।

(৯) হাওছারাহ ইবনে ওয়াদা আল-আসাদী–বনি তাঈ-এর একজন লোকের হাতে নিহত হয়েছিল।

(১০) মুস্তাওয়ারিদ ইবনে উল্লাফাহ্ আত-তায়মী— মুয়াবিয়ার রাজত্বকালে সাকিল ইবনে কায়েস আর-রিয়াহীর হাতে নিহত হয়েছিল।

(১১) শাবিব ইবনে ইয়াজিদ আশ-শায়বানী—নদীতে ডুবিয়ে হত্যা করা হয়েছিল।

(১২) ইমরান ইবনে হারিছ আর-রাসিবী– দুলাবের যুদ্ধে নিহত হয়েছিল।

(১৩-১৪) জাহ্‌হাব আত-তাঈ এবং কুরায়েব ইবনে মুররাহ আল-অজদী—বনি তাহিয়ার সাথে যুদ্ধে নিহত হয়েছিল।

(১৫) জুবায়র ইবনে আলী আস-সালিতী আত-তামিমী—আত্তাব ইবনে ওয়ারকা আর-রিয়াহীর সাথে যুদ্ধে নিহত হয়েছিল।

(১৬) আলী ইবনে বশির ইবনে মাহুজ আল-ইয়ারাবুঈ—হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ আছ-ছাকাফীর হাতে নিহত হয়েছিল।

(১৭) উবায়দুল্লাহ ইবনে বশির- দুলাবের যুদ্ধে মুহাল্লাব ইবনে আবি সুফ্‌রার হাতে নিহত হয়েছিল।

(১৮) আবুল ওয়াজী আর রাসিবী–বনি ইয়াশকুরের কবরস্থানে একজন লোক দেয়াল চাপা দিয়ে হত্যা করেছিল।

(১৯) আবদু রাব্বিহ্ আস সগির–মুহাল্লাবের সাথে যুদ্ধে নিহত হয়েছিল।

(২০) ওয়ালিদ ইবনে তরিফ আশ-শায়বানী–ইয়াজিদ ইবনে মাজইয়াদ আশ-শায়বানীর সাথে যুদ্ধে নিহত হয়েছিল।

(২১-২৪) আবদুল্লাহ্ ইবনে ইয়াহিয়াহ্ আল-কিন্দী, মুখতার ইবনে আউফ আল-অজদী, আব্রাহাহ্ ইবনে সাব্বাহ্ এবং বাল্‌য ইবনে উকবাহ্ আল-আসাদী—এরা সকলেই মারওয়ান ইবনে মুহাম্মদের (শেষ উমাইয়া খলিফা) রাজত্বকালে আবদাল মালিক ইবনে আতিয়াহ আস-সা'দি কর্তৃক নিহত হয়েছিল।

★★★★★

খোৎবা-৬০

আমিরুল মোমেনিন আরো বলেন ঃ

আমার পরে খারিজীদের সাথে যুদ্ধ[১] করো না, কারণ যে ন্যায় অনুসন্ধান করে কিন্তু খুঁজে পায় না সে ঐ ব্যক্তির মত নয় যে অন্যায় অনুসন্ধান করে এবং তা খুঁজে পায়।

১। খারিজীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করার আদেশ দানের কারণ হলো—তিনি স্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁর পরে কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা এমন অজ্ঞ লোকদের (মুয়াবিয়া ও তার দল) হাতে চলে যাবে যারা জিহাদের যথার্থতা বুঝতে পারবে না এবং তারা শুধু তাদের প্রভাব টিকিয়ে রাখার জন্য তরবারি ব্যবহার করবে। এমনকি তাদের কেউ আমিরুল মোমেনিনের কুৎসা রটনা করার জন্য খারিজীদেরকে উৎসাহিত করবে। সুতরাং যারা নিজেরাই অন্যায়ে জড়িত অন্য অন্যায়কারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অধিকার তাদের নেই। আবার, যারা ইচ্ছাকৃতভাবে অন্যায় করে তারা সেসব লোকের সাথে যুদ্ধ করতে পারে যারা ভুলবশতঃ অন্যায় করছে। এভাবে আমিরুল মোমেনিন স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, খারিজীদের বিপথগামীতা ইচ্ছাকৃত নয়—শয়তানের প্রভাব। তারা অন্যায়কে ন্যায় বলে গ্রহণ করে তাতেই দৃঢ় রয়েছে। অপরদিকে মুয়াবিয়া ও তার দল বুঝে-শুনেই ন্যায়কে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং অন্যায়কে তাদের আচরণ বিধি হিসাবে গ্রহণ করেছে। দ্বীনের ব্যাপারে তাদের ধৃষ্টতা এমন এক পর্যায়ে গিয়ে পৌছেছে যে, এটাকে ভুল বুঝার ফল বলা যায় না, আবার বিচারের ভ্রমাত্মক লেবাসও বলা যায় না। কারণ তারা প্রকাশ্যে দ্বীনের সীমালজ্ঘন করেছিল এবং তাদের নিজস্ব ধ্যান-ধারণার বাইরে রাসুলের (সঃ) আদেশ-নিষেধকে আমল দেয়নি। হাদীদ[১৫২] (৫ম খন্ড, পৃঃ১৩০) লিখেছেন যে, মুয়াবিয়াকে স্বর্ণ ও রৌপ্যের বাসন-কোসন ব্যবহার করতে দেখে সাহাবা আবু দারদা বললেন, "রাসুলকে (সঃ) বলতে শুনেছি— যে কেউ স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্রে পান করবে সে উদরে দোযখের আগুনের জ্বালা পোহাবে।" মুয়াবিয়া বললো, "এটা আমার জন্য ক্ষতিকর নয়।" একইভাবে সে জিয়াদ ইবনে আবিহ্‌র (তার পিতার জারজ সন্তান) সাথে তার খুশীমত রক্তের সম্পর্ক গড়েছিল যা শরিয়ত সিদ্ধ নয়। সে মিম্বারে বসে রাসুলের আহলুল বাইতকে গালিগালাজ করতো এবং শরিয়তের সীমালজ্ঘন করে চলতো। সে নির্দোষ লোকদের রক্তপাত ঘটিয়েছিল এবং দুশ্চরিত্র ও পাপী লোকদেরকে জনগণের ওপর চাপিয়ে দিয়েছিল।

★★★★★

খোৎবা-৬১

প্রতারক কর্তৃক নিহত হবার বিষয়ে আমিরুল মোমেনিনকে সতর্ক করা হলে তিনি বলেনঃ

নিশ্চয়ই, আল্লাহ্‌র একটা শক্ত ঢাল আমার ওপর রয়েছে। যখন আমার দিন ঘনিয়ে আসবে তখন সে ঢাল সরিয়ে নেয়া হবে এবং আমাকে মৃত্যুর হাতে সঁপে দেয়া হবে। সে সময় কোন তীরই লক্ষভ্রষ্ট হবে না এবং কোন আঘাতের ক্ষত নিরাময় হবে না।

★★★★★

খোৎবা-৬২

দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ীত্ব সম্পর্কে

সাবধান, দুনিয়া এমন এক স্থান যার থেকে শুধু জীবিত থাকাকালীন সময়ে প্রতিরক্ষা আশা করা যায়। শুধুমাত্র দুনিয়ার জন্য আমল করে মুক্তি লাভ করা যায় না। বিপদাপদের মধ্যে দিয়েই দুনিয়াতে মানুষকে পরীক্ষা করা হয়। এখানে যারা জাগতিক ভোগ-বিলাসে কাটিয়েছে মৃত্যুই উহা হতে তাদেরকে বঞ্চিত করবে এবং এ সম্পর্কে তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে। উত্তম আমল দ্বারা পরকালের জন্য যা কিছু অর্জন করবে, সেখানে তারা তা পাবে এবং উপভোগ করবে। বুদ্ধিমানের জন্য এ দুনিয়া ছায়ার মত—যা এ মুহূর্তে বৃদ্ধি পেয়ে ছড়িয়ে পড়ে আবার পর মুহূর্তেই সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে।

★★★★★

খোৎবা-৬৩

দুনিয়ার ক্ষয় ও ধ্বংস সম্পর্কে

হে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ, আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং মৃত্যুর আগেই সৎ আমলে নিজেকে নিয়োজিত কর। পার্থিব সম্পদ তথা দুনিয়ার ভোগ-বিলাসের বিনিময়ে অনন্তকালীন আনন্দ ক্রয় কর। অনন্ত যাত্রার জন্য প্রস্তুত হও, কারণ তোমরা সেদিকে তাড়িত হচ্ছো এবং মৃত্যুর জন্য নিজেকে প্রস্তুত কর কারণ মৃত্যু তোমাদের মাথার ওপর ঘুরছে। এমন লোক হও যারা আহ্বান মাত্রই জেগে উঠে, যারা জানে এ দুনিয়া তাদের আবাসস্থল নয় এবং যারা এ দুনিয়াকে পরকালের সঙ্গে বদল করে নিয়েছে।

নিশ্চয়ই, আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে বিনা উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেননি এবং অকেজোভাবে তোমাদেরকে ফেলেও রাখেন নি। তোমাদের এবং বেহেশত অথবা দোযখের মধ্যবর্তী মৃত্যু ব্যতীত আর কিছুই নেই যা তোমাদের ওপর আপতিত হবেই। প্রতিটি মুহূর্ত জীবন থেকে খসে গিয়ে জীবনকে খর্ব করছে এবং প্রতিটি মুহূর্ত এভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে খাট হয়ে যাচ্ছে বলে মনে করতে হবে। মৃত্যু নামক গুপ্ত ঘটনা দিবারাত্র তোমাদের দিকে দ্রুত এগিয়ে আসছে। মৃত্যুপথের অভিযাত্রীকে সর্বোত্তম রসদ সংগ্রহ করতে হবে। সুতরাং এ দুনিয়াতে থাকাকালেই এমন রসদ সংগ্রহ কর যদ্বারা আগামীকাল নিজকে রক্ষা করতে পারবে।

সুতরাং প্রত্যেকের উচিত আল্লাহ্কে ভয় করা, নিজেকে সতর্ক করা, তওবা করা, কামনা-বাসনাকে প্রতিহত করা; কারণ মৃত্যু তার কাছে গুপ্ত, কামনা-বাসনা তাকে প্রতারিত করে এবং শয়তান তার পিছু লেগে আছে। শয়তান পাপকে তার কাছে মনোমুগ্ধকর করে উপস্থাপন করে এবং তওবা করতে বিলম্ব ঘটানোর জন্য এমন বেখবর বানিয়ে দেয় যে, অসতর্ক অবস্থায় তওবার পূর্বেই মৃত্যু এসে পড়ে। দুঃখ হয় সে সব গাফেলের জন্য যাদের জীবনই তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ হয়ে দাঁড়াবে এবং তাদের দিনগুলো (গাফলতিতে অতিবাহিত) তাদেরকে শাস্তির দিকে নিয়ে যাবে।

আমরা মহিমান্বিত আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদেরকে এবং তোমাদেরকে সেসব লোকের মত করেন যাদেরকে নিয়ামত বিপথগামী করে না, যাদেরকে কোন কিছুই আল্লাহ্র আনুগত্য হতে বারিত করতে পারে না এবং যারা মৃত্যুর পর লজ্জা ও দুঃখে নিপতিত হয় না।

★★★★★

খোৎবা-৬৪

আল্লাহ্র গুণরাজী সম্পর্কে

প্রতিষ্ঠিত প্রশংসা আল্লাহ্র যাঁর এক অবস্থা অন্যটির শর্ত নয় যাতে তিনি শেষ হবার পূর্বেই প্রথম হতে পারেন অথবা গুপ্ত হবার পূর্বেই সপ্রকাশ হতে পারেন। তিনি ব্যতীত যাকেই 'এক' (একাকী) বলা হয়, তাকেই ক্ষুদ্রতার জন্য তা বলা হয় এবং তিনি ব্যতীত যে কোন সম্মানিত ব্যক্তিই নগণ্য। তিনি ব্যতীত যে কোন ক্ষমতাবান ব্যক্তিই দুর্বল। তিনি ব্যতীত প্রত্যেক মনিবই দাসানুদাস।

তিনি ব্যতীত প্রত্যেক জ্ঞানীই জ্ঞানানুসন্ধানী। তিনি ব্যতীত সকল নিয়ন্ত্রকই নিয়ন্ত্রিত। তিনি ব্যতীত সকল শ্রবণকারীই বধির, কারণ হালকা স্বর সে শুনতে পায় না, আবার উচ্চৈঃস্বর তাকে বধির করে দেয় এবং দূরবর্তী স্বরও তার কাছে পৌছে না। তিনি ব্যতীত সকল দৃষ্টিমান ব্যক্তিই অন্ধ, কারণ সে গুপ্ত রং ও সূক্ষ্ম জিনিস দেখতে পায় না। তিনি ব্যতীত প্রতিটি সপ্রকাশ জিনিসই গুপ্ত, কিন্তু তিনি ব্যতীত কোন গুপ্ত জিনিস প্রকাশ পেতে অসমর্থ।

তিনি যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তা তাঁর কর্তৃত্ব শক্তিশালী করার জন্য বা সময়ের পরিণতির ভয়ে করেননি। কোন শক্তিধর প্রতিদ্বন্দ্বীর আক্রমণে সাহায্য পাবার আশায় অথবা কোন দাম্ভিক অংশীদার বা কোন ঘৃণ্য শত্রুর বিরোধিতা ঠেকানোর জন্যও তিনি কোন কিছু সৃষ্টি করেনি। অপরদিকে সৃষ্টির সব কিছুকেই তিনি প্রতিপালন করেন এবং সকল সৃষ্টিই তাঁর দাসানুদাস। তিনি কোন কিছুর সাথেই যুক্ত (বস্তুমোহ নিরপেক্ষ) নন যাতে বলা যেতে পারে তিনি অমুক বস্তুতে রয়েছেন, আবার কোন কিছু হতেই তিনি বিযুক্ত নন যাতে বলা যেতে পারে অমুক বস্তু হতে তিনি আলাদা। তিনি যা কিছু সৃষ্টি করেছেন উহা নিয়ন্ত্রণে বা পরিচালনা করতে কখনো ক্লান্তি বোধ করেন না। তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তাতে কোন অক্ষমতা বা ত্রুটি তাকে স্পর্শ করেনি। তাঁর কোন নির্দেশে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে কোন প্রকার সংশয় তাঁকে স্পর্শ করেনি। তাঁর রায় সুনিশ্চিত, তাঁর জ্ঞান পরিপূর্ণ এবং তাঁর শাসন অদম্য। দুঃখ-দুর্দশায় তাঁর সহায়তা যাচ্না করা হয়, আবার ঐশ্বর্য আপ্লুত অবস্থায়ও তাঁকে ভয় করা হয়।

★★★★★

খোৎবা-৬৫

সিফ্‌ফিনের যুদ্ধের সময় আমিরুল মোমেনিন তার সহচরদেরকে বলেন ঃ

হে মুসলিম জনতা! আল্লাহ্‌র ভয়কে তোমাদের জীবনের রুটিনে পরিণত কর। নিজেকে মানসিক প্রশান্তিতে রেখো এবং দাঁতে দাঁত চেপে ধর, কারণ এতে তোমাদের মাথার ওপর থেকে তরবারি দূরে সরে যাবে। তোমাদের বর্ম পরিধান কর এবং তরবারি বের করার আগে খাপের মধ্যে নেড়ে নাও। শত্রুর ওপর চোখ রেখো। তোমাদের বর্শা উভয় দিকে ব্যবহার করো এবং তরবারি দ্বারা শত্রুকে আঘাত হানো। মনে রেখো, তোমরা আল্লাহ্‌র সম্মুখে এবং রাসুলের চাচাতো ভাই এর সাথী হয়ে লড়ছো। বারংবার আক্রমণ কর এবং পিছু হটার লজ্জাকর অবস্থার কথা অনুভব কর; কারণ এটা পরবর্তী বংশধরগণের জন্য লজ্জা ও শেষ বিচারের দিনে শাস্তির কারণ। স্বেচ্ছায় তোমাদের জীবন আল্লাহ্‌কে দাও এবং নির্দ্বিধায় মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাও। ঐ সুসজ্জিত তাঁবু ও এর চারপাশের জটলার প্রতি সতর্ক হও এবং জটলার মধ্যভাগে যেখানে দামামা বাজছে সেখানে তোমাদের আক্রমণের লক্ষ্যস্থল স্থির কর, কারণ সেখানে শয়তান বসে আছে। সে তোমাদেরকে আক্রমণ করার জন্য তার হাত প্রসারিত করেছে এবং পালিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে পা পেছনে রেখেছে। তোমরা ধৈর্য ধারণ কর যে পর্যন্ত না সত্যের আলো প্রতিভাত হয়।

সুতরাং তোমরা মনোবল হারিয়ো না এবং সন্ধির প্রস্তাব করো না। তোমরাই প্রবল; আল্লাহ্ তোমাদের সঙ্গে আছেন, তিনি তোমাদের কর্মফল কখনো ক্ষুন্ন করবেন না (কুরআন-৪৭ ঃ ৩৫)

★★★★★

খোৎবা-৬৬

রাসুলের (সঃ) ইনতিকালের অব্যবহিত পরে বনি সাঈদাহ্‌র সকিফাহ্[১] -এ সংঘটিত ঘটনা প্রবাহের সংবাদ আমিরুল মোমেনিনকে অবহিত করা হলে তিনি জানতে চেয়েছিলেন যে, আনসারগণ কি বলেছিল। লোকেরা বললো যে, তারা দাবী করেছিল একজন প্রধান তাদের থেকে এবং আরেকজন প্রধান অন্যদের মধ্য হতে নিয়োগ করতে। তখন আমিরুল মোমেনিন বলেনঃ

তোমরা কেন রাসুলের অছিয়ত সম্পর্কে বললে না যে, আনসারদের মধ্যে যারা ভাল লোক তাদের প্রতি উত্তম ব্যবহার করবে; আর যারা মন্দলোক তাদেরকে সব সময় ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবে।

লোকেরা বললোঃ রাসুলের এ অছিয়তের মধ্যে তাদের দাবীর বিরুদ্ধে কি আছে?

আমিরুল মোমেনিন বললেন ঃ "যদি নেতৃত্ব তাদের জন্য হতো তবে তাদের অনুকূলে কোন অছিয়ত থাকার প্রয়োজন ছিল না।" তৎপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "কুরায়েশগণ কি জবাব দিল"?

লোকেরা বললোঃ তারা যুক্তি দেখালো যে, তারা রাসুলের সাজারার অন্তর্ভূক্ত (বংশধর)। আমিরুল মোমেনিন বললেনঃ তারা সাজারার যুক্তি দেখিয়েছে অথচ এর ফল বিনষ্ট করে ফেলেছে।

১। বনি সা'ইদার সকিফাতে যা ঘটেছিল তাতে মনে হয় আনসারদের বিরুদ্ধে মুহাজিরদের বলিষ্ঠ যুক্তি ছিল যে, তারা রাসুলের (সঃ) আত্মীয়স্বজন। সুতরাং তারা ছাড়া আর কেউ খেলাফত পেতে পারে না। তাদের এ যুক্তিই ছিল তাদের কৃতকার্য হবার মূল ভিত্তি। এ যুক্তির ভিত্তিতে আনসারগণের বিরাট জনতা তাদের অস্ত্র তিনজন মুহাজিরের সামনে সমর্পণ করেছিল এবং মুহাজিরগণ রাসুলের বংশধর হবার বৈশিষ্ট্য দেখিয়েই খেলাফত লাভ করেছিল। সকিফার ঘটনা প্রবাহ

সম্পর্কে তাবারী [৭৫] লিখেছেন যে, যখন আনসারগণ সা'দ ইবনে উবাদার হাতে বায়াত গ্রহণের জন্য বনি সাঈদার সকিফায় একত্রিত হলো তখন আবু বকর, উমর ও আবু উবায়দাহ্ ইবনে আল-জাররাহ যেকোন ভাবে টের পেয়ে সেখানে উপস্থিত হয়েছিল। উমর দাঁড়িয়ে কিছু বলতে গেলে আবু বকর তাকে থামিয়ে দিয়ে নিজেই বলতে লাগলোঃ

মুহাজিরগণ হলো তারা যারা সর্বাগ্রে আল্লাহ্র ইবাদত করেছিল এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের প্রতি ইমান এনেছিল এবং তারাই রাসুলের বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজন। এ কারণেই শুধু তারাই খেলাফতের যোগ্য। যারা তাদের সাথে দ্বন্দ্ব করবে তারাই সীমালজ্ঘনকারী।

আবু বকরের বক্তব্য শেষ হলে হুবাব ইবনে মুনযির দাঁড়িয়ে আনসারগণকে লক্ষ্য করে বললো, "হে আনসারগণ! তোমাদের হাতের লাগাম অন্যের হাতে তুলে দিয়ো না। জনসাধারণ তোমাদের তত্ত্বাবধানে। তোমরা সম্মানে, সম্পদে, গোত্রে ও সংখ্যায় কম নও। যদি কোন বিষয়ে তোমাদের ওপর মুহাজিরদের প্রাধান্য থেকে থাকে তবে অন্য অনেক বিষয়ে তাদের ওপরও তোমাদের প্রধান্য আছে। তোমরা তাদেরকে নিজের ঘরে আশ্রয় দিয়েছো। যুদ্ধে তোমরাই ইসলামের বাহুবল এবং তোমাদের সহায়তায় ইসলাম নিজ পায়ে দাঁড়িয়েছে। মুক্তভাবে আল্লাহ্র ইবাদত তোমাদের শহরেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। নিজেদের মধ্যে বিভেদ করো না এবং নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে চেষ্টা করো। যদি মুহাজিরগণ তোমাদের অধিকার স্বীকার না করে তবে তাদের বলে দাও আমাদের মধ্য হতে একজন ও তাদের মধ্য হতে একজন প্রধান নিয়োগ করতে হবে। হুবাব কথা শেষ করে বসে পড়তেই উমর দাঁড়িয়ে বললোঃ

এটা যুক্তিসঙ্গত হতে পারে না যে, একই সময়ে দু'জন শাসক থাকবে। আল্লাহ্র কসম, তোমাদের মধ্য হতে রাষ্ট্রপ্রধান মনোনয়ন আরবগণ কখনো মেনে নেবে না, কারণ রাসুলের আবির্ভাব তোমাদের মধ্য হতে হয়নি। নিশ্চয়ই, আরবগণ এ যুক্তির থোড়াই পরোয়া করবে যে, খেলাফত সে ঘরেই যাবে যে ঘরে রাসুল চির নিদ্রায় শায়িত। তোমাদের মধ্যে যদি কেউ ভিন্নমত পোষণ করে তবে সে সুস্পষ্ট ও স্বচ্ছ যুক্তি উত্থাপন করতে পারে। মুহাম্মদের (সঃ) কর্তৃত্ব ও শাসনকার্য সম্পর্কে যে কেউ আমাদের সাথে বিরোধ করবে সে ভ্রান্তিতে নিপতিত হবে এবং পাপী বলে গণ্য হবে; ফলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।

উমরের কথা শেষ হতেই হুবাব আবার দাঁড়িয়ে বললো ঃ

হে আনসারগণ, তোমাদের দাবীতে তোমরা স্থির থাক। এ লোকটিও তার সমর্থকদের কথায় কর্ণপাত করো না। তারা তোমাদের অধিকারকে পদদলিত করতে চায়। যদি তারা তোমাদের অধিকার মেনে না নেয় তবে তাদেরকে তোমাদের শহর হতে বের করে দাও এবং তোমরা খেলাফত প্রতিষ্ঠা করো। খেলাফতের হকদার তোমাদের চেয়ে আর বেশী কে আছে?

হুবাবের কথা শেষ হলে উমর তাকে গালাগালি শুরু করে দিল। হুবাবের পক্ষ হতেও মন্দ শব্দ প্রয়োগ করতে লাগলো। এতে অবস্থার অবনতি লক্ষ্য করে আবু উবায়দাহ্ ইবনে জাররাহ্ অবস্থা ঠান্ডা করার জন্য বললো ঃ

হে আনসার ভ্রাতাগণ, তোমরাই তো তারা যারা সর্বোপায়ে আমাদের সাহায্য করেছিলে—সমর্থন দিয়েছিলে। এখন কেন তোমরা তোমাদের সে মনোভাব ও আচরণ পরিবর্তন করছো।

আবু উবায়দার বক্তব্যের পরও আনসারগণ তাদের মত পরিবর্তন করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলো। তারা সা'দের হাতে বায়াত গ্রহণ করতে যাচ্ছিলো এমন সময় সা'দের গোত্রের বশির ইবনে আমর আল-খাযরাজী দাঁড়িয়ে বললো ঃ

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আমরা দ্বীনকে সমর্থন করেছিলাম এবং জিহাদে এগিয়ে এসেছিলাম, কিন্তু এতে আমাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভ করা এবং তাঁর রাসুলকে মান্য করা। এতে আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করে খেলাফতের ব্যাপারে গোলযোগ সৃষ্টি করা উচিত হবে না। মুহাম্মদ ছিলেন কুরায়েশ বংশের; সেহেতু খেলাফতে তাদের অধিকার সমধিক এবং খেলাফতের জন্য তারাই অধিক যোগ্য।

বশিরের বক্তব্য শেষ হতে না হতেই আনসারগণের মধ্যে বিভেদ দেখা দিল এবং তার উদ্দেশ্যও ছিল তা-ই কারণ সে তার গোত্রের একজনকে এত উচ্চ মর্যাদায় দেখা সহ্য করতে পারেনি। মুহাজেরগণ এ সুযোগে আবু বকরের হাতে বায়াত গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রথমেই বশির, তৎপর উমর ও তৎপর আবু উবায়দাহ্ আবু বকরের হাতে হাত রেখে বায়াত গ্রহণ করেছিল। এর পর বশিরের গোত্রের সকলেই বায়াত গ্রহণ করলো।

এ সময় আমিরুল মোমেনিন রাসুলের (সঃ) কাফন ও দাফনে ব্যস্ত ছিলেন। পরে যখন তিনি সকিফার ঘটনা শুনলেন তখন বললেন যে, তারা রাসুলের বংশধারার (সাজারা) যুক্তি দেখিয়ে আনসারদের দাবীর মুখে জয়লাভ করেছে অথচ তারা সে গাছের ফল নষ্ট করেছে অর্থাৎ রাসুলের আহলুল বাইতকে (পরিবারের সদস্য) বঞ্চিত করেছে। মুহাজিরগণ সাজারার দাবীতে প্রবল, কিন্তু কি করে তারা সে সাজারার ফলকে উপেক্ষা করলো? এটা এক অদ্ভুত ব্যাপার যে, আবু বকর সাত স্তর এবং উমর নয় স্তর উপরে গিয়ে রাসুলের সাজারায় (লিনিয়্যাল ট্রী) যুক্ত হয়ে তাঁর পরিবারভুক্ত হবার কথা ব্যক্ত করেছে অথচ তারা রাসুলের আপন চাচাতো ভাইকে অস্বীকার করেছে।

★★★★★

খোৎবা-৬৭

মিশরের গভর্ণর মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর[১] ক্ষমতাচ্যুৎ হয়ে নিহত হবার খবর পেয়ে আমিরুল মোমেনিন বলেন ঃ

হাশিম ইবনে উতবাহ্‌কে মিশরে প্রেরণ করার জন্য আমি মনস্থ করেছিলাম। যদি আমি তা-ই করতাম তবে সে বিরোধীদের জন্য যুদ্ধের ময়দান খালি করে দিত না এবং তাদেরকে কোন সুযোগ দিত না (তাকে ধরে ফেলার)। এ উক্তি আমি মুহাম্মদের মানহানি করার জন্য করিনি যেহেতু আমি তাকে ভালবাসি এবং আমি তাকে লালন-পালন করেছি।

১। মুহাম্মদ ইবনে আবু বকরের মাতা ছিলেন আসমা বিনতে উমায়েস। আবু বকরের মৃত্যুর পর আমিরুল মোমেনিন তাকে বিয়ে করেন। ফলে মুহাম্মদ আমিরুল মোমেনিনের সাথে বাস করতো এবং তাকে আমিরুল মোমেনিনই লালন-পালন করেন। সে কারণে মুহাম্মদ তাঁর আচার-আচরণ, মত ও পথ আত্মভূত করতে পেরেছিল। আমিরুল মোমেনিন তাকে অত্যন্ত ভালবাসতেন এবং নিজের পুত্র মনে করতেন। তিনি অনেক সময় বলতেন, "মুহাম্মদ আবু বকরের ঔরসজাত কিন্তু আমার পুত্র।" বিদায় হজ্বের যাত্রাকালে সে জন্মগ্রহণ করে এবং আটাশ বছর বয়সে ৩৮ হিজরী সনে শহীদ হয়।

আমিরুল মোমেনিন খেলাফত গ্রহণের পর কায়েস ইবনে সাদ ইবনে উবাদাহ্‌কে মিশরের গভর্ণর মনোনীত করেন, কিন্তু অবস্থা এমন হয়েছিল যে, শেষ পর্যন্ত মুহাম্মদ ইবনে আবু বকরকে গভর্ণর করে প্রেরণ করতে হয়েছিল। কায়েস উসমানী দলের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেয়ার পক্ষপাতী ছিল না, কিন্তু মুহাম্মদের অভিমত ছিল বিপরীত। ক্ষমতা গ্রহণের এক মাসের মধ্যেই মুহাম্মদ তাদের কাছে বার্তা প্রেরণ করলো যে, যদি তারা তাকে মান্য না করে তবে তাদের অস্তিত্ব মিশরে রাখা হবে না। ফলে এসব লোক তার বিরুদ্ধে একটা দল গঠন করে গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। সিফফিনের সালিশীর পর তারা প্রকাশ্যভাবে প্রতিশোধের শ্লোগান দিয়ে সমস্যার সৃষ্টি করে মিশরের পরিবেশ অশান্ত করে তুলেছিল। আমিরুল মোমেনিন এ সংবাদ পেয়ে মালিক ইবনে হারিছ আল-আশতারকে মিশরের গভর্ণর নিয়োগ করে তথায় প্রেরণ করলেন যাতে

ষড়যন্ত্র প্রদমিত হয়ে প্রশাসন ভালভাবে চলে। কিন্তু মালিক উমাইয়াদের নীলনকশা হতে নিস্কৃতি পায়নি। তারা মালিককে পথিমধ্যেই বিষ প্রয়োগে হত্যা করে। ফলে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকরই মিশরের শাসনকর্তা রয়ে গেল।

এ দিকে সালিশীতে আমর ইবনে আস এর কার্যক্রমের জন্য মুয়াবিয়া তাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তা মুয়াবিয়াকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হলো। ফলে সে আমরের নেতৃত্বে ছয় হাজার সৈন্য ন্যস্ত করে মিশর আক্রমণের জন্য তাকে প্রেরণ করলো। শত্রুর অগ্রযাত্রা সম্পর্কে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর জানতে পেরে সাহায্যের জন্য আমিরুল মোমেনিনকে পত্র লিখলো। প্রত্যুত্তরে তিনি জানালেন যে, তিনি সহসাই তার সাহায্যের জন্য সৈন্য সংগ্রহ করে প্রেরণ করবেন; ইতোমধ্যে সে যেন তার নিজের বাহিনীকে সমবেত করে যুদ্ধের উদ্যোগ গ্রহণ করে। মুহাম্মদ চার হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী গঠন করে উহা দু'ভাগ করলেন। একভাগ নিজের অধীনে রেখে অপরভাগ কিনানাহ্ ইবনে বশির আত-তুযিবীর নেতৃত্বে ন্যস্ত করে শত্রুর অগ্রযাত্রা প্রতিহত করার জন্য আদেশ দিলেন। কিনানাহ্ তার বাহিনী নিয়ে এগিয়ে গেল। শত্রুর সম্মুখভাগে তারা যখন ক্যাম্প স্থাপন করলো তখন একের পর এক শত্রুদল তাদেরকে আক্রমণ করতে লাগলো। তারা অসীম সাহসিকতা ও বীরত্বের সাথে এসব আক্রমণ মোকাবেলা করেছিলো। অবশেষে মুয়াবিয়াহ ইবনে হুদায়েজ আল-কিন্দি তার সর্বশক্তি নিয়োগ করে এমনভাবে আক্রমণ করলো যে, কিনানাহ্র বাহিনী তা প্রতিহত করতে পারেনি। ফলে তারা যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে পড়লো। কিনানাহ্র পরিণতির সংবাদ পেয়ে মুহাম্মদের বাহিনী ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে তাকে পরিত্যাগ করে পালিয়ে গেল। মুহাম্মদ নিরুপায় হয়ে আত্মগোপন করে একটা নির্জন স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। শত্রুপক্ষ যে কোন লোকের মাধ্যমে খবর পেয়ে তৃষ্ণাকাতর অবস্থায় মুহাম্মদকে ধরে ফেললো এবং তাকে দ্বিখন্ডিত করে তার লাশ জ্বালিয়ে দিয়েছিল।

এদিকে মালিক ইবনে কা'ব আল-আরহাবীর নেতৃত্বে দু'হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী কুফা হতে যাত্রা করে গিয়েছিল। কিন্তু তারা মিশরে পৌছার আগেই শত্রুপক্ষ মিশর দখল করে নিয়েছিলো।

★★★★★

খোৎবা-৬৮

অনুচরদের অসতর্ক আচরণ সম্পর্কে উপদেশ দিয়ে আমিরুল মোমেনিন বলেন ঃ

আর কতকাল আমি তোমাদের ইচ্ছা ও অনুভূতির প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে চলবো। আমি তোমাদের ইচ্ছার সঙ্গে সেভাবেই খাপ খাইয়ে নিয়েছি যেভাবে মানুষ ফাঁপা কুঁজ সম্পন্ন উট অথবা এদিক সেলাই করলে ওদিক বেরিয়ে পড়ে এমন ছেঁড়া কাপড়ের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়। যখন সিরিয়ার একটা ছোট বাহিনী তোমাদের কাছে-ধারে ঘোরাফেরা করেছিলো তখন তোমরা ঘরের দরজা বন্ধ করে এমনভাবে লুকিয়ে পড়েছিলে যেন গিরগিটি অথবা ব্যাজার তার গর্তে লুকিয়ে পড়েছে। আল্লাহ্র কসম, তোমাদের মত মানুষকে সমর্থন করলে অপদস্থ হওয়া অনিবার্য এবং তোমাদের সমর্থন নিয়ে তীর ছোঁড়া মানেই হলো মাথা ও লেজ ভাঙ্গা তীর নিক্ষেপ করা। আল্লাহ্র কসম, ঘরের আঙ্গিনায় তোমরা সংখ্যায় অনেক কিন্তু ব্যানারের তলে তোমরা মুষ্টিমেয় কয়েকজন। নিশ্চয়ই, আমি জানি কিসে তোমাদের আচরণের উন্নতি হবে এবং কি করে তোমাদের বক্রতা সোজা করতে হবে। কিন্তু আমি নিজেকে বরবাদ করে তোমাদের উন্নতি বিধান করবো না। আল্লাহ্ তোমাদেরকে অসম্মানিত ও ধ্বংস করতে পারেন। তোমরা অন্যায়কে যতটুকু বোঝ, ন্যায়কে ততটুকু বোঝ না এবং ন্যায়কে ধ্বংস করার জন্য যতটুকু প্রবৃত্ত হও, অন্যায়কে ধ্বংস করার জন্য ততটুকু হও না।

★★★★★

খোৎবা-৬৯

প্রাণনাশক আঘাতের দিন ভোরে আমিরুল মোমেনিন বলেন ঃ

আমি বসেছিলাম। হঠাৎ নিদ্রাচ্ছন্ন হলাম। আমি দেখলাম আল্লাহ্‌র রাসুল (সঃ) আমার সম্মুখে উপস্থিত। আমি বললাম, "হে আল্লাহ্‌র রাসুল! মানুষের বক্রতা ও শক্রতা আমি আর কত সহ্য করবো?" আল্লাহ্‌র রাসুল বললেন, "তাদের অশুভের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা কর।" আমি বললাম, "আমার জন্য তাদের চেয়ে আরো ভাল লোক এবং তাদের জন্য আমার পরিবর্তে অনেক খারাপ লোক আল্লাহ্ দিতে পারেন।"

★★★★★

খোৎবা-৭০

ইরাকের জনগণকে ভর্ৎসনা

ওহে ইরাকের জনগণ[১]! তোমরা হলে সেই গর্ভবতী মহিলার মত যে গর্ভসময় পূর্তির পর একটা মৃত সন্তান প্রসব করে এবং তার স্বামীও মারা যায় এবং তার বৈধব্য দীর্ঘস্থায়ী হয়ে পড়ে, ফলে দূরবর্তী আত্মীয়-স্বজন তার উত্তরাধিকারী হয়। আল্লাহ্‌র কসম, আমি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তোমাদের কাছে আসিনি। অবস্থার প্রেক্ষিতে আমি আসতে বাধ্য হয়েছি। আমি জানতে পেরেছি যে, তোমরা বল আলী মিথ্যা কথা বলে। আল্লাহ্ তোমাদেরকে ধ্বংস করুন। কার বিরুদ্ধে আমি মিথ্যা বলি? আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে? কিন্তু তাঁর প্রতি ইমান আনাতে আমিই তো প্রথম। তাঁর রাসুলের বিরুদ্ধে? কিন্তু আমিই তো প্রথম যে তাঁকে বিশ্বাস করে। কখনো নয়; আল্লাহ্‌র কসম, আমি যা বলেছি তা সম্পূর্ণ সঠিক। তোমরা সে সময় উপস্থিত ছিলে না—থাকলেও সে কথা বোঝার যোগ্য লোক তোমরা নও। তোমাদের ওপর অভিশাপ! আমি বিনামূল্যে আমার সুশোভন বক্তব্য তোমাদের দিয়ে যাচ্ছি। আহা! এটা ধারণ করার মত পাত্র যদি থাকতো।

"কিয়ৎকাল পরে তোমরা এটা অবশ্যই বুঝতে পারবে।" (কুরআন ঃ ৩৮ ঃ ৮৮)

১। সালিশীর পর মুয়াবিয়ার আক্রমণ ক্রমাগত বেড়ে যায়। এসব আক্রমণ প্রতিহত করতে ইরাকীদের শৈথিল্য ও হৃদয়হীনতা দেখে আমিরুল মোমেনিন তাদের ভর্ৎসনা করে এ ভাষণ দেন। এ ভাষণে তারা যে সিফফিনে প্রতারিত হয়েছে তা উল্লেখ করে পাঁচটি বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন মহিলার সাথে তাদের তুলনা করেনঃ

(ক) মহিলাটি গর্ভবতী- এতে বুঝানো হয়েছে ইরাকীদের যুদ্ধ করার ক্ষমতা ছিল। তারা বন্ধ্যা নারীর মত নয় যার কাছে কিছু আশা করা যায় না।

(খ) তার গর্ভকাল পূর্তি হয়েছে-অর্থাৎ ইরাকীরা যুদ্ধের বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে চূড়ান্ত বিজয়ের মুখে পৌঁছেছিল।

(গ) সে মৃত সন্তান প্রসব করলো-অর্থাৎ চূড়ান্ত বিজয়ের মুখে তারা সালিশীতে যাবার জন্য জেদ ধরলো এবং বিজয়ের পরিবর্তে নৈরাশ্যের মোকাবেলা করলো।

(ঘ) তার বৈধব্য দীর্ঘস্থায়ী হলো-অর্থাৎ এমন এক আস্থায় তারা পড়লো যে তাদের কোন রক্ষাকর্তা বা পৃষ্ঠপোষক রইলো না এবং তারা কোন শাসনকর্তা ছাড়া ঘুরে বেড়াতে লাগলো।

(ঙ) দূরবর্তী আত্মীয় তার উত্তরাধীকারী হলো - অর্থাৎ সিরিয়ার জনগণ যাদের সঙ্গে কোন আত্মীয়তা নেই তারাই ইরাকীদের সম্পদ দখল করলো।

★★★★★

খোৎবা-৭১

রাসুলের ওপর কিভাবে সালাম পেশ করতে হয় সে সম্পর্কে আমিরুল মোমেনিন বলেন ঃ

হে আল্লাহ্, তুমি পৃথিবীর উপরিভাগকে বিস্তৃতকারী এবং আকাশ মন্ডলের সুনির্দিষ্ট রক্ষক। তুমি ভাল ও মন্দ স্বভাব সম্পন্ন হৃদয় সৃষ্টিকারী। মুহাম্মদের (সঃ) প্রতি তোমার পছন্দের সেরা সালাম ও বরকত বর্ষণ করো। তিনি তোমার বান্দা ও রাসুল। তিনি সর্বশেষ নবী। যা নিরুদ্ধ ছিল তিনি তা উন্মুক্ত করেছেন। তিনি সত্যের ঘোষণাকারী। তিনি অন্যায়ের সৈন্যকে পর্যুদস্তকারী এবং বিভ্রান্তির আক্রমণ ধ্বংসকারী। যেহেতু তুমি রেসালতের মহান দায়িত্বের বোঝা তাঁর স্কন্ধে দিয়েছো সেহেতু তিনি তোমার আদেশের ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থেকে সে দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন। তিনি তোমার ইচ্ছার প্রতি অগ্রসরমান ছিলেন। এতে তাঁর কোন পদক্ষেপে সঙ্কোচন ছিল না এবং তাঁর দৃঢ় সংকল্পে কোন দুর্বলতা ছিল না। তোমার অহি শ্রবণে ও তোমার ওয়াদা সংরক্ষণে তিনি কার্পণ্য করেননি। তোমার আদেশ তিনি ছড়িয়ে দিয়ে অনুসন্ধানকারীদের জন্য আলো জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন এবং যারা অন্ধকারে হাতড়িয়ে চলছিলো তাদেরকে আলোর সন্ধান দিয়েছিলেন।

যে হৃদয়সমূহ ফেতনা-ফ্যাসাদে লিপ্ত ছিল তারা তাঁর মাধ্যমে হেদায়েত প্রাপ্ত হয়েছিল। তিনি সুস্পষ্ট পথের নিদর্শন ও সমুজ্জ্বল নির্দেশাবলী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি তোমার বিশ্বস্ত আমানতদার এবং তোমার জ্ঞান ভান্ডারের খাজেন (খাজাঞ্চি)। শেষ বিচারের দিনে তিনি তোমার সাক্ষী। তিনি তোমার সত্যের দূত এবং মানুষের নিকট তোমার বার্তাবাহক। হে আল্লাহ্, তোমার ছায়াতলে তাঁর জন্য বিশাল স্থান নির্ধারণ কর এবং তোমার অগণনীয় রহমত তাঁকে প্রদান কর।

হে আল্লাহ্, তাঁর নির্মাণকে (মিশন বা আদর্শ) সকল নির্মাণের ওপর উচ্চতা প্রদান করো, তোমার নিকট তাঁর মর্যাদাকে সমুচ্চ করো, তাঁর নূরকে পরিপূর্ণতা প্রদান করো এবং তাঁর আলোকে তুমি উদ্ভাসিত রাখো। তোমার রেসালতের দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে পালনের জন্য তাঁর সাক্ষ্যই গ্রহণ করো এবং তাঁর বক্তব্য পছন্দনীয় করো, কারণ তাঁর বক্তব্য ন্যায়ভিত্তিক ও তাঁর বিচার সুস্পষ্ট। হে আল্লাহ্, আমাদেরকে ও তাঁকে জীবনের আনন্দে, নেয়ামতের বহাল অবস্থায়, আকাঙ্খার পরিতৃপ্তিতে, আনন্দ উপভোগে, জীবন ধারণের আরামে, মনের শান্তিতে ও সম্মানের অনুদানে একত্রে রেখো।

★★★★★

খোৎবা-৭২

মারওয়ান ইবনে হাকাম জামালের যুদ্ধে বন্দী হয়ে হাসান ও হোসাইনকে অনুনয় বিনয় করে অনুরোধ করেছিল তাঁরা যেন আমিরুল মোমেনিনের কাছে তার অনুকূলে সুপারিশ করেন। তাঁদের সুপারিশের কারণেই আমিরুল মোমেনিন মারওয়ানকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন। সুপারিশকালে মহান ভ্রাতৃদ্বয় বলেন, "হে আমিরুল মোমেনিন, সে আপনার বায়াত গ্রহণের ইচ্ছা পোষণ করে।" তখন আমিরুল মোমেনিন বলেনঃ

উসমানের হত্যার পর সে কি আমার বায়াত গ্রহণ করেনি? এখন আর তার বায়াতের কোন প্রয়োজন আমার নেই, কারণ তার হাত হলো ইহুদীর হাত। যদি সে আমার হাত ধরেও বায়াত গ্রহণ করে তবুও সে কিছুক্ষণ পরে

তা ভঙ্গ করবে। সে একদিন ক্ষমতা পাবে তবে ততক্ষণ টিকে থাকবে যতক্ষণ কুকুর নিজের নাক চাটে (স্বল্পক্ষণের জন্য)। সে চারটি ভেড়ার পিতা হবে (যারাও শাসন করবে)। সে এবং তার পুত্রদের দ্বারা জনগণ লাল দিবস (দুঃখ-কষ্ট) পোহাবে[১]।

১। মারওয়ান ইবনে হাকাম উসমানের ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা। তার শরীরের পাতলা গড়ন ও কর্মকান্ডের জন্য তাকে বলা হতো 'খায়ত বাতিল' (অন্যায়ের সূতা)। যখন আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান আমর ইবনে সাঈদকে হত্যা করলো তখন তার ভ্রাতা ইয়াহিয়া বলেছিল ঃ

> *হে খায়ত বাতিলের পুত্র, তুমি আমরকে প্রতারণা করেছো এবং তোমাদের মত লোকেরা প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতার ওপর প্রতিষ্ঠিত।*

মারওয়ানের পিতা হাকাম যদিও মক্কা বিজয়ের পর ইসলাম গ্রহণ করেছিল তবুও তার আচার-আচরণ ও কর্মকাণ্ড রাসুলকে ব্যথাতুর করতো। রাসুল (সঃ) অভিসম্পাত দিয়ে বলেছিলেন, "এ লোকটির বংশধরের হাতে আমার লোকদের অনেক দুঃখ-দুর্দশা ঘটবে।" অবশেষে তার গুপ্ত চক্রান্ত বেড়ে যাওয়ায় রাসুল (সঃ) তাকে মদিনা হতে বহিষ্কার করে দিয়েছিলেন। সে তার পুত্র মারওয়ানকে নিয়ে তায়েফের ওয়াজ উপত্যকায় চলে গিয়েছিল। রাসুলের (সঃ) জীবদ্দশায় তাকে আর মদিনায় প্রবেশ করতে দেয়া হয় নি। আবু বকর ও উমর একইভাবে তাকে মদিনায় আসতে দেয়নি কিন্তু উসমান খলিফা হয়েই তাদের উভয়কে ডেকে নিয়ে এসেছিল এবং মারওয়ানকে এত উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত করেছিল যে, খেলাফতের লাগাম মারওয়ানের হাতে চলে গিয়েছিল। এরপর অবস্থা তার অনুকূলে এমনভাবে গিয়েছিল যে, মুয়াবিয়া ইবনে ইয়াজিদের পর সে মুসলিম জাহানের খলিফা হয়েছিল। কিন্তু চার মাস দশ দিন (মতান্তরে নয় মাস আঠার দিন) সে খলিফা ছিল। তার স্ত্রী তার মুখে বালিশ চেপে ধরে তাকে হত্যা করেছিল।

যে চার পুত্রের কথা আমিরুল মোমেনিন বলেছিলেন, কারো কারো মতে তারা হলো আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ানের চার পুত্র যথা - ওয়ালিদ, সুলায়মান, ইয়াজিদ ও হিশাম—এরা একের পর এক খলিফা হয়েছিল এবং কলঙ্কিত ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলো। আবার কারো কারো মতে ঐ চার ভেড়া হলো মারওয়ানের চার পুত্র যথা- খলিফা আবদুল মালিক, মিশরের গভর্ণর আবদুল আজিজ, ইরাকের গভর্ণর বিশর ও জাজিরাহ্‌র গভর্ণর মুহাম্মদ।

★★★★★

খোৎবা-৭৩

যখন পরামর্শক কমিটি (শূরা) উসমানের হাতে বায়াত গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তখন আমিরুল মোমেনিন বলেন ঃ

নিশ্চয়ই তোমরা জেনেছো যে, খেলাফতের জন্য অন্য সকলের চেয়ে আমার অধিকার বেশী। আল্লাহ্‌র কসম, যতদিন পর্যন্ত মুসলিমদের বিষয়াষয় সঠিকভাবে চলবে এবং আমি ব্যতীত অন্যদের ওপর কোন অত্যাচার-নিপীড়ন থাকবে না ততদিন আমি আল্লাহ্‌র কাছে পুরস্কার প্রার্থী হয়ে নিশ্চুপ থাকবো এবং খেলাফতের সকল আকর্ষণ ও প্রলোভন হতে নিজকে সরিয়ে রাখবো যা তোমরা আকুলভাবে বাসনা কর।

★★★★★

খোৎবা-৭৪

আমিরুল মোমেনিন যখন জানতে পারলেন যে, উসমানের হত্যার জন্য উমাইয়াগণ তাঁকে দায়ী করছে তখন তিনি বলেনঃ

উমাইয়াগণ আমাকে ভালভাবেই জানে। তবুও তারা আমাকে দোষারোপ করা হতে নিবৃত্ত থাকেনি। সকলের আগে ইসলামে প্রবেশ করা সত্ত্বেও এসব অজ্ঞ লোক আমাকে দোষারোপ করা হতে বিরত থাকতে পারেনি। আল্লাহ্‌র সতর্কবাণী আমার কথার চেয়ে অনেক সুন্দরভাবে বর্ণিত আছে। আমি তাদের প্রতিদ্বন্দ্বি যারা ইমান পরিত্যাগ করে এবং তাদের বিরোধী যারা সংশয়কে সাদরে গ্রহণ করে। অনিশ্চিত বিষয়সমূহ সুস্পষ্ট ব্যাখ্যার জন্য আল্লাহ্‌র কুরআনের সামনে উপস্থাপন করার দরকার। নিশ্চয়ই, মানুষ সে অনুযায়ী বিনিময় পাবে যা তার হৃদয়ে আছে।

★★★★★

খোৎবা-৭৫

ধর্মের শিক্ষা ও উপদেশ সম্পর্কে

তার ওপর আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হোক, যে জ্ঞানের বিষয় শ্রবণ করে এবং তা মান্য করে। যখন তাকে ন্যায় পথের দিকে আমন্ত্রণ জানানো হয় তখন সেদিকে সে অগ্রসর হয়। সে একজন হাদীর কটিবন্ধ ধরে তাকে অনুসরণ করে এবং মুক্তির পথ খুঁজে পায়। সে সর্বদা আল্লাহ্‌কে তার চোখের সামনে রাখে এবং পাপকে ভয় করে। সে আন্তরিকতা ও পরহেজগারীর সাথে আমল করে এবং স্বর্গীয় ঐশ্বর্যের পুরস্কার অর্জন করে। পাপকে সে এড়িয়ে চলে, কল্যাণকর বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য স্থির করে এবং তদানুযায়ী বিনিময় পায়। সে তার আকাঙ্খার মোকাবেলা করে, কামনা প্রদমিত করে। ছবরকে মুক্তির উপায় মনে করে এবং তাকওয়াকে মৃত্যুর জন্য রসদ মনে করে। সে সম্মানের পথে এগিয়ে চলে এবং সত্যের সড়কে চলাফেরা করে। সে সময়ের সদ্ব্যবহার করে, পথ অতিক্রম করার জন্য তাড়াহুড়া করে এবং আমলে সালেহারূপ রসদ সঙ্গে নিয়ে যায়।

★★★★★

খোৎবা-৭৬

উমাইয়াদের সম্পর্কে

বনি উমাইয়া আমাকে একটু একটু করে মুহাম্মদের উত্তরাধিকার দিচ্ছে যেমন করে একটি উষ্ট্রিকে একটু দোহন করে উহার শাবককে দুধ পান করতে দেয়া হয় যেন দোহনের জন্য উহা প্রস্তুত হয়। আল্লাহ্‌র কসম, যদি আমি বেঁচে থাকি তবে তাদেরকে এমনভাবে প্রত্যাখ্যান করবো যেমন করে কসাই বালি লাগা মাংশের টুকরা হতে বালি ঝেড়ে ফেলে।

★★★★★

খোৎবা-৭৭

আমিরুল মোমেনিনের সানুনয় প্রার্থনা

হে আমার আল্লাহ্! আমি আমাকে যতটা জানি তুমি তার চেয়ে বেশি জানো। যদি আমি নিজের অজ্ঞাতে কোন অপরাধ করে থাকি তবে আমায় ক্ষমা করো। যদি আমি পাপের দিকে যাই তাহলে তুমি ক্ষমার দিকে যেয়ো। হে আমার আল্লাহ্ আমি নিজের কাছে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তা যদি তুমি অপরিপূর্ণ দেখ সেজন্য আমাকে ক্ষমা করো। আমার আল্লাহ্, আমি আমার জিহ্বা দ্বারা তোমার নৈকট্য যাচ্‌না করেছি কিন্তু আমার হৃদয় তাতে বাধা দিয়েছে এবং সে মত কাজ করেনি; সেজন্য আমাকে ক্ষমা করো। আমার আল্লাহ্ চোখের খেয়ানত, কথার অসৌজন্যতা, হৃদয়ের আকাঙ্খা ও বক্তব্যের ভুলের জন্য আমাকে ক্ষমা করো।

★★★★★

খোৎবা-৭৮

খারিজীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য যাত্রাকালে কেউ একজন আমিরুল মোমেনিনকে বললো," এ মূহুর্তে যাত্রা করলে, জ্যোতিষশাস্ত্র মতে, আমার ভয় হয়, আপনি লক্ষ্য অর্জনে কৃতকার্য হতে পারবেন না।" তখন আমিরুল মোমেনিন বলেন ঃ

তুমি কি মনে কর, তুমি বলে দিতে পার মানুষ কোন্ সময় বের হলে অশুভ তাকে স্পর্শ করতে পারবে না অথবা কোন্ সময় বের হলে সে ক্ষতিগ্রস্থ হবে সে বিষয়ে তুমি সতর্ক করে দিতে পার? যে কেউ জ্যোতিষশাস্ত্র বিশ্বাস করে সে কুরআনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং নিজের অভিষ্ট অর্জনে ও অবাঞ্ছিত বিষয় প্রতিহতকরণে আল্লাহ্‌র প্রতি অমনোযোগী হয়ে পড়ে। তোমার এসব কথার মাধ্যমে তুমি আশা পোষণ কর যে, যারা তোমার কথামত কাজ করে তারা যেন আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তোমার প্রশংসা করে, কারণ তোমার ভুল ধারণা অনুযায়ী তুমি তাদেরকে লাভবান হওয়া অথবা ক্ষতি এড়ানোর মূহুর্ত বলে দিয়ে পরিচালিত করেছো।

তৎপর আমিরুল মোমেনিন জনগণের দিকে এগিয়ে গিয়ে বলেন ঃ

হে জনমন্ডলী! শুধু স্থলভাগে ও সমুদ্রে দিক নির্ণয় ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে তারকাবিদ্যা শিক্ষা করা সম্পর্কে তোমরা হুশিয়ার থেকো। কারণ এটা মানুষকে অনুমানের দিকে ঠেলে দেয় এবং জ্যোতিষী একজন অনুমানকারী ছাড়া কিছুই নয়। এহেন অনুমানকারী যাদুকরের মত, যাদুকর কাফেরের মত এবং কাফের দোযখবাসী। কাজেই আল্লাহ্‌র নামে এগিয়ে যাও।

১। খারিজীদের উত্থান দমনের জন্য নাহ্‌রাওয়ান যাত্রাকালে আফিফ ইবনে কায়েস আল-কিন্দি আমিরুল মোমেনিনকে বললো, "এ ক্ষণটা ভাল নয়। এ সময়ে আপনি যাত্রা করলে পরাজিত হবেন।" কিন্তু আমিরুল মোমেনিন তার কথায় কর্ণপাত না করে তখনই বেরিয়ে পড়লেন। সে যুদ্ধে খারিজীদের শোচনীয় পরাজয় হয়েছিল। তাদের নয় হাজার সৈন্যের মধ্যে নয় জন পলাতক ব্যতীত সকলেই নিহত হয়েছিল।

এ খোৎবায় আমিরুল মোমেনিন জ্যোতিষশাস্ত্র মিথ্যা প্রমাণ করে তিনটি যুক্তি দেখিয়েছেন ঃ প্রথমতঃ জ্যোতিষীদের অভিমত সঠিক বলে গ্রহণ করলে কুরআনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়। কারণ কুরআন বলে

বল, আল্লাহ্ ব্যতীত আকাশ ও পৃথিবীতে অদৃশ্য বিষয়ে কেউ কিছু জ্ঞাত নহে (২৭ : ৬৫)।

দ্বিতীয়তঃ জ্যোতিষী তার ভুল ধারণার প্রভাবে বিশ্বাস করে যে, ভবিষ্যৎ জানার মাধ্যমে সে তার লাভ বা ক্ষতির বিষয় জানতে পারে। সে ক্ষেত্রে সে আল্লাহ্ ও তাঁর সাহায্য প্রার্থনার প্রতি উদাসীন হয়ে পড়ে। এরূপ ঔদাসীন্যতা ইমানের পথ পরিত্যাগ করা ও নাস্তিকতার সামিল যা আল্লাহ্‌র প্রতি আশা পোষণের মানসিকতা বিনষ্ট করে দেয়। তৃতীয়তঃ কোনক্রমে যদি তার কথা সঠিক হয়ে যায় তবে সে মনে করে এটা জ্যোতিষশাস্ত্র জানার ফলে হয়েছে। ফলতঃ সে আল্লাহ্‌র প্রসংশা করার পরিবর্তে আত্মপ্রসাদ লাভ করে এবং এহেন অনুমান ভিত্তিক কাজে দৈবক্রমে কেউ লাভবান হলে সে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে জ্যোতিষীর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

★★★★★

খোৎবা-৭৯

জামালের[১] যুদ্ধের পর নারীর দৈহিক ক্রটি সম্পর্কে আমিরুল মোমেনিন বলেন ঃ

হে জনমন্ডলী! ইমানে, উত্তরাধিকারে ও আকলে (বুদ্ধিমত্তায়) নারীর কমতি রয়েছে। ইমানে কমতি এ জন্য যে, ঋতুস্রাবে তারা সালাত ও সিয়াম হতে বিরত থাকে। আকলে কমতি এ জন্য যে, দু'জন নারীর সাক্ষ্য একজন পুরুষের সাক্ষ্যের সমতুল্য। উত্তরাধিকারে কমতি হলো নারী পুরুষের অর্ধেক অংশ পায়। সুতরাং তাদের অশুভ হাতছানি হতে সতর্ক থেকো; এমন কি তাদের মধ্যে যারা ভাল, তাদের থেকেও নিজেকে রক্ষা করে চলো। কোন ভাল কাজেও তাদের মেনে চলো না, তাহলে তারা তোমাকে অশুভের দিকে আকর্ষণ করতে পারবে না।

১। জামালের যুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞের পর আমিরুল মোমেনিন এ খোৎবা প্রদান করেন। একজন নারীর (আয়শা) আদেশ অন্ধভাবে অনুসরণ করার ফলে জামালের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। সে জন্য এ খোৎবায় নারীর দৈহিক ক্রটি ও এর ফলাফল বর্ণিত হয়েছে। নারীকে প্রতিমাসেই ক'দিন সালাত ও সিয়াম থেকে বিরত থাকতে হয় যা ইমানের কমতি প্রমাণ করে। যদিও ইমানের প্রকৃত অর্থ হলো হৃদয় নিংড়ানো সাক্ষ্য ও দৃঢ়-প্রত্যয় তবুও রূপকভাবে ইমান আমল ও আখলাককে বুঝায়। কারণ আলম ইমানের বহিঃপ্রকাশ। ইমাম আলী ইবনে মুসা আর-রেজা বলেছেন ঃ

ইমান হচ্ছে হৃদয়ের দৃঢ় প্রত্যয় ও সাক্ষ্য, মৌখিক স্বীকৃতি ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কর্ম।

দ্বিতীয় ক্রটি হচ্ছে প্রাকৃতিকভাবেই নারী আকলের পরিপূর্ণ প্রয়োগ করতে পারে না। সেজন্য প্রকৃতি তাদের কাজের সাথে সামঞ্জস্য রেখেই আকল প্রদান করেছেন যা তাদেরকে গর্ভধারণ, সন্তান প্রসব, সন্তান লালন-পালন ও গৃহস্থালী কাজের পথে পরিচালিত করেছে। আকলের কমতি থাকার ফলেই কুরআন বলে ঃ

অতঃপর তোমাদের পুরুষদের মধ্য হতে দু'জন সাক্ষী ডাক এবং যদি দু'জন পুরুষ সাক্ষী না পাও তবে একজন পুরুষ ও দু'জন নারীর সাক্ষ্য গ্রহণ কর, যাতে একজন নারী কিছু ভুলে গেলে অন্যজন তাকে মনে করিয়ে দিতে পারে (কুরআন, ২ ঃ ২৮২)।

তৃতীয় দুর্বলতা হলো উত্তরাধিকারে নারী পুরুষের অর্ধেক। কুরআন বলে ঃ

আল্লাহ্ নির্দেশ দিচ্ছেন তোমাদের সন্তান-সন্ততি সম্পর্কে। পুরুষ সন্তান দু'জন নারী সন্তানের সমান অংশ পাবে (কুরআন; ৪ঃ১১)।

নারীর প্রাকৃতিক দুর্বলতা বর্ণনার পর আমিরুল মোমেনিন তাদেরকে অন্ধভাবে অনুসরণ ও ভ্রান্তভাবে মান্য করার অকল্যাণ বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করেন। তিনি বলেন যে, শুধু অশুভ বিষয় নয়, কোন ভাল বিষয়ও এমনভাবে করা উচিত যেন তারা বুঝতে না পারে যে এটা তাদের ইচ্ছানুযায়ী করা হয়েছে; তারা যেন অনুধাবন করে যে, কাজটি ভাল

বলেই করা হয়েছে, এতে তাদের সন্তোষ বা ইচ্ছার করণীয় কিছু নেই। যদি তারা বুঝতে পারে যে, তাদের সন্তুষ্টির কারণে কাজটা করা হয়েছে তা হলে ধীরে ধীরে তাদের দাবী বৃদ্ধি পেতে থাকবে এবং সকল বিষয় তাদের ইচ্ছানুযায়ী সম্পাদনের জন্য চাপ প্রয়োগ করতে থাকবে যার অবধারিত ফল হবে ধ্বংস। এ বিষয়ে শায়খ মুহাম্মদ আবদুহ্[৭] লিখেছেন ঃ

আমিরুল মোমেনিনের এ অভিমত শতাব্দীর অভিজ্ঞতা দ্বারা স্বীকৃত।

★★★★★

খোৎবা-৮০

সংযম সম্পর্কে

হে লোকসকল! সংযম হলো কামনা-বাসনাকে কমিয়ে ফেলা, আল্লাহ্‌র নেয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং যা নিষিদ্ধ করা হয়েছে উহা হতে দূরে থাকা। আল্লাহ্‌র নেয়ামত প্রাপ্তিতে শুকরিয়া জ্ঞাপন করতে তোমরা ভুলে যেয়োনা। এটা সম্ভব হলে নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ তোমাদের ধৈর্যকে পরাভূত করতে পারবে না। আল্লাহ্ তোমাদের জন্য স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল প্রমাণাদি দিয়ে এবং সমুজ্জ্বল কিতাব খোলা রেখে তোমাদের ওজরখাহি করার কোন সুযোগ রাখেননি।

★★★★★

খোৎবা-৮১

দুনিয়া ও এর মানুষ সম্পর্কে

কিভাবে আমি এ দুনিয়ার বর্ণনা দেব যার প্রারম্ভ দুঃখ-দুর্দশায় এবং পরিসমাপ্তি ধ্বংসে[১]? এখানে সম্পাদিত হালাল কাজের জন্য জবাবদিহিতা রয়েছে এবং নিষিদ্ধ কাজের জন্য শাস্তি রয়েছে। এখানে যে ধনবান তাকে ফেতনা-ফ্যাসাদ মোকাবেলা করতে হয় আর যে দরিদ্র সে দুঃখ-দুর্দশায় নিপতিত। যে ব্যক্তি দুনিয়ার প্রতি লালায়িত হয় সে উহা পায় না। আবার যে ব্যক্তি দুনিয়া হতে দূরে সরে থাকে তার দিকে দুনিয়া এগিয়ে যায়। যদি কেউ দুনিয়ার মধ্য দিয়ে দেখতে চায় তবে দুনিয়া তাকে দৃষ্টিদান করে। কিন্তু কারো চোখ যদি স্থিরভাবে দুনিয়ার ওপর থাকে তবে দুনিয়া তাকে অন্ধ করে দেয় (অর্থাৎ গোমরাহ্ বা পথভ্রষ্ট করে দেয়)।

১। "এ দুনিয়ার প্রারম্ভ দুঃখ-দুর্দশায় আর সমাপ্তি ধ্বংসে"- আমিরুল মোমেনিনের এ কথাটি কুরআন সমর্থিত ঃ

প্রকৃত পক্ষে আমরা দুঃখ-দুর্দশার মধ্যেই মানুষকে সৃষ্টি করেছি (৯০ : ৪)।

এ কথা সত্য যে, মায়ের সংকীর্ণ জরায়ু হতে বিশাল মহাশূন্য পর্যন্ত মানব জীবনের পরিবর্তনের পরিসমাপ্তি ঘটে না। জীবনের প্রথম স্পন্দনে মানুষ নিজকে এমন একটা সংকীর্ণ অন্ধকারাচ্ছন্ন বন্দিখানায় দেখতে পায় যেখানে সে না পারে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নাড়াতে, না পারে পাশ পরিবর্তন করতে। এ বন্দিখানা থেকে মুক্তি লাভ করে পৃথিবীতে পদার্পণ করেই সে অগণিত দুঃখ-কষ্টে নিপতিত হয়। শুরুতেই সে কথা বলতে পারে না, ফলে নিজের দুঃখ-বেদনা-ব্যথা কিছুই প্রকাশ করতে পারে না এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালন করে নিজের প্রয়োজন সারতে পারে না। শুধু তার ফোঁফানো কান্না আর গড়িয়ে পড়া অশ্রুজল তার প্রয়োজন ও দুঃখ-বেদনা প্রকাশ করে। এ অবস্থা অতিক্রম করে শেখার স্তরে পদার্পণ করলেই শাসন আর নির্দেশ তাকে ভীত সন্ত্রস্ত রাখে। এ অবস্থা হতে অব্যাহতি পেতে না পেতেই পারিবারিক ও জীবিকার দুশ্চিন্তা তাকে ঘিরে ধরে। তখন

কখনো পেশার সহচরদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব, কখনো শত্রুর সাথে সংঘর্ষ, কখনো ভাগ্যের উত্থান-পতন, কখনো রোগের আক্রমণ, কখনো সন্তানের শোক, কখনো বার্ধক্যের জরা— এভাবে পৃথিবীকে বিদায় জানানো পর্যন্ত দুঃখ-দুর্দশায় থাকতে হয়।

তৎপর আমিরুল মোমেনিন বলেন যে, এ পৃথিবীতে হালাল কাজের জবাবদিহিতা ও হারাম কাজের জন্য শাস্তি রয়েছে। ফলে আনন্দ-উপভোগও তার কাছে তিক্ত হয়ে পড়ে। অর্থ-সম্পদের প্রাচুর্য মানুষকে এমনভাবে উদ্বিগ্ন করে তোলে যে তার মানসিক শান্তি বিনষ্ট হয়ে পড়ে; আবার দারিদ্র-পীড়িত হলে সে সম্পদের জন্য হা-হুতাশ করে। দুনিয়ার প্রতি লালায়িত ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষার কোন শেষ নেই; একটা পূরণ হতে না হতেই অন্যটি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। এ দুনিয়া প্রতিবিম্বের মত— এর পেছনে যতই দৌড়াবে উহা ততই এগিয়ে যাবে; আবার উহাকে ত্যাগ করে যতই পিছু হটবে, উহাও তোমাকে অনুসরণ করে তোমার পিছু নেবে। অর্থাৎ যদি কোন ব্যক্তি লোভ-লালসার দৃঢ়মুষ্টি হতে নিজকে মুক্ত করে দুনিয়ার পিছু নেয়া থেকে নিজকে বিরত রাখে তবুও সে দুনিয়া হতে বঞ্চিত হয় না। সুতরাং যে ব্যক্তি দুনিয়াকে ভাসাভাসাভাবে দেখে, এর ঘটনা প্রবাহ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে এবং এর বহুরূপী পরিবর্তন হতে আল্লাহ্‌র শক্তি, জ্ঞান, বিচার শক্তি, করুণা, ক্ষমা এবং সংরক্ষণ ক্ষমতা সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করতে পারে সে ব্যক্তি প্রকৃত চক্ষুষ্মান হয়। অপরপক্ষে যে ব্যক্তি দুনিয়ার চাকচিক্যে ও রং -ঢং-এ নিজকে হারিয়ে ফেলে সে দুনিয়ার অন্ধকারে নিপতিত হয়। আল্লাহ্ বলেন :

তোমার চোখ কখনো প্রসারিত করো না উহার প্রতি যা আমরা তাদের বিভিন্ন শ্রেণীকে পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য স্বরূপ উপভোগের উপকরণ হিসাবে দিয়েছি, উহা দ্বারা তাদের পরীক্ষা করার জন্য। তোমার প্রতিপালকের জীবিকা উৎকৃষ্ট ও অধিক স্থায়ী (কুরআন - ২০:১৩১)।

★★★★★

খোৎবা-৮২

খোৎবাতুল ঘার্‌রা (ব্রিলিয়্যান্ট ভাষণ)

প্রতিষ্ঠিত প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি সকল কিছু হতে সুউচ্চ-মহান এবং তাঁর নেয়ামতের মাধ্যমে সৃষ্টির অতি নিকটবর্তী। তিনিই সকল পুরস্কার ও সম্মান দাতা এবং সকল দুর্যোগ ও দুঃখ-কষ্ট মোচনকারী। তাঁর লাগাতার রহমত ও প্রাচুর্যপূর্ণ নেয়ামতের জন্য আমি তাঁর প্রশংসা করি।

আমি তাঁর প্রতি ইমান আনি যেহেতু তিনিই আদি এবং তিনিই একমাত্র সত্য। আমি তাঁর কাছে হেদায়েত যাচ্না করি যেহেতু তিনিই নিকটতম এবং তিনিই সৎপথ প্রদর্শক। আমি তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করি যেহেতু তিনিই সর্বশক্তিমান এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ পরাভূতকারী। আমি তাঁর ওপর নির্ভর করি যেহেতু তিনিই অভাব মোচনকারী এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ পরিপোষক। এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর বান্দা ও রাসুল। তিনি তাঁকে পাঠিয়েছিলেন তাঁর আদেশ পৃথিবীতে জারী করার জন্য ও ওজর খতম করার জন্য এবং অনন্ত শাস্তি সম্পর্কে সতর্কাদেশ প্রদান করার জন্য।

তাকওয়ার আদেশ

হে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ, আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি আল্লাহ্‌কে ভয় করার জন্য যিনি উপমা উপস্থাপন করেছেন এবং তোমাদের জীবনকে যিনি নির্ধারিত সময়ের গন্ডিতে বেঁধে দিয়েছেন। তিনি তোমাদেরকে পোষাকের আবরণ দিয়েছেন এবং তিনি তোমাদের জন্য জীবিকা ছড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি তোমাদেরকে তাঁর জ্ঞান দ্বারা ঘিরে রেখেছেন। তাঁর কাছে নির্ধারিত পুরস্কার রয়েছে। তিনি তোমাদেরকে বিস্তৃত রহমত ও অগণন নেয়ামত দান করেছেন, সুদূর প্রসারি প্রমাণাদি দ্বারা তিনি তোমাদেরকে সতর্ক করেছেন এবং তিনি সংখ্যা দ্বারা তোমাদেরকে গণনা করেছেন। এ পরীক্ষাস্থলে ও শিক্ষণ ঘরে তিনি তোমাদের বয়স নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

দুনিয়া সম্পর্কে সতর্কাদেশ

তোমরা এ দুনিয়াতে পরীক্ষার সম্মুখীন এবং দুনিয়া সম্বন্ধে তোমাদেরকে হিসাব-নিকাশ দিতে হবে। নিশ্চয়ই, এ দুনিয়া দূষিত-ময়লাযুক্ত পানির স্থল এবং কর্দমযুক্ত পানীয় পানির উৎস। এর বহির্ভাগ হৃদয়-কাড়া আকর্ষণীয় এবং অভ্যন্তরভাগ ধ্বংসাত্মক। এটা ছলনাময়ী প্রবঞ্চনা, ক্ষণস্থায়ী প্রতিবিম্ব এবং বাঁকা স্তম্ভ। দুনিয়ার অবজ্ঞাকারী যখন একে পছন্দ করতে শুরু করে এবং যে এর সাথে পরিচিত নয় সে যখন এতে সন্তোষ অনুভব করে তখন দুনিয়া তাকে ফাঁদে আবদ্ধ করে, তাকে এর তীরের লক্ষ্যস্থল করে নেয় এবং তার ঘাড়ে মৃত্যু-দড়ি বেঁধে তাকে সংকীর্ণ কবর ও ভীতিকর বাসস্থানে নিয়ে যায় এবং এভাবে তার কাজের বিনিময় প্রদান করে। এ অবস্থা বংশ পরম্পরায় চলতে থাকে। না মৃত্যু থেমে থাকে তাদের বিচ্ছিন্ন করা হতে, আর না জীবতরা বিরত থাকে পাপে লিপ্ত হওয়া থেকে।

মৃত্যু ও কেয়ামত

তারা একে অপরের সমকক্ষ হতে চেষ্টা করছে এবং দল বেঁধে চূড়ান্ত লক্ষ্য ও মৃত্যুর মিলনস্থলের দিকে এগিয়ে চলছে যে পর্যন্ত না সকল বিষয়ের পরিসমাপ্তি ঘটে, দুনিয়া মরে যায় এবং কেয়ামত নিকটবর্তী হয়। আল্লাহ্ তাদেরকে কবরের কোণ হতে, পাখীর বাসা হতে, পশুর গর্ত হতে এবং মৃত্যুর স্থল হতে বের করে আনবেন। তারা তাঁর আদেশের দিকে দ্রুত এগিয়ে যায় এবং দলের পর দল নিশ্চুপ হয়ে সারিবদ্ধভাবে দন্ডায়মান অবস্থায় তাদের জন্য নির্ধারিত চূড়ান্ত গন্তব্য স্থানের দিকে দৌড়ে যায়। তারা আল্লাহ্র দৃষ্টিসীমার মধ্যে থাকবে এবং যারা তাদেরকে ডাকবে তাদের সকলের ডাক শুনবে। তারা অসহায়ত্বের পোশাক পরবে এবং অমর্যাদা ও হীনাবস্থা তাদের ঢেকে রাখবে। এ সময় সকল তদবির শেষ হয়ে যাবে, সকল আকাঙ্খা তিরোহিত হয়ে যাবে, সকল চিত্ত শান্তভাবে ডুবে থাকবে, গলার স্বর নুয়ে পড়বে, ঘর্ম মুখ পর্যন্ত এসে যাবে, ভীতি বৃদ্ধি পাবে এবং শেষ বিচারের জন্য ও কর্মের বিনিময়ে পুরস্কার অথবা শাস্তির জন্য ঘোষকের বজ্রসম স্বরে কানে তালা লেগে যাবে।

জীবনের সীমাবদ্ধতা

আল্লাহ্ তাঁর ক্ষমতার প্রমাণ হিসাবে মানুষ সৃষ্টি করেছেন, কর্তৃত্ব সহকারে তাদের লালন-পালন করেছেন, তীব্র অনুশোচনায় তাদের মৃত্যুর ব্যবস্থা করেছেন এবং তাদেরকে কবরে রাখার ব্যবস্থা করেছেন যেখানে তারা শুকনো খাবারের ছোট্ট টুকরার মত হয়ে যায়। তৎপর তাদেরকে একজন একজন করে জীবন ফিরিয়ে দেয়া হবে, তাদের (কর্মের) বিনিময় দেয়া হবে এবং প্রত্যেকের আমলের হিসাব নিয়ে পৃথক পৃথক করে দেয়া হবে। তাদেরকে মুক্তিপথ অনুসন্ধানের সময় দেয়া হয়েছিল, সত্য পথ দেখানো হয়েছিল এবং বেঁচে থাকার ও নেয়ামত অনুসন্ধান করার হায়াত (সময়) দেয়া হয়েছিল। তাদের জন্য সংশয়ের অন্ধকার দূরীভূত করা হয়েছিল। এবং জীবৎকালে প্রশিক্ষণের জন্য মুক্তভাবে ছেড়ে দেয়া হয়েছিল যাতে তারা বিচারের দিনের দৌড় প্রতিযোগিতার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে, যাতে সুচিন্তিতভাবে উদ্দেশ্য স্থির করে অনুসন্ধান করতে পারে, যাতে সুফল সংগ্রহের প্রয়োজনীয় সময় পায় ও পরবর্তী বাসস্থানের জন্য রসদ সংগ্রহ করতে পারে।

তাকওয়া ব্যতীত সুখ নেই

এসব উপমা ও কার্যকর মৃদু ভর্ৎসনা কতই না উপযোগী হতো যদি তা পবিত্র হৃদয়, খোলা কান, দৃঢ় দৃষ্টিভঙ্গী ও তীক্ষ্ম বুদ্ধিমত্তা দ্বারা গৃহীত হতো। সেই ব্যক্তির মত আল্লাহ্কে ভয় কর যে সদোপদেশ শুনলে মাথা নত করে, পাপ করলে স্বীকার করে, ভয় অনুভব কিরলে পরহেজগারী করে, বুঝতে পারলে সৎ আমলের দিকে দ্রুত এগিয়ে

যায়, বিশ্বাস করলে মুত্তাকী হয়, শিক্ষাগ্রহণ (দুনিয়া হতে) করতে বললে শিক্ষা গ্রহণ করে, মন্দ কাজ না করতে বললে তা হতে দূরে সরে থাকে, (কোন বিষয়ে) ধমক দিলে (তা হতে) বিরত থাকে, (আল্লাহ্‌র) ডাকে সাড়া দিলে (তাঁর প্রতি) ঝুঁকে পড়ে, পুনরায় মন্দ কাজ করলে তওবা করে, অনুসরণ করলে পুরোপুরিভাবে অনুকরণ করে এবং (ন্যায় ও সত্য পথ) দেখানো হলে তা দেখে।

এ ধরনের লোক সত্যের সন্ধানে ব্যস্ত থাকে এবং (জাগতিক মন্দ হতে) দৌড়ে পালিয়ে রক্ষা পায়। এরা নিজের জন্য রসদ (সৎ আমল) সংগ্রহ করে, নিজেদের বাতেনকে পবিত্র করে, পরকালের জন্য নির্মাণ করে এবং তাদের ভ্রমণ, অবস্থান ও প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে যাত্রা পথের রসদ সংগ্রহ করে। এরা (পরকালের) আবাস স্থলের জন্য পূর্বেই প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রেরণ করে। হে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ, তিনি কেন তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তার কারণ চিন্তা করে আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং তাঁকে ততটুকু ভয় কর যতটুক (ভয় করতে) তিনি তোমাদের বলেছেন। তাঁর প্রতিশ্রুতির সত্যতার প্রতি আস্থা রেখে ও বিচার দিবসের ভয় পোষণ করে নিজেদেরকে তাঁর প্রতিশ্রুতি পাওয়ার যোগ্য করে গড়ে তোল।

আল্লাহ্‌র নেয়ামত সম্পর্কে

তিনি তোমাদের জন্য কান তৈরী করে দিয়েছেন যাতে তোমরা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ধারণ করে রাখতে পার এবং অন্ধত্বের স্থলে দৃষ্টি দানের জন্য চক্ষু তৈরী করেছেন। তিনি ছোট ছোট অংশের সমাহার করে তোমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ তৈরী করেছেন। এসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বক্রতা নির্মাণশৈলির আকর এবং বয়সের সাথে সুসমন্বিত। এবং দেহ এদেরকে ধারণ করে রেখেছে ও হৃদপিন্ড এদের খাদ্য যোগান দিতে সর্বদা ব্যস্ত থাকে। অন্যান্য বড় বড় নেয়ামত ছাড়াও তিনি তোমাদের দেহে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা তৈরী করেছেন। তিনি তোমাদের বয়স নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তিনি তোমাদের শিক্ষার জন্য অতীত জনগণের ধ্বংসাবশেষ সংরক্ষণ করেছেন। সে সব লোক তাদের হিস্যা পূর্ণ উপভোগ করেছিল এবং তারা সম্পূর্ণ বাধা-বিঘ্নহীন ছিল। মৃত্যু তাদেরকে পরাভূত করেছিল এবং তাদের কামনা-বাসনা পূর্ণ হওয়ার আগেই মৃত্যুর হস্ত তাদেরকে আলাদা করে দিয়েছিল। শরীর সুস্থ থাকাকালে তারা নিজেদের রসদ সংগ্রহ করেনি এবং যৌবনের দ্বিধাগ্রস্থ অবস্থায় তারা শিক্ষা গ্রহণ করেনি।

এসব লোক কি তাদের যৌবনে পিঠ-নুজ বৃদ্ধ বয়সের জন্য অপেক্ষা করেছে? তারা কি সুস্বাস্থ্যের সময় রোগ-ক্লিষ্ট অবস্থার জন্য অপেক্ষা করেছে? তারা কি জীবৎকালে মৃত্যু-মূহুর্তের দিকে ফিরে তাকিয়ে দেখেছে? যখন প্রস্থানের সময় নিকটবর্তী হয়ে গেল, তীব্র শোক-দুঃখ-বেদনা-ভোগান্তি ও মুখের লালা শুকানো শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় যাত্রাকাল হাতের কাছে এলো, বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয় স্বজনের সাহায্য চাওয়ার সময় হলো এবং (যন্ত্রণায়) বিছানায় এপাশ ওপাশ করতে লাগলো তখন কি নিকটজন মৃত্যুকে প্রতিহত করতে পেরেছিল? তখন কি শোক প্রকাশকারিনী মহিলারা তাদের কোন কল্যাণ করতে পেরেছিল? বরং তারা তাদেরকে সংকীর্ণ কবরে আটকে রেখে কবরস্থানের একাকীত্বে পরিত্যাগ করেছে।

সেখানে বিষাক্ত প্রাণী তাদের চামড়া ছিন্ন-ভিন্ন করে ফেলেছে এবং দুঃখ-দুর্দশায় তাদের সজীবতা বিনষ্ট হয়ে গেছে। ঝড় তাদের আলামত (হদিস) বিলুপ্ত করে দিয়েছে এবং দুর্যোগ তাদের চিহ্ন মুছে ফেলেছে। তাদের সতেজ শরীর ও হাড় পঁচে গলে গেছে। রূহ (আত্মা) সমূহ পাপের বোঝা বয়ে চলেছে এবং গায়েব সম্পর্কে তাদের একীন হয়েছে। কিন্তু এখন আর কোন নেক আমল যোগ করা অথবা তওবা দ্বারা কোন বদ আমল স্খালন করার সুযোগ নেই। তোমরা কি এসব মৃত লোকদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা ও আত্মীয়-স্বজন নও? তোমরা কি তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে না? তোমরা কি তাদের পথে যাবে না? কিন্তু তোমাদের হৃদয়ে এখনো সাড়া জাগেনি। এখনো তোমরা হেদায়েত হতে মুখ ফিরিয়ে রেখেছো এবং ভুল পথে চলছো। তোমরা এমনভাবে চলছো মনে হয় যেন এসব কথা তোমাদেরকে বলা হচ্ছে না—অন্য কাউকে বলা হচ্ছে এবং তোমরা যেন মনে কর সঠিক পথ হচ্ছে দুনিয়ার সম্পদ স্তূপীকৃত করা।

বিচার দিনের প্রস্তুতি সম্পর্কে

এবং জেনে রাখো, তোমাদেরকে সিরাতের পথ অতিক্রম করতে হবে যেখানে পদক্ষেপ হবে কম্পবান, পা ফসকে পড়বে এবং প্রত্যেক পদক্ষেপে বিপদের আশঙ্কা থাকবে। হে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ, সেসব জ্ঞানী লোকের মত আল্লাহ্‌কে ভয় কর যারা পরকালের চিন্তায় অন্য সব বিষয় পরিত্যাগ করেছে, আল্লাহ্‌র ভয় যাদের শরীরকে পীড়া-ক্লিষ্ট করেছে, রাতের এবাদত যাদেরকে বিনিদ্র করেছে, বিনিময়ের আশা যাদেরকে দিবাভাগে পিপাসু রাখে, বর্জন যাদের আকাঙ্খাকে কুঁকড়ে দিয়েছে এবং আল্লাহ্‌র জেকের যাদের জিহ্বাকে সদা সঞ্চরমান করেছে। বিপদের আভাস দেখা দেয়ার আগেই তারা ভয়ে ভীত থাকে। তারা বঙ্কুর পথ এড়িয়ে সুস্পষ্ট পথে চলে। উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য তারা সংক্ষিপ্ত পথ অনুসরণ করে, ধোকা তাদের চিন্তাকে বিকৃত করে না এবং (কোন বিষয়ের) অস্পষ্টতা তাদের চোখকে অন্ধ করে না।

তারা প্রশংসনীয়ভাবে এ পৃথিবীর পথ অতিক্রম করে যায়। তারা নেক আমল নিয়ে পরকালে পৌছায়। তারা (পাপের) ভয়ে (পূণ্যের দিকে) দ্রুত চলে। (জীবনের) স্বল্প সময়ে তারা দ্রুত অগ্রসর হয়। তারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য আত্মনিয়োগ করে এবং পাপ হতে দৌড়ে পালায়। অদ্যই তারা আগামীকালের জন্য মনোযোগী হয় এবং তাদের চিন্তা-চেতনায় ভবিষ্যৎ প্রতিভাত হয়। নিশ্চয়ই, বেহেশ্‌ত প্রকৃষ্ট পুরস্কার এবং দোযখ শাস্তি ও ভোগান্তির স্থল। আল্লাহ্ প্রকৃষ্ট প্রতিশোধ গ্রহণকারী ও সাহায্যকারী এবং কুরআন প্রকৃষ্ট যুক্তি ও (বাতিলের সাথে) সংঘর্ষকারী।

শয়তান সম্পর্কে সতর্কোপদেশ

আমি তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছি আল্লাহ্‌কে ভয় করতে যিনি তাঁর সতর্কবাণী দ্বারা সকল ওজর দূরীভূত করেছেন এবং তাঁর প্রদর্শিত (সত্য) পথের সকল প্রমাণাদি (হেদায়েতের) পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। তিনি তোমাদেরকে সেই শত্রু সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছেন, যে গোপনভাবে হৃদয়ে প্রবেশ করে গোপনে কানের ভেতর কথা বলে এবং বিভ্রান্ত করে ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়। এ শত্রু তোমাদেরকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেয়, ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী করে রাখে, খারাপ ও অন্যায় কাজকে আকর্ষণীয় করে দেখায় এবং জঘন্য পাপকেও সহজ করে দেখায়। যখন তার প্রতারণা ও অঙ্গীকার শেষ হয় তখন সে তার অনুচরদেরকে যা ভাল বলেছিল, যা সহজ বলেছিল ও যা নিরাপদ বলেছিল তাতে দোষ খুঁজে বের করে ভয় দেখাতে শুরু করে।

মানুষ সৃষ্টি সম্পর্কে

চিন্তা করো মানুষের কথা, যাদের আল্লাহ্ বেগে স্খলিত বীর্য হতে অন্ধকার জরায়ুতে সৃষ্টি করেছেন। তৎপর আকার বিহীন জমাট বাঁধা রক্ত, তৎপর ভ্রূণ, তৎপর দুগ্ধপোষ্য শিশু, তৎপর কিশোর এবং তৎপর পূর্ণবয়স্ক যুবকে পরিণত করেছেন। তিনি তাকে স্মৃতিশক্তিসহ হৃদয়, কথা বলার জন্য জিহবা এবং দেখার জন্য চোখ দান করেছেন যাতে সে (চার পাশের যা কিছু আছে তা হতে) শিক্ষা গ্রহণ করে ও বুঝতে পারে এবং (আল্লাহ্‌র) আদেশ পালন করে ও পাপ হতে বিরত থাকে।

যখন সে স্বাভাবিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং তার গঠন উন্নতি লাভ করে তখন সে আত্ম-গর্বে পতিত হয় ও হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে। সে অসংখ্য আকাঙ্খায় জড়িয়ে পড়ে, দুনিয়ার আনন্দের জন্য তার কামনা-বাসনা পূরণে ডুবে যায় এবং তার (হীন প্রবৃত্তিসম্পন্ন) লক্ষ্য অর্জনে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তখন সে কোন পাপকে ভয় করে না এবং কোন

আশঙ্কাতেই ভীত হয় না। সে পাপে আচ্ছন্ন হয়ে মৃত্যুবরণ করে। তার ক্ষণকালীন জীবন সে গোমরাহীতে অতিবাহিত করে। সে কোন পুরস্কার অর্জন করে না এবং কোন দায়িত্বও পরিপূর্ণ করেনা। ভোগ-বিলাসের মধ্যেই জীবনঘাতী পীড়া তাকে হতবুদ্ধি ও পরাভূত করে। সে শোকে-দুঃখে এবং ব্যথা ও পীড়ার যন্ত্রণায় বিনিদ্র রজনী যাপন করে। সহোদর ভাই, স্নেহশীল পিতা, বিলাপরত মায়ের এবং ক্রন্দনরত বোনের উপস্থিতিতে সে পাগল-করা অস্বস্তি, সংজ্ঞাহীনতা, চীৎকার, শ্বাসরুদ্ধকর ব্যথা ও মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতরায়।

তৎপর তাকে কাফন পরিয়ে দেয়া হয় এবং সে সম্পূর্ণ শান্ত ও অন্যের অনুগত হয়ে যায়। তৎপর তাকে কাঠের তক্তায় করে এমন অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হয় যেন সে দারুণভাবে দুর্দশাগ্রস্থ ও পীড়া কবলিত। যুবকেরা ও সাহায্যকারী ভ্রাতাগণ তাকে তার একাকীত্বের ঘরে নিয়ে যায় যেখানে সকল দর্শনার্থীর সাথে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। অতঃপর যারা সঙ্গে গিয়েছিলো ও যারা বিলাপ করেছিলো তারা চলে এলে ভয়ঙ্কর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ও বিপজ্জনক পরীক্ষার জন্য তাকে কবরে বসানো হয়। সে স্থানের বড় দুর্যোগ হচ্ছে গরম পানি ও দোযখে প্রবেশ— অনন্ত আগুনের শিখা ও অগ্নিচ্ছটার প্রচন্ডতা। এ অবস্থার কোন বিশ্রাম নেই, আরামের জন্য কোন বিরতি নেই, হস্তক্ষেপ করার কোন ক্ষমতা নেই, প্রবোধ দেয়ার জন্য মৃত্যু নেই এবং ব্যথা ভুলিয়ে দেয়ার জন্য নিদ্রা নেই। সে বরং প্রতি পলে অনুপলে মৃত্যুর মূহূর্ত কাটায়। আমরা আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করি।

মৃতদের কাছ থেকে গ্রহণীয় শিক্ষা

হে আল্লাহ্র বান্দাগণ! তারা আজ কোথায় যারা দীর্ঘ বয়স পর্যন্ত বেঁচে থেকে আল্লাহ্র নেয়ামত ভোগ করেছিলো। তাদেরকে শিক্ষা দেয়া হয়েছিলো এবং তারা শিখেছিলো, তাদেরকে সময় দেয়া হয়েছিলো এবং তারা বৃথা সময় নষ্ট করেছিলো, তাদেরকে সুস্থ রাখা হয়েছিলো এবং তারা কর্তব্য বিষয় ভুলে গিয়েছিলো; তারা দীর্ঘ জীবন পেয়েছিলো, জীবন-যাপনে সুব্যবস্থা পেয়েছিলো, দুঃখময় শাস্তির বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিলো এবং বিপুল পুরস্কারের ওয়াদা করা হয়েছিলো। সুতরাং তোমরা পাপ পরিত্যাগ কর যা ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায় এবং অসৎ আমল পরিত্যাগ কর যা আল্লাহ্র রোষে তোমাদেরকে নিপতিত করে।

হে লোকসকল, তোমাদের যাদের চোখ আছে, কান আছে, স্বাস্থ্য আছে ও সম্পদ আছে—তারা বলতো কোথাও কি কোন আত্মরক্ষার স্থল, কোন নিরাপদ আশ্রয়, আত্মগোপন করার স্থান বা পালিয়ে যাবার স্থান আছে? না, নাই। যদি না থাকে তবে "কিরূপে তোমরা মুখ ফেরাও" (কুরআন- ৬:৯৫, ১০ : ৩৪, ৩৫:৩, ৪০:৬২) এবং কোথায় তোমরা সরে যাচ্ছো? কি জিনিসের দ্বারা তোমরা প্রতারিত হয়েছো? নিশ্চয়ই, এ বিশাল পৃথিবীতে তোমাদের অংশ হলো শরীরের মাপে এক টুকরা জমি যেখানে তোমরা চির শায়িত থাকবে। কাজেই বর্তমানটা তোমাদের আমলের এক সুবর্ণ সুযোগ।

হে আল্লাহ্র বান্দাগণ, যেহেতু তোমাদের ঘাড় ফাঁস মুক্ত, রূহ প্রতিবন্ধকহীন এবং যেহেতু এখনো হেদায়েতের পথ অন্বেষণ করার সময় আছে, তোমাদের শরীর সুস্থ আছে, তোমরা দলবদ্ধভাবে জড়ো হতে পার, তোমাদের সম্মুখে বাকী জীবন পড়ে আছে, তোমরা ইচ্ছা করলে সৎ আমলের সুযোগ আছে, তওবা করার সুযোগ আছে এবং শান্তিপূর্ণ অবস্থা আছে সেহেতু তোমরা আল্লাহ্র রজ্জু ধরো। সংকীর্ণ অবস্থায় পতিত হবার আগে, দুঃখ-দুর্দশা অথবা ভয় ও দুর্বলতায় স্পর্শ করার আগে, অপেক্ষমান মৃত্যু হাজির হবার আগে এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ কর্তৃক অবরুদ্ধ হবার আগে তোমরা সৎ আমল করো।

★★★★★

খোৎবা-৮৩

আমর ইবনে আ'স সম্পর্কে

নাবিঘার পুত্রের কথা শুনে আমার বিস্ময় লাগলো। সে শ্যামবাসীদের কাছে আমার সম্পর্কে বলে বেড়াচ্ছে যে, আমি একজন ভাঁড় এবং আমি কৌতুক আর ঠাট্টা বিদ্রূপে নিয়োজিত। সে ভুল বলছে এবং পাপ কথা বলছে। সাবধান, উহাই নিকৃষ্টতম কথা যা অসত্য। সে কথা বললে মিথ্যা বলে এবং ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে। সে যখন যাচ্না করে তখন তাতে লেগেই থাকে, কিন্তু তার কাছে কেউ কিছু চাইলে সে কৃপণের মত হাত গুটায়। সে বিশ্বাসঘাতকতা করে ওয়াদা ভঙ্গ করে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করে। যুদ্ধে সে হাঁক-ডাক দিয়ে আদেশ-নির্দেশ দেয় কিন্তু তার এ হাঁক-ডাক তরবারি কার্যকর হবার পূর্ব পর্যন্তই চলে। যুদ্ধ শুরু হলে সে যখন প্রতিপক্ষের মুখোমুখী হয় তখন তার বড় চাতুরী হলো উলঙ্গ[১] হয়ে যাওয়া। আল্লাহ্র কসম, মৃত্যুর স্মরণ আমাকে ক্রীড়া-কৌতুক হতে দূরে সরিয়ে রেখেছে। অপরপক্ষে পরকালের বিস্মৃতি তাকে সত্য কথা বলা হতে বিরত রেখেছে। সে বিনা স্বার্থে মুয়াবিয়ার আনুগত্য স্বীকার করেনি, পূর্বেই মুয়াবিয়াকে রাজী করিয়েছিলো যে, তাকে উপযুক্ত মূল্য দিতে হবে এবং ধর্ম ত্যাগের জন্য মুয়াবিয়াও তাকে পুরস্কৃত করেছিলো।

১। আমিরুল মোমেনিন এখানে মিশর বিজয়ী আমর ইবনে আসের সাহসের বহরের প্রতি ইঙ্গিত করে একথা বলেছেন। ঘটনাটি হলো, সিফফিনের যুদ্ধের এক পর্যায়ে সে আমিরুল মোমেনিনের মুখোমুখী হয়েছিল। আমিরুল মোমেনিন তাকে লক্ষ্য করে তরবারি তুলতেই সে উলঙ্গ হয়ে গেল। এতে আমিরুল মোমেনিন মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং সে রক্ষা পেয়ে গেল। আরবের বিখ্যাত কবি আল-ফারাজদাক এ সম্পর্কে বলেছেন ঃ

অমর্যাদাকর চালাকি দ্বারা জীবন রক্ষায়
নেই কোন সুনাম,
যা করেছে আমর ইবনে আ'স একদিন
করে তার গুপ্তাঙ্গ প্রদর্শন।

জীবন রক্ষার এহেন চাতুরী সর্বপ্রথম ওহুদের যুদ্ধে সংঘটিত হয়েছিল। ওহুদের যুদ্ধে তালহা ইবনে আবি তালহা আমিরুল মোমেনিনের মুখোমুখী হলে তিনি আঘাত হানতে যাবেন এসময়ে সে ভয়ে উলঙ্গ হয়ে গিয়েছিল এবং আমিরুল মোমেনিন তাকে আঘাত না করে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। আমরের পর বুশর ইবনে আবি আরতাত আমিরুল মোমেনিনের মুখোমুখী হলে একই উপায়ে জীবন রক্ষা করেছিল।

★★★★★

খোৎবা-৮৪

আল্লাহ্র উৎকর্ষ সম্পর্কে

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি এক এবং তাঁর কোন অংশীদার নেই। তিনিই আদি—তাঁর পূর্বে কোন কিছু নেই। তিনিই অন্ত—তাঁর কোন পরিসীমা নেই। কল্পনা তাঁর কোন গুণাবলীকে ধারণ করতে পারে না। তাঁর স্বরূপ সম্বন্ধে হৃদয়ের কোন বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। কোন বিশ্লেষণ ও বিভাজন তাঁর প্রতি প্রযোজ্য হতে পারে না। চোখ ও হৃদয় তাঁকে উপলব্ধি করতে পারে না।

হে আল্লাহ্র বান্দাগণ, আল্লাহ্র নির্দেশ ও আয়াতসমূহ হতে শিক্ষা গ্রহণ কর। সতর্কবাণী সম্পর্কে সাবধান হও। আদেশ ও উপদেশাবলী হতে লাভবান হও। মনে রেখো, মৃত্যুর থাবা সতত তোমাকে চাপ দিচ্ছে এবং

তোমার আশা-আকাঙ্খা হতে তোমাকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে। কি কঠিন অবস্থাই না তোমার উপর আপতিত হবে এবং তুমি সে দিকেই এগিয়ে চলছো যেখানে প্রত্যেককে যেতে হয়—তার নাম মৃত্যু। "প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে থাকবে একজন চালক ও একজন সাক্ষী" (কুরআন-৫০ : ২১)। চালক তাকে পুনরুজ্জীবনের দিকে ধাবিত করবে এবং সাক্ষী তার কর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে।

বেহেশ্‌তে অনেক উচ্চ শ্রেণী এবং থাকার বিবিধ স্থান আছে। এর নেয়ামত কখনো শেষ হবে না। এর সীমানা ভ্রমণ করে শেষ করা যাবে না এবং এর থেকে কেউ নিস্ক্রান্ত হবে না। যে কেউ এখানে প্রবেশ করবে সে কখনো বৃদ্ধ হবে না এবং এখানে কেউ কোন অভাব অনুভব করবে না।

★★★★★

খোৎবা-৮৫

পরকালের জন্য প্রস্তুতি ও আল্লাহ্‌র আদেশ পালন সম্পর্কে

আল্লাহ্ সকল গুপ্ত বিষয় সম্বন্ধে অবহিত এবং অন্তরের অনুভূতি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল আছেন। তিনি সবকিছুকে পরিবৃত করে আছেন। সব কিছুর ওপরে তাঁর নিয়ন্ত্রণ ও ক্ষমতা রয়েছে। তোমাদের প্রত্যেকের উচিত মৃত্যুর আগমনের পূর্বেই যা যা করণীয় তা করা, অবসর সময় অবহেলায় নষ্ট না করা এবং শ্বাসরুদ্ধ হবার আগেই এ যাত্রা বিরতির স্থল হতে স্থায়ী আবাসের জন্য রসদ সংগ্রহ করা।

আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর, হে জনমন্ডলী, তিনি তাঁর কিতাবে যা বলেছেন তৎপ্রতি যত্নবান হও এবং তোমাদের প্রতি তাঁর যে হক রয়েছে তা সম্পন্ন কর। নিশ্চয়ই, আল্লাহ্ তোমাদেরকে অহেতুক সৃষ্টি করেননি এবং লাগামহীনভাবে ছেড়েও দেননি; আবার অজ্ঞতা ও অন্ধকারে রেখেও দেননি। কি তোমাদের রেখে যাওয়া উচিত তিনি তা সংজ্ঞায়িত করেছেন, তোমাদেরকে তোমাদের আমল শিক্ষা দিয়েছেন, তোমাদের মৃত্যুকে নির্ধারিত করেছেন এবং "সবকিছুর ব্যাখ্যাসহ কিতাব" (কুরআন-১৬ঃ৮৯) নাজেল করেছেন। তিনি তাঁর রাসুলকে দীর্ঘ সময় তোমাদের মাঝে রেখেছিলেন যে পর্যন্ত না কুরআনের মাধ্যমে তোমাদের জন্য তাঁর বাণী তথা তাঁর মনোনীত দ্বীন পরিপূর্ণ করেছিলেন। তিনি তাঁর রাসুলের মাধ্যমে সৎ আমল ও বদ আমল এবং তাঁর আদেশ ও নিষেধের ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন।

তিনি তোমাদের সম্মুখে তাঁর প্রমাণাদি রেখেছেন এবং তোমাদের ওপর তাঁর ওজর নিঃশেষ করেছেন। তিনি তোমাদের সম্মুখে তাঁর সতর্কবাণী রেখেছেন এবং কঠোর শাস্তির বিষয়েও তোমাদেরকে সতর্ক করেছেন। সুতরাং তোমাদের বাকী দিনগুলোতে পূর্ণভাবে প্রায়শ্চিত্ত কর এবং ছবর অভ্যাস কর। যতটুকু সময় তুমি আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধের প্রতি অমনোযোগিতা ও বিস্মৃতির মধ্যে কাটিয়েছো তার তুলনায় অবশিষ্ট সময় খুবই অল্প। তোমার নিজের জন্য সময় রেখো না—রাখলে তা তোমাকে অন্যায়কারীদের পথে ঠেলে নিয়ে যাবে। কখনো অলস হয়ো না কারণ অলসতা তোমাকে পাপাচারিতার দিকে ঠেলে নিয়ে যাবে।

হে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ, সে ব্যক্তি সর্বোত্তম আত্ম-উপদেষ্টা যে আল্লাহ্‌র অতি অনুগত এবং সে ব্যক্তি সব চাইতে বড় আত্ম-প্রবঞ্চক যে আল্লাহ্‌র অনুগত নয়। সে ব্যক্তিই সব চাইতে বেশী প্রবঞ্চিত যে নিজেকে প্রবঞ্চনা করে। সে ব্যক্তি অতিব ঈর্ষণীয় যার ইমান নিরাপদ। ভাগ্যবান সে ব্যক্তি যে অন্যদের থেকে উপদেশ গ্রহণ করে এবং ভাগ্যাহত সে যে কামনা-বাসনার শিকার হয়। মনে রেখো, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মোনাফেকিও শিরকের সামিল এবং আকাঙ্খা-পূজারীর সঙ্গ ইমানের বিস্মৃতির চাবিকাঠি ও শয়তানের আসন।

মিথ্যার বিরুদ্ধে নিজেকে সতর্ক রেখো কারণ মিথ্যা ইমানের বিপরীত। একজন সত্যবাদী মুক্তি ও মর্যাদার শিখরে। অপরপক্ষে একজন মিথ্যাবাদী অমর্যাদা ও হীনতার শেষ সীমায়। কখনো ঈর্ষাপরায়ণ হয়ো না কারণ মাৎসর্য ইমানকে খেয়ে ফেলে যেভাবে আগুন শুকনো কাঠকে খেয়ে ফেলে। বিদ্বেষপরায়ণ হয়ো না কারণ বিদ্বেষ সদ্‌গুণ মোছক। জেনে রাখো, কামনা বুদ্ধিমত্তাকে লোপ করে এবং স্মৃতিতে বিস্মরণ ঘটায়। কামনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা তোমাদের উচিত, কারণ এটা এক প্রকার ছলনা এবং যার কামনা আছে সে ধোকায় লিপ্ত।

★★★★★

খোৎবা-৮৬

মোমিনের গুণাবলী

হে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ, সে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সব চাইতে প্রিয় যাকে তিনি কামনা-বাসনা প্রদমিত করার ক্ষমতা অর্পণ করেছেন যাতে তার বাতেন শোক-বিহ্বল ও জাহের ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে। তার হৃদয়ে হেদায়েতের প্রদীপ সমুজ্জ্বল। সে সেদিনের আপ্যায়নোপকরণ সংগ্রহ করেছে যে দিনটি অবশ্যম্ভাবী (মৃত্যু)। যা দূরে তা সে নিকটে মনে করে এবং যা কঠিন তা সে সহজ মনে করে। সে দৃষ্টিপাত করে ও উপলব্ধি করে; সে আল্লাহ্‌র জেকের করে ও আমলকে প্রসারিত করে। সে মিঠা পানি পান করে যার উৎসের দিকে তার পথ সহজ করে দেয়া হয়েছে। সুতরাং সে পরিতৃপ্ত হওয়া পর্যন্ত পান করে এবং সমতল পথ অবলম্বন করে। সে একটি (আল্লাহ্‌র সন্তোষ) ছাড়া অন্য সকল আকাঙ্খার আচ্ছাদন খুলে ফেলে দিয়েছে এবং সকল উদ্বেগ হতে মুক্ত হয়েছে। সে কুপথে পরিচালিত হওয়া থেকে নিরাপদ এবং যারা কামনা-বাসনার অনুসারী সে তাদের সঙ্গ ত্যাগ করেছে। সে হেদায়েতের দুয়ারের চাবিতে পরিণত হয়েছে এবং ধ্বংসের দুয়ারের তালায় পরিণত হয়েছে। সে তার পথ দেখেছে এবং সেপথেই হেঁটে যাচ্ছে। সে তার হেদায়েতের আলামত ও চিহ্নকে চিনেছে এবং গভীর জলাশয় অতিক্রম করেছে। সে বিশ্বস্ততম অবলম্বন ও শক্ততম রজ্জু ধরেছে। সে দৃঢ় প্রত্যয়ের এমন স্তরে যা সূর্যের দীপ্তির মত। সে নিজেকে মহিমান্বিত আল্লাহ্‌র জন্য নিয়োজিত করেছে এবং মহত্তম কর্মের জন্য সে যেকোন পরিস্থিতির মোকাবেলা ও যেকোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সদা প্রস্তুত। সে অন্ধকারের প্রদীপ। সে সকল প্রকার অন্ধত্ব অপনোদনকারী, গুপ্ত বিষয়ের চাবি, জটিলতা অপসারণকারী এবং বিশাল মরুভূমিতে পথ প্রদর্শক। যখন সে কথা বলে তখন তা বুঝিয়ে বলে। আবার যখন সে চুপ থাকে তখন তা নিরাপদ বলেই করে। সে সবকিছু শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যই করে। ফলে আল্লাহ্‌ও তাকে নিজের করে নেয়। সে আল্লাহ্‌র দ্বীনের খনি ও তাঁর জমিনের পেরাক স্বরূপ। সে ন্যায়কে নিজের জন্য ফরজ করে নিয়েছে।

তার ন্যায়ের প্রথম পদক্ষেপ হলো সে হৃদয় থেকে সকল কামনা বিদূরীত করেছে। সে ন্যায়ের বর্ণনা যেভাবে করে ঠিক সেভাবে আমল করে। যা কিছু কল্যাণকর তা তার লক্ষ্য এড়ায় না এবং কুরআনের কোন স্থান তার দৃষ্টির আড়াল হয় না। সুতরাং কুরআন তার পরিচালক ও ইমাম। অর্থাৎ সে সর্বদা কুরআনের সাথে থাকে, কখনো পৃথক হয় না। তার দৈনন্দিন কাজ কর্মেও সে কুরআনকে অনুসরণ করে।

বেঈমানের বৈশিষ্ট্য

অপরপক্ষে, অন্য প্রকৃতিরও মানুষ আছে যে নিজেকে জ্ঞানী মনে করে, আসলে সে তা নয়। সে অজ্ঞদের কাছ থেকে অজ্ঞতা এবং পথভ্রষ্টদের কাছ থেকে পথভ্রষ্টতা কুড়িয়ে নেয়। সে মানুষের জন্য মিথ্যা বক্তৃতা ও প্রতারণার

দড়ি দিয়ে ফাঁদ পাতে। সে নিজের অভিমত অনুযায়ী কুরআনকে এবং কামনা-বাসনার বশবর্তী হয়ে ন্যায়কে গ্রহণ করে। সে মহাপাপকে নিরাপদ এবং লঘু পাপকে গুরুতর অপরাধ বলে মানুষকে বুঝায়। সংশয়ে ডুবে থেকে সে বলে যে, সে সংশয়ের ব্যাখ্যার জন্য অপেক্ষা করছে। সে বলে যে, সে বিদা'ত থেকে দূরে থাকে অথচ সে বিদা'তে নিমগ্ন রয়েছে। তার আকৃতি মানুষের মত কিন্তু তার চিত্তবৃত্তি পশুর মত। হেদায়েতের দরজা তার অচেনা। কাজেই সে সৎপথ অনুসরণ করতে পারে না। এসব লোক জীবন্মৃত।

রাসুলের (সঃ) ইতরাহ্ সম্পর্কে

"সুতরাং কোথায় তোমরা চলছো" (কুরআন-৮১ঃ২৬) এবং "তোমরা কিভাবে বিপথগামী হচ্ছো" (কুরআন-৬ঃ৯৫, ১০ঃ৩৪, ৩৫ঃ৩, ৪০ঃ৬২)। হেদায়েতের প্রতীক-চিহ্নসমূহ দন্ডায়মান, সদগুণাবলীর লক্ষণসমূহ সুস্পষ্ট এবং আলোর পথের মিনার নির্ধারিত। তোমাদেরকে কোন্ বিপথে নেয়া হচ্ছে এবং কিভাবে তোমরা অন্ধত্বের দিকে যাচ্ছো যেখানে তোমাদের মাঝে রাসুলের আহলুল বাইত রয়েছে? তাঁরা হলেন ন্যায়ের লাগাম, দ্বীনের প্রতীক ও সত্যের জিহ্বা। তোমরা কুরআনকে যতটুকু মর্যাদা দাও তাদেরকেও ততটুকু মর্যাদা দিও এবং তৃষ্ণার্ত উট যেভাবে পানির ঝরণার দিকে ছুটে যায়, হেদায়েতের তৃষ্ণা মিটানোর জন্য তোমরাও সেভাবে তাদের দিকে যেয়ো।

হে জনমন্ডলী, খাতেমুন নবীর বাণী [১] তোমরা স্মরণ কর। তিনি বলেছেন, "আমাদের মধ্যে হতে যে কেউ মৃত্যুবরণ করে সে মৃত নয় এবং আমাদের মধ্য হতে যে কেউ ক্ষয়প্রাপ্ত (মৃত্যুর পর) হয় সে প্রকৃতপক্ষে ক্ষয়প্রাপ্ত নয়। যে বিষয় তোমরা বুঝ না সে বিষয়ে কথা বলো না, কারণ তোমরা যা অস্বীকার কর তাতে অধিকাংশ সত্য ও ন্যায় আছে। যার বিরুদ্ধে তোমাদের কোন যুক্তি নেই তার যুক্তি গ্রহণ কর।" রাসুল (সঃ) এখানে যার কথা বলেছেন আমিই তো সে ব্যক্তি। আমি কি তোমাদের সম্মুখে ছাকালুল-আকবরের (কুরআনের) আমল করিনি? আমি কি তোমাদের ছাকালুল-আজগরের[২] (আহলুল বাইতের) অন্তর্ভুক্ত নই? আমি তোমাদের ইমানের মানদন্ড নির্ধারণ করে দিয়েছি এবং তোমাদেরকে হালাল ও হারামের সীমারেখা শিখিয়ে দিয়েছি। আমি আমার ন্যায় বিচার দ্বারা তোমাদেরকে নিরাপত্তার পোষাক পরিয়ে দিয়েছি এবং আমার কথা ও কর্ম দ্বারা তোমাদের জন্য সৎকাজের কার্পেট ছড়িয়ে দিয়েছি। আমি নিজের মাধ্যমে তোমাদেরকে উন্নত আচরণ দেখিয়েছি। যা চোখে দেখা যায় না অথবা মনে ধারণ করা যায় না সে বিষয়ে কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করো না।

বনি উমাইয়া সম্পর্কে

যতদিন পর্যন্ত মানুষ মনে করবে যে, পৃথিবী উমাইয়াদের করতলে, সকল নেয়ামত তাদের ওপর বর্ষিত, স্বচ্ছ সরবরের পানি ব্যবহারের অধিকার শুধু তাদের, ততদিন পর্যন্ত উমাইয়াদের চাবুক ও তরবারি মানুষের মাথার ওপর হতে সরবে না। উমাইয়ারা যদি মনে করে থাকে যে তারা চিরস্থায়ীভাবে মানুষের ওপর অত্যাচার-উৎপীড়ন চালিয়ে যেতে পারবে তাহলে তাদের সে চিন্তা ভুল। জীবনের আনন্দের কয়েক ফোটা মাত্র তারা অল্প সময়ের জন্য পান করতে পারবে এবং পরক্ষণেই তারা সবকিছু বমি করে ফেলবে।

১। রাসুলের (সঃ) এ বাণী হতে নিশ্চিত প্রমাণিত হয় যে, আহলুল বাইতের সদস্যদের জীবনে কখনো পরিসমাপ্তি আসে না এবং দৃশ্যতঃ মৃত্যু তাদের বেঁচে থাকার মধ্যে কোন ব্যবধান সৃষ্টি করে না। কিন্তু মানুষের বুদ্ধিমত্তা সে জীবনের অবস্থা ও ঘটনাবলী অনুধাবন করতে সক্ষম হয় না। আমাদের জ্ঞান-জগতের বাইরে অনেক সত্য রয়েছে যা মানুষের মন এখনো বুঝতে পারে না। কবরের সংকীর্ণ স্থানে যেখানে একটু নিশ্বাস ফেলা সম্ভব নয়; কে বলতে পারে সেখানে কি করে মুনকার নকিরের প্রশ্নের জবাব দেয়া হয়? একইভাবে, আল্লাহ্‌র রাস্তায় যারা শহীদ হয়েছে তাদের জীবনের অর্থ কি? যদিও আমাদের দৃষ্টিতে তারা মৃত তবুও কুরআন বলেঃ

যারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয়েছে তাদের মৃত বলো না, তারা জীবিত; কিন্তু তোমরা উহা অনুধাবন করতে পার না (২ঃ১৫৪)। যারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে মৃত মনে করো না। বরং তারা জীবিত এবং তাদের রবের নিকট হতে জীবিকাপ্রাপ্ত (৩ঃ১৬৯)।

যেখানে সাধারণ শহীদদেরকে মৃত বলতে ও মনে করতে কুরআনে নিষেধ করা হয়েছে সেখানে ঐসব মহান ব্যক্তিত্ব যাঁরা আল্লাহ্‌র দ্বীনের জন্য তরবারির নীচে মাথা ও বিষের পেয়ালা হাতে রেখেছেন তারা অনাদি জীবনের অধিকারী হবেন এতে দ্বিমত করার কিছু নেই। তাদের দেহ সম্বন্ধে আমিরুল মোমেনিন বলেছেন যে, কালের অতিক্রমণে উহা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না; তারা যে অবস্থায় শহীদ হয়েছেন সে অবস্থায় থাকেন। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই কারণ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় দীর্ঘদিন পূর্বে সংরক্ষিত মৃতদেহ এখনো রয়েছে। এটা যখন মানুষের পক্ষে সম্ভব সেক্ষেত্রে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ যাদের চিরস্থায়ী জীবন দান করেছেন তাদের বেলায় লয় রোধ করা কি তাঁর ক্ষমতা বহিঃর্ভুত? বদরের যুদ্ধের শহীদদের সম্পর্কে রাসুল (সঃ) বলেছেনঃ

তাদেরকে তাদের ক্ষতস্থান হতে নির্গত রক্তসহ দাফন করো কারণ বিচার-দিনে যখন তারা উত্থিত হবে তখন তাদের গলা দিয়ে রক্ত বের হবে।

২। ছাকালুল আকবর বলতে কুরআন এবং ছাকালুল আজগর বলতে আহ্‌লুল বাইতকে বুঝানো হয়েছে। রাসুল (সঃ) বলেছেন ঃ

নিশ্চয়ই, আমি তোমাদের মাঝে ছাকালায়েন (দু'টো মহামূল্যবান জিনিস) রেখে যাচ্ছি।

ছাকালায়েন বলতে রাসুল (সঃ) কুরআন ও আহলুল বাইতকে বুঝিয়েছেন। ছাকাল শব্দের অর্থ হলো ভ্রমণকারীর অত্যাবশ্যকীয় জিনিসপত্র; মূল্যবান বস্তু। এ পৃথিবী মানুষের জন্য ভ্রমণ স্থান ছাড়া আর কিছুই নয়। এ ভ্রমণে ছাকালায়েন এত অত্যাবশ্যকীয় যে, এ দু'টো মূল্যবান বস্তু ছাড়া ভ্রমণ পথে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হবে এবং ভ্রমণের উদ্দেশ্যও ব্যাহত হয়ে যাবে।

ইবনে হাজর আল-হায়তামী,[১৬৬] (পৃঃ৯০) লিখেছেন,

রাসুল (সঃ) কুরআন ও তাঁর আহলুল বাইতকে ছাকালায়েন বলেছেন কারণ ছাকাল অর্থ হলো পবিত্র, সৎ ও সংরক্ষিত বস্তু এবং এ দু'টো প্রকৃতপক্ষে তা-ই। এদের প্রতিটি ঐশী জ্ঞানের ভান্ডার, গুপ্ত বিষয়সমূহের উৎস এবং দ্বীনের নির্দেশিত বিধান। সে জন্য রাসুল (সঃ) তাদেরকে অনুসরণ করতে, তাদের আঁচল (দামান) ধরে রাখতে এবং তাদের কাছ থেকে জ্ঞান আহরণ করতে মানুষকে নির্দেশ দিয়েছেন। আহলুল বাইতের প্রধান সদস্য হলেন ইমাম আলী ইবনে আবি তালিব। তিনি রাসুলের (সঃ) কাছ থেকে সরাসরি জ্ঞান লাভ করায় অতি উঁচুস্তরের অন্তর্দৃষ্টি ও গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তাঁর জ্ঞানের সনদ রাসুল (সঃ) নিজেই দিয়ে বলেছেনঃ "আমি জ্ঞানের মহানগরী এবং আলী তার দরজা।"

★★★★★

খোৎবা-৮৭

উম্মাহ্‌র বিভেদ ও দলাদলি সম্পর্কে

নিশ্চয়ই, আল্লাহ্ এ পৃথিবীতে কোন স্বেচ্ছাচারীর ঘাড় মটকাননি যে পর্যন্ত না তাকে শোধরানোর সময় ও সুযোগ দিয়েছেন এবং কোন উম্মাহ্‌র ভাঙ্গা হাড় জোড়া লাগাননি যে পর্যন্ত না তিনি তাদের ওপর দুর্যোগ ও দুঃখ-দুর্দশা আরোপ করেছেন। যে ভোগান্তি ও দুর্ভাগ্য তোমাদের জীবনে ঘটেছে তা তোমাদের শিক্ষার জন্য যথেষ্ট।

কিন্তু প্রত্যেক মানুষ হৃদয় থাকা সত্ত্বেও বুদ্ধিমান নয়, প্রত্যেক কানের শ্রুতিশক্তি নেই এবং প্রত্যেক চোখ দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন নয়।

হায়! আফসোস, এসব দলের ভুল-ভ্রান্তি দেখে আমার আশ্চর্য না হবার কোন কারণ নেই, কারণ তারা তাদের দ্বীনে পরিবর্তন এনেছে, তারা তাদের নবীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে না এবং নবীর প্রতিনিধির আমল অনুসরণ করেনা। তারা গায়েবের প্রতি ঈমান আনে না এবং আয়েব (দোষ) হতে নিজেদেরকে সারিয়ে রাখে না। তারা সংশয়ের মধ্যে কাজ করে এবং কামনা-বাসনার পথে পরিচালিত হয়। শুভ হলো সেটা যেটাকে তারা ভাল মনে করে এবং মন্দ হলো সেটা যেটাকে তারা মন্দ মনে করে। তারা মনে করে দুর্দশার সমাধান তাদের নিজেদের হাতে। তারা বিশ্বাস করে যে, সন্দেহজনক বিষয়সমূহ তাদের মতানুযায়ী নিষ্পত্তি হবে। মনে হয় তাদের প্রত্যেকেই যেন ইমাম। যে কোন বিষয়ে তারা সিদ্ধান্ত নেয় তারা মনে করে বিশ্বস্ত বরাত-সূত্র ও মজবুত উৎস হতে তারা তা পেয়েছে।

★★★★★

খোৎবা-৮৮

রাসুল (সঃ) সম্পর্কে

অন্যান্য নবীদের মিশন শেষ হবার পর আল্লাহ্ রাসুলকে (সঃ) প্রেরণ করেছেন যখন মানুষ দীর্ঘদিন যাবত তন্দ্রাচ্ছন্ন ছিল। যখন পাপাচার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল, সকল বিষয় সংহতিহীন ও যুদ্ধানলের শিখাধীন ছিল এবং পৃথিবী তার ঔজ্জ্বল্য হারিয়ে ফেলেছিল ও চতুর্দিকে খোলাখুলি প্রতারণা ও প্রবঞ্চনা বিরাজ করছিলো। গাছের পাতা হলুদ হয়ে গিয়েছিল এবং ফল পাবার কোন আশা ছিল না; পানি মাটির নীচে চলে গিয়েছিল। হেদায়েতের মিনার অদৃশ্য হয়ে পড়েছিল এবং ধ্বংসের চিহ্নসমূহ দৃষ্টিগোচর হচ্ছিলো। পৃথিবী তার অধিবাসীর জন্য কঠোর হয়ে পড়েছিল এবং অনুসন্ধানকারীর প্রতি ভ্রুকুটি করতো। এর ফল ছিল পাপ ও খাদ্য ছিল মৃতদেহ। এর অন্তর্বাস ছিল ভয় এবং বহিরাবরণ ছিল তরবারি।

সুতরাং হে আল্লাহ্র বান্দাগণ, তোমাদের পিতা ও ভ্রাতা যে সকল পাপ কাজে জড়িয়ে পড়েছিল এবং যে জন্য তাদেরকে জবাবদিহি হতে হয়েছে তা স্মরণ কর এবং তা হতে শিক্ষা গ্রহণ কর। আমার জীবনের কসম, তোমাদের বর্তমান সময় হতে তাদের সময় খুব বেশী দিন আগের নয়- এখনো শতাব্দী পার হয়ে যায় নি- এটাও বেশীদিন আগের কথা নয় যে তোমরা তাদের ঔরসে ছিলে।

আল্লাহ্র কসম, রাসুল (সঃ) তাদেরকে যা বলেছিলেন, আমিও আজ তোমাদেরকে তা-ই বলছি; তোমরা আজ যা কিছু শুনছো, তারা গতকাল তা-ই শুনেছিল। তাদের জন্য যে চোখ খোলা হয়েছিল, যে হৃদয় তাদের জন্য সেদিন তৈরী করা হয়েছিল, অনুরূপ তাই আজ তোমাদের জন্য দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্র কসম, এমন কিছু আজ তোমাদেরকে বলা হচ্ছে না, যা তারা জানত না এবং এমন কিছু তোমাদেরকে দেয়া হচ্ছে না যা হতে তারা বঞ্চিত ছিল। নিশ্চয়ই, তোমরা এমন একটা চরম বিপর্যয়ে কষ্ট পাবে (যা উষ্ট্রীর মত) যার নাকের দড়ি নড়বড়ে ও গলার দড়ি ছিঁড়ে গেছে। সুতরাং এ প্রতারকগণ যেন কোন অবস্থাতেই তোমাদের ধোঁকায় ফেলতে না পারে, কারণ এটা একটা ক্ষণস্থায়ী দীর্ঘছায়া।

★★★★★

খোৎবা-৮৯

আল্লাহ্‌র গুণাবলী ও কয়েকটি উপদেশ

প্রতিষ্ঠিত প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি দৃশ্যমান না হয়েও সুপরিচিত। তিনি কোন প্রকার চিন্তা-ভাবনা না করেই সৃষ্টি করেন। যখন নীহারিকা বিশিষ্ট আকাশ ছিল না, পৃথিবী ছিল না, অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রি ছিল না, শান্ত সমুদ্র ছিল না, উপত্যকা বিশিষ্ট পর্বত ছিল না, বিছানো মাটি (সমতল) ছিল না এবং কোন আত্ম-প্রত্যয়ি প্রাণী ছিল না, তখনো তিনি ছিলেন। তিনিই সৃষ্টির উদ্ভাবক ও তাদের প্রভু। তিনিই সৃষ্টির উপাস্য ও তাদের রেজেকদাতা। তাঁর ইচ্ছায় চন্দ্র ও সূর্য আপন কক্ষপথে ভ্রমণ করে।

তিনি সকল জীবের জীবিকা ছড়িয়ে দিয়েছেন। তাদের কর্মকান্ড, শ্বাস-প্রশ্বাস, গোপন দৃষ্টিপাত এবং তাদের হৃদয়ে যা লুক্কায়িত রয়েছে তার হিসাব রাখেন। তিনি তাদের পিতার ঔরস ও মায়ের গর্ভাশয় হতে শেষ অবস্থান পর্যন্ত সব কিছু জানেন।

তাঁর পরম করুণা থাকা সত্ত্বেও শত্রুর প্রতি তাঁর শাস্তি কঠোর এবং তিনি কঠোর শাস্তিদাতা হওয়া সত্ত্বেও তাঁর বন্ধুদের প্রতি তিনি পরম করুণাময়। যে তাঁকে অতিক্রম করতে চায় তিনি তাকে পরাভূত করেন এবং যে তাঁর সাথে সংঘর্ষ করতে চায় তিনি তাকে ধ্বংস করেন। যে তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করে তিনি তাকে অপমানিত করেন। যে তাঁর সাথে দুশমনি করে তিনি তার ওপর জয়ী হন। যে তাঁর কাছে যাচ্না করে তিনি তাকে দান করেন এবং যে তাঁকে ঋণ দান করে তিনি তা পরিশোধ করেন। যে তাঁর ওপর নির্ভর করে তার জন্য তিনিই যথেষ্ট এবং যে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ তিনি তাকে পুরস্কৃত করেন।

হে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ, বিচারের সম্মুখীন হবার আগেই নিজেকে বিচার কর, (পাপ-পূণ্যের) ওজন নেয়ার আগেই নিজেই ওজন কর এবং মূল্যায়িত হবার আগেই নিজেকে মূল্যায়ন কর। শ্বাসরুদ্ধ হবার আগেই শ্বাস গ্রহণ কর। দ্রুত তাড়িত হবার আগেই অনুগত হও। জেনে রাখো, যে ব্যক্তি নিজেকে সাহায্য করে না এবং নিজের উপদেষ্টা ও সতর্ককারী নিজে হয় না, অন্য কেউ কার্যকরভাবে তার উপদেষ্টা ও সতর্ককারী ও সাহায্যকারী হতে পারে না।

★★★★★

খোৎবা-৯০

খোৎবাতুল আশবাহ[১]

ইমাম জাফর ইবনে মুহাম্মদ আস-সাদিকের সূত্রে প্রাপ্তি উল্লেখ পূর্বক মাসা'দাহ্ ইবনে সাদাকাহ্ বলেছেন ঃ

"আমিরুল মোমেনিন কুফার মসজিদের মিম্বারে দাঁড়িয়ে এ খোৎবা প্রদান করেছিলেন। যখন একজন লোক বলেছিল, হে আমিরুল মোমেনিন, আমাদের জন্য আল্লাহ্‌র বর্ণনা এমনভাবে ব্যক্ত করুন যেন আমরা কল্পনা করতে পারি যে, আমরা তাঁকে চোখে দেখি এবং তাতে তাঁর প্রতি আমাদের জ্ঞান ও প্রেম বৃদ্ধি পায়।" প্রশ্নকারীর এ অনুরোধে আমিরুল মোমেনিন রাগান্বিত হয়ে গেলেন এবং সকল মুসলিমকে মসজিদে সমবেত হতে আদেশ দিলেন। বহুসংখ্যক মুসলিম মসজিদে জমায়েত হয়েছিল এবং সে স্থান জনাকীর্ণ হয়ে পড়েছিল। আমিরুল মোমেনিন মিম্বারে উঠলেন কিন্তু তখনো তিনি রাগান্বিত অবস্থায় ছিলেন এবং রাগে তাঁর মুখের বর্ণ পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল। আল্লাহ্‌র উচ্চ প্রশংসা ও রাসুলের ওপর তাঁর রহমত প্রার্থনা করে তিনি বলেন ঃ

আল্লাহ্‌র বর্ণনা

প্রতিষ্ঠিত প্রশংসা আল্লাহ্‌র যাঁকে দানের অসম্মতি ও কার্পণ্য ধনী করে না এবং যাঁকে মহাদানশীলতা ও দয়াদ্রতা দরিদ্র করে না। তিনি ব্যতীত প্রত্যেকেই যে পরিমাণ দান করে সে পরিমাণ কমে যায় এবং প্রত্যেক কৃপণকে তার দানকুণ্ঠার জন্য দোষারোপ করা হয়। তাঁর অগণিত নেয়ামত ও দান-অনুদানের মাধ্যমে তিনি আমাদেরকে অনুগ্রহ করেন। সমগ্র সৃষ্টি তাঁর পোষ্য[২]। তিনি তাদের জীবিকার নিশ্চয়তা ও রেজেক নির্ধারিত করে দিয়েছেন। যারা তাঁর দিকে মুখ ফেরায় এবং তাঁর কাছে যাচ্না করে তিনি তাদের জন্য পথ প্রস্তুত করেছেন। তাঁর কাছে যা যাচ্না করা হয় তার জন্য তিনি যতটুকু উদার, যা যাচ্না করা হয় না তার জন্যও ততটুকু উদার। তিনিই প্রথম যাঁর কোন আদি নেই; তাতে তাঁর পূর্বে কোন কিছুই থাকতে পারে না। তিনিই শেষ যাঁর কোন অন্ত নেই: তাতে তাঁর পরে কোন কিছুই থাকতে পারে না। তিনি তাঁকে দেখা বা প্রত্যক্ষ করা হতে মানুষের চোখকে বারিত করেছেন। কাল (সময়) তাঁর কোন পরিবর্তন করে না; তাতে তাঁর অবস্থার কোন পরিবর্তন নেই। তিনি কোন নির্দিষ্ট স্থানে নেই, তাতে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে তাঁর কোন চলাচল নেই। পর্বতে, ভূগর্ভের খনিতে ও সমুদ্র বক্ষে স্বর্ণ, রৌপ্য, মুক্ত, মানিক্য ও প্রবাল- যা কিছু আছে উহার সবকিছু দান করলেও তাঁর দানশীলতা ক্ষুন্ন হবে না বা তাঁর যা আছে তাতে কোন কমতি দেখা দেবে না, তাঁর নেয়ামতের ভান্ডার এমন সমগ্র সৃষ্টির চাহিদা পূরণের ফলে তাতে কোন কমতি দেখা দেয় না। তিনি এমন দয়ালু সত্তা যাঁকে ভিক্ষুকের যাচ্না দরিদ্র করতে পারে না এবং নাছোড়বান্দা যাচ্নাকারী কৃপণ করতে পারে না।

কুরআনে বর্ণিত আল্লাহ্‌র গুণাবলী

তৎপর প্রশ্নকারীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলেন যে, আল্লাহ্‌র সেসব গুণাবলীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাক যা কুরআনে বর্ণিত হয়েছে এবং সেসব গুণাবলীর হেদায়েতের নূর হতে আলোর অনুসন্ধান করো। যে জ্ঞান অনুসন্ধান করতে শয়তান তোমাকে প্ররোচিত করেছে এবং যে জ্ঞান অনুসন্ধান করার কোন নির্দেশ কুরআনে নেই অথবা রাসুল (সঃ) বা অন্য কোন হাদীর কথায় ও কর্মে যে জ্ঞানের কোন ইঙ্গিত পর্যন্ত নেই তা আল্লাহ্‌র হাতে ছেড়ে দাও। তোমাদের ওপর এটাই আল্লাহ্‌র দাবীর চরম সীমা। জেনে রাখো, তারাই জ্ঞানে দৃঢ় যারা অপরিজ্ঞাতের পর্দা উন্মোচন করা হতে বিরত থাকে এবং গুপ্ত ও অপরিজ্ঞাত বিষয়ের বিস্তারিত সম্বন্ধে নিজের অজ্ঞতা স্বীকার করে অধিকতর অনুসন্ধান থেকে বিরত থাকে। যে জ্ঞান তাদের দেয়া হয়নি তা পেতে তারা অক্ষম—এ কথা স্বীকার করার জন্য আল্লাহ্ তাদের প্রশংসা করেন। আল্লাহ্‌কে জানার জন্য এমন কোন গভীর আলোচনায় তারা লিপ্ত হয় না যা আদেশ করা হয়নি এবং এটাকেই তারা দৃঢ়তা বলে। এটুকুতেই পরিতৃপ্ত হও এবং তোমার নিজের বুদ্ধিমত্তার পরিমাপের মধ্যে আল্লাহ্‌র মহত্বকে সীমাবদ্ধ করো না। অন্যথায় তুমি ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

তিনি সর্বশক্তিমান। যদি তাঁর ক্ষমতার পর্যাপ্ততা ও সীমা নির্ণয়ের জন্য কল্পনার তীর ছোঁড়া হয়, মনকে পাপ-চিন্তা মুক্ত করে তাঁর রাজ্যের গভীরে তাঁকে দেখার চেষ্টা করা হয়, তাঁর গুণাবলীর বাস্তবতাকে উপলব্ধি করার জন্য হৃদয়ে প্রবল আশা পোষণ করা হয় এবং তাঁর সত্তা সম্বন্ধে জ্ঞানার্জনের জন্য অপরিজ্ঞাতের অন্ধকার গর্ত অতিক্রম করে তাঁর প্রতি মনোনিবেশ পূর্বক বুদ্ধিমত্তা ও চিন্তাশক্তির বর্ণনাতীত মহাকাশে প্রবেশ করে; তবুও তিনি তাদেরকে ফেরত পাঠিয়ে দেবেন—তাঁর গায়েব সম্পর্কে এতটুকুও জানতে পারবে না। তারা পরাজিত হয়ে ফিরে আসবে এবং স্বীকার করবে যে, তাঁর গায়েব এহেন ছড়ানো-ছিটানো প্রচেষ্টা দ্বারা আয়ত্ব করা সম্ভব নয় এবং তাঁর সম্মানিত মহত্বের একটা বিন্দুও চিন্তাবিদদের বোধগম্যতায় আসবে না।

আল্লাহ্র সৃষ্টি সম্পর্কে

তিনি কোন প্রকার অনুকরণীয় কিছু ছাড়াই সৃষ্টির উদ্ভাবন করেছেন এবং তাঁর সম্মুখে অন্য স্রষ্টার কোন প্রকার নমুনা ছিল না। তাঁর কুদরতের রাজত্ব তিনি আমাদের দেখিয়েছেন এবং এমন সব অত্যাশ্চার্য বিষয় দেখিয়েছেন যা তাঁর হেকমত প্রকাশ করে। সৃষ্ট বস্তু এ কথা স্বীকার করে যে, আল্লাহ্র কুদরত ও শক্তি তাদেরকে অস্তিত্বে টিকিয়ে রেখেছে। আল্লাহ্র মারেফাতের অকাট্য প্রমাণাদি তাঁর পরিচয় সম্পর্কে আমাদেরকে অনুধাবন করিয়ে দেয় (অর্থাৎ সৃষ্টি দ্বারাই আল্লাহ্ স্বপ্রকাশ; এতে কেউ বলতে পারে না যে, তাঁর পরিচয় পাওয়া যায় নি)। তাঁর সৃষ্ট আশ্চর্যজনক বস্তুনিচয়ে তাঁর সৃষ্টি-ক্ষমতার ও জ্ঞানের ষ্ট্যান্ডার্ড পরিদৃশ্যমান। তিনি যা কিছু সৃষ্টি করেছেন উহার প্রতিটিই তাঁর অনুকূলে এক একটি দলিল ও তাঁকে চিনিয়ে দেয়ার গাইড। এমন কি একটা নিশ্চল জড়বস্তুও এমনভাবে তাঁকে চিনিয়ে দেয় যেন এটা কথা বলে এবং যেন সে বস্তুর স্রষ্টার পরিচয় সুস্পষ্ট।

হে আল্লাহ্! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, যে ব্যক্তি তোমার সম্পর্কীয় জ্ঞানের সাথে নিজের বাতেনকে পরিচিত না করিয়ে তোমাকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিভক্ততা বা হাত-পায়ের জোড়ার সাথে তুলনা করে এবং হৃদয়ে এ মর্মে একীন (দৃঢ়-প্রত্যয়) করে না যে, তোমার কোন অংশীদার নেই, সে ব্যক্তি শিরক করলো। সে যেন শোনেনি, বিভ্রান্ত অনুসারীগণ তাদের মিথ্যা দেবতাকে পরিত্যাগ করে বলেছিল, "আল্লাহ্র কসম, আমরা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই ছিলাম; যখন আমরা তোমাদিগকে রাব্বুল আলামীনের সমকক্ষ গণ্য করতাম" (কুরআন-২৬ঃ৯৭-৯৮)। তারা ভ্রান্ত যারা তোমাকে তাদের বিগ্রহের অনুরূপ মনে করে এবং তাদের কল্পনার সৃষ্টির পোষাকে তোমাকে আবৃত করে, তাদের নিজস্ব চিন্তায় শরীরের অংশসমূহ তোমাতে আরোপ করে ও তাদের বুদ্ধিমত্তা খাটিয়ে বিভিন্ন প্রকার সৃষ্টির মত তোমাকে মনে করে। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, যারা তোমার সৃষ্ট কোন কিছুর সমান তোমাকে মনে করে এবং যারা তোমার সদৃশ বলে কোন কিছুকে গ্রহণ করে তারা তোমার সুস্পষ্ট বাণী ও প্রমাণাদি অনুযায়ী কাফের। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমিই আল্লাহ্ যাঁকে বুদ্ধির শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা যায় না যাতে কল্পনা দ্বারা তোমার অবস্থার পরিবর্তন স্বীকার করা যায় এবং মনের বেড়ি দিয়েও যাঁকে আবদ্ধ করা যায় না যাতে তোমাকে সীমাবদ্ধ করা যায়।

আল্লাহ্র সৃষ্টির পরিপূর্ণতা সম্পর্কে

তিনি তাঁর সৃষ্ট প্রত্যেক বস্তুর সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং সেই সীমাকে সুদৃঢ় করেছেন। তিনি তাঁর সৃষ্ট প্রত্যেক বস্তুর কর্মধারা নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং সেই কর্মধারাকে সহজসাধ্য করে দিয়েছেন। তিনি সকল বস্তুর গতিপথ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন এবং কোন বস্তু উহার অবস্থানের সীমালঙ্ঘন করে না এবং উহার লক্ষ্যের শেষ সীমায় পৌছাতে ব্যর্থ হয় না। তাঁর ইচ্ছায় চলার জন্য আদেশ করা হয়েছিল তখন উহারা আদেশ অমান্য করে নাই। যেখানে সব কিছু তাঁর ইচ্ছা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সেখানে কিভাবে উহারা আদেশ অমান্য করবে? তিনিই বিবিধ প্রকার জিনিস উৎপাদনকারী। এ বস্তুনিচয় সৃষ্টিতে তিনি কোন কল্পনা প্রয়োগ করেননি, কোন প্রকার গুপ্ত আবেগের বশবর্তী হননি, সময়ের উত্থান-পতন হতে কোন প্রকার অভিজ্ঞতা লাভ করেননি এবং কোন অংশীদারের সহায়তা গ্রহণ করার প্রয়োজন হয়নি।

এভাবে তাঁর হুকুমে সৃষ্টি সম্পন্ন হয়েছিল এবং সৃষ্টি তাঁর প্রতি আনুগত্যের নিদর্শন স্বরূপ সেজদা করেছিল ও তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়েছিল। কোন কুঁড়ের অলসতা বা কোন ওজর উত্থাপনকারীর সহজাত নিষ্ক্রিয়তা আনত হওয়া হতে বিরত করতে পারেনি। সুতরাং তিনি বস্তুর বক্রতা সোজা করলেন এবং তাদের সীমা নির্ধারণ করে দিলেন। তিনি নিজের ক্ষমতা বলে বস্তুর বিপরীতধর্মী অংশসমূহের মধ্যে সংহতির সৃষ্টি করলেন এবং একইমুখী উপাদানগুলো একত্রিত করলেন। অতঃপর তিনি উহাদেরকে বিবিধভাবে পৃথক করলেন যা সীমায়, পরিমাণে, বৈশিষ্ট্যে ও আকারে ভিন্ন ভিন্ন। এসকল হলো নতুন সৃষ্টি। তিনি উহাদেরকে দৃঢ় করলেন এবং তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী আকৃতি দান করলেন ও আবিষ্কার করলেন।

আকাশের বর্ণনা

তিনি আকাশের উন্মুক্ততার অবতল ও সমুন্নতি বিধান করেছেন। তিনি ইহার ফাটলসমূহের প্রশস্ততা সংযোগ করেছেন এবং একটির সাথে অপরটির জোড়া লাগিয়েছেন। আকাশের উচ্চতা তাদের আসা-যাওয়ার জন্য সহজ করে দিয়েছেন যারা তাঁর আদেশ নিয়ে নীচে নেমে আসে এবং বান্দার কর্মকান্ডের সংবাদ নিয়ে ওপরে যায়। তিনি বাষ্প আকারে থাকাকালে এটাকে আহ্বান করেছিলেন। তৎক্ষনাৎ এর জোড়াসমূহ সংযুক্ত হলো। এরপর আল্লাহ্ এর বন্ধ দরজা খুলে দিলেন এবং উল্কার প্রহরীকে এর ছিদ্রপথে রাখলেন এবং তাঁর কুদরতের হাতে উল্কাকে ধরে রাখলেন যেন উহারা অনন্ত শূন্যে বিক্ষিপ্ত না হয়।

তিনি আকাশকে আদেশ দিলেন তাঁর আদেশের প্রতি আনুগত্য দেখিয়ে স্থির থাকতে। তিনি সূর্যকে সৃষ্টি করলেন দিনে ঔজ্জল্যের নির্দেশক এবং চন্দ্রকে রাতের অন্ধকারের নির্দেশক হিসাবে। তৎপর তিনি উহাদেরকে কক্ষপথে স্থাপন করে গতি প্রদান করলেন এবং উহাদের চলার পথের বিভিন্ন পর্যায়ে গতিধারা নির্ধারিত করে দিলেন যাতে উহাদের সাহায্যে দিবা ও রাত্রি আলাদা করা যায় এবং বছরের গণনা উহাদের নির্ধারিত গতিধারা থেকে জানা যায়। তৎপর তিনি আকাশের অনন্ত বিস্তারের মধ্যে উজ্জ্বল, মুক্ত ও প্রদীপ সদৃশ তারকারাজি স্থাপন করলেন। যারা আড়িপাতে তাদের প্রতি উজ্জ্বল উল্কাপিন্ডের তীর নিক্ষেপ করলেন। তিনি তারকারাজিকে অনুগত করে রুটিন মাফিক গতিতে গতিমান করলেন এবং উহাদেরকে স্থির নক্ষত্র, চলমান নক্ষত্র, নিম্নগামী নক্ষত্র, উর্ধগামী নক্ষত্র, শুভাশুভ নির্ণয়ক নক্ষত্র ও সৌভাগ্য নির্ণয়ক নক্ষত্রে বিভক্ত করলেন।

ফেরেশতার বর্ণনা

তৎপর মহিমান্বিত আল্লাহ্ তাঁর আকাশে বসবাসের জন্য এবং তাঁর রাজ্যের উর্ধস্তরকে বসতিপূর্ণ করার জন্য মালাইকা নামক নতুন মাখলুক সৃষ্টি করলেন। এদের দ্বারা তিনি মহাশূন্যের প্রশস্ত রাস্তা পরিপূর্ণ করলেন এবং মহাশূন্যের বিশাল পরিধি তাদের দ্বারা বসতিপূর্ণ করলেন। এসব প্রশস্ত রাস্তার মধ্যবর্তী শূন্যস্থানে তাঁর তসবীহ পাঠরত মালাইকাগণের কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি হচ্ছে। এ তসবীহ তাঁর পবিত্রতার বেড়ার মধ্যে, গুপ্ত পর্দার অন্তরালে এবং তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের ঘোমটার মধ্যে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। এ কান-ফাটা প্রতিধ্বনির অন্তরালে রয়েছে নূরের তাজাল্লী যাতে দৃষ্টি পৌঁছার পূর্বেই তা প্রতিহত হয়ে যায়। ফলে দৃষ্টিশক্তি এর সীমাবদ্ধতায় হতভম্ব হয়ে থেমে থাকে।

তিনি তাদেরকে বিবিধ আকৃতি ও বৈশিষ্ট্যে সৃষ্টি করেছেন। তাদের পাখা আছে। তারা আল্লাহ্র ইজ্জতের মহিমার তসবীহ করে। এ বিশ্ব-চরাচর সৃষ্টিতে আল্লাহ্ যে নৈপুণ্য দেখিয়েছেন উহার কোন কিছু তাদের নিজেদের বলে তারা দাবি করে না। কোন কিছু সৃষ্টি করেছে বলেও তারা দাবি করে না। "তারা তো তাঁর সম্মানিত বান্দা যারা তাঁর আগ-বাড়িয়ে কথা বলে না এবং তারা তাঁর আদেশ অনুসারেই কাজ করে" (কুরআন-২১ঃ২৬-২৭)। তিনি তাদেরকে তাঁর অহির আমানতদার করেছেন এবং তাঁর আদেশ-নিষেধের ধারক ও বাহক স্বরূপ নবীগণের নিকট প্রেরণ করেছেন। তিনি তাদেরকে সংশয়ের বিরুদ্ধে অনাক্রমণ্য করেছেন। ফলে তাদের কেউ আল্লাহ্র সন্তুষ্টির পথ হতে বিপথে যায় না। তিনি তাদেরকে সকল প্রকার বিপদাপদ হতে মুক্ত করে দিয়েছেন এবং তাদের হৃদয়কে বিনম্রতা ও প্রশান্তিতে ভরপুর করে দিয়েছেন। তাঁর মহত্বের কাছে বিনয়াবনত হওয়ার সকল দরজা তিনি তাদের জন্য খুলে দিয়েছেন। তাঁর একত্বের নিদর্শন স্বরূপ তিনি তাদের জন্য উজ্জ্বল মিনার নির্ধারিত করেছেন। পাপের ভারে কখনো তারা ভারাক্রান্ত হয় না এবং রাত ও দিনের পরিবর্তন তাদেরকে নড়-চড় করায় না। সংশয়ের তীর কখনো তাদের ইমানের দৃঢ়তাকে আক্রমণ করতে পারে না। আশঙ্কা কখনো তাদের একীনের ভিত্তিকে আক্রমণ করতে পারে না। তাদের মধ্যে ঈর্ষার আগুন জ্বলে না। আল্লাহ্র মারেফাত সম্বন্ধে যে জ্ঞান তাদের হৃদয়ে রয়েছে এবং তাদের বক্ষে আল্লাহ্র যে মহত্ব ও আজমত স্থান পেয়েছে প্রচন্ড বিস্ময়ও তা ম্লান করে না। শয়তানের ওয়াছ-ওয়াছা (পাপ-চিন্তা) তাদেরকে স্পর্শ করে না এবং তাদের চিন্তায় কোন সন্দেহ প্রবেশ করতে পারে না।

তাদের মধ্যে এমন অনেক আছে যারা গভীর মেঘপুঞ্জে, উত্তুঙ্গ পর্বত শিখরে অথবা অপরিসীম অন্ধকারে অবস্থান করে এবং এমন অনেক আছে যাদের পা মাটির সর্বনিম্ন স্তর ভেদ করে পৌছেছে। এ পাগুলো শ্বেত-প্রতীক স্বরূপ যা বায়ুমন্ডল পার হয়ে গেছে। উহার নীচে হালকা বাতাস প্রবাহিত হয় এবং শেষ সীমার প্রতি তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ।

তাঁর ইবাদতে মশগুল থাকায় তারা সকল বিষয়-মুক্ত এবং ইমানের বাস্তবতা তাদের ও আল্লাহ্র মারেফাতের মধ্যে সংযোগ হিসাবে কাজ করে। তার প্রতি তাদের একীন তাদেরকে ধ্যানে নিমগ্ন রেখেছে। তারা শুধু তাঁর কাছেই প্রত্যাশা করে, অন্য কারো কাছে নয়। তারা তাঁর মারেফাতের স্বাদ পেয়েছে এবং তাঁর মহব্বতের তৃপ্তিকর পেয়ালা হতে তারা পান করেছে। তাদের হৃদয়ের গভীরে তাঁর ভয় শিকড় গেড়ে আছে। ফলতঃ তাঁর ইবাদত করতে করতে তারা তাদের সোজা পিঠ বাঁকা করে ফেলেছে। সুদীর্ঘ বিনম্রতা ও অতি নৈকট্য তাদের ভয়কে দূরীভূত করেনি।

তাদের অত্যধিক আমল সত্ত্বেও তারা কখনো মদমত্ত হয় না। আল্লাহ্র মহত্ত্বের সামনে তাদের বিনম্রতা কখনো তাদেরকে তাদের নিজের গুণের কথা ভাববার সময় দেয় না। অনন্তকাল ধরে ধ্যানমগ্ন থাকা সত্ত্বেও কোন অবসন্নতা তাদের স্পর্শ করে না। আল্লাহ্র কাছে তাদের আকাঙ্খা (তাঁকে পাবার) কখনো হ্রাস পায় না যাতে তারা তাদের প্রতিপালকের প্রতি নিরাশ হতে পারে। অবিরত জেকেরেও তাদের জিহ্বা শুকিয়ে যায় না। অন্য কোন দায়-দায়িত্বে তারা বিজড়িত হয় না যাতে তাঁর তসবীহ্ পাঠের উচ্চস্বর ক্ষীণ হতে পারে। ইবাদতের ভঙ্গির কারণে তাদের স্কন্দ কখনো স্থানচ্যুত হয় না। তারা কখনো তাঁর আদেশ অমান্য করে আরামের জন্য (এদিক সেদিক) ঘাড় নাড়ায় না। অবহেলার মূর্খতাবশতঃ তারা সংকল্প বিরোধী কাজ করে না এবং আকাঙ্খার প্রবঞ্চনা তাদের সাহসকে অতিক্রম করতে পারে না।

তারা আর্শের অধিপতিকে তাদের প্রয়োজনের দিনের মজুদ মনে করে। তাঁর প্রতি তাদের মহব্বতের কারণে তারা শুধু তাঁরই দিকে মুখ করে আছে। তারা তাঁর ইবাদতের শেষ সীমায় পৌছায়নি। তাঁর ইবাদতের জন্য তাদের আবেগপ্রবণ অনুরাগ তাদেরকে নিজেদের হৃদয়ের প্রস্রবন ছাড়া অন্য দিকে ফেরায় না। এ প্রস্রবন কখনো তাঁর আশা ও ভয়হীন হয় না। আল্লাহ্র ভয় কখনো তাদেরকে ত্যাগ করে না যাতে তারা তাদের প্রচেষ্টায় শিথীল হতে পারে। লোভ-লালসা কখনো তাদেরকে জড়াতে পারে না যাতে তারা স্বল্প অনুসন্ধানকে ইবাদতের ওপর অগ্রাধিকার দেবে।

তারা তাদের অতীত কর্মকান্ডকে বড় করে দেখে না, কারণ তা করলে আশা তাদের হৃদয় হতে ভয়কে মুছে ফেলতো। তাদের ওপর শয়তানের নিয়ন্ত্রণের ফলে তারা তাদের প্রতিপালক সম্বন্ধে পরস্পর মতবিরোধ করে না। একে অপর হতে বিচ্ছিন্নতার পাপ তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে না। অন্তরে সঞ্চিত বিদ্বেষ ও পারস্পরিক ঘৃণা তাদেরকে পরাভূত করে না। দোদুল্যমানতার পথ তাদেরকে বিভক্ত করে না। সাহসের মাত্রার ব্যবধান তাদেরকে অনৈক্যের মধ্যে নিপতিত করে না। এভাবে তারা ইমানের অনুরাগী। কোন প্রকার মনের বক্রতা বা বাড়াবাড়ি বা শৈথিল্য বা জড়তা তাদেরকে ইমানের রশিচ্যুত করে না। আকাশে সূঁচাগ্র স্থান নেই যেখানে কোন না কোন ফেরেশতা সেজদাবনত নেই বা আল্লাহ্র আদেশ দ্রুত পালনে ব্যস্ত নেই। তাদের প্রতিপালকের দীর্ঘ ইবাদত দ্বারা তারা তাদের জ্ঞান বৃদ্ধি করে এবং তাদের হৃদয়ে তাদের প্রতিপালকের সম্মান বৃদ্ধি পায়।

পৃথিবীর বর্ণনা

আল্লাহ্ পৃথিবীকে ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ ও উত্তাল উর্মিমালা এবং ফেঁপে উঠা সমুদ্রের ওপর বিস্তৃত করলেন। সমুদ্রের মধ্যে সুউচ্চ তরঙ্গমালা একে অপরের সাথে সংঘাত করতো এবং টগবগিয়ে একে অপরের ওপর গড়িয়ে পড়তো।

যৌন উত্তেজনার সময় উটের মুখ দিয়ে যেভাবে ফেনা বের হয় উর্মিমালা হতেও তদ্রুপ ফেনপুঞ্জ নির্গত হয়েছিল। সুতরাং পৃথিবীর ভারে ঝঞ্জাপূর্ণ পানির আলোড়ন প্রদমিত হলো। যখন পৃথিবী ইহার বুক দিয়ে চাপ দিল তখন শাঁ শাঁ করা আন্দোলন বন্ধ হলো। যখন পৃথিবী ইহার চড়াই উৎরাইসহ গড়িয়ে গেল পানি তখন শান্ত হয়ে গেল। এভাবে উত্তাল তরঙ্গের পর পানি পরাভূত ও অনুগত হলো এবং পরাজিত বন্দির মত অসম্মানের শিকলে বাঁধা পড়লো। অপরপক্ষে পৃথিবী নিজেকে বিস্তৃত করে বিক্ষুব্ধ পানির মধ্যে শক্ত হতে লাগলো। (এভাবে) পৃথিবী পানির দর্প, আত্মগর্ব, উচ্চ মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব চূর্ণ করে দিল এবং ইহার প্রবাহের নির্ভীকতাকে নিশ্চুপ করিয়ে দিল। ফলে পানি ঝঞ্জা-বিক্ষুব্ধ প্রবাহের পর চুপ হয়ে গেল এবং প্রবল আলোড়নের পর স্থির হয়ে গেল।

যখন পৃথিবী ও ইহার স্কন্ধে স্থাপিত সুউচ্চ পর্বতমালার চাপে পানির উত্তেজনা প্রদমিত হলো আল্লাহ্ তখন পর্বতের চূড়া থেকে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত করলেন। এ ঝর্ণাধারা সমতল প্রান্তর ও নীচু ভূমির মধ্য দিয়ে বন্টন করলেন এবং প্রোথিত পাথর ও উচু পর্বত দ্বারা প্রবাহকে পরিমিত করলেন। তৎপর পৃথিবীর উপরিভাগের বিভিন্ন স্থানে পর্বতমালা গেড়ে দেয়ার ফলে পৃথিবীর কম্পন থেমে গেল। তৎপর আল্লাহ্ পৃথিবী ও নভোমন্ডলের মধ্যে অসীমতা সৃষ্টি করলেন এবং পৃথিবীর অধিবাসীর জন্য প্রবাহিত বাতাস সৃষ্টি করলেন। তৎপর পৃথিবীর বাসিন্দাদেরকে সুবিধাজনক স্থানসমূহে ছড়িয়ে পড়তে নির্দেশ দিলেন। অতঃপর পৃথিবীর যে সকল অঞ্চলে ঝর্ণাধারা ও নদী প্রবাহিত হতে পারেনি, সেসব অঞ্চলকে তিনি অনুর্বর ফেলে রাখেননি। সে সব অঞ্চলের জন্য তিনি ভাসমান মেঘ সৃষ্টি করলেন, যা অনুৎপাদনশীল অঞ্চলকে জীবিত করে সজীবতা আনয়ন করেছে।

তিনি খন্ড খন্ড ছোট মেঘকে জড়ো করে প্রকান্ড মেঘ তৈরী করলেন এবং মেঘের মধ্যে জলকণা জমে মেঘ হতে যখন বিদ্যুৎ চমকাতে শুরু করে তখন তিনি উহাকে প্রবল বৃষ্টিপাত রূপে প্রেরণ করলেন। মেঘ পৃথিবীর দিকে ঝুলতেছিল এবং দক্ষিণা বাতাস মেঘকে চারদিক থেকে পেষণ করে ইহার পানি ঝরিয়েছিল যেমন করে উষ্ট্রী দুধ দোহনের জন্য পেছনের দিক বাঁকা করে দেয়। যখন মেঘ নিজেকে আনত করে বাহিত সমুদয় পানি বর্ষণ করলো তখন আল্লাহ্ সমতল ভূমিতে উদ্ভিদ ও পর্বতে লতাপাতা জন্মালেন। ফলে পৃথিবী উদ্যান সুশোভিত হয়ে আনন্দদায়ক হলো এবং নরম উদ্ভিদের সজীব পোষাক ও ফুলের অলঙ্কারে চমক লাগিয়ে দিল। আল্লাহ্ এসব কিছু মানুষ ও পশুর খাদ্য হিসাবে তৈরী করলেন। আল্লাহ্ পৃথিবীর বিস্তীর্ণ স্থানে রাজপথ খুলে দিয়েছেন এবং যারা রাজপথে চলে তাদের জন্য হেদায়েতের মিনার প্রতিষ্ঠা করেছেন।

মানুষ সৃষ্টি ও নবী প্রেরণ সম্পর্কে

যখন তিনি পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছেন এবং তাঁর আদেশ কার্যকরী করেছেন তখন তিনি আদমকে তাঁর সৃষ্টির মধ্যে সর্বোত্তম হিসাবে পছন্দ করেছেন এবং তাকে সকল সৃষ্টির প্রথম হবার গৌরব দান করেছেন। তিনি তাঁকে বেহেশ্‌তে বসবাস করতে দিলেন এবং তথায় তার খাবার ব্যবস্থা করলেন এবং যা তার জন্য নিষিদ্ধ করেছিলেন তিনি তাও নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। তিনি তাকে বললেন যে, ইহার প্রতি অগ্রসর হওয়া অবাধ্যতার সামিল এবং তাতে তার নিজের মর্যাদা বিপজ্জনক হবে। কিন্তু আদমকে যা হতে বিরত থাকতে বলা হয়েছিল তিনি তা করে বসলেন, যা আল্লাহ্‌র জ্ঞানে ধরা ছিল। ফলে তার তওবা কবুল করার পর আল্লাহ্ তাকে প্রেরণ করলেন এবং তার বংশধর দ্বারা আল্লাহ্‌র পৃথিবী জনবসতিপূর্ণ হলো যারা সৃষ্টির মধ্যে তাঁর অস্তিত্বের প্রমাণ ও ওজর হিসাবে বিরাজিত।

এমন কি আল্লাহ্ যখন আদমের মৃত্যু ঘটালেন তখনো তিনি তাদের মাঝে তাঁর খোদাত্বের প্রমাণ ও ওজর পরিবেশনকারী না দিয়ে ছাড়েননি যারা মানুষ ও আল্লাহ্‌র জ্ঞানের মধ্যে সংযোগ হিসাবে কাজ করেছে। কিন্তু তিনি তাঁর মনোনীত নবীর মাধ্যমে তাদের কাছে প্রমাণাদি প্রেরণ করেছেন যাঁরা ছিলেন তাঁর বাণীর বিশ্বস্ত বাহক এবং

যুগের পর যুগ এ ধারা চলে আসছিলো। নবী মোহাম্মদ (সঃ) এর আগমনে এ ধারা শেষ হলো এবং আল্লাহ্‌র ওজর ও সতর্কাদেশ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছে গেল।

তিনি জীবিকার[৩] প্রতুলতা ও অপ্রতুলতা নির্ধারণ করে দিলেন। তিনি তাদের কাউকে অল্প আবার কাউকে অপরিমিত জীবিকা বন্টন করে দিলেন। তিনি ন্যায় বিচারের সাথে এরূপ করলেন মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য। কাউকে প্রাচুর্য দিয়ে আবার কাউকে নিঃস্ব করার মাধ্যমে তিনি ধনী ও দরিদ্রের কৃতজ্ঞতা ও সহিষ্ণুতা পরীক্ষা করলেন। তৎপর তিনি প্রাচুর্যের সাথে দুর্ভাগ্য, নিরাপত্তার সাথে দুর্যোগের ঘনঘটা ও ভোগের আনন্দের সাথে শোকের বেদনা একত্রে জুড়ে দিলেন। তিনি বয়ঃসীমা নির্ধারিত করে দিলেন এবং এটা কারো জন্য দীর্ঘ, কারো জন্য স্বল্প, কারো জন্য আগে ও কারো জন্য পরে করলেন এবং মৃত্যুর সাথে তাদের পরিসমাপ্তি ঘটালেন। বয়সের দড়ি টেনে ছিঁড়ে ফেলার ক্ষমতা তিনি মৃত্যুকে দিলেন।

যারা গোপন করে তাদের গুপ্ত বিষয়, যারা গোপন আলাপে লিপ্ত তাদের গুপ্ত আলোচনা, যারা অনুমানের ওপর নির্ভর করে তাদের বাতেন অনুভূতি, সুনির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী, চোখের ইঙ্গিত-ইশারা, হৃদয়ের গভীরে যাকিছু এবং অজানা বিষয়ের গভীরে যা নিহিত আছে—এ সব কিছু তিনি [৪] জানেন। কানের ছিদ্র বাঁকা করে যা শুনতে হয় তা, পিপীলিকার গ্রীষ্মকালীন আশ্রয়, কীট-পতঙ্গের শীতকালীন আবাস, শোকাহত নারীর কান্নার প্রতিধ্বনি ও পদক্ষেপের শব্দ—এসব কিছুও তিনি জানেন। পাতার অভ্যন্তরের শীষ যেখানে ফল জন্মে, পশুর লুকাবার স্থান যেমন পর্বত ও উপত্যকার গুহা, বৃক্ষের কান্ডের গর্ত ও তৃণ-গুল্ম যেখানে মশা লুক্কায়িত থাকে, বৃক্ষের শাখার যে স্থানে পাতা গজায়, কটি দেশের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত বীর্যের ফোটার পতন স্থান, ক্ষুদ্র মেঘ খন্ড ও বিশাল মেঘমালা, ঘন মেঘে বৃষ্টির ফোটা, দমকা বাতাসে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণা, বৃষ্টি-বন্যা দ্বারা মুছে যাওয়া রেখাসমূহ, বালিরাশির ওপর কীট-পতঙ্গের চলাফেরা, পর্বতের গহ্বরে পাখা-ওয়ালা প্রাণীর বাসা এবং ডিম পাড়ার স্থানে পাখীর কুজন-এসব কিছুই তিনি জানেন।

মুক্তার মাতা যা কিছু সঞ্চিত রেখেছে, মহাসমুদ্রের তরঙ্গমালার নীচে যা কিছু আছে, রাত্রির অন্ধকারে যা লুক্কায়িত আছে, দিনের আলোয় যা প্রতিভাত হয়, যাতে কখনো রাতের অন্ধকার আবার কখনো দিনের আলো বিরাজ করে, প্রতিটি পদক্ষেপের চিহ্ন, প্রতিটি নড়চড়ের অনুভূতি, প্রতিটি ধ্বনির প্রতিধ্বনি, প্রতিটি ঠোটের নড়চড়, প্রতিটি জীবের আবাস স্থল, প্রতিটি অণুর ওজন, হৃদযন্ত্রের প্রতিটি স্পন্দন এবং পৃথিবীর উপরিভাগে যা কিছু আছে যেমন গাছের ফল অথবা ঝরে-পড়া পাতা অথবা বীর্য জমা হবার স্থান অথবা রক্তের জমাট বাঁধন অথবা মাংশপিন্ড এবং জীবন ও ভ্রূণে উন্নীত হওয়া—এসব কিছু তিনি জানেন।

এত সব কিছু সত্ত্বেও তাঁকে কোন অসুবিধা ভোগ করতে হয় না এবং তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তা সংরক্ষণে কোন প্রতিবন্ধকতা তাকে প্রতিহত করতে পারে না। তাঁর আদেশ বলবৎকরণে ও সমগ্র সৃষ্টির ব্যবস্থাপনায় কোন প্রকার অবসন্নতা বা শোক বাধার সৃষ্টি করতে পারে না। তাঁর জ্ঞান সমগ্র সৃষ্টিকে ঘিরে আছে এবং সব কিছুই তাঁর গণনার মধ্যে রয়েছে। সব কিছুই তাঁর বিচারাধীন এবং তিনি যা প্রাপ্য তা প্রদানে ব্যর্থতা সত্ত্বেও তাঁর রহমত তাদের ঘিরে আছে।

হে আমার আল্লাহ্! সকল সুন্দর বর্ণনা ও সর্বোচ্চ গুণগান তোমারই প্রাপ্য। যদি কিছু কাম্য থাকে তবে তুমিই সর্বোত্তম কাম্য। যদি কিছু আশা করার থাকে তবে তুমিই সর্বোত্তম সম্মানিত সত্তা যার কাছে আশা করা যায়। হে আমার আল্লাহ্! তুমি আমাকে এমন ক্ষমতা দান করেছো যদ্দারা তুমি ব্যতীত অন্য কারো প্রশংসা আমি করি না এবং তুমি ব্যতীত অন্য কারো জন্য আমার কোন প্রশংসাত্মক উক্তি নেই। আমার প্রশংসাকে কখনো তাদের দিকে পরিচালিত করিনা যারা হতাশার উৎস ও সন্দেহের কেন্দ্রবিন্দু। মানুষকে প্রশংসা করা ও সৃষ্টির গুণকীর্তন করা হতে

তুমি আমার জিহ্বাকে বিরত রেখেছো। হে আমার আল্লাহ্! প্রত্যেক প্রশংসাকারী, যাকে সে প্রশংসা করে তার কাছ থেকে, পুরস্কার ও বিনিময় পাওয়ার অধিকার আছে। নিশ্চয়ই, আমি তোমার দিকে মুখ ফিরিয়েছি এবং আমার চোখ তোমার দয়া ও ক্ষমার ভান্ডারের দিকে তাকিয়ে আছে।

হে আমার আল্লাহ্! সে ব্যক্তি এখানে দাঁড়িয়ে আছে (অর্থাৎ আমি) যে তোমাকে এক ও একক মনে করেছে এবং তুমি ব্যতীত অন্য কাউকে প্রশংসা ও গুণকীর্তন পাওয়ার যোগ্য মনে করে না। তোমার কাছে আমার চাহিদা তোমার দয়া ছাড়া অন্য কিছু নয়; তোমার দয়ার চরম দারিদ্র তুমি ঘুচিয়ে দাও। সুতরাং এ স্থানে তোমার ইচ্ছাকে আমাদের জন্য মঞ্জুর কর এবং তুমি ছাড়া অন্য কারো কাছে হাত পাতা হতে তুমি আমাদেরকে রক্ষা করো । "নিশ্চয়ই, তুমি সকল বস্তুর ওপর ক্ষমতাবান" (কুরআন-৬৬ঃ৮)।

১। এ খোৎবাটির নামকরণ করা হয়েছে "খোৎবাতুল আশবাহ"। আশবাহ শব্দটি শাবাহ শব্দের বহুবচন এবং শাবাহ শব্দের অর্থ হলো কঙ্কাল। যেহেতু এ খোৎবায় আল্লাহ্র গুণাবলী, কুদরত ও সৃষ্টি বর্ণিত হয়েছে, যা কারো পক্ষে বর্ণনা করে শেষ করা সম্ভব নয়, সেহেতু একে কঙ্কাল বলা হয়েছে। কুরআন সাক্ষ্য দেয় পৃথিবীর সমুদয় জলরাশি কালি হলে এবং সকল বৃক্ষ-গাছ-পালা কলম হলেও আল্লাহ্র গুণরাজী লিখে শেষ করা যাবে না। কাজেই এ খোৎবাকে 'কঙ্কাল' বলা যুক্তিযুক্ত।

প্রশ্নকারীর ওপর আমিরুল মোমেনিন রাগান্বিত হবার কারণ হলো, তার অনুরোধ শরিয়তের গন্ডির বাইরে এবং এহেন বর্ণনা মানুষের ক্ষমতার সীমা বহির্ভূত।

২। আল্লাহ্ জীবিকার নিশ্চয়তাদানকারী ও ব্যবস্থাপক। তিনি বলেছেনঃ

ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী সকলের জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহ্রই (কুরআন-১১ঃ৬)। কিন্তু তিনি জীবিকার নিশ্চয়তাদানকারী অর্থ হলো যে, তিনি প্রত্যেকের জন্য জীবিকা উপার্জনের পথ করে দিয়েছেন এবং প্রত্যেককে বনে, পর্বতে, খনিতে, নদীতে ও বিশাল পৃথিবীতে জীবিকা মঞ্জুর করেছেন। তিনি প্রত্যেককে তাঁর নেয়ামত ভোগ করার অধিকার দিয়েছেন। না তাঁর নেয়ামত কোন ব্যক্তি বিশেষের জন্য নির্ধারিত, আর না তাঁর খাদ্য উপাদানের দরজা কারো জন্য বন্ধ। আল্লাহ্ বলেনঃ

> *তোমার প্রতিপালক তাঁর নেয়ামত দ্বারা এদেরকে ও ওদেরকে সাহায্য করেন এবং তোমার প্রতিপালকের নেয়ামত অবারিত (কুরআন-১৭ঃ২০)।*

যদি কোন ব্যক্তি অলসতা ও আরাম-আয়েশের কারণে নিঃচেষ্ট হয়ে বসে থাকে তবে জীবিকা কখনো তাঁর দরজায় পৌছাবে না। আল্লাহ্ বিবিধ খাদ্য সামগ্রী ছড়িয়ে রেখেছেন কিন্তু এগুলো পেতে হলে হস্ত-পদ সঞ্চালন করা প্রয়োজন। তিনি সমুদ্রের তলদেশে মুক্তা সঞ্চিত রেখেছেন কিন্তু এগুলো পেতে হলে ডুব দিতে হবে। তিনি পর্বতকে চুনি ও মূল্যবান পাথর দ্বারা পরিপূর্ণ করেছেন কিন্তু খনন করা ছাড়া এগুলো পাওয়া যায় না। তিনি ফসল ফলানোর সকল প্রকার উপাদন মাটিতে দান করেছেন কিন্তু বীজ বপন না করলে এসব উপাদানের সুফল ভোগ করা যায় না। খাদ্যদ্রব্য পৃথিবীর চতুর্দিকে ছড়িয়ে আছে কিন্তু ভ্রমণের কষ্ট স্বীকার না করলে এসব খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করা যায় না। আল্লাহ্ বলেন ঃ

> *অতএব তোমরা দিক-দিগন্তে বিচরণ কর এবং তাঁর প্রদত্ত জীবনোপকরণ হতে আহার্য গ্রহণ কর (কুরআন-৬৭ঃ১৫)।*

আল্লাহ্ জীবিকা দানকারী। এর অর্থ এ নয় যে, জীবিকা অন্বেষণের জন্য কোন চেষ্টার প্রয়োজন নেই বা ঘরের বের হবার প্রয়োজন নেই; জীবিকা নিজের থেকেই অনুসন্ধানকারীর কাছে হাজির হবে। তিনি জীবিকা দানকারী অর্থ হলো, তিনি মাটিকে উৎপাদনের সকল গুণাগুণ দান করেছেন, অঙ্কুরিত হবার জন্য বৃষ্টি দিয়েছেন, শস্য-কণা, ফল-ফলাদি ও শাক-সব্জী সৃষ্টি করেছেন। এসব কিছুই আল্লাহ্ প্রদত্ত কিন্তু এগুলো সংগ্রহ করা মানুষের চেষ্টার সাথে সম্পৃক্ত। যে কেউ সাগ্রহের চেষ্টা করবে সে তার চেষ্টার ফল পাবে, আর যে চেষ্টা করা হতে বিরত থাকবে সে তার অলসতার ফল ভোগ করবে। আল্লাহ্ বলেন ঃ

> *মানুষ চেষ্টা ছাড়া কিছুই পায় না (কুরআন-৫৩ঃ৩৯)*

বিশ্বের সকল মানুষ একটি প্রবাদের শৃঙ্খলে বাঁধা; প্রবাদটি হলো, "যেমন কর্ম তেমন ফল।" বপন না করে অঙ্কুরের আশা বা চেষ্টা ছাড়া ফলাফলের আশা করা একটা ভ্রম। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেয়া হয়েছে কর্মঠ রাখার জন্য। আল্লাহ্ মরিয়মকে সম্বোধন করে বলেন ঃ

তুমি তোমার দিকে খেজুর গাছের কান্ডে নাড়া দাও, ইহা তোমার ওপর সুপক্ক তাজা খেজুর ফেলবে।

তখন আহার কর, পান কর ও চক্ষু শীতল কর (কুরআন ১৯ঃ২৫-২৬)

আল্লাহ্ মরিয়মের জীবিকার সংস্থান করেছিলেন। কিন্তু তিনি খেজুর পেড়ে তার হাতে তুলে দেননি। তিনি গাছকে সবুজ রেখে খেজুর উৎপাদন করার ব্যবস্থা করেছেন এবং সেই খেজুর সুপক্ক হবার ব্যবস্থাও করেছেন। কিন্তু যখন খেজুর পাড়ার প্রয়োজন হলো তখন আর হস্তক্ষেপ না করে মরিয়মকে তার কাজ মনে করিয়ে দিলেন অর্থাৎ তার হস্তদ্বয় সঞ্চালন করে খাদ্যের ব্যবস্থা করা।

আবার, আল্লাহ্ জীবিকার সংস্থান করেন বলতে যদি এটা বুঝায় যে, যাকিছু দেয়া হয়েছে ও গৃহীত হয়েছে এবং মানুষ যাকিছু উপার্জন ও আহার করে উহা আল্লাহ্ হতে প্রাপ্ত তাহলে হালাল ও হারামের প্রশ্ন থাকে না। চুরি, ডাকাতি, ঘুষ, নিপীড়ন, লুট—যেভাবে পাওয়া যাক না কেন তা আল্লাহ্‌র কাজ এবং অন্যায়ভাবে প্রাপ্ত বস্তু আল্লাহ্‌র সংস্থান বলে বুঝা যাবে। এতে মানুষের ইচ্ছার কোন স্বাধীনতা নেই বলেই মনে করা হবে। আসলে তা নয়। যেহেতু প্রতিটি কাজে হালাল ও হারামের প্রশ্ন জড়িত সেহেতু কর্মে মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা রয়েছে। সকল সম্ভাবনা আল্লাহ্ কর্তৃক চালিত কিন্তু সেই সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করা মানুষের দায়িত্ব ও ইচ্ছাধীন। এ বাস্তবায়নে হালাল ও হারামের প্রশ্ন জড়িত। হালাল উপায়ে বাস্তবায়ন অনুমোদিত এবং হারাম উপায়ে বাস্তবায়ন পাপে জড়িত যার জন্য জবাবদিহি হতে হবে। ভ্রূণ যখন মায়ের গর্ভে থাকে তখন তার প্রয়োজন মত খাদ্য আল্লাহ্ তাকে পৌঁছে দিচ্ছেন। কিন্তু এ ভ্রূণ যখন পৃথিবীর আলোতে আসে তখন তার ঠোঁট দিয়ে না চুষলে খাদ্য পায় না। আবার বয়স হলে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ব্যবহার না করলে খাদ্য যোগাড় করতে পারে না। কাজেই খাদ্যের সংস্থান আল্লাহ্ করে রেখেছেন। মানুষকে নিজের চেষ্টা দ্বারা হালাল কর্মের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সংস্থানকে কাজে লাগিয়ে খাদ্যের ব্যবস্থা করতে হয়। খাদ্য আপনা আপনি মানুষের হাতে এসে পৌঁছায় না।

৩। এ বিশ্বের কর্মকান্ড ব্যবস্থাপনার সাথে আল্লাহ্ কর্মের কারণকে সম্পৃক্ত করেছেন যার ফলে মানুষের কর্মক্ষমতা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে না। একইভাবে তিনি মানুষের কর্মকে তাঁর মহান ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল করেছেন যাতে করে মানুষ স্রষ্টাকে ভুলে গিয়ে নিজের কর্মক্ষমতার ওপর নির্ভর না করে। মানুষের ইচ্ছা স্বাধীন, না কি আল্লাহ্‌র ইচ্ছাধীন—এ বিতর্কের মূল ইস্যু এটাই। সমগ্র বিশ্বচরাচরে প্রকৃতির বিধান যেভাবে কাজ করছে, ঠিক সেভাবেই খাদ্য উৎপাদন ও বন্টন মানুষের তকদীর ও চেষ্টা এ দ্বৈত শক্তি দ্বারা পরিচালিত এবং মানুষের চেষ্টা ও ভাগ্যলিপি অনুপাতেই এটা কোথাও বেশী কোথাও কম হয়ে থাকে। যেহেতু তিনি জীবিকার উপায়-উপকরণ সমূহের স্রষ্টা এবং তিনিই জীবিকা অন্বেষণের ক্ষমতা দান করেছেন সেহেতু জীবিকার স্বল্পতা বা প্রাচুর্য উভয়ই তাঁর দ্বারা হচ্ছে বলে গণ্য করা হয়। কারণ মানুষের চেষ্টা ও কর্মের পরিমাণ এবং মঙ্গল বিবেচনা করে তিনি প্রত্যেকের জন্য আলাদাভাবে জীবিকার পরিমাণ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। ফলে কোথাও দুর্ভিক্ষ, কোথাও সমৃদ্ধি আবার কোথাও দুঃখ-দুর্দশা, কোথাও আরাম-আয়েশ এবং কেউ মহানন্দে উপভোগরত আবার কেউ অভাব অনটনে জর্জরিত। আল্লাহ্ বলেন ঃ

তিনি যার প্রতি ইচ্ছা রিয্‌ক বর্ধিত করেন অথবা সঙ্কুচিত করেন। তিনি সর্ব বিষয়ে সবিশেষ অবহিত (কুরআন-৪২ঃ১২)।

এ বিষয়টি আমিরুল মোমেনিন ২৩ নং খোৎবায় উল্লেখ করে বলেছেন, "প্রত্যেকের ভাগে যা লিপিবদ্ধ আছে তা আকাশ থেকে মাটিতে নেমে আসে। এটা বৃষ্টির ফোটার মত বেশী বা কম হয়ে থাকে।" বৃষ্টি দানের একটা নির্দিষ্ট নিয়ম ও পদ্ধতি রয়েছে, যেমন- সমুদ্রের বাষ্প জলকণাসহ উঠে এসে ঘনকালো মেঘরূপে ছড়িয়ে পড়ে এবং তৎপর উহা হতে পানি ফোটা হয়ে চুইয়ে পড়ে। এ বৃষ্টি সমতল ভূমি ও উঁচু এলাকাকে ভিজিয়ে চাষোপযোগী করে এবং নীচু এলাকার দিকে এগিয়ে গিয়ে জমে থাকে যাতে তৃষ্ণার্ত পান করতে পারে, প্রাণীকুল ব্যবহার করতে পারে এবং শুষ্ক ভূমিতে দেয়া যায়। একইভাবে

আল্লাহ্ জীবিকার সকল উপায়-উপকরণ দান করেছেন কিন্তু তাঁর দান একটা বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ করে যা বিন্দুমাত্রও ব্যতিক্রম হয় না। আল্লাহ্ বলেনঃ

আমাদেরই হাতে রয়েছে প্রত্যেক বস্তুর ভান্ডার এবং আমরা উহা পরিজ্ঞাত পরিমাণেই দিয়ে থাকি (কুরআন-১৫ঃ২১)।

ধন-সম্পদের প্রাচুর্যের কারণে মানুষের লোভ-লালসা যখন সীমালঙ্ঘন করে তখন মানুষ আল্লাহ্কে ভুলে যায় এবং আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধ অমান্য করে ধ্বংসের পথে চলে যায় যেমন করে অতি-বৃষ্টি ফসল উৎপাদনের পরিবর্তে বিনষ্ট করে ফেলে। ফলে আল্লাহ্ বলেন ঃ

আল্লাহ্ তাঁর সকল বান্দাকে জীবনোপকরণের প্রাচুর্য দিলে তারা পৃথিবীতে অবশ্যই বিপর্যয় সৃষ্টি করতো, কিন্তু তিনি তাঁর ইচ্ছামত পরিমাণেই উহা দিয়ে থাকেন। তিনি তাঁর বান্দাগণকে সম্যক জানেন ও দেখেন (কুরআন- ৪২ঃ২৭)।

বৃষ্টি না হলে যেভাবে মাটি অনুর্বর হয়ে পড়ে এবং প্রাণীকুল বিরান হয়ে যায় তদ্রূপ জীবিকার উপায়-উপকরণ প্রদান বন্ধ করে দিলে মানব সমাজ বিলীন হয়ে যাবে। আল্লাহ্ বলেন ঃ

এমন কে আছে, যে তোমাদেরকে জীবনোপকরণ দান করবে, তিনি যদি জীবনোপকরণ বন্ধ করে দেন? (কুরআন-৬৭ঃ২১)

(এই খোৎবার টীকা ২ ও ৩-এ জীবনোপকরণ বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অদৃষ্টবাদ ও ইচ্ছার স্বাধীনতাবাদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা হয়েছে। এ বিষয় দু'টি ধর্ম-দর্শনে খুবই বিতর্কিত। ইসলামের অনেক পূর্ব হতেই দার্শনিকগণ এ বিতর্কের অবতারণা করেছেন। মুসলিম দার্শনিকগণ এ বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। বিষয়টি এত বিতর্কিত যে, কোন দু'জন দার্শনিক একটি সিদ্ধান্ত দিতে পারেননি। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে হলে মোঃ সোলায়মান আলী সরকারের "ইবনুল আরাবী ও জালালুদ্দীন রুমী" এবং আমিনুল ইসলামের "জগৎ জীবন দর্শন' গ্রন্থদ্বয়ের যথাক্রমে পৃষ্ঠা ৩০৪-৩৩৬ ও পৃষ্ঠা ২৮০-২৯০ দেখার জন্য সুহৃদয় পাঠককে অনুরোধ করা হলো—বাংলা অনুবাদক)।

৪। আমিরুল মোমেনিন যে বাগ্মীতার সাথে আল্লাহ্র জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন এবং যে সব মহত্বপূর্ণ শব্দ দ্বারা আল্লাহ্র জ্ঞান চিত্রায়িত করেছেন তাতে যে কোন মৃত-হৃদয় সম্পন্ন বিরোধী ব্যক্তিও মোহিত হয়ে যায়। হাদীদ[১৫২] (৭ম খন্ড, পৃঃ ২৩-২৫) লিখেছেনঃ

এরিষ্টটল বিশ্বাস করতো আল্লাহ্ বিশ্বচরাচর সম্বন্ধে অবহিত কিন্তু তা বিশদভাবে নয়। যদি সে আমিরুল মোমেনিনের এ খোৎবা শুনতো তবে তার হৃদয়ও অনুরক্ত হতো, তার চুল দাঁড়িয়ে যেতো এবং তার চিন্তায় নাটকীয় পরিবর্তন আসতো। তোমরা কি খোৎবাটির ঔজ্জ্বল্য, শক্তিমান গতি, প্রচন্ডতা, মহিমা, মহত্ব, ঐকান্তিকতা ও পূর্ণতা দেখতে পাও না? এসব বৈশিষ্ট্য ছাড়াও এতে রয়েছে মাধুর্য, স্পষ্টতা, কোমলতা ও সুসমতা। আমি এর সমকক্ষ কোন বক্তব্য আর কোনদিন শুনিনি। অবশ্য এর সমতুল্য কোন বক্তব্য যদি থাকে তবে তা শুধু আল্লাহ্র। আমিরুল মোমনিনের এহেন বক্তব্যে বিস্ময়ের কিছু নেই কারণ তিনি ইব্রাহীমের (আঃ) প্রশাখা, একই নদীর প্রবাহ এবং একই নূরের প্রতিবিম্ব।

যারা মনে করে আল্লাহ্ শুধু সার্বিক জ্ঞান রাখেন তাদের যুক্তি হলো কোন কিছু বিশদ জানতে হলে পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে হয়। যদি এ কথা বিশ্বাস করা হয় যে, বিশদ পরিবর্তনীয় জ্ঞান তাঁর আছে তা হলে শর্ত হয়ে দাড়ায়, তাঁর জ্ঞানে পরিবর্তন অত্যাবশ্যকীয়। কিন্তু তাঁর জ্ঞান তাঁর সত্তাসারের অনুরূপ। কাজেই জ্ঞানে পরিবর্তন হলে তাঁর সত্তাসারও পরিবর্তনের বিষয়। এতে তাঁর চিরন্তনতার বৈশিষ্ট্য হারিয়ে যায়। এটা অত্যন্ত ভ্রান্তিমূলক যুক্তি কারণ জ্ঞানের বিষয়বস্তুর পরিবর্তন তখনই জ্ঞাতার পরিবর্তন আনতে পারে যখন মনে করা হয় যে, জ্ঞাতা পরিবর্তনের বিষয়ে পূর্বাহ্নে অবহিত নহে। কিন্তু সকল প্রকার পরিবর্তন আল্লাহ্ সম্যক অবহিত এবং তাঁর সামনে সকল পরিবর্তন স্ফটিকের মত স্বচ্ছ সেহেতু জ্ঞানের বিষয়ের পরিবর্তনে তিনিও পরিবর্তনীয় হতে পারেন না। প্রকৃতপক্ষে এ পরিবর্তন জ্ঞানের বিষয়ে সীমাবদ্ধ এবং এ পরিবর্তন জ্ঞানকে প্রভাবিত করে না।

★★★★★

খোৎবা-৯১

উসমানের হত্যার পর যখন জনগণ আমিরুল মোমেনিনের হাতে বায়াত[১] গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তখন তিনি বলেন ঃ

আমাকে ছাড়ো, অন্য কারো অনুসন্ধান কর। আমরা একটা বিষয়ের মুখোমুখী হচ্ছি যার বিবিধ দিক ও রঙ রয়েছে, যা হৃদয় সহ্য করতে পারে না এবং বুদ্ধিমত্তা গ্রহণ করতে পারে না। আকাশে মেঘ ভাসছে এবং সঠিক পথ নির্ণয় করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে। তোমাদের জানা দরকার যে, যদি আমি তোমাদের কথায় সাড়া দেই তবে আমি যা জানি সেভাবেই তোমাদের পরিচালনা করবো এবং অন্যে কি বলবে বা দোষারোপকারীর নিন্দার পরোয়া আমি করবো না। যদি তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও তবে আমি তোমাদের একজনের মতই হব। তোমাদের কর্মকান্ডের ভার অন্য কাউকে দিলে আমিও তাকে মেনে চলবো এবং তার কথা শ্রবণ করবো। আমি তোমাদের প্রধান হওয়া অপেক্ষা উপদেষ্টা হওয়াকে অধিকতর ভাল মনে করি।

১। উসমান নিহত হলে খলিফা পদ শূন্য হয়ে পড়ে। তখন মুসলিমগণ আলীর শান্তিপূর্ণ আচরণ, নীতির প্রতি দৃঢ়তা ও রাজনৈতিক নিরপেক্ষতার কথা চিন্তা করে তাঁর হাতে বায়াত গ্রহণ করার জন্য এমনভাবে ছুটে আসতে লাগলো যেন পথ-হারা পথিক দূরে কোন নিশানা দেখে সে দিকে ছুটে যায়। তাবারী [৭৫] (১ম খন্ড, পৃঃ ৩০৬৬, ৩০৬৭, ৩০৭৬) লিখেছেনঃ

> *জনতা আমিরুল মোমেনিনের ওপর চাপ প্রয়োগ করে বললো, "আমরা আপনার হাতে বয়াত গ্রহণ করতে চাই এবং আপনি দেখুন ইসলাম আজ কত বিপদের সম্মুখীন; এ অবস্থায় আমরা কিভাবে রাসুলের নিকট আত্মীয় সম্পর্কে নির্লিপ্ত থাকতে পারি।"*

কিন্তু আমিরুল মোমেনিন কিছুতেই জনতার অনুরোধে রাজী হচ্ছিলেন না। এতে জনগণ হৈ চৈ আরম্ভ করে দিল এবং চিৎকার দিয়ে বলতে লাগলো, "হে আবুল হাসান, ইসলাম ধ্বংসের দিকে যাচ্ছে তা কি আপনি দেখেন না? বলগাহীনতা আর ফেতনার বন্যা কিভাবে এগিয়ে আসছে তা কি আপনি দেখেন না? আপনার কি আল্লাহ্‌র ভয় নেই।" এতদসত্ত্বেও আমিরুল মোমেনিন তাদের প্রস্তাবে রাজী হননি কারণ তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে, রাসুলের ইনতিকালের পর হতে যে হাল-চাল মানুষের হৃদয়-মন ঘিরে ফেলেছে তা ঠিক করা দুরূহ ব্যাপার। স্বার্থপরতা ও ক্ষমতার লোভ তাদের মধ্যে শিকড় গেড়ে বসেছিল। তাদের সকল ধ্যান-ধারণা বস্তুবাদে জড়িয়ে পড়েছিল এবং সরকারকে ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার উপায় বলে মনে করতো। এ সব লোক এখন আবার ঐশী খেলাফত বাস্তবায়ন করতে চায় এবং খেলাফত নিয়ে খেলা করতে চায়। বিদ্যমান অবস্থায় তাদের মানসিকতা ও প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটানো অসম্ভব ছিল। এ ছাড়াও তিনি তাদেরকে বিষয়টির ওপর আরো অধিক চিন্তা–ভাবনা করার সুযোগ দিয়েছেন যাতে ভবিষ্যতে তাদের বস্তু-স্বার্থে আঘাত লাগলে তারা বলতে না পারে যে, খেলাফত বিষয়ে তারা যথাযথ চিন্তা করার সুযোগ পায়নি। প্রথম খেলাফত সম্বন্ধে উমরের ধারণা তার নিম্নের বিবৃতিতেই প্রকাশ পেয়েছে ঃ

> *আবু বকরের খেলাফত চিন্তা-ভাবনা না করেই প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল কিন্তু আল্লাহ্ ইহার ফেতনা থেকে আমাদেরকে রক্ষা করেছেন। যদি কেউ এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি করে, তোমরা তাকে হত্যা করো। (বুখারী[১০২], ৮ম খন্ড, পৃঃ ২১০-২২১; হাম্বল[১৬০], ১ম খন্ড, পৃঃ ৫৫; তাবারী[৭৫], ১ম খন্ড, পৃঃ ১৮২২; কাছীর[৩৯], ৫ম খন্ড, পৃঃ ২৪৬; আছীর[২], ২য় খন্ড, পৃঃ ৩২৭; হিশাম[১৬৯], ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ৩০৮-৩০৯)*

যখন জনগণের চাপ সীমাতিরিক্ত হয়ে পড়েছিল তখন আমিরুল মোমেনিন এ খোৎবা প্রদান করেন। এতে তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন, "যদি তোমরা তোমাদের দুনিয়াদারির স্বার্থসিদ্ধির জন্য আমাকে চাও তবে জেনে রাখো, আমি তোমাদের যন্ত্রের মত কাজ করতে প্রস্তুত নই। তোমরা আমাকে বাদ দিয়ে এমন কাউকে মনোনীত কর যে তোমাদের স্বার্থ রক্ষা করতে পারবে। যদি তোমরা অন্য কাউকে মনোনীত করো তবে আমি শান্তিপ্রিয় নাগরিকের মত রাষ্ট্রের আইন ও

সংবিধান মেনে চলবো। তোমরা আমার অতীত জীবন দেখেছো। আমি কুরআন ও সুন্নাহ্ ছাড়া আর কিছু অনুসরণ করতে প্রস্তুত নই। ক্ষমতার লোভে আমার সে নীতি পরিত্যাগ করতে পারবো না। তোমরা অন্য কাউকে মনোনীত করলে আমি কখনো বিদ্রোহের প্রেরণা দিয়ে মুসলিমদের অস্তিত্ব বিনষ্ট করবো না। কিন্তু আমাকে মনোনীত করলে তা ঘটবে। তোমাদের সার্বিক মঙ্গল বিবেচনা করেই আমি তোমাদেরকে সঠিক উপদেশ দিয়েছি—আমার অনিচ্ছার কারণে এ পরামর্শ দেইনি। যদি তোমরা আমাকে মনোনীত না কর তবে তোমাদের দুনিয়াদারির জন্য তা ভাল হবে। কারণ আমার হাতে ক্ষমতা না থাকলে আমি তোমাদেরকে দুনিয়ামুখী কর্মকান্ডে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারবো না। যা হোক, যদি তোমরা আমার হাতে বায়াত গ্রহণ করতে দৃঢ় সংকল্প হয়ে থাক তাহলে মনে রেখো, তোমরা আমার প্রতি বিরাগ দেখাও আর আমার বিরুদ্ধে সমালোচনা কর আমি উহার তোয়াক্কা না করে তোমাদেরকে ন্যায়পথে পরিচালিত করতে প্রয়োজনে বল প্রয়োগ করবো। ন্যায়ের ব্যাপারে কোন কিছুর সাথে আমার আপোষ নেই। এরপরও যদি তোমরা বায়াত গ্রহণ করতে চাও তবে তোমাদের ইচ্ছা পূরণ করতে পার।"

এসব লোক সম্পর্কে আমিরুল মোমেনিনের ধারণা পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ হতে সঠিক বলেই প্রমাণিত হয়েছিল। প্রকৃত পক্ষে যারা দুনিয়াদারির উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য বায়াত গ্রহণ করেছিল তারা যখন পরে দেখলো যে, তাদের লক্ষ্য অর্জিত হচ্ছে না তখন তারা ভিত্তিহীন ও ছুতা-নাতা কারণ দেখিয়ে তার সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল।

★★★★★

খোৎবা-৯২

খারিজীদের ধ্বংস ও উমাইয়াদের ফেতনা সম্পর্কে[১]

প্রতিষ্ঠিত প্রশংসা ও সকল প্রশংসাত্মক উক্তি আল্লাহ্‌র। হে লোকসকল, আমি ফেতনা-ফ্যাসাদের চোখ উৎপাটন করে ফেলেছি। আমি ব্যতীত আর কেউ এ কাজের দিকে অগ্রসর হয়নি। অথচ ফেতনার অন্ধকারচ্ছন্নতা বৃদ্ধি পাচ্ছিল এবং ইহার উন্মাদনাও চরমে পৌছেছিল। আমাকে[২] হারাবার আগেই যা খুশী জিজ্ঞেস কর। যাঁর হাতে আমার প্রাণ সেই আল্লাহ্‌র কসম, এখন থেকে শেষ বিচারের দিনের মধ্যবর্তী সময়ের যা কিছু তোমরা জিজ্ঞেস করবে তা আমি বলে দিতে পারবো। আমি তোমাদেরকে বলে দিতে পারবো কোন্ দল শত শত লোককে হেদায়েতের পথ দেখাবে আর কোন্ দল শত শত লোককে বিপথে পরিচালিত করবে। আমি তোমাদেরকে আরো বলে দিতে পারবো যে,মানুষের বিপথগামীতার অগ্রযাত্রা কে ঘোষণা করছে, কে এর অগ্রভাগে রয়েছে, কে এর পেছন থেকে প্রেরণা যোগাচ্ছে, কোথায় এর বাহন পশুগুলো বিশ্রামের জন্য থামবে, কোথায় এর সর্বশেষ অবস্থান এবং তাদের মধ্যে কে নিহত হবে ও কে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করবে।

যখন আমি মরে যাব তখন তোমাদের ওপর খুব কঠিন অবস্থা ও দুঃখজনক ঘটনাবলী আপতিত হবে। তখন প্রশ্ন করার মত মর্যাদাসম্পন্ন অনেক ব্যক্তি নীচের দিকে চোখ রেখে চুপ করে থাকবে এবং উত্তর দেয়ার মত মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিরা সাহস হারিয়ে ফেলবে। এটা এমন এক সময়ে ঘটবে যখন সকল প্রকার দুঃখ-দুর্দশা ও অভাব-অনটনের সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহ তোমাদের ওপর নেমে আসবে। সেই সময় তোমাদের এত কঠিন অবস্থা হবে যে, দুঃখ-দুর্দশার কারণে তোমাদের মনে হবে যেন দিন ফুরায় না। তোমাদের মধ্যে যারা মোত্তাকী তাদেরকে আল্লাহ্ জয়ী করা পর্যন্ত এ অবস্থা বিরাজ করবে।

যখন ফেতনা শুরু হয় তখন ন্যায়ের সাথে অন্যায় এমনভাবে তালগোল পাকিয়ে ফেলে যে, মানুষ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে এবং যখন ফেতনা অপসৃত হয় তখন উহা একটা সতর্কাদেশ রেখে যায়। অভিগমনের

সময় ফেতনাকে চেনা যায় না। কিন্তু প্রত্যাবর্তনের সময় উহাকে স্পষ্ট চেনা যায়। ইহা এমনভাবে প্রবাহিত হয় যেমন প্রবাহমান বাতাস কোন কোন শহরে আঘাত হানে আবার কোন কোন শহর বাদ পড়ে।

সাবধান, আমার মতে তোমাদের জন্য সবচাইতে ভয়ঙ্কর ফেতনা হলো উমাইয়াদের ফেতনা, কারণ ইহা অন্ধ এবং অন্ধকারাচ্ছন্নতাও সৃষ্টি করে। ইহার প্রভাব অতি সাধারণ হলেও ইহার কুফল বিশেষ বিশেষ লোকদের ওপর পড়বে। এ ফেতনার মধ্যে যারা স্বচ্ছ-দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি তারা দুঃখ-দুর্দশায় নিপতিত হবে এবং যারা চোখ বুঁজে থাকবে তাদেরকে দুঃখ দুর্দশা পোহাতে হবে না। আল্লাহ্র কসম, আমার পরে তোমাদের জন্য বনি উমাইয়াকে নিকৃষ্টতম দেখতে পাবে। তারা হবে অবাধ্য উষ্ট্রীর মত যে সামনে গেলে কামড় দেয় ও সম্মুখের পা দিয়ে আঘাত করে এবং পেছনে গেলে লাথি মারে ও দুধ দোহন করতে দেয় না। তারা তোমাদের ওপর আপতিত হয়ে শুধু তাদেরকেই ছেড়ে দেবে যাদের দ্বারা উপকৃত হবে এবং যাদের দ্বারা তাদের ক্ষতি হবে না। তারা তোমাদেরকে ক্রীতদাসের মত মনে করবে এবং তাদের অত্যাচার-অবিচার ততক্ষণ পর্যন্ত চলবে যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা তাদের আজ্ঞানুবর্তী হও এবং তাদের নেতৃত্ব মেনে নিয়ে তাদের সাহায্য-সহায়তার মুখাপেক্ষী হও।

তাদের ফেতনা-ফ্যাসাদ তোমাদের কাছে এমনভাবে আসবে যা দেখতে কুদৃশ্য ও ভয়ানক এবং আইয়ামে জাহেলিয়ার লোকদের চাল-চলনের মত যাতে না আছে কোন হেদায়েতের চিহ্ন আর না আছে (উহা হতে) মুক্তির কোন লক্ষণ। আমরা আহলুল বাইত-এর সদস্যগণ এসব ফেতনা হতে মুক্ত এবং আমরা তাদের অর্ন্তভুক্ত নই যারা ফেতনা জন্ম দেয়। অতঃপর আল্লাহ্ তোমাদের ওপর হতে এসব ফেতনা-ফ্যাসাদ দূরীভূত করবেন যেমন করে মাংশ হতে চামড়া ছড়ানো হয়। এ কাজ এমন ব্যক্তির মাধ্যমে করবেন যে তাদেরকে হীন করে ছাড়বে, তাদের ঘাড় ধরে হেঁচড়িয়ে নিয়ে যাবে, তাদেরকে পূর্ণ পেয়ালা (দুঃখ-দুর্দশার) পান করাবে, তরবারি ছাড়া অন্য কিছু তাদের প্রতি প্রসারিত করবে না এবং আতঙ্ক ছাড়া অন্য কোন পোশাক পরাবে না। সে সময় কুরাইশগণ পৃথিবীর সব কিছুর বিনিময়ে হলেও একটিবার উট জবাই করার সময় টুকুর জন্য আমাকে পেতে চাইবে এ জন্য যে, আজ তারা আমাকে যা হতে বঞ্চিত করে রেখেছে তা যেন আমি গ্রহণ করি।

১। নাহ্রাওয়ানের যুদ্ধের পর আমিরুল মোমেনিন এ খোৎবাটি প্রদান করেছিলেন। এখানে ফেতনা বলতে জামাল, সিফ্ফিন ও নাহ্রাওয়ানের যুদ্ধকে বুঝানো হয়েছে। কারণ রাসুলের সময়ের যুদ্ধের সাথে এ যুদ্ধগুলোর প্রভেদ রয়েছে। রাসুলের সময়ের যুদ্ধের বিরুদ্ধ পক্ষ ছিল কাফের কিন্তু আলী ইবনে আবি তালিবের সাথে যারা যুদ্ধ করেছিল তাদের মুখে ইসলামের অবগুণ্ঠন ছিল এবং তারা মুসলিম বলে সমাজে পরিচিত ছিল। ফলে মানুষ মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে ইতস্ততঃ করতো এবং বলতো কেন তারা এমন লোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে যারা আজান দেয় ও নামাজ আদায় করে। এ যুক্তি দেখিয়ে খুজায়মাহ্ ইবনে ছাবিত আল-আনসারী সিফফিনের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি এবং আম্মার ইবনে ইয়াসির শহীদ হবার পূর্ব পর্যন্ত তাকে বুঝানো সম্ভব হয়নি যে, বিরুদ্ধ দল প্রকৃতপক্ষেই বিদ্রোহী। একইভাবে তালহা ও জুবায়রসহ অনেক সাহাবা জামালের যুদ্ধে আয়শার পক্ষে থাকায় এবং নাহ্রাওয়ানের যুদ্ধে খারিজীদের কপালে সেজদার কালো দাগ থাকায় আমিরুল মোমেনিনের পক্ষের লোকদের মনে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল। এমতাবস্থায় যারা আমিরুল মোমেনিনের বিপক্ষের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে সাহস করেছিল তারা ওদের হৃদয়ের গুপ্ত বিষয় ও ইমানের বাস্তবতা সম্পর্কে অবহিত ছিল। আমিরুল মোমেনিনের উপলব্ধি ও আত্মিক সাহসের বৈশিষ্ট্য এটাই যে, তিনি তাদের মদমত্ত শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন এবং তাতে রাসুলের বাণী সঠিক প্রমাণিত হলো। রাসুল বলেছিলেনঃ

> *আমার পরে তোমাকে বায়াত ভঙ্গকারী (জামালের লোকেরা), অত্যাচারী (সিরিয়ার লোকেরা) ও ধর্মত্যাগীদের (খারিজীগণ) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। (নায়সাবুরী[৮৪], ৩য় খন্ড, পৃঃ ১৩৯-১৪০; শাফেয়ী[১২১], ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃঃ ১৮; বার[৯৭], ৩য় খন্ড, পৃঃ ১১১৭; আছীর[১], ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ৩২-৩৩; বাগদাদী[৯৪], ৮ম খন্ড, পৃঃ ৩৪০; ১৩শ খন্ড, পৃঃ ১৮৬-১৮৭; আসাকীর[২৬], ৫ম খন্ড, পৃঃ ৪১; কাছীর[৩৯],*

৭ম খন্ড, পৃঃ ৩০৪-৩০৬, শাফী[১২৮], ৭ম খন্ড, পৃঃ ২৩৮; ৯ম খন্ড, পৃঃ ২৩৫; জুরকানী[৭১], ৩য় খন্ড, পৃঃ ৩১৬-৩১৭; হিন্দি[১৬৭], ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃঃ ৭২, ৮২, ৮৮, ১৫৫, ৩১৯, ৩৯১, ৩৯২; ৮ম খন্ড, পৃঃ ২১৫)

(আমিরুল মোমেনিন খেলাফত গ্রহণের পর হতেই তাঁর বিরুদ্ধে বনি উমাইয়া, রাসুলের কতিপয় সাহাবা (?) ও খারেজীগণ আদাজল খেয়ে লেগেছিল। ঐতিহাসিকভাবে হাশেমী গোত্রের সাথে উমাইয়াদের পূর্ব শক্রতা এর কারণ বলা হলেও আরো অনেক আধ্যাত্মিক কারণ রয়েছে। কেন আলী কারো দ্বারা আকর্ষিত ও কারো কাছে বিকর্ষিত হয়েছিল সে বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য অধ্যাপক আয়াতুল্লাহ্ মুর্তাজা মোতাহারীর "আলীর আকর্ষণ ও বিকর্ষণ" পুস্তকখানা পড়ার জন্য সহৃদয় পাঠককে অনুরোধ করা হলো—বাংলা অনুবাদক)

২। রাসুলের (সঃ) পর আমিরুল মোমেনিন ব্যতীত সাহাবাদের মধ্যে আর কেউ এমন চ্যালেঞ্জ করেনি যে, তোমাদের যা কিছু জানতে ইচ্ছা হয় আমাকে জিজ্ঞেস করো। তবে সাহাবা নয় এমন কয়েকজনের নাম ইতিহাসে পাওয়া যায় যারা এরূপ চ্যালেঞ্জ করেছিল। তারা হলো ইব্রাহীম ইবনে হিশাম আল-মখযুমী, মুকাতিল ইবনে সুলায়মান, কাতাদাহ্ ইবনে দিয়ামাহ্, আবদার রহমান ইবনে জাওজী এবং মুহাম্মদ ইবনে ইদ্রিছ আশ-শাফী। এরা সকলেই এহেন চ্যালেঞ্জ করে দারুণভাবে অপমানিত হয়েছিল এবং চ্যালেঞ্জ ফিরিয়ে নিতে তারা বাধ্য হয়েছিল। এ ধরনের চ্যালেঞ্জ শুধুমাত্র তিনিই করতে পারেন যিনি বিশ্বচরাচরের বাস্তবতা ও ভবিষ্যতের ঘটনা প্রবাহ অনুধাবন করতে পারেন। আমিরুল মোমেনিন ছিলেন রাসুলের (সঃ) জ্ঞান-নগরের দরজা এবং তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি কোন দিন কারো কোন প্রশ্নের জবাব দিতে অসমর্থ হন নি। এমনকি খলিফা উমরও বলেছেন, "আলীকে যখন পাওয়া যেত না তখন কোন সমস্যা দেখা দিলে উহার সমাধানের জন্য আমি আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করতাম।" একইভাবে আমিরুল মোমেনিনের ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হয়েছিল যা তাঁর গভীর জ্ঞানের নির্দেশক। বনি উমাইয়ার ধ্বংস কি খারিজীদের উত্থান-পতন কি তাতারদের যুদ্ধ ও ধ্বংসযজ্ঞ কি ইংরেজদের আক্রমণ কি বসরার বন্যা কি কুফার ধ্বংস প্রতিটি ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবে রূপ নিয়েছিল। (বার[৯৮], ১ম খন্ড, পৃঃ ৫৮; বার[৯৭], ৩য় খন্ড, পৃঃ ১১০৩; আছীর[১], ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ২২; হাদীদ[১৫২], ৭ম খন্ড, পৃঃ ৪৬; সুয়ুতী[১৪৭], পৃঃ ১৭১; হায়তামী[১৬৬], পৃঃ ৭৬)

★★★★★

খোৎবা-৯৩

নবীগণের প্রশংসা

মহিমান্বিত আল্লাহ্ যাঁর সান্নিধ্যে কোন দুঃসাহসী পৌঁছুতে পারে না এবং কোন প্রকার বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা তাকে দেখতে পারে না। তিনি এমন প্রথম যাঁর কোন শেষ সীমা নেই যে সীমারেখার মধ্যে তাঁকে আবদ্ধ করা যায়। তাঁর কোন শেষ নেই যেখানে তিনি সমাপ্ত হতে পারেন।

আল্লাহ্ নবীগণকে জমা করে রেখেছিলেন জমা করার সর্বোৎকৃষ্ট স্থানে এবং তাদেরকে থাকতে দিয়েছিলেন থাকার জন্য সর্বোৎকৃষ্ট স্থানে। তিনি তাদেরকে সম্মানিত পূর্ব-পুরুষগণের উত্তরাধিকারিত্বে গর্ভাশয়সমূহ শুদ্ধ ও সংশোধনার্থে প্রেরণ করেছিলেন। যখনই তাদের মধ্য হতে একজন পূর্বসূরীর মৃত্যু হতো তার অনুবর্তী আরেকজন আল্লাহ্‌র দ্বীনের জন্য উঠে দাঁড়িয়ে যেতো।

মুহাম্মদের (সঃ) আগমনের পূর্ব পর্যন্ত মহিমান্বিত আল্লাহ্ এ ব্যবস্থা চালু রেখেছিলেন। আল্লাহ্ তাঁকে বিশিষ্টতম মূলোৎস ও গাছ লাগানোর সর্বোৎকৃষ্ট স্থান হতে বের করে আনলেন। যে সাজারাহ হতে তিনি অন্যান্য

নবী বের করে এনেছিলেন এবং যে সাজারাহ হতে তিনি তাঁর আমানতদার মনোনীত করেছিলেন সেই সাজারাহ হতেই তিনি মুহাম্মদকে এনেছিলেন। মুহাম্মদের অধঃস্তন (ইত্‌রাহ) বংশধরগণ সর্বোত্তম বংশধর, তাঁর জ্ঞাতিগণ সর্বোত্তম এবং তাঁর সাজারাহ সর্বোত্তম সাজারাহ। এ সাজারাহ সুনামের মধ্যে জন্মেছিল এবং বৈশিষ্ট্যের মধ্যে বৃদ্ধি পেয়েছিল। ইহার শাখাসমূহ সুউচ্চ এবং ফল নাগালের বাইরে (অর্থাৎ কেউ সমকক্ষ হওয়ার যোগ্য নয়)।

তিনি তাদের সকলের ইমাম (নেতা) যারা (আল্লাহ্‌র) ভয় অনুশীলন করে এবং তাদের জন্য আলোকবর্তিকা যারা হেদায়েত গ্রহণ করে। তিনি একটা প্রদীপ যার শিখা জ্বলছে, একটা উল্কা যার আলো উজ্জ্বল এবং একটা চকমকি পাথর যার ঝলক উজ্জ্বল। তাঁর আচরণ ন্যায়নিষ্ঠ, তাঁর সুন্নাত পথ নির্দেশক, তাঁর বক্তব্য সিদ্ধান্তমূলক এবং তাঁর সিদ্ধান্ত ন্যায়ের প্রতীক। পূর্ববর্তী নবীগণ হতে দীর্ঘদিনের বিরতির পর আল্লাহ্ তাঁকে প্রেরণ করেছেন যখন মানুষ আমলের ভুল-ভ্রান্তি ও অজ্ঞতায় নিপতিত হয়েছিল। তোমাদের ওপর রহমত স্বরূপ আল্লাহ্ তাকে প্রেরণ করেছেন।

আল্লাহ্‌র রহমত তোমাদের ওপর বর্ষিত হোক। সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী অনুযায়ী আমল কর, কারণ পথ আলোকিত যা তোমাদেরকে শান্তি ও নিরাপত্তার ঘরের দিকে আহবান করছে। তোমরা এমন স্থানে আছো যেখানে আল্লাহ্‌র রহমত অনুসন্ধানের সময় ও সুযোগ তোমাদের আছে। এখন বই (তোমাদের কর্মকান্ড লিপিবদ্ধ করার) খোলা আছে, কলম (ফেরেশতার) ব্যস্ত (আমল রেকর্ড করতে) আছে, শরীর সুস্থ আছে, জিহ্বায় জড়তা নেই, তওবা কবুল হয় এবং আমল মঞ্জুরী প্রাপ্ত হয়।

★★★★★

খোৎবা-৯৪

নবুয়ত প্রকাশকালে মানুষের অবস্থা সম্পর্কে

আল্লাহ্ এমন এক সময় রাসুলকে (সঃ) প্রেরণ করেছিলেন যখন মানুষ জটিল অবস্থার মধ্যে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিলো এবং যত্রতত্র ফেতনার মধ্যে ঘোরাঘুরি করতেছিলো। কামনা-বাসনায় তাদের পদস্খলন হয়েছিল এবং আত্মগর্বে তারা উদ্ধত ছিল। চরম অজ্ঞতা তাদেরকে মুর্খ করে রেখেছিলো। অস্থিরতা ও অজ্ঞতার কুফলে তারা বিভ্রান্ত ছিল। তৎপর রাসুল (সঃ) তাঁর সাধ্যমত তাদেরকে আন্তরিক উপদেশ দিলেন এবং তিনি নিজে ন্যায়পথে থেকে তাদেরকে প্রজ্ঞা ও সৎ পরামর্শের দিকে আহ্বান করলেন।

★★★★★

খোৎবা-৯৫

রাসুলের (সঃ) প্রশংসা

প্রতিষ্ঠিত প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি এমন প্রথম যে, তাঁর আগে কিছুই ছিল না এবং এমন শেষ যে, তাঁর পরে কিছুই নেই। তিনি এমন সুস্পষ্ট যে, তাঁর ওপরে কিছুই নেই এবং এমন গুপ্ত যে, তাঁর চেয়ে নিকটতর আর কিছুই নেই।

রাসুলের (সঃ) অবস্থানস্থল সর্বোত্তম স্থান এবং তাঁর মূলোৎস হলো সব চাইতে মহৎ-সম্মানের আকর ও নিরাপত্তার ক্রোড়। নেককারগণ তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়েছে এবং তাদের আঁখি তাঁর দিকে নিবদ্ধ হয়েছে। তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ্ পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ দাফন করলেন এবং বিদ্রোহের শিখা নির্বাপিত করলেন। তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ্ তাদের মধ্যে ভ্রাতৃসুলভ ভালবাসা দিলেন এবং যারা ঐক্যবদ্ধ (কুফরীতে) ছিল তাদেরকে বিভেদ করলেন। তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ্ নীচদের সম্মানের পাত্র করলেন এবং (কুফরের) সম্মানকে হেনস্থা করলেন। তাঁর কথা সুস্পষ্ট এবং তাঁর নিশ্চুপতা গভীর বাণীবহ।

★★★★★

খোৎবা-৯৬

নিজের অনুচরদেরকে ভর্ৎসনা[১]

যদিও আল্লাহ্ অত্যাচারীকে সময় দিয়ে থাকেন তাঁর ধরা থেকে সে কখনো নিষ্কৃতি পাবে না। আল্লাহ্ তার চলার পথ ও উহার শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখেন।

সাবধান, যাঁর হাতে আমার জীবন সেই আল্লাহ্‌র কসম, এসব লোক (মুয়াবিয়া ও তার লোক-লস্কর) তোমাদেরকে পর্যুদস্ত করবে। এটা এ জন্য নয় যে, তাদের অধিকার তোমাদের চেয়ে অধিকতর; বরং এটা এ জন্য যে, তারা তাদের নেতার সাথে অন্যায়ের দিকে দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে এবং তোমরা মন্থর গতিতে আমার ন্যায়পথ অনুসরণ করছো। মানুষ শাসকের অত্যাচারের ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে; আর আমি আমার প্রজাদের অত্যাচারকে ভয় করি।

আমি তোমাদেরকে জিহাদে আহ্বান করেছিলাম কিন্তু তোমরা এলে না। আমি তোমাদেরকে সতর্ক করেছিলাম কিন্তু তোমরা শুনলে না। আমি তোমাদেরকে গোপনে ও প্রকাশ্যে আহ্বান করেছিলাম কিন্তু তোমরা সাড়া দিলে না। আমি তোমাদেরকে আন্তরিক উপদেশ দিয়েছিলাম কিন্তু তোমরা তা গ্রহণ করলে না। তোমরা কি উপস্থিত থেকেও অনুপস্থিত এবং স্বাধীন হয়েও ক্রীতদাস? আমি তোমাদের সম্মুখে প্রজ্ঞার কথা বলি কিন্তু তোমরা তা হতে মুখ ফিরিয়ে নাও। আমি তোমাদেরকে সুদূর প্রসারি উপদেশ দেই কিন্তু তোমরা তা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাও। বিদ্রোহী লোকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্য আমি তোমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করি কিন্তু আমার বক্তব্য শেষ হবার আগেই সাবার[২] পুত্রগণের মত তোমরা সরে পড়। তোমরা তোমাদের জায়গায় ফিরে গিয়ে একে অপরকে পরামর্শ দ্বারা প্রতারণা কর। আমি সকাল বেলায় তোমাদেরকে সোজা করি কিন্তু বিকেল বেলায় তোমরা ধনুকের পিঠের মত বাঁকা হয়ে আমার কাছে আস। আমি তোমাদেরকে সোজা করতে গিয়ে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছি আর তোমরাও অশোধনীয় হয়ে পড়েছো।

হে সেসব লোক যাদের দেহ এখানে উপস্থিত কিন্তু মন-মানসিকতা অনুপস্থিত ও যাদের আকাঙ্খা বিক্ষিপ্ত, তোমরা শোন, তাদের শাসকগণ ফেতনা-ফ্যাসাদে লিপ্ত আর তোমাদের নেতা আল্লাহ্‌র অনুগত, কিন্তু তোমরা তার অবাধ্য। অপরপক্ষে সিরিয়দের নেতা আল্লাহ্‌র অবাধ্য কিন্তু তারা নেতার অনুগত। আল্লাহ্‌র কসম, দিনারের সাথে দেরহাম বিনিময়ের মত মুয়াবিয়া যদি তোমাদের দশজনকে নিয়ে তদ্বিনিময়ে তার একজন আমাকে দিত আমি তাতেই সন্তুষ্ট হতাম।

হে কুফাবাসীগণ, তোমাদের নিকট হতে আমি পাঁচটি জিনিসের অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। এ গুলো হলো— কান থাকা সত্ত্বেও তোমরা বধির, কথা বলার শক্তি থাকা সত্ত্বেও তোমরা বোবা, চোখ থাকা সত্ত্বেও তোমরা অন্ধ,

যুদ্ধে তোমরা খাঁটি সমর্থক নও এবং বিপদে তোমরা নির্ভরযোগ্য ভ্রাতা নও। তোমাদের হাত মাটি দ্বারা ময়লাযুক্ত হোক (অর্থাৎ তোমরা অপমানিত ও লজ্জিত হও)। ওহে, তোমাদের উদাহরণ হলো চালকবিহীন উটের পালের মত যাদের একদিক হতে জড়ো করলে অন্যদিকে ছড়িয়ে যায়। আল্লাহ্‌র কসম, আমি দিব্য দৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি যে, যদি পুরাদমে যুদ্ধ বাধে তবে তোমরা আবি তালিবের পুত্রকে ছেড়ে এমনভাবে দৌড়ে পালাবে যেভাবে সম্মুখভাগ উলঙ্গ হওয়া মেয়েলোক পালায়। নিশ্চয়ই, আমি আমার প্রভু হতে প্রাপ্ত সুস্পষ্ট হেদায়েতের ওপর ও আমার রাসুলের নির্দেশিত পথে আছি এবং আমি ন্যায়ের ওপর আছি যা আমি প্রতিনিয়ত মনে করি।

আহলুল বাইত সম্পর্কে

রাসুলের আহলুল বাইতের দিকে তাকিয়ে দেখ। তাদের নির্দেশ মেনে চলো। তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করো কারণ তারা কখনো তোমাদেরকে হেদায়েতের পথ ছাড়া অন্যদিকে নিয়ে যাবে না এবং কখনো তোমাদেরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেবে না। যদি তারা বসে তোমরাও বসে পড়ো এবং যদি তারা দাঁড়ায় তোমরাও দাঁড়িয়ে যেয়ো। তাদের পুরোগামী হয়ো না, তাতে তোমরা বিপথগামী হয়ে যাবে এবং তাদের থেকে পিছিয়ে পড়ো না, তাতে তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে।

আমি রাসুলের সাহাবীদের দেখেছি কিন্তু তোমাদের মাঝে তাদের মত কাউকে দেখি না। তাদের দিন শুরু হতো চুল ও মুখে ধুলো-বালি নিয়ে (অর্থাৎ অত্যন্ত দুঃখ-কষ্টের মধ্যে) এবং তারা রাত কাটাতেন সেজদায় ও দাঁড়ানো অবস্থায় ইবাদতে। কখনো কপাল এবং কখনো গাল তারা মাটিতে রাখতেন। মনে হতো কেয়ামতের কথা চিন্তা করে তারা যেন জ্বলন্ত কয়লার ওপর দাঁড়িয়ে আছে। দীর্ঘক্ষণ সেজদায় পড়ে থাকতে থাকতে তাদের কপালের মাঝখানে ছাগলের হাঁটুর মত কালো দাগ পড়ে গেছে। যখন আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারিত হতো তখন তাদের চোখ দিয়ে এত অশ্রু ঝরতো যে, তাদের শার্টের কলার ভিজে যেতো। শাস্তির ভয়ে ও পুরস্কারের আশায় তারা এমনভাবে কাঁপতো যেন ঝড়ো হাওয়ায় বৃক্ষ কাঁপে।

১। রাসুলের (সঃ) ইনতিকালে অব্যবহিত পরে যে অবস্থার সৃষ্টি করা হয়েছিল তাতে আহলুল বাইতের নিঃসঙ্গ হওয়া ছাড়া আর কোন গত্যন্তর ছিল না। ফলে পৃথিবীর মানুষ তাদের প্রকৃত বৈশিষ্ট্যমূলক গুণাবলী এবং শিক্ষা ও সিদ্ধি সম্পর্কে অনবহিত ও অপরিচিত রয়ে গেল। তাদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করা ও সকল প্রকার কর্তৃত্ব হতে দূরে সরিয়ে রাখাকে ইসলামের মহাসেবা বলে মনে করা হতো। যদি উসমানের প্রকাশ্য অপকর্মগুলো মুসলিমদেরকে জেগে ওঠার ও চোখ খোলার সুযোগ করে না দিত তবে আমিরুল মোমেনিনের হাতে বায়াত গ্রহণ করার কোন প্রশ্ন উঠতো না এবং সেক্ষেত্রে পার্থিব কর্তৃত্ব যেমন ছিল তেমনই থেকে যেতো। কর্তৃত্ব গ্রহণের জন্য যাদের নাম করা যায় তারা নিজেদের দোষত্রুটির কারণে এগিয়ে আসতে সাহস করেনি। অপরপক্ষে মুয়াবিয়া কেন্দ্র হতে বহু দূরবর্তী সিরিয়ায় ছিল। এমতাবস্থায় কর্তৃত্ব অর্পণের জন্য আমিরুল মোমেনিন ব্যতীত আর কেউ ছিল না যার কথা বিবেচনা করা যায়। ফলতঃ জনগণের চোখ আমিরুল মোমেনিনকে ঘিরে ধরলো। এসব লোক বাতাসের অনুকূলে চলতে অভ্যস্ত। এরাই সেসব লোক যারা অন্যান্যদের হাতেও বায়াত গ্রহণ করেছিলো। এখন আবার আমিরুল মোমেনিনের হাতে বায়াত গ্রহণ করার জন্য লাফিয়ে উঠেছে। এতদসত্ত্বেও তারা এ কথা মনে করে আমিরুল মোমেনিনের হাতে বায়াত গ্রহণ করেনি যে, তিনি একজন ইমাম যাঁকে মেনে চলা বাধ্যতামূলক এবং তাঁর খেলাফত আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে। বরং এ বায়াত ছিল তাদের নিজস্ব নিয়ম-নীতি প্রসূত যাকে গণতান্ত্রিক বা পরামর্শদায়ক বলা হতো। যা হোক একদল লোক ছিল যারা তাঁর হাতে বায়াত গ্রহণ করাকে ধর্মীয় বাধ্যতামূলক দায়িত্ব হিসাবে মনে করতো এবং তাঁর খেলাফতকে আল্লাহ্ কর্তৃক স্থিরিকৃত মনে করতো। কিন্তু অধিকাংশ লোক তাঁকে অন্যান্য খলিফার মত একজন শাসক মনে করে অগ্রগণ্যতার ক্রমানুসারে তাঁর জন্য চতুর্থ স্থান নির্ধারণ করেছিলো। যেহেতু জনগণ,

সৈন্যবাহিনী ও সরকারী কর্মচারীগণ পূর্ববর্তী শাসকদের বিশ্বাস ও কর্মদ্বারা প্রভাবিত ছিল সেহেতু উহার বিপরীত ও তাদের পছন্দের বিপরীত কিছু দেখলেই তারা ক্রোধ ও অধীরতা প্রকাশ করতো, ভ্রূ-কুটি করতো, যুদ্ধ এড়িয়ে যেতো, এমন কি বিদ্রোহ করতেও প্রস্তুত হতো। তদুপরি যারা আমিরুল মোমেনিনের সামনে হাজির হয়েছিল তাদের মধ্যে দুনিয়ার সুযোগ-সুবিধা অন্বেষণকারীর অভাব ছিল না। এসব লোক বাহ্যিকভাবে আমিরুল মোমেনিনের সঙ্গে ছিল কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তারা মুয়াবিয়ার সাথে সংশ্রব রাখতো এবং মুয়াবিয়া তাদের কাউকে কাউকে সরকারী উচ্চপদ ও অন্যদেরকে ধন-সম্পদ দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। হাদীদ[১৫২] (৭ম খন্ড, পৃঃ৭২) লিখেছেনঃ

আমিরুল মোমেনিনের খেলাফত কালের ঘটনা প্রবাহ মনোযোগ সহকারে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে যে, তাঁকে কোণঠাসা করা হয়েছিল। কারণ তাঁর প্রকৃত মর্যাদা জানার মত লোক ছিল মুষ্টিমেয় এবং মৌমাছির ঝাঁকের মত সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক মনে করতো যে, তাকে মান্য করা বা তাঁর সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস রাখা বাধ্যতামূলক নয়। তারা পূর্ববর্তী খলিফাদের নজির তাঁর কথা ও কাজের ওপরে স্থান দিতো এবং তারা মনে করতো তাঁর সকল কাজে পূর্ববর্তী খলিফাগণকে অনুসরণ করা উচিত। তারা এমনও বলেছিল যে, পূর্ববর্তী খলিফাগণের নিয়ম-নীতি অনুসরণ না করলে তারা আমিরুল মোমেনিনের পক্ষ ত্যাগ করবে। এসব লোক আমিরুল মোমেনিনকে একজন সাধারণ নাগরিক মনে করতো। যারা তাঁর সাথী হয়ে যুদ্ধ করেছে তাদের অধিকাংশই ইজ্জতের খাতিরে অথবা আরবদের গোত্রনীতি অনুসরণ করে যুদ্ধ করেছে। তারা দ্বীন বা ইমানের খাতিরে যুদ্ধ করেনি।

২। সাবার বংশধর হলো সাবা ইবনে ইয়াশজুব ইবনে ইয়ারুব ইবনে কাতান। সাবা গোত্রের লোকজনকে 'সাবার পুত্রগণ' বলা হয়েছে। এ গোত্রের লোকেরা যখন রাসুলকে (সঃ) মিথ্যা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা চালাতে লাগলো তখন আল্লাহ্ বন্যা দ্বারা তাদের বাগানসমূহ ডুবিয়ে দিয়েছিলেন। ফলে তারা তাদের ঘর-বাড়ী ও সম্পদ ফেলে গিয়ে বিভিন্ন শহরে বসতি স্থাপন করেছিল। এ ঘটনা থেকেই প্রবাদটি প্রচলিত আছে। কোন জনগোষ্ঠি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে এবং তাদের একত্রিত হবার আশা না থাকলে এ প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

★★★★★

খোৎবা-৯৭

উমাইয়াদের অত্যাচার সম্পর্কে

আল্লাহ্র কসম, উমাইয়াগণ সকল নাজায়েজ কাজকে জায়েজ বানিয়ে নেবে। আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী একটি নাজায়েজ কাজ অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত, যা তারা জায়েজ বানিয়ে নেয়নি, তারা অত্যাচার-নিপীড়ন চালিয়ে যাবে। এমন কোন প্রতিশ্রুতি থাকবে না যা তারা ভঙ্গ করবে না এবং এমন কোন ঘর ও তাবু থাকবে না যেখানে তাদের অত্যাচার প্রবেশ করবে না। তাদের খারাপ আচরণ তাদের জন্য শোচনীয় পরিণাম ডেকে আনবে। দু'দল ক্রন্দনরত অভিযোগকারী তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে। এদের একদল দ্বীনের জন্য এবং অপরদল দুনিয়ার জন্য কাঁদবে। তাদের একজনের প্রতি তোমাদের একজনের সাহায্য হবে মনিবের প্রতি ক্রীতদাসের সাহায্যের মত। অর্থাৎ যখন মনিব উপস্থিত থাকে তখন ক্রীতদাস তাকে মান্য করে, কিন্তু মনিব সরে গেলে ক্রীতদাস তার গীবত করে। তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি (তাদের দ্বারা) সর্বাপেক্ষা বেশী দুর্দশাগ্রস্ত হবে যে আল্লাহ্তে প্রগাঢ় ইমান রাখে। যদি আল্লাহ্ তোমাদেরকে নিরাপত্তা মঞ্জুর করেন তবে শোকর করো এবং যদি তোমাদেরকে বিপদে রাখেন তবে সবুর করো, কারণ আল্লাহ্র ভয় নিশ্চয়ই সুফলদায়ক।

★★★★★

খোৎবা-৯৮

দুনিয়ার প্রতি বিমুখীতা ও সময়ের উত্থানপতন সম্পর্কে

যা কিছু ঘটেছে তজ্জন্য আমরা আল্লাহ্‌র প্রশংসা করি এবং আমাদের কাজকর্মে ভবিষ্যতে যা কিছু ঘটবে তজ্জন্য আমরা তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করি। আমাদের ইমানের নিরাপত্তার জন্য আমরা তাঁর কাছে প্রার্থনা করি যেভাবে আমরা শরীরের নিরাপত্তার জন্য প্রার্থনা করে থাকি।

হে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ, এ দুনিয়া হতে দূরে থাকার জন্য আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি। যদিও তোমরা দুনিয়ার প্রস্থান পছন্দ কর না তবুও অচিরেই দুনিয়া তোমাদেরকে পরিত্যাগ করবে এবং তোমাদের শরীরকে তরতাজা রাখার জন্য যতই চেষ্টা কর না কেন বার্ধক্য উহাকে গ্রাস করবেই । তোমাদের ও দুনিয়ার অবস্থা হলো সহযাত্রীর মত— কিছু দূর একসাথে চলার পর যে যার পথে দ্রুত চলে যায়। কত অল্প সময়ের এ সহযাত্রা! এ দুনিয়ার রঙ্গমঞ্চ অতি অল্প সময়ের যা একটি মূহূর্তের জন্য বর্ধিত করার ক্ষমতা তোমাদের নেই। অপরপক্ষে একজন দ্রুতগামী চালক (অর্থাৎ সময়) দুনিয়া হতে প্রস্থান করার জন্য তোমাদেরকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

সুতরাং পার্থিব সম্মান ও প্রতিপত্তির জন্য লালায়িত হয়ো না। দুনিয়ার চাকচিক্য ও ঐশ্বর্যে আনন্দ-উদ্বেল হয়ো না এবং এর ক্ষতি ও দুর্ভাগ্যের জন্য রোদন করো না। কারণ দুনিয়ার সম্মান ও প্রতিপত্তি নিঃশেষ হয়ে যাবে, ইহার সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্য ধ্বংস হয়ে যাবে এবং ইহার ক্ষতি ও দুর্ভাগ্যের অবসান হবে। এ পৃথিবীতে প্রতিটি কালের শেষ আছে এবং প্রত্যেক জীবিত বস্তুই মৃত্যুবরণ করবে। তোমাদের পূর্ববর্তীগণের স্মৃতিচিহ্ন কি তোমাদের জন্য সতর্কাদেশ নয়? তারা কি তোমাদের চোখ খুলে দেয় নি? তোমাদের পূর্ব পুরুষগণের অবস্থা কি তোমাদেরকে শিক্ষা দেয় না? তাদের অবস্থা কি তোমাদের বোধ শক্তি জাগ্রত করে না?

তোমরা কি দেখতে পাও না পূর্ববর্তীগণ ফিরে আসে না এবং জীবিত অনুসারীগণ চিরকাল থাকে না? তোমরা কি লক্ষ্য কর না দুনিয়ার মানুষ সকাল ও সন্ধ্যা এক অবস্থায় কাটায় না? কেউ মৃতের জন্য কাঁদছে, কেউ সান্ত্বনা দিচ্ছে, কেউ দুর্দশায় জর্জরিত, কেউ পীড়িতের খোঁজ খবর নিচ্ছে, কেউ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করছে, কেউ দুনিয়ার পেছনে ছুটে চলেছে অথচ মৃত্যু তাকে খুঁজছে; কেউ সব ভুলে গাফেল হয়ে বসে আছে অথচ মৃত্যু তাকে কখনো ভুলে না এবং পূর্ববর্তীগণের পদাঙ্কের দিকে পরবর্তীগণকে নিয়ে যায়।

সাবধান, পাপ কাজ করার আগে ভোগ-বিলাস ধ্বংসকারী, আনন্দ নস্যাৎকারী ও কামনা-বাসনার হত্যাকারীকে (মৃত্যু) স্মরণ করো। আল্লাহ্‌র প্রতি কর্তব্য পালনের জন্য এবং তাঁর অগণিত নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করার জন্য তাঁর সাহায্য প্রার্থনা কর।

★★★★★

খোৎবা-৯৯

রাসুল (সঃ) ও তাঁর বংশধর সম্পর্কে

প্রতিষ্ঠিত প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি তাঁর নেয়ামত সারা সৃষ্টিতে ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং সকলের প্রতি তাঁর দয়ার হাত প্রসারিত করেছেন। তাঁর সকল কর্মকান্ডে আমরা তার প্রশংসা করি এবং তাঁর প্রতি আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পরিপূরণের জন্য তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করি। আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি ব্যতীত আর কোন মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর বান্দা ও রাসুল। তিনি তাঁর আদেশ সুস্পষ্টভাবে দেখানো ও তাঁকে স্মরণ করার কথা বলার জন্য রাসুলকে (সঃ) প্রেরণ করেছিলেন। ফলতঃ তিনি বিশ্বস্ততার সাথে তা পরিপূর্ণ করেছিলেন এবং সত্যপথ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তিনি ইনতিকাল করেছিলেন।

তিনি আমাদের মাঝে সত্যের ঝান্ডা (আহলুল বাইত) রেখে গেছেন। যে কেউ এ ঝান্ডা ডিঙ্গিয়ে যায় সে ইমান হারিয়ে ফেলে, যে কেউ উহা হতে পেছনে পড়ে থাকে সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। যে ইহার প্রতি অবিচল থাকে সে সত্য ও ন্যায়ের সঙ্গে যুক্ত হয়। ইহার নিদর্শন হলো সংক্ষিপ্ত কথা বলা, ধীর পদক্ষেপ নেওয়া এবং যখন সে উঠে দাঁড়ায় তখন খুব দ্রুত এগিয়ে যায়। যখন তোমরা তাঁর সম্মুখে তোমাদের ঘাড় বাঁকা করেছো এবং তাঁর দিকে তোমাদের আঙ্গুলি নির্দেশ করেছো তখন তাঁর মৃত্যু হয়েছিল এবং আল্লাহ্ তাঁকে তুলে নিয়ে গেছেন। তারা তাঁর পরেও বেঁচেছিল যতদিন আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন। আল্লাহ্ তোমাদের জন্য একজনকে বের করে আনেন যিনি তোমাদেরকে একত্রিত করলেন এবং বিভেদের পর তোমাদেরকে একীভূত করলেন। যে এগিয়ে আসে না তার কাছে কিছু প্রত্যাশা করো না এবং যে প্রচ্ছাদিত তার প্রতি নিরাশ হয়ো না। কারণ প্রচ্ছাদিতজনের দু'পায়ের একটা ফসকে গেলেও অপরটির ওপর সে থাকতে পারে যতক্ষণ পর্যন্ত না উভয় পা যথাস্থানে ফিরে এসে ঠিক হয়ে না দাঁড়ায় (দু'পা বলতে জাহেরী রাজত্ব ও বাতেনি রাজত্ব বুঝানো হয়েছে)।

সাবধান, আহ্‌লে মুহাম্মদের (সঃ) উদাহরণ হলো আকাশের তারকাপুঞ্জের মত। যখন একটা তারকা অস্ত যায় তখন অন্য একটা উদিত হয়। সুতরাং তোমরা এমন অবস্থায় আছো যে, তোমাদের ওপর আল্লাহ্‌র আশীর্বাদ সম্পূর্ণ করা হয়েছে এবং তোমরা যা আকাঙ্খা করতে আল্লাহ্ তোমাদেরকে তা দেখিয়ে দিয়েছেন।

★★★★★

খোৎবা-১০০

সময়ের উত্থানপতন সম্পর্কে

আল্লাহ্ সকল প্রথমের পূর্বের প্রথম এবং সকল শেষের পরের অবশিষ্ট। তাঁর প্রথমতা অপরিহার্য করে তোলে যে, তাঁর পূর্বে অন্য কোন প্রথম নেই এবং তাঁর অবশিষ্টতা অপরিহার্য করে তোলে যে, তাঁর পরে অন্য কোন কিছু অবশিষ্ট নেই। আমি প্রকাশ্যে ও গোপনে, হৃদয়ে ও মুখে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন কিছু মাবুদ নেই।

হে লোকসকল, আমার বিরোধিতা করার অপরাধ করো না। আমাকে অমান্য করার কাজে প্রলুব্ধ হয়ো না এবং যখন আমার কথা শোন তখন একে অন্যের সাথে চোখ ঠারাঠারি করোনা। যিনি বীজ হতে অংকুর গজান ও বাতাস প্রবাহিত করেন, সেই আল্লাহ্‌র কসম, আমি তোমাদের কাছে যা বলি উহার সবই রাসুল (সঃ) হতে প্রাপ্ত। না রাসুল আল্লাহ্‌র বাণী মিথ্যা বলেছেন আর না শ্রোতা হিসাবে আমি তা ভুল বুঝেছি।

আমি সিরিয়ায় একজন গোমরাহ (বিভ্রান্ত) লোককে[১] চেঁচাতে দেখি যে কুফার উপকণ্ঠে তার ঝান্ডা গেড়েছে। যখন তার মুখ পুরাপুরি খুলবে, তার অবাধ্যতা চরমে পৌছবে এবং তার পদচারণ পৃথিবীতে ভারী হয়ে পড়বে (স্বৈরাচারীতা চরম হবে) তখন বিশৃঙ্খলা ইহার দাঁত দিয়ে মানুষকে কেটে ফেলবে, যুদ্ধের তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়বে, দিবাভাগ দারুণ কঠোর ও রাত্রি শ্রমসাধ্য হয়ে পড়বে। সুতরাং সময় ও সুযোগ পরিপক্ক হলে গোমরাহ বিদ্রোহীর ঝান্ডা আঁধার করা রাত ও তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের মত ক্রোধে জ্বলে উঠবে। এরকম এবং আরো বহু তান্ডব কুফার ওপর দিয়ে বয়ে যাবে এবং প্রবল ঝঞ্জা কুফাকে ধুয়ে-মুছে ফেলবে এবং শীঘ্রই মাথা মাথার সাথে সংঘর্ষ করবে, দাঁড়ানো শস্য কর্তিত হবে ও কর্তিত শস্য বিনষ্ট করা হবে।

১। কারো কারো মতে উল্লেখিত গোমরাহ লোকটি মুয়াবিয়া, আবার কারো কারো মতে লোকটি আবদাল মালেক ইবনে মারওয়ান।

★★★★★

খোৎবা-১০১

বিচারদিন সম্পর্কে

সেদিন এমন হবে যে, আল্লাহ্ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলকে একত্রিত করবেন। প্রত্যেকেই নিজ নিজ কাজের হিসাব-নিকাশ দেখা ও বিনিময় পাওয়ার জন্য আনুগত্য সহকারে দাঁড়িয়ে থাকবে। ঘর্ম তাদের মুখ পর্যন্ত প্রবাহিত হবে এবং তাদের পায়ের নীচের মাটি কাঁপতে থাকবে। তাদের মধ্যে সে-ই সব চাইতে ভাল অবস্থায় থাকবে যে তার দুটো পা রাখার জন্য একটু জায়গা পাবে এবং নিশ্বাস ফেলার জন্য একটু খোলা জায়গা পাবে।

ভবিষ্যৎ ফেতনা সম্পর্কে

ফেতনা হলো অন্ধকার রাতের মত। না অশ্ব উহার মোকাবেলায় দাঁড়াবে আর না উহার ঝান্ডা ফিরে আসবে। উহা পূর্ণ লাগামে উপস্থিত হবে এবং জিন্ নিয়ে প্রস্তুত থাকবে। উহাদের নেতা উহাদেরকে পরিচালিত করতে থাকবে এবং সওয়ার উহার ক্ষমতা কাজে লাগতে থাকবে। ফেতনাবাজগণের আক্রমণ মারাত্মক। আল্লাহ্র খাতিরে যারা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে তারা গর্বিতদের দৃষ্টিতে নীচ, পৃথিবীতে অপরিচিত কিন্তু আকাশে সুপরিচিত। তোমাকে অভিশাপ হে বসরা, যখন আল্লাহ্র অভিশপ্ত একদল সৈনিক কোন প্রকার চিৎকার না করেই তোমার ওপর আপতিত হবে তখন তোমার অধিবাসীগণ রক্তাক্ত মৃত্যুর মুখোমুখি হবে ও ক্ষুধায় মরবে।

★★★★★

খোৎবা-১০২

মিতাচারিতা ও আল্লাহ্র ভয় সম্পর্কে

হে লোকসকল, সেসব লোকের মত দুনিয়ার দিকে দৃষ্টিপাত কর যারা দুনিয়াকে পরিহার করে ও দুনিয়া হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়। আল্লাহ্র কসম, অচিরেই দুনিয়া ইহার অধিবাসীকে অপসারণ করবে এবং সুখী ও নিরাপদগণের শোকের কারণ হবে। ইহা হতে যা ফিরে চলে যায় তা কখনো প্রত্যাবর্তন করে না এবং যা সংঘটিত হতে পারে তা অজানা ও অননুমেয়। ইহার আনন্দ দুঃখের সাথে মিশ্রিত। এখানে মানুষ দৃঢ়তা, দুর্বলতা ও অবসন্নতা প্রবণ থাকে। এখানে যা কিছু তোমাদেরকে আনন্দ দেয় উহার দ্বারা তুমি ধোকায় পড়ো না কারণ খুব অল্প সংখ্যক উপকরণই তোমাদের সাহায্যে আসবে।

আল্লাহ্র রহমত তার ওপর বর্ষিত হোক, যে চিন্তা করে ও উহা হতে শিক্ষা গ্রহণ করে এবং যখন সে শিক্ষা গ্রহণ করে তখন সে হেদায়েতের আলো লাভ করে। এ পৃথিবীতে যা কিছু বিদ্যমান অচিরেই উহার অস্তিত্ব থাকবে না। অপরপক্ষে পরকালে যা টিকে থাকবে তা এখনো অস্তিত্বমান। গণনাযোগ্য প্রতিটি বস্তু মরে যাবে। প্রতিটি পূর্বাভাস দেখা দেবে বলে ধরে নিতে হবে এবং যা কিছু দেখা দেবে তা খুবই নিকটবর্তী বলে ধরে নিতে হবে।

বিদ্বান লোকের গুণাবলী

বিদ্বান হলো সেই ব্যক্তি যে নিজের মূল্য জানে। একজন লোকের অজ্ঞ থাকার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে নিজের মূল্য জানে না। নিশ্চয়ই, সে ব্যক্তি আল্লাহ্র সর্বাপেক্ষা ঘৃণিত যাকে তার নিজের কারণে আল্লাহ্ পরিত্যাগ করেছেন। সে সত্য পথ ছেড়ে বিপথগামী হয় এবং পথ প্রদর্শক ছাড়া ঘোরাফিরা করে। এ দুনিয়ার বাগান করতে (সম্পদ আহরণ) তাকে আহবান করলে সে কর্মতৎপর হয়ে পড়ে, কিন্তু পরকালের বাগান করতে আহ্বান করলে

সে ঝিমিয়ে পড়ে। (দেখে মনে হবে) যাতে সে কর্মতৎপর তা যেন তার জন্য অবশ্যকরণীয় এবং যাতে সে ঝিমিয়ে পড়ে তা তার জন্য অত্যাবশ্যকীয় নয়।

ভবিষ্যৎ সময় সম্পর্কে

এমন এক সময় আসবে যখন শুধুমাত্র ঘুমন্ত (নিষ্ক্রিয়) মোমিন নিরাপদ থাকবে। যদি সে উপস্থিত থাকে তবে তাকে স্বীকৃতি দেয়া হবে না এবং অনুপস্থিত থাকলে তাকে সন্ধান করা হবে না। এরাই হেদায়েতের প্রদীপ ও নিশীথ যাত্রার পতাকা। তারা কারো চরিত্র হননের জন্য মিথ্যা বিবৃতি ছড়ায় না, গুপ্ত বিষয় ফাঁস করে দেয় না এবং কাউকে অপবাদ দেয় না। তারা সেসব লোক যাদের জন্য আল্লাহ্ তাঁর রহমতের দরজা খুলে রাখবেন এবং তাঁর শাস্তির কষ্ট তাদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখবেন।

হে লোকসকল, এমন এক সময় আসবে যখন ইসলামকে উল্টিয়ে দেয়া হবে যেমন করে ভেতরের বস্তুসহ কোন পাত্রকে উল্টিয়ে দেয়া হয়। হে লোকসকল, আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি কঠোর হতে পারতেন; তিনি তোমাদেরকে তা হতে রক্ষা করেছেন। কিন্তু তিনি তোমাদের বিচার না করে ছাড়বেন না। সকল বক্তার চেয়ে মহিমান্বিত বক্তা বলেন ঃ

এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে। আমি তো তাদেরকে পরীক্ষা করেছিলাম (কুরআন-২৩ :৩০)।

★★★★★

খোৎবা-১০৩

নবুয়ত প্রকাশের পূর্বে মানুষের অবস্থা সম্পর্কে

নিশ্চয়ই, আল্লাহ্ মুহাম্মদকে (সঃ) নবী হিসাবে প্রেরণ করেছিলেন যখন আরবদের কেউ কিতাব পড়তে জানতো না এবং কেউ নবুয়ত বা অহী দাবি করেনি। যারা তাঁকে অনুসরণ করেছিল তাদেরকে সাথে নিয়ে তিনি সেইসব লোকের[১] বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন যারা তাঁকে অমান্য করেছিলো। তিনি তাদেরকে মুক্তির পথ দেখিয়েছিলেন এবং তিনি এতে তাড়াহুড়া করেছিলেন পাছে মৃত্যু তাদেরকে পরাভূত করে। নিকৃষ্টতম লোক, যার ভেতরে কোন সদগুণের লেশমাত্র নেই, ব্যতীত যখনই কোন ক্লান্ত মানুষ হাই তুলেছিল অথবা বিপদগ্রস্থ হয়েছিল তিনি তার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন যে পর্যন্ত না সে তার লক্ষ্য অর্জন করেছিল। অবশেষে তিনি তাদেরকে তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য দেখিয়ে দিলেন এবং মুক্তির স্থানে নিয়ে গেলেন। ফলতঃ তাদের কর্মকান্ডের অবস্থান পরিবর্তিত হলো, তাদের হস্তচালিত কল ঘুরতে লাগলো এবং তাদের বর্শা সোজা হয়ে গেল (অর্থাৎ তারা সরল ও সৎ অবস্থা লাভ করলো)।

আল্লাহ্র কসম, আমি তাদের পেছনে প্রহরীর মত ছিলাম যে পর্যন্ত না তারা পাশ ফিরেছিলো এবং তাদের রশিতে জমায়েত হয়েছিলো (অর্থাৎ ইমানের পথে ফিরে এসেছিলো)। আমি কখনো দুর্বলতা প্রদর্শন করিনি বা সাহস হারাইনি। আমি কখনো বিশ্বাসঘাতকতা করিনি বা নিস্তেজ হইনি। আল্লাহ্র কসম, আমি অন্যায়কে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে ফেলবো এবং ইহার পাঁজর থেকে ন্যায় বের করে আনবো।

★★★★★

খোৎবা-১০৪

রাসুলের (সঃ) প্রশংসা

আল্লাহ্ রাসুলকে (সঃ) সাক্ষী, শুভসংবাদ প্রদানকারী ও সতর্ককারী হিসাবে প্রেরণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন বিশ্বের পবিত্রতম শিশু, নিষ্পাপতম যুবক, আচরণে পরিশুদ্ধদের পরিশুদ্ধতম এবং যারা উদারতা চাইত তাদের জন্য উদারতম।

উমাইয়াদের সম্পর্কে

এ দুনিয়া ইহার আমোদ-প্রমোদে মধুর হয়ে তোমাদের নিকট হাজির হয়নি এবং তোমরা ইহার বাঁট হতে দুধ দোহন করনি যে পর্যন্ত না ইহার নাকের রশি টেনে ধরেছিলে ও পেটে বাঁধা বেল্ট ঢিলা করে দিয়েছিলে। কিছু লোকের কাছে দুনিয়ার হারাম জিনিসগুলো ছিল ফলভারে নুয়ে পড়া বৃক্ষ শাখার মত, আর হালাল জিনিসগুলো ছিল অনেক দূরে—নাগালের বাইরে। আল্লাহ্র কসম, তোমরা এটাকে একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য দীর্ঘ প্রতিবিম্বের মত দেখতে পাবে। সুতরাং কোন বাধা-বিপত্তি ছাড়াই পৃথিবী তোমাদের সাথে আছে এবং এতে তোমাদের হাত সম্প্রসারিত। অপরপক্ষে নেতাদের (ইমামদের) হাত তোমাদের নিকট হতে সরিয়ে নেয়া হয়। তোমাদের তরবারি তাদের ওপর ঝুলছে, কিন্তু তাদের তরবারি তোমাদের ওপর থেকে সরিয়ে রাখা হয়েছে।

সাবধান, প্রতিটি রক্তপাতের জন্য প্রতিশোধ গ্রহণকারী আছে এবং প্রতিটি অধিকারের দাবিদার আছে। আমাদের রক্তের বদলা গ্রহণকারী তার নিজের দাবির বিচারকের মত। আল্লাহ্ এমন যে, যদি কেউ তাঁকে অনুসন্ধান করে, তিনি তাকে হতাশ করেন না। আবার কেউ যদি তাঁর কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াতে চায় তবে সে তাঁর নজর এড়িয়ে যেতে পারে না। আমি আল্লাহ্র নামে শপথ করে বলছি, হে বনি উমাইয়া, অচিরেই তোমরা দেখতে পাবে যে, তোমাদের দখলীয় সবকিছু অন্যের হাতে ও তোমাদের শত্রুর ঘরে চলে গেছে। জেনে রাখো, সর্বোত্তম দৃষ্টিমান চোখ সেটি যাতে কল্যাণ ধরা পড়ে এবং সর্বোত্তম শ্রুতিমান কান সেটি যাতে ভাল উপদেশ শোনা যায় ও তা গ্রহণ করে।

ইমামদের কাজ সম্পর্কে

হে লোকসকল, তোমরা সেই ওয়ায়েজের (নসীহতকারী) দীপ-শিখা হতে আলো সংগ্রহ করো যিনি যা নসীহত করেন তা নিজেও অনুসরণ করেন এবং সেই ঝর্ণা হতে পানি তুলে নাও যা ময়লা বিমুক্ত করা হয়েছে।

হে আল্লাহ্র বান্দাগণ, তোমাদের অজ্ঞতার ওপর নির্ভর করো না এবং তোমাদের খাহেশের অনুগত হয়ো না কারণ যে খাহেশ নিয়ে থাকে সে যেন পানি দ্বারা ধ্বংসোন্মুখ তীরের ঢালু স্থানে থাকে। একের পর এক অভিমত পরিবর্তন করে সে নিজের পিঠে ধ্বংস বহন করে বেড়ায়। যা আমন্ত্রিত হবার নয় সে চায় তা আমন্ত্রণ করতে এবং যা একত্রে রাখা যায় না সে চায় তা একত্রিত করতে। সুতরাং আল্লাহ্কে ভয় কর এবং যে তোমাদের দুঃখ বিমোচন করতে পারে না তার কাছে অনুযোগ করো না এবং যা তোমাদের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছে তা করা হতে তার কথায় বিরত হয়ো না।

নিশ্চয়ই, আল্লাহ্ যে কাজ অর্পণ করেছেন তা ছাড়া ইমামের আর কোন দায়িত্ব নেই। তা হলো—সতর্কাদেশ পৌঁছিয়ে দেয়া, ভাল উপদেশ প্রদান করা, সুন্নাহ্ পুনরুজ্জীবিত করা, যারা শাস্তি পাওয়ার যোগ্য তাদের শাস্তি বিধান করা এবং যারা অংশ পাওয়ার যোগ্য তাদেরকে তা প্রদান করা। সুতরাং জ্ঞানের বৃক্ষ শুকিয়ে যাবার পূর্বেই ইহার দিকে দ্রুত এগিয়ে যাও এবং যাদের জ্ঞান আছে তাদের কাছ থেকে জ্ঞান আহরণ হতে নিজকে ফিরিয়ে নেয়ার পূর্বেই তাদের দিকে দ্রুত এগিয়ে যাও। হারাম কাজ করা হতে নিজেকে বিরত রেখো এবং অন্যকেও নিবৃত্ত করো, কারণ অন্যকে নিবৃত্ত করার পূর্বে নিজেকে বিরত করতে তোমাদেরকে আদেশ দেয়া হয়েছে।

★★★★★

খোৎবা-১০৫

ইসলাম সম্পর্কে

প্রতিষ্ঠিত প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি ইসলামকে প্রতিষ্ঠা প্রদান করেছেন। তাদের জন্য ইসলামকে সাজ করে দিয়েছেন যারা ইহার সমীপবর্তী হয়। তিনি ইসলামের স্তম্ভসমূহ এমন সুদৃঢ় করেছেন যে, কেউ চেষ্টা করে উহা উপড়ে ফেলতে পারে না। সুতরাং আল্লাহ্ ইসলামকে তার জন্য শান্তির উৎস করেছেন যে ইহাকে জড়িয়ে ধরে, তার জন্য নিরাপত্তার উৎস করেছেন যে ইহাতে প্রবেশ করে, তার জন্য দলিল স্বরূপ করেছেন যে ইহা সম্বন্ধে কথা বলে, তার জন্য সাক্ষী করেছেন যে ইহার জন্য জিহাদ করে, তার জন্য আলোকবর্তিকা করেছেন যে ইহাতে আলোর সন্ধান করে, তার জন্য প্রজ্ঞা যে ইহার প্রতিপালন করে, তার জন্য বিচক্ষণতা যে গভীর চিন্তা করে, তার জন্য নিদর্শন (আয়াত) যে উপলব্ধি করে, তার জন্য দৃষ্টিশক্তি যে স্থির করে, তার জন্য শিক্ষা যে উপদেশ সন্ধান করে, তার জন্য মুক্তি যে তাসদীক (বিশ্বাস) করে, তার জন্য নির্ভরশীলতা যে তাওয়াক্কুল করে, তার জন্য আনন্দ যে সমর্পণ করে এবং তার জন্য বর্ম যে ছবর (ধৈর্য ধারণ) করে।

ইসলাম হলো সকল পথের চেয়ে উজ্জ্বলতম ও পরিচ্ছন্নতম। ইহার মর্যাদাপূর্ণ মিনার, উজ্জ্বল রাজপথ, প্রদীপ্ত প্রদীপ, সম্মানজনক কর্মক্ষেত্র ও মহান উদ্দেশ্য আছে। ইহার দ্রুত ধাবমান অশ্ব আছে। আগ্রহের সাথে এ অশ্বের নিকটবর্তী হতে হয়। এ অশ্বের সওয়ার অত্যন্ত সম্মানিত। আল্লাহ্ ও রাসুলের নির্দেশিত পথই এ অশ্বের একমাত্র চলার পথ, আমলে সালেহা (কল্যাণকর কর্ম) ইহার মিনার, মৃত্যু ইহার সীমা, দুনিয়া ইহার ঘোড়-দৌড় মাঠ, বিচার দিন ইহার দৌড় প্রতিযোগিতা ও বেহেশ্‌ত ইহার নির্দিষ্ট লক্ষ্যবিন্দু।

রাসুল (সঃ) সম্পর্কে

রাসুল (সঃ) সন্ধানকারীদের জন্য উজ্জ্বল প্রদীপ শিখা জ্বালিয়েছিলেন এবং বিভ্রান্তদের জন্য উজ্জ্বল আলোক বর্তিকা রেখে গেছেন। সুতরাং হে আল্লাহ্, তিনি তোমার বিশ্বস্ত আমানতদার, বিচার দিনে তোমার সাক্ষী, তোমার নেয়ামতস্বরূপ প্রতিনিধি এবং তোমার রহমতস্বরূপ সত্যের বাণীবাহক। হে আমার আল্লাহ্ তোমার ন্যায় বিচারের প্রসাদ হতে এবং তোমার অগণন নেয়ামত হতে তাঁকে তুমি পুরস্কৃত কর। আমার আল্লাহ্ তাঁর নির্মাণকে অন্য সকল নির্মাণ হতে উঁচু করো, যখন তিনি তোমার কাছে আসেন তখন তাঁকে সম্মান করো, তোমার কাছে তাঁর মর্যাদা সমুন্নত করো, তাঁকে সম্মানিত মর্যাদা প্রদান করো এবং তাঁকে গৌরব ও বিশিষ্টতা দ্বারা পুরস্কৃত কর। বিচারের দিনে আমাদেরকে তাঁর দলভুক্ত করো যাতে আমরা লজ্জিত না হই, অনুতপ্ত না হই, দিকভ্রান্ত না হই, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী না হই, বিপথগামী না হই, গোমরাহ না হই ও প্রলুব্ধ না হই।

তাঁর অনুচরদের সম্পর্কে

তোমাদের ওপর আল্লাহ্‌র রহমতের কারণে তোমরা এমন এক মর্যাদা লাভ করেছো যাতে তোমাদের ক্রীতদাসেরাও আজ সম্মান পাচ্ছে এবং তোমাদের প্রতিবেশীগণ ভাল ব্যবহার পাচ্ছে। এমনকি যার সঙ্গে তোমাদের কোন পার্থক্য নেই বা যারা তোমাদের কাছে ঋণী নয় তারাও তোমাদেরকে সম্মান করে। ওই সকল লোকও আজ তোমাদেরকে ভয় করে তোমাদের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা যাদের নেই বা যাদের ওপর তোমাদের কোন কর্তৃত্ব নেই। তোমরা এখন দেখতে পাচ্ছো যে, আল্লাহ্‌র প্রতি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা হচ্ছে, কিন্তু তোমরা তাতে ক্ষুব্ধ হচ্ছো না যদিও তোমাদের পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্য ভাঙ্গতে গেলে তোমরা ক্রোধে অস্থির হয়ে পড়তে। আল্লাহ্‌র আহ্‌কাম তোমাদের নিকট আসছে ও চলে যাচ্ছে এবং আবার তোমাদের নিকট ফিরে আসছে কিন্তু তোমরা তোমাদের স্থান অন্যায়কারীদের কাছে হস্তান্তর করে দিয়েছো, তোমাদের দায়িত্ব তাদের দিকে

নিক্ষেপ করেছো এবং আল্লাহ্‌র আহকামকে তাদের হাতে তুলে দিয়েছো। তারা সংশয়ে আমল করে এবং আকাঙ্খার বশবর্তী হয়ে পদচারণা করে। আল্লাহ্‌র কসম, যদি তারা তোমাদেরকে বিভিন্ন নক্ষত্রেও ছড়িয়ে দেয় তবুও আল্লাহ্ নির্দিষ্ট দিনে তোমাদেরকে একত্রিত করবেন যে দিনটি তাদের জন্য নিকৃষ্টতম হবে।

★★★★★

খোৎবা-১০৬

সিফফিনের যুদ্ধ চলাকালে

আমি তোমাদের যুদ্ধ দেখেছি এবং দেখেছি সারি হতে তোমাদের সরে পড়া। তোমরা চারিদিক থেকে সিরিয়ার রূঢ় ও নীচ বেদুঈন দ্বারা ঘেরাও হয়ে পড়েছিলে। অথচ তোমরা আরবদের প্রধান ও বিশিষ্টতার চূড়ায় এবং এমন মর্যাদার অধিকারী যেন উঁচু নাক ও বিরাট কুঁজওয়ালা উট। আমার বুকের দীর্ঘশ্বাস প্রশমিত হতো যদি আমি একটি বারের জন্য দেখতে পেতাম তোমরা তাদের ঘেরাও করে রেখেছো যেভাবে তারা তোমাদেরকে ঘেরাও করেছে; তোমরা তাদেরকে অবস্থানচ্যুত করেছো যেভাবে তারা তোমাদেরকে করেছে, তীর দ্বারা তাদেরকে হত্যা করেছো এবং বর্শা দ্বারা তাদেরকে আঘাত করেছো যাতে তাদের অগ্রবর্তী সারি পশ্চাদ সারির ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে যেমন করে তৃষ্ণার্ত উট পানি দেখলে হুমড়ি খেয়ে পড়ে।

★★★★★

খোৎবা-১০৭

সময়ের উত্থানপতন সম্পর্কে

প্রতিষ্ঠিত প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি তাঁর সৃষ্টির সম্মুখে তাদেরই কারণে স্বতঃপ্রকাশ, যিনি সুস্পষ্ট প্রমাণের কারণে তাদের হৃদয়ে দৃশ্যমান; যিনি কোন প্রকার চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই সৃষ্টি করেছেন। চিন্তা করার ইন্দ্রিয় ছাড়া চিন্তা-ভাবনার কথা অযৌক্তিক। তাঁর নিজের কোন চিন্তা-ইন্দ্রিয় নেই। তাঁর জ্ঞান অজ্ঞাত-গুপ্ত বিষয়ের অভ্যন্তরেও প্রবেশ করে এবং সুগভীর বিশ্বাসের তলদেশ সম্বন্ধেও তিনি অবহিত।

রাসুল (সঃ) সম্পর্কে

আল্লাহ্ নবীদের সাজারাহ হতে, আলোর শিখা হতে, মহত্ত্বের কপাল হতে, বাত্‌হা উপত্যকার শ্রেষ্ঠাংশ হতে, অন্ধকারের প্রদীপ হতে এবং প্রজ্ঞার উৎস হতে তাঁকে নির্বাচিত করেছেন। রাসুল হলেন ভ্রাম্যমান চিকিৎসক যিনি সর্বদা তাঁর মলম প্রস্তুত রেখেছেন এবং তার যন্ত্রপাতি উত্তপ্ত রেখেছেন (জীবাণুমুক্ত করার জন্য)। এসব চিকিৎসার উপকরণ তিনি ব্যবহার করেছেন যখনই অন্ধ হৃদয়, বধির কান ও রুদ্ধবাক জিহ্বার চিকিৎসার জন্য প্রয়োজন হয়েছে। তিনি তাঁর ঔষধসহ গাফলতি ও জটিলতার স্থলে উপস্থিত হতেন।

মুসলিমদের দোষারোপ

মানুষ তাঁর প্রজ্ঞার আলো হতে আলো গ্রহণ করেনি এবং তারা প্রদীপ্ত জ্ঞান-স্ফুলিঙ্গ হতে শিখা উৎপন্ন করেনি। সুতরাং এ ব্যাপারে তারা চারণভূমির ভ্রাম্যমান গরুর পাল ও কঠিন পাথরের মত। এতদসত্ত্বেও যারা উপলব্ধি

করে তাদের জন্য গুপ্ত বিষয়াবলী দৃশ্যমান হয়েছে, ভ্রমণকারীর জন্য ন্যায়ের মুখ সুস্পষ্ট হয়েছে, সমীপবর্তী হওয়ার মুহূর্ত ইহার মুখের ঘোমটা তুলে দিয়েছে এবং যারা অনুসন্ধান করে তাদের জন্য নিদর্শনসমূহ উদ্ভাসিত হয়েছে।

আমার কি হয়েছে! আমি তোমাদেরকে দেখতে পাচ্ছি রুহ্ ছাড়া শরীর ও শরীর ছাড়া রুহ্মাত্র। তোমরা কল্যাণ ছাড়া ভক্ত, লাভ ছাড়া ব্যবসায়ী। তোমরা জেগে থেকেও ঘুমন্ত, উপস্থিত থেকেও অনুপস্থিত, চোখ থেকেও অন্ধ, কান থেকেও বধির এবং বাকশক্তি থেকেও মূক।

আমি লক্ষ্য করেছি যে, গোমরাহী ইহার কেন্দ্রবিন্দুতে দাঁড়িয়ে চতুর্দিকে শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে দিয়েছে। ইহা নিজের ওজনে তোমাদেরকে ওজন করে এবং বিভিন্ন উপায়ে তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করে। ইহার নেতা একজন সমাজচ্যুত লোক। সে গোমরাহীতে অটল রয়েছে। সুতরাং সেদিন তোমাদের মধ্য হতে পাতিলের তলানির মত মুষ্টিমেয় কিছু সংখ্যক ছাড়া আর কেউ অবশিষ্ট থাকবে না। চামড়া যেভাবে ঘষে পরিষ্কার করা হয় তোমাদেরকে সেভাবে ঘষা হবে এবং শস্য যেভাবে মাড়ানো হয় তোমরা সেভাবে দলিত হবে। কিন্তু ইমানদারগণ এমনভাবে মুক্তি পাবে যেভাবে পাখী মোটা শস্যদানাকে চিকন দানা হতে বের করে নিয়ে আসে।

আচ্ছন্নতা বিপথে পরিচালিত করে এবং মিথ্যা প্রবঞ্চনা করে কোথায় তোমাদেরকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। কী কারণে তোমরা নীত হও এবং কোথায় তোমরা তাড়িত হও? প্রতিটি কালের জন্য লিখিত দলিল আছে এবং অনুপস্থিতগণের প্রত্যেককে ফিরে যেতে হবে। সুতরাং তোমাদের উদ্ধারকারী নেতার কথা শোন এবং তোমাদের হৃদয় উপস্থিত রাখ। যদি তিনি তোমাদেরকে বলেন তবে জাগরিত থেকো। অগ্রবর্তীজন তার লোকের কাছে সত্য কথাই বলে। কাজেই (তার কথা শুনতে) বুদ্ধিমত্তা রাখতে ও মানসিকভাবে উপস্থিত থাকতে হয়। তিনি প্রতিটি বিষয় বিশদ ব্যাখ্যা করেছেন—একটা সুচের ছিদ্রও বাদ পড়েনি এবং ঘষে পরিষ্কার করে দিয়েছেন যেমন করে গাছের শাখা হতে ঘষে আঠা বের করা হয়।

এতদসত্ত্বেও এখন অন্যায় ন্যায়ের স্থান দখল করেছে এবং অজ্ঞতা ইহার বাহনে আরোহণ করেছে। ঔদ্ধত্য বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কল্যাণের আহবান চাপা পড়ে গেছে। সময় ক্ষুধার্ত মাংসাশী প্রাণীর মত ঝাঁপিয়ে পড়েছে এবং অন্যায় উটের মত চিৎকার দিচ্ছে। অপকর্মের জন্য মানুষ একে অপরের ভ্রাতা হয়েছে, দ্বীনকে পরিত্যাগ করেছে এবং মিথ্যা বলার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়েছে কিন্তু সত্যের ব্যাপারে পরস্পরকে ঘৃণা করছে।

অবস্থা যখন এমন তখন পুত্র ক্রোধের কারণ হবে (চোখের শীতলতার পরিবর্তে) এবং বৃষ্টি উত্তাপের কারণ হবে; পাপাচারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে, বুজর্গ লোকের সংখ্যা কমে যাবে। এ সময়ের মানুষ নেকড়ের মত হবে, শাসকগণ পশুর মত হবে, মধ্যবিত্তগণ অতিভোজী হবে এবং দরিদ্রগণ মৃতপ্রায় হয়ে পড়বে। এ সময় সত্য কমে যাবে, মিথ্যা উপচিয়ে পড়বে, স্নেহ-মমতা শুধু মুখে মুখে থাকবে কিন্তু অন্তরে মানুষ কলহপ্রিয় হবে। ব্যভিচার বংশানুক্রমের চাবি হবে, সতীত্ব দুষ্প্রাপ্য হবে এবং ইসলামকে চামড়ার মত উল্টিয়ে পরা হবে।

★★★★★

খোৎবা-১০৮

আল্লাহ্‌র কুদরত সম্পর্কে

সকল কিছু আল্লাহ্‌র অনুগত এবং সকল কিছুই তাঁর দ্বারা অস্তিত্ববান। তিনি দরিদ্রের সন্তুষ্টি, নীচ-এর মর্যাদা, দুর্বলের শক্তি এবং মজলুমের আশ্রয়স্থল। যে কেউ কথা বলে তিনি শোনেন এবং যে নিশ্চুপ থাকে তিনি তার গুপ্ত বিষয় জানেন। জীবিত সব কিছুর জীবিকা তাঁর হাতে এবং মৃত্যুর পর সকলেই তাঁর কাছে প্রত্যাবর্তন করে।

হে আল্লাহ্! চোখ তোমাকে দেখেনি যাতে তোমার সম্বন্ধে অবহিত হওয়া যায়, কিন্তু তোমার সৃষ্টির বর্ণনাকারীদের পূর্বেও তুমি বিদ্যমান ছিলে। তুমি তোমার নিঃসঙ্গতার কারণে মাখলুক সৃষ্টি করনি এবং কোন লাভের আশায় তাদেরকে কর্ম সম্পাদনের ক্ষমতা দাওনি। যাকে তুমি ধর সে একটুও এগুতে পারে না আর যাকে তুমি আটকিয়ে ফেলো সে কিছুতেই পালাতে পারে না। কেউ তোমাকে অমান্য করলে তোমার কর্তৃত্ব একটুও খর্ব হয় না এবং কেউ তোমার অনুগত হলে তোমার শক্তি একটুও বৃদ্ধি পায় না। কেউ তোমার বিচারে সংক্ষুব্ধ হলে তা ফিরিয়ে দিতে পারে না এবং কেউ তোমার আদেশ হতে মুখ ফিরিয়ে নিলেও তোমাকে ছাড়া চলতে পারে না। প্রতিটি গুপ্ত বিষয় তোমার কাছে উন্মুক্ত এবং তোমার জন্য প্রত্যেক অনুপস্থিতই উপস্থিত।

তুমি চিরন্তন, তোমার কোন অন্ত নেই। তুমিই সর্বোচ্চ লক্ষ্য এবং তোমার আয়ত্ত থেকে কোন নিষ্কৃতি নেই। তুমিই প্রতিশ্রুত প্রত্যাবর্তন স্থল এবং তোমার দিকে যাওয়া ব্যতীত কোন নিস্তার নেই। বান্দার চূর্ণকুন্তল তোমার হাতের মুঠোয় এবং প্রতিটি জীবিত সত্তার প্রত্যাবর্তন তোমারই কাছে। সকল গৌরব তোমার। তোমার সৃষ্টির যা কিছু আমরা দেখি তা কত বিশাল কিন্তু এ বিশালত্ব তোমার কুদরতের কাছে কতই না ক্ষুদ্র। তোমার রাজ্য, যা আমরা লক্ষ্য করি, কত বিস্ময়কর কিন্তু তোমার কর্তৃত্বের যেটুকু আমাদের কাছে গুপ্ত উহার তুলনায় কত নগণ্য। এ পৃথিবীতে তোমার নেয়ামত কত ব্যাপক কিন্তু আখেরাতের নেয়ামতের তুলনায় তা কত তুচ্ছ।

ফেরেশতা সম্পর্কে

হে আল্লাহ্, তুমি ফেরেশতাদেরকে তোমার আসমানে বসত করার ব্যবস্থা করেছো এবং তোমার পৃথিবীর অনেক উর্ধ্বে তাদেরকে স্থাপন করেছো। তোমার সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞান তাদেরই আছে এবং তোমার সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে তারাই তোমাকে সর্বাপেক্ষা বেশী ভয় করে এবং তারাই তোমার সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী। তারা কখনো কারো ঔরসে বা কারো গর্ভাশয়ে ছিল না এবং তাদেরকে নাপাক পানি হতে সৃষ্টি করা হয় নি। সময়ের উত্থান-পতনের কারণে তারা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েনি। তারা তোমার থেকে আলাদা তাদের নির্দিষ্ট স্থানে এবং তাদের নির্দিষ্ট মর্যাদায় তোমার নিকটে অবস্থান করে। তাদের সকল আকাঙ্খা তোমাকে কেন্দ্র করে। তারা অত্যধিক পরিমাণে তোমার ইবাদত করে। তোমার আদেশের প্রতি তাদের কোন গাফলতি নেই। যদি তারা দেখে যে, তোমার সম্পর্কে কিছু সংগুপ্ত রয়ে গেছে তবে তারা মনে করে তাদের আমল কম হয়েছে এবং তখন তারা আত্মসমালোচনা করে এবং অনুধাবন করতে পারে যে, যতটুকু ইবাদত তোমার প্রাপ্য ছিল ততটুকু তারা করেনি অথবা তোমাকে যতটুকু মান্য করা উচিত ছিল ততটুকু তারা করেনি।

আল্লাহ্‌র নেয়ামত ও অকৃতজ্ঞ সম্পর্কে

তুমি মহিমান্বিত, তুমি স্রষ্টা, তুমি উপাস্য তোমার বান্দাদের প্রতি সুবিচারের কারণে। তুমি বেহেশত সৃষ্টি করে তাতে তৃপ্তিদায়ক উপভোগ্য বস্তু, পানীয়, খাদ্য, সুদর্শন সঙ্গিনী বা সঙ্গী, চাকর-চাকরানী, মনোরম স্থান, স্রোতস্বিনী, বাগান ও ফল দিয়েছো। অতঃপর তুমি তোমার বার্তাবাহক প্রেরণ করেছো বেহেশতের দিকে আমন্ত্রণ জানাতে কিন্তু মানুষ আহবানকারীর আহবানে সাড়া দেয়নি। যেদিকে অনুপ্রাণিত হতে তুমি বলেছিলে তারা সেদিকে অনুপ্রাণিত হয়নি। যেদিকে আগ্রহ দেখাতে তুমি ইচ্ছা করেছিলে তারা সেদিকে আগ্রহ দেখায়নি। তারা মৃত লাশের (এ দুনিয়া) ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো, তা খেয়ে লজ্জিত হলো এবং উহার প্রেমে ঐক্যবদ্ধ হলো।

যখন কেউ কোন কিছুকে ভালবাসে তখন উহা তাকে অন্ধ করে দেয় এবং তার হৃদয়কে পীড়িত করে। তখন দেখে কিন্তু অসুস্থ চোখ দিয়ে; শোনে কিন্তু রুদ্ধ কান দিয়ে। আকাঙ্খা তার বুদ্ধিমত্তাকে বিনষ্ট করে দেয় এবং দুনিয়া তার হৃদয়কে মৃত করে দেয়, কারণ তার মন সদাসর্বদা দুনিয়ার আশায় লিপ্ত থাকে। ফলে সে দুনিয়ার

গোলাম হয়ে পড়ে এবং তাদেরও গোলাম হয়ে যায় দুনিয়াতে যাদের অংশীদারিত্ব আছে। দুনিয়া যেদিকে মুখ ফেরায় সেও সেদিকে মুখ ফেরায় এবং দুনিয়া যেদিকে অগ্রসর হয় সেও সেদিকে অগ্রসর হয়। আল্লাহ্ হতে কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কোন বাধাদানকারী দ্বারা সে বাধাপ্রাপ্ত হয় না এবং কোন ধর্মোপদেশক হতে নসিহত গ্রহণ করে না। সে তাদেরকেই দেখে যারা গাফলতিতে ধৃত হয়েছে যেখান থেকে পশ্চাদপসরণ বা প্রত্যাবর্তন নেই।

মৃত্যু সম্পর্কে

এ দুনিয়া হতে বিচ্ছিন্ন হওয়াকে তারা উপেক্ষা করেছিল কিন্তু তা তাদের ঘটেছে। অথচ সময়মত বিচ্ছিন্ন হলে তারা নিজেদেরকে নিরাপদ রাখতে পারতো। তারা পরকালে প্রতিশ্রুত ফল লাভ করেছে। সেখানে যা ঘটেছে তা বর্ণনাতীত। মৃত্যুর যন্ত্রণা আর দুনিয়া হারাবার শোক তাদেরকে ঘিরে ধরেছে। ফলে তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অসাড় ও চেহারা বদল হয়ে যায়। মৃত্যু উহার যন্ত্রণা তাদের ওপর বৃদ্ধি করে।

কতক লোকের বেলায় মৃত্যু তার ও তার কথা বলার শক্তির মাঝে এসে দাঁড়ায় যদিও সে তখন তার লোকজনের মাঝেই শুয়ে থাকে, চোখ দিয়ে তাকায়, কান দিয়ে শুনে এবং তার বোধশক্তি ও বুদ্ধিমত্তা অটুট থাকে। তখন সে চিন্তা করে কিভাবে তার জীবন নষ্ট করেছিলো এবং কি আমল করে তার সময় কেটেছিলো। সে তার সঞ্চিত সম্পদকে স্মরণ করে যা আহরণে সে নিজেকে অন্ধ করে রেখেছিলো এবং উহা আহরণে ন্যায়-অন্যায় বিচার বিবেচনা করেনি। এখন সম্পদ আহরণের পরিণাম তাকে পাকড়াও করেছে। সে উহা ত্যাগ করার প্রস্তুতি নেয় এবং এগুলো তার পরবর্তীগণের জন্য থাকবে। তারা এগুলো ভোগ করবে ও উপকৃত হবে।

তার পরিত্যক্ত সম্পদ পরবর্তীগণের জন্য সহজলভ্য, কিন্তু উহা আহরণের সকল দায়-দায়িত্ব তার ঘাড়ে এবং সে এসব দায়-দায়িত্ব হতে মুক্তি পাবে না। তার মৃত্যুর সময় তার অতীত কর্মকান্ড যখন তার সামনে তুলে ধরা হবে তখন সে লজ্জায় নিজের হাত কামড়াবে। জীবনে ব্যগ্রভাবে যা সে কামনা করেছিল মৃত্যুর সময় সে উহাকে ঘৃণা করবে এবং মনে মনে আক্ষেপ করবে যে, সম্পদের কারণে যারা তাকে ঈর্ষা করেছিল তাদের সম্পদ স্তূপীকৃত হয়ে সে যদি নিঃস্ব হতো।

বিচার দিবস সম্পর্কে

মৃত্যু তার শরীরকে ক্রমান্বয়ে আক্রমণ করতে থাকবে এবং এক পর্যায়ে তার কানও জিহ্বার মত হয়ে যাবে (অকেজো হয়ে যাবে)। সুতরাং সে তার লোকজনের মাঝেই বাকশক্তিহীন ও শ্রবণ শক্তিহীন অবস্থায় পড়ে থাকবে। সে তার দৃষ্টিকে তাদের মুখের ওপর ঘুরাবে, তাদের মুখের নড়া-চড়া লক্ষ্য করবে কিন্তু তাদের কথা শুনতে পাবে না। তৎপর মৃত্যু ইহার প্রভাব আরো বৃদ্ধি করে দেবে এবং তাতে তার দৃষ্টিও কেড়ে নেয়া হবে কান ও জিহ্বার মত এবং তার রুহ্ দেহ হতে প্রস্থান করবে। তখন সে তার প্রিয়জনদের কাছে একটি লাশে পরিণত হবে। তারা তার অনুপস্থিতি অনুভব করবে এবং তার কাছ থেকে চলে যাবে। সে আর কখনো শবানুগামীদের সাথে যোগ দিতে পারবে না অথবা কোন আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দিতে পারবে না। তৎপর তারা তাকে বহন করে নিয়ে যাবে এবং মাটির অভ্যন্তরে একটা ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে ফেলে চলে যাবে যেখানে সে তার কাজ-কর্মের ফল ভোগ করবে। এরপর আর কোনদিন তার সাথে কেউ দেখা করতে যাবে না।

বিচার দিন সম্পর্কে

যা কিছু স্থিরিকৃত হয়ে লিখিত আছে তা শেষ প্রান্তে না পৌছা পর্যন্ত, কর্মকান্ড পূর্বনির্ধারিত সীমা সম্পূর্ণ না করা পর্যন্ত, পরবর্তীগণ পূর্ববর্তীগণের সাথে মিলিত না হওয়া পর্যন্ত এবং যা কিছু আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন তার সৃষ্টির

পুনরুত্থান আকারে তা সংঘটিত না হওয়া পর্যন্ত সে এভাবে পড়ে থাকবে। তখন তিনি আকাশকে প্রবলভাবে কম্পিত করে বিচূর্ণ করবেন। তিনি পৃথিবীকে কম্পিত ও আলোড়িত করবেন। তিনি পর্বতসমূহকে সমূলে উৎক্ষিপ্ত করে বিচ্ছিন্ন করবেন। উহারা তাঁর মহত্ত্বের আতঙ্কে ও মহিমার ভয়ে একে অপরকে ধ্বংস করবে।

তিনি ইহার ভেতরে যারা আছে তাদের প্রত্যেককে বের করে আনবেন। তিনি তাদেরকে ছিন্ন-ভিন্ন হওয়ার পরও সজীব ও সতেজ করবেন এবং তাদেরকে বিচ্ছিন্ন অবস্থা হতে একত্রিত করবেন। তৎপর তাদের গোপন কর্মকান্ড ও অপ্রকাশিত আমল সমূহের বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাদেরকে একদিকে সরিয়ে রাখবেন। অতঃপর তিনি তাদেরকে দু'টি দলে বিভক্ত করবেন— একদলকে পুরস্কৃত করবেন এবং অন্যদলকে শাস্তি প্রদান করবেন। যারা তাঁর অনুগত ছিল তিনি তাদেরকে তাঁর নৈকট্য দ্বারা পুরস্কৃত করবেন এবং চিরদিনের জন্য তাদেরকে তাঁর ঘরে রাখবেন যেখান থেকে কোন অবস্থানকারী বের হয়ে আসে না। সেখানে তাদের অবস্থার কোন পরিবর্তন হবে না, ভীতি তাদেরকে স্পর্শ করবে না, রোগ-ব্যাধি তাদেরকে আক্রমণ করবে না, কোন বিপদাপদ তাদেরকে প্রভাবিত করবে না এবং একস্থান থেকে অন্যত্র ভ্রমণ করতে তাদেরকে বাধ্য করা হবে না।

অপরপক্ষে পাপী লোকদেরকে তিনি নিকৃষ্টতম স্থানে বসবাস করতে দেবেন। তাদের হাত ঘাড়ের সাথে বাঁধবেন, কপালের কেশগুচ্ছ পায়ের সাথে বাঁধবেন, আলকাতরার জামা পরাবেন এবং অগ্নিশিখা দ্বারা কেটে বানানো পোষাক পরাবেন। তারা আগুনে শাস্তি ভোগরত থাকবে যার উত্তাপ প্রচন্ড, দরজা বন্ধ এবং ভেতরে বিভৎস চিৎকার, উত্থিত অগ্নি-শিখা ও ভীত-সন্ত্রস্ত কণ্ঠ। ইহার ভেতরে যারা আছে তারা বেরিয়ে আসতে পারে না, ইহার বন্দিকে মুক্তিপণ দিয়ে মুক্ত করা যায় না এবং ইহার শিকল কাটা যায় না। এ ঘরের জন্য কোন নির্ধারিত সময়-কাল নেই যাতে শাস্তি শেষ হতে পারে এবং এ জীবনের কোন শেষ নেই যাতে মৃত্যুবরণ করতে পারে।

রাসুল (সঃ) সম্পর্কে

তিনি দুনিয়াকে ঘৃণাভরে দেখতেন এবং অত্যন্ত নিকৃষ্ট মনে করতেন। তিনি উহাকে অবজ্ঞেয় মনে করতেন এবং ঘৃণা করতেন। তিনি অনুধাবন করেছিলেন যে, আল্লাহ্ ইচ্ছাকৃতভাবে দুনিয়াকে তাঁর কাছ থেকে দূরে রেখেছেন এবং তা তিনি ঘৃণা আকারে অন্যদের মাঝে ছড়িয়ে দিয়েছেন। সে জন্য তিনি মনে-প্রাণে দুনিয়া হতে দূরে ছিলেন, মন থেকে ইহার স্মৃতি মুছে ফেলেছিলেন এবং প্রার্থনা করতেন দুনিয়ার আকর্ষণ যেন তার দৃষ্টিসীমার বাইরে থাকে যাতে উহা হতে কোন পোষাক তাকে না পরতে হয়। তিনি পাপের বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌র ওজর জ্ঞাপন করেছিলেন, মানুষকে সতর্ককারী হিসাবে পরামর্শ দিয়েছিলেন এবং শুভ সংবাদ জ্ঞাপনকারী হিসাবে মানুষকে বেহেশতের দিকে আহ্বান করেছিলেন।

আহ্‌লুল বাইত সম্পর্কে

আমরা নবুয়তের সাজারাহ, ঐশীবাণীর অবস্থান স্থল, ফেরেশতাগণের অবতরণ স্থল, জ্ঞানের আকর ও প্রজ্ঞার উৎস। আমাদের সমর্থক ও প্রেমিকগণ আল্লাহ্‌র ক্ষমাপ্রাপ্ত এবং আমাদের শত্রু ও যারা আমাদেরকে ঘৃণা করে তারা আল্লাহ্‌র রোষে নিপতিত।

★★★★★

খোৎবা-১০৯

ইসলাম সম্পর্কে

প্রশংসিত ও মহিমান্বিত আল্লাহ্র সান্নিধ্য সন্ধানকারীগণ যে প্রকৃষ্ট উপায়ে তাঁর সান্নিধ্য অনুসন্ধান করে তা হলো— আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের প্রতি প্রগাঢ় ইমান ও আল্লাহ্র পথে জিহাদ কারণ ইহা ইসলামের সর্বোচ্চ চূড়া, কালিমাতুল ইখলাছে বিশ্বাস কারণ ইহা ইসলামের ফেত্‌রাত, সালাত কায়েম কারণ ইহা সমাজ, জাকাত প্রদান কারণ ইহা বাধ্যতামূলক দায়িত্ব, রমজান মাসে সিয়াম সাধনা কারন ইহা শাস্তির বিরুদ্ধে ঢাল, হজ্জ্ব ও উমরাহ পালন কারণ ইহা দারিদ্রতা মুছে ফেলে ও পাপ ধুয়ে ফেলে, আত্মীয়-স্বজনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ কারণ ইহা সম্পদ ও জীবনের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করে, গোপন-দান কারণ ইহা ত্রুটি বিচ্যুতি ঢেকে দেয়, প্রকাশ্য-দান কারণ ইহা সায়াত (শঙ্কাকুল মৃত্যু) হতে রক্ষা করে এবং সুযোগ-সুবিধা সকলের মধ্যে বন্টন কারণ ইহা অমর্যাদাকর অবস্থা হতে রক্ষা করে।

পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ্ সম্পর্কে

আল্লাহ্র জেকেরে এগিয়ে যাও কারণ এটাই সর্বোত্তম জেকের এবং ধার্মিকগণের প্রতি তিনি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন উহার আশা পোষণ করো কারণ তাঁর প্রতিশ্রুতি সর্বাপেক্ষা সত্য। রাসুলের (সঃ) পথ অনুসরণ করো কারণ ইহা সকল আচরণবিধি অপেক্ষা সঠিক। কুরআন শিক্ষা করো কারণ ইহা সুন্দরতম ধর্মোপদেশ এবং কুরআনকে বিশদভাবে বুঝতে চেষ্টা করো কারণ ইহা সর্বোত্তমভাবে হৃদয়কে প্রস্ফুটিত করে। সুন্দরভাবে ইহাকে তেলাওয়াত করো কারণ ইহা অতি সুন্দর বর্ণনা। নিশ্চয়ই, একজন বিজ্ঞ লোক তার জ্ঞানানুসারে আমল না করলে সে মস্তিষ্কহীন অজ্ঞের সামিল হয়, সে তার অজ্ঞতা হতে মুক্তি পথ খুঁজে পায় না। জ্ঞানীগণের ওপর আল্লাহ্র ওজর বেশী; তাদের দায়িত্বও বেশী এবং আল্লাহ্র সম্মুখে তারাই বেশী দোষারোপযোগ্য।

★★★★★

খোৎবা-১১০

দুনিয়া সম্পর্কে সতর্কোপদেশ

নিশ্চয়ই, আমি তোমাদেরকে দুনিয়া সম্পর্কে ভয় দেখিয়েছি কারণ ইহা মধুর ও মনোরম, লোভ-লালসায় ভরপুর এবং ইহার আশু ভোগ-বিলাসের জন্য ইহা খুবই পছন্দনীয়। ইহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তু দ্বারা বিস্ময়ের উদ্রেক করে। ইহা মিথ্যা আশায় অলঙ্কৃত এবং প্রবঞ্চনা ও ছলনায় সজ্জিত। ইহার আনন্দ-উপভোগ স্থায়ী নয় এবং ইহার যন্ত্রণাও এড়ানো যায় না। ইহা ছলনাময়ী, ক্ষতিকর, পরিবর্তনশীল, নশ্বর, ধ্বংসনীয়, সর্বগ্রাসী ও বিনাশী। যখন ইহা তাদের আকাঙ্খার চরমে পৌঁছে যারা ইহার দিকে ঝুঁকে পড়ে ও সুখ অনুভব করে তাদের অবস্থা এমন হয় যা মহিমান্বিত আল্লাহ্ বলেন ঃ

> *ইহা পানির ন্যায় যা আমরা আকাশ হতে বর্ষণ করি, তাই পৃথিবীর বৃক্ষাদি উদ্‌গত হয়; অতঃপর বিশুষ্কতা ও বিচূর্ণতার সময় আসে যখন বাতাস উহাকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। আল্লাহ্ সর্ব বস্তুর ওপর ক্ষমতাশীল। (কুরআন-১৮ : ৪৫)*

যে ব্যক্তি দুনিয়া হতে আনন্দ উপভোগ করে একদিন তার চোখে অশ্রু আসবে এবং যে ব্যক্তি দুনিয়া হতে আরাম-আয়েশ লাভ করে একদিন তার জীবনে অভাব-অনটন ও দুর্যোগ নেমে আসবে। কেউ আরামের হালকা

বৃষ্টি পেলে দুর্দশার প্রবল বৃষ্টি তার ওপর পতিত হবে। এ দুনিয়ার স্বভাব এমনই যে, সকালবেলায় যাকে সমর্থন করে বিকেলবেলায় তাকে আর চেনে না। যদি এর একদিক মধুর ও মনোরম হয় তবে অন্যদিক কটু ও বেদনাদায়ক।

দুনিয়ার চাকচিক্য হতে কেউ উপভোগ্য সংগ্রহ করলে তাকে এর দুর্যোগের দুর্দশার মোকাবেলা করতে হয়। যে ব্যক্তি নিরাপত্তার পাখাতলে সন্ধ্যাবেলা অতিবাহিত করবে সকালবেলায় সে আতঙ্কের পাখার অগ্রভাগের পালকের নীচে থাকবে। দুনিয়া ছলনাময়ী এবং এতে যা কিছু আছে সবই ছলনামাত্র। এটা নশ্বর এবং এতে যা কিছু আছে সবই লয়প্রাপ্ত হবে। ইহার ভান্ডারে কল্যাণকর কোন রসদ নেই একমাত্র তাকওয়া ছাড়া। যে দুনিয়া হতে স্বল্পমাত্রায় গ্রহণ করে সে অনেক কিছু সঞ্চয় করে যা (পরকালে) তাকে নিরাপত্তা প্রদান করবে এবং যে এটা হতে প্রভূত পরিমাণ গ্রহণ করে সে মূলতঃ উহাই গ্রহণ করলো যা তাকে ধ্বংস করবে। তার সংগ্রহসমূহ ছেড়ে সে অচিরেই প্রস্থান করবে। কতলোক দুনিয়ার ওপর নির্ভর করেছিলো কিন্তু দুনিয়া তাদেরকে দুঃখ-দুর্দশায় নিপতিত করেছিলো, কতলোক এতে শান্তি অনুভব করেছিলো, ফলে তাদের অধঃপতন হয়েছিল; কতলোক (দুনিয়ার সংগ্রহ দ্বারা) মর্যাদাকর অবস্থায় ছিল কিন্তু উহা তাদেরকে হীনাবস্থায় ফেলেছে এবং কতলোক (দুনিয়ার সংগ্রহের জন্য) গর্বিত ছিল কিন্তু তা তাদেরকে অসম্মানজনক অবস্থায় ফেলেছিলো।

দুনিয়ার কর্তৃত্ব পরিবর্তনশীল। এর জীবন নোংরা। এর মধুর পানিও কটু স্বাদযুক্ত। এর মধুরতা গন্ধরসের মত। এর খাদ্য দ্রব্য বিষযুক্ত। এর উপকরণাদি দুর্বল। এতে বেঁচে থাকা মৃত্যুতুল্য; এতে স্বাস্থ্যবানও রুগ্নতুল্য। এর রাজত্ব কেড়ে নেয়া হবে। এর শক্তিধরগণ পরাজিত হবে এবং ধনবানগণ দুর্ভাগ্য দ্বারা আক্রান্ত হবে। এর প্রতিবেশীগণ লুটেরা হবে।

তোমরা কি তোমাদের পূর্ববর্তীগণের ঘরে বসবাস কর না? তারা তোমাদের চেয়ে দীর্ঘজীবি ছিল, তোমাদের চেয়ে বেশী অনুসন্ধানী ছিল, তোমাদের চেয়ে বেশী আকাঙ্খী ছিল, তোমাদের চেয়ে সংখ্যায় বেশী ছিল এবং তাদের বিশাল সৈন্যবাহিনী ছিল। তোমরা কি দেখনি কিভাবে তারা (দুনিয়ার প্রতি) নিজেদেরকে আসক্ত করেছিলো এবং কিভাবে তারা (দুনিয়াকে) সব কিছুর উর্ধ্বে মনে করতো? তৎপর সব কিছু পরিত্যাগ করে তাদেরকে চলে যেতে হয়েছিল এবং আখিরাতের পথ অতিক্রম করার জন্য তাদের না ছিল কোন রসদ আর না ছিল কোন বাহন।

তোমরা কি এ সংবাদ পাওনি যে, তাদের জন্য যে কোন মুক্তিপণ দিতে দুনিয়া উদার ছিল অথবা যে কোন সমর্থন বা উত্তম সঙ্গী দিতে চেয়েছিল? কিন্তু কোন কিছুতেই কাজ হয়নি। বরং দুনিয়া তাদেরকে বিপদাপন্ন করেছে, দুর্যোগ এনে তাদেরকে অসাড় করে দিয়েছে, আকস্মিক বিপর্যয় দ্বারা তাদেরকে নিগৃহীত করেছে, তাদেরকে ধাক্কা মেরে উপুড় করে ফেলে দিয়েছে, খুরের নীচে দলিত মথিত করেছে এবং তাদের বিরুদ্ধে সময়ের উত্থান-পতনের সহায়তা করেছে। তোমরা নিশ্চয়ই তাদের প্রতি দুনিয়ার অদ্ভুত আচরণ লক্ষ্য করেছো যারা এর নিকটে গিয়েছিলো, অর্জন করেছিলো, উপযোজন করেছিলো এবং চিরতরে এটা হতে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলো। দুনিয়া কি তাদেরকে ক্ষুধা-তৃষ্ণা ছাড়া অন্য কোন রসদ দিয়েছিলো? উহা কি তাদেরকে সংকীর্ণ স্থান ছাড়া অন্যকোন বাসস্থান দিয়েছিলো? উহা কি তাদেরকে অন্ধকার ছাড়া আলো এবং অনুশোচনা ছাড়া অন্য কিছু দিতে পেরেছিলো? এটাই কি সেটা নয় যা তোমরা বেশী বেশী পেতে চাও, যাতে তোমরা সন্তুষ্ট থাকো এবং যার প্রতি তোমরা লোভাতুর থাকো? কত নিকৃষ্ট এ আবাসস্থল যা তারা অনুমান করতে পারেনি এবং উহা হতে তাদের ভয়ের উদ্রেক হয়নি?

মনে রেখো, দুনিয়াকে পরিত্যাগ করে তোমাদেরকে চলে যেতেই হবে। তোমরা তাদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর "যারা বলতো আমাদের চেয়ে শক্তিশালী আর কে আছে" (কুরআন-৪১ ঃ ১৫)। তাদেরকেও কবরে

নেয়া হয়েছিল কিন্তু সওয়ার হিসাবে নয়। তাদেরকে কবরে থাকতে দেয়া হয়েছিল কিন্তু মেহমান হিসাবে নয়। তাদের কবর মাটিতেই হয়েছিল। তাদের কাফন কাপড়েরই ছিল। পুরাতন হাড় তাদের প্রতিবেশী হয়েছিল। এটা এমন প্রতিবেশী যা আহবানে সাড়া দেয় না, বিপদে সাহায্য করে না এবং কাঁদলে ফিরেও তাকায় না।

বৃষ্টি হলে তারা (কবরবাসী) আনন্দ অনুভব করে না এবং দুর্ভিক্ষে তারা হতাশ হয় না। তারা একত্রিত কিন্তু একে অপর হতে আলাদা। তাঁরা একে অপরের নিকটবর্তী কিন্তু কেউ কাউকে দেখে না। তারা একে অপরের সাথে সাক্ষাত করে না। তারা সহিষ্ণু এবং কারো প্রতি কোন ঘৃণাবোধ নেই। তারা অজ্ঞ এবং তাদের দ্বারা কারো ক্ষতির সম্ভাবনা মরে গেছে। তাদের কাছ থেকে বিপদের কোন আশংকা নেই এবং বিপদে তারা সাহায্য করতে পারবে এমন আশাও নেই। তারা পৃথিবীর পিঠকে (উপরিভাগ) পেটের (অভ্যন্তরভাগ) সাথে, বিশালতাকে সংকীর্ণতার সাথে, পরিজনকে (বেষ্টিত অবস্থা) একাকীত্বের সাথে এবং অন্ধকারকে আলোর সাথে বিনিময় করে নিয়েছে। তারা যেভাবে এ পৃথিবীতে এসেছিল সেভাবেই খালি পায়ে ও নিরাবরণ শরীরে চলে গেছে। তারা তাদের স্থায়ী জীবন ও আবাসে শুধুমাত্র তাদের আমল নিয়ে গেছে। আল্লাহ্ বলেন ঃ

যেভাবে আমরা প্রথমে সৃষ্টি করেছিলাম সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করব; (ইহা এমন) এক ওয়াদা যা পূর্ণ করার দায়িত্ব আমাদের, অবশ্যই ইহা আমরা করবো (কুরআন-২১ :১০৪)।

★★★★★

খোৎবা-১১১

আজরাইল ও রুহের প্রস্থান সম্পর্কে

আজরাইল যখন কোন ঘরে প্রবেশ করে তোমরা কি টের পাও? যখন সে কারো রুহ্ নিয়ে চলে যায় তোমরা কি তাকে দেখতে পাও? মায়ের গর্ভাশয়ের মধ্যে অবস্থিত ভ্রূণের প্রাণবায়ু কি করে সে নিয়ে যায়? সে কি (মায়ের) শরীরের কোন অংশ দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে ইহা বের করে আনে? না কি, আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে তার ডাকে রুহ সাড়া দেয়? অথবা সে কি ভ্রূণের সাথে মায়ের ভেতরেই থাকে? যে ব্যক্তি এভাবে একটি বান্দার বর্ণনা ও ব্যাখ্যা দিতে অক্ষম সে কি করে আল্লাহ্র বর্ণনা দেবে?

★★★★★

খোৎবা-১১২

দুনিয়া ও এর মানুষ সম্পর্কে

এ দুনিয়া সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে সতর্ক করি কারণ ইহা টলমলায়মান আবাসস্থল। এটা জাবনার জন্য ঘর নয়। দুনিয়া ছলনা দ্বারা নিজেকে সুসজ্জিত করেছে এবং এ সাজ-সজ্জা দ্বারাই এটা প্রবঞ্চনা করে। এটা এমন এক ঘর যা আল্লাহ্র কাছে অত্যন্ত নিম্নমানের। সুতরাং তিনি এতে হালালের সাথে হারামের, ভাল'র সাথে মন্দের, জীবনের সাথে মৃত্যুর এবং মধুরতার সাথে তিক্ততার সংমিশ্রণ করেছেন। আল্লাহ্ দুনিয়ার ভালগুলো তাঁর প্রেমিকদের জন্য অকাতরে দেননি এবং তাঁর শত্রুদের জন্য তাতে কার্পণ্য করেননি। দুনিয়ার ভালগুলো কষ্টে লভ্য। এর মন্দগুলো হাতের কাছে-সহজলভ্য। এর সঞ্চয় ক্রমশ কমে যাবে। এর কর্তৃত্ব কেড়ে নেয়া হবে। ইহার অধিবাসী নিঃসঙ্গ হয়ে পড়বে। যে ঘর পতনোন্মুখ নির্মাণের মত পড়ে যায় তাতে কি শুভ নিহিত থাকতে পারে?

রসদ ফুরিয়ে গেলে যে বয়স নিঃশেষ হয় তাতে কি মঙ্গল নিহিত থাকতে পারে? অথবা যে সময় ভ্রমণের মত অতিক্রান্ত হয়ে যায় তাতে কি কল্যাণ থাকতে পারে?

তোমাদের চাহিদার মধ্যে সে সব বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে নাও যা আল্লাহ্ তোমাদের জন্য বাধ্যতামূলক করেছেন। তিনি তোমাদেরকে যা করতে বলেছেন তা পরিপূর্ণ করার জন্য তাঁর কাছেই প্রার্থনা কর। মৃত্যু দ্বারা আমন্ত্রিত হবার পূর্বেই মৃত্যুর ডাক শোনার জন্য তোমাদের কানকে প্রস্তুত কর। নিশ্চয়ই, এ দুনিয়াতে সংযমীগণের হৃদয় ক্রন্দনরত থাকে যদিও (বাহ্যিকভাবে দেখা যায়) তারা হাসে এবং তারা শোকাভিভূত থাকে যদিও তাদেরকে আনন্দিত মনে হয়। তাদের আত্ম-ঘৃণা অত্যধিক যদিও যে জীবনোপকরণ তাদেরকে মঞ্জুর করা হয়েছে তার জন্য তারা হিংসার পাত্র হতে পারে। যখন মিথ্যা আশা তোমাদের মনে জাগে তখন তোমাদের হৃদয় হতে মৃত্যুর স্মরণ তিরোহিত হয়ে যায়। সুতরাং পরকাল অপেক্ষা ইহকাল তোমাদের ওপর অধিক প্রভুত্ব করছে এবং আশু ফলাফল (লাভ) তোমাদেরকে দূরবর্তী লাভ (পরকাল) হতে সরিয়ে দিয়েছে। আল্লাহ্‌র দ্বীনে তোমরা ভ্রাতা। নোংরা স্বভাব ও মন্দ মানসিকতা তোমাদেরকে আলাদা করে রেখেছে। ফলতঃ তোমরা একে অপরের বোঝা বহন কর না, একে অপরকে উপদেশ দাও না, একে অপরের জন্য ব্যয় কর না এবং একে অপরকে ভালবাস না।

তোমাদের এ কি অবস্থা? এ দুনিয়া হতে যা কিছু সামান্য সংগ্রহ করেছো তাতেই তোমরা সন্তোষ অনুভব কর অথচ পরকালের অনেক কিছু হতে তোমরা বঞ্চিত হয়েও শোকাতুর হও না। দুনিয়ার সামান্য কিছু হারালে তোমরা এত বেদনাতুর হও যা তোমাদের মুখেই প্রতিভাত হয় (মুখ মলিন হয়); এত অধৈর্য হয়ে পড় যে, মনে হয় দুনিয়া তোমাদের স্থায়ী আবাস এবং দুনিয়ার সম্পদ চিরদিন তোমাদের সঙ্গে থাকবে। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য ভীত সে তা তার সাথীর কাছে প্রকাশ করতে কোন কিছুই তাকে বাধা দেয় না। সে শুধুমাত্র ভয় করে যে, তার সাথীও অনুরূপ ত্রুটি-বিচ্যুতি প্রকাশ করবে কিনা। পরকালকে ত্যাগ করে ইহকালকে ভালবাসার জন্য তোমরা সকলে মিলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছো। তোমাদের দ্বীন কেবলমাত্র জিহ্বার লেহনে পরিণত হয়েছে। এটা সে ব্যক্তির কাজের মত যে কাজ সম্পন্ন করেছে এবং তার মনিবের সন্তুষ্টি অর্জন করেছে।

★★★★★

খোৎবা-১১৩

সংযম, আল্লাহ্‌র ভয় ও পরকালের রসদ সম্পর্কে

প্রতিষ্ঠিত প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি নেয়ামতকে প্রশংসার অনুবর্তী করেছেন এবং কৃতজ্ঞতাকে নেয়ামতের অনুবর্তী করেছেন। আমরা তাঁর প্রশংসা করি তাঁর নেয়ামত ও পরীক্ষার জন্য। আমরা তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করি সেসব হৃদয়ের বিরুদ্ধে যারা তাঁর আদেশ পালনে বিলম্ব করে এবং তিনি যা নিষিদ্ধ করেছেন উহার দিকে দ্রুত এগিয়ে যায়। আমরা তাঁর ক্ষমা ভিক্ষা করি তা হতে যা তাঁর জ্ঞান ঢেকে রাখে অথচ তাঁর দলিল জ্ঞান সংরক্ষণ করে যাতে কোন কিছু বাদ পড়ে না। আমরা তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করি সেই ব্যক্তির বিশ্বাসের মত যে অজানাকে দেখেছে ও প্রতিশ্রুত পুরস্কার অর্জন করেছে; যার বিশ্বাসের পবিত্রতা আল্লাহ্‌র অংশীদারিত্বের বিশ্বাস হতে তাকে দূরে রেখেছে এবং যার দৃঢ় প্রত্যয় সকল সংশয় দূরীভূত করেছে।

আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি এক, তাঁর কোন অংশীদার নেই এবং মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর বান্দা ও রাসুল। এ দু'টো ঘোষণা কথা ও আমলকে সমুচ্চ করে। যে মিজানে (পাল্লায়) এ

দু'টো ঘোষণা রাখা হবে তা কখনো হালকা হবে না, আবার যে মিজান থেকে এ দু'টো সরিয়ে নেয়া হয় তা কখনো ভারী হবে না।

তাকওয়ার নির্দেশ

হে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ, আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি আল্লাহ্‌কে ভয় করার জন্য যা তোমাদের পরকালের রসদ এবং এটা নিয়েই তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে। এ রসদ তোমাদেরকে গন্তব্যস্থানে পৌছে দেবে এবং তোমাদের প্রত্যাবর্তন সফল হবে। সে-ই সর্বোত্তম যে মানুষকে এর দিকে আহ্বান করে শোনাতে সক্ষম হয়েছে এবং সর্বোত্তম শ্রোতা এটা শুনেছে। সুতরাং আহ্বানকারী ঘোষণা করেছে এবং শ্রোতা শুনেছে ও সংরক্ষণ করেছে।

হে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ, নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র ভয় আল্লাহ্‌র প্রেমিকগণকে হারাম জিনিস হতে রক্ষা করেছে এবং তাঁর ভয় তাদের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে জন্য তারা রাত্রি কাটায় বিনিদ্র অবস্থায় ও দিবস কাটায় তৃষ্ণায়। সুতরাং তারা বিপদের মাধ্যমেই আরাম ও তৃষ্ণার মাধ্যমেই সুমিষ্ট পানি লাভ করে। তারা মৃত্যুকে অতি নিকটে মনে করে এবং সে কারণে উত্তম আমলের দিকে দ্রুত এগিয়ে যায়। তারা তাদের কামনা-বাসনাকে বাতিল করে দিয়েছে এবং সে জন্য মৃত্যুকে তাদের দৃষ্টিতে রাখে।

এ দুনিয়া ধ্বংসের, দুর্ভোগের, পরিবর্তনের ও শিক্ষার ক্ষেত্র। ধ্বংসের এ জন্য যে, সময়ের ধনুক প্রস্তুত আছে এবং উহার তীর কখনো লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না; উহার ক্ষত শুকায় না; উহা মৃত্যু দ্বারা জীবিতকে, পীড়া দ্বারা স্বাস্থ্যবানকে দুর্দশা দ্বারা নিরাপদকে আক্রমণ করে। দুনিয়া এমন এক ভক্ষক যে কখনো তৃপ্ত হয় না এবং এমন পানকারী যার তৃষ্ণা কখনো নিবারিত হয় না। দুর্ভোগ এজন্য যে, একজন মানুষ যতটুকু সংগ্রহ করে ততটুকু সে খায় না এবং যা নির্মাণ করে তাতে সে বসবাস করে না। অতঃপর সে আল্লাহ্‌র কাছে চলে যায় কিন্তু সে তার সম্পদ ও ইমারত তথায় স্থানান্তর করতে পারে না।

পরিবর্তন এ জন্য যে, তোমরা দেখ একজন শোচনীয় অবস্থার লোক ঈর্ষার পাত্র হয়ে যায় আবার একজন ঈর্ষার পাত্র লোকও শোচনীয় অবস্থায় পড়ে। এটা এ কারণে যে, তার সম্পদ চলে গেছে এবং তার দুর্ভাগ্য এসে পড়েছে। শিক্ষা এজন্য যে, একজন লোক তার কামনা-বাসনার দ্বারপ্রান্তে পৌছাতেই মৃত্যু হাজির হয়ে উহা হতে তাকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়; তখন তার কামনার বস্তুও অর্জিত হয় না এবং তাকেও ছেড়ে দেয়া হয় না। হায় আল্লাহ্, দুনিয়ার আনন্দ কত ছলনাময়ী, এর পানীয় কত তৃষ্ণা উদ্দীপক এবং এর ছায়া কত রৌদ্রোজ্জ্বল। যে হাজির হয় (মৃত্যু) তাকে ফেরত দেয়া যায় না এবং যে চলে যায় সে ফিরে আসে না। হায় আল্লাহ্, জীবিতগণ মৃতগণের কতই না নিকটবর্তী, কারণ জীবিতগণ অতি শীঘ্রই মৃতগণের সাথে সাক্ষাত করবে এবং মৃতগণ জীবিতগণ হতে কতই না দূরে কারণ তারা জীবিতগণকে ছেড়ে চলে গেছে।

নিশ্চয়ই পাপের শাস্তি ব্যতীত পাপ অপেক্ষা কদর্য আর কিছু নেই এবং কল্যাণের পুরস্কার ব্যতীত কল্যাণ অপেক্ষা উত্তম কিছু নেই। ইহকালে যা কিছু শ্রুত হয় তা দৃষ্ট বস্তু অপেক্ষা ভাল এবং পরকালে যা কিছু দৃষ্ট হয় তা শ্রুত বস্তু অপেক্ষা ভাল। সুতরাং তোমরা দেখা অপেক্ষা শ্রুতি দ্বারা এবং অজানা বিষয়ের সংবাদ দ্বারা নিজেদেরকে তুষ্ট করতে পার। জেনে রাখো, যে বস্তু দুনিয়াতে স্বল্প অথচ পরকালে অধিক তা সেই বস্তু অপেক্ষা উত্তম যা দুনিয়াতে অধিক অথচ পরকালে স্বল্প। এমন অনেক ক্ষেত্র আছে যেখানে স্বল্পতা লাভজনক এবং আধিক্য লোকসানদায়ক।

নিশ্চয়ই তোমাদেরকে যে কাজ করতে আদেশ দেয়া হয়েছে তা নিষিদ্ধ কাজ হতে প্রশস্ত এবং তোমাদের জন্য যা হালাল করা হয়েছে তা হারাম কাজ অপেক্ষা অধিক। কাজেই যা কম তা ত্যাগ কর এবং যা বেশী তা কর, যা সীমিত তা ত্যাগ কর এবং যা বিশাল তা কর। আল্লাহ্ তোমাদের জীবিকার নিশ্চয়তা দিয়েছেন এবং আমল করার

জন্য আদেশ দিয়েছেন। সুতরাং যে বিষয়ে নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে তা লাভের চেষ্টা কখনো সে বিষয়ের ওপর অগ্রাধিকার পেতে পারে না যা সম্পাদন করতে আদেশ দেয়া হয়েছে।

কিন্তু আল্লাহ্র কসম, অধিকাংশ ক্ষেত্রে অবস্থা এমন হয়েছে যে, সংশয় অভিভূত করে ফেলেছে ও নিশ্চয়তা চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হয়েছে এবং মনে হয়, যে বিষয়ে তোমাদেরকে নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে তা তোমাদের কাছে বাধ্যতামূলক হয়ে গেছে আর যা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে তা যেন তোমাদের কাছ থেকে তুলে নেয়া হয়েছে। সুতরাং আমলে সালেহার দিকে দ্রুত এগিয়ে যাও এবং মৃত্যুর আকস্মিকতাকে ভয় কর; কারণ জীবিকা ফিরে পাওয়া যেভাবে আশা করতে পার, বয়স ফিরে পাওয়াকে সেভাবে আশা করতে পার না। জীবিকা হতে আজ যা হারিয়ে যায় আগামীকাল বর্ধিত আকারে তা পেতে পার কিন্তু গতকাল বয়স থেকে যা হারিয়েছ আজ আর উহার প্রত্যাসন আশা করা যায় না। যা আসবে শুধু উহার জন্যই আশা, যা চলে গেছে উহার জন্য শুধু হতাশা। সুতরাং, "আল্লাহ্কে ভয় কর, যেভাবে ভয় করা কর্তব্য এবং মুসলিম না হওয়া পর্যন্ত তোমরা মরো না।" (কুরআন-৩ঃ১০২)

★★★★★

খোৎবা-১১৪

বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা

হে আমার আল্লাহ্, নিশ্চয়ই আমাদের পর্বতগুলো শুকিয়ে গেছে এবং আমাদের মাটি ধুলাময় হয়ে গেছে। আমাদের গবাদি পশু তৃষ্ণার্ত এবং তাদের বেষ্টনীর মধ্যে হতাশাগ্রস্থ হয়ে আছে। উহারা সন্তান হারা মায়ের মত আর্তনাদ করছে। উহারা চারণভূমিতে যেতে ক্লান্তি অনুভব করছে এবং উহারা প্রস্রবণের দিকে যেতে উদগ্রীব। হে আমার আল্লাহ্, উহাদের আর্তনাদ ও আকুল আকাঙ্খার প্রতি দয়া কর। হে আমার আল্লাহ্, উহাদের হতাশার প্রতি দয়া কর।

হে আমার আল্লাহ্, আমরা তোমার কাছে এসেছি যখন অনেক বছরের খরা কৃশ-উটপালের মত আমাদের ওপর ভিড় করেছে এবং যখন বৃষ্টির মেঘ আমাদেরকে পরিত্যাগ করেছে। তুমিই আক্রান্তের আশা-ভরসা এবং তুমিই যাচনাকারীর সাহায্যদাতা। আমরা তোমাকে এমন এক সময়ে ডাকছি যখন মানুষ সকল আশা হারিয়ে ফেলেছে, আকাশে মেঘ নেই এবং গবাদি পশু মরছে। আমাদের কাজের জন্য আমাদেরকে পাকড়াও করো না, আমাদের পাপের জন্য আমাদেরকে ফাঁদে ফেলে ধরো না এবং বৃষ্টির মেঘের মাধ্যমে আমাদের ওপর তোমার রহমত বর্ষণ কর যাতে ফলবান বৃক্ষের ফুল বিকশিত হয়, বিস্ময়-বিহ্বল করে তোলে এমন উদ্ভিদ গজায়, বিশুষ্ক প্রান্তর প্রাণ ফিরে পায় ও যা হারিয়ে গেছে তা যেন ফিরে আসে।

হে আমার আল্লাহ্, তোমার কাছ থেকে আমাদেরকে বৃষ্টি দাও যা হবে প্রাণদায়ক, সন্তুষ্টিদায়ক, ব্যাপক, চতুর্দিকে ছড়ানো, পরিশুদ্ধ, সুখদায়ক, পর্যাপ্ত ও প্রাণসঞ্চারক। (এমন বৃষ্টি প্রদান কর) যেন বৃক্ষ-লতাদি ও তৃণ-শস্য সমৃদ্ধ হয়, গাছের শাখা ফলপূর্ণ হয় এবং পাতা সবুজ হয়। তোমার বান্দাদের মধ্যে দুর্বলকে তুমি বৃষ্টি দ্বারা পুষ্ট কর এবং মৃত নগরসমূহে প্রাণের সঞ্চার কর।

হে আমার আল্লাহ্, তোমার কাছ থেকে আমাদেরকে বৃষ্টি দাও যাতে আমাদের উঁচু ভূমি সবুজ শাক-সব্জীতে ঢেকে যায়, স্রোত প্রবাহ পায়, আমাদের মাঠসমূহ সবুজ ঘাসে ভরে যায়, আমাদের ফল সতেজ হয়ে ওঠে, আমাদের গবাদি-পশু বৃদ্ধি পায়, আমাদের সুদূর প্রসারিত প্রান্তর জল-বিধৌত হয় এবং আমাদের শুষ্ক এলাকা উপকৃত হয়। তোমার দুর্দশাগ্রস্থ পৃথিবী ও প্রাণীকূলকে তোমার অগণিত অনুদান ও সীমাহীন নেয়ামত দ্বারা রক্ষা কর। আমাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষণ কর যা হবে নিষিক্তনীয়, নিরবচ্ছিন্ন ও ভারী এবং উহা এমনভাবে বর্ষণ কর যেন

এক পশলা আরেক পশলার সথে সংঘর্ষ করে এবং এক ফোটা অন্য ফোটাকে ধাক্কা দেয়। আকাশে চমকানো বিজলী যেন প্রবঞ্চক না হয়, বৃষ্টিহীনতার ধৃষ্টতা না দেখায়, সাদা মেঘ যেন ছড়িয়ে না পড়ে, বৃষ্টি যেন হালকা না হয় যাতে দুর্ভিক্ষ-পীড়িতগণ প্রচুর শাক-সবজী দ্বারা বাঁচতে পারে এবং খরা-পীড়িত এলাকায় যাতে ইহার পরম সুখ দ্বারা প্রাণের সঞ্চার হয়। নিশ্চয়ই, মানুষ হতাশ হবার পর তুমি বৃষ্টি বর্ষণ কর এবং তোমার রহমত ছড়িয়ে দাও যেহেতু তুমিই অভিভাবক ও প্রশংসিত।

★★★★★

খোৎবা-১১৫

ভবিষ্যতের বিপদ সম্পর্কে

আল্লাহ্ রাসুলকে (সঃ) সত্যের দিকে আহ্বায়ক এবং বান্দার সাক্ষী হিসাবে নিযুক্ত করেছিলেন। রাসুল (সঃ) আল্লাহ্‌র বাণী কোন প্রকার অলসতা ও ক্রুটি-বিচ্যুতি ছাড়া মানুষের কাছে পৌছে দিয়েছেন এবং তিনি কোন প্রকার অবসন্নতা ও ওজর ছাড়া আল্লাহ্‌র জন্য তাঁর শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। তাকওয়ায় তিনি ছিলেন সকলের অগ্রণী এবং যারা হেদায়েত লাভ করেছিল তাদের সকলের চেয়ে তাঁর প্রত্যক্ষকরণ ক্ষমতা ছিল অধিক।

তাঁর নিজের লোকদের সম্পর্কে অনুযোগ

গুপ্ত বিষয় সম্পর্কে আমি যা জানি, যা তোমাদের কাছে আবরিত (গোপন) রাখা হয়েছে তা যদি তোমরা জানতে পারতে তাহলে নিশ্চয়ই তোমরা তোমাদের কর্মকান্ডের জন্য প্রকাশ্যে ক্রন্দন করতে এবং শোকে নিজের শরীরে আঘাত করতে এবং কোন পাহারা ও বিকল্প ছাড়া তোমাদের সম্পদ পরিত্যাগ করতে। তখন তোমরা প্রত্যেকেই অন্যের প্রতি মনোযোগ ছেড়ে দিয়ে নিজের প্রতি যত্নশীল হতে। কিন্তু যা তোমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছিল তোমরা তা ভুলে গেছ এবং যে বিষয়ে তোমাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল তা হতে তোমরা নিজেদেরকে নিরাপদ মনে করেছিলে। ফলে তোমাদের ধ্যান-ধারণা বিপথে গিয়েছিল এবং তোমাদের কর্মকান্ড বিশৃঙ্খল হয়ে গেছে।

আমি ইচ্ছা পোষণ করি আল্লাহ্ যেন আমার ও তোমাদের মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করেন এবং আমাকে এমন লোক দেন যাদের আমার সাথে থাকার জন্য তোমাদের চেয়ে বেশী অধিকার আছে। আল্লাহ্‌র কসম, তারা সুখদায়ক ধ্যান-ধারণার, সুগভীর প্রজ্ঞাবান ও সত্য ভাষণকারী লোক। তারা বিদ্রোহ হতে দূরে থাকে। তারা আল্লাহ্‌র পথে দৃঢ় পদ এবং সহজ সরল পথে চলে। ফলে তারা পরকালের অনন্ত জীবনে সুখ ও সম্মান অর্জন করেছে।

সাবধান! আল্লাহ্‌র কসম, বনি ছাকিফ এর হেলে দুলে চলন ভঙ্গির একটা লম্বা ছোকরাকে[১] তোমাদের কর্তৃত্ব দেয়া হবে। সে তোমাদের গাছপালা খেয়ে ফেলবে এবং তোমাদের শরীরের চর্বি গলিয়ে ফেলবে। সুতরাং হে 'আবা ওয়াজাহাহ্', এখানেই শেষ করলাম।

১। এখানে যে লোকটির কথা বলা হয়েছে সে হলো হাজ্জাজ ইবনে ইউছুফ আছ-ছাকাফি। 'আল-ওয়াজাহাহ্' অর্থ হলো 'আল-খুনফুসা' যার বাংলা অর্থ হলো গুবরে পোকা। একদিন নামায পড়ার সময় একটি গুবরে-পোকা হাজ্জাজের দিকে এগিয়ে আসে। সে হাত দিয়ে সরিয়ে দিতে গেলে উহা তার হাতে কামড় দেয়। এতে তার হাত ফুলে যায় এবং শেষ পর্যন্ত এতে সে মারা যায়। ইবনে আবিল হাদীদ লিখেছেন 'আল-ওয়াজাহাহ্' অর্থ হলো পশুর লেজে লেগে থাকা বিষ্ঠা। হাজ্জাজের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করার জন্যই তাকে এ নামে সম্বোধন করা হয়েছে।

★★★★★

খোৎবা-১১৬

কৃপণদের প্রতি তিরস্কার

যিনি তোমাদেরকে সম্পদ দিয়েছেন তোমরা তাঁর উদ্দেশ্যে উহা ব্যয় কর না এবং যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর জন্য তোমরা জীবনের ঝুঁকি গ্রহণ কর না। তোমরা আল্লাহ্‌র মাধ্যমে তাঁর বান্দাদের নিকট সম্মানিত কিন্তু আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্যে তোমরাই আল্লাহ্‌কে সম্মান কর না। তোমরা তাদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর যারা তোমাদের পূর্ববর্তী এবং যাদের স্থান তোমরা দখল করে আছো। তোমাদের নিকটতম ভ্রাতাগণের প্রস্থান হতেও শিক্ষা গ্রহণ কর।

★★★★★

খোৎবা-১১৭

বিশ্বস্ত সাথীদের প্রশংসা

তোমরা সত্যের (হক) সমর্থক এবং ইমানী ভাই। তোমরা দুঃখের দিনের ঢাল এবং অন্য লোকদের মধ্যে আমার আমানত। তোমাদের সমর্থনেই আমি (সত্য পথ হতে) পলাতকগণকে আঘাত করি এবং যারা সামনের দিকে এগিয়ে আসে তাদের আনুগত্য পাওয়ার আশা করি। সুতরাং আমার প্রতি এমন সমর্থন প্রসারিত কর যা হবে প্রবঞ্চনা ও সন্দেহমুক্ত। আল্লাহ্‌র কসম, মানুষের জন্য আমিই অন্য সকলের চেয়ে বেশী বরণীয়।

★★★★★

খোৎবা-১১৮

আমিরুল মোমেনিন লোকবল সংগ্রহ করে তাদেরকে জিহাদে উদ্বুদ্ধ করলেন কিন্তু তারা দীর্ঘদিন নিশ্চুপ হয়ে বসে রইলো। তখন তিনি বললেন,"তোমাদের কি হয়েছে? তোমরা কি বোবা হয়ে গেলে?" একদল প্রত্যুত্তরে বললো. "হে আমিরুল মোমেনিন, যদি আপনি যান তবে আমরাও আপনার সাথে যাবো।" এতে আমিরুল মোমেনিন বললেন ঃ

তোমাদের কি হয়েছে? তোমরা সঠিকভাবে পরিচালিত হতে পার না এবং সঠিক পথ দেখতে পাও না। বিদ্যমান অবস্থায় আমি কি যেতে পারি? বস্তুতঃ এ সময় আমি তোমাদের মধ্য হতে একজন সাহসী ও নির্ভিক ব্যক্তিকে, যাকে আমি মনোনীত করে দেব, তোমাদের সঙ্গে প্রেরণ করবো। সৈন্যবাহিনী, নগরী, বায়তুল মাল, জমির খাজনা—এসব অরক্ষিত অবস্থায় ত্যাগ করে আমার যাওয়া শোভা পায় না। তদুপরি মুসলিমদের মধ্যে ন্যায় বিচার বিধান করা, জনগণের দাবি-দাওয়া দেখাশোনা করা, এদিক সেদিক একের পর এক বাহিনী প্রেরণ করা—এসব ছেড়ে আমার যাওয়া শোভনীয় হয় না।

আমি আটা-কলের মধ্য-শলাকা। আমি নিজের অবস্থানে থাকলে চাক্কি আমাকে কেন্দ্র করে ঘুরবে। যখনই আমি সরে যাব অমনি ঘূর্ণনে ব্যাঘাত সৃষ্টি হবে এবং নীচের পাথরও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আল্লাহ্‌র কসম, (তোমরা যা বলেছো) এটা একটা মন্দ উপদেশ। আল্লাহ্‌র কসম, শত্রুর মোকাবেলায় যদি আমি শাহাদাতের আশা পোষণ না করতাম এবং তার সাথে আমার মোকাবেলা যদি পূর্বনির্ধারিত না হতো তবে আমি আমার বাহনে চড়ে তোমাদের কাছ থেকে বেরিয়ে পড়তাম এবং উত্তর ও দক্ষিণ আলাদা না হওয়া পর্যন্ত তোমাদের সাহায্য চাইতাম না।

তোমাদের সংখ্যাধিক্য দ্বারা কোন লাভ নেই, কারণ তোমাদের হৃদয়ে ঐক্যের অভাব। আমি তোমাদেরকে স্বচ্ছ পথেই রেখেছি যেখানে তোমাদের কেউ ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে না, কেবলমাত্র যে নিজেকে ধ্বংস করে সে ছাড়া। যে ব্যক্তি এ পথে লেগে থাকবে সে বেহেশত লাভ করবে এবং যে এ পথ থেকে সরে যাবে সে দোযখে যাবে।

★★★★★

খোৎবা-১১৯

আহলুল বাইতের মহত্ব সম্পর্কে

আল্লাহ্‌র কসম, (আল্লাহর) বাণীবাহন, প্রতিশ্রুতি পূরণ ও সম্পূর্ণ অভিব্যক্তি সম্বন্ধে আমার জ্ঞান আছে। আমরা আহলুল বাইতগণ জ্ঞানের দরজা ও শাসনের আলো। সাবধান, দ্বীনের পথ একটি এবং এর রাজপথ সোজা। যে তাদেরকে অনুসরণ করে সে লক্ষ্য অর্জন করে ও উদ্দেশ্য হাসিল করে এবং যে তাদের থেকে দূরে দাঁড়িয়ে থাকলো সে পথভ্রষ্ট হলো ও অনুশোচনা করলো।

সেই দিনের জন্য আমল কর যেদিনের জন্য রসদ সঞ্চিত করতে হয় এবং যেদিন (প্রত্যেকের) নিয়্যত পরীক্ষিত হবে। যদি কোন লোকের নিজের বুদ্ধিমত্তা তাকে সাহায্য না করে তবে অন্য লোকের বুদ্ধি তার কোন উপকারে আসে না এবং যারা তার কাছ থেকে দূরে তারা অধিকতর অকার্যকর। আগুনকে ভয় কর যার শিখা ভয়ঙ্কর, যার গর্ত গভীর, যার পোষাক লোহা এবং যার পানীয় রক্তমাখা পুঁজ। সাবধান, মহিমান্বিত আল্লাহ্ কোন লোকের সুনাম মানুষের মাঝে রেখে দেন যা সম্পদ অপেক্ষা অধিকতর ভাল কারণ যারা সম্পদের উত্তরাধিকারী হয় তারা তার প্রশংসা করে না।

★★★★★

খোৎবা-১২০

আমিরুল মোমেনিনের অনুচরদের মধ্যে একজন দাঁড়িয়ে বললো, " হে আমিরুল মোমেনিন, আপনি প্রথমে সালিশীতে আমাদেরকে বারণ করেছিলেন এবং পরে উহার জন্য আদেশ দিয়েছিলেন। আমরা জানি না এ দু'টোর কোন্‌টি বেশী সঠিক।" এতে আমিরুল মোমেনিন এক হাত অপর হাতের ওপর থাপ্পড় দিয়ে বললেনঃ

যে ব্যক্তি অঙ্গীকার ভঙ্গ করে এটাই তার পুরস্কার। আল্লাহ্‌র কসম, যখন আমি সালিশী মান্য না করার জন্য তোমাদেরকে আদেশ দিয়েছিলাম তখন আমি তোমাদেরকে একটা অবাঞ্ছিত বিষয়ের (যুদ্ধ) দিকে পরিচালিত করছিলাম যাতে আল্লাহ্ মঙ্গল নিহিত রেখেছিলেন। যদি তোমরা দৃঢ়-সংকল্প চিত্তের হতে আমি তোমাদেরকে পরিচালিত করতাম, যদি তোমরা বেঁকে যেতে আমি তোমাদেরকে সোজা করতাম এবং যদি তোমরা অস্বীকার করতে আমি তোমাদেরকে সংশোধন করতাম। এটাই ছিল সব চাইতে সুনিশ্চিত পথ। কিন্তু কার সাথে ও কাকে সে পথের কথা বলবো। আমি তোমাদের কাছে আমার চিকিৎসা চেয়েছিলাম কিন্তু তোমরা আমার রোগ হয়ে গিয়েছিলে। (অবস্থা এমন করেছিলে যে) কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে গিয়ে উৎপাটক জানতে পারলো যে, তার হাতের কাঁটাটি ভেঙ্গে ভেতরে রয়ে গেছে।

হায় আল্লাহ! চিকিৎসকগণ এ ঘাতক রোগে হতাশ হয়ে গেল এবং পানি উত্তোলনকারীগণ এ কূপের দড়িতে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়লো। কোথায় তারা যারা ইসলামের প্রতি আমন্ত্রিত হয়েছিল এবং তারা তা গ্রহণ করেছিল? তারা কুরআন তেলওয়াত করতো এবং তদানুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতো। তারা যুদ্ধের প্রতি উদ্বুদ্ধ ছিল এবং উষ্ট্রি যেভাবে উহার শাবকের দিকে ধাবিত হয় তারাও সেভাবে জিহাদের দিকে ধাবিত হতো। তারা তাদের তরবারি কোষ থেকে বের করে দলে দলে সারিবদ্ধভাবে জিহাদের জন্য বেরিয়ে পড়তো। তাদের কেউ কেউ মৃত্যুবরণ করতো, কেউ কেউ গাজী হয়ে ফিরে আসতো। না তারা গাজী হবার সুখবরে আনন্দিত হতো, আর না তারা মৃত সম্পর্কে সান্ত্বনা পেতো। কাঁদতে কাঁদতে তাদের চোখ সাদা হয়ে গিয়েছিল। রোজা রাখতে রাখতে তাদের পেট কৃশ হয়ে গিয়েছিল। অত্যধিক নামাজের কারণে তাদের ঠোঁট শুকিয়ে গিয়েছিল। রাত্রি জাগরণের কারণে তাদের বর্ণ পান্ডুর হয়ে গিয়েছিল। তাদের মুখে খোদা-ভীতির চিহ্ন ছিল। এরাই ছিল আমার সাথী যারা গত হয়ে গেছে।

নিশ্চয়ই, শয়তান তার পথকে তোমাদের জন্য সহজ করে দিয়েছে এবং দ্বীনের বন্ধন একটির পর একটি খুলে ফেলতে চায় যাতে তোমাদের মধ্যে ঐক্যের পরিবর্তে বিভেদ সৃষ্টি হয়। তার কুমন্ত্রণা ও জাদুমন্ত্র থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখ এবং কেউ সদুপদেশ দিলে তা গ্রহণ করে মনে রেখো।

★★★★★

খোৎবা-১২১

যখন খারিজীগণ সালিশী প্রত্যাখ্যানের জন্য অনড় অবস্থান গ্রহণ করলো তখন আমিরুল মোমেনিন তাদের ক্যাম্পের কাছে গিয়ে তাদেরকে সম্বোধন করে বললেনঃ

তোমরা সবাই কি সিফ্‌ফিনে আমাদের সঙ্গে ছিলে? প্রত্যুত্তরে তারা বললো যে, কেউ কেউ ছিল, কেউ কেউ ছিল না। আমিরুল মোমেনিন বললেন, তাহলে তোমরা দু'ভাগে বিভক্ত হও। যারা সিফফিনে ছিলে তারা এক দিকে যাও আর যারা সিফফিনে ছিলে না তারা একদিকে যাও যাতে আমি প্রত্যেক দলকে যথোচিতভাবে সম্বোধন করতে পারি। তৎপর তিনি উচ্চৈঃস্বরে বললেন, কথা বলা বন্ধ কর এবং আমি যা বলি শোন। তোমাদের হৃদয়কে আমার দিকে ফেরাও। যাকে আমি সাক্ষ্য দিতে বলি সে তার জানা মত সাক্ষ্য দেবে।

প্রবঞ্চনা, কৌশল, শঠতা ও প্রতারণা হিসাবে যখন তারা কুরআনকে তুলে ধরলো তখন কি তোমরা বলনি "তারা আমাদের ভাই এবং ইসলাম গ্রহণে আমাদের সাথী। তারা চায় যুদ্ধ বন্ধ করে মহিমান্বিত আল্লাহ্‌র কেতাবের আশ্রয় গ্রহণ করতে। আমাদের অভিমত হলো তাদের সাথে একমত হয়ে তাদের অসুবিধা শেষ করে দেয়া।" তখন আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম, "এ কাজের বহির্ভাগ ইমান মনে হলেও এর অভ্যন্তরে শত্রুতা রয়েছে। এর শুরু ধার্মিকতা মনে হলেও এর শেষ হবে অনুশোচনা। কাজেই তোমরা নিজ নিজ অবস্থানে দৃঢ় থাক এবং তোমাদের পথে দৃপ্তপদে দৃঢ়-সংকল্প থাক। তোমরা দাঁতে দাঁত চেপে ধরে জিহাদে প্রবৃত্ত থাক। চিৎকারকারীর (মুয়াবিয়া) চিৎকারে কর্ণপাত করো না। যদি তার চিৎকারের জবাব দাও তবে সে তোমাদেরকে বিপথে পরিচালিত করবে আর জবাব না দিলে সে অপমানিত হবে।"

কিন্তু যখন সালিশী করা হলো, তখন আমি দেখলাম, তোমরা তা মেনে নিয়েছো। আল্লাহ্‌র কসম, যদি আমি উহা অস্বীকার করতাম তাহলে উহা আমার জন্য বাধ্যতামূলক হতো না এবং আল্লাহ্‌ উহার পাপ আমার ওপর চাপিয়ে দিতেন না। আল্লাহ্‌র কসম, আমি উহা গ্রহণ করেছি; আমিই ন্যায়সঙ্গত ব্যক্তি যাকে অনুসরণ করা উচিত, কারণ কুরআন আমার সাথে। কুরআনকে সাথী করে নেয়ার পর থেকে আমি কখনো উহাকে পরিত্যাগ করিনি।

আমরা রাসুলের (সঃ) সাথে যুদ্ধক্ষেত্রে ছিলাম, সেখানে আমাদের হাতে যারা নিহত হয়েছিল তারা ছিল আমাদের পিতা, ভ্রাতা, পুত্র ও আত্মীয়-স্বজন। এতদসত্ত্বেও, সকল দুঃখ-কষ্ট ও অভাব-অনটন আমাদের ইমানকে বৃদ্ধি করেছে, সত্যপথে আমাদেরকে দৃঢ় করেছে, আল্লাহ্র আদেশের প্রতি অনুগত করেছে এবং ক্ষতস্থানের ব্যথা সহ্য করার ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে।

আমাদেরকে এখন যুদ্ধ করতে হবে ইসলামী ভাইদের সাথে কারণ ইসলামে গোমরাহী, বক্রতা, সংশয় ও অপব্যাখ্যার অনুপ্রবেশ ঘটেছে। যাহোক, যদি আমরা কোন পথ দেখি যদ্বারা আল্লাহ্ আমাদেরকে এ বিশৃঙ্খল অবস্থা হতে একত্রিত করেন এবং যদ্বারা আমরা একে অপরের কাছে আসতে পারি এবং আমাদের মধ্যে যেসব বিষয়ে উভয়ের মিল থাকবে তা গ্রহণ করে অন্য সব কিছু পরিত্যাগ করবো।

★★★★★

খোৎবা-১২২

সিফফিনের যুদ্ধক্ষেত্রে অনুচরদের প্রতি উপদেশ

তোমাদের মধ্যে কেউ যদি সংঘর্ষ চলাকালে হৃদয়ে সাহসিকতা বোধ কর এবং তোমাদের কোন সাথী যদি শত্রু পরিবেষ্টিত হয়ে হতাশ হয়ে পড়ে তাহলে তাকে তৎক্ষণাৎ শত্রুমুক্ত করা উচিত। এ ক্ষেত্রে সাথীকে রক্ষা করার জন্য এমনভাবে শত্রুকে প্রতিহত করতে হবে যেভাবে কেউ নিজের বেলায় করে, কারণ তোমার সাথীর চেয়ে যে বলিষ্ঠতা তোমাকে দেয়া হয়েছে আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তোমার সাথীকেও তোমার মত করতে পারতেন। নিশ্চয়ই, মৃত্যু দ্রুত অনুসন্ধানকারী। না কোন দৃপ্ত পদ এটা থেকে রক্ষা পেতে পারে আর না কোন দৌড়বিদ এটা থেকে পালিয়ে যেতে পারে। নিহত হওয়া সর্বোত্তম মৃত্যু। যে আল্লাহ্র হাতে আবু তালিবের পুত্রের জীবন সেই আল্লাহ্র কসম, বিছানায় পড়ে মৃত্যু অপেক্ষা তরবারির এক হাজার আঘাত আমার কাছে সহজতর, কারণ বিছানায় পড়ে থেকে মৃত্যু আল্লাহ্র আনুগত্যের (জিহাদ) নয়।

আমি দেখতে পাচ্ছি তোমরা যেন গিরিগিটির মত টিকটিক স্বরে শব্দ করছো। তোমরা নিজেদের দাবী প্রতিষ্ঠিত করতে চাও না এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা কর না। তোমাদেরকে মুক্তভাবে পথে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। যে যুদ্ধের দিকে দৌড়ে যায় সে মুক্তি পায় আর যে ইতস্ততঃ করে পেছনে পড়ে থাকে সে ধ্বংস হয়।

★★★★★

খোৎবা-১২৩

অনুচরগণকে যুদ্ধে[১] উদ্বুদ্ধকরণ

বর্মাচ্ছদিত লোকদের সামনে রেখো এবং বর্মবিহীনদেরকে পেছনে রেখো। তোমরা দাঁতে দাঁত চেপে ধরো, কারণ এতে তরবারি মাথার খুলির ওপর পড়বে না। যে দিকে (শত্রুর) বর্শাধারী সেদিকে 'ডজ' (হঠাৎ সরে পড়া) দিয়ো, কারণ তাতে বর্শার ফলার দিক পরিবর্তিত হয়ে যাবে। চোখ বন্ধ করো কারণ এতে আত্মশক্তি বৃদ্ধি পায় এবং হৃদয়ে শান্তি আসে। গলার স্বর বন্ধ করো কারণ এতে সাহসহীনতা দূর হয়।

তোমাদের ঝান্ডা কখনো বাঁকা করো না এবং উহা কখনো ফেলে যেয়োনা। সাহসী ও মর্যাদা রক্ষক ছাড়া অন্য কারো কাছে ঝান্ডা দিয়ো না, কারণ বিপদ ঘটলে তারাই শুধু সহ্য করতে পারে; তারা ঝান্ডাকে চর্তুদিক হতে

ঘিরে রাখে এবং সম্মুখ ও পেছন উভয় দিকে উহাকে চক্রাকার করে রাখে। তারা ঝান্ডা হতে আলাদা হয় না পাছে উহা শত্রুর হাতে চলে যায়। তারা ঝান্ডা ছেড়ে এগিয়ে যায় না পাছে উহা একা পড়ে যায়। প্রত্যেকে তার বিপক্ষের মোকাবেলা করবে এবং নিজের জীবন দিয়ে হলেও সাথীকে সাহায্য করবে। কখনো বিপক্ষকে সাথী মোকাবেলা করবে মনে করে ছেড়ে দিও না। এতে তোমার বিপক্ষ তোমার সাথীর বিপক্ষের সাথে যোগ দেবে।

আল্লাহ্র কসম, তোমরা আজকের তারবারি হতে পালিয়ে গেলেও পরকালের তরবারি হতে নিরাপদ থাকতে পারবে না। তোমরা আরবদের মধ্যে অগ্রণী এবং অঙ্গ-সৌষ্ঠবেও তোমরা উন্নত। নিশ্চয়ই, জিহাদ হতে পলায়নে রয়েছে আল্লাহ্র রোষ, চিরস্থায়ী অসম্মান ও লজ্জা। নিশ্চয়ই,একজন পলায়নকারী তার জীবন দীর্ঘায়িত করতে পারে না এবং তার ও তার মৃত্যুর মধ্যে কোন কিছুই হস্তক্ষেপ করতে পারে না। কে আছে এমন যে আল্লাহ্র দিকে ছুটে যায় যেমন করে তৃষ্ণার্ত পানির দিকে যায়? বর্শার ফলার নীচে বেহেশ্ত রয়েছে। আজ শৌর্যের সুখ্যাতি পরীক্ষিত হবে।

আল্লাহ্র কসম, তারা তাদের ঘরে ফেরার জন্য যতটুকু উৎসুক আমি তাদেরকে যুদ্ধে দেখার জন্য ততোধিক উৎসুক। হে আমার আল্লাহ্, যদি তারা সত্য পরিত্যাগ করে তবে তাদের দল ছত্রভঙ্গ করো, তাদের মধ্যে মতদ্বৈধতা সৃষ্টি করো এবং তাদের পাপের কারণে তাদেরকে ধ্বংস করো।

তারা তাদের মনোভাব পরিবর্তন করবে না যে পর্যন্ত না বর্শার আঘাতে তাদের শরীর এমনভাবে বিদীর্ণ হয় যাতে এদিক থেকে সেদিক বাতাস পার হয়ে যায়, তরবারির আঘাতে তাদের মাথায় খুলি কেটে যায়, হাড় ভাঙ্গে ও হাত-পা বিছিন্ন হয়। তারা তাদের অবস্থান পরিবর্তন করবে না যে পর্যন্ত না তারা একের পর এক বাহিনী দ্বারা আক্রান্ত হয়, তাদের শহরসমূহ মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হয় এবং ঘোড়ার পদাঘাতে তাদের চারণভূমি ও ভূমির শেষ সীমা পর্যন্ত দলিত ও বিনষ্ট হয়।

১। আমিরুল মোমেনিন সিফফিনের যুদ্ধের প্রাক্কালে এ ভাষণ দিয়েছিলেন। ৩৭ হিজরী সনে আমিরুল মোমেনিন ও সিরিয়ার গভর্ণর মুয়াবিয়ার মধ্যে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। খলিফা উসমানের হত্যার তথাকথিত প্রতিশোধের কারণ দেখিয়ে মুয়ারিয়া এ যুদ্ধের সূত্রপাত ঘটায়। বস্তুত এ যুদ্ধ ছিল মুয়াবিয়ার কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য। মুয়াবিয়া খলিফা উমরের সময় হতে সিরিয়ার গভর্ণর নিয়োজিত থেকে তথায় স্বশাসন চালিয়ে আসছিলো। উসমানের সময় তার ক্ষমতা যদৃচ্ছ প্রয়োগ করে সিরিয়াকে করতলগত করে নিয়েছিল। আমিরুল মোমেনিন খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর মুয়াবিয়া তাঁর বায়াত গ্রহণ করেনি কারণ সে মনে করতো আমিরুল মোমেনিনের বায়াত গ্রহণ করলে তার কর্তৃত্ব থাকবে না। ফলে সে তার সহজাত ধূর্ততা প্রয়োগ করে কর্তৃত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য উসমানের হত্যাকে একটা ইস্যু হিসাবে ব্যবহার করেছিল। তার পরবর্তী কার্যাবলী হতে এটা সুস্পষ্ট বুঝা যায়। সে ক্ষমতা দখলের পর কোনদিন ভুলেও উসমানের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের বিষয়টি মুখে আনেনি বা হত্যাকারীদের বিষয়ে কোন শব্দ করেনি।

যদিও প্রথম দিন হতেই আমিরুল মোমেনিন বুঝতে পেরেছিলেন যে, যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবি তবুও সকল ওজর নিঃশেষ করার প্রয়োজনে জামালের যুদ্ধ শেষে কুফায় ফিরে এসে ৩৬ হিজরী সনের ১২ই রজব সোমবার তিনি জারির ইবনে আবদিল্লাহ্ আল-বাজালীকে একটি পত্রসহ মুয়াবিয়ার নিকট দামস্কে প্রেরণ করেছিলেন। পত্রে তিনি লিখেছিলেন যে, মুহাজির ও আনসারগণ তাঁর বায়াত গ্রহণ করেছে এবং মুয়াবিয়াও যেন বায়াত গ্রহণ করতঃ উসমানের হত্যা মামলা পেশ করে যাতে তিনি কুরআন ও সুন্নাহ্ অনুযায়ী রায় প্রদান করতে পারেন। কিন্তু মুয়াবিয়া নানা তালবাহানা করে জারিরকে বিলম্ব করাতে লাগলো। অপরদিকে আমর ইবনে আল-আসের পরামর্শক্রমে উসমান হত্যার কারণ দেখিয়ে বিদ্রোহ ঘোষণার ব্যবস্থা করলো। সে সিরিয়ার গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিগণের মাধ্যমে অজ্ঞ জনগণকে বুঝিয়েছিল যে, উসমানের হত্যার জন্য আলী দায়ী— তিনি তাঁর আচরণ দ্বারা অবরোধকারীদেরকে উৎসাহ ও প্রশ্রয় দিয়েছেন। ইতোমধ্যে মুয়াবিয়া উসমানের রক্তমাখা জামা ও

তার স্ত্রী নায়লাহ্ বিনতে ফারাফিসার কর্তিত আঙ্গুল দামস্কের কেন্দ্রীয় মসজিদে ঝুলিয়ে রেখেছিল এবং ইহার চারিদিকে সত্তর হাজার সিরিয়ান কান্নারত ছিল এবং তারা উসমানের রক্তের প্রতিশোধ নেয়ার শপথ গ্রহণ করেছিলো। এভাবে মুয়াবিয়া সিরিয়দের অনুভূতি এমন এক অবস্থায় নিয়ে গেল যে, তারা উসমানের রক্তের বদলা নেয়ার জন্য নিজেদের জীবন বিসর্জন দিতেও দৃঢ় সংকল্প হলো। তখন মুয়াবিয়া "উসমানের হত্যার প্রতিশোধ" ইস্যুর ওপর তাদের বায়াত গ্রহণ করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে লাগলো। মুয়াবিয়া জারিরকে সিরিয়দের অনুভূতি ও মনোভাব দেখিয়ে দিয়ে অপমান করে ফেরত পাঠিয়ে দিল।

জারীরের কাছে বিস্তারিত জানতে পেরে আমিরুল মোমেনিন অত্যন্ত দুঃখ পেয়েছিলেন এবং মালিক ইবনে হাবিব আল-ইয়ারবুইকে নুখায়লাহ্ উপত্যকায় সৈন্য সমাবেশ করার আদেশ দিলেন। ফলে কুফার উপকণ্ঠ হতে প্রায় আশি হাজার লোক সেখানে জড়ো হলো। প্রথমে আমিরুল মোমেনিন জিয়াদ ইবনে নদর আল-হারিছির নেতৃত্বে আট হাজারের একটা শক্তিশালী রক্ষীবাহিনী এবং সুরায়হ ইবনে হানি আল-হারিছির নেতৃত্বে অন্য একটি চার হাজারের শক্তিশালী বাহিনী সিরিয়া অভিমুখে প্রেরণ করলেন। অবশিষ্ট সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্ব নিজে গ্রহণ করে ৫ই শাওয়াল বুধবার আমিরুল মোমেনিন সিরিয়া অভিমুখে যাত্রা করলেন। কুফার সীমান্ত অতিক্রম করে তিনি যোহর সালাত আদায় করলেন এবং তৎপর দায়র আবু মুসা, নাহর, নার্‌স, কুব্বাত কুব্বিন, বাবিল, দায়র কা'ব, কারবালা, সাবাত, বাহুরা সিনি, আল-আনবার ও আর জাযিরাহ স্থানসমূহে বিশ্রাম গ্রহণ করে আর-রিক্কায় উপনীত হলেন। এখানকার জনগণ উসমানের পক্ষীয় ছিল এবং এখানেই সিমাক ইবনে মাখতামাহ্ আল আসাদী তার আটশত লোকসহ তাঁবু খাটিয়েছিল। এসব লোক আমিরুল মোমেনিনের পক্ষ ত্যাগ করে মুয়াবিয়ার সঙ্গে যোগ দেয়ার জন্য কুফা হতে বেরিয়ে এসেছিলো। যখন তারা আমিরুল মোমেনিনের বাহিনী দেখতে পেল তখন তারা ফোরাত নদীর ওপরের সেতু খুলে ফেললো যাতে তিনি নদী পার হতে না পারেন। কিন্তু মালিক ইবনে হারিছ আল-আশতারের ধমকে তারা ভীত হয়ে গেল এবং উভয়ের মধ্যে আলাপ-আলোচনার পর তারা সেতু জোড়া লাগিয়ে দিল এবং আমিরুল মোমেনিন তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে নদী পার হয়ে গেলেন। নদীর অপর তীরে অবতরণ করে তিনি দেখতে পেলেন যে, জিয়াদ ও সুরায়হ সেখানে ছাউনী পেতে অপেক্ষা করছে। তারা আমিরুল মোমেনিনকে বললো যে, এ স্থানে পৌছার পর তারা খবর পেয়েছিল মুয়াবিয়ার বাহিনী ফোরাত অভিমুখে এগিয়ে আসছে। তার বিশাল বাহিনীর গতিরোধ করা সম্ভব হবে না মনে করে তারা আর না এগিয়ে আমিরুল মোমেনিনের জন্য অপেক্ষা করছিলো। তাদের থেমে থাকার ওজর আমিরুল মোমেনিন গ্রহণ করলেন এবং তাদেরকে অগ্রবর্তী হওয়ার জন্য আদেশ দিলেন। তারা যখন সুর-আর-রুম নামক স্থানে পৌছলো তখন দেখতে পেলো যে, আবু আল-আওয়ার আস-সুলামী তথায় ক্যাম্প করে সৈন্যসহ অবস্থান করছে। তারা উভয়ে আমিরুল মোমেনিনকে এ সংবাদ দিল। তিনি মালিক ইবনে হারিছ আল-আশতারকে সেনাপতি নিয়োগ করে তথায় প্রেরণ করলেন এবং নির্দেশ দিলেন যে, যতদূর সম্ভব যুদ্ধ এড়িয়ে গিয়ে তাদেরকে প্রকৃত অবস্থা বুঝিয়ে বলে উপদেশ দ্বারা তাদের মনোভাব পরিশুদ্ধ করতে। মালিক-আল-আশতার তাদের নিকট হতে অল্প দূরে ক্যাম্প করলেন। কিন্তু তিনি যুদ্ধের কোন ভাব দেখালেন না। অপর দিকের অবস্থা থমথমে ছিল, যে কোন সময় যুদ্ধ শুরু করার জন্য তারা উন্মুক্ত অসি হাতে অপেক্ষা করছিলো। আবু আল-আওয়ার হঠাৎ করে রাতের বেলা আক্রমণ করে বসলো এবং সামান্য সময় যুদ্ধের পর সে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে পালিয়ে গেল। পরদিন আমিরুল মোমেনিন সসৈন্যে সেখানে পৌছে সিফফিন অভিমুখে যাত্রা করলেন। মুয়াবিয়া পূর্বেই সিফফিন পৌছে ছাউনী পেতেছিলো এবং ফোরাত কূল অবরোধ করে সৈন্য মোতায়েন করেছিলো। আমিরুল মোমেনিন তথায় পৌছে মুয়াবিয়াকে অনুরোধ করে পাঠালেন যেন সে ফোরাত কূল হতে সৈন্য সরিয়ে নিয়ে পানি নেয়ার ব্যবস্থা অবরোধমুক্ত করে। কিন্তু মুয়াবিয়া আমিরুল মোমেনিনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় ইরাকী সৈন্যগণ সাহসিকতার সাথে আক্রমণ করে ফোরাতকূল দখল করে। অতঃপর আমিরুল মোমেনিন মুয়াবিয়ার নিকট বশির ইবনে আমর আল-আনসারি, সাঈদ ইবনে কায়েস আল-হামদানি ও শাবাছ ইবনে রিবি আত-তামিমীকে প্রেরণ করলেন এ জন্য যে, তারা যেন যুদ্ধের ভয়াবহতা তাকে বুঝিয়ে বলে এবং সে যেন বায়াত গ্রহণ করে একটা মীমাংসায় আসতে রাজী হয়। এ প্রস্তাবে মুয়াবিয়া সরাসরি বলে দিল যে, উসমানের রক্তের প্রতি সে উদাসীন থাকতে পারে না; কাজেই

তরবারিই একমাত্র মীমাংসা—এর কোন বিকল্প নেই। ফলে ৩৬ হিজরী সনের জিলহজ্জ মাসে উভয় পক্ষের যোদ্ধাগণ একে অপরের মোকাবেলা করার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে নেমে পড়লো। আমিরুল মোমেনিনের পক্ষে যারা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করেছিল তারা হলো ঃ হুজর ইবনে আদি আল-কিন্দি, শাবাছ ইবনে রিবি আত-তামিমী, খালিদ ইবনে মুআম্মার, জিয়াদ ইবনে নদর আল-হারিছি, জিয়াদ ইবনে খাসাফাহ্ আত-তায়মী, সাঈদ ইবনে কায়েস আল-হামদানী, কায়েস ইবনে সা'দ আল-আনসারী ও মালিক ইবনে হারিছ আল-আশতার। অপরপক্ষে সিরিয়দের মধ্য হতে যারা যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল তারা হলো ঃ আবদার রহমান ইবনে খালিদ ইবনে ওয়ালিদ, আবু আল-আওয়ার আস-সুলামী, হাবিব ইবনে মাসলামাহ্ আল-ফিহ্রি, আবদুল্লাহ্ ইবনে জিলকালা, উবায়দুল্লাহ্ ইবনে উমর ইবনে আল-খাত্তাব, শুরাহ্বিল ইবনে সিম্‌ত আল-কিন্দি, ও হামজাহ্ ইবনে মালিক আল-হামদানী। জিলহজ্জ মাসের শেষের দিকে মুহ্‌রামের জন্য যুদ্ধ বন্ধ রাখতে হলো এবং ১লা সফর পুনরায় যুদ্ধ শুরু হলো। ঢাল, তলোয়ার ও বর্শা নিয়ে উভয় পক্ষ সারিবদ্ধভাবে একে অপরের মুখোমুখী দাঁড়ালো। আমিরুল মোমেনিনের পক্ষ হতে কুফী অশ্বারোহীগণের কমান্ডার হলেন মালিক আশতার ও কুফী পদাতিক বাহিনীর কমান্ডার হলেন আম্মার ইবনে ইয়াসির এবং বসরী অশ্বারোহীর কমান্ডার হলেন সহ্‌ল ইবনে হুনায়েফ আল-আনসারী ও বসরী পদাতিকের কমান্ডার হলেন কায়েস ইবনে সাদ। আমিরুল মোমেনিনের সেনাবাহিনীর ঝান্ডা বহনকারী ছিল হাশিম ইবনে উত্‌বাহ্। অপরপক্ষে সিরিয়দের দক্ষিণ বাহুর কমান্ডার ছিলো ইবনে জিলকালা ও বাম বাহুর কমান্ডার ছিলো হাবিব ইবনে মাসলামাহ্ এবং অশ্বারোহীর কমান্ডার ছিলো আমর ইবনে আস ও পদাতিক বাহিনীর কমান্ডার হলো দাহ্‌হাক ইবনে কায়েস।

প্রথম দিন মালিক ইবনে আশতার যুদ্ধের ময়দানে তার লোকজন নিয়ে নেমেছিল এবং হাবিব ইবনে মাসলামাহ্ তার লোকজন নিয়ে মালিকের মোকাবেলা করলো। সারাদিন তরবারি ও বর্শার যুদ্ধ চলেছিলো।

পরদিন হাশিম ইবনে উতবাহ্ আলীর সৈন্য নিয়ে ময়দানে নামলো এবং আবু আল-আওয়ার তার মোকাবেলা করলো। অশ্বারোহী অশ্বারোহীর ওপর ও পদাতিক পদাতিকের ওপর ঝাপিয়ে পড়লো এবং ভয়ানক যুদ্ধে হাশিম দৃপ্তপদে বীর বিক্রমে যুদ্ধ করেছিলো।

তৃতীয় দিন আম্মার ইবনে ইয়াসির অশ্বারোহী ও জিয়াদ ইবনে নদর পদাতিক বাহিনী নিয়ে ময়দানে নামলো। আমর ইবনে আস বিশাল বাহিনী নিয়ে তাদের মোকাবেলা করলো। মালিক ও জিয়াদের প্রবল আক্রমণে শত্রুপক্ষ গ্রাউন্ড হারিয়ে ফেলে এবং আক্রমণ রোধ করতে ব্যর্থ হয়ে আমর লোকজন নিয়ে ক্যাম্পে ফিরে গিয়েছিলো।

চতুর্থ দিন মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়া যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিল। উবায়দুল্লাহ্ ইবনে উমর তার মোকাবেলায় এসেছিল। মুহাম্মদ বীর বিক্রমে যুদ্ধ করে শত্রুর প্রভূত ক্ষতিসাধন করেছিল।

পঞ্চম দিনে আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস ময়দানে গেল এবং তার মোকাবেলা করার জন্য ওয়ালিদ ইবনে উকবা এসেছিল। কিন্তু আবদুল্লাহ্ বীর বিক্রমে এমন প্রচন্ড আক্রমণ করলো যে, শত্রু ময়দান ত্যাগ করে পিছু হটে গেল।

ষষ্ঠ দিনে কায়েস ইবনে সা'দ আল-আনসারী ময়দানে নামলো এবং তার মোকাবেলা করার জন্য ইবনে জিলকালা এসেছিল। উভয় পক্ষে এত প্রচন্ড লড়াই হয়েছিলো যে, প্রতি পদক্ষেপে মৃতদেহ দেখা গিয়েছিল এবং রক্তের স্রোতধারা বয়ে গিয়েছিল। অবশেষে রাত্রি নেমে আসায় উভয় বাহিনী আলাদা হয়ে গেল।

সপ্তম দিনে মালিক আশতার ময়দনে নামলে হাবিব ইবনে মাসলামাহ্ তার মোকাবেলায় এসে যোহরের নামাজের পূর্বেই ময়দান ছেড়ে পিছিয়ে গেল।

অষ্টম দিনে আমিরুল মোমেনিন নিজেই ময়দানে গেলেন এবং এমন প্রচন্ড বেগে আক্রমণ করলেন যে, যুদ্ধক্ষেত্র প্রকম্পিত হয়ে উঠেছিল। বর্শা ও তীর বৃষ্টি উপেক্ষা করে ব্যূহের পর ব্যূহ ভেদ করে শত্রুর উভয় লাইনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং মুয়াবিয়াকে চ্যালেঞ্জ করে বললেন, "অযথা লোক ক্ষয় করে লাভ কি? তুমি আমার মোকাবেলা কর। তাতে একজন নিহত হলে অপরজন শাসক হবে।" এসময় ইবনে আস মুয়াবিয়াকে বললো, "আলী ঠিক বলেছে। একটু সাহস সঞ্চার করে তার মোকাবেলা কর।" মুয়াবিয়া বললো, "তোমার প্ররোচনায় আমি আমার প্রাণ হারাতে প্রস্তুত নই।" এ বলে

সে পেছনের দিকে চলে গেল। মুয়াবিয়াকে পেছনে হটতে দেখে আমিরুল মোমেনিন মুচকি হেসে ফিরে এলেন। যে সাহসিকতার সাথে আমিরুল মোমেনিন সিফফিনে আক্রমণ রচনা করেছিলেন তা নিঃসন্দেহে অলৌকিক। যখনই তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতেন তখন শত্রু ব্যূহ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে যেত এবং দুঃসাহসী যোদ্ধারাও তার মুখোমুখী হতো না। এ কারণেই তিনি কয়েকবার পোশাক বদল করে যুদ্ধক্ষেত্রে এসেছিলেন। একবার আরার ইবনে আদ'হামের মোকাবেলায় আব্বাস ইবনে রাবি ইবনে হারিছ ইবনে আবদাল মুত্তালিব গিয়েছিল। আব্বাস অনেকক্ষণ লড়াই করেও আরারকে পরাজিত করতে পারতেছিলো না। হঠাৎ সে দেখতে পেল আরারের বর্মের একটি আংটা খুলে আছে। আব্বাস কাল বিলম্ব না করে তরবারি দিয়ে আরো ক'টি আংটা কেটে দিয়ে চোখের নিমিষে আরারের বুকে তরবারি ঢুকিয়ে দিল। আরারের পতন দেখে মুয়াবিয়া বিচলিত হয়ে গেল এবং আব্বাসকে হত্যা করতে পারে এমন কেউ আছে কিনা বলে চিৎকার করতে লাগলো। এতে লাখম গোত্রের কয়েকজন এগিয়ে এসে আব্বাসকে চ্যালেঞ্জ করলে সে বললো যে, সে তার প্রধানের অনুমতি নিয়ে আসবে। আব্বাস আমিরুল মোমেনিনের কাছে গেলে তিনি তাকে সেখানে রেখে তার পোশাক পরে ও তার ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করলেন। আব্বাস মনে করে লাখম গোত্রের লোকেরা বললো, "তাহলে তুমি তোমার প্রধানের অনুমতি নিয়েছো।" প্রত্যুত্তরে আমিরুল মোমেনিন নিম্নের আয়াত আবৃত্তি করলেন ঃ

যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হলো তাদেরকে যারা আক্রান্ত হয়েছে; কারণ তাদের প্রতি অত্যচার করা হয়েছে।
আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম। (কুরআন-২২ঃ৩৯)

তখন লাখম গোত্রের একজন লোক হাতির মত গর্জন করতে করতে আমিরুল মোমেনিনের ওপর আঘাত হানলো। তিনি সে আঘাত প্রতিহত করে এমন জোরে আঘাত করলেন যে, লোকটি দ্বিখন্ডিত হয়ে ঘোড়ার দু'দিকে দু'খন্ড পড়ে গেল। তৎপর সে গোত্রের অন্য একজন এসেছিল। সেও চোখের নিমিষে শেষ হয়ে গেল। অসি চালনা ও আঘাতের ধরণ দেখে লোকেরা বুঝতে পারলো যে আব্বাসের ছদ্মবেশে আমিরুল মোমেনিন যুদ্ধ করছেন। তখন আর কেউ সাহস করে তাঁর সামনে আসেনি।

নবম দিনে দক্ষিণ বাহুর দায়িত্ব দেয়া হলো আবদুল্লাহ্ ইবনে বুদায়লকে ও বাম বাহুর দায়িত্বে ছিলেন আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস এবং মধ্যভাগে আমিরুল মোমেনিন নিজে ছিলেন। অপরদিকে সিরিয় সৈন্যদের নেতৃত্বে ছিল হাবিব ইবনে মাসলামাহ্। উভয় লাইন মুখোমুখী হলে সিংহের মত একে অপরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এবং চতুর্দিক হতে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। আমিরুল মোমেনিনের বাহিনীর ঝান্ডা বনি হামদানের হাতে ঘুরছিলো। একজন শহীদ হলে আরেকজন উহা তুলে ধরে। প্রথমে কুরায়ব ইবনে শুরায়রের হাতে ছিল, তার পতনে শুরাহ্বিল ইবনে শুরায়রের হাতে গেল, তৎপর ইয়ারিম ইবনে শুরায়র, তৎপর সুমায়র ইবনে শুরায়র, তৎপর হুবায়রাহ ইবনে শুরায়র, তৎপর মারসাদ ইবনে শুরায়র-এই ছয় ভ্রাতা শহীদ হবার পর ঝান্ডা গ্রহণ করলো সুফিয়ান, তৎপর আবদ, তৎপর কুরায়ব—জায়েদের এ তিন পুত্র। তারা শহীদ হবার পর ঝান্ডা ধারণ করলো বশিরের দুপুত্র—উমায়র ও হারিছ। তারা শহীদ হবার পর ঝান্ডা ধারণ করলো ওহাব ইবনে কুরায়ব। এদিনের যুদ্ধে শত্রুর বেশী লক্ষ্য ছিল দক্ষিণ বাহুর দিকে। সে দিকে এত তীব্র বেগে আক্রমণ করেছিলে যে, আবদুল্লাহ্ ইবনে বুদায়লের সাথে মাত্র তিন শত সৈন্য ছাড়া সকলেই যুদ্ধক্ষেত্র পিছিয়ে গিয়েছিল। এ অবস্থা দেখে আমিরুল মোমেনিন মালিক আশতারকে বললেন, "ওদের ফিরিয়ে আন। ওদের জীবন যদি ফুরিয়ে এসে থাকে তাহলে পালিয়ে গিয়ে মৃত্যুকে এড়ানো যাবে না। দক্ষিণ বাহুর পরাজয় বাম বাহুকেও প্রভাবিত করবে ভেবে আমিরুল মোমেনিন বাম বাহুর দিকে এগিয়ে গেলেন এবং শত্রুর ব্যূহ ভেদ করতে লাগলেন। এসময় উমাইয়াদের একটা ক্রীতদাস (যার নাম আহ্মার) বললো, "তোমাকে কতল করতে না পারলে আল্লাহ্ আমার মৃত্যু করুন।" এ কথা শুনামাত্র আমিরুল মোমেনিনের ক্রীতদাস ফায়সান তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। কিন্তু আহ্মারের হাতে শহীদ হয়ে গেল। অতঃপর আমিরুল মোমেনিন আহ্মারকে আকর্ষণ করে শূন্যে তুলে এমন জোরে আছাড় দিলেন যে, তার শরীরের সব ক'টি জোড়া খুলে গিয়েছিলো। তখন ইমাম হাসান ও মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়া তাকে জাহান্নামে প্রেরণ করলেন। এদিকে মালিক আশতারের আহ্বানে দক্ষিণ বাহুর পলাতক লোকজন ফিরে এসে তীব্রভাবে আক্রমণ করে শত্রুকে পূর্বাস্থানে ঠেলে নিয়ে গেল—এখানে আবদুল্লাহ্ ইবনে বুদায়েল শত্রু

কর্তৃক ঘেরাও হয়ে রয়েছিল। নিজের লোকজন দেখে আবদুল্লাহ্‌র সাহস ফিরে এলো। সে খোলা তরবারি হাতে নিয়ে মুয়াবিয়ার তাঁবুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। মালিক আশতার তাকে থামাতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো। মুয়াবিয়া আবদুল্লাহ্‌কে দেখে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে গেল এবং তার রক্ষীদের বললো আবদুল্লাহ্‌কে পাথর মারতে। এতে আবদুল্লাহ্ শহীদ হলো। মালিক আশতার ইহা দেখে বনি হামদান ও বনি মুযহিজ-এর যোদ্ধাগণকে নিয়ে মুয়াবিয়ার ওপর আক্রমণ চালাবার জন্য এগিয়ে গেল এবং মুয়াবিয়ার রক্ষীবাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করতে লাগলো। রক্ষীবাহিনীর পাঁচটি চক্রের মধ্যে মাত্র একটি ছত্রভঙ্গ হবার বাকী থাকাকালে মুয়াবিয়া পালিয়ে যাবার জন্য ঘোড়ার রেকাবে পা রেখেছিল, এমন সময় কে একজন সাহস দেয়ায় সে ফিরে দাঁড়ালো। যুদ্ধ ক্ষেত্রের অপরদিকে আম্মার ইবনে ইয়াসির ও হাশিম ইবনে উত্বার তরবারি প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলো। আম্মার যে দিকে যেত রাসুলের (সঃ) সাহাবিগণ সে দিকে জড়ো হয়ে তাকে ঘিরে থাকতো এবং তারা এমন প্রবল আক্রমণ রচনা করতো যে, শত্রু ব্যূহে লাশের পর লাশ পড়ে যেত। মুয়াবিয়া এ অবস্থা দেখে আম্মারের দিকে সংরক্ষিত সৈন্য হতে বেশ কিছু প্রেরণ করলো। কিন্তু আম্মারের তরবারি ও বর্শা নৈপুণ্যের কাছে তারা টিকতে পারেনি। এক পর্যায়ে আবু আদিয়াহ্ আল-জুহানির বর্শার আঘাতে তিনি আহত হলেন এবং ইবনে হাওয়াইয়ার (জাওন আস-সাকসিকি) তাঁকে কতল করে শহীদ করলো। আম্মারের মৃত্যুর ফলে মুয়াবিয়ার দলের অভ্যন্তরে রাসুলের (সঃ) একটি বাণী নিয়ে আলোড়ন শুরু হলো। লোকেরা বলতে লাগলো যে, তারা শুনেছে রাসুল (সঃ) বলেছেন, "আম্মার একটি বিদ্রোহী দলের হাতে নিহত হবে।" জুলকালা আমরকে বললো, "আমি দেখতে পাচ্ছি আম্মার আলীর দলে; তাহলে কি আমরা বিদ্রোহী?" আমর একথার সুস্পষ্ট জবাব দিতে পারেনি। তখন মুয়াবিয়া সিরিয়দেরকে সম্বোধন করে বললো, "আমরা আম্মারকে হত্যা করিনি। তাকে হত্যা করেছে আলী, কারণ আলীই তো তাকে যুদ্ধক্ষেত্রে এনেছে।" মুয়াবিয়ার এহেন ধূর্ততাপূর্ণ কথা শুনে আমিরুল মোমেনিন বললেন, "তাহলে বলতে হয় রাসুল (সঃ) হামজাকে হত্যা করেছেন, কারণ তিনিই হামজাকে ওহুদের যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়েছেন।" আম্মার নিহত হবার পর হাশিম ইবনে উতবাও শাহাদত বরণ করেন। হারিছ ইবনে মুনযির তাকে নিহত করে। তার মৃত্যর পর তার পুত্র আবদুল্লাহ্ বাহিনীর দায়িত্ব গ্রহণ করে।

এসব অকুতোভয় যোদ্ধাগণের মৃত্যুতে আমিরুল মোমেনিন দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে হামদান ও রাবিয়াহ গোত্রদ্বয়ের লোকদেরকে বললেন, "আমার কাছে তোমরা বর্ম ও বর্শা সমতুল্য। উঠে দাঁড়াও—এসব বিদ্রোহীকে উচিত শিক্ষা দাও।" ফলে রাবিয়াহ ও হামদান গোত্রদ্বয়ের বার হাজার সৈন্য তরবারি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। তাদের ঝান্ডা ছিলো হুদায়ন ইবনে মুনযিরের হাতে। তারা বিপুল বিক্রমে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করলো এবং শত্রুর ব্যূহ একের পর এক ভেদ করে রক্তের স্রোত বইয়ে দিল এবং লাশ স্তূপীকৃত হয়ে রইল। রাতের গাঢ় অন্ধকার না নামা পর্যন্ত তাদের তরবারি থামলো না। এটাই সেই ভয়ঙ্কর রাত্রি যা ইতিহাসে "আল-হারিরের রাত্রি" বলে খ্যাত। এ রাতে অস্ত্রের ঝনঝনানি, ঘোড়ার খুরের শব্দ ও সিরিয়দের আর্তনাদে আকাশ প্রকম্পিত হয়েছিলো এবং তাদের আর্ত-চিৎকার ছাড়া অন্য কিছু কর্ণকুহরে প্রবেশ করেনি। মাঝে মাঝে আমিরুল মোমেনিনের দিক হতে "অন্যায় ও বিভ্রান্তি নিপাত যাক"-শ্লোগানে তাঁর সৈন্যগণের সাহস ও শৌর্য বৃদ্ধি করছিলো এবং শত্রুর হৃদয় শুকিয়ে দিয়েছিলো। যুদ্ধ যখন চরমে পৌছালো তখন তীরন্দাজের তীর নিঃশেষ হয়ে গেল- বর্শার বাট ভেঙ্গে গেল—হাতে হাতে তরবারি যুদ্ধ চলছিলো। সকাল বেলায় দেখা গেল ত্রিশ হাজারের উর্ধে লোক নিহত হয়েছিল।

দশম দিনে আমিরুল মোমেনিনের লোকেরা একই মনোবল নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে গেল। দক্ষিণ বাহুর কমান্ডার ছিলেন মালিক আল-আশতার এবং বাম বাহুর কমান্ডার ছিলেন আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস। তারা এমন তীব্র আক্রমণ রচনা করেছিলেন যে, সিরিয়দের পরাজয় অবশ্যম্ভাবি হয়ে গেল—তারা যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পলায়ন করতে শুরু করেছিলো। এমন সময় শত্রুপক্ষ পাঁচশত কুরআন বর্শার আগায় বেঁধে তুলে ধরলো যাতে যুদ্ধের অবস্থা বদলে গেল—তরবারি চালনা থেমে গেল—ছলনা কৃতকার্য হলো—অন্যায়ের পথ পরিষ্কার হয়ে গেল। এ যুদ্ধে সিরিয়দের পক্ষে পঁয়তাল্লিশ হাজার লোক নিহত হয়েছিল এবং পঁচিশ হাজার ইরাকী শহীদ হয়েছিলো। (মিনকারী[১১০], তাবারী[৭৫], ১ম খন্ড, পৃঃ ৩২৫৬-৩৩৪৯)।

★★★★★

খোৎবা-১২৪

খারিজীগণ এবং সালিশী সম্পর্কে তাদের অভিমত

সালিশ হিসাবে আমরা কোন মানুষের নাম বলিনি—আমরা কুরআনের নাম বলেছিলাম। কুরআন একটি গ্রন্থ যা দু'টি মলাটে ঢাকা এবং এটা কথা বলতে পারে না। সুতরাং এর একজন ব্যাখ্যাকারী অত্যাবশ্যকীয়। মানুষই শুধু কুরআনের ব্যাখ্যাকারী হতে পারে। যখন সেসব লোক কুরআনকে সালিশ মান্য করার জন্য আমাদেরকে আহ্বান করলো তখন আমরা আল্লাহ্‌র কিতাব হতে মুখ ফিরিয়ে নিতে পারি না। কারণ আল্লাহ্ বলেনঃ

কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটলে উহা আল্লাহ্ ও রাসুলের নিকট উপস্থাপন কর (কুরআন-৪ঃ৫৯)।

আল্লাহ্‌র নিকট উপস্থাপন অর্থ হলো কুরআন অনুসারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা এবং রাসুলের নিকট উপস্থাপন অর্থ হলো তাঁর সুন্নাহ অনুসরণ করা। সুতরাং সালিশী যদি সত্যিকার অর্থে আল্লাহ্‌র কিতাব (কুরআন) অনুযায়ী করা হতো তাহলে খেলাফতের জন্য আমরাই সব চাইতে ন্যায়সঙ্গত হতাম; আর যদি রাসুলের সুন্নাহ্ অনুযায়ী করা হতো তাহলে সকলের চেয়ে আমরাই অধিকার প্রাপ্ত হতাম।

আমি কেন আমার ও তাদের মধ্যে সালিশ সাব্যস্ত করতে কিছু সময় অতিক্রান্ত করেছিলাম তা তোমরা আমাকে জিজ্ঞেস করেছো। আমি এটা করেছিলাম এ জন্য যে, অজ্ঞ ব্যক্তি যেন সত্য সন্ধান করতে পারে এবং যে ব্যক্তি জানে সে যেন আরো দৃঢ়ভাবে সত্য আঁকড়ে ধরতে পারে। সম্ভবতঃ এ শান্তির ফলে আল্লাহ্ এসব লোকের অবস্থা উন্নত করতে পারেন এবং তারা শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় ধৃত হবে না এবং পূর্বের মত সত্যের নিদর্শনের সম্মুখে বিদ্রোহী হবে না। নিশ্চয়ই, আল্লাহ্‌র কাছে সে ব্যক্তি সব চাইতে উত্তম যে ন্যায় অনুসারে আমল করতে বেশী ভালবাসে যদিও এটা তার দুঃখ-দুর্দশা ও শোকের কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং অন্যায় তার সুযোগ-সুবিধা ও উন্নতি আনয়ন করলেও সে উহা পরিহার করে।

সুতরাং কোথায় তোমরা বিভ্রান্ত হচ্ছো এবং কোথা হতে তোমাদেরকে এ অবস্থায় টেনে আনা হয়েছে? যারা সত্য ও ন্যায় পথ হতে সরে গেছে তাদের দিকে কুচকাওয়াজ করে এগিয়ে যেতে প্রস্তুত হও এবং এটা দেখো না যে, যারা অন্যায় কর্মে জড়িয়ে গেছে তাদেরকে পরিশুদ্ধ করা যায় না। তারা আল্লাহ্‌র কিতাব হতে অনেক দূরে সরে গেছে এবং সত্য পথ হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। তোমরা এমন বিশ্বাসযোগ্য নও যে, তোমাদের ওপর নির্ভর করা যায় এবং এমন সম্মানীয় নও যে, তোমাদেরকে মান্য করা যায়। তোমরা যুদ্ধের ইন্ধন যোগাতে ওস্তাদ। তোমাদের ওপর লানত! তোমাদের নিয়ে আমার উদ্বিগ্নতার শেষ নেই। কখনো আমি তোমাদেরকে জিহাদে আহ্বান করি এবং কখনো আমি তোমাদেরকে বিশ্বাস করে কথা বলি। আহ্বানের সময় তোমরা সত্যিকার অর্থে মুক্ত মানুষ নও এবং বিশ্বাস করে কথা বলার জন্য তোমরা বিশ্বস্ত ভ্রাতা নও।

★★★★★

খোৎবা-১২৫

বায়তুল মালের সুষম বন্টনের জন্য যখন আমিরুল মোমেনিনের কুৎসা রটানো হলো তখন তিনি বললেন ঃ

তোমরা কি মনে কর যে, যাদের কর্তৃত্ব আমার ওপর অর্পিত হয়েছে তাদেরকে অত্যাচার করে আমি সমর্থন আদায় করবো? আল্লাহ্‌র কসম, যতদিন পৃথিবী টিকে থাকবে এবং আকাশের নক্ষত্র একটি অপরটিকে অনুসরণ

করবে ততদিন আমি এমন কাজ করবো না। এমন কি এটা যদি আমার নিজের সম্পদও হতো তবুও আমি তা তাদের মধ্যে সমভাবে বণ্টন করে দিতাম! সেখানে আল্লাহ্‌র সম্পদ কেন সমভাবে বণ্টন করবো না? সাবধান, যার সম্পদ পাবার অধিকার নেই তাকে তা দেয়া অপচয়ের সামিল। এহেন কাজ করে ইহকালে বাহ্‌বা পাওয়া গেলেও পরকালে অপদস্থ ও হীন হতে হয়। এহেন কাজ মানুষের কাছে সম্মানের কারণ হলেও আল্লাহ্‌র কাছে অমর্যাদাপূর্ণ। কোন ব্যক্তি যদি তার সম্পদ এমন লোকদের দেয় যারা তা পাবার উপযুক্ত নয় বা তা পেতে যাদের কোন অধিকার নেই, আল্লাহ্ তাকে তাদের কৃতজ্ঞতা হতে বঞ্চিত করেন এবং তাদের ভালবাসাও অন্য লোকের জন্য হয়ে থাকে। অতঃপর যদি সে কখনো বিপদে পড়ে এবং তার সাহায্যের প্রয়োজন হয় তখন তারা মন্দতর সাথী ও জঘন্য বন্ধু হিসাবে প্রমাণিত হবে।

★★★★★

খোৎবা-১২৬

খরিজীদের সম্পর্কে

আমি বিপথগামী হয়ে গেছি বা বিভ্রান্ত হয়ে গেছি— এসব কথা বলা যদি তোমরা বন্ধ না কর তবে কেন তোমরা মনে কর না যে, নবী মুহাম্মদের (সঃ) অনুসারীগণের মধ্যে সাধারণ লোকেরা আমার মত পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে? আমার যে সব কাজকে তোমরা বিভ্রান্তি বল কেন তাদের সে সব কাজকে বিভ্রান্তি বল না? আমার যে সব কাজকে পাপ বল কেন সে সব কাজের জন্য তাদেরকে অবিশ্বাসী বল না? তোমরা তোমাদের তরবারি কাঁধের ওপর রেখেছো এবং ন্যায়-অন্যায় বিচার বিবেচনা ছাড়াই যদৃচ্ছ তা ব্যবহার করছো। পাপী ও নিষ্পাপের মধ্যে তোমরা তালগোল পাকিয়ে ফেলেছো। দেখ, রাসুল (সঃ) বিবাহিত ব্যভিচারীকে পাথর মেরে হত্যা করেছিলেন, তৎপর তিনি তার জানাজায় হাজির হয়েছিলেন এবং তার পরবর্তীগণকে তার উত্তরাধিকারের অনুমতি দিয়েছিলেন। তিনি খুনী হত্যা করেছিলেন কিন্তু তার পরবর্তীগণকে তার উত্তরাধিকারের অনুমতি দিয়েছিলেন। তিনি চোরের হাত ব্যবচ্ছেদ করে দিয়েছিলেন এবং অবিবাহিত ব্যভিচারীকে বেত্রাঘাত করেছিলেন, কিন্তু বায়তুল মাল হতে তাদের হিস্যা প্রদান করেছিলেন ও তারা মুসলিম রমণী বিবাহ করেছিল। এভাবে রাসুল (সঃ) তাদের পাপের জন্য তাদেরকে শাস্তি দিয়েছিলেন আবার তাদের বিষয়ে আল্লাহ্‌র আদেশও মান্য করেছিলেন। না তিনি ইসলাম কর্তৃক প্রদত্ত অধিকার থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করেছেন আর না তিনি ইসলামের অনুসারীদের তালিকা হতে তাদের নাম কেটে দিয়েছেন।

নিশ্চয়ই, তোমরা সর্বাপেক্ষা খারাপ লোক এবং তোমরা হলে সে সব লোক যাদেরকে শয়তান তার পথে রেখেছে এবং তার বেরিয়ে আসার পথবিহীন রাজ্যে নিক্ষেপ করেছে। আমার বিষয়ে দু'প্রকার লোক ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। প্রথমতঃ যে আমাকে অত্যধিক ভালবাসে এবং এ ভালবাসা তাকে ন্যায়পরায়ণতা হতে সরিয়ে নিয়ে যায়। দ্বিতীয়তঃ যে আমাকে অত্যধিক ঘৃণা করে এবং সে ঘৃণা তাকে ন্যায়পরায়ণতা হতে সরিয়ে নিয়ে যায়। আমার বিষয়ে সে ব্যক্তি সর্বোত্তম যে মধ্যপথাবলম্বী। সুতরাং তার সাথে থেকো এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমদের সাথে থেকো কারণ আল্লাহ্‌র হাত (প্রতিরক্ষার) ঐক্য রক্ষার ওপর। বিভেদ সম্পর্কে তোমরা সাবধান থেকো কারণ দল থেকে বিচ্ছিন্ন একজন লোক সহজেই শয়তানের শিকারে পরিণত হয় যেমন করে পাল থেকে বিচ্ছিন্ন ভেড়া নেকড়ের শিকার হয়।

সাবধান, এ পথের দিকে যে আহ্বান করে তাকে হত্যা কর; যদি সে আমার পাগড়ীর নীচেও থেকে থাকে। নিশ্চয়ই সালিশদ্বয় নিয়োগ করা হয়েছিলো কুরআন যা বাঁচিয়ে রাখতে বলে তা বাঁচিয়ে রাখার জন্য এবং কুরআন যা ধ্বংস করতে বলে তা ধ্বংস করার জন্য। বাঁচিয়ে রাখা অর্থ হলো কুরআন সমর্থিত বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ হওয়া, আর ধ্বংস মানে হলো কুরআন অসমর্থিত বিষয়ে বিভেদ হওয়া। কুরআন যদি আমাদেরকে তাদের দিকে পরিচালিত করে তাহলে আমরা তাদেরকে অনুসরণ করবো এবং কুরআন যদি তাদেরকে আমাদের দিকে পরিচালিত করে তাহলে তারা আমাদেরকে অনুসরণ করবে। তোমাদের পিতা না থাকুক! (তোমাদের ওপর লানত), আমি তোমাদের কোন দুর্ভাগ্য ঘটাই নি; আমি তোমাদেরকে কোন বিষয়ে প্রতারণা করিনি; আমি কোন বিষয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করিনি। তোমাদের নিজেদের দল সর্বসম্মতিক্রমে এ দু'জন লোকের বিষয়ে সুপারিশ করেছিলো। আমরা তাদেরকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করেছিলাম যেন তারা কুরআনের ব্যতিক্রম না করে। কিন্তু তারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছিলো এবং ন্যায় পরিত্যাগ করেছিলো। অথচ তারা উভয়েই কুরআন সম্পর্কে অবগত। তারা তাদের প্রবৃত্তির তাড়নায় এহেন অন্যায় কাজ করেছিলো এবং তারা উহাকে পদদলিত করেছিলো। আমরা মনে করেছিলাম যে, ন্যায়-বিচারের সাথে সালিশ করতে গিয়ে এবং ন্যায়পরায়ণতার প্রতি স্থিরচিত্ত থাকতে গিয়ে তারা তাদের নিজেদের মতামতের কুপ্রভাব ও নিজেদের রোয়েদাদের অকল্যাণ বর্জন করবে। কিন্তু তারা তা করতে পারেনি সেহেতু তাদের রোয়েদাদ আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

★★★★★

খোৎবা-১২৭

বসরায় সংঘটিত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী সম্পর্কে

হে আহ্‌নাফ, আমি যেন দেখতে পাচ্ছি, সে একদল সৈন্যসহ এগিয়ে আসছে এবং তাতে কোন ধুলি উড়ছে না, কোন শব্দ হচ্ছে না, লাগামের মর্মর ধ্বনি হচ্ছে না বা ঘোড়ার হ্রেষারব হচ্ছে না। তারা মাটিকে পদদলিত করছে, পাগুলো যেন উট পাখীর পা। (আমিরুল মোমেনিন সাহিবুজ জান্‌জ[১] অর্থাৎ নিগ্রো নেতার প্রতি ইঙ্গিত দিলেন— শরীফ রাজী)। তৎপর তিনি বললেনঃ

বসরার বসতিপূর্ণ রাস্তার লোকসকল এবং শকুনের পাখার মত পক্ষযুক্ত ও হাতির শুড়যুক্ত সুসজ্জিত বাড়ীর লোক সকল, তোমাদের ওপর লানত। তারা এমন লোক যাদের মধ্য হতে কেউ নিহত হলে তার জন্য শোক করার কেউ নেই অথবা কেউ হারিয়ে গেলে তাকে খোঁজার কেউ নেই। আমি দুনিয়াকে উহার মুখের ওপর উল্টিয়ে দিয়েছি (উপুড় করে ফেলা), সর্বনিম্ন মূল্যে উহাকে মূল্যায়ন করি এবং এমন চোখে উহার দিকে তাকাই যা উহার উপযুক্ত।

আমি এমন লোককে[২] দেখি যাদের মুখমন্ডল বর্মের অমসৃণ চামড়ার মত। তারা সিল্ক ও পশমী পোষাক পরিধান করে এবং সুন্দর সুন্দর ঘোড়ায় চড়ে। তারা এমন হত্যাযজ্ঞ ও রক্তপাত ঘটাবে যে, আহতগণ লাশের ওপর দিয়ে হেঁটে যাবে এবং বন্দী অপেক্ষা পলাতকের সংখ্যা কম হবে।

বনি কালবের একজন লোক (আমিরুল মোমেনিনের সাথী) বললো, "হে আমিরুল মোমেনিন, আপনি আমাদেরকে গুপ্ত বিষয়ের জ্ঞান দান করেছেন।" এ কথা শুনে আমিরুল মোমেনিন হেসে উঠে বললেনঃ

হে কালবের ভ্রাতা, এটা ইলমুল গায়েব (গুপ্ত জ্ঞান) নয়; এসব বিষয় তাঁর কাছ থেকে অর্জন করেছি যিনি (রাসুল) এ বিষয় জানতেন। ইলমুল গায়েব অর্থ হলো বিচার দিনের জ্ঞান এবং নিম্নের আয়াতের আওতায় যেসব বিষয় আল্লাহ্ গুপ্ত রেখেছেনঃ

কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহ্র নিকট রয়েছে, তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তিনি জানেন যা জরায়ুতে আছে। কেউ জানে না আগামীকাল সে কি অর্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন স্থানে তার মৃত্যু ঘটবে। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সর্ব বিষয়ে অবহিত (কুরআন-৩১ঃ৩৪)।

সুতরাং গর্ভাশয়ে যা আছে— পুরুষ কি নারী, সুন্দর কি কুৎসিত, দয়ালু কি কৃপণ, দুর্বৃত্ত কি ধার্মিক, দোযখের জ্বালানি কি বেহেশতে রাসুলের অনুচর এসবকিছু শুধু আল্লাহ্ই জ্ঞাত আছেন। এটাই ইলমুল গায়েব যা আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ জানে না। এসব ছাড়া যে জ্ঞান আল্লাহ্ তাঁর রাসুলকে দান করেছিলেন তা তিনি আমাকে দান করেছিলেন এবং আমার জন্য দোয়া করে বলেছিলেন যে, আমার বক্ষে যেন তা থাকে ও আমার পাঁজর যেন তা ধারণ করতে পারে।

১। সাহিবুজ জান্জ (নিগ্রো নেতা) বলতে যে লোকটির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে সে হলো আলী ইবনে মুহাম্মদ। সে রায়ের উপকণ্ঠে ওয়ারজানিন নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলো এবং সে খারিজীদের আজারিকাহ্ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। সে নিজেকে রাসুলের বংশধর বলে দাবী করেছিলো এবং তার বংশ পরিচয় এভাবে প্রকাশ করেছিলো যে, আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ মুখতাফি ইবনে ইসা ইবনে জায়েদ ইবনে আলী ইবনে হুসায়েন ইবনে আলী ইবনে আবি তালিব। কিন্তু সাজারাহ বিশেষজ্ঞগণ ও জীবনীলেখকগণ তার এ দাবি নাকচ করে দিয়েছে। তারা তার পিতার নাম মুহাম্মদ ইবনে আবদার রহমান বলে উল্লেখ করেছে। তার পিতা ছিল আবদাল কায়েস গোত্রের এবং সে (আলী ইবনে মুহাম্মদ) একজন সিন্ধী ক্রীতদাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিল।

আলী ইবনে মুহাম্মদ ২৫৫ হিজরী সনে মুহতাদি বিল্লাহ্র রাজত্বকালে বসরা আক্রমণ করেছিলো। সে বসরার উপকণ্ঠের জনগণকে অর্থ, সম্পদ ও মুক্তির প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিজের দলে ভিড়িয়ে বসরা আক্রমণ করেছিলো। ২৫৫ হিজরী সনের ১৭ ই শাওয়াল সে বসরায় প্রবেশ করেছিলো। বসরায় যে হত্যাযজ্ঞ সে ঘটিয়েছিলো তাতে দু'দিনে ত্রিশ হাজার নারী, পুরুষ ও শিশু নিহত হয়েছিল। সে ঘরবাড়ী ভেঙ্গে দিয়েছিলো, মসজিদ জ্বালিয়ে দিয়েছিলো এবং চৌদ্দ বছর হত্যা, লুণ্ঠন ও ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে ২৭০ হিজরী সনের সফর মাসে নিহত হলে জনগণ ধ্বংসযজ্ঞ হতে মুক্তি পেয়েছিলো। সে সময় মুয়াফ্ফাক বিল্লাহ্র রাজত্বকাল ছিল।

আমিরুল মোমেনিনের এ ভবিষ্যদ্বাণী অন্যান্য ভবিষ্যদ্বাণীর ন্যায় অজানা বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করেছিল। আলী ইবনে মুহাম্মদের সৈন্য বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণী একটা ঐতিহাসিক সত্য। ইতিহাসবেত্তা তাবারী লিখেছেন যে, এ লোকটি যখন বিদ্রোহ করার উদ্দেশ্যে কারখ নামক স্থানে পৌছে তখন এ স্থানের লোকেরা তাকে অভ্যর্থনা জানায়। এক লোক তাকে একটা ঘোড়া উপহার দেয়। উহার লাগাম পর্যন্ত ছিল না। সেই ঘোড়ায় চড়ার জন্য সে দড়ি ব্যবহার করেছিল। একইভাবে তার দলে মাত্র তিনখানা তরবারি ছিল। একখানা আলী ইবনে আবান আল-মুহাল্লাবির, একখানা মুহাম্মদ ইবনে সালমের এবং একখানা তার নিজের। পরবর্তীতে সে লুণ্ঠন করে অনেক অস্ত্র সংগ্রহ করে।

২। আমিরুল মোমেনিনের এ ভবিষ্যদ্বাণী ছিল তারতারদের (মঙ্গোল) আক্রমণ সংক্রান্ত বিষয়ে। এরা তুর্কীস্থানের উত্তর-পশ্চিমে মঙ্গোলিয়ান মরুভূমির অধিবাসী। এই বর্বর জাতি লুণ্ঠন, হত্যা ইত্যাদি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতো। এরা নিজেদের মধ্যেও যুদ্ধ-বিগ্রহ করতো এবং প্রতিবেশী এলাকাসমূহ আক্রমণ করতো। প্রত্যেক গোত্রের আলাদা আলাদা গোত্রপতি ছিল যে নিজের গোত্রের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব বহন করতো। এরকম একটি গোত্রের গোত্রপতি ছিল চেঙ্গিস খান (টেমুজিন)। সে অত্যন্ত দুঃসাহসী ও দুর্ধর্ষ প্রকৃতির লোক ছিল। সে তাদের বিভক্ত গোত্রসমূহকে একত্রিত করার চেষ্টা

চালাতে লাগলো। বিভিন্ন গোত্রের বিরোধিতা সত্ত্বেও সে তার বুদ্ধিমত্তা ও শক্তি সামর্থ্যের ফলে কৃতকার্য হয়েছিল। তার ঝান্ডা তুলে এক বিশাল বাহিনী জড়ো করে সে ৬০৬ হিজরী সনে ঝড়ের বেগে নগরীর পর নগরী দখল করে নিয়েছিল এবং জনগণকে ধ্বংস করে ছাড়লো। এভাবে সে উত্তর চীন পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখন্ড জয় করে নিল।

এসব ভূখন্ডে তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবার পর সে প্রতিবেশী দেশ তুর্কীস্থানের শাসক আলাউদ্দিন খওয়ারাজম শাহ্-এর সাথে এক চুক্তি করলো যাতে উল্লেখ ছিল যে, তারতার ব্যবসায়ীগণকে তুর্কীস্থানে ব্যবসায়ের অনুমতি দিতে হবে এবং তাদের জান-মালের নিরাপত্তা বিধান করতে হবে। কিছুদিন তারা মুক্তভাবে ব্যবসা করার পর আলাউদ্দিন তাদের বিরুদ্ধে গুপ্তচর বৃত্তির অভিযোগ এনে তাদের মালামাল বাজেয়াপ্ত করলো এবং আত্‌রার এলাকার প্রধান দ্বারা তাদেরকে নিহত করায়েছিল। এতে চেঙ্গিস খান ক্রোধান্ধ হয়ে আলাউদ্দিনের নিকট বার্তা প্রেরণ করলো যেন সে তারতারদের মালামাল ফেরত পাঠিয়ে দেয় এবং আতরারের শাসককে যেন তার হাতে তুলে দেয়। আলাউদ্দিন নিজের শক্তি ও ক্ষমতার দম্ভে চেঙ্গিস খানের কথায় কর্ণপাত করেনি, বরং অদূরদর্শীর মত কাজ করে চেঙ্গিসের দূতকে হত্যা করেছিলো। এতে চেঙ্গিস খানের চোখে রক্ত উঠে গেল। তার নেতৃত্বে তারতার বাহিনী তাদের দ্রুতগামী ও খোজা না করা ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে বুখারার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। আলাউদ্দিন চার লক্ষ সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে মোকাবেলা করেও তারতারদের প্রতিহত করতে ব্যর্থ হলো। মাত্র কয়েকটি আক্রমণের পরই সে পরাজিত হয়ে সিন্দুন নদীর ধারে নিশাবুর এলাকায় পালিয়ে গেল। তারতারগণ বুখারাকে ধুলিসাৎ করে দিল। তারা মানুষের ঘর-বাড়ী, স্কুল ও মসজিদ জ্বালিয়ে ভস্ম করে ফেললো এবং নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে হত্যা করেছিলো। পরবর্তী বছর তারা সমরকন্দ আক্রমণ করে উহা সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিয়েছিলো। আলাউদ্দিন পালিয়ে যাবার পর তার পুত্র জালালুদ্দিন খওয়ারাজম সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলো। তারতারগণ তাকেও তাড়না করেছিলো এবং সে দশ বছর এখানে সেখানে পালিয়ে বেড়িয়েছিলো। এ সময় তারতারগণ জনবসতিপূর্ণ স্থানসমূহ ধ্বংস করে মানবতাকে চরমভাবে লাঞ্ছিত করেছিলো। তাদের ধ্বংসযজ্ঞ হতে কোন নগরী নিষ্কৃতি পায়নি এবং কোন জনপদ তাদের পদদলন হতে রেহাই পায়নি। এভাবে সমগ্র উত্তর এশিয়ায় তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

৬২২ হিজরী সনে চেঙ্গিস খানের মৃত্যুর পর তার পুত্র ওগেদি খান ক্ষমতা দখল করেছিলো। সে ৬২৮ হিজরী সনে জালালুদ্দিনকে খুঁজে বের করে হত্যা করেছিলো। ওগেদি খানের পর তার ভ্রাতুষ্পুত্র মংকা খান সিংহাসনে বসে। মংকা খানের পর কুবলাই খান দেশের একটা অংশের কর্তৃত্ব পায় এবং এশিয়া অংশ তার ভ্রাতা হালাগু খানের কর্তৃত্বে চলে যায়। সমগ্র রাজ্য চেঙ্গিস খানের পৌত্রদের মধ্যে বিভক্ত হয়ে যাওয়ায় হালাগু খান মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল জয় করার চিন্তা করতেছিলো। এ সময় খুরাশানের হানাফি মুসলিমগণ শাফেয়ী মুসলিমদের সাথে শত্রুতাবশতঃ খুরাশান আক্রমণের জন্য হালাগু খানকে আমন্ত্রণ জানায়। এতে হালাগু খান খুরাশান আক্রমণ করে। হানাফিগণ নিজেদেরকে নিরাপদ মনে করে নগরীর তোরণ খুলে দিয়েছিলো। কিন্তু তারতার বাহিনী হানাফী ও শাফেয়ী নির্বিচারে হাতের কাছে যাকে পেয়েছে তাকেই হত্যা করেছে। এভাবে নগরী বিরান করে তারা উহা দখল করে নিয়েছে। হানাফি ও শাফেয়ীদের এই বিভেদ তার ইরাক জয়ের পথ খুলে দিল। ফলে খুরাশান জয় করার পর তার সাহস বৃদ্ধি পেল এবং ৬৫৬ হিজরী সনে সে দু'লক্ষ তারতার বাহিনী নিয়ে বাগদাদ আক্রমণ করলো। তখন খলিফা ছিল মুসতাসিম বিল্লাহ্। খলিফার বাহিনী ও বাগদাদের জনগণ সম্মিলিতভাবে হালাগুর আক্রমণ প্রতিহত করার চেষ্টা করেছিলো কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারেনি। আশুরার দিন তারতার বাহিনী বাগদাদে প্রবেশ করেছিলো এবং চল্লিশ দিন ধরে হত্যাযজ্ঞ ও রক্তপাত চালিয়েছিলো। রাস্তায় রাস্তায় রক্তের স্রোত বয়ে গিয়েছিল এবং অলি-গলি মৃতলাশে পরিপূর্ণ ছিল। মুসতাসিম বিল্লাহকে পদদলিত করে হত্যা করা হয়েছিল। লক্ষ লক্ষ লোক তাদের তরবারিতে প্রাণ হারিয়েছিল। শুধুমাত্র যারা আত্মগোপন করে তাদের দৃষ্টি এড়াতে পেরেছিল তারা প্রাণে রক্ষা পেয়েছে। এতেই আব্বাসীয় রাজত্বের পরিসমাপ্তি ঘটলো এবং তাদের পতাকা আর কোনদিন উড়েনি।

★★★★★

খোৎবা-১২৮

দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ীত্ব ও এর মানুষের অবস্থা সম্পর্কে

হে আল্লাহ্র বান্দাগণ! তোমরা এবং এ দুনিয়া হতে তোমরা যা কিছু কামনা কর তা সবই নির্ধারিত সময়ের অতিথি মাত্র এবং ঋণদাতার মত যে শুধু ঋণ পরিশোধের জন্য আহ্বান করে। তোমাদের জীবনকাল ক্রমশঃ কমে আসছে আর তোমাদের আমলের রেকর্ড যথাযথভাবে সংরক্ষিত হচ্ছে। অনেক উদ্যমী লোক সময়ের অপচয় করছে এবং যারা সচেষ্ট তাদের অনেকেই ক্ষতির দিকে ধাবিত হচ্ছে। তোমরা এমন এক সময় আছো যখন সৎগুণাবলী ও ধার্মিকতার অবক্ষয় হচ্ছে,পাপ সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এবং মানুষের ধ্বংসের জন্য শয়তান অত্যাগ্রহী হয়ে পড়ছে। বর্তমান সময়ে শয়তানের সরঞ্জাম শক্তিশালী, তার ফাঁদ সুবিস্তৃত এবং তার শিকার ধরা সহজসাধ্য হয়ে পড়েছে।

যেদিকে ইচ্ছা মানুষের দিকে তাকাও, দেখতে পাবে হয় দারিদ্র নিষ্পেষিত দরিদ্র লোক, না হয় ধনীলোক যারা আল্লাহ্র নেয়ামত ভোগ করা সত্ত্বেও তাঁকে উপেক্ষা করছে, না হয় কৃপণ লোক যে আল্লাহ্র প্রতি দায়িত্ব পদদলিত করে সম্পদ বৃদ্ধি করছে, না হয় অবাধ্য লোক যে সকল প্রকার উপদেশ হতে কানকে রুদ্ধ রাখছে। কোথায় তোমাদের কল্যাণকামী লোকসকল; কোথায় তোমাদের ন্যায়বানগণ? কোথায় তোমাদের আদর্শবাদী ও দয়াদ্রচিত্ত লোকসকল? কোথায় তোমাদের সেসব লোক যারা ব্যবসায়ে প্রতারণা করে না এবং তাদের আচরণে তারা পরিশুদ্ধ। তারা সবাই কি এ অমর্যাদাকর, ক্ষণস্থায়ী ও বিপদজ্জনক দুনিয়া থেকে প্রস্থান করেনি? তোমাদেরকে কি সেসব লোকের মধ্যে রেখে যায়নি যারা নীচ-নোংরা—যারা এত নীচ যে, তাদের কথা মুখে আনা যায় না—যাদের নীচতার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করতে ঠোঁট নড়ে না।

আমরাতো আল্লাহ্রই এবং নিশ্চিতভাবেই তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী (কুরআন-২ঃ১৫৬)

ফেতনা ছড়িয়ে পড়েছে। এর বিরোধিতা বা গতিরোধ করার মত কাউকে দেখছি না। এর প্রতি বিরাগ সৃষ্টিকারী বা বিরতকারী কাউকে তো দেখছি না। এসব গুণাবলী নিয়েই কি তোমরা আল্লাহ্র পবিত্র সান্নিধ্য কামনা কর ও তাঁর একনিষ্ঠ প্রেমিক হতে চাও? আহা! আল্লাহ্কে তাঁর বেহেশত সম্বন্ধে ছলনা করা যায় না এবং তার আনুগত্য ব্যতিরেকে তাঁর রহমত লাভ করা যায় না। তাদের ওপর আল্লাহ্র অভিশাপ যারা অন্যকে ভাল উপদেশ দেয় কিন্তু নিজে তা করে না এবং যারা অন্যকে পাপে বাধা দেয় কিন্তু নিজে পাপে লিপ্ত।

★★★★★

খোৎবা-১২৯

মদিনা হতে আবু যরের বহিষ্কারের সময় প্রদত্ত ভাষণ

হে আবু যর! তুমি আল্লাহ্র নামে ক্রোধ দেখিয়েছিলে। সুতরাং যার ওপরে রাগান্বিত হয়েছিলে তার বিষয়ে আল্লাহ্তে আশা রেখো। মানুষ তাদের জাগতিক বিষয়ের জন্য তোমাকে ভয় করতো, আর তুমি তোমার ইমানের জন্য তাদেরকে ভয় করতে। কাজেই তারা যেজন্য তোমাকে ভয় করে তা তাদের কাছে রেখে দাও এবং তুমি যে জন্য তাদেরকে ভয় কর তা নিয়ে বেরিয়ে পড়। যে বিষয় হতে তুমি তাদেরকে বিরত করতে চেয়েছিলে তাতে তারা কতই না আসক্ত এবং যে বিষয়ে তারা তোমাকে অস্বীকার করেছে উহার প্রতি তুমি কতই না নির্লিপ্ত। অল্পকাল পরেই তুমি জানতে পারবে আগামীকাল (পরকালে) কে বেশী লাভবান এবং কে বেশী ঈর্ষনীয়। এমন কি সমস্ত আকাশ ও পৃথিবী যদি কারো জন্য রুদ্ধ হয়ে যায় এবং সে যদি আল্লাহ্কে ভয় করে, তবে আল্লাহ্ তার জন্য

উহা খুলে দিতে পারেন। শুধু ন্যায়পরায়ণতা তোমাকে আকর্ষণ করে এবং অন্যায় তোমাকে বিকর্ষণ করে। যদি তুমি তাদের জাগতিক বিষয়ের প্রীতি গ্রহণ করতে তাহলে তারা তোমাকে ভালবাসতো এবং যদি তুমি তাদের সাথে ইহার অংশগ্রহণ করতে তবে তারা তোমাকে আশ্রয় দিত।

১। আবু যর আল-গিফারীর নাম ছিল জুনদাব ইবনে জুনাদাহ্। তিনি মদিনার পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত রাবাযাহ্ নামক একটা ছোট গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। রাসুলের (সঃ) ইসলাম প্রচারের কথা শুনামাত্রই তিনি মক্কা এসেছিলেন এবং রাসুলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এতে কাফের কুরাইশগণ তাকে নানাভাবে অত্যাচার-উৎপীড়ন করেছিল কিন্তু তার দৃঢ় সংকল্প হতে তাকে টলাতে পারেনি। ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে তিনি চতুর্থ অথবা পঞ্চম ছিলেন। ইসলামে অগ্রণী হবার সাথে তার আত্মত্যাগ ও তাকওয়া এত উঁচু স্তরের ছিল যে, রাসুল (সঃ) বলেছেনঃ

আমার লোকদের মধ্যে আবু যরের আত্মত্যাগ ও তাকওয়া মরিয়ম তনয় ঈসার মত।

খলিফা উমরের রাজত্বকালে আবু যর সিরিয়া চলে গিয়েছিলেন এবং উসমানের সময়েও তথায় ছিলেন। তিনি উপদেশ প্রদান, ধর্ম প্রচার, সৎপথ প্রদর্শন ও আহলুল বাইতের মহত্ত্ব সম্বন্ধে জনগণকে অবহিত করে দিন অতিবাহিত করেছিলেন। বর্তমানে সিরিয়া ও জাবাল আমিলে (উত্তর লেবানন) শিয়া সম্প্রদায়ের যে চিহ্ন পাওয়া যায় তা তার প্রচার ও কার্যক্রমের ফল। সিরিয়ার শাসনকর্তা মুয়াবিয়া তাকে ভাল চোখে দেখতো না। উসমানের অন্যায় কর্মকান্ড ও তহবিল তসরুফের প্রকাশ্য সমালোচনা করতেন বলে মুয়াবিয়া তার উপর খুব বিরক্ত ছিল। কিন্তু সে তাকে কিছু করতে না পেরে উসমানের কাছে পত্র লিখলো যে, আবু যর যদি আরো কিছুদিন এখানে থাকে তবে সে জনগণকে খলিফার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলবে। প্রত্যুত্তরে উসমান লিখলো যে, আবু যরকে যেন জিনবিহীন উটের পিঠে চড়িয়ে মদিনায় প্রেরণ করা হয়। উসমানের আদেশ পালিত হয়েছিলো। মদিনায় পৌঁছেই তিনি ন্যায় ও সত্যের প্রচার শুরু করলেন। তিনি মানুষকে রাসুলের (সঃ) সময়ের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে লাগলেন এবং রাজকীয় সাড়ম্বরতা প্রদর্শনের বিষয়ে সতর্ক করতে লাগলেন। এতে উসমান অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে তাঁর কথা বলা বন্ধ করতে চেষ্টা করলেন। একদিন উসমান তাকে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন, "আমি জানতে পেরেছি তুমি নাকি প্রচার করে বেড়াচ্ছো যে, রাসুল (সঃ) বলেছেনঃ

যখন বনি উমাইয়া ত্রিশজন সংখ্যায় হবে তখন তারা আল্লাহ্‌র নগরীসমূহকে তাদের নিজের সম্পদ মনে করবে, তাঁর বান্দাগণকে তাদের গোলাম মনে করবে এবং তাঁর দ্বীনকে তাদের প্রতারণার হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করবে।

আবু যর বললেন তিনি রাসুলকে (সঃ) এরূপ বলতে শুনেছেন। উসমান বললেন যে, আবু যর মিথ্যা কথা বলেছে এবং তিনি তার পার্শ্বে উপবিষ্ট সকলকে জিজ্ঞেস করলেন যে, তারা এমন কথা শুনেছে কিনা। উপস্থিত সকলেই না বোধক উত্তর দিয়েছিল। আবু যর তখন বললেন যে, এ বিষয়ে আলী ইবনে আবি তালিবকে জিজ্ঞেস করা হোক। তখন আলীকে ডেকে পাঠানো হলো এবং তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি আবু যরের বক্তব্যের সত্যতা স্বীকার করেন। তখন উসমান আলীর কাছে জানতে চাইলেন কিসের ভিত্তিতে তিনি এ হাদীসের সত্যতা সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছেন। আমিরুল মোমেনিন বললেন তিনি রাসুলকে বলতে শুনেছেনঃ

আকাশের নীচে ও মাটির ওপরে আবু যর অপেক্ষা অধিক সত্য বক্তা আর কেউ নেই।

এতে উসমান আর কথা না বাড়িয়ে চুপ করে রইলেন কারণ আবু যরকে এরপরও মিথ্যাবাদী বলা মানে রাসুলের (সঃ) ওপর মিথ্যারোপ করা। কিন্তু ভেতরে ভেতরে উসমান আবু যরের ওপর ভীষণ রাগান্বিত হয়ে রইলেন। কারণ তিনি তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে পারেননি। অপরদিকে মুসলিমদের সম্পদ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করার জন্য আবু যর প্রকাশ্যভাবে উসমানের সমালোচনা অব্যাহত রাখলেন। যেখানেই তিনি উসমানকে দেখতেন সেখানে নিম্নের আয়াত আবৃত্তি করতেন ঃ

.... আর যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জীভূত করে এবং উহা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে না তাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও। সে দিন জাহান্নামের অগ্নিতে উহা উত্তপ্ত করা হবে এবং উহা দ্বারা তাদের ললাট,

পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশে দাগ দেয়া হবে। সেদিন বলা হবে, ইহাই উহা যা তোমরা নিজেদের জন্য পুঞ্জীভূত করতে (কুরআন-৯ ঃ ৩৪-৩৫)।

উসমান অর্থ দিয়ে আবু যরের মুখ বন্ধ করতে চাইলেন কিন্তু এ স্বাধীনচেতা লোকটিকে তার সোনার ফাঁদে আটকাতে পারেননি। এ লোকটি কোন কিছুতেই ভীত হলেন না অথবা প্রলুব্ধও হলেন না, আবার তার মুখও বন্ধ হলো না; অবশেষে মদিনা ত্যাগ করে রাবাযাহ্ চলে যাবার জন্য উসমান তাকে নির্দেশ দিলেন এবং মারওয়ান ইবনে হাকামকে (এই হাকামকে তার কুকর্মের জন্য রাসুল মদিনা হতে বহিস্কার করেছিলেন; সে তার পুত্রসহ নির্বাসনে ছিল এবং উসমান তাদেরকে ফেরত এনেছিল) নিয়োগ করেছিল আবু যরকে বের করে দেয়ার জন্য। একই সাথে উসমান একটা অমানবিক আদেশ জারী করেছিলেন যে, আবু যরকে কেউ যেন বিদায় সম্বর্ধনা না জানায়। কিন্তু আমিরুল মোমেনিন, ইমাম হাসান, ইমাম হুসাইন, আকীল ইবনে আবি তালিব, আবদুল্লাহ্ ইবনে জাফর ও আম্মার ইবনে ইয়াসির খলিফার অমানবিক আদেশ অমান্য করে আবু যরকে বিদায় সম্বর্ধনা দিয়েছিলেন। সেই বিদায় সম্বর্ধনায় আমিরুল মোমেনিন এ খোৎবা প্রদান করেন।

রাবাযাহ্‌তে যাবার পর হতে আবু যর অতি দুঃখ-কষ্টে দিন কাটাচ্ছিলেন। এ স্থানে তার পুত্র যর ও তার স্ত্রী মারা গিয়েছিলো এবং তার জীবিকা নির্বাহের জন্য যে ভেড়া ও ছাগল পালন করতেন সেগুলোও মরে গিয়েছিল। তার সন্তানদের মধ্যে একটি কন্যা জীবিত ছিল যে পিতার দুঃখ-কষ্ট ও উপোসের অংশীদার ছিল। যখন তাদের জীবিকার সকল পথ বন্ধ হয়ে গেল তখন দিনের পর দিন উপোস করে সে পিতাকে বললো,"বাবা, আর তো ক্ষুধার জ্বালা সইতে পারিনা। আর কতদিন এভাবে কাটাবো। জীবিকার সন্ধানে চল অন্য কোথাও যাই।" আবু যর কন্যাকে সাথে নিয়ে এক নির্জন স্থানের মধ্য দিয়ে যাত্রা করলেন। কোথাও বৃক্ষপত্র পর্যন্ত তাঁর চোখে পড়লো না। অবশেষে এক স্থানে তিনি ক্লান্ত হয়ে বসে পড়লেন। তিনি কিছু বালি একত্রিত করে উহার ওপর মাথা রেখে শুয়ে পড়লেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই তার চোখে-মুখে মৃত্যুর লক্ষণ দেখা দিল।

পিতার এ অবস্থা দেখে কন্যা বিচলিত হয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো এবং বললো, "পিতা, এ নির্জন স্থানে তোমার মৃত্যু হলে আমি কিভাবে তোমার দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করবো।" প্রত্যুত্তরে পিতা বললেন, "বিচলিত হয়ো না। রাসুল (সঃ) আমাকে বলেছেন অসহায় অবস্থায় আমার মৃত্যু হবে এবং কয়েকজন ইরাকী আমার দাফন-কাফন করবে। আমার মৃত্যুর পর আমাকে চাদরে ঢেকে রাস্তার পাশে বসে থেকো এবং কোন যাত্রিদল যেতে থাকলে তাদরকে বলো রাসুলের প্রিয় সাহাবা আবু যর মারা গেছে।" ফলে তার মৃতুর পর তার কন্যা রাস্তার পাশে বসেছিল। কিছুক্ষণ পরে একটি যাত্রিদল সে পথ দিয়ে যাচ্ছিলো। এ যাত্রিদলে ছিল মালিক ইবনে হারিছ আল-আশতার, হুজর ইবনে আবদি আত-তাঈ, আল-কামাহ্ ইবনে কায়েস, ছাছা'আহ ইবনে সুহান, আসওয়াদ ইবনে ইয়াজিদসহ মোট চৌদ্দজন। আবু যরের এহেন অসহায় মৃত্যুর কথা শুনে তারা অত্যন্ত শোক বিহ্বল হলো। তারা তাদের যাত্রা স্থগিত করে আবু যরের দাফনের ব্যবস্থা করলেন। মালিক আশতার কাফনের জন্য একটি চাদর দিলেন। এ কাপড়টির দাম ছিল চার হাজার দিরহাম। তার জানাজার পর তাকে দাফন করে তারা প্রস্থান করলো। ৩২ হিজরী সনের জিলহজ্জ মাসে এ ঘটনা ঘটেছিল।

★★★★★

খোৎবা-১৩০

খেলাফত গ্রহণের কারণ ও শাসকের গুণাবলী

হে জনমন্ডলী! তোমাদের হৃদয় ও মন দ্বিধা বিভক্ত। তোমাদের দেহ এখানে কিন্তু তোমাদের বোধশক্তি এখানে অনুপস্থিত। আমি তোমাদেরকে সত্যের পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি আর তোমরা উহা হতে এমনভাবে দৌড়ে পালিয়ে যাচ্ছো যেন ভেড়া-ছাগলের পাল সিংহের গর্জনে দৌড়ে পালায়। ন্যায়ের গুপ্তভেদ তোমদের কাছে উন্মোচন করা কতই না শক্ত। সত্যের বক্রতাকে সোজা করতে আমার কতই না কষ্ট হচ্ছে।

হে আমার আল্লাহ্! তুমি তো জান যে, আমরা যা করেছি তা ক্ষমতার লোভে বা এ অসার দুনিয়া হতে কোন কিছু অর্জন করার জন্য করিনি। বরং আমরা চেয়েছিলাম তোমার দ্বীনের চিহ্ন টিকিয়ে রাখতে, তোমার নগরীসমূহকে উন্নতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে, যাতে তোমার বান্দাদের মধ্যে যারা অত্যাচারিত তারা নিরাপদে থাকতে পারে এবং তোমার পরিত্যাক্ত আদেশাবলী প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। হে আমার আল্লাহ্! আমিই প্রথম যে তোমাতে আত্মোৎসর্গ করেছে এবং তোমার ইসলামের কথা শুনা মাত্রই সাড়া দিয়েছে। রাসুল (সঃ) ব্যতীত আর কেউ সালাতে আমার অগ্রণী নয়।

হে আল্লাহ্, তুমি নিশ্চয়ই জান, যে ব্যক্তি মুসলিমগণের মান-ইজ্জত, জীবন, বায়তুল মাল, আইন প্রয়োগ ইত্যাদি দায়িত্বে ও নেতৃত্বে থাকবে সে কৃপণ হতে পারবে না যাতে জনগণের সম্পদের প্রতি তার লোলুপ দৃষ্টি পড়ে; সে অজ্ঞ হতে পারবে না যাতে তার অজ্ঞতা জনগণকে বিপথগামী করে ফেলে; সে রূঢ় আচরণের হতে পারবে না যাতে তার রূঢ়তা জনগণের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে; সে ন্যায়ের পরিপন্থি কিছু করতে পারবে না যাতে একদল অন্যদলের ওপর প্রাধান্য পায়; সে সিদ্ধান্ত নেয়ার সুবাদে উৎকোচ গ্রহণ করতে পারবে না যাতে অন্যের অধিকার খর্ব হয় এবং চূড়ান্ত না করে (কোন বিষয়) লুকিয়ে রাখতে ও রাসুলের সুন্নাহ্র প্রতি কোনরূপ উপেক্ষা প্রদর্শন করতে পারবে না যাতে জনগণ ধ্বংস হয়ে যায়।

★★★★★

খোৎবা-১৩১

মৃত্যু সম্পর্কে সতর্কাদেশ

আমরা আল্লাহ্র প্রশংসা করি যা তিনি দিয়েছেন উহার জন্য, যা তিনি নিয়ে যাচ্ছেন উহার জন্য, যা তিনি আমাদের ওপর আপতিত করেন উহার জন্য এবং আমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য। যা কিছু গুপ্ত তা তিনি অবহিত এবং যা কিছু দৃষ্টির আড়ালে তা তিনি দেখেন। মানুষের অন্তরে যা লুকিয়ে আছে তা তিনি জানেন এবং চোখ যা আড়াল করতে চায় তা তাঁর অজ্ঞাত নয়। আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি তিনি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর মনোনীত প্রতিনিধি। আমরা এ সাক্ষ্য দিচ্ছি গোপনে ও প্রকাশ্যে—হৃদয়ে ও মুখে।

আল্লাহ্র কসম, এটাই বাস্তবতা—কৌতুক নয়; এটাই সত্য, এতে কোন মিথ্যার লেশ নেই। এটা মৃত্যু ব্যতীত আর কিছু নয়। মৃত্যুর আহ্বান সতত উচ্চারিত হচ্ছে এবং টানা হেঁচড়াকারী (মৃত্যুদূত) দ্রুত পায়ে এগিয়ে আসছে। তোমরা আত্মপ্রবঞ্চনায় জড়িয়ে পড়ো না (অথবা অধিকাংশ লোক তোমাকে প্রবঞ্চনা করবে না)। তোমরা দেখেছো তোমাদের পূর্বে এ পৃথিবীতে বহু লোক বাস করতো যারা সম্পদের পাহাড় গড়েছিল, দারিদ্রকে ভয় করতো, সম্পদের কুফল হতে নিজেদেরকে নিরাপদ মনে করতো, যাদের কামনা-বাসনা ছিল অসীম এবং যারা মৃত্যু হতে দূরে সরে থাকতে চেয়েছিল। তারপর তাদের কি হয়েছিলো! মৃত্যু তাদেরকে গ্রাস করেছিলো, তাদের সুরম্য ভবন হতে তাদেরকে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছিলো এবং তাদের নিরাপদ স্থান হতে তাদেরকে সরিয়ে দেয়া হয়েছিলো। তারাও কাফনে আবৃত হয়েছিল—মানুষ তাদের সরিয়ে দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলো—তাদেরকে কফিনে করে কাঁধে বহন করে নিয়েছিলো।

তোমরা কি তাদেরকে দেখনি যারা অসীম আকাঙ্খা করতো, সুদৃঢ় ইমারত গড়তো, সম্পদ স্তূপীকৃত করতো কিন্তু তাদের প্রকৃত ঘর হয়েছিলো কবর এবং তাদের সমুদয় সঞ্চয় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিলো। তাদের ধন-সম্পদ পরবর্তী আপনজন ভোগ করেছিলো। তারা এখন আর কোন সৎ আমল বৃদ্ধি করতে পারছে না বা কোন

মন্দ আমলের জন্য আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে পারছে না। সুতরাং যে ব্যক্তি নিজের হৃদয়কে আল্লাহ্র ভয়ে ভীত থাকার জন্য অভ্যস্ত করে সে অগ্রণী মর্যাদা প্রাপ্ত হয় এবং তার আমল জয়যুক্ত হয়। এর জন্য নিজকে প্রস্তুত কর, জান্নাতের জন্য সম্ভব সব কিছু কর। নিশ্চয়ই এ পৃথিবী তোমার চিরস্থায়ী আবাসস্থল নয়। কিন্তু এটা সৃষ্টি করা হয়েছে যাত্রাপথের সরাইখানা হিসাবে যেন তোমরা উহা হতে সৎ আমলরূপী রসদ সংগ্রহ করে চিরন্তন আবাসস্থলে যেতে পার। এখান থেকে প্রস্থানের জন্য সদা-সর্বদা প্রস্তুত থেকো এবং যাত্রার জন্য বাহন সংগ্রহ করে রেখো।

★★★★★

খোৎবা-১৩২

আল্লাহ্র মহিমা সম্পর্কে

ইহকাল ও পরকাল উহাদের লাগাম আল্লাহ্র নিকট পেশ করেছে এবং আকাশমন্ডলী ও বিশ্ব-ব্রহ্মান্ড উহাদের কুঞ্জিকাঠি তাঁর দিকে ছুঁড়ে দিয়েছে। সজীব বৃক্ষাদি সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর প্রতি আনত হয় এবং তাঁরই আদেশে শাখাসমূহ অগ্নিশিখা দেয় ও উহাদের নিজের খাদ্য পরিপক্ক ফলে রূপান্তরিত হয়।

আল্লাহ্র কিতাব তোমাদের মধ্যেই রয়েছে। ইহা কথা বলে এবং ইহার জিহ্বায় কোন জড়তা নেই। ইহা এমন এক ঘর যার স্তম্ভ কখনো ধরাশায়ী হয় না এবং ইহা এমন এক শক্তি যার সমর্থক কখনো পরাজিত হয়ে ছত্রভঙ্গ হয় না।

পূর্ববর্তী নবীগণের পরে বেশ কিছুটা ব্যবধানে আল্লাহ্ রাসুলকে (সঃ) প্রেরণ করেছিলেন যখন জনগণের মধ্যে নানা কথা (বিরোধ) বিরাজমান ছিল। তাঁর সাথেই নবীদের ধারাবাহিকতা ও অহি-প্রত্যাদেশের পরিসমাপ্তি ঘটেছিল। তৎপর তিনি তাদের সাথে যুদ্ধ করেছিলেন যারা আল্লাহ্র পথ হতে সরে গিয়ে তাঁর সমান অন্য কিছুকে মনে করেছিল।

নিশ্চয়ই, যারা মানসিকভাবে অন্ধ তারা এ দুনিয়ার বাইরে কিছু দেখতে পায় না। যারা মনশ্চক্ষু দিয়ে দেখে তাদের দৃষ্টি দুনিয়া ভেদ করে যায় এবং তারা উপলব্ধি করতে পারে যে, প্রকৃত বাসস্থান এ দুনিয়ার বাইরে রয়েছে। ফলে দৃষ্টিমানগণ এ দুনিয়া হতে বেরিয়ে যেতে চায় আর অন্ধগণ এ দুনিয়াতে আবদ্ধ থাকতে চায়। দৃষ্টিমানগণ এ দুনিয়া হতে পরকালের জন্য রসদ সংগ্রহ করে আর অন্ধগণ শুধু ইহকালের জন্যই রসদ সংগ্রহ করে।

জেনে রাখো, মানুষ জীবন ব্যতীত অন্য সব কিছুতেই পরিতৃপ্তি পায় ও ক্লান্তি বোধ করে। কারণ সে মৃত্যুতে তার নিজের জন্য আনন্দ বোধ করে না। এটা মৃত হৃদয়ের জন্য জীবিত অবস্থা, অন্ধ চোখের জন্য দৃষ্টিশক্তি, বধির কানের জন্য শ্রুতিশক্তি, তৃষ্ণার্তের জন্য তৃষ্ণা নিবারণ এবং এতে রয়েছে পূর্ণ পর্যাপ্তি ও নিরাপত্তা।

আল্লাহ্র কেতাবের সাহায্যেই তোমরা দেখ, কথা বল ও শুন। ইহার এক অংশ অন্য অংশের জন্য কথা বলে এবং এক অংশ অন্য অংশের প্রমাণের কাজ করে। ইহা আল্লাহ্ সম্বন্ধে কোন মতভেদ করে না এবং ইহার অনুসারীগণকে কখনো আল্লাহ্র পথ হতে বিপথে পরিচালিত করে না। তোমরা একে অন্যের প্রতি ঘৃণা পোষণে একত্রিত হয়েছো। তোমরা বাইরে ভাল মানুষী দেখিয়ে ভেতরের ময়লা ঢাকতে চাচ্ছ। কামনা-বাসনার পূজায় তোমরা একে অপরকে ভালবাস এবং সম্পদ অর্জনে একে অপরের শত্রুতা কর। শয়তান তোমাদেরকে কুঁকড়ে দিয়েছে এবং প্রবঞ্চনা তোমাদেরকে বিপথগামী করেছে। আমি নিজের জন্য ও তোমাদের জন্য আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা করি।

★★★★★

খোৎবা-১৩৩

খলিফা উমর ইবনে খাত্তাব যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্য মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে রোম (বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য) অভিমুখে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে আমিরুল মোমেনিনের পরামর্শ চাইলে তিনি এ খোৎবা প্রদান করেন[১]।

এ দ্বীনের অনুসারীদের দায়িত্ব আল্লাহ্ নিজে গ্রহণ করেছেন। তিনিই তাদের সহায় ও তিনিই তাদের রক্ষাকর্তা। তারা যখন সংখ্যায় অল্প ছিল এবং নিজেদেরকে রক্ষা করার ক্ষমতা তাদের ছিল না তখনো আল্লাহ্ তাদেরকে সাহায্য করেছেন। তিনি চিরঞ্জীব—তাঁর মৃত্যু নেই। শত্রুর দিকে এগিয়ে যাবার জন্য যদি তুমি ইচ্ছা পোষণ কর ও নিজেই যদি সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে পড় এবং তাতে যদি কোন বিপদ ঘটে যায় তাহলে প্রত্যন্ত অঞ্চল ছাড়া মুসলিমদের আর কোন আশ্রয়স্থল থাকবে না এবং তাদের প্রত্যাবর্তনেরও কোন স্থান থাকবে না। সুতরাং তুমি একজন অভিজ্ঞ লোকের অধীনে এমন সৈন্যদের প্রেরণ কর যাদের অতীত প্রতিপাদন সন্তোষজনক এবং যারা শুভাশয় সম্পন্ন। যদি আল্লাহ্ তোমাকে বিজয়ী করেন তবে তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। অন্যথায়, তুমি জনগণের সহায়ক হিসাবে থাকতে পারবে এবং মুসলিমগণ প্রত্যাবর্তনের স্থান পাবে।

১। আমিরুল মোমেনিন সম্পর্কে এক অদ্ভুত প্রচারণা চালানো হয়েছিল। একদিকে বলা হতো তিনি প্রায়োগিক রাজনীতিতে অদক্ষ ছিলেন ও প্রশাসনের বাস্তব পদ্ধতির সাথে পরিচিত ছিলেন না। উমাইয়াদের ক্ষমতা লিপ্সাই যে তাদের বিদ্রোহের কারণ তা ধামাচাপা দেয়ার জন্যই বলা হতো আমিরুল মোমেনিনের দুর্বল শাসন ব্যবস্থাই তাদের ক্ষমতা গ্রহণের কারণ। অপরদিকে খলিফাগণ রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও মোশরেকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বিষয়ে আমিরুল মোমেনিনের সাথে পরামর্শ করতেন। বস্তুতঃ এহেন পরামর্শ দ্বারা আমিরুল মোমেনিনের চিন্তা ও বিচারের বিশুদ্ধতা বা তাঁর সুগভীর প্রজ্ঞা জনসমক্ষে তুলে ধরা তাদের উদ্দেশ্য ছিল না। বরং তারা দেখাতে চেয়েছিল যে, আমিরুল মোমেনিনের সাথে তাদের কোন মতদ্বৈধতা নেই। খেলাফত বিষয়ে আলীকে বঞ্চিত করার ঘটনা ধামাচাপা দিয়ে জনগণের দৃষ্টি সরিয়ে রাখাই ছিল তাদের মূল উদ্দেশ্য। অপরপক্ষে কেউ কোন উপদেশ বা পরামর্শ চাইলে সে বিষয়ে নীতিগতভাবে সৎপরামর্শ দেয়া থেকে আমিরুল মোমেনিন বিরত থাকতে পারেন না কারণ তিনি সুন্নাহ্‌র ধারক ও বাহক। খেলাফত বিষয়ে তার মতামত ও রোষ তিনি খোৎবাতুল শিকশিকিয়াতে জোর গলায় ব্যক্ত করেছেন। তাঁর এহেন ক্রোধের অর্থ এ নয় যে, ইসলামের সামগ্রিক সমস্যায় তিনি যথাযথ পরামর্শ দ্বারা সঠিক পথ প্রদর্শন করবেন না। আমিরুল মোমেনিনের চারিত্রিক মহত্ব এত উঁচু-মাপের ছিল যে, তাঁর শত্রুও পরামর্শ চাইলে তিনি ক্ষতিকর কোন পরামর্শ দিতে পারতেন না। এ কারণে মতদ্বৈধতা থাকা সত্ত্বেও এবং নীতিগত বিরোধ থাকা সত্ত্বেও খলিফাগণ তাঁর কাছে পরামর্শ চাইতেন। এটা তার চারিত্রিক মহত্ব, চিন্তা ও বিচারের বিশুদ্ধতা এবং গভীর প্রজ্ঞার প্রতি আলোকপাত করে। এটা রাসুলের (সঃ) চরিত্রের একটা মহৎ বৈশিষ্ট্য ছিল। মোশরেকগণ তাঁকে নবী বলে স্বীকার করেনি, তাঁর বাণী গ্রহণ করেনি কিন্তু তাঁকে আল-আমীন বলে কখনো অস্বীকার করেনি। যখন তাদের সাথে রাসুলের (সঃ) দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ চলছিলো তখনও তারা তাদের ধনসম্পদ তাঁর কাছে গচ্ছিত রাখতো। এতে তারা এতটুকুও ভয় পেত না যে, তাদের সম্পদ আত্মসাৎ হয়ে যেতে পারে। একইভাবে খলিফাদের সাথে যতই মতবিরোধ থাকুক না কেন জাতীয় ও উম্মাহ্‌র স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এবং ইসলামের অভিভাবক হিসাবে ইসলামের কল্যাণ ও সমৃদ্ধির জন্য শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে অপ্রভাবিত পরামর্শ দান করে আমিরুল মোমেনিন আমিরুল মোমেনিন রাসুলের সুন্নাহ্ পালন করেছেন। প্যালেষ্টাইন যুদ্ধে উমর নিজে যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়ার বিষয়ে আমিরুল মোমেনিনের পরামর্শ চাইলে তিনি ইসলামের বৃহত্তর স্বার্থে তাকে যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে বারণ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "যদি তোমাকে যুদ্ধক্ষেত্র হতে পিছু হটতে হয় তবে সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হয়ে এখানে সেখানে বিশৃঙ্খলভাবে ছড়িয়ে পড়বে। এতে মুসলিমগণ সাহস হারিয়ে ফেলবে। তুমি কেন্দ্রে থাকলে তারা বিশৃঙ্খল না হয়ে তোমার কাছে ফিরে আসবে। অধিকন্তু কোন বিপর্যয় ঘটলে তুমি কেন্দ্রে থেকে আরো সৈন্য সংগ্রহ করে তাদের সাহায্যার্থে প্রেরণ করতে পারবে।"

★★★★★

খোৎবা-১৩৪

খলিফা উসমানের সাথে একদিন আমিরুল মোমেনিনের কিছু কথা কাটাকাটি হয়। মুঘিরাহ ইবনে আখনাস[১] সেখানে উপস্থিত ছিল। সে উসমানকে বললো যে, সে আমিরুল মোমেনিনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এতে আমিরুল মোমেনিন মুঘিরাকে বললেনঃ

ওহে অভিশপ্ত ব্যক্তি ও অপুত্রকের পুত্র, তোমার সাজারায় না আছে শিকড় আর না আছে শাখা। তুমি আমার বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেবে? আল্লাহ্‌র কসম, তুমি যাকে সমর্থন করবে আল্লাহ্ তাকে জয়যুক্ত করবে না এবং তুমি যাদেরকে উত্তেজিত করে তুলবে তারা আমার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারবে না। আমাদের দু'জনের মধ্য হতে সরে পড়। আল্লাহ্ তোমার উদ্দেশ্য সফল হতে দেবে না। অতঃপর যা খুশী কর। আমার প্রতি দয়াদ্র হলেও আল্লাহ্ তোমাকে ক্ষমা করবেন না ।

১। মুঘিরা ইবনে আখনাস ছিল উসমানের চাচাতো ভাই ও অন্যতম চাটুকার। মুঘিরার ভাই আবুল হাকাম অহুদের যুদ্ধে আমিরুল মোমেনিনের হাতে নিহত হয়েছিল। সেই কারণে সে সর্বদা আমিরুল মোমেনিনের বিরোধিতা করতো। তার পিতা আখনাস মক্কা বিজয়ের পর ইসলাম গ্রহণ করেছিল কিন্তু তার মন হতে বিরোধিতা ও মোনাফেকী কখনো বিদূরিত হয়নি। এজন্যই আমিরুল মোমেনিন তাকে অভিশপ্ত বলেছেন এবং মুঘিরার মত পুত্র যার আছে তাকে অপুত্রক বলা যায়।

(আমিরুল মোমেনিন মুঘিরাকে অপুত্রকের পুত্র বলেছেন। তাঁর উক্তিটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কারো পুত্রকে পুত্রহীনের (অপুত্রকের) পুত্র বলার মধ্যে গভীর অর্থ বহন করে। এ ধরনের একটি বাক্য কুরআনেও রয়েছে। সুরা কাউছারে বলা হয়েছে, "আপনাকে যারা অবজ্ঞা করে তারা অপুত্রক।" অথচ রাসুলকে (সঃ) যারা অবজ্ঞা করেছিল তাদের প্রায় সকলেরই পুত্রসন্তান ছিল, যেমন-আবু সুফিয়ান, আবু জেহেল, আবু লাহাব, আখনস ইত্যাদি। উক্তিটির ভাবার্থ হলো অবজ্ঞাকারীগণ কখনো নূরে মুহাম্মদীর মহান পুত্র লাভ করবে না—বাংলা অনুবাদক)।

★★★★★

খোৎবা-১৩৫

নিজের ইচ্ছার অকৃত্রিমতা সম্পর্কে

কোন চিন্তা-ভাবনা[১] ছাড়া তোমরা আমার বায়াত গ্রহণ করনি এবং আমার ও তোমাদের অবস্থান এক নয়। আল্লাহ্‌র জন্য আমি তোমাদেরকে চাই কিন্তু তোমরা নিজেদের স্বার্থে আমাকে চাও। হে জনমন্ডলী, সকল কামনা-বাসনার উর্দ্ধে উঠে আমাকে সমর্থন দাও। আল্লাহ্‌র কসম, আমি জালেম হতে মজলুমের প্রতিশোধ নেব এবং নাকে দড়ি বেঁধে অত্যাচারীকে সত্যের ঝরণা ধারার দিকে নিয়ে যাব যদিও সে সেদিকে যেতে অনিচ্ছুক।

১। সকিফাহ্‌র দিনে খলিফা আবু বকরের বায়াত গ্রহণ সম্পর্কে উমর ইবনে খাত্তাব যে উক্তি করেছিলেন আমিরুল মোমেনিন এখানে তৎপ্রতি ঈঙ্গিত দিয়েছেন। উমর বলেছিলেন, "আবু বকরের বায়াত গ্রহণ করা দারুণ ভুল হয়েছে; কোন চিন্তা-ভাবনা (ফালতাহ্) ছাড়াই তা করা হয়েছিল, কিন্তু এরকম ভুল কাজের কুফল থেকে আল্লাহ্ আমাদেরকে রক্ষা করেছেন। সুতরাং যদি কেউ এরকম ভুল করতে চায় তবে তোমরা তাকে কতল করো।" (বুখারী[১০২], ৮ম খন্ড, পৃঃ ২১১; হিশাম[১৬৯], ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ৩০৮-৩০৯; তাবারী[৭৫], ১ম খন্ড, পৃঃ ১৮২২; আছীর[২], ২য় খন্ড, পৃঃ ৩২৭; কাছীর[৩৯], ৫ম খন্ড, পৃঃ ২৪৫-২৪৬; হাম্বল[১৬০], ১ম খন্ড, পৃঃ ৫৫; হাদীদ [১৫২], ২য় খন্ড, পৃঃ ২৩)।

★★★★★

খোৎবা-১৩৬
তালহা ও জুবায়র সম্পর্কে

আল্লাহ্র কসম, তারা মর্যাদাহানিকর কোন কিছু আমার মধ্যে দেখতে পায়নি এবং তারা আমার ও তাদের মধ্যে ন্যায় বিচার করেনি। নিশ্চয়ই তারা এখন এমন এক অধিকার দাবি করছে যা তারা পরিত্যাগ করেছে এবং এমন এক রক্তের বদলা দাবি করছে যে রক্তপাত তারা নিজেরাই ঘটিয়েছে। যদি আমি এ কাজে তাদের সাথে জড়িত থাকতাম তা হলে তো এতে তাদেরও অংশ রয়েছে। আর যদি তারা আমাকে ছাড়া তা করে থাকে তাহলে রক্তের বদলার দাবি তাদের বিরুদ্ধে হওয়া উচিত। তাদের বিচারের প্রথম পদক্ষেপেই তাদের রায় নিজেদের বিরুদ্ধে যাবে। ঘটনার বিস্তারিত তথ্য ও সমাচার আমার জানা আছে।

আমি কখনো কোন বিষয়ে তালগোল পাকাইনি এবং তালগোল পাকানো কোন বিষয় আমার কাছে উপস্থাপিত হয়নি (অর্থাৎ আমি কোন কিছু নিয়ে বক্র চিন্তা করিনি এবং কুট কৌশলও আঁটিনি)। নিশ্চয়ই, এ দলটি বিদ্রোহী যাদের মধ্যে রয়েছে নিকটজন (জুবায়র), বৃশ্চিকের বিষ (আয়শা) এবং সংশয় যা সত্যকে ঢেকে দিয়েছে। কিন্তু বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে পড়েছে এবং অন্যায়ের ভিত কেঁপে উঠেছে। এর জিহবা ফেতনার প্রচারণা বন্ধ করেছে। আল্লাহ্র কসম, আমি তাদের জন্য একটা জলাধার তৈরী করবো যা হতে আমি একাই জল নিতে পারবো। না তারা এর পানি পান করতে সমর্থ হবে, আর না তারা অন্য স্থান হতে পান করতে পারবে।

'বায়াত' 'বায়াত' বলে তোমরা আমার দিকে এমনভাবে দৌড়ে এসেছো যেন উষ্ট্রি উহার নব প্রসবিত শাবকের দিকে দৌড়ে যায়। আমি আমার হাত গুটিয়ে রেখেছিলাম কিন্তু তোমরা তা তোমাদের দিকে টেনে নিয়েছো। আমি আমার হাত আবার টেনে গুটিয়ে নিয়েছিলাম কিন্তু তোমরা তা আবার জোরে আকর্ষণ করেছো। হায় আল্লাহ্, এরা দু'জন আমার অধিকার উপেক্ষা করেছে এবং আমার প্রতি অবিচার করলো। তারা উভয়ে বায়াত ভঙ্গ করেছে এবং জনগণকে আমার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলছে। তারা যা বন্ধন করছে তুমি তা মুক্ত কর; তারা যে মিথ্যার জাল বুনছে তুমি তা দুর্বল কর। যে উদ্দেশ্য নিয়ে তারা কাজ করছে উহার কুফল তাদেরকে দেখিয়ে দাও। যুদ্ধের পূর্বে আমি তাদেরকে অনুরোধ করেছিলাম তাদের বায়াতে দৃঢ় থাকতে এবং আমি তাদের প্রতি কোমল আচরণ করেছিলাম। কিন্তু তারা এ আশীর্বাদ খাট করে দেখলো এবং নিরাপত্তার পথ অবলম্বন করতে অস্বীকৃতি জানালো।

★★★★★

খোৎবা-১৩৭
ভবিষ্যৎ ঘটনা প্রবাহ সম্পর্কে

তিনি আকাঙ্খাকে হেদায়েতের পথের দিকে পরিচালিত করবেন যখন মানুষ হেদায়েতকে আকঙ্খার দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। তিনি মানুষের উদ্দেশ্যকে কুরআনমুখী করবেন যখন মানুষ কুরআনকে উদ্দেশ্য সাধনের হাতিয়ার করবে। মঙ্গলের এ আদেশদাতার[১] পূর্বেই পারিপার্শ্বিক অবস্থা সঙ্গীন হয়ে পড়বে। যুদ্ধ উহার দাঁত বের করে সুমিষ্ট দুধ পূর্ণ বাঁট অথচ তিক্ত অগ্রভাগসহ তোমাদের মধ্যে প্রচন্ডভাবে বিরাজ করবে। সাবধান, এটা হবে আগামীকাল এবং সেদিন সহসাই আসবে এমন কিছু নিয়ে যা তোমরা জান না। সেই ক্ষমতাবান মানুষটি, যিনি

এ জনতা থেকে হবেন না, পূর্ববর্তী সকলকে তাদের কুকর্মের জন্য বিচার করবেন এবং পৃথিবী ইহার অভ্যন্তরীণ সম্পদরাজী তার জন্য খুলে দিয়ে চাবি তার হাতে তুলে দেবে। তিনি তোমাদেরকে কেবলমাত্র আচরণ পদ্ধতি দেখিয়ে দেবেন এবং জীবনবিহীন কুরআন ও সুন্নাহ্কে পুনরুজ্জীবিত করবেন।

আমি যেন দেখতে পাচ্ছি সেই পাপের আদেশদাতাকে[২]। সে সিরিয়ায় চিৎকার দিচ্ছে এবং কুফার উপকণ্ঠ পর্যন্ত তার ঝান্ডা প্রসারিত। উষ্ট্রির কামড়ের মত সে ইহার দিকে বেঁকে আছে। সে নরমুন্ডে জমিন ঢেকে দিয়েছে। তার মুখগহবর প্রশস্থ এবং জমিনে তার পদচারণা ভারী হয়ে পড়েছে। বিস্তৃত এলাকা নিয়ে তার অগ্রযাত্রা এবং তার আক্রমণ তীব্র।

আল্লাহ্র কসম, সে তোমাদেরকে সারা পৃথিবীতে বিচ্ছিন্ন করে দেবে এবং চোখের সুর্মার মত তোমরা মুষ্টিমেয় ক'জন অবশিষ্ট থাকবে। আরব জাতির বোধশক্তি ফিরে না আসা পর্যন্ত এ অবস্থা চলবে। কাজেই তোমরা প্রতিষ্ঠিত পথ অনুসরণ কর, পাপ পরিষ্কার কর এবং নবুয়তের চিরস্থায়ী মহৎগুণাবলী অনুসরণ কর। মনে রেখো, শয়তান তার পথকে সহজ করেছে যাতে তোমরা পদে পদে তাকে অনুসরণ করতে পার।

১। আমিরুল মোমেনিনের এই ভবিষ্যদ্বাণী দ্বাদশ ইমাম আবুল কাসেম মুহাম্মদ ইবনে হাসান আল মাহদীর আগমণ সম্পর্কে।

২। ইহা আবদাল মালিক ইবনে মারওয়ানের প্রতি ইঙ্গিত। মারওয়ানের মৃত্যুর পর সে সিরিয়ার ক্ষমতা দখল করেছিল। অতঃপর সে মুসআব ইবনে জুবায়রের সাথে যুদ্ধে মুখতার ইবনে আবি উবায়েদ আছ-ছাকাফিকে হত্যা করে ইরাকের দিকে অগ্রসর হয়েছিল। সে কুফার উপকণ্ঠে দায়রুল যাছালিক-এর নিকটবর্তী মাসকিন নামক স্থানে মুসআবের বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করেছিল। মুসআবকে পরাজিত করে সে কুফায় প্রবেশ করে কুফাবাসীদের বায়াত আদায় করেছিলো। তৎপর সে আব্দুল্লাহ্ ইবনে জুবায়রের সাথে যুদ্ধ করার জন্য হাজ্জাজ ইবনে ইউছুফ আছ-ছাকাফিকে মক্কায় প্রেরণ করেছিল। ফলে হাজ্জাজ মক্কা অবরোধ করে কাবা ঘরে পাথর নিক্ষেপ করেছিল। সে হাজার হাজার নিরীহ লোককে হত্যা করে পানির মত রক্তের স্রোত বইয়ে দিয়েছিল। সে ইবনে জুবায়রকে হত্যা করে তার লাশ ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলিয়ে রেখেছিল। সে এমন নৃশংসতা সংঘটিত করেছিল যে, কেউ তার কথা মনে করলেই থরথর করে কেঁপে উঠতো।

★★★★★

খোৎবা-১৩৮

খলিফা উমরের মৃত্যুর পর আলোচনা কমিটি উপলক্ষে

মানুষকে সত্যের দিকে আহ্বানে, আত্মীয়তার বন্ধনের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে ও উদারতা প্রদর্শনে আমার চেয়ে অগ্রণী আর কেউ নেই। সুতরাং আমার কথা শুনো এবং আমি যা বলি তা মনে রেখো। এমনও হতে পারে, তোমরা দেখবে আগামীকাল এ ব্যাপারে খোলা তরবারি হাতে নেয়া হবে এবং তোমরা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবে। অবস্থা এতোদূর যাবে যে, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ গোমরাহ লোকদের নেতা হবে এবং অজ্ঞ লোকদের অনুসারী হবে।

★★★★★

খোৎবা-১৩৯

গীবত[1] সম্পর্কে

যারা পাপ করে না এবং পাপ হতে যাদেরকে নিরাপত্তা দেয়া হয়েছে তাদের উচিত পাপী ও অবাধ্যগণের প্রতি করুণা প্রকাশ করা। কৃতজ্ঞতাই তাদের সবচেয়ে বড় পরিতৃপ্তি হওয়া উচিত এবং ইহা তাদেরকে অন্যের দোষ অন্বেষণ করা হতে রক্ষা করবে। গীবতকারীর অবস্থা কী, যে তার ভাইকে দোষারোপ করে এবং তার দোষ খুঁজে বেড়ায়? সে কি ভুলে গেছে যে, আল্লাহ্ তার পাপ গোপন করে রেখেছেন যা তার ভাইয়ের পাপ হতেও গুরুতর? যেখানে সে নিজেই পাপে লিপ্ত সেখানে সে কি করে অন্যকে পাপের জন্য নিন্দা করবে? যদি সে অন্যের সমান পাপ নাও করে থাকে তবুও সে যে বড় ধরনের পাপ করেনি উহার নিশ্চয়তা কোথায়? আল্লাহ্‌র কসম, যদি সে কবিরা গুনাহ্ না করে সগিরা গুনাহ্‌ও করে থাকে তবুও অন্যের গুনাহ্ চর্চা করে সে কবিরা গুনাহ্‌ই করলো।

হে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ, তোমরা অন্যের পাপ-চর্চায় তাড়াহুড়া করো না, কারণ সে হয়তো ইহার জন্য ক্ষমা পেয়ে যেতে পারে এবং তোমার নিজের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পাপের জন্যও নিজেকে নিরাপদ মনে করো না, কারণ তোমাকে হয়ত উহার জন্যই শাস্তি ভোগ করতে হবে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে কেউ অন্যের দোষ জানতে পারলে তা প্রকাশ করা উচিত নয় কারণ তার চিন্তা করা উচিত সে নিজের দোষ কতটুকুই বা জানে। তদুপরি তার উচিত শুকরিয়া আদায় করা এ জন্য যে তাকে এহেন পাপ হতে রক্ষা করা হয়েছে।

১। অন্যের ছিদ্রান্বেষণ ও গীবত এমনভাবে অভ্যাসে পরিণত হয়েছে যে, মানুষ ইহার কুফল বেমালুম ভুলে আছে। বর্তমানে অবস্থা এমন হয়েছে যে, বড় ও ছোট, সম্ভ্রান্ত ও নীচ কেউ এ দোষ থেকে মুক্ত নয়। মিম্বারের উচ্চ মর্যাদা বা মসজিদের পবিত্রতা কোন কিছুই এ দোষ নিবৃত্ত করতে পারছে না। কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব একত্রে বসলেই তাদের আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়ায় অতিরঞ্জিত করে অন্যের দোষ বের করে কুৎসা রটানো। ছিদ্রান্বেষী লোকের শত দোষ থাকলেও সে নিজের দোষ প্রকাশ হোক এটা কখনো চায় না, কিন্তু সে অন্যের দোষত্রুটি খুঁজে বেড়ায় এবং রসিয়ে তা প্রকাশ করে। নিজের জন্য যেমন অন্যের জন্যও ঠিক তদ্রূপ অনুভূতি থাকা উচিত। অন্যের অনুভূতিতে আঘাত করে কারো কিছু করা উচিত নয়। এ প্রবাদ সকলেরই মেনে চলা উচিত যে, "তুমি অন্যের কাছ্ থেকে যা আশা কর না, অন্যের প্রতিও তুমি তা করো না।"

গীবতের সংজ্ঞা হলো, কথায় হোক আর কর্মেই হোক মানহানী করার উদ্দেশ্যে কারো দোষ প্রকাশ করা যা তার দুঃখের কারণ হয়ে দাড়ায়। কেউ কেউ বলেন, গীবত হবে উহাই যাহা মিথ্যামিথ্যি ও সত্যের বিপরীতভাবে প্রকাশ করা হয়। তাদের মতে যা দেখেছে বা শুনেছে তা অবিকল প্রকাশ করা গীবত নয়। তারা বলে তারা তো যা দেখেছে বা শুনেছে উহাই প্রকাশ করেছে—এতে গীবত হবে কেন? বস্তুতঃ এহেন বাস্তব ঘটনা বর্ণনা করার নামই হলো গীবত কারণ ঘটনাটি যদি তথ্যগতভাবে মিথ্যা হতো তবে তা হতো কাউকে মিথ্যা দোষারোপ করা—গীবত নয়। বর্ণিত আছে যে, রাসুল (সঃ) বলেছেন ঃ

> *"তোমরা কি জান গীবত কী?" লোকেরা বললো, "আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলই ভাল জানেন।" তৎপর তিনি বললেন, "তোমরা তোমাদের ভাইদের সম্বন্ধে কিছু বললে যদি সে ব্যথিত হয়—উহাই গীবত।" কেউ একজন বললো, "যদি আমি তার সম্বন্ধে যা বলি তা প্রকৃত পক্ষেই সত্য হয় তাহলে কি হবে?" রাসুল (সঃ) জবাব দিলেন, "গীবত হবে তখনই যখন তথ্যগতভাবে উহা সত্য হয়। অন্যথায় উহা মিথ্যা অপবাদ হবে।"*

গীবত নানা কারণে করা হয়ে থাকে, সে কারণে মানুষ কখনো জ্ঞাতসারে আবার কখনো অজ্ঞাতসারে গীবতে জড়িয়ে পড়ে। আবু হামিদ আল-গাজ্জালী তার গ্রন্থ 'এহ্‌ইয়া উলুমদ্দীন"-এ গীবতের বিস্তারিত কারণ উল্লেখ করেছেন। উহার প্রধান প্রধানগুলি নিম্নরূপ ঃ

১. কারো সম্বন্ধে কৌতুক করা বা কারো মানহানি করার জন্য;
২. মানুষকে হাসাবার জন্য এবং নিজের হাস্য-রসিকতা ও প্রাণ-চাঞ্চল্য প্রকাশ করার জন্য;
৩. ক্রোধের বশবর্তী হয়ে নিজের অনুভূতি প্রকাশের জন্য;
৪. অন্যের বদনাম করে নিজের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করার জন্য;
৫. কোন বিষয়ে নিজের সংশ্লিষ্টতা ঢেকে রাখার জন্য, যেমন-কোন অপরাধ অন্যের ওপর চাপিয়ে দেয়া;
৬. কোন দলের সাথে জড়িত থেকেও উহা ধামাচাপা দেয়ার জন্য;
৭. কোন লোককে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য যার কাছ থেকে নিজের দোষ প্রকাশিত হয়ে পড়ার ভয় থাকে;
৮. প্রতিযোগীকে পরাভূত করার জন্য;
৯. ক্ষমতাসীন কারো কাছে নিজের স্থান করে নেয়ার জন্য;
১০. অমুক ব্যক্তি অমুক পাপে লিপ্ত হয়েছে— এরূপ কথা বলে দুঃখ প্রকাশ করা জন্য;
১১. বিস্ময় প্রকাশ করার জন্য, যেমন- অমুক ব্যক্তি এ কাজ করেছে;
১২. কোন কাজে ক্রোধ প্রকাশ করে কাজটি যে করেছে তার নাম প্রকাশ করার জন্য। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে ছিদ্রান্বেষণ বা সমালোচনা গীবত হয় না, যেমন-

(১) অত্যাচার হতে নিষ্কৃতি পাবার জন্য মজলুম জালেমের বিরুদ্ধে নালিশ করলে গীবত হয় না, যেমন— আল্লাহ্ বলেন,

> *মন্দ কথার প্রচারণা আল্লাহ্ পছন্দ করেন না; তবে যার ওপর জুলুম করা হয়েছে তার কথা স্বতন্ত্র; (কুরআন-৪ঃ১৪৮)*

(২) অন্যকে উপদেশ দেয়ার জন্য কারো দোষ উদাহরণ হিসাবে প্রকাশ করলে গীবত হয় না;
(৩) দ্বীনের অনুশাসন বলবৎ করার জন্য কারো বিশেষ দোষ প্রকাশ করলে গীবত হয় না;
(৪) কোন মুসলিমকে ক্ষতির হাত হতে রক্ষা করার জন্য আত্মসাৎ ও অসাধুতার কথা প্রকাশ করলে গীবত হয় না;
(৫) এমন কারো কাছে দোষ প্রকাশ করা যিনি বাধা দিয়ে দোষ করা হতে রক্ষা করতে পারবেন;
(৬) হাদীসের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য হাদীস বর্ণনাকারীর সমালোচনা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি প্রকাশ করলে গীবত হয় না;
(৭) কারো শারীরিক সীমাবদ্ধতা (যেমন-বোবা, অন্ধ, কালা, হাতবিহীন) ব্যক্তিত্ব ব্যাখ্যার জন্য প্রকাশ করা গীবত নয়:
(৮) চিকিৎসকের নিকট চিকিৎসার জন্য দোষ প্রকাশ করা গীবত নয়;
(৯) কেউ মিথ্যা বংশ পরিচয় দিলে তার সঠিক বংশ পরিচয় প্রকাশ করলে গীবত হয় না;
(১০) কারো জীবন, সম্পদ ও মর্যাদা রক্ষা করার জন্য তার দোষ প্রকাশ করলে গীবত হয় না;
(১১) যদি দু'ব্যক্তি কারো দোষ আলোচনা করে যা উভয়েরই জানা আছে তবে তা গীবত হয় না;
(১২) যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে কুকর্ম করে তার আচরণ প্রকাশ করলে গীবত হয় না; যেমন হাদীসে আছে; "যে লজ্জার ঘোমটা ছিঁড়ে ফেলেছে তার বেলায় গীবত নেই।"

★★★★★

খোৎবা-১৪০

উৎপথগামীর ওপর বিশ্বাস স্থাপনের বিরুদ্ধে

হে লোকসকল, যদি কেউ জানে যে, তার ভাই ইমানে অটল এবং সত্য ও সঠিক পথে দৃঢ় তবে তার সম্বন্ধে মানুষ কিছু বললে তৎপ্রতি কান না দেয়া উচিত। তীরন্দাজের তীরও অনেক সময় লক্ষ্যভেদ করে না। একইভাবে মানুষের কথাও অসংলগ্ন হতে পারে। কথার ভুল নৈতিকতা বিনষ্ট করে। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা ও সর্ববিষয়ে সাক্ষী। সত্য ও মিথ্যার মধ্যে চার আঙ্গুল ব্যতীত কিছু নেই।

কেউ একজন এ কথার অর্থ জিজ্ঞেস করলে আমিরুল মোমেনিন তাঁর হাতের চারটি আঙ্গুল একত্রিত করে কান ও চোখের মধ্যবর্তী স্থানে রেখে বললেন, এটাই মিথ্যা যখন তোমরা বল "আমি এরূপ শুনেছি" এবং উহাই সত্য যখন তোমরা বল "আমি দেখেছি।"

★★★★★

খোৎবা-১৪১

অপাত্রে উদারতা দেখানোর বিরুদ্ধে

কেউ যদি এমন লোকের প্রতি উদারতা দেখায় যার উহা পাবার কোন যোগ্যতা বা দাবী নেই তবে সে শুধু ইতর-মন্দ লোকদের প্রশংসা পায়। অবশ্য যতক্ষণ সে দিয়ে যাবে অজ্ঞলোকেরা ততক্ষণ তাকে উদার ও দানশীল বলবে যদিও সে আল্লাহ্র কাজে কৃপণ।

সুতরাং আল্লাহ্ যাদেরকে বিত্তবান করেছেন তাদের উচিত আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি, বন্দী ও দুর্দশাগ্রস্থদের প্রতি, দরিদ্র ও ঋণগ্রস্থদের প্রতি, অন্যের অধিকার পরিপূরণের জন্য এবং পুরস্কার দিবসের আশায় যারা অভাব-অনটনে আছে তাদের প্রতি উদারতার হাত প্রসারিত করা। নিশ্চয়ই, এসব গুণাবলী মানুষকে ইহকালে শ্রেষ্ঠত্ব ও পরকালে আল্লাহ্র বিশেষ অনুকম্পার অধিকারী করে।

★★★★★

খোৎবা-১৪২

বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা

সাবধান, তোমাদের পদতলের মাটি আর মাথার ওপরের আকাশ উহাদের সংরক্ষকের (আল্লাহ্) প্রতি অত্যন্ত অনুগত। উহারা তোমাদের প্রতি দয়া পরবশ হয়ে বা তোমাদেরকে খাতির করে বা তোমাদের কোন কর্মে খুশী হয়ে উহাদের আশীর্বাদ তোমাদের অনুকূলে প্রেরণ করে না। তোমাদের ওপর আর্শীবাদ প্রেরণের জন্য নির্দেশিত হলেই উহারা তা পালন করে এবং তোমাদের মঙ্গল করার জন্য আদিষ্ট হলেই উহারা তোমাদের মঙ্গল করে।

নিশ্চয়ই, আল্লাহ্ তাঁর বান্দাগণকে তাদের মন্দ আমলের জন্য পরীক্ষার্থে ফল-ফলাদি কমিয়ে দেন, আশীর্বাদ সমূহের বর্ষণ আটকিয়ে রাখেন এবং মঙ্গলের স্রোতধারা ক্ষীণ করে দেন যাতে করে যে ব্যক্তি তওবা করতে চায় সে যেন তওবা করতে পারে, যে ব্যক্তি পাপের পথ হতে ফিরে আসতে চায় সে যেন ফিরে আসতে পারে, যে ব্যক্তি

ভুলে যাওয়া নেয়ামতের কথা স্মরণ করতে চায় সে যেন স্মরণ করতে পারে এবং যে ব্যক্তি মন্দ কাজ হতে বিরত থাকতে চায় সে যেন বিরত থাকতে পারে। মহিমান্বিত আল্লাহ্ ক্ষমা প্রার্থনাকে জীবিকা প্রদান ও রহমত বর্ষণের উপায় হিসাবে চিহ্নিত করে বলেন ঃ

তোমরা তোমাদের রবের ক্ষমা প্রার্থনা কর; নিশ্চয়ই তিনি মহাক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত করবেন এবং তোমাদেরকে সমৃদ্ধ করবেন সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে। তিনি তোমাদের জন্য স্থাপন করবেন উদ্যান ও প্রবাহিত করবেন নদী-নালা (কুরআন-৭১ঃ১০-১২)

যে ব্যক্তি তওবা করে পাপ পরিত্যাগ করে এবং মৃত্যুর পূর্বে সৎকর্মের প্রতি তাড়াহুড়া করে তার ওপর আল্লাহ্র রহমত বর্ষিত হয়।

হে আল্লাহ্, আমরা পর্দা ও ঘর হতে বের হয়ে তোমার কাছে এসেছি যখন পশুকূল ও শিশুকূল কাঁদছে, তোমার দয়া প্রার্থনা করছে, তোমার নেয়ামত হতে দানের আশা পোষণ করছে এবং তোমার শাস্তির ভয়ে কম্পবান হয়ে আছে। হে আল্লাহ্, তোমার বৃষ্টি হতে আমাদেরকে পানি পান করতে দাও এবং আমাদেরকে হতাশ করো না, বছরের পর বছর খরায় আমাদেরকে মেরো না এবং আমাদের মাঝে মূর্খগণ যে অপরাধ করেছে উহার জন্য আমাদেরকে শাস্তি দিও না, হে রহমানুর রহিম।

হে আল্লাহ্, আমরা তোমার কাছে যে ফরিয়াদ নিয়ে এসেছি তা তোমার কাছে গুপ্ত নয়। আমরা সাতটি বিপদে নিপতিত হয়েছি। খরাজনিত দুর্ভিক্ষ আমাদেরকে তাড়না করেছে, যন্ত্রণাদায়ক অভাব-অনটন আমাদেরকে সহায়-সম্বলহীন করে দিয়েছে এবং বিপজ্জনক ফেতনা অবিরামভাবে আমাদের ওপর আপতিত হয়েছে। হে আল্লাহ্, আমরা তোমার কাছে মিনতি করি তুমি আমাদেরকে নিরাশ করো না যাতে আমাদেরকে চোখ নীচু করে ফিরে যেতে হয়। আমাদের পাপের জন্য রোষভরে আমাদের নিবেদন প্রত্যাখ্যান করো না এবং আমাদের আমল অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করো না।

হে আল্লাহ্, তোমার দয়া, তোমার রহমত, তোমার নেয়ামত আমাদের ওপর বর্ষণ কর এবং আমাদেরকে আনন্দদায়ক পানীয় দাও, আমাদের তৃষ্ণা নিবারণ কর, সবুজ শাক-সবজি গজিয়ে দাও যা জ্বলে গেছে এবং আমাদের তৃণভূমিকে সজীব করে দাও। আমাদের বৃক্ষের সজীবতা দান করে ফলে ফুলে ভরে দাও। আমাদের সমতল ভূমিকে ভিজিয়ে দাও, নদীকে প্রবাহমান করে দাও যাতে বৃক্ষের পাতা গজায় এবং দ্রব্যমূল্য নেমে আসে। নিশ্চয়ই তুমি যা খুশী তা-ই করতে পার।

★★★★★

খোৎবা-১৪৩

পয়গম্বর প্রেরণ সম্পর্কে

মহিমান্বিত আল্লাহ্ পয়গম্বরগণকে মনোনীত করে তাঁর প্রত্যাদেশ দ্বারা তাদেরকে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করেছিলেন। তিনি পয়গম্বরগণকে তাঁর বান্দাদের কাছে প্রেরণ করেছিলেন যেন তারা কোন ওজর পেশ করতে না পারে যে, তাদের কোন পথপ্রদর্শক (হেদায়েতকারী) ছিল না। পয়গম্বরগণ মানুষকে সত্যবাদিতার সাথে সৎ ও সঠিক পথের দিকে আমন্ত্রণ করেছিলেন। মনে রেখো, মহান আল্লাহ্ তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে সবিশেষ পরিজ্ঞাত। এমন নয় যে, তিনি

তাদের গোপন বিষয় ও অন্তরের অনুভূতি সম্পর্কে অবহিত নহেন। তবুও তাদের মধ্যে ভাল ও মন্দ আলাদা করার জন্য তিনি তাদের বিচার করেন যাতে ভাল কাজের জন্য পুরস্কার ও মন্দ কাজের জন্য শাস্তি প্রদান করা যায়।

আহ্লুল বাইতের মর্যাদা সম্পর্কে

কোথায় সেসব লোক যারা মিথ্যামিথ্যি ও অন্যায়ভাবে দাবী করেছিল যে, তারা আমাদের চেয়ে গভীর জ্ঞানের অধিকারী। অথচ আল্লাহ্ আমাদেরকে মর্যাদায় উন্নত করেছেন আর তাদেরকে হীন করেছেন; আমাদেরকে প্রজ্ঞা দান করেছেন আর তাদেরকে উহা হতে বঞ্চিত করেছেন; আমাদেরকে জ্ঞানের নগর-দুর্গে প্রবেশাধিকার দিয়েছেন আর তাদেরকে সেই নগরী হতে বাইরে রেখেছেন। আমাদের কাছেই হেদায়েতের প্রত্যাশী হতে হবে এবং গোমরাহীর অন্ধত্ব পরিবর্তন করে উজ্জ্বল আলো পেতে হলে আমাদের কাছেই আসতে হবে। নিশ্চয়ই, ইমামগণ (আধ্যাত্মিক নেতা) কুরাইশ বংশের হাশিমী শাখা হতেই হবে। এ নেতৃত্ব অন্য কারো জন্য প্রযোজ্য নয় এবং অন্য কেউ এ কাজের যোগ্যও নহে।

আহ্লুল বাইতের বিরোধীদের সম্পর্কে

তারা দুনিয়াকে আঁকড়ে ধরেছে এবং পরকালকে পরিত্যাগ করেছে। তারা স্বচ্ছ পানি পরিত্যাগ করে ঘোলাটে অপবিত্র পানি পান করেছে। তাদের মধ্য হতে নিষ্ঠুরটিকে[১] আমি দেখতে পাচ্ছি, যে অনবরত হারাম (বেআইনী) কাজে লিপ্ত থাকবে, অন্যায়কারীদের সাথে সখ্যতা করবে এবং তার চুল না পাকা পর্যন্ত এ সখ্যতা টিকে থাকবে এবং তার স্বভাব অন্যায়কারীদের রঙে রঞ্জিত হবে। সে (অন্যায়ের পথে) এগিয়ে যাবে প্রবলবেগে প্রবাহিত স্রোত হতে নির্গত ফেনার মত যা কখনো খেয়াল করে না যে, কাকে ডুবিয়ে দিচ্ছে অথবা খড়ের আগুনের মত যা বুঝতে পারে না কি পুড়িয়ে দিচ্ছে।

কোথায় সেসব মন যা হেদায়েতের প্রদীপ থেকে আলোর সন্ধান করে? কোথায় সেসব চোখ যা তাকওয়ার মিনারের দিকে তাকায়? কোথায় সেসব হৃদয় যা আল্লাহ্র প্রতি উৎসর্গীকৃত ও তাঁর আনুগত্যের প্রতি অনুরক্ত? তারা সকলে অসার জাগতিক বিষয়ের চারিদিকে ভিড় জমিয়েছে এবং তারা হারাম বিষয় নিয়ে বিবাদে লিপ্ত। তাদের জন্য জান্নাত ও জাহান্নামের ব্যানার উত্তোলিত হয়েছে কিন্তু তারা তাদের কর্মকান্ড দ্বারা জান্নাত হতে মুখ ফিরিয়ে জাহান্নামের দিকে এগিয়ে গেছে। আল্লাহ্ তাদের আহবান করেছিলেন কিন্তু তারা উহা অপছন্দ করে দৌড়ে পালিয়েছে। যখন শয়তান তাদের আহবান করলো তখন তারা সাড়া দিয়ে পাগলপ্রায় হয়ে দৌড়ে এগিয়ে গেল।

১। এখানে আবদাল মালেক ইবনে মারওয়ানের প্রতি ঈঙ্গিত করা হয়েছে। সে তার অফিসার হাজ্জাজ ইবনে ইউছুফের দ্বারা চরম নৃশংসতা সংঘটিত করিয়েছিল।

★★★★★

খোৎবা-১৪৪

এ দুনিয়া সম্পর্কে

হে লোকসকল, তোমরা এ পৃথিবীতে মৃত্যু-তীরের লক্ষ্যবস্তু। তোমাদের পানীয় বস্তুর প্রতিটি ঢোক ও খাদ্যের প্রতিটি গ্রাস শ্বাসরুদ্ধকর। ইহাতে তোমরা একটি সুবিধা পরিত্যাগ করা ব্যতীত অন্য একটি সুবিধা পাও না এবং তোমাদের জীবন থেকে একটি দিন ঝরে না গেলে তোমরা বয়সে একটি দিনও এগিয়ে যেতে পার না। পূর্বে যা ছিল উহা কমে যাওয়া ছাড়া তোমাদের খাদ্যে আর কিছুই যোগ হচ্ছে না। একটি চিহ্ন অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত

অন্যটি উপস্থিত হয় না। নতুন পুরাতন না হওয়া পর্যন্ত নতুন কিছু হয় না। শস্য কর্তন না করা পর্যন্ত নতুন শস্য জন্মায় না। সেই সব শিকড় চলে গেছে আমরা যাদের শাখা। মূল চলে গেলে শাখা কি করে থাকে?

বিদা'ত সম্পর্কে

একটি সুন্নাহ্কে বর্জন না করা পর্যন্ত একটি বিদা'ত প্রচলিত হয় না। সুতরাং বিদা'ত হতে দূরে থাক এবং প্রশস্ত পথে চলো। নিশ্চয়ই, পুরাতন পরীক্ষিত পথ সর্বোত্তম এবং বিদা'ত মন্দ।

★★★★★

খোৎবা-১৪৫

পারস্যের যুদ্ধে[১] স্বয়ং অংশগ্রহণ করার বিষয়ে খলিফা উমর পরামর্শ চাইলে আমিরুল মোমেনিন এ খোৎবা দিয়েছিলেন

সৈন্যসংখ্যা কম বা বেশীর ওপর জয়-পরাজয় নির্ভর করে না। ইহা আল্লাহ্র দ্বীন যা তিনি অন্য সকল ধর্মের ওপরে স্থান দিয়েছেন এবং তাঁর সৈন্যবাহিনীকে সুসংহত ও বর্ধিত করে বর্তমান অবস্থায় উন্নিত করেছেন। আমরা আল্লাহ্র নিকট হতে প্রতিশ্রুতি প্রাপ্ত। তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি পরিপূর্ণ করবেন এবং তাঁর বাহিনীকে সমর্থন করবেন।

একজন সরকার প্রধানের অবস্থান হলো তসবীর সূতার মত যা তসবীর দানাগুলোকে সুসংহত ও একত্রিত রাখে। যদি সূতা ছিঁড়ে যায় তবে দানাগুলো বিচ্ছিন্ন হয়ে হারিয়ে যায়। আরবরা সংখ্যায় কম হলেও ইসলামের কারণে আজ অনেক বড় এবং ঐক্যের কারণে শক্তিশালী। তোমাকে তাদের কেন্দ্রীয় শলাকার মত থাকতে হবে ও তাদের দ্বারা চাক্কি (সরকার) ঘুরাতে হবে এবং তাদের মূল হিসাবে কাজ করতে হবে। কাজেই যুদ্ধে যাওয়া তোমার পক্ষে ঠিক হবে না কারণ শত্রুপক্ষ রাজধানী শূন্য অবস্থায় পেলে তা দখল করার জন্য সবদিক থেকে আক্রমণ করবে। তারা তখন এগিয়ে যাওয়া সৈন্যের মোকাবেলা করা অপেক্ষা পেছনে ফেলে যাওয়া অরক্ষিত স্থানসমূহ দখল করা অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ মনে করবে।

পারস্যবাসীরা কাল তোমাকে দেখেই বলবে, "এ লোকটি আরবের প্রধান। যদি আমরা তাকে খতম করতে পারি তবেই আমরা শান্তিতে থাকতে পারবো।" তাদের এহেন চিন্তা তোমাকে শেষ করার উচ্চাকাঙ্খা বাড়িয়ে দেবে এবং তুমি তাদের লক্ষ্যবস্তু হয়ে যাবে। তুমি বল যে, তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বেরিয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্ তাদের পরিকল্পনা তোমার চেয়ে বেশী নস্যাৎ করে দিতে পারেন এবং তিনি যা নস্যাৎ করেন তা রক্ষা করার ক্ষমতা কারো নেই। তাদের সৈন্যসংখ্যার আধিক্য সম্বন্ধে তোমার অভিমত ঠিক নয়। অতীতে আমরা সৈন্যসংখ্যার আধিক্য চিন্তা করে যুদ্ধ করিনি। আমরা আল্লাহ্র সহায়তা ও সমর্থন সম্বল করে যুদ্ধ করেছি[১]।

১। কাদিসিয়্যা বা নাহাওয়ান্দের যুদ্ধে ব্যক্তিগতভাবে অংশগ্রহণের জন্য কেউ কেউ খলিফা উমরকে পরামর্শ দিয়েছিল। তিনি বিষয়টি নিয়ে আমিরুল মোমেনিনের সাথে পরামর্শ করা যথার্থ মনে করলেন। ব্যক্তিগতভাবে যুদ্ধে না যাবার জন্য তিনি খলিফাকে উপদেশ দিলেন। অন্যরা যুক্তি দেখিয়ে বলেছিল যে, রাসুল (সঃ) শুধু সৈন্য পাঠিয়ে যুদ্ধ করেননি। তিনি নিজের আত্মীয়-স্বজন নিয়ে নিজেও যুদ্ধে যেতেন। আমিরুল মোমেনিনের পরামর্শ চাওয়ার মূল কারণ হলো, যদি তিনি যুদ্ধে যেতে বারণ করেন তবে খলিফা তাঁর পরামর্শের ওজর জনগণের সম্মুখে উপস্থাপন করতে পারবেন এবং তিনি যুদ্ধে যেতে পরামর্শ দিলে অন্য কোন কারণ দেখিয়ে খলিফা বিরত থাকতেন। যাহোক, আমিরুল মোমেনিন ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ্র

বৃহত্তর স্বার্থে খলিফাকে যুদ্ধে যেতে বারণ করেছিলেন। আমিরুল মোমেনিনের দৃষ্টিতে যুদ্ধক্ষেত্রে খলিফা উমরের উপস্থিতি ইসলাম ও উম্মাহ্‌র তেমন কোন উপকারে আসবে না; বরং রাজধানীতে তাঁর উপস্থিতি মুসলিমগণকে বিচ্ছিন্ন হওয়া থেকে রক্ষা করবে।

"সরকার প্রধান জাতির অক্ষরেখা যাকে কেন্দ্র করে সরকার চলে"- আমিরুল মোমেনিনের এ উক্তি স্বতঃসিদ্ধ। ইহা সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নীতিগত বিষয়। ইহা কোন ব্যক্তি বিশেষের ব্যক্তিত্বের বিশেষত্ব নয়। শাসক মুসলিম হোক আর অমুসলিমই হোক, ন্যায়পরায়ণ হোক আর স্বৈরাচারীই হোক, ধার্মিক হোক আর পাপাচারীই হোক— রাষ্ট্রের প্রশাসনের জন্য তার উপস্থিতি অত্যাবশ্যকীয়। ভাল হোক আর মন্দ হোক রাষ্ট্রের জন্য একজন শাসকের কোন বিকল্প নেই (খোৎবা-৪০)।

আমিরুল মোমেনিন তাঁর উপদেশে যেসব কথা বলেছেন তা শুধু শাসক হিসাবে উমরের প্রতি প্রযোজ্য। ইহা খলিফা উমরের বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্ব নির্দেশক নয়। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, রাষ্ট্রক্ষমতা খলিফা উমরের হাতে ছিল। এই রাষ্ট্রক্ষমতা ন্যায় কি অন্যায়ভাবে গ্রহণ করা হয়েছে তা অন্য বিষয়। কর্তৃত্ব বা প্রশাসনের ক্ষমতা যেখানে থাকবে জনগণের ভাল-মন্দ কর্মকান্ডও সেখানে কেন্দ্রীভূত থাকে। ফলে জনগণ ক্ষমতাসীনদের কাছেই ঘোরে। সেই কারণে আমিরুল মোমেনিন বলেছিলেন যে, যদি উমর বেরিয়ে পড়ে তবে বিপুল সংখ্যক লোক যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে চলে যাবে এবং তাতে নগরীর পর নগরী অরক্ষিত হয়ে পড়লে শত্রু অতি সহজে অন্য পথে এসে তা দখল করে নেবে। আবার, যুদ্ধক্ষেত্রে যদি সরকার প্রধানের মৃত্যু ঘটে তবে সৈন্যগণ স্বাভাবিকভাবেই বিশৃঙ্খল হয়ে পড়বে কারণ সেনাবাহিনীর ভিত্তি হলো সরকার প্রধান। ভিত্ নড়ে গেলে দেয়াল দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। "আমলুল আরব' (আরবের মূল প্রধান) শব্দটি কোন বিশেষত্ব প্রকাশক শব্দ হিসাবে আমিরুল মোমেনিন ব্যবহার করেননি। তিনি ইহা 'রাষ্ট্রপ্রধান' হিসাবে ব্যবহার করেছেন। নিশ্চয়ই, রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে খলিফা উমর আরবের প্রধান ছিলেন।

(১৩৩ নং খোৎবায়ও দেখা যায় আমিরুল মোমেনিন খলিফা উমরকে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে না যাবার বিষয়ে উপদেশ দিয়েছিলেন। ১১৮ নং খোৎবায় তাঁর নিজের যুদ্ধে না যাবার বিষয়ে যুক্তি প্রদর্শন করেছিলেন। এগুলি তাঁর রাষ্ট্র প্রশাসন ও যুদ্ধকৌশল সংক্রান্ত গভীর প্রজ্ঞার পরিচয় বহন করে। মূলতঃ শুধু খলিফা উমর নয় অন্য খলিফাগণও কখনো বিচারের কঠিন সমস্যায়, কখনো প্রশাসনের সমস্যায়, কখনো দ্বীন বিষয়ক সমস্যায়, কখনো যুদ্ধ বিষয়ক সমস্যায় পতিত হলেই আমিরুল মোমেনিনের কাছে উপদেশ চাইতেন। তিনি নির্দ্বিধায় তাদেরকে সৎ ও সঠিক পরামর্শ দিতেন। তাঁর এহেন পরামর্শের সূত্র ধরে অনেকেই মত প্রকাশ করেন যে, খেলাফত বিষয়ে আমিরুল মোমেনিনের কোন মতদ্বৈধতা বা কোন দুঃখ ছিল না। তিনি অন্যদের খেলাফতের সাথে ঐকমত্য পোষণ করতেন।

তাদের এ ধারণা সঠিক নয়। অন্য খলিফাত্রয়ের তুলনায় আমিরুল মোমেনিন অনেক বেশী জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান ছিলেন। না হয় তিনি "জ্ঞান-নগরীর দুয়ার" হবেন কেন? এবং সে দুয়ারে সকলকেই যেতে হয়। অপরপক্ষে, শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে যে কেউ পরামর্শ চায় তাকে সৎ ও সঠিক পরামর্শ দেয়া তাঁর সহজাত নীতি। ইহা রাসুলের আখলাক। ঘোরতর শত্রু আবু জেহেল, আবু সুফিয়ানদের কাছেও রাসুল (সঃ) 'আল-আমীন' ছিলেন। এটা বিশ্বস্ততার প্রতীক। কাজেই বিরোধী লোককেও সৎপরামর্শ দেয়া বিশ্বস্ততার প্রতীক। খোৎবা নং ১১৮, ১৩৩ ও ১৪৫ একত্রে পড়লে দেখা যাবে আমিরুল মোমেনিন নিজের জন্য যে মত পোষণ করতেন উমরের বেলায়ও একই মত পোষণ করেছেন। এসব পরামর্শের সূত্র ধরে খেলাফত বিষয়ে আমিরুল মোমেনিনের ঐকমত্য সাব্যস্ত করা সঠিক হবে না। এ বিষয়ে বিশদ গবেষণার অবকাশ রয়েছে। এ গবেষণার জন্য ঘাদিরে খুমে ১৪ই জিলহজ্জে (বিদায় হজ্জের পর) রাসুলের ভাষণ, তৎপরবর্তী একাশি দিনের ঘটনা প্রবাহ, রাসুল (সঃ) মৃত্যু শয্যায় থাকাকালের ঘটনাবলী, সকিফা-ই সাঈদার ঘটনাবলী, রাসুলের মরদেহ দাফনের ঘটনাবলী, আবু বকর কর্তৃক ফদক রাষ্ট্রায়ত্বকরণসহ অন্যান্য ঘটনাবলী, উমরের সময়ের ঘটনাবলী, ফাতিমার মৃত্যুর ঘটনাবলী, খলিফা নির্বাচনের পদ্ধতিসমূহ ইত্যাদি নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে সমসাময়িক ইতিহাসের আলোকে পর্যালোচনা করতে হবে— বাংলা অনুবাদক।

★★★★★

খোৎবা-১৪৬

রাসুল প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং কুরআনের বিরোধিতা করার সময়কার অবস্থা সম্পর্কে

আল্লাহ্ মুহাম্মদকে (সঃ) সত্য সহকারে প্রেরণ করেছিলেন যাতে তিনি মানুষকে মূর্তি পূজা হতে আল্লাহ্র ইবাদত এবং শয়তানের আনুগত্য হতে আল্লাহ্র আনুগত্যের দিকে ফিরিয়ে আনতে পারেন। তিনি তাকে কুরআনসহ প্রেরণ করেছেন যা তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন এবং মজবুত করেছিলেন যাতে মানুষ তাদের রবকে জানতে পারে যেহেতু তারা তাঁর সম্বন্ধে অজ্ঞ; যাতে তারা তাঁকে স্বীকার করে যেহেতু তারা তাঁকে অস্বীকার করেছিলো; যাতে তারা তাঁকে গ্রহণ করে যেহেতু তারা তাঁকে পরিত্যাগ করেছিলো। মহিমান্বিত আল্লাহ্ কুরআনের প্রত্যাদেশের মাধ্যমে তাঁর কুদরত তাদেরকে দেখিয়ে দিলেন এবং তাঁর শাস্তির ভয় তাদেরকে বুঝিয়ে দিলেন (যদিও তারা তাঁকে দেখতে পায়নি)। যাদেরকে ইহকালে ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন তাদেরকে কিভাবে তাঁর শাস্তির মাধ্যমে ধ্বংস করেছিলেন এবং যা তিনি বিনষ্ট করতে চেয়েছিলেন তা কিভাবে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছিলেন— এসব কিছু কুরআনের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।

ভবিষ্যৎ সম্পর্কে

নিশ্চয়ই, আমার পরে এমন এক সময় আসবে যখন ন্যায়পরায়ণতার চেয়ে অধিক গোপনীয় আর কিছু হবে না, অন্যায়ের চেয়ে প্রকাশ্য আর কিছু হবে না এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের (সঃ) বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণার চেয়ে অধিক প্রবাহমান আর কিছু হবে না। এ সময়কার মানুষের কাছে কুরআন অপেক্ষা মূল্যহীন আর কিছু হবে না; তারা আবৃত্তির কারণে কুরআন আবৃত্তি করবে। কুরআনকে ইহার অবস্থান হতে সরিয়ে ফেলা অপেক্ষা মূল্যবান কাজ তাদের কাছে আর কিছু থাকবে না (অর্থাৎ কুরআনের প্রকৃত দর্শন হতে দূরে সরে যাওয়া)। শহরগুলোতে ধার্মিকতা অপেক্ষা বেশী ঘৃণিত আর কিছু হবে না এবং পাপ অপেক্ষা বেশী গ্রহণীয় আর কিছু থাকবে না।

(সেই সময়) কুরআন যাদের কাছে থাকবে তারা উহা ছুড়ে ফেলে দেবে এবং হাফিজগণ উহা ভুলে যাবে। এসময়ে কুরআন ও ইহার লোক (অনুসারী) বিতাড়িত ও নির্বাসিত হবে। তারা একই পথে থেকে একে অপরের সঙ্গী হবে কিন্তু কেউ তাদেরকে আশ্রয় দেবে না। ফলে এ সময় কুরআন ও ইহার লোক (অনুসারী) জনগণের মধ্য হতে দূরে সরে যাবে কারণ গোমরাহী কখনো হেদায়েতের সাথে থাকতে পারে না। মানুষ বিভিন্ন মতাবলম্বী দলে বিভক্ত হয়ে দলবদ্ধ হবে এবং তারা সমাজবদ্ধতা হতে কেটে পড়বে। মনে হবে যেন তারা কুরআনের নেতা হয়ে গেছে, কুরআন তাদের নেতা নয়। কুরআনের নাম ছাড়া আর কোন কিছুই তাদের কাছে থাকবে না এবং তারা কুরআনের বর্ণমালা ছাড়া আর কিছুই জানবে না। তৎপূর্বে তারা ধার্মিকগণের ওপর নানা প্রকার বিপদ আপতিত করবে, আল্লাহ্ সম্পর্কে ধার্মিকগণের সত্য অভিমতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করবে এবং ধার্মিকতার জন্য পাপের শাস্তি আরোপ করবে।

যারা তোমাদের পূর্বে মৃত্যুবরণ করেছে, অশেষ কামনা-বাসনা ও মৃত্যুকে ভুলে থাকার কারণে তাদের সকল ওজর প্রত্যাখ্যাত হয়েছে, তওবা অগ্রাহ্য হয়েছে এবং তারা শাস্তি ভোগ করে প্রতিদান পাচ্ছে।

আহলুল বাইত সম্পর্কে

হে লোকসকল, যারা আল্লাহ্র কাছে উপদেশ চায় তারা হেদায়েতপ্রাপ্ত হয় এবং যারা তাঁর বাণীকে দেশনা হিসাবে গ্রহণ করে তারা সিরাতুল মুস্তাকীমে প্রতিষ্ঠিত হয়, কারণ আল্লাহ্র প্রেমিকগণ নিরাপত্তার মধ্যে থাকে এবং তাঁর বিরোধীরা ভীতির মধ্যে থাকে। যারা আল্লাহ্র মহত্ব সম্বন্ধে জানে তারা নিজেকে অতিক্ষুদ্র মনে করে। যারা

আল্লাহ্র মহত্ব ও কুদরত সম্বন্ধে জানে তাদের মহত্ব আল্লাহ্র কাছে আত্মসমর্পণের মধ্যেই প্রকাশ পায়। তোমরা সত্য হতে এমনভাবে দূরে সরে যেয়ো না যেমন করে সুস্থলোক কুষ্ঠ রোগীর কাছ থেকে সরে পড়ে।

জেনে রাখো, তোমরা কখনো হেদায়েতের দিশা পাবে না যদি তোমরা হেদায়েত পরিত্যাগকারীকে না চেন। তোমরা কখনো কুরআনের অঙ্গীকার মেনে চলতে পারবে না যদি তোমরা উহা ভঙ্গকারীদের না চেন। তোমরা কখনো কুরআনের সঙ্গে লেগে থাকতে পারবে না যদি তোমরা উহা বর্জনকারীকে না চেন। এসব বিষয় তাদের কাছে অনুসন্ধান কর যারা এগুলোর স্বত্বাধিকারী, কারণ তারা হলো জ্ঞানের জীবন-ঝর্ণা ও অজ্ঞতার মৃত্যু। তারা সেসব লোক যাদের আদেশ তোমাদের কাছে তাদের জ্ঞানের পরিধি প্রকাশ করবে, তাদের নীরবতা বাকশক্তি ব্যক্ত করবে এবং তাদের জাহেরী অবস্থা তাদের বাতেনের বহিঃপ্রকাশ করবে। তারা কখনো দ্বীনের বিরোধিতা করে না এবং দ্বীন সম্বন্ধে একে অপরের সাথে মতদ্বৈধতা করে না। তাদের মধ্যে দ্বীন হলো একটা সত্যবাদী সাক্ষী ও নীরব বক্তা।

★★★★★

খোৎবা-১৪৭

তালহা, জুবায়র ও বসরার জনগণ সম্পর্কে

এ দু'জনের প্রত্যেকেই (তালহা ও জুবায়র) নিজের জন্য খেলাফতের আকাঙ্খা পোষণ করে এবং দু'জনেই জনগণকে নিজের দিকে টেনে নেয়ার চেষ্টা করছে। তারা আল্লাহ্র নিকট প্রবেশ প্রাপ্তির কোন পথ অবলম্বন করেনি এবং তাঁর দিকে অগ্রসর হবার কোন উপায়ও করেনি। তারা উভয়ে একে অপরের প্রতি ঘৃণা পোষণ করে। সহসাই এ বিষয়ের ওপর তাদের পরানো ঘোমটা খুলে যাবে। আল্লাহ্র কসম, যদি তারা তাদের লক্ষ্য অর্জন করতে পারে তবে একজন অপরজনকে হত্যা করবে এবং একজন অপরজনকে সদলে নির্মূল করবে। বিদ্রোহী দল গজিয়ে উঠেছে। কোথায় সদ্গুণ সন্ধানীগণ; কারণ সৎপথ নির্ধারণ করা হয়েছে এবং তাদেরকে এ সংবাদও দেয়া হয়েছে। প্রতিটি গোমরাহীর জন্য কারণ রয়েছে এবং প্রতিটি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের জন্য মিথ্যা ওজর রয়েছে। আল্লাহ্র কসম, আমি সেই ব্যক্তির মত হব না, যে শোকাকুল মানুষের কণ্ঠস্বর শোনে, মৃত্যুর সংবাদ বহনকারীর কথা শোনে এবং শোককারীর সাক্ষাত করে অথচ উহা হতে শিক্ষা গ্রহণ করে না।

★★★★★

খোৎবা-১৪৮

মৃত্যুর পূর্বক্ষণে প্রদত্ত ভাষণ

হে লোকসকল, প্রত্যেক ব্যক্তিই উহার সাক্ষাত পাবে যা সে দৌড়ে পালিয়ে এড়িয়ে যেতে চায় (অর্থাৎ প্রত্যেকের মৃত্যু ঘটবে)। মৃত্যু এমন এক স্থান যেদিকে জীবন তাড়িত হচ্ছে। ইহার হাত থেকে দৌড়ে পালানো মানেই ইহাকে আঁকড়ে ধরা। এ বিষয়ের গুপ্ত রহস্য অনুসন্ধান করার জন্য কতই না দিন আমি কাটিয়েছি, কিন্তু আল্লাহ্ এ রহস্য উদঘাটনের অনুমতি দেননি। আহা! এটা হলো একটা সংরক্ষিত গুপ্ত জ্ঞান। তোমাদের প্রতি আমার শেষ অছিয়ত হলো আল্লাহ্ সম্বন্ধে, তাঁর কোন অংশীদার আছে বলে বিশ্বাস করো না এবং মুহাম্মদ (সঃ) সম্বন্ধে আমার অছিয়ত হলো তাঁর সুন্নাহ্র প্রতি কোনরূপ অশ্রদ্ধা ও অবহেলা প্রদর্শন করো না। এ দু'টি স্তম্ভকে ধরে রেখো এবং এ দু'টি বাতি জ্বালিয়ে দিও। এ দু'টো থেকে আলাদা না হওয়া পর্যন্ত কোন পাপ তোমাদেরকে স্পর্শ

করতে পারবে না। তোমাদের প্রত্যেককেই তার নিজের (পাপের) বোঝা বহন করতে হবে। অজ্ঞদের জন্য এ বোঝা হালকা করা হয়েছে। আল্লাহ্ পরম দয়ালু। ইমান সহজ সরল। রাসুল (সঃ) জ্ঞানের আধার। গতকাল আমি তোমাদের সংগে ছিলাম। আজ আমি তোমাদের জন্য শিক্ষা গ্রহণের বিষয়বস্তু হয়েছি এবং আগামীকাল আমি তোমাদেরকে পরিত্যাগ করবো। আল্লাহ্ আমাকে ও তোমাদেরকে ক্ষমা করুন।

এ পিচ্ছিল স্থানে যদি পা সুদৃঢ় রাখতে পার তবেই উত্তম। কিন্তু পা যদি ফসকে যায় তবেই সর্বনাশ। এ পদস্খলনের কারণ হলো শাখার ছায়া তলে না থাকা বাতাসের প্রবাহ ও মেঘের শামিয়ানার স্তর অনেক উর্দ্ধ-আকাশে যার চিহ্নমাত্রও এ পৃথিবীতে দেখা যায় না। আমি তোমাদের প্রতিবেশী ছিলাম। আমার দেহ কিছুদিন তোমাদের সঙ্গী ছিল এবং সহসাই তোমরা আমার চলমান দেহকে স্থির, নিশ্চল ও শূন্য অবস্থায় দেখতে পাবে। এ ভাষণের পর আমি নিশ্চুপ হয়ে যাব। সুতরাং আমার নিশ্চুপতা, মুদ্রিত চক্ষু, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নিশ্চলতা ও দেহের অসাড়তা তোমাদের জন্য উপদেশ যোগাবে কারণ যারা ইহা হতে শিক্ষা গ্রহণ করে তাদের জন্য ইহার চেয়ে বড় কোন উপদেশ আর হতে পারে না। আমি তোমাদের কাছ থেকে প্রস্থান করে এমন একজনের কাছে যাচ্ছি যাঁর সাক্ষাতের জন্য আমি অধিক আগ্রহী। আগামীকাল তোমরা আমার দিনগুলোর (জীবনের কর্মকান্ডের) প্রতি লক্ষ্য করে দেখবে তখন আমার বাতেন তোমাদের কাছে প্রকাশ পাবে। আমার স্থান শূন্য হলে এবং সেখানে অন্য কেউ অধিষ্ঠিত হবার পর তোমরা আমাকে বুঝতে পারবে।

★★★★★

খোৎবা-১৪৯

ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী ও মোনাফিকদের কর্মকান্ড প্রসঙ্গে

তারা ডানে ও বামে তাকিয়ে প্রবলবেগে পাপের পথে প্রবেশ করে এবং হেদায়েতের পথ পরিত্যাগ করে। যা কিছু ঘটতে যাচ্ছে বা ঘটার অপেক্ষায় আছে উহার জন্য তোমরা তাড়াহুড়া করো না এবং আগামীকাল তোমাদের জন্য যা কিছু বয়ে নিয়ে আসবে তা বিলম্বিত করার আশা পোষণ করো না। কারণ, অনেক লোক কোন কিছু দ্রুত ঘটার জন্য তাড়াহুড়া করে, কিন্তু যখন উহা ঘটে যায় তখন তারা বলে ইহা না ঘটা তো ভাল ছিল। আজকের দিন আগামীকাল প্রত্যুষের কত নিকটবর্তী। হে লোকসকল, প্রতিটি প্রতিশ্রুত ঘটনা ঘটার সময় এটাই এবং প্রতিটি বিষয়ের উপস্থিতির সময় এটাই যা তোমরা জান না। আমাদের মধ্য হতে যে কেউ সেই দিনগুলোতে থাকবে সে প্রদীপ্ত প্রদীপ নিয়ে জনগণের মধ্যে চলাফেরা করবে এবং ধার্মিকগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে যাতে গেরো খুলে যায়, ঝগড়া-বিবাদ ভুলে যায়, (অন্যায়ে) ঐক্যবদ্ধগণ বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং (ন্যায়ের পথে) বিচ্ছিন্নগণ ঐক্যবদ্ধ হয়। সে জনগণ হতে গোপন থাকবে। সদম্ভ অনুসন্ধানকারীগণ তাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে পশ্চাদ্ধাবন করেও তার পদচিহ্ন দেখতে পাবে না। তৎপর একদল লোক এমনভাবে (জ্ঞানে) সুতীক্ষ্ণ হয়ে ওঠবে যেমন করে কামার তরবারি ধারালো করে। তাদের দৃষ্টিশক্তি প্রত্যাদেশ দ্বারা সমুজ্জ্বল হবে, (সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম) ব্যাখ্যা তাদের কানে ধ্বনিত হবে এবং সকাল-সন্ধ্যায় তাদেরকে জ্ঞানের পানীয় দেয়া হবে।

তাদের সময় দীর্ঘায়িত হয়েছিল এজন্য যে, তারা যেন অমর্যাদাকর অবস্থা পরিসমাপ্ত করতে পারে এবং তারা যেরূপ উত্থান-পতন বা ভাগ্য বিপর্যয়ের উপযুক্ত তদ্রুপ সময় যেন উপস্থিত হয়; এ সময়ের শেষ ভাগে একদল

লোক ফেতনা-ফ্যাসাদের দিকে ঝুঁকে পড়ে যুদ্ধের জন্য অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিল। ধার্মিকগণ আল্লাহর প্রতি কোন দায়-দায়িত্ব দেখায়নি কিন্তু নীরবে সবকিছু সহ্য করেছিল এবং নিজেদেরকে সত্যবাদিতার প্রতি ঐকান্তিকভাবে নিয়োজিত রাখার জন্য উল্লসিত হয়ে পড়েনি। পরিণামে পূর্ব নির্ধারণ অনুসারে পরীক্ষার সময় শেষ হয়ে গেল। অতঃপর তারা তাদের মতামত অন্যদের কাছে প্রচার করলো এবং তাদের নেতার আদেশানুযায়ী আল্লাহর নৈকট্য অনুসন্ধান করলো।

যখন আল্লাহ্ রাসুলকে (সঃ) নিজের কাছে নিয়ে গেলেন তখন একদল লোক তাদের পুরানো পথে ফিরে গিয়েছিলো। গোমরাহীর পথ তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছিলো এবং তারা গোপন চক্রান্তকারীদের প্রতারণাপূর্ণ কথায় বিশ্বাস স্থাপন করেছিলো। তারা আত্মীয়-স্বজন অপেক্ষা অন্যদের প্রতি অধিক গুরুত্ব দিয়েছিল এবং যাদেরকে ভালবাসার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছিল সেসব জ্ঞাতিকে পরিত্যাগ করেছিল। তারা ইমারতকে উহার শক্তিশালী ভিত্তি হতে সরিয়ে নিয়ে অনুপযুক্ত স্থানে স্থাপন করেছিল। তারা সকল ত্রুটি-বিচ্যুতির উৎসমূল এবং তারা ছিল অন্ধকারে দরজা হাতড়ানোওয়ালা। তারা প্রচন্ড বিস্ময়ে এদিক সেদিক ঘুরাঘুরি করতেছিলো এবং ফেরাউনের লোকদের মত মদমত্ত হয়েছিলো। তারা দুনিয়ার দিকে ঝুঁকে পড়েছিল এবং ইহার ওপর নির্ভর করতেছিলো। তারা ইমান হতে দূরে সরে গিয়েছিলো এবং ইমানকে সরিয়ে দিয়েছিলো।

★★★★★

খোৎবা-১৫০

জুলুম ও হারাম উপার্জন সম্পর্কে

আমি আল্লাহ্র প্রশংসা করি এবং শয়তানের প্রতারণামূলক কর্মকান্ডের শাস্তি হতে তাঁর সাহায্য ও শয়তানের দুরভিসন্ধি (ফাঁদ) ও ওতপাতা থেকে তাঁর আশ্রয় প্রার্থনা করি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর বান্দা ও রাসুল। মুহাম্মদের বৈশিষ্ট্য কারো সাথে তুলনীয় নয় এবং তাঁকে হারানোর ক্ষতি কখনো পূরণীয় নয়। জনবসতিপূর্ণ স্থানসমূহ তাঁর মাধ্যমে আলোকিত হয়েছিল। সেসব স্থান পূর্বে গোমরাহীর অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। সেসব স্থানে ছিলো সর্বগ্রাসী অজ্ঞতা ও রূঢ় আচরণ এবং মানুষ হারামকে হালাল মনে করতো, জ্ঞানীদেরকে অবমানিত করতো, পথ প্রদর্শকবিহীন অবস্থায় জীবনযাপন করতো ও অবিশ্বাসী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করতো।

হে আরবের জনগণ, তোমরা বিপর্যয়ের শিকার হবে যা সন্নিকটে রয়েছে। তোমরা সম্পদের নেশা পরিহার কর, খোশগল্পের আড্ডায় সময় নষ্ট করার বিপদকে ভয় কর, ফেতনা-ফ্যাসাদের অন্ধকার ও বক্রতায় নিজেদেরকে সুদৃঢ় ও শক্ত রাখো। যখন ফেতনার গুপ্ত প্রকৃতি উহার স্বরূপ প্রকাশ করে দেয়, তখন গোপনীয় বিষয় সর্বসমক্ষে প্রকাশিত হয়ে পড়ে এবং ইহার ঘূর্ণনের অক্ষরেখা ও কিলক শক্তি সঞ্চার করে। ইহা নগণ্য অবস্থা হতে শুরু হয়ে ভয়ঙ্কর অবস্থায় উন্নিত হয়। প্রারম্ভে ইহা কিশোরের মত হলেও ইহার আঘাত প্রস্তরাঘাতের মত বেদনাদায়ক।

অত্যাচারীগণ (পরস্পর) চুক্তির ভিত্তিতে ইহার উত্তরাধিকারিত্ব লাভ করে। তাদের প্রথম জন পরবর্তীগণের জন্য নেতা হিসাবে কাজ করে এবং পরবর্তীগণ প্রথমজনকে অনুসরণ করে। তারা ঘৃণ্য দুনিয়া নিয়ে একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করে এবং পুঁতিগন্ধময় এ শবদেহের (দুনিয়া) ওপর লাফিয়ে পড়ে। সহসাই অনুসারীগণ

নেতার সাথে চুক্তি বাতিলের ঘোষণা দেবে এবং নেতাও অনুসারীর সাথে। পারস্পরিক কারণে তাদের মধ্যে থাকবে অনৈক্য এবং একের সাথে অপরের দেখা হলে অভিশম্পাত দেবে। এরপর এমন এক ফেতনাবাজের আবির্ভাব ঘটবে যে বিনষ্ট জিনিস ধ্বংস করে দেবে। স্বাভাবিক স্পন্দনপ্রাপ্ত হৃদয় আবার কম্পিত হবে, নিরাপত্তার পর মানুষ আবার বিপথগামী হবে, কামনা-বাসনা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়ে বহুমুখী হয়ে পড়বে এবং সঠিক ধ্যান-ধারণা তালগোল পাকিয়ে ফেলবে।

এ সময়কার ফেতনার দিকে যে এগিয়ে যাবে সে ধ্বংস প্রাপ্ত হবে এবং যে ইহার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবে তাকে খতম করে দেয়া হবে। বন্য গাধা যেভাবে পালের মধ্যে কামড়া-কামড়ি করে তারাও নিজেদের মধ্যে তদ্রূপ কামড়া-কামড়ি করবে। রশির গোলাকার চক্র (সত্য ও ন্যায়) এলোমেলো হয়ে যাবে এবং কর্মকান্ডের বাহ্যিক দিকে সকলেই অন্ধ হয়ে থাকবে। এসময় জ্ঞান ও বোধশক্তিতে ভাটা পড়বে এবং জালেমগণই শুধু কথা বলার সুযোগ পাবে। এ ফেতনা ইহার হাতুড়ি দিয়ে বেদুঈনদেরকে বিচূর্ণ করে ফেলবে এবং ইহার বক্ষ দ্বারা তাদেরকে পিষে ফেলবে। ইহার গুঁড়োর মধ্যে একজন পদব্রজক ডুবে যাবে এবং ইহার পথে একজন অশ্বারোহী ধ্বংস হয়ে যাবে। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস নিয়ে ইহা আসবে এবং (দুধের পরিবর্তে) তাজা রক্ত দেবে। ইহা ইমানের মিনার ভেঙ্গে ফেলবে এবং দৃঢ় বিশ্বাসের বন্ধন চুর্ণ বিচূর্ণ করে ফেলবে। জ্ঞানীগণ ইহা হতে দৌড়ে পালিয়ে যাবে, অন্যায়কারীগণ ইহার পৃষ্ঠপোষক হবে। ইহা বজ্রের মত গর্জন করবে এবং বিজলীর মত চমকাবে। ইহা নিদারুণ বিপর্যয়ের সৃষ্টি করবে। ইহাতে আত্মীয়ের বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে এবং ইসলাম পরিত্যাক্ত হবে। যে ব্যক্তি এ অবস্থা অস্বীকার করবে সে ক্ষতিগ্রস্থ হবে এবং যে ব্যক্তি ইহা হতে পালিয়ে যায় তাকে এতে থাকতে বাধ্য করা হবে।

তাদের মধ্যে কতেক প্রতিশোধবিহীনভাবে শহীদ হবে এবং কতেক ভয়ে আতঙ্কিত হবে ও আশ্রয় প্রার্থনা করবে। তারা প্রতিশ্রুতি ও ইমানের ভান দ্বারা প্রতারিত হবে। তোমরা ফেতনা ও বিদা'তের নিশানবরদার হয়ো না। তোমরা সেপথ মেনে চলো যার ওপর উম্মাহ্র বন্ধন ও আনুগত্যের স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত। মজলুম হিসাবে তোমরা আল্লাহ্র দিকে অগ্রসর হয়ো এবং জালেম হিসাবে তাঁর দিকে অগ্রসর হয়ো না। শয়তানের পথ আর বিদ্রোহের স্থান এড়িয়ে চলো। তোমাদের পেটে হারাম খাদ্যকণা ঢুকিয়ো না কারণ তোমরা তাঁর সম্মুখীন হচ্ছো যিনি অবাধ্যতাকে হারাম করেছেন এবং আনুগত্যের পথকে তোমাদের জন্য সহজ করে দিয়েছেন।

★★★★★

খোৎবা-১৫১

আল্লাহ্র মহত্ব ও ইমাম সম্পর্কে

প্রতিষ্ঠিত প্রশংসা আল্লাহ্র, তাঁর সৃষ্টির মাধ্যমে তাঁর অস্তিত্বের প্রমাণ, তাঁর সৃষ্টির নতুনত্বের মাধ্যমে তাঁর সত্তার বহিঃপ্রকাশ এবং সৃষ্টি পারস্পরিক সাদৃশ্যের মাধ্যমে প্রমাণিত যে, তাঁর সদৃশ কোন কিছুই নেই। বোধি তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না এবং পর্দা তাঁকে আবৃত করতে পারে না, শুধুমাত্র স্রষ্টা ও সৃষ্টের ব্যবধানের কারণে সীমাবদ্ধকারী ও সীমিতের কারণে এবং ধারক ও ধারিতের কারণে।

তিনি এক কিন্তু গণনায় প্রথম দ্বারা নয়; তিনি স্রষ্টা কিন্তু কর্ম বা শ্রমের দ্বারা নয়; তিনি শ্রবণকারী কিন্তু শারীরিক অঙ্গ দ্বারা নয়; তিনি দর্শনকারী কিন্তু চোখের পাতা প্রসারণ দ্বারা নয়; তিনি সাক্ষী কিন্তু নৈকট্য দ্বারা নয়;

তিনি নিকটবর্তী কিন্তু দূরত্বের পরিমাপ দ্বারা নয়, তিনি প্রকাশ্য কিন্তু দৃষ্টিগ্রাহ্যতা দ্বারা নয়; তিনি গুপ্ত কিন্তু (দেহের) সূক্ষ্মতা দ্বারা নয়। তিনি বস্তু হতে আলাদা বৈশিষ্ট্যমন্ডিত কারণ তিনি উহাদেরকে পরাভূত করেন এবং উহাদের ওপর কুদরত প্রয়োগ করেন। অপরপক্ষে বস্তু তাঁর থেকে আলাদা উহাদের পরাজয় ও তাঁর প্রতি প্রত্যাবর্তনের কারণে।

যে তাঁর বর্ণনা দেয় সে তাঁকে সীমায়িত করে। যে তাঁকে সীমায়িত করে সে তাঁকে সংখ্যায়িত করে। যে তাঁকে সংখ্যায়িত করে সে তাঁর অবিনশ্বরতা অগ্রাহ্য করে। যে বলে "আল্লাহ্ কিরূপ" সে তাঁর বর্ণনার অন্বেষণ করে। যে বলে "আল্লাহ্ কোথায়" সে তাঁকে সীমবদ্ধতায় আনতে চায়। তিনি তখনো জ্ঞাতা যখন জানার মত কিছুই ছিল না। তিনি তখনো ধারক যখন ধারণ করার মত কিছুই ছিল না। তিনি তখনো সর্বশক্তিমান যখন পরাভূত করার মত কিছুই ছিল না।

ঈমাম (আধ্যাত্মিক নেতা) সম্পর্কে

যে জেগে ওঠার—ওঠেছে, যে আলোক উদ্দীপ্ত হবার—হয়েছে, যে হাজির হবার—হয়েছে এবং বক্রতা সোজা করা হয়েছে। আল্লাহ্ একটি জনগোষ্ঠি দ্বারা অন্য একটি জনগোষ্ঠি এবং একটি দিন দ্বারা অন্য একটি দিন প্রতিস্থাপিত করেছেন। এ পরিবর্তনের জন্য আমরা অপেক্ষা করেছিলাম যেমন করে খরা পীড়িতরা বৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করে। নিশ্চয়ই, ইমামগণ আল্লাহ্র বান্দাদের কাছে তাঁর প্রতিনিধি এবং তাঁরা আল্লাহ্কে চিনিয়ে দেন। আল্লাহ্ ও ইমামগণকে না চেনা ব্যতীত কেউ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না এবং ইমামগণ ও আল্লাহ্কে অস্বীকারকারী ব্যতীত কেউ জাহান্নামে প্রবেশ করবে না।

মহিমান্বিত আল্লাহ্ ইসলাম দ্বারা তোমাদেরকে বিশিষ্ট করেছেন এবং তোমাদেরকে ইসলামের জন্য পছন্দ করেছেন। কারণ নিরাপত্তা ও সম্মানের নাম ইসলাম। মহিমান্বিত আল্লাহ্ ইসলামের পথকে পছন্দ করছেন এবং প্রকাশ্য জ্ঞান ও গোপন প্রবচন দ্বারা ইহার ওজরসমূহ উন্মুক্ত করেছেন। ইহার বিস্ময় (কুরআন) কখনো ফুরিয়ে যাবে না এবং ইহার তাৎপর্য কখনো শেষ হবে না। এতে রয়েছে অগণিত নেয়ামত ও অন্ধকারের প্রদীপ। ন্যায় ও সত্যের দরজা কুরআন-চাবি ব্যতীত খোলা যায় না এবং অন্ধকারের গ্লানি কুরআন-প্রদীপ ব্যতীত দূর করা যায় না। আল্লাহ্ ইহার অপ্রবেশ্য বিষয় (শত্রু হতে) সংরক্ষণ করেছেন এবং ইহার চারণভূমিতে (অনুসারীগণকে) বিচরণ করার অনুমতি দিয়েছেন। ইহাতে রয়েছে (গোমরাহী রোগাক্রান্ত) রোগীর চিকিৎসা এবং মুক্তি সন্ধানীর জন্য মুক্তি।

★★★★★

খোৎবা-১৫২

অমনোযোগী ব্যক্তি সম্পর্কে

আল্লাহ্ তাকে সময় মঞ্জুর করেছিলেন। সে অবহেলাকারী ব্যক্তিদের সাথে এসে পতিত হচ্ছিলো এবং চলার কোন রাস্তা বা পথ দেখানোর ইমাম ছাড়া পাপীদের সাথে প্রত্যুষে যায়।

অবশেষে আল্লাহ্ যখন তাদের পাপের পরিণাম তাদের কাছে স্পষ্ট করবেন এবং তাদের অমনোযোগিতার পর্দা থেকে তাদেরকে বের করে আনবেন তখন তারা সেদিকে এগিয়ে যাবে যেদিক হতে পালিয়ে এসেছিল এবং যে

দিকে তারা যাচ্ছিলো সেদিক হতে পালিয়ে যাবে। যে অভাব তারা মিটিয়েছিল বা যে কামনা তারা পূর্ণ করেছিল তা হতে তারা উপকৃত হবে না।

এ অবস্থা হতে আমি তোমাদেরকে ও আমার নিজেকে সতর্ক করি। মানুষ তার নিজের থেকেই উপকৃত হতে পারে। নিশ্চয়ই, সে ব্যক্তি বুদ্ধিমান যে শোনে ও তা নিয়ে চিন্তা করে; যে দেখে ও পর্যবেক্ষণ করে; যে শিক্ষামূলক বিষয়বস্তু হতে লাভবান হয় এবং পরে সুস্পষ্ট পথে চলে। সেপথে চললে সে খাদ-খন্দকে পতিত হওয়া থেকে বেঁচে যায় ও পথভ্রষ্ট হয়ে চোরাগর্তে আপতন থেকে রক্ষা পায়। সত্যবাদিতার দিক হতে ফিরিয়ে নিয়ে যারা তাকে গোমরাহীর দিকে নিয়ে যেতে চায় সে তার কথা পরিবর্তন করে অথবা সত্যের ভয়ে তাদেরকে সহায়তা করে না।

হে শ্রোতৃমন্ডলী, তোমরা নেশাগ্রস্থতা হতে মুক্ত হও, তন্দ্রা হতে জেগে ওঠো, তোমাদের দুনিয়ামুখী তৎপরতা কমিয়ে ফেলো, উম্মি[১] নবীর মাধ্যমে যেসকল অপরিহার্য ও বাধ্যতামূলক বিষয়াদি তোমাদের কাছে এসেছে তা ভালভাবে ভেবে দেখ। তোমরা সেসব লোক হতে দূরে থেকো যারা তাঁর বিরোধিতা করে এবং যা তারা নিজেদের মনমত গ্রহণ করেছে তা ত্যাগ কর। আত্মশ্লাঘা পরিহার কর, উদ্ধত স্বভাব ত্যাগ কর এবং কবরকে স্মরণ কর, কারণ সময় তোমাদেরকে সেদিকেই এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তোমরা অন্যের সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার করবে সেরূপ ব্যবহার পাবে, তোমাদের যেমন কর্ম তেমন ফল হবে এবং আজ যা প্রেরণ করবে কাল তাই ফেরত পাবে। সুতরাং তোমাদের ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় কর এবং হিসাব-নিকাশের দিনের জন্য কিছু সৎ আমল আগেই প্রেরণ কর। ভয় কর, ভয় কর, হে শ্রোতৃমন্ডলী! আমল কর, আমল কর, হে বেখবর! কেউ তোমাদেরকে আমার মত সতর্ক করবে না।

প্রাজ্ঞ স্মারকে (কুরআন) আল্লাহ্‌র দৃঢ় সিদ্ধান্ত রয়েছে যে, যদি কেউ ইবাদতের সময় আল্লাহ্‌র অংশীদারে বিশ্বাস করে, অথবা কাউকে হত্যা করে নিজের ক্রোধ প্রশমিত করে, অথবা অন্যের আমলের সমালোচনা করে, অথবা আত্মস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য নিজের দ্বীনে বেদা'তের প্রক্ষেপ ঘটায়, অথবা দ্বিমুখী স্বভাব নিয়ে মানুষের সঙ্গে চলে, অথবা দ্বিমুখী কথা বলে মানুষের সাথে মেলামেশা করে, তবে সে যতই সচেষ্ট হোক আর আন্তরিকভাবে আমল করুক না কেন তওবা করা ব্যতীত এ দুনিয়া ত্যাগ করে আল্লাহ্‌র কাছে চলে গেলে তার আমল কোন উপকারে আসবে না। কুরআনের এ সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে আল্লাহ্ পুরস্কার অথবা শাস্তি প্রদান করেন এবং ইহার মাধ্যমে তিনি পছন্দ অথবা অপছন্দ করে থাকেন। এটা বুঝে নাও কারণ উদাহরণ ইহার সাদৃশ্যের জন্য উত্তম দেশনা।

পশু উহার পেট নিয়েই উদ্বিগ্ন। হিংস্র প্রাণী অন্যকে আক্রমণ করায় উদ্বিগ্ন। নারী অমর্যাদাকর জীবনের আভরণ ও ফেতনা[২] সৃষ্টিতে উদ্বিগ্ন। অপরপক্ষে ইমানদারগণ বিনয়ী, আল্লাহ্‌র প্রশংসাকারী ও আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত।

১। রাসুল (সঃ) সম্বন্ধে "উম্মি" শব্দটি কুরআনের সূরা আরাফের ১৫৭-১৫৮ আয়াতে (৭ঃ১৫৭-১৫৮) ব্যবহৃত হয়েছে। ইহার বিশদ ব্যাখ্যা জানার জন্য কুরআনের তফসীর দ্রষ্টব্য।

২। ইবনে আবিল হাদীদ লিখেছেন যে, জামালের যুদ্ধে বসরা অভিমুখে যাত্রাকালে এ খোৎবা প্রদান করেন। বসরার গোলযোগের মূল কারণ ছিল একজন নারীর (আয়শা) ইন্ধন। সে কারণে পশু ও হিংস্র প্রাণীর স্বভাব উল্লেখ করে নারীর মধ্যে উহা বিদ্যমান আছে বলে আমিরুল মোমেনিন অভিমত ব্যক্ত করেন এবং উহার ফলশ্রুতিই জামালের যুদ্ধ, যাতে হাজার হাজার লোক নিহত হয়েছিল।

★★★★★

খোৎবা-১৫৩

আহলুল বাইত ও তাঁদের বিরোধীদের সম্পর্কে

যে বুদ্ধিমান মনের সে তার লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রাখে। সে জানে তার রাস্তার কোন্‌টি উঁচু আর কোন্‌টি নীচু। আহ্বানকারী আহ্বান করেছে। মেষপালক তার মেষের পালকে ডাকছে। সুতরাং আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দাও এবং রাখালকে অনুসরণ কর।

বিরোধীগণ বিভ্রান্তি ও গোলযোগের সমুদ্রে প্রবেশ করেছে এবং রাসুলের (সঃ) সুন্নাহ্‌র পরিবর্তে বেদা'ত মেনে চলে। ইমানদারগণ দমে পড়েছে এবং গোমরাহ ও মিথ্যাবাদীগণ বুক ফুলিয়ে কথা বলছে। আমরা রাসুলের (সঃ) আপনজন, তাঁর সাহাবী, তাঁর সম্পদ-ভাণ্ডার এবং তাঁর সুন্নাহ্‌র দরজা। দরজা ছাড়া কোন ঘরে প্রবেশ করা যায় না। যে ব্যক্তি দরজা ছাড়া অন্য পথে প্রবেশ করে সে চোর বলেই অভিহিত।

আহলুল বাইত সম্পর্কেই কুরআনের সূক্ষ্মতা এবং তাঁরাই আল্লাহ্‌র ধন-ভান্ডার। তারা যখন কথা বলে— সত্য কথা বলে, কিন্তু যখন তাঁরা নিশ্চুপ থাকে তখন কেউ কথা বলতে পারে না যে পর্যন্ত না তাঁরা কথা বলে। অগ্রদূত (যে ব্যক্তি আরেক ব্যক্তির আগমন সূচিত করেন) তাঁর লোকজনের কাছে সঠিক প্রতিবেদন পেশ করবে, তাঁর মানসিক ক্ষিপ্রতা রেখে যাবে এবং তাঁকে পরকালের সুযোগ্য সন্তান হতে হবে, কারণ তিনি যেখান থেকে এসেছেন এবং সেখানেই প্রত্যাবর্তন করবেন।

যে ব্যক্তি হৃদয় দিয়ে দেখে ও চোখ দিয়ে আমল করে, তার আমল শুরু হয় এটা মূল্যায়নের মধ্যে যে, সে আমলটি তার পক্ষে যাবে না কি তার বিরুদ্ধে যাবে। যদি ইহা তার অনুকূলে যায় তবে সে তা করবে আর যদি তার প্রতিকূলে যায় তবে সে উহা হতে দূরে থাকবে। কারণ, কোন কিছু না জেনে আমল করা মানেই হলো পথ ছাড়া চলা। কাজেই পথ ছেড়ে চললে লক্ষ্য হতে দূরে সরে যায়—লক্ষ্য অর্জিত হয় না এবং যে ব্যক্তি জ্ঞানানুসারে আমল করে সে ঐ ব্যক্তির মত যে সুস্পষ্ট পথে চলে। কাজেই, যে দেখতে পারে তার দেখা উচিত; সে সামনে এগিয়ে যাবে নাকি ফিরে আসবে।

জেনে রাখো, যেকোন জিনিসের জাহের যেমন বাতেনও তেমন। যে জিনিসের জাহের ভাল উহার বাতেনও ভাল এবং যে জিনিসের জাহের মন্দ উহার বাতেনও মন্দ। রাসুল (সঃ) বলেছেন, "আল্লাহ্ কোন লোককে ভালবাসলেও তার আমলকে ঘৃণা করতে পারেন, আবার কোন আমলকে ভালবাসলেও লোকটিকে ঘৃণা করতে পারেন।" জেনে রাখো, প্রতিটি আমল অঙ্কুর উদ্‌গমের মত। অঙ্কুর যেমন পানি ছাড়া উদ্‌গম হতে পারে না, পানি আবার নানা রকম হয়ে থাকে। সুতরাং পানি যেখানে ভাল হয় চারাও সেখানে ভাল হয় এবং ইহার ফলও মিষ্ট হয়; যেখানে পানি খারাপ হয় সেখানে চারাও খারাপ হবে এবং ইহার ফলও তিক্ত হবে।

★★★★★

খোৎবা-১৫৪

বাদুরের আশ্চর্যজনক সৃষ্টি সম্পর্কে

প্রতিষ্ঠিত প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি এমন যে, তাঁর সম্বন্ধে জ্ঞানের বাস্তবতা বর্ণনা করা সম্ভব নহে। তাঁর মহত্ব বর্ণনা করতে গেলে মানুষের বুদ্ধি-জ্ঞান স্থবির হয়ে পড়ে। সুতরাং মানুষ তাঁর রাজ্যের সীমা-পরিসীমা নির্ধারণ করতে পারে না। তিনিই আল্লাহ্— মহাসত্য— সত্যের মহাপ্রকাশ। চোখ যা দেখে উহা অপেক্ষা তিনি অধিক

সত্য—অধিক স্বপ্রকাশ। বুদ্ধি দ্বারা তাঁকে উপলব্ধি করা যায় না কারণ তাতে সীমা নির্ধারণের প্রশ্ন আসে এবং সীমা নির্ধারণ করলেই তাঁকে গুণের আকারে আবদ্ধ করা হবে। ধারণা দিয়ে তাঁকে বুঝা যায় না কারণ তাতে তাঁর গুণাগুণ সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে এবং সেক্ষেত্রে তাঁর প্রতি গুণসম্পন্ন দৈহিক অবস্থা আরোপ করা হয়। তিনি সৃষ্টিকে অস্তিত্বে এনেছেন কিন্তু তজ্জন্য কোন নমুনার প্রয়োজন হয়নি, কোন উপদেষ্টার পরামর্শের প্রয়োজন হয়নি এবং কোন সাহায্যকারীর সাহায্যের প্রয়োজন হয়নি। তাঁর নির্দেশেই সৃষ্টি সম্পন্ন হয়েছে এবং আনুগত্যের নিদর্শন স্বরূপ আনত হয়েছে। সৃষ্টি তাঁর প্রতি সাড়া দিয়েছে এবং তাকে অস্বীকার করেনি। সৃষ্টি তাঁর আদেশ মান্য করেছে এবং তাতে দ্বিরুক্তি করেনি।

তাঁর মাহাত্ম্যপূর্ণ ও আশ্চর্যজনক সৃষ্টির গভীর তাৎপর্যের একটা উদাহরণ, যা তিনি আমাদেরকে দেখিয়েছেন তা হলো বাদুর যারা দিবালোকে নিজেদেরকে গোপন করে রাখে অথচ দিবালোক অন্যসব কিছুকে দৃশ্যমান করে, যারা রাত্রিকালে বের হয় অথচ রাত জীবন্ত সব কিছুকে গোপন করে। কিরূপে সূর্যের আলো ইহার চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দেয় এবং ইহার পথ চলার জন্য ও গন্তব্যস্থলে পৌছার জন্য সূর্যের আলোর প্রয়োজন হয় না।

আল্লাহ্ বাদুরকে সূর্যের উজ্জ্বল আলোতে চলাফেরা হতে বারিত করেছেন এবং দিনের বেলায় বাইরে যাবার পরিবর্তে গোপন স্থানে থাকতে বাধ্য করেছেন। ফলে দিনে উহারা চোখের পাতা বন্ধ করে রাখে এবং রাতকে প্রদীপ হিসাবে কাজে লাগিয়ে জীবিকার অন্বেষণে বেরিয়ে পড়ে। রাতের অন্ধকার তাদের দৃষ্টিশক্তিতে কোন বাধার সৃষ্টি করতে পারে না এবং অন্ধকারের গাঢ়ত্ব তাদের চলাফেরা বন্ধ করতে পারে না। যেমাত্র সূর্য ইহার ঘোমটা খোলে ও ভোরের সূর্য রশ্মি দেখা দেয় অমনি গিরগিটি গর্তে ঢোকে আর বাদুর চোখের ওপরে চোখের পাতা টেনে দেয় এবং রাতের অন্ধকারে যা সংগ্রহ করেছে তা দিয়ে জীবন ধারণ করে। তিনিই মহিমান্বিত যিনি রাতকে উহাদের জীবিকা সংগ্রহের জন্য দিন করেছেন এবং দিনকে উহাদের বিশ্রামের জন্য রাত করেছেন।

তিনি উহাদেরকে মাংশল পাখা দিয়েছেন যাতে উহারা প্রয়োজনে উড়ে ওপরে ওঠতে পারে। পাখাগুলো কানের অগ্রভাগের মত দেখায় যাতে কোন পালক ও হাড় নেই। অবশ্য পাখার শিরাগুলো পরিষ্কারভাবে দেখা যায়। উহাদের দু'টি পাখা আছে যা এমন পাতলা নয় যাতে উড়তে উল্টে যাবে আবার এমন পুরুও নয় যাতে ভারী অনুভূত হবে। যখন উহারা উড়ে তখন উহাদের বাচ্চা উহাদেরকে আঁকড়ে ধরে রাখে এবং উহাদের সাথে আশ্রয় নেয়, যখন উহারা নীচে নেমে আসে তখন নীচে নামে ও যখন উহারা ওপরে ওঠে তখন ওপরে ওঠে। বাচ্চগুলোর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শক্ত হয়ে নিজে নিজে উড়ে ওপরে ওঠার ও নিজের বাসস্থান চেনার পূর্ব পর্যন্ত উহাদেরকে ত্যাগ করে না। তিনিই মহিমান্বিত যিনি কারো দ্বারা পূর্বে প্রস্তুতকৃত কোন নমুনা ছাড়াই সব কিছু সৃষ্টি করেছেন।

★★★★★

খোৎবা-১৫৫

আয়শার বিদ্বেষ ও বসরার জনগণের প্রতি সতর্কবাণী

বর্তমান সময়ে যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রতি দৃঢ়ভাবে আসক্ত থাকতে পারে তার তা করা উচিত। যদি তোমরা আমাকে অনুসরণ কর তবে, ইনশাল্লাহ, নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে জান্নাতের পথে পরিচালিত করবো যদিও সে পথ দুঃখ-কষ্ট ও তিক্ততায় পরিপূর্ণ।

একজন বিশেষ মহিলা[১] সম্পর্কে বলছি, সে তার নারীসুলভ অভিমতের আওতাধীন এবং কামারের চুল্লির মত তার বুকে বিদ্বেষের আগুন জ্বলছে। সে আমার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করছে অন্যদের প্রতি সেরূপ ব্যবহার করতে বলা হলে কখনো তা করবে না। আমার দিক থেকে এরপরও সে যথার্থ সম্মান পাবে, তবে তার কুকর্মের জন্য আল্লাহ্র কাছে তাকে জবাবদিহি হতে হবে।

এ পথ আলোক বিশিষ্ট এবং উজ্জ্বলতম বাতি। আমলে সালেহার দিকে হেদায়েত ইমানের মাধ্যমে অনুসন্ধান করতে হয়; অপরপক্ষে ইমানের দিকে হেদায়েত আমলে সালেহার মাধ্যমে লাভ করতে হয়। ইমানের মাধ্যমে জ্ঞানের উন্নতি সাধন হয় এবং জ্ঞানের কারণেই মৃত্যুকে ভয় করা হয়। মৃত্যুর সাথে এ দুনিয়ার পরিসমাপ্তি ঘটে, অপরপক্ষে এ দুনিয়ায় আমলে সালেহার দ্বারা পরকাল নিরাপদ হয়। কেয়ামত হতে মানুষের কোন নিষ্কৃতি নেই। তারা এই শেষ পরিণতির দিকে নির্ধারিত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে।

তারা তাদের কবরের বিশ্রামস্থল হতে উঠে দাঁড়িয়েছে এবং চূড়ান্ত পরিণতির দিকে যাত্রা করেছে। প্রত্যেক ঘরেরই নিজস্ব লোক আছে। সেখানে তাদের কোন পরিবর্তন হয় না এবং সেখান থেকে তারা স্থানান্তরিত হয় না। ন্যায়ের প্রতিপালন ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করার জন্য আদেশ দান মহিমান্বিত আল্লাহ্র দু'টি বৈশিষ্ট্য। তারা মৃত্যুকে নিকটবর্তী করে আনতে পারে না এবং জীবনোপকরণও কমাতে পারে না।

আল্লাহ্র কিতাবকে মান্য করা তোমাদের উচিত কারণ ইহা একটা অতিশক্ত রশি, সুস্পষ্ট আলো, উপকারী চিকিৎসা, তৃষ্ণা নিবারক, মান্যকারীদের জন্য রক্ষাবর্ম এবং আসক্তগণের জন্য মুক্তি। ইহা কাউকে বক্র করে না যাতে সোজা করার প্রয়োজন হতে পারে এবং কাউকে দূষিত করে না যাতে পরিশুদ্ধ করার প্রয়োজন হতে পারে। ইহার পুনরাবৃত্তি ও কানে প্রবেশ করার পৌনঃপুনিকতা ইহাকে পুরাতন করে না। যে কেউ কিতাব অনুযায়ী কথা বলে সে সত্য বলে এবং যে কেউ কিতাব অনুযারী আমল করে সে (আমলে) অগ্রণী।

একজন লোক দাঁড়িয়ে বললো, "হে আমিরুল মোমেনিন, এ গোলযোগ সম্পর্কে আমাদেরকে বলুন এবং আপনি এ বিষয়ে রাসুলকে (সঃ) কিছু জিজ্ঞেস করেছিলেন কিনা।" আমিরুল মোমেনিন বললেন, যখন মহিমান্বিত আল্লাহ্ এ আয়াত নাজেল করলেনঃ

আলিফ-লাম-মীম; মানুষ কি মনে করে যে, "আমরা বিশ্বাস স্থাপন করিলাম" এ কথা বলার ওপরে (তাদেরকে) ছেড়ে দেয়া হবে এবং তারা পরীক্ষিত হবে না? কুরআন-২৯ঃ১-২)

তখন আমি জানতে পেরেছিলাম যে, যতদিন রাসুল (সঃ) আমাদের মাঝে থাকবেন ততদিন আমাদের ওপর কোন ফেতনা আপতিত হবে না।

সুতরাং আমি জিজ্ঞেস করলাম, "হে আল্লাহ্র রাসুল, সেই ফেতনাটা কি যা মহামহিম আল্লাহ্ আপনাকে জানিয়েছেন?" উত্তরে তিনি বললেন, "ওহে আলী, আমার লোকেরা আমার পরে ফেতনা সৃষ্টি করবে"। আমি বললাম, "হে আল্লাহ্র রাসুল, ওহুদের দিনে অনেক লোক শহীদ হয়েছিল। আমি শহীদ হইনি বলে বড় অস্বস্তি অনুভূত হয়েছিল। তখন কি আপনি আমাকে বলেন নি "খুশি হও, এরপর তুমিও শাহাদত বরণ করবে?" রাসুল (সঃ) প্রত্যুত্তরে বললেন, "হাঁ, বলেছি, কিন্তু বর্তমানে তোমার সহ্য শক্তির কি হয়েছে।" আমি বললাম, "হে আল্লাহ্র রাসুল, এটা ধৈর্যের উপলক্ষ নয়, এখন আনন্দ করা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উপলক্ষ।"

তখন তিনি বললেন, "ওহে আলী, মানুষ তাদের সম্পদের মাধ্যমে ফেতনায় পতিত হবে, বিশ্বাসের কারণে আল্লাহর প্রতি দায়িত্ব প্রদর্শন করবে, তাঁর দয়া প্রত্যাশা করবে, তাঁর রোষ হতে নিরাপদ মনে করবে এবং মিথ্যা সংশয় উথাপন করে ও গোমরাহ কামনা-বাসনা দ্বারা তাঁর হারাম বিষয়কে হালাল মনে করবে। তারা মদকে যবের পানি বলে হালাল করে নেবে, ঘুষকে দান বলে হালাল করে নেবে, সুদকে বিক্রয় বলে হালাল করে নেবে।" আমি

বললাম, "হে আল্লাহ্‌র রাসুল, সে সময়ে তাদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করা আমার উচিত হবে—আমি তাদেরকে উৎপথগামিতার দিকে ফিরে যেতে দেব—নাকি রুখে দাঁড়াবো?" তিনি বললেন, "রুখে দাঁড়াবে।"

১। একথা অস্বীকার করার কোন যো নেই যে, আমিরুল মোমেনিনের প্রতি আয়শার আচরণ সর্বদা শত্রুভাবাপন্ন ছিল। প্রায়শই তার মনের এ কালিমা তার মুখে প্রকাশ হয়ে পড়তো এবং তার ঘৃণা ও বিদ্বেষ স্পষ্ট হয়ে ওঠতো। কোন কারণে তার সামনে কেউ আমিরুল মোমেনিনের নাম নিলে তিনি কপাল কুঞ্চিত করতেন এবং আমিরুল মোমেনিনের নাম নেয়ার স্বাদ তার জিহ্বা কখনো গ্রহণ করেনি। উদাহরণ স্বরূপ, উবায়দুল্লাহ্ ইবনে আবদিল্লাহ্ ইবনে উতবাহ্ আয়শার রবাত সূত্র উল্লেখপূর্বক আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসকে বলেছেন, "রাসুল (সঃ) মৃত্যুশয্যায় থাকাকালে আল-ফজল ইবনে আব্বাস ও অন্য এক ব্যক্তির কাঁধে ভর দিয়ে তার (আয়শার) ঘরে গিয়েছিলেন।" আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বললেন, "অন্য লোকটি কে তা কি আপনি জানেন।" জবাবে উবায়দুল্লাহ্ বললেন, "হাঁ, আলী ইবনে আবি তালিব। কিন্তু আয়শা কোন ভাল বিষয়ে আলীর নাম নেয়ার বিরোধিতা করে।" (হাম্বল[১৬০], ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃঃ ৩৪ ও ২২৮; সাদ [১৩৭], ২য় খন্ড, পৃঃ ২৯; তাবারী[৭৫], ১ম খন্ড, পৃঃ ১৮০০-১৮০১; বালাজুরী[১০০], ১ম খন্ড, পৃঃ ৫৪৪-৫৪৫; শাফেয়ী [১২৫], ৩য় খন্ড, পৃঃ ৩৯৬)

আমিরুল মোমেনিনের প্রতি আয়শার এহেন ঘৃণা ও বিদ্বেষের একটা কারণ হলো হজরত ফাতিমার মর্যাদা ও সুনাম আয়শার হৃদয়ে কাঁটার মত বিঁধতো। রাসুলের (সঃ) অন্যান্য স্ত্রীদের প্রতি চরম ঈর্ষার ফলে অন্য একজন স্ত্রীর কন্যাকে রাসুল (সঃ) ভালবাসেন এটা তিনি সহ্য করতে পারতেন না। তদুপরি ফাতিমার প্রতি রাসুলের (সঃ) ভালবাসা এত অধিক মাত্রায় ছিল যে, তার আগমনের জন্য রাসুল (সঃ) দাঁড়িয়ে থাকতেন, নিজের বসার স্থানে তাকে বসাতেন। নারী জাতির মধ্যে তাকে সর্বাপেক্ষা মর্যাদাশালিনী ঘোষণা করেছেন এবং তার সন্তানগণকে সর্বাপেক্ষা বেশী ভালবাসতেন। এসব কিছু আয়শার মর্মপীড়ার কারণ ছিল এবং স্বভাবতঃই তার মনে হতো যদি তার সন্তান থাকতো তবে তারা রাসুলের (সঃ) পুত্র হতো এবং ইমাম হাসান ও হুসাইনের পরিবর্তে তারা রাসুলের (সঃ) ভালবাসার কেন্দ্রবিন্দু হতো। কিন্তু তার কোন সন্তান ছিল না এবং তাই তিনি তার মা হবার বাসনা চরিতার্থ করার জন্য তার বোনের ছেলের নামানুসারে উম্মে আবদিল্লাহ্ ডাকনাম গ্রহণ করেছিলেন। মোট কথা এ সবকিছু মিলিয়ে তার হৃদয়ে একটা ঈর্ষাগ্নি প্রজ্বলিত ছিল যার ফলশ্রুতিতে তিনি যখন তখন ফাতিমার বিরুদ্ধে রাসুলের (সঃ) নিকট অভিযোগ করতেন কিন্তু ফাতিমার প্রতি রাসুলের (সঃ) সুনজর এতটুকুও কমাতে পারেননি। তার এ মর্মাঘাত ও বিচ্ছেদের খবর আবু বকরের কানেও পৌঁছেছিল। এতে কন্যার প্রতি মৌখিক সান্ত্বনা ছাড়া আবু বকরের করণীয় কিছু ছিল না বলে তিনি এ বিষয়ে নিজেই উত্তেজিত ছিলেন। অবশেষে রাসুলের (সঃ) ওফাতের পর সরকারের ক্ষমতা তার হাতে গেল। ফলে তার মনের ঝাল মিটিয়ে প্রতিশোধ নেয়ার সুযোগ হয়ে গেল। প্রথমেই তিনি ফাতিমাকে উত্তরাধিকারিত্ব হতে বঞ্চিত করার জন্য ঘোষণা করলেন যে, নবীদের কোন ওয়ারিশ থাকে না এবং তাঁরাও কারো ওয়ারিশ নন। এই ঘোষণা বলে তিনি রাসুলের (সঃ) পরিত্যক্ত সম্পত্তি রাষ্ট্রায়ত্ব করলেন। এতে ফাতিমা নিদারুণ দুঃখ-কষ্টে নিপতিত হলেন। এ দুঃখে তিনি মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত কোনদিন আবু বকরের সাথে কথা বলেননি। ফাতিমার মর্মান্তিক মৃত্যুতে আয়শা কোনদিন একটুখানি দুঃখও প্রকাশ করেননি। এমন কি তিনি কোনদিন একটু দেখতেও যাননি। হাদীদ[১৫২] (৯ম খন্ড, পৃঃ ১৯৮) লিখেছে ঃ

> *যখন ফাতিমার মৃত্যু হলো তখন আয়শা ব্যতীত রাসুলের (সঃ) সকল স্ত্রী বনি হাশিমকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য এসেছিল। তিনি নিজেকে অসুস্থ বলে দেখিয়েছিলেন। কিন্তু তার কথাবার্তা আলীর কানে পৌঁছেছিল যাতে বুঝা গিয়েছিল যে তিনি আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন।*

যেখানে ফাতিমার প্রতি আয়শা এহেন বিদ্বেষ পোষণ করতেন, সেখানে তিনি ফাতিমার স্বামীর প্রতি একই বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করা স্বাভাবিক। বিশেষ করে 'ইফ্‌ক'*-এর ঘটনায় আমিরুল মোমেনিন নাকি রাসুলকে (সঃ) বলেছিলেন, "সে আপনার জুতার ফিতা অপেক্ষা অধিক কিছু নয়, তাকে তালাক দিয়ে বিদায় করুন।" একথা শুনার পর হতে আমিরুল

মোমেনিনের প্রতি আয়শার ঘৃণা ও বিদ্বেষ চরম রূপ লাভ করেছিলো। এ ছাড়াও অনেক সময় আবু বকরের উর্দ্ধে আমিরুল মোমেনিনকে মর্যাদা দেয়া হয়েছিল এবং আবু বকরের উপস্থিতিতেই আমিরুল মোমেনিনের প্রসংশাসূচক উক্তি করা হয়েছিল। উদাহরণ স্বরূপ, সূরা বারাআহ (তওবা)** নাজিল হওয়ার পর আবু বকরকে হজ্ব যাত্রীদের নেতৃত্ব হতে ফিরিয়ে এনে তদস্থলে আমিরুল মোমেনিনকে প্রেরণ করা হয়েছিল। আবু বকরকে বলে দিয়েছেন যে, হয় রাসুল (সঃ) নিজে না হয় তাঁর পরিবারের কাউকে দিয়ে উহা প্রেরণ করার জন্য রাসুল (সঃ) আল্লাহ্ কর্তৃক আদিষ্ট হয়েছেন। নেতৃত্ব থেকে বাদ দেয়ার কারণে তিনি আলীর প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন। একইভাবে আবু বকরসহ সকলের ঘরের যে দরজা মসজিদের দিকে ছিল তা রাসুল (সঃ) বন্ধ করায়ে দিয়েছিলেন কিন্তু আলীর সেই দরজা খোলা রাখার অনুমতি দিয়েছিলেন।

আয়শা তার পিতার ওপরে আলীকে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করা সহ্য করতে পারতেন না। তাই কখনো এমন বৈশিষ্ট্য উপলক্ষ হলেই তিনি তা পন্ড করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। জীবন সায়াহ্নে রাসুল (সঃ) উসামাহ্ ইবনে জায়েদের নেতৃত্বে (সিরিয়া অঞ্চলের উপদ্রব প্রশমনের জন্য) সৈন্য বাহিনীকে অগ্রবর্তী হতে আদেশ দিয়েছিলেন এবং আবু বকর ও উমরকে উসামাহ্‌র নেতৃত্বাধীনে অভিযানে যেতে বলেছিলেন। কিন্তু তারা রাসুলের (সঃ) স্ত্রীদের কাছ থেকে খবর পেয়েছিল যে, তাঁর অবস্থা বিশেষ ভাল নয়- আর অগ্রবর্তী না হয়ে তারা যেন ফিরে আসে। উসামাহ্‌র অধিনস্থ বাহিনী এ সংবাদ পাওয়া মাত্র ফেরত এসেছিল। রাসুল (সঃ) এ কথা জানতে পেরে পুনরায় যাত্রা করার জন্য উসামাহ্‌কে নির্দেশ দিলেন এবং একথাও বললেন, "যে ব্যক্তি বাহিনী হতে সরে যাবে তার ওপর আল্লাহ্‌র লানত।" ফলে তারা আবার যাত্রা করলো কিন্তু রাসুলের অসুস্থতা বৃদ্ধি হয়েছে বলে খবর দিয়ে আবার তাদেরকে ফিরিয়ে আনা হয়েছিল। উসামাহ্‌র বাহিনী মদিনার বাইরে যায়নি। কারণ তারা যেতে চায়নি। তাদের দূরদর্শিতায় তারা মনে করেছিল যে, আনসার ও মুহাজিরগণকে মদিনার বাইরে এ কারণে প্রেরণ করা হচ্ছে যাতে রাসুলের পরে আলী খেলাফত লাভ করতে কোন বেগ পেতে না হয়। এরপর বিলালের মাধ্যমে সালাতে ইমামতী করার জন্য আবু বকরকে বলা হয়েছিল। তিনি ইমামতীকে খেলাফত পাওয়ার দাবী হিসাবে দাঁড় করেছিলেন। অতঃপর বিষয়গুলো এমন ঘুরপাক খেয়েছিলো যে, আমিরুল মোমেনিন খেলাফত হতে বঞ্চিত হয়েছিলেন।

তৃতীয় খলিফার রাজত্বের পর অবস্থা এমনভাবে মোড় নিয়েছিল যে, মানুষ আমিরুল মোমেনিনের হাতে বায়াত গ্রহণের জন্য পাগল হয়ে পড়লো। এ সময় আয়শা মক্কায় ছিলেন। যখন তিনি আলীর খেলাফতের কথা জানতে পারলেন তখন তার চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে পড়তে লাগলো। ঈর্ষা ও ক্রোধ তাকে এমনভাবে অস্থির করে তুললো যে, উসমানের রক্তের বদলার ছুতায় তিনি আলীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে সশরীরে যুদ্ধ ক্ষেত্রে পর্যন্ত সৈন্য পরিচালনা করেছিলেন। অথচ উসমান নিহত হবার কিছু দিন আগেই তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে, উসমান কতল হবার উপযুক্ত। যা হোক, আয়শার বিদ্রোহের ফলে এত রক্তপাত হয়েছিল যে, সমগ্র বসরা রক্তে লাল হয়ে গিয়েছিল এবং অনৈক্য ও ফেতনার দরজা চিরতরে খুলে গেল।

★ ইফ্‌কের ঘটনা আলীর বিরুদ্ধবাদীগণ আয়শাকে যেভাবে শুনিয়েছিল এখানে সেভাবেই উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম হতেই যারা আলীর বিরোধিতা করতো তারা আয়শাকে অসত্য ও বিভ্রান্তকর কথা শুনিয়ে তার মন বিষায়িত করে তুলেছিল এবং আলীর প্রতি তার ঘৃণা ও বিদ্বেষের মূল কারণ এসব মিথ্যা প্রচারণা। এ কথার অর্থ এ নয় যে, এসব মিথ্যা প্রচারণা না করলে তিনি আলীকে ভালবাসতেন বা তাঁর বায়াত গ্রহণ করতেন। আলীকে অপছন্দ করার শত কারণ রয়েছে— কিছু নারীসুলভ, কিছু পৈতৃক ও কিছু গোত্রীয় কারণ তারমধ্যে ছিল। তবু একটু বলা যায় আলী-বিরোধীদের মিথ্যা প্রচারণা ও প্ররোচনা না থাকলে আয়শা জঙ্গে জামালের মত অন্যায়কাজে অবতীর্ণ হতেন না। আলীর প্রতি তার ঘৃণা ও বিদ্বেষ ব্যক্তি পর্যায়ে থাকতো। যা হোক, ইফ্‌কের প্রকৃত ঘটনা হলো—রাসুলের (সঃ) নিকট যখন সংবাদ পৌঁছে যে, মক্কার নিকটবর্তী বনি-মুস্তালিক গোত্র কুরাইশদের সহায়তায় হারেস ইবনে সিরাবের নেতৃত্বে মদিনা আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছিলো তখন রাসুল (সঃ) তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান পরিচালনা করলেন। এ যুদ্ধে রাসুলের (সঃ) স্ত্রী আয়শা তাঁর সফরসঙ্গিনী ছিলেন। আয়শা একটি পৃথক উটে চড়ে গিয়েছিলেন। পঞ্চম হিজরী সনের ২রা শাবান (মতান্তরে ৬ষ্ঠ হিজরী সনের শাবান মাস মোতাবেক

৬২৭ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাস) বনি-মুস্তালিকে যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং এ যুদ্ধে তারা শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করে। যুদ্ধ শেষে রাসুল (সঃ) মদীনা অভিমুখে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে এক স্থানে সৈন্যবাহিনীসহ রাত্রি যাপন করেন। ভোরবেলায় কাফেলা তাড়াহুড়া করে পুনঃযাত্রারম্ভের ব্যবস্থা করে। এদিকে আয়শা তার শিবিকা হতে বের হয়ে প্রাকৃতিক ডাকে একটু দূরে গিয়েছিলেন। কাজ শেষ করে শিবিকার কাছাকাছি এসেই দেখতে পেলেন যে, তার গলার হারটি খোয়া গেছে। তিনি পুনরায় হার খুঁজতে চলে যান। কাফেলার লোকজন মনে করেছে যে, তিনি শিবিকার মধ্যেই বসে আছেন এবং তারা শিবিকা উটের পিঠে বসিয়ে দিল। কাফেলা যাত্রা শুরু করে সে স্থান থেকে চলে গেল। হার খুঁজতে গিয়ে আয়শা উহা পেয়ে গেলেন। তিনি তাড়াতাড়ি ফিরে এসে দেখেন যে, কাফেলা সে স্থান ত্যাগ করে চলে গেছে। ভয়ে তিনি জড়সড় হয়ে গেলেন। তিনি ভাবলেন পথিমধ্যে কোথাও শিবিকা শূন্য ধরা পড়লে তাকে খুঁজতে লোকেরা সেখানেই আসবে। তাই তিনি চাদরাবৃত হয়ে সেখানে শুয়ে রইলেন। রাসুলের (সঃ) নিয়ম ছিল যে, কোথাও কাফেলা অবস্থান করলে সেই স্থান ত্যাগের পর একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত লোক তল্লাশী করে দেখতো কেউ কোন কিছু ফেলে গেল কিনা এবং তল্লাশী শেষ করে সে কাফেলাকে অনুসরণ করতো। এই কাফেলার তল্লাশী কাজে নিয়োজিত ছিল সাহাবী সাফওয়ান ইবনে মুআত্তাল আস্-সুলামী। তিনি তার দায়িত্ব অনুযায়ী তল্লাশী করতে গিয়ে আয়শাকে দেখে চমকে উঠলেন এবং ঘটনা অবগত হয়ে তার উটে আয়শাকে বসিয়ে নিজে উটের দড়ি ধরে হেঁটে যাত্রা করলেন। রাসুলের (সঃ) কাফেলা মদিনা পৌছার চার দিন পর আয়শাকে নিয়ে সাফওয়ান মদিনা পৌছেন।

এ দুর্ঘটনার পর মদিনার মোনাফেকগণ সাফওয়ানকে কেন্দ্র করে আয়শার চরিত্রে কালিমা লেপন করে নানা কুকথা প্রচার করতে থাকে। এদের মধ্যে মুখ্য ভূমিকায় ছিল মোনাফেক সর্দার আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই, আবু বকরের অনুগ্রহে লালিত ভাগিনা মেসতাহ ইবনে উছাছাহ্, রাসুলের (সঃ) স্ত্রী জয়নবের ভগিনী হাসনা বিনতে জাহাশ ও রাসুলের (সঃ) কবি হাসান বিন সাবেত। এদের কানাকানি ও কুৎসা-রটনা রাসুলের (সঃ) কানে গেলে। তিনি খুবই মর্মাহত হলেন। এক পর্যায়ে আয়শাও বিষয়টি জেনেছেন। তিনি লজ্জায় ও ক্ষোভে-দুঃখে ম্রিয়মান হয়ে একেবারে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। এমনকি একদিন কূপে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করার চেষ্টাও করেছিলেন। অবশেষে পিতা আবু বকরের বাড়ীতে চলে গেলেন। রাসুল (সঃ) আয়শাকে যেমন বিশ্বাস করতেন সাফওয়ানের প্রতিও তাঁর তেমনি আস্থা ছিল। কিন্তু কোন কিছুতেই মোনাফেকগণের কানাঘুষা বন্ধ হচ্ছিলো না দেখে রাসুল (সঃ) উমর, উসমান ও আলীকে ডেকে এ বিষয়ে তাদের মতামত চাইলেন। উমর ও উসমান একবাক্যে বলে দিলেন "ইহা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও মিথ্যা।" আলীকে জিজ্ঞেস করলে তিনি শুধু "মিথ্যা" বলেন নি। তিনি তাঁর স্বাভাবিক প্রজ্ঞা ও বিচারবুদ্ধি দ্বারা বিষয়টির ব্যাখ্যা ও যুক্তিসহ তাঁর মতামত প্রদান করেন। এ বিষয়ে তাঁর মতামত বিভিন্ন ঐতিহাসিক বিভিন্নভাবে লিখেছেন। সেগুলি মোটামুটি নিম্নরূপ ঃ

(ক) আলী বললেন, "ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা রটনা। হে আল্লাহ্র রাসুল (সঃ), আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে একদিন সালাত আদায়কালে আপনি এক পায়ের জুতা খুলে ফেলেছিলেন। সালাত শেষে এ বিষয়ে আপনাকে জিজ্ঞেস করা হলে আপনি বলেছিলেন ঐ জুতায় কিছু নোংরা জিনিস লেগেছিল বলে উহা খুলে ফেলার জন্য জিব্রাইল মারফত খবর দেয়া হয়েছিল। সামান্য একটু নোংরা বস্তু হতে আপনাকে পবিত্র রাখার ব্যাপারে যেখানে আল্লাহ্ এতটা সজাগ সেখানে এতবড় একটা বিষয় সত্য হলে আল্লাহ্ চুপ করে থাকবেন ইহা কিছুতেই হতে পারে না।"

(খ) আলী বললেন, "হে আল্লাহ্র রাসুল, ব্যাপারটা আমার বিশ্বাস হয় না। তবুও আপনি আয়শার বাঁদীকে জিজ্ঞাসাবাদ করে দেখতে পারেন। সে হয়ত সঠিক তথ্য বলে দেবে।"

(গ) আলী মন্তব্য করলেন, "হে আল্লাহ্র রাসুল, আয়শা ব্যতীত কি আর কোন নারী নেই? আপনি এত উদ্বিগ্ন হয়েছেন কেন? আয়শাকে পরিবর্তন করতে তো আপনি সক্ষম।"

আমিরুল মোমেনিন সম্পর্কে যাদের সামান্যতম জ্ঞান আছে তারা কখনো তৃতীয় মন্তব্যটি মেনে নেবেন না। আলীর মত মহান চরিত্রের অধিকারী একজন প্রাজ্ঞ মোনাফেকগণের কুৎসা-রটনার বিষয়ে এমন কুৎসিত মন্তব্য করতে পারেন না। অথচ

আলী-বিদ্বেষীগণ আয়শাকে এই কুৎসিত মন্তব্যটি শুনিয়েছিলেন যা তিনি যাচাই-বাছাই না করে বিশ্বাস করেছিলেন এবং আলীর বিরুদ্ধে সারাজীবন বিদ্বেষ পোষণ করেছিলেন। উসমানের রক্তের বদলার ছদ্মাবরণে জঙ্গে জামালে আয়শার অবতীর্ণ হবার ইহা অন্যতম কারণও বটে।

যাহোক, একমাস পর্যন্ত আয়শা এহেন কুৎসা রটনার জন্য নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণায় কাতর হবার পর আল্লাহ্ সূরা নূরে বিষয়টি স্পষ্ট করে দিলে রাসুল (সঃ) আয়শাকে তার পিতৃগৃহ হতে নিয়ে আসেন এবং তিনি মানসিক শান্তি লাভ করেন। এই বিষয়ে আরো অধিক জানার জন্য গোলাম মোস্তফার বিশ্ব নবী (পৃঃ ২৪৭-২৫৯), আবদুল হামীদ আল খতিবের মহানবী (পৃঃ ১৬৯-১৭৫), সাদেক শিবলী জামানের হজরত আলী (পৃঃ ১০৪-১১১) এবং যে কোন তফসীর গ্রন্থের সূরা নূরের শানে নজুল দ্রষ্টব্য—বাংলা অনুবাদক

★★

সূরা বারাআহ্ (সূরা তওবা) নাজিলের ফলে আবু বকরকে আমীরে হজ্জ থেকে বাদ দেয়ার ঘটনাটি হলো—*অষ্টম হিজরীর রমজান মাসে মক্কা বিজয়ের পর জেলহজ্জ মাসে মোশরেকদের তত্ত্বাবধানে পূর্বে প্রচলিত তাদের নিয়মানুযায়ী হজ্জের আরকান সমাধা করা হয়েছিল। মুসলিমগণ মক্কার আমীর আত্তাব ইবনে উমাদের সাথে হজ্জ সম্পন্ন করে।*

নবম হিজরীর দ্বিতীয়ার্ধ হতেই এ বছরের হজ্জ সম্পর্কে রাসুল (সঃ) চিন্তিত হয়ে পড়েন। পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে তিনি সারাজীবন সংগ্রাম করে গেলেন। এখন হজ্জের সময় তাঁর সামনেই পৌত্তলিকতার অস্তিত্ব তিনি কিভাবে বরাদাশ্‌ত করবেন। অপরপক্ষে, তাদেরকে নিষেধ করাও একটা জটিল সমস্যা। কারণ-

(ক) ইতিপূর্বে কাবা জিয়ারতে আগত কাউকে নিষেধ না করার সাধারণ নীতি তাঁর পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়েছিল;

(খ) বেশ ক'টি আরব গোত্রের সাথে তাঁর চুক্তি বলবৎ ছিল যে, আশহুরে হারামে (নিষিদ্ধ মাসে) কাউকে ভীতি প্রদর্শন করা হবে না;

(গ) রাসুলের (সঃ) পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষের বাক স্বাধীনতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা ঘোষণা করে শরীয়তের নীতিমালা প্রচার করা হয়েছিল।

এসব চিন্তা করে নবম হিজরীর হজ্জ সম্পাদন করা রাসুলের (সঃ) পক্ষে সম্ভব হবে না বিধায় তিনি জিলকদ মাসের শেষ দিকে আবু বকরকে আমিরুল হজ্জ নিয়োগ করে তিনশত মুসলিমকে হজ্জ সম্পাদনের জন্য প্রেরণ করেন যাতে তারা রাসুল কর্তৃক মনোনীত হজ্জের নিয়ম-কানুন বিবৃত করে। আবু বকর মুসলিমদের নিয়ে মদিনা ত্যাগের পর সূরা বারাআহ্ (তওবা) এর ১-৪০ আয়াত নাজিল হয় এবং ইহাতে কাবাগৃহে পৌত্তলিকদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। সাহাবীগণের কেউ কেউ পরামর্শ দিয়েছিল সূরাটি কাউকে দিয়ে আবু বকরের কাছে পাঠিয়ে দিলে তিনি হজ্জের সময় উহা জনগণকে জানিয়ে দিতে পারবেন। ইহাতে রাসুল (সঃ) বললেন, "না, তা হতে পারে না। ইহা আমার পক্ষ হতে এমন একজন ঘোষণা করতে পারে যার যোগ্যতা ও অধিকার আছে—আর সে হলো আলী"। অতঃপর রাসুল (সঃ) একটা নির্দেশনামা লেখাইয়া তাঁর নিজের দ্রুতগামী উষ্ট্রি 'আজবা' (মতান্তরে কুসওয়া) তে আরোহণ করিয়ে আলীকে মক্কা অভিমুখে প্রেরণ করলেন।

আলী মদিনা হতে মক্কার পথে আজু নামক স্থানে আবু বকরের সাথে মিলিত হলেন। ঠিক প্রত্যুষে আলীকে হঠাৎ সেখানে উপস্থিত দেখে আবু বকর জিজ্ঞেস করলেন, "কি হে আলী, তোমার এ আগমন কি আমীর হিসাবে নাকি মামুর (অনুসারী) হিসাবে।" প্রত্যুত্তরে আলী বললেন, "আমীর হিসাবে। রাসুলের (সঃ) আপনজনদের মধ্য হতে যোগ্য ও অধিকার প্রাপ্তকে আমীরের দায়িত্ব অর্পন করতে তিনি আদিষ্ট হয়েছেন।" অতঃপর আবু বকর আলীর নেতৃত্বাধীনে হজ্জ সমাপন করেন। (কারো কারো মতে আবু বকর 'আজু থেকে মদিনায় ফিরে আসেন। আবার কারো কারে মতে উভয়ের যুগ্ম নেতৃত্বে হজ্জ সমাপন হয়েছিল)।

যাহোক, হজ্জ শেষে সমবেত জনমন্ডলীর সামনে দাঁড়িয়ে আলী সুললিত কণ্ঠে সূরা বারাআহ্‌র (তওবার) ১ হতে ৪০ আয়াত আবৃত্তি করে শুনালেন এবং তৎপর বজ্রকণ্ঠে রাসুলের (সঃ) নির্দেশনামা ঘোষণা করলেন। নির্দেশগুলো হলো-

(১) মুমিন ছাড়া কেউ জান্নাতে যাবে না;

(২) এখন হতে কোন পৌত্তলিক কাবাগৃহে হজ্জ করতে পারবে না এবং কাবাগৃহে প্রবেশ তাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হলো;

(৩) উলঙ্গাবস্থায় কাবা তাওয়াফ করা চলবে না;

(৪) মোশরিকগণ চার মাসের মধ্যে আপন আপন স্থানে গমন করবে। এরপর তাদের সাথে মুসলিমদের কোন সম্পর্ক থাকবে না;

(৫) আল্লাহ্‌র রাসুলের (সঃ) সাথে যার যে চুক্তি হয়েছে তা নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

এ সময় সমবেত মোশরিকগণ ঘোষণা শ্রবণ করলো কিন্তু বাধা দেয়ার সাহস হয়নি। অতঃপর মুসলিমগণ মদিনা প্রত্যাবর্তন করলেন—বাংলা অনুবাদক

★★★★★

খোৎবা-১৫৬

তাকওয়ার প্রতি আহবান

প্রতিষ্ঠিত প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি প্রশংসাকে তাঁর জিকিরের চাবি, তাঁর নেয়ামত বৃদ্ধির উপায় এবং তাঁর মহিমা ও সিফাতের দেশনা করেছেন।

হে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ, যারা এ দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছে তাদের প্রতি সময় যেরূপ আচরণ করেছে একইরূপ আচরণ তাদের প্রতিও করা হবে যারা জীবিত আছে। যে সময় চলে গেছে তা আর কোনদিন ফিরে আসবে না এবং আজ দুনিয়াতে যা কিছু আছে তা চিরদিন থাকবে না। ইহার পূর্ববর্তী কাজ পরবর্তী কাজের অনুরূপ। ইহার বিপদাপদ ও দুঃখ-কষ্ট একটি অপরটিকে ছাপিয়ে যেতে চায়। ইহার ঝান্ডা একটি অপরটিকে অনুসরণ করে। ইহা এ জন্য যে, তোমরা যেন শেষ দিনের প্রতি অনুরক্ত হও যা তোমাদেরকে এত দ্রুত তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে যেমন করে সাত মাসের অদুগ্ধবতী উষ্ট্রিকে তাড়িয়ে নিয়ে যায়। যে ব্যক্তি আত্ম উন্নতি ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে ব্যস্ত থাকে সে অন্ধকারে বিহবল হয়ে পড়ে এবং ধ্বংসে জড়িয়ে পড়ে। তার পাপাত্মা তাকে অধর্মের গভীরে ডুবিয়ে দেয় এবং তার মন্দ আমল সমূহকে সুন্দর করে দেখায়। ভাল কাজে যারা অগ্রণী জান্নাত তাদের জন্য আর যারা সীমালজ্ঞনকারী জাহান্নাম তাদের জন্য।

হে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ, জেনে রাখো, তাকওয়া একটি সুরক্ষিত ঘর এবং তাকওয়াহীনতা অতি দুর্বল ঘর যা বসবাসকারীকে রক্ষা করতে পারে না এবং এতে যারা আশ্রয় গ্রহণ করে তাদেরকে কোন নিরাপত্তা দিতে পারে না। জেনে রাখো, তাকওয়া পাপের বিষাক্ত ছোবল হতে রক্ষা করে এবং ঈমানের দৃঢ়তা দ্বারা চূড়ান্ত লক্ষ্য (মুক্তি) অর্জন করা যায়।

হে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ! আল্লাহ্‌কে ভয় কর, আল্লাহ্‌কে ভয় কর, তোমাদের নিজস্ব ব্যাপারে যা তোমাদের অতি প্রিয় ও নিকটতম। কারণ, আল্লাহ্ তোমাদের কাছে সত্যবাদিতার পথের বিশদ ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন এবং সেই পথকে আলোকমণ্ডিত করেছেন। সুতরাং চিরকালীন দুর্ভোগ ও অনন্ত আনন্দ—এ দু'টির যে কোন একটি তোমরা বেছে নিতে পার। এই নশ্বর দিনগুলোতে অনন্ত দিনের রসদ সংগ্রহ করা তোমাদের উচিত। তোমাদেরকে রসদের

কথা জানানো হয়েছে, অগ্রগামী হতে আদেশ দেয়া হয়েছে এবং যাত্রায় তাড়াহুড়া করতে বলা হয়েছে। তোমরা দণ্ডায়মান অশ্বারোহীর মত যারা জানে না কখন তাদেরকে কুচকাওয়াজ করার জন্য আদেশ দেয়া হবে। সাবধান, যারা পরকালের জন্য সৃষ্টি হয়েছে তারা এ দুনিয়া দিয়ে কি করবে? সম্পদ দিয়ে মানুষ কি করবে যা থেকে সে সহসাই বঞ্চিত হবে? মানুষ শুধুমাত্র সম্পদের কুফল ও হিসাব-নিকাশ পেছনে ফেলে যায়।

হে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ, আল্লাহ্ যে সব কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা কখনো পরিত্যাগ করো না এবং যে সব অকল্যাণ হতে বিরত থাকতে বলেছেন তাতে কখনো লিপ্ত হয়ো না। হে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ, সে দিনকে ভয় কর যেদিন আমলের হিসাব নেয়া হবে। সেদিন তোমরা এমনভাবে ভয়ে কাঁপতে থাকবে যে, শিশুও বৃদ্ধ হয়ে যাবে।

হে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ, জেনে রাখো, তোমাদের বাতেনই (বিবেক) তোমাদের জন্য প্রহরী। তোমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ পাহারাদার এবং সত্যবাদী প্রহরীগণের কাছে বিশ্বস্ত যারা তোমাদের আমল ও শ্বাস-প্রশ্বাসের হিসাব রাখে। রাতের গাঢ় অন্ধকার বা রুদ্ধদ্বার তাদের কাছ থেকে তোমাদেরকে গোপন করতে পারে না। নিশ্চয়ই আগামীকাল আজকের অতি নিকটবর্তী।

আজকের দিনটি উহার সব কিছু নিয়ে প্রস্থান করা মাত্রই আগামীকাল এসে পড়বে। ইহা এ জন্য যে, তোমাদের প্রত্যেকেই যেন পৃথিবীর সে স্থানে পৌঁছে গেছো যেখানে তোমরা একাকী থাকবে (অর্থাৎ কবর)। সুতরাং সেই নিঃসঙ্গ ঘর, নির্জন থাকার জায়গা ও নির্জন নির্বাসনের কথা তোমাদেরকে কি আর বলবো! শিঙ্গার আওয়াজ যেন তোমাদের কাছে পৌঁছে গেছে, নির্ধারিত সময় যেন তোমাদেরকে নাগাল ধরে ফেলেছে এবং তোমরা যেন বিচারের জন্য বেরিয়ে এসেছো। তোমাদের নিকট হতে মিথ্যার আবরণ সরিয়ে যেন ফেলা হয়েছে এবং তোমাদের সকল ওজর দুর্বল হয়ে পড়েছে। তোমাদের বিষয়ে যা সত্য তা যেন প্রমাণিত হয়েছে। তোমাদের সকল বিষয় ইহার পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়েছে। সুতরাং উপমা ও উদাহরণ হতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর, উত্থান-পতন হতে শিক্ষা গ্রহণ কর এবং সতর্ককারীগণের সতর্কবাণীর সুযোগ গ্রহণ কর।

★★★★★

খোৎবা-১৫৭

রাসুল (সঃ), পবিত্র কুরআন ও উমাইয়াদের স্বৈরাচার সম্পর্কে

আল্লাহ্ রাসুলকে (সঃ) এমন এক সময় প্রেরণ করেছিলেন যখন পৃথিবীতে বেশ কিছু সময়ের জন্য কোন পয়গম্বর ছিল না। মানুষ দীর্ঘকাল ধরে নিদ্রাচ্ছন্ন ছিল এবং রশির পাক শ্লথ হয়ে গিয়েছিল। রাসুল (সঃ) এমন এক কিতাব নিয়ে এসেছিলেন যাতে রয়েছে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে যা ছিল উহার সমর্থন ও অনুসরণীয় আলো। এ কিতাব হলো কুরআন, যদি তোমরা ইহাকে কথা বলতে বল তবে ইহা কথা বলতে পারবে না; কিন্তু আমি ইহার সম্পর্কে বলবো, তোমরা জেনে রাখো যে, ইহাতে রয়েছে যা কিছু ঘটবে উহার জ্ঞান, অতীতের ঘটনা প্রবাহ, তোমাদের রোগের নিরাময় ও যাকিছু তোমাদের মুখোমুখী হয় উহার নিয়ম-কানুন।

উমাইয়াদের স্বৈরাচার সম্পর্কে

সে সময় এমন কোন ঘর বা তাবু থাকবে না যেখানে জালেমগণ শোকের ছায়া ঢুকিয়ে দেবে না এবং নিপীড়ন প্রবেশ করবে না। সেই দিনগুলোতে জনগণের অভিযোগ শুনার জন্য আকাশে কেউ থাকবে না এবং তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসার মত মাটিতে কেউ থাকবে না। তোমরা এমন লোককে প্রশাসনের জন্য (খেলাফত)

মনোনীত করেছো যে উহার যোগ্য নয় এবং তোমরা তাকে এমন পদমর্যাদায় উঠিয়ে দিয়েছো যা তার জন্য প্রযোজ্য নয়। সহসাই আল্লাহ্ তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন যারা জুলুম করেছে— সেই প্রতিশোধ হবে খাদ্যের বদলে খাদ্য ও পানীয়ের বদলে পানীয়। তাদেরকে খাবার জন্য কোলেসিনথ্ (শশার মত বিষাক্ত ফল) এবং পান করার জন্য গন্ধরস ও ঘৃতকুমারী পাতার রস দেয়া হবে। এ সমস্ত খাদ্য ও পানীয়ের যন্ত্রণায় তাদের ভেতরের দিক জ্বলবে এবং বাইরের খোলস তরবারির ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকবে।

তারা ভারবাহী জন্তুর মত পাপের ভার বয়ে বেড়াবে এবং উটের সওয়ারের মত কুকর্মের সওয়ার হবে। আমি শপথ করে বলছি—আবার শপথ করে বলছি যে, উমাইয়াগণ খেলাফতকে মুখের শ্লেষার মত থু করে ফেলে দেবে এবং তৎপর আর কোন দিন ইহার স্বাদ গ্রহণ করতে পারবে না। যতদিন দিবারাত্র থাকবে ততদিন তারা আর খেলাফতের গন্ধ গ্রহণ করতে পারবে না।

★★★★★

খোৎবা-১৫৮

মানুষের সঙ্গে সদাচরণ প্রসংগে

আমি তোমাদের উত্তম প্রতিবেশী ছিলাম এবং তোমাদেরকে দেখাশোনা করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলাম। আমি তোমাদেরকে হীনাবস্থার বেড়াজাল হতে মুক্ত করেছিলাম। তোমাদের সামান্য ভাল কাজের জন্য আমি আমার কৃতজ্ঞতার মাধ্যমে জুলুমের বেড়ি হতে তোমাদেরকে মুক্ত করেছিলাম। তোমাদের অনেক খারাপ কাজের প্রতি আমি আমার চক্ষু বন্ধ করে রেখেছিলাম যার সাক্ষ্য আমার চোখ ও দেহ বহন করে।

★★★★★

খোৎবা-১৫৯

আল্লাহ্র প্রশংসা সম্পর্কে

আল্লাহ্র রায় সুবিবেচনাপূর্ণ এবং প্রজ্ঞাময়। তাঁর সন্তুষ্টি মানেই হলো সুরক্ষা ও করুণা। তিনি অসীম জ্ঞানের সাথে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং সহনশীলতার সাথে ক্ষমা করেন।

হে আল্লাহ্, তুমি যা নিয়ে যাও এবং যা দিয়ে দাও তার জন্য আমরা তোমার প্রশংসা করি। যা দিয়ে তুমি রোগমুক্ত কর এবং যদ্বারা তুমি রোগাক্রান্ত কর তার জন্য আমরা তোমার প্রশংসা করি। যে প্রশংসা তোমার কাছে সবচেয়ে বেশী গ্রহণীয়, যে প্রশংসা তুমি সবচাইতে বেশী পছন্দ কর এবং যে প্রশংসা তোমার কাছে সবচাইতে মর্যাদাশীল আমরা তোমার সেই প্রশংসা করি। আমরা তোমার সেই প্রশংসা করি যা তোমার সৃষ্টিকে আপ্লুত করে এবং তুমি যেখানে ইচ্ছা কর সেখানে পৌঁছে। আমরা তোমার সেই প্রশংসা করি যা তোমার কাছে গুপ্ত নয়, যার কোন শেষ নেই এবং যার অবিরাম চলমানতা কখনো স্থগিত হবে না।

আল্লাহ্র মহত্ব

আমরা তোমার প্রকৃত মহত্ব সম্পর্কে তেমন কিছু জানি না। আমরা শুধু জানি তুমি চিরঞ্জীব ও স্বয়ম্ভর এবং সবকিছু তোমার ওপর নির্ভরশীল। তন্দ্রা বা নিদ্রা তোমাকে স্পর্শ করে না, দৃষ্টি তোমার কাছে পৌঁছে না এবং

দৃষ্টিশক্তি তোমাকে আঁকড়ে ধরতে পারে না। তুমি মানুষের চক্ষু দেখ এবং কাল গণনা কর। কপাল ও পা দ্বারা তুমি মানুষকে তোমার গোলাম কর। আমরা তোমার সৃষ্টিকে দেখি এবং তাতে তোমার কুদরত দেখে বিস্মিত হই। তোমার কর্তৃত্ব প্রকাশের জন্য আমরা সৃষ্টির বর্ণনা করি। কিন্তু যা আমাদের কাছে গুপ্ত, যা আমাদের দৃষ্টি দেখতে পায় না, যা আমাদের বুদ্ধিমত্তা আয়ত্ব করতে পারে না এবং যে সব বিষয় ও আমাদের মধ্যে কুদরতের পর্দা ফেলে রাখা হয়েছে সে সব বিষয় আরো অনেক মহান।

পৃথিবীর সব কিছু হতে হৃদয়কে মুক্ত করে যদি কেউ তার সমগ্র চিন্তাশক্তি নিয়োগ করে এসব বিষয় জানতে চায় যে, কিভাবে তুমি আরশে অধিষ্ঠিত, কিভাবে তুমি বস্তু নিচয় সৃষ্টি করেছ, কিভাবে তুমি আকাশে বাতাস প্রবাহিত করেছ এবং কিভাবে তুমি জল-তরঙ্গের ওপর পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছ, তবে তার চোখ ক্লান্ত হয়ে পড়বে, তার বুদ্ধিবৃত্তি ও জ্ঞান রুদ্ধ হয়ে যাবে, তার কান বন্ধ হয়ে যাবে এবং তার চিন্তাশক্তি স্থবির হয়ে যাবে।

আল্লাহ্‌তে ভয় ও আশা সম্পর্কে

যে তার চিন্তাশক্তি অনুযায়ী দাবী করে যে, সে আল্লাহ্ হতে অনেক আশা করে। মহান আল্লাহ্‌র কসম, সে মিথ্যা কথা বলে। অবস্থা এমন যে, আল্লাহ্‌তে তার আশা সে আমলের মাধ্যমে করে না। অথচ সে জানে যারা আল্লাহ্‌তে আশা করে তারা তা শুধু আমলের মাধ্যমে করে থাকে। মহিমান্বিত আল্লাহ্‌কে পাবার আশা ছাড়া অন্য সকল আশা অপবিত্র এবং আল্লাহ্‌র ভয় ছাড়া অন্য ভয় প্রকৃত ভয় নয়।

সে আল্লাহ্‌র কাছে বড় জিনিস ও মানুষের কাছে ক্ষুদ্র জিনিস আশা করে। কিন্তু এ ব্যাপারে সে মানুষকে যেভাবে গুরুত্ব দেয় আল্লাহ্‌কে সেভাবে গুরুত্ব দেয় না। মহামহিম আল্লাহ্‌র প্রশংসা করতে বাধা কোথায়? তিনি তাঁর বান্দাকে যা দিয়েছেন সে তুলনায় তাঁকে কমই দেয়া হচ্ছে। তোমাদের কি ভয় হয় না যে, তোমরা আল্লাহ্‌তে ভুয়া আশা কর? অথবা তোমরা কি তাঁকে তোমাদের আশার কেন্দ্রবিন্দু মনে কর না? একইভাবে, কোন মানুষ যদি অন্য লোককে ভয় করে তবে সেই ভয়ের কারণে সে তাকে যতটুকু গুরুত্ব দেয় আল্লাহ্‌র ভয়ের কারণে আল্লাহ্‌কে ততটুকু গুরুত্ব দেয় না। এভাবে সে মানুষের প্রতি ভয়কে নগদ এবং স্রষ্টার প্রতি ভয়কে বাকী অথবা প্রতিশ্রুতিতে পরিণত করেছে। যাদের দৃষ্টিতে দুনিয়া বড় ও গুরুত্বপূর্ণ এবং যাদের হৃদয়ে দুনিয়ার মর্যাদা বেশী তাদের প্রত্যেকের বেলায় এ অবস্থা বিদ্যমান। সে আল্লাহ্ অপেক্ষা দুনিয়াকে অধিক পছন্দ করে; সুতরাং সে দুনিয়ার দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং দুনিয়ার শিষ্য হয়ে পড়ে।

রাসুলের (সঃ) উপমা

নিশ্চয়ই, আল্লাহ্‌র রাসুলের (সঃ) মাঝে দুনিয়ার কুফল, ইহার দোষত্রুটি, ইহার অগণিত অমর্যাদাকর অবস্থা ও ইহার পাপ সম্বন্ধে অনেক উদাহরণ—উপমা ও প্রমাণ রয়েছে। কারণ, দুনিয়ার পার্শ্বদেশ তাঁর জন্য সঙ্কুচিত করা হয়েছে। অথচ ইহার বাহু অন্যদের জন্য বিস্তৃত করা হয়েছে। তিনি দুনিয়ার দুগ্ধ হতে বঞ্চিত ছিলেন এবং ইহার সাজ-সজ্জা ও চাকচিক্য হতে মুখ ফিরিয়ে রেখেছিলেন।

মুসার উপমা

যদি তোমরা চাও তবে আমি দ্বিতীয় উদাহরণ হিসাবে মুসার কথা বলব। আল্লাহ্‌র সাথে কথোপকথনকারী মুসা (আঃ) বলেছিলেন, "হে আল্লাহ্, যা কিছু মঙ্গল তুমি আমার জন্য মঞ্জুর কর উহাই আমার প্রয়োজন" (কুরআন-২৮ : ২৪)।

আল্লাহ্‌র কসম, তিনি খাবার জন্য শুধু রুটি চেয়েছিলেন। কারণ, তিনি লতাপাতা খেয়ে থাকতেন এবং তাঁর পেটের কোমল চামড়ায় সবুজাভ রং দেখা যেত। কারণ তিনি অত্যন্ত কৃশ ছিলেন এবং তাঁর শরীর মাংশল ছিল না।

দাউদের উপমা

যদি তোমরা জানতে চাও তবে আমি দাউদের (আঃ) তৃতীয় উপমা উপস্থাপন করতে পারি। তিনি বেহেশ্তে আল্লাহ্র গুণকীর্তন আবৃত্তিকারী। তিনি খেজুর গাছের পাতার ঝুড়ি নিজ হাতে তৈরী করতেন এবং তাঁর অনুচরদেরকে বলতেন, "তোমাদের মধ্যে কে আছে যে এই ঝুড়ি ক্রয় করে আমাকে সাহায্য করতে পার?" ঝুড়ি বিক্রি লব্ধ অর্থ দ্বারা তিনি বার্লির রুটি ক্রয় করতেন।

ঈশার উপমা

যদি তোমরা চাও তবে আমি মরিয়ম তনয় ঈশা (আঃ) সম্বন্ধে বলবো। তিনি একখণ্ড পাথরকে বালিশ হিসাবে ব্যবহার করতেন, মোটা কাপড় পরিধান করতেন এবং অতি সাধারণ মোটা খাবার খেতেন। ক্ষুধা ছিল তাঁর নিত্য সাথী। চন্দ্র ছিল তাঁর রাতের বাতি। শীতকালে তাঁর আশ্রয়স্থল ছিল পূর্বদিক ও পশ্চিম দিকে পৃথিবীর বিস্তৃতি (অর্থাৎ খোলা আকাশ)। তাঁর ফল ও ফুল ছিল তা যা পশুর জন্য মাটিতে জন্মে। তাঁর কোন স্ত্রী ছিল না যে তাঁকে প্রলুব্ধ করবে, তাঁর কোন পুত্র ছিল না যার জন্য তিনি শোকাহত হবেন, তাঁর কোন সম্পদ ছিল না যা তাঁর দৃষ্টি সরিয়ে নিতে পারে এবং তাঁর কোন লোভ ছিল না যাতে তাঁর অমর্যাদা হবে। তাঁর দু'পা ছিল তাঁর বাহন এবং তাঁর দু'হাত ছিল চাকর।

রাসুলের (সঃ) উপমা অনুসরণ

তোমাদের রাসুলকে (সঃ) অনুসরণ করা তোমাদের উচিত। তিনি ছিলেন পবিত্রতম ও পরিশুদ্ধতম। তাঁর মধ্যে অনুসরণকারীর জন্য রয়েছে উপমা এবং সান্ত্বনা-সন্ধানীর জন্য রয়েছে সান্ত্বনা। আল্লাহ্র নিকট সেই ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা প্রিয় যে তাঁর রাসুলকে অনুসরণ করে এবং যে রাসুলের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলে। তিনি দুনিয়া হতে অতি অল্পই গ্রহণ করেছিলেন এবং কখনো দুনিয়ার প্রতি পুরোপুরি দৃষ্টিপাত করেননি। পৃথিবীর মানুষের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বাপেক্ষা পরিতৃপ্ত ও অভুক্ত। তাঁকে দুনিয়া সাধাসাধি করা হয়েছিলো কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছিলেন। যখন তিনি জানলেন যে, মহিমান্বিত আল্লাহ্ কোন কিছুকে ঘৃণা করেছিলেন, তিনি তখনই উহাকে ঘৃণা করেছিলেন; আল্লাহ্ কোন কিছুকে হীন করেছিলেন, তিনিও উহাকে হীন মনে করতেন; আল্লাহ্ কোন কিছুকে ক্ষুদ্র করেছিলেন, তিনিও উহাকে ক্ষুদ্র মনে করেছিলেন। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুল যা ঘৃণা করেন তা যদি আমরা ভালবাসি এবং তাঁরা যা ক্ষুদ্র করেছেন তা যদি আমরা বড় মনে করি তবে ইহাই আল্লাহ্ থেকে দূরে সরে যাওয়া ও তাঁর আদেশের সীমালঙ্ঘনের জন্য যথেষ্ট।

রাসুল (সঃ) মাটিতে বসে খেতেন এবং ক্রীতদাসের মত বসতেন। তিনি নিজ হাতে জুতা মেরামত করতেন এবং নিজ হাতেই নিজের কাপড়ে তালি লাগাতেন। তিনি জিনবিহীন খচ্চরে আরোহণ করতেন এবং তাঁর পেছনে অন্য কাউকে উঠিয়ে নিতেন। যদি তিনি তাঁর দরজায় চিত্রাঙ্কিত কোন পর্দা দেখতেন তবে স্ত্রীদের কাউকে বলতেন, "হে অমুক, এপর্দা আমার দৃষ্টির আড়াল কর, কারণ ইহার দিকে দৃষ্টি পড়লে দুনিয়া ও উহার সাজ-সজ্জার কথা আমার স্মরণ হয়।" এভাবে তিনি তাঁর হৃদয় হতে দুনিয়াকে বিতাড়িত করেছিলেন এবং তাঁর মন হতে দুনিয়ার স্মরণকে বিনষ্ট করেছিলেন। দুনিয়ার চাকচিক্য তাঁর দৃষ্টির আড়াল রাখতে তিনি ভালবাসতেন। সেইজন্য তিনি মূল্যবান পোষাক পরিধান করতেন না। তিনি পৃথিবীকে বাসস্থান হিসাবে গণ্য করতেন না এবং ইহার মধ্যে বাস করার আশাও করতেন না। ফলে দুনিয়াকে তিনি তাঁর মন হতে সরিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁর হৃদয় হতে ইহাকে বিদূরীত হতে বাধ্য করেছিলেন এবং তাঁর চক্ষু হতে ইহাকে গুপ্ত রেখেছিলেন। একইভাবে যে ব্যক্তি কোন কিছুকে ঘৃণা করে তার উচিত উহার প্রতি দৃষ্টিপাত করতে বা উহা সম্বন্ধে কানে শুনতে ঘৃণাবোধ করা।

নিশ্চয়ই, আল্লাহ্‌র রাসুলের মধ্যে এমন গুণ ছিল যা তোমাদেরকে দুনিয়ার অমঙ্গল ও দোষত্রুটি দেখিয়ে দেবে। তিনি তাঁর প্রধান সাহাবীগণসহ ক্ষুধার্ত থাকতেন এবং দুনিয়ার ভোগ-বিলাসের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও উহা হতে দূরে সরে থাকতেন। এখন তোমরা তোমাদের বুদ্ধিমত্তা দ্বারা দেখতে পার, ইহার ফলে আল্লাহ্ মুহাম্মদকে (সঃ) সম্মানিত করেছিলেন নাকি অসম্মানিত করেছিলেন? যদি কেউ বলে আল্লাহ্ তাঁকে অপমানিত করেছিলেন তবে সে নিশ্চয়ই মিথ্যা কথা বলে এবং একটা মহা অসত্যের মাঝে নিজেকে জড়িয়ে নেয়। যদি কেউ বলে আল্লাহ্ তাঁকে সম্মানিত করেছিলেন তবে মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ্ তাদেরকে অপমানিত করেন যাদের প্রতি তিনি দুনিয়াকে প্রসারিত করেন এবং যারা তাঁর নিকটতম হয়েছে তাদের কাছ থেকে দুনিয়াকে সরিয়ে রাখেন।

সুতরাং প্রত্যেকের উচিত আল্লাহ্‌র রাসুলকে অনুসরণ করা, তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলা এবং তাঁর প্রদর্শিত পথে প্রবেশ করা। অন্যথায় সে ধ্বংস হতে নিরাপদ থাকতে পারবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মুহাম্মদকে (সঃ) বিচার দিনের নির্দশন, বেহেশ্‌তের সুসংবাদদাতা ও মহাশাস্তির সতর্ককারী হিসাবে প্রেরণ করেছেন। তিনি ক্ষুধার্ত অবস্থায় এ পৃথিবী ত্যাগ করেছিলেন কিন্তু নিরাপত্তার সাথে পরকালে প্রবেশ করেছিলেন। তিনি পৃথিবী ত্যাগের পূর্ব পর্যন্ত ঘর নির্মাণের জন্য একটি পাথরের ওপর আরেকটি পাথর রাখেননি এবং আল্লাহ্‌র ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন। আল্লাহ্‌র রহমত কত মহান যে, তিনি রহমত স্বরূপ রাসুলকে (সঃ) আমাদের মাঝে দিয়েছেন যাঁকে আমরা অনুসরণ করতে পারি এবং যিনি একজন নেতা যাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমরা চলতে পারি।

আমিরুল মোমেনিনের নিজের উপমা

আল্লাহ্‌র কসম, আমি আমার পিরহানে (শার্ট) এত বেশী তালি লাগিয়েছি যে এখন আমি উহা পরতে লজ্জা বোধ করি। কেউ একজন আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলো আমি এই পিরহান খুলে ফেলবো কিনা। আমি তাকে বলেছিলাম, "আমার কাছ থেকে সরে যাও।" শুধুমাত্র ভোরবেলা মানুষ ইহার সুবিধা অনুধাবন করতে পারে এবং রাতের পথ চলায় ইহার প্রশংসা করে।

★★★★★

খোৎবা-১৬০

রাসুল (সঃ) প্রেরণ প্রসংগে

আল্লাহ্ রাসুলকে (সঃ) সমুজ্জ্বল আলো, সুস্পষ্ট দলিল, উন্মুক্ত পথ ও হেদায়েত সম্বলিত কিতাব সহকারে প্রেরণ করেছিলেন। তাঁর গোত্র ছিল সর্বোৎকৃষ্ট এবং তাঁর সাজারাহ সর্বোত্তম যার শাখাগুলো সুষমতা সম্পন্ন ও যাতে ঝুলন্ত ফল প্রচুর। তাঁর জন্মস্থান মক্কা এবং তাঁর হিজরতের স্থান তায়েবাহ (মদিনা), যেখান থেকে তাঁর সুনাম সুউচ্চতা লাভ করে ও তাঁর কণ্ঠস্বর চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

আল্লাহ্ তাঁকে পর্যাপ্ত ওজর, দৃঢ় প্রত্যয় উৎপাদক বক্তব্য এবং সংশোধনমূলক ঘোষণা সহকারে প্রেরণ করেছিলেন। তাঁর মাধ্যমে সেই পথ প্রকাশ করেছিলেন যা মানুষ পরিত্যাগ করেছিল এবং সেই সব বিদা'ত ধ্বংস করেছিলেন যা মানুষ উদ্ভাবন করেছিল। তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ্ তাঁর আদেশ-নিষেধের বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। এক্ষণে যে কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দ্বীন গ্রহণ করে তার কার্পণ্য সুনিশ্চিত, তার ছড়ি (ভর দেয়ার লাঠি) ভেঙ্গে যাবে, তার ভাগ্য মারাত্মক হবে, তার পরিণাম হবে দীর্ঘস্থায়ী শোক ও কঠিন শাস্তি।

দুনিয়া হতে শিক্ষা গ্রহণ

আমি আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস করি, সে বিশ্বাস তাঁর প্রতি সেজদাবনত হওয়ার। আমি তাঁর হেদায়েত প্রার্থনা করি যা তাঁর জান্নাতের দিকে নিয়ে যায় এবং তাঁর সন্তুষ্টির স্থানে নিয়ে যায়। আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি, হে আল্লাহ্‌র 'বান্দাগণ, তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করে কাজ কর এবং তাঁর অনুগত হও। কারণ ইহা তোমাদের আগামীকালের মুক্তি ও অনন্ত শান্তির উপায়। তিনি তোমাদেরকে সতর্ক (শাস্তি সম্বন্ধে) করেছিলেন এবং বিশদভাবে তা করেছিলেন। তিনি তোমাদেরকে প্ররোচিত করেছিলেন (সৎকাজের প্রতি) এবং সম্পূর্ণরূপে তা করেছিলেন। তিনি দুনিয়ার বর্ণনা করেছেন, ইহা তোমাদের কাছ থেকে যেভাবে কেটে পড়ে, ইহার ধ্বংসাবশেষ ও ইহার হাত বদল সম্বন্ধে বলেছেন। সুতরাং দুনিয়ার আকর্ষণ হতে দূরে সরে থাক। কারণ ইহার কিছুই তোমার সাথী হবে না। এ ঘর (দুনিয়া) আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টির অতি নিকটবর্তী এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি হতে অনেক দূরে।

সুতরাং হে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ, তোমাদের চোখ বন্ধ কর এবং দুনিয়ার আকর্ষণ ও ভাবনা হতে নিজকে মুক্ত রাখ। কারণ ইহা হতে তোমাদের আলাদা হয়ে যেতে হবে, তা তোমরা নিশ্চিতভাবেই জান এবং ইহার পরিবর্তনশীল অবস্থার কথাও জান। তোমরা আন্তরিকতার সাথে দুনিয়াকে ভয় কর এবং তোমাদের পূর্বে যাদের পতন ঘটেছে তাদের থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর। তাদের সকল জোড়া বিনষ্ট হয়ে গেছে, তাদের চোখ ও কান ধ্বংস হয়ে গেছে, তাদের সম্মান ও মর্যাদা উঠে গেছে এবং তাদের আরাম-আয়েশ ও ঐশ্বর্য নিঃশেষ হয়ে গেছে। তাদের সন্তান-সন্ততির নৈকট্য এখন দূরবর্তিতায় পরিণত হয়েছে এবং তাদের স্বামী-স্ত্রীর সঙ্গ বিচ্ছেদে পরিণত হয়েছে। এখন আর তারা একে অপরের ওপর দম্ভোক্তি করে না, সন্তান জন্ম দেয় না, একে অপরের সাথে সাক্ষাত করে না এবং প্রতিবেশী হিসাবে বসবাসও করে না। সুতরাং হে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ, তোমরা সেই ব্যক্তির মত ভয় কর যে আত্মনিয়ন্ত্রিত, যে তার কামনা-বাসানাকে প্রদমিত করতে পারে এবং যে তার প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করতে পারে। নিশ্চয়ই, বিষয়টি তোমরা স্পষ্ট বুঝেছো; ঝান্ডা দন্ডায়মান, উপায় সমতল এবং পথ সোজা।

★★★★★

খোৎবা-১৬১

বনি আসাদ গোত্রের একজন অনুচর আমিরুল মোমেনিনকে জিজ্ঞেস করেছিলো, "এটা কেমন কথা যে, আপনার গোত্র (কুরাইশ) আপনাকে পদমর্যাদা (খেলাফত) হতে বঞ্চিত করেছিল? অথচ উহার জন্য আপনি সর্বাপেক্ষা বাঞ্চিত ব্যক্তি।" প্রত্যুত্তরে আমিরুল মোমেনিন বললেন ঃ

হে বনি আসাদের ভ্রাতা, তোমার জিন আটকানোর বেল্ট ঢিলা এবং তুমি তা উল্টোভাবে লাগিয়েছো। এতদসত্ত্বেও তুমি বৈবাহিক সূত্রে আত্মীয় এবং তোমার জিজ্ঞেস করার অধিকার আছে। যেহেতু তুমি জিজ্ঞেস করেছো, তাই শোন ঃ যদিও আমরা আল্লাহ্‌র রাসুলের সর্বোচ্চ উত্তরাধিকারী এবং সবচাইতে নিকটতম আত্মীয় তবুও খেলাফত বিষয়ে আমরা বেশী অত্যাচারিত। ইহা কতিপয় স্বার্থান্বেষী লোকের কাজ যাতে তাদের হৃদয় লোভাতুর হয়ে পড়েছিল; যদিও কিছু লোক ইহার পরোয়া করেনি। আল্লাহ্ ন্যায় বিচারক এবং বিচার দিনে সকলেই তাঁর কাছে প্রত্যাবর্তন করবে।

এখন[1] সেই ধ্বংসযজ্ঞের কেচ্ছা ছাড় যা নিয়ে চতুর্দিকে হৈ চৈ হচ্ছে।

এখন আবু সুফিয়ানের পুত্রের (মুয়াবিয়া) দিকে তাকাও। কান্নার পর সময় এখন আমাকে হাসাচ্ছে। আশ্চর্য হবার কিছু নেই, আল্লাহ্‌র কসম, তার কর্মকান্ড সকল বিস্ময়কে ছাড়িয়ে গেছে এবং অবৈধতাকে বৃদ্ধি করেছে। এসব লোক আল্লাহ্‌র প্রদীপের আলো-শিখা নিভিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছে এবং তাঁর ঝরণাকে ইহার উৎসস্থলে বন্ধ করে দিতে চেয়েছে। তারা মহামারী উৎপাদক পানি আমার ও তাদের মধ্যে মিশ্রিত করতে চেয়েছিল। যদি পরীক্ষামূলক দুঃখ-দুদর্শা আমাদের কাছ থেকে সরিয়ে নেয়া হতো তাহলে তাদেরকে আমি সত্যবাদিতার পথে নিয়ে যেতে পারতাম। অন্যথায় ঃ

সুতরাং তাদের জন্য আক্ষেপ করে তোমার প্রাণ যেন বিনষ্ট হয়ে না যায়। নিশ্চয় আল্লাহ্ উহা সম্যক জানেন যা তারা করছে (কুরআন - ৩৫:৮)।

১। এ উক্তিটি আরবের কবি ইমরুল কায়েস আল-কিন্দির একটি কবিতার পংক্তি। ইহার পরবর্তী পংক্তিটি হলো ঃ

এবং বাহন উটগুলোর কি হলো সে কেচ্ছা আমাকে জানতে দাও।

এ কবিতার ঘটনা হলো কায়েসের পিতা হুজর যখন নিহত হলো তখন সে পিতার রক্তের বদলা নেয়ার জন্য বিভিন্ন গোত্রের কাছে গিয়েছিল। সে জাদিলা গোত্রের খালিদ ইবনে সাদুসের কাছে এ ব্যাপারে যখন গিয়েছিল তখন সেই গোত্রের বাইছ ইবনে হুওয়াস নামক এক ব্যক্তি তার উটগুলো তাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল। সে তার মেজবানের নিকট নালিশ করেছিল। মেজবান খালিদ বললো যে, উটগুলো ফিরিয়ে আনার জন্য তার উষ্ট্রিগুলো সঙ্গে দিয়ে তাকে পাঠাতে হবে। কায়েস তাই করলো। খালিদ তার গোত্রের লোকদেরকে বললো তারা যেন তার মেহমানের উটগুলো ফেরত দেয়। কায়েস যে খালিদের মেহমান একথা তারা বিশ্বাস করতে চাইলো না। তখন খালিদ কায়েসের উষ্ট্রিগুলো দেখিয়ে শপথ করে বলাতে তারা লুণ্ঠিত উটগুলো ফেরত দিতে রাজী হয়েছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা উটগুলো ফেরত না দিয়ে উষ্ট্রিগুলোকেও তাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল। কায়েস এ সংবাদ পেয়ে কবিতাটি রচনা করেছিল।

আমিরুল মোমেনিন উপমা হিসাবে এ কবিতা উদ্ধৃতি করার উদ্দেশ্য হলো, "এখন মুয়াবিয়া আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত। এখন সেই বিষয়ে কথা বলা যায়। এখন তাদের বিষয় আলোচনা করার সময় নয় যারা আমার অধিকার জবরদখল করে ধ্বংস সাধন করেছে। সে সময় চলে গেছে। এখন শুধু ফেতনার বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োগ করে জাপটা-জাপটি করার সময়। সুতরাং এক্ষণে বিদ্যমান ঘটনাবলী নিয়ে আলোচনা কর, অসময়ের সঙ্গীত এখন বাদ দাও।" আমিরুল মোমমিন এরূপ বলার কারণ হলো লোকটি সিফফিনের যুদ্ধ চলাকালে এ প্রশ্ন করেছিলো।

★★★★★

খোৎবা-১৬২

আল্লাহ্‌র গুণাবলী সম্পর্কে

প্রতিষ্ঠিত প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি মানুষের স্রষ্টা এবং যিনি পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছেন। তিনি প্রস্রবণ সৃষ্টি করেছেন প্রবাহিত হওয়ার জন্য এবং লতা-গুল্ম-বৃক্ষ সৃষ্টি করেছেন উচ্চভূমিতে জন্মাবার জন্য। তাঁর আদিত্বের কোন প্রারম্ভ নেই এবং চিরন্তনতার কোন শেষ নেই। তিনিই প্রথম এবং সর্বকালীন। তিনিই চিরস্থায়ী যাতে কোন সীমা নেই। কপাল তাঁর সামনে আনত হয় (সেজদা করে) এবং ঠোঁট তাঁর একত্ব ঘোষণা করে। তিনি বস্তুনিচয় সৃষ্টি করার সময়েই উহার সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং নিজেকে উহাদের সাদৃশ হতে দূরে সরিয়ে রেখেছেন।

গতিবিধি, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও বোধশক্তির গন্ডিতে কল্পনাশক্তি তাঁকে আন্দাজ করতে পারে না। তাঁর সম্বন্ধে "কখন?" বলা যায় না এবং "পর্যন্ত" বলে তাঁকে কোন সময়সীমার গন্ডিভুক্ত করা যায় না। তাঁকে স্পষ্টত প্রতীয়মান করা যায়, কিন্তু "কোথা হতে" বলা যায় না। তিনি সংগুপ্ত, কিন্তু "কিসের মধ্যে" বলা যায় না। তিনি শরীরী নন যে, মরে যাবেন এবং তিনি আবৃত নন যাতে আবদ্ধ করা যায়। তিনি স্পর্শ দ্বারা বস্তুর নিকটবর্তী নন এবং বিচ্ছেদ দ্বারা বস্তু হতে দূরবর্তী নন।

মানুষের চোখের স্থিরদৃষ্টি, কথার প্রতিধ্বনি, পাহাড়ের মিটমিটে আলো, রাতের গভীর অন্ধকারের পদচারণা— কোন কিছুই তাঁর কাছে গোপন নয়। চন্দ্রকিরণ যেখানে পড়ে, সূর্য রশ্মি যেখান থেকে উদ্ভাসিত হয়, সূর্য যেখানে অস্তমিত ও আবার উদিত হয়, দিবা-রাত্রির পরিবর্তন যেভাবে হয়, সময়ের পরিবর্তন যেভাবে হয়— এসবের কোন কিছুই তাঁর কাছে গুপ্ত নয়।

তিনি সকল সীমা ও পরিসীমা এবং সকল গণনা ও সংখ্যার অতীত। যারা তাঁর প্রতি সীমিত গুণারোপ করে, তাদের ধারণার অনেক অনেক উর্দ্ধে তিনি। পরিমাপের গুণ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থাকা, ঘরে বসবাস করা, কোন স্থানে থাকা— এসব গুণ তাঁর জন্য প্রযোজ্য নয়; কারণ, সীমা-পরিসীমা সৃষ্টির জন্যই নির্ধারিত এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য সব বস্তুতে আরোপ করা যায়।

আল্লাহ্ নঞ হতে উদ্ভাবক

তিনি চিরন্তন বস্তু হতে বা উপস্থিত কোন নমুনা হতে বস্তুনিচয় সৃষ্টি করেননি। তিনি সৃষ্টি করেছিলেন যা সৃষ্টি করতে চেয়েছেন এবং তৎপর উহার সীমা নির্ধারণ করেছেন। তিনি আকৃতি দিয়েছেন যেভাবে আকৃতি দিতে চেয়েছেন এবং তাতে সর্বোৎকৃষ্ট আকৃতি হয়েছে। কোন কিছুই তাঁর অবাধ্য হতে পারে না। কিন্তু কোন কিছু তাঁর বাধ্য হলেও তাঁর কোন উপকার হয় না। অতীতে যারা মরে গেছে তাদের সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান যেরূপ বর্তমানে যারা বেঁচে আছে তাদের সম্পর্কেও তাঁর জ্ঞান একইরূপ। উর্ধাকাশে যা কিছু আছে উহা সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান যেরূপ মাটির নিম্নদেশে যা কিছু আছে উহা সম্পর্কেও তাঁর জ্ঞান একইরূপ।

মানুষ সৃষ্টি সম্পর্কে

হে আল্লাহ্র বান্দাগণ, তোমাদেরকে যথাযথভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং মাতৃগর্ভের অন্ধকারে বহু পর্দার আবরণের মধ্যেও তোমাদেরকে লালন-পালন করা হয়েছে। তোমাদেরকে মৃত্তিকার উপাদান থেকে (কুরআন-২৩:১২) স্থাপন করা হয়েছে সুরক্ষিত আধারে একটা নির্দিষ্টকালের জন্য (কুরআন-৭৭ :২১-২২)। তোমরা মায়ের গর্ভে নড়াচড়া করতে পারতে, কিন্তু না পারতে কোন শব্দ শুনতে আর না পারতে কোন ডাকে সাড়া দিতে।

অতঃপর সেই স্থান থেকে তোমাদেরকে বের করে আনা হয়েছিল এবং এমন স্থানে আনা হয়েছিল যে স্থান তোমরা দেখনি ও তোমরা এ স্থানের উপকার লাভের উপায়ের সঙ্গে পরিচিত ছিলে না। তোমরা তার সঙ্গে পরিচিত ছিলে না, যে মায়ের স্তন থেকে চুষে জীবিকা আহরণের পথ দেখিয়ে দিয়েছিল এবং যখন তোমাদের প্রয়োজন হতো তখন তোমাদের জীবিকার অবস্থান দেখিয়ে দিতো। আহা! যে ব্যক্তি সৃষ্টির এসব গুণাবলী বুঝতে অক্ষম সে স্রষ্টার গুণাবলী বুঝতে আরো অক্ষম। যে ব্যক্তি সৃষ্টির মাধ্যমে স্রষ্টাকে চিনতে পারে না সে স্রষ্টা হতে অনেক দূরবর্তী।

★★★★★

খোৎবা-১৬৩

যখন জনগণ দলবদ্ধ হয়ে আমিরুল মোমেনিনের কাছে গিয়ে উসমানের বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগ জানিয়ে তাদের পক্ষ হতে উসমানের সাথে কথা বলার জন্য অনুরোধ করেছিল তখন তিনি উসমানের কাছে গিয়ে বললেন[১] ঃ

আমার পেছনে অনেক লোক রয়েছে যারা তোমার ও তাদের মধ্যে দূত হিসাবে আমাকে প্রেরণ করেছে। কিন্তু আল্লাহ্‌র কসম, তোমার কাছে কি বলতে হবে তা আমি জানি না। তুমি হয়ত জান না যে, এ ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না এবং যে ব্যাপারে তুমি অবহিত নও সে ব্যাপারে তোমাকে দিক নির্দেশনাও দিতে পারি না। আমরা যা জানি নিশ্চয়ই তা তুমি অবগত আছো। আমরা তোমার কাছ থেকে এমন কোন কিছু জানতে আসিনি যা তোমাকে জিজ্ঞেস করতে পারি। আমরা গোপনে কিছু জানতেও পারিনি যা তোমাকে জানিয়ে দিতে পারি। তুমি যা দেখেছো আমরাও তা-ই দেখেছি; তুমি যা শুনেছো আমরাও তাই শুনেছি। আল্লাহ্‌র রাসুলের সাহাবী হিসাবে তুমি তাঁর কাছে বসেছিলে যেমনটি আমরাও বসেছিলাম। ইবনে আবি কুহাফাহ্ (আবু বকর) ও ইবনে আল-খাত্তাব (উমর) ন্যায়-নিষ্ঠভাবে কাজ করার জন্য তোমার চেয়ে বেশী দায়িত্বপূর্ণ ছিল না। কারণ গোত্র বন্ধনে তুমি তাদের চেয়ে আল্লাহ্‌র রাসুলের নিকটতর এবং তুমি বৈবাহিক সূত্রেও তাঁর আত্মীয় যা তাদের নেই।

কাজেই, নিজের বাতেনে আল্লাহ্‌কে ভয় কর। আল্লাহ্‌র কসম, তোমাকে অন্ধ মনে করে কোন কিছু দেখানো হচ্ছে না এবং অজ্ঞ মনে করে কোন কিছুর প্রশংসা বা মূল্যায়ন করা হচ্ছে না। ইমানের পথ সুস্পষ্ট এবং ইহার ঝান্ডা সুনির্ধারিত। তোমার জানা দরকার যে, আল্লাহ্‌র বান্দাগণের মধ্যে আল্লাহ্‌র কাছে সবচাইতে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত ব্যক্তি হলেন ন্যায়পরায়ণ ইমাম যিনি আল্লাহ্ কর্তৃক পরিচালিত হয়ে অন্যদেরকে পরিচালনা করেন। সুতরাং তিনি রাসুলের স্বীকৃত সুন্নাহ্‌র ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকেন এবং বিদা'ত ধ্বংস করেন। (রাসুলের) পথ সুস্পষ্ট এবং উহার নিদর্শনাবলী রয়েছে। অপরপক্ষে, বিদা'তও সুস্পষ্ট এবং উহারও নিদর্শন আছে। নিশ্চয়ই, আল্লাহ্‌র কাছে নিকৃষ্টতম ব্যক্তি হলো জুলুমবাজ ইমাম যে নিজে বিপথগামী হয়েছে এবং অন্যদেরকেও বিপথগামী করেছে। সে সহীহ সুন্নাহ্ ধ্বংস করে এবং বাতিল বিদা'ত পুনরুজ্জীবিত করে। আমি আল্লাহ্‌র রাসুলকে বলতে শুনেছিলাম, "বিচার দিনে জুলুমবাজ ইমামকে কোন সমর্থক ছাড়া আনা হবে। তার পক্ষে ক্ষমা প্রার্থনা করারও কেউ থাকবে না। তখন তাকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে এবং সে আটা-চাক্কির মত ঘুরতে ঘুরতে দোযখে পড়বে। তৎপর সে একটি গর্তে আটক থাকবে।"

আমি আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে তোমাকে বলছি, তোমার এমন ইমাম হওয়া উচিত হবে না যাকে জনগণ হত্যা করবে। কারণ এটা বলা হয়েছে যে, "এসব লোকের একজন ইমামকে হত্যা করা হবে। ইহার পর হতে বিচার দিন পর্যন্ত হত্যা ও যুদ্ধের পথ তাদের জন্য খোলা হয়ে যাবে এবং সে তাদের ব্যাপারে তালগোল পাকিয়ে তাদের ওপর আপদ ছড়িয়ে দেবে। ফলে তারা সত্যকে মিথ্যা হতে পৃথক করতে পারবে না। তারা তরঙ্গের মত দুলতে থাকবে এবং চরমভাবে বিপথে পরিচালিত হবে।" মারওয়ানের বাহন হিসাবে আচরণ করো না, যাতে সে তোমার জ্যেষ্ঠতা উপেক্ষা করে যে দিকে ইচ্ছা তোমাকে টেনে নিয়ে যেতে পারে।

অতঃপর উসমান আমিরুল মোমেনিনকে বললেন, "জনগণের দুঃখ-দুর্দশা উপশম করার পূর্ব পর্যন্ত আমাকে সময় দিতে তাদেরকে বল।" আমিরুল মোমেনিন বললেন, "মদিনার জনগণের বিষয়ে সময়ের প্রশ্ন ওঠে না। দূরবর্তী এলাকার জনগণের বিষয়ে তোমার আদেশ তথায় পৌছা পর্যন্ত তুমি সময় পেতে পার।"

১। উসমানের খেলাফতকালে সরকার ও ইহার কর্মচারীদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে বিভিন্ন এলাকার জনগণ মদিনায় জড়ো হয়েছিল। তারা রাসুলের (সঃ) জ্যেষ্ঠ সাহাবীদের নিকট নালিশ জানানোর উদ্দেশ্যেই মদিনায় একত্রিত হয়েছিল। তারা শান্তিপূর্ণভাবে আমিরুল মোমেনিনের কাছে এসে তাঁকে অনুরোধ করেছিল যেন তিনি উসমানের কাছে যান এবং

মুসলিমদের অধিকার পদদলিত করে তাদেরকে বিপদগ্রস্থ ও ধ্বংস করা হতে নিবৃত্ত হওয়ার জন্য উসমানকে উপদেশ প্রদান করেন। এতে তিনি উসমানের কাছে গিয়ে উপর্যুক্ত বক্তব্য রাখেন।

আমিরুল মোমেনিন তাঁর উপদেশাবলীর তিক্ততা রুচিকর করার জন্য কিছুটা প্রশংসাসূচক বক্তব্যের পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন। সেই কারণে রাসুলের সাহাবী হওয়া, ব্যক্তিগত মর্যাদা, রাসুলের আত্মীয় হওয়া, অন্য দু'জন খলিফা অপেক্ষা দায়িত্বপূর্ণ হওয়া— এসব উক্তি করেছেন। যেহেতু বক্তৃতা হতে বুঝা যায় উসমান অন্যায় ও বিদা'তে লিপ্ত ছিল সেহেতু আমিরুল মোমেনিনের এসব উক্তির কারণ হলো উসমানকে তার কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধে সজাগ করে দেয়া— এটা নিছক প্রশংসাত্মক নয়। উপরন্তু এটা দৌত্য কর্মের একটা কৌশলও বটে। প্রথম হতেই উসমান যা করেছিলেন তা তিনি ইচ্ছাকৃতভাবেই করেছিলেন। তার অজানা কিছু ছিল না এবং তাকে না জানিয়ে কোন কিছুই করা হয়নি। সেই কারণে তাকে জবাবদিহি করতে হবে না— একথা বলা যায় না। তিনি এমন এক পথ অবলম্বন করেছিলেন যা সমগ্র ইসলামিক বিশ্বে হৈ চৈ সৃষ্টি করেছিলো। এসব কর্মকান্ড নিশ্চয়ই সুন্নাহ্ বিরোধী ছিল। কোন লোক যদি রাস্তার চড়াই-উতরাই না জানে এবং সে রাতের অন্ধকারে হোঁচট খায় তবে তাকে ততটুকু দোষারোপ করা যায় না যতটুকু দোষারোপ করা যায় সেই ব্যক্তিকে যে রাস্তার চড়াই-উতরাই জানা সত্ত্বেও দিনের আলোতে হোঁচট খায়। সেক্ষেত্রে দিনের আলোতে হোঁচট খাওয়া লোকটিকে যদি কেউ বলে যে, আপনার চোখ দু'টোর দৃষ্টিশক্তি খুবই ভাল, আপনি একজন সুস্থ-সবল যুবক তাহলে যেমন লোকটির প্রশংসা করা হয় না, তদ্রুপ আমিরুল মোমেনিনের উক্তিও প্রশংসাত্মক নয়— প্রকারান্তরে বিদ্রূপাত্মক।

সচরাচর রাসুলের (সঃ) জামাতা হিসাবে উসমানের বিশেষ মর্যাদা তুলে ধরা হয়। রাসুল (সঃ) তাঁর কন্যা রুকাইয়া ও উম্মে কুলসুমকে একের পর এক উসমানের নিকট বিয়ে দিয়েছিলেন। সেজন্য কোন কোন অতি উৎসাহী লেখক উসমানকে 'জুন্নেরাইন' (দুই নূরের মালিক) উপাধিতেও ভূষিত করেছে। প্রকৃতপক্ষে উসমানের এদু'টি বিয়ের ফলে তিনি কোন বিশিষ্টতা লাভ করেছিলেন কিনা তা ইতিহাসের আলোকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা দরকার। ইতিহাসে দেখা যায় রুকাইয়া ও উম্মে কুলসুমের প্রথম স্বামী উসমান নন। নবুয়ত প্রকাশের পূর্বে আবু লাহাবের পুত্র উৎবাহ্র সাথে রুকাইয়ার ও উতায়বাহ্র সাথে উম্মে কুলসুমের বিয়ে হয়েছিল। ইতিহাসে বা রাসুলের জীবনে এ কন্যা দু'টির এমন কোন গুরুত্ব নেই যে জন্য এদের বিয়ে করার কারণে কেউ বিশেষ কোন মর্যাদার অধিকারী হতে পারে। নবুয়ত প্রকাশের পূর্বে যেহেতু মোশরেকের সাথে কন্যা বিয়ে দেয়া অবৈধ ছিল না সেহেতু নবুয়ত প্রকাশের পর উসমানের সাথে এদের বিয়ে দেয়া তার ইসলাম গ্রহণের প্রমাণ বহন করে। অবশ্য এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, উসমান কালিমা শাহাদত উচ্চারণ করে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তদুপরি রুকাইয়া ও উম্মে কুলসুম রাসুলের (সঃ) ঔরসজাত কন্যা নয় বলেও ইতিহাসে যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। কেউ কেউ লিখেছেন এরা খাদিজার ভগ্নি হালাহ্র কন্যা আবার কেউ কেউ লিখেছেন এরা খাদিজার প্রাক্তন স্বামীর ঔরসজাত কন্যা। কুফী [৫১] (পৃঃ ৬৯) লিখেছেন ঃ

> *আল্লাহ্র রাসুল (সঃ) খাদিজাকে বিয়ে করার কিছু দিন পর খাদিজার ভগ্নি হালাহ্ দু'টি কন্যা সন্তান রেখে মারা যায়। তাদের একজনের নাম জয়নব ও অন্যজনের নাম রুকাইয়া এবং তারা উভয়েই রাসুল (সঃ) ও খাদিজা কর্তৃক তাঁদের গৃহে লালিত-পালিত হয়। প্রাক-ইসলামী যুগে প্রথা ছিল যে, কেউ কোন সন্তান লালন-পালন করলে তার নামেই সেই সন্তানের পরিচিতি হবে।*

হযরত খাদিজার সন্তান সম্বন্ধে হিশাম [১৬৯] (৪র্থ খন্ড, পৃঃ ২৯৩) লিখেছেন ঃ

> *রাসুলের (সঃ) সাথে বিয়ে হবার আগে আবি হালাহ্ ইবনে মালিক নামক এক ব্যক্তির সাথে খাদিজার বিয়ে হয়েছিল এবং তার ঔরসে খাদিজা দু'টি সন্তান প্রসব করেছিলেন। তাদের একজনের নাম হিন্দ ইবনে আবি হালাহ্ ও অপরজন জয়নব বিনতে আবি হালাহ্। আবি হালাহ্র সাথে বিয়ে হবার আগেও উতায়ইক ইবনে আবিদ ইবনে আবদিল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে মখজুম নামক আরেক ব্যক্তির সাথে খাদিজার বিয়ে হয়েছিল এবং তার ঔরসে তিনি আবদুল্লাহ্ নামক একটি পুত্র সন্তান ও একটি কন্যা সন্তান প্রসব করেছিলেন।*

এতে দেখা যায় যে, রাসুলের (সঃ) সাথে বিয়ে হবার পূর্বেও হযরত খাদিজার দু'টি কন্যা সন্তান ছিল। পিতৃহীন এ কন্যাদ্বয় যেহেতু রাসুলের (সঃ) ও খাদিজার ঘরে লালিত-পালিত সেহেতু এদেরকে সকলেই রাসুলের কন্যা বলে জানতো এবং যাদের কাছে এদের বিয়ে দেয়া হয়েছিল তাদেরকে রাসুলের জামাতা মনে করতো। রাসুলের (সঃ) জামাতা হিসাবে

উসমানকে বিশেষ মর্যাদা দেয়ার আগে বুখারী ও অন্যান্য হাদীসবেত্তাগণ এবং ঐতিহাসিকগণ বর্ণিত একটি হাদীসের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা দরকার। হাদীসটি নিম্নরূপ ঃ

> *আনাস ইবনে মালিক বর্ণনা করেন, "রাসুলের কন্যা উম্মে কুলসুমের দাফন অনুষ্ঠানে আমরা উপস্থিত ছিলাম। রাসুল (সঃ) কবরের পাশেই বসেছিলেন। আমি দেখলাম তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তেছিল। হঠাৎ তিনি বললেন, 'তোমাদের মধ্যে এমন কেউ কি আছে যে গতরাতে পাপ করেনি? আবু তালহা (জায়েদ ইবনে শহল আল-আনসারী) বললো, 'আমি আছি।' তখন রাসুল (সঃ) বললেন, 'তা হলে তুমি কবরে নামো।' ফলে সে কবরে নেমেছিলো।"*

টীকাকারকগণের প্রায় সকলেই "পাপ করা" শব্দটি দ্বারা রাসুল (সঃ) যৌন ক্রিয়া বুঝিয়েছেন বলে মন্তব্য করেছে। একথা বলে রাসুল (সঃ) উসমানের ব্যক্তিগত জীবন উন্মোচন করতে এবং তাকে কবরে নামা হতে বারিত করতে চেয়েছেন। অবশ্য কারো ব্যক্তিগত জীবন প্রকাশ্যে বলে কাউকে হেয় করা রাসুলের নীতি বিরুদ্ধ ছিল এবং অনেকের অনেক দোষ-ত্রুটি জানা সত্ত্বেও তিনি তা উপেক্ষা করতেন। কিন্তু এক্ষেত্রে উসমানের আচরণ এত নোংরা ছিল যে, উহা জনসমক্ষে তুলে ধরার প্রয়োজনীয়তা তিনি অনুভব করেছিলেন। যেহেতু উসমান তার স্ত্রী উম্মে কুলসুমের মৃত্যুর প্রতি কোন প্রকার সম্মান প্রদর্শন করেনি, শোক প্রকাশ করেনি এবং রাসুলের সাথে তার আত্মীয়তার রশি ছিন্ন হবার জন্য দুঃখ প্রকাশ না করে রাসুলের কন্যার মৃত লাশ ঘরে রেখে অন্য স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছিল সেহেতু তার এহেন নোংরা স্বভাব প্রকাশ করে দেয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল এবং কবরে নামা হতে বঞ্চিত করে জামাতা হবার অধিকার ও সম্মান হতে তাকে বঞ্চিত করা হয়েছিল (বুখারী[১০২], ২য় খন্ড, পৃঃ ১০০-১০১ ও ১১৪; হাম্বল[১৬০], ৩য় খন্ড, পৃঃ ১২৬, ২২৮, ২২৯ ও ২৭০; নায়সাবুরী[৮৪], ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ৪৭; শাফেয়ী[১২৫], ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ৫৩; সাদ[১৩৭], ৮ম খন্ড, পৃঃ ২৬; সুহায়লী[১৪৮], ২য় খন্ড, পৃঃ ১০৭; হাজর[১৫০], ৪র্থ খন্ড, পৃ ৪৮৯; আসকালানী[২২], ৩য় খন্ড পৃঃ ১২২; হানাফী[১৫৫], ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ৮৫; আছীর[৪], ৩য় খন্ড, পৃঃ ২৭৬; মন্‌জুর[১০৪], ৯ম খন্ড, পৃঃ ২৮০-২৮১; জাবিদী[৬৪], ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃ ঃ ২২০)।

★★★★★

খোৎবা-১৬৪

ময়ূর ও পাখীর বিস্ময়কর সৃষ্টি সম্পর্কে

জীবিত, জীবন বিহীন, স্থির ও চলমান অনেক বিস্ময়কর প্রাণী ও বস্তু আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন। তিনি তাঁর সূক্ষ্ম সৃষ্টি ক্ষমতা ও কুদরতের এমন সুস্পষ্ট প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করেছেন যাতে মানুষের মন উহার স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁর প্রতি ঝুঁকে পড়ে ও তাঁর আনুগত্য করে এবং তাঁর একত্বের সুর যেন আমাদের কানে বাজে। তিনি বিভিন্ন আকৃতির পাখী সৃষ্টি করেছেন। উহার কোনটি মাটি খুড়ে গর্ত করে বাস করে, কোনটি খোলা জায়গায় বাস করে এবং কোনটি পর্বতের চূড়ায় বাস করে।

উহাদের বিভিন্ন প্রকারের পাখা ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে। আল্লাহ্‌র কর্তৃত্বের রশি দ্বারা উহারা নিয়ন্ত্রিত। উহারা পাখা ঝাপটিয়ে খোলা আকাশে দ্রুত উড়ে বেড়ায়। এক অদ্ভুত আকৃতিতে তিনি উহাদেরকে অনস্তিত্ব হতে অস্তিত্বে এনেছেন এবং অস্থি ও গ্রন্থি মাংশাবৃত করে তৈরী করেছেন। এদের কতেককে ভারী দেহের কারণে সহজে উড়ে বেড়ানো হতে বিরত করেছেন এবং পাখা ব্যবহার করে মাটি হতে অল্প উপরে চলার অনুমতি দিয়েছেন। তিনি তাঁর কুদরত ও সৌন্দর্যপূর্ণ সৃষ্টি ক্ষমতা দ্বারা এদেরকে বিভিন্ন রঙের সৃষ্টি করেছেন। এদের মধ্যে কোন একটির বর্ণের ওপর অন্য বর্ণের আভা থাকলে তা অন্য কোনটির সাথে মিলবে না। কোন কোনটির আবার এক রঙের আভা থাকে এবং উহাদের গলায় বিভিন্ন রঙের রিং করা থাকে যা দেহের রঙ হতে সম্পূর্ণ আলাদা।

ময়ূর সম্পর্কে

পাখীর মধ্যে ময়ূর হচ্ছে বিস্ময়কর সৃষ্টি যা আল্লাহ্ অতি প্রতিসম মাত্রায় সৃষ্টি করেছেন এবং ইহার রঙ সুন্দরভাবে পাখায় ও লম্বা লেজে সমাবেশিত করেছেন। ময়ূর যখন ময়ূরীর কাছে যায় তখন ময়ূরী লেজ উত্তোলন করে এমনভাবে ছড়িয়ে দেয় মনে হয় যেন ময়ূরের মাথায় ছায়া দিচ্ছে। এ সময় লেজ দেখলে মনে হয় নৌকায় পাল তোলা হয়েছে। ইহারা নিজের রঙের জন্য গর্ববোধ করে এবং সদম্ভে চলাফেরা করে। ইহারা মোরগের মত যৌনসঙ্গমে মিলিত হয়। কামুক সুঠামদেহী মানুষের মত ইহা (ময়ূরীকে) ঝাঁপটে ধরে।

আমি যা বলছি তা আমার পর্যবেক্ষণ থেকে বলছি। অন্যের বর্ণনা করা বিষয় বলি না।' যেমন অনেকে বলে থাকে ময়ূরের চোখের পানি ময়ূরী খেয়ে ফেলে এবং তাতে ময়ূরী ডিম পাড়ে। প্রকৃতপক্ষে ময়ূর মোরগের মতই প্রজনন ক্রিয়া করে। ইহার পালকগুলো যেন রৌপ্যের তৈরী ছবির মত এবং তাতে রয়েছে বিস্ময়কর বৃত্ত ও সূর্যাকৃতি পালক যা বিশুদ্ধ স্বর্ণ ও সবুজ পান্নার মত দেখায়। এটাকে যদি মাটিতে জন্মানো কোন কিছুর সাথে তুলনা করতে হয় তবে বলতে হবে বসন্তের একগুচ্ছ ফুল; যদি কাপড়ের সঙ্গে তুলনা করতে হয় তবে বলতে হবে ইয়েমেনে তৈরী চিত্র বিচিত্র ছাপযুক্ত রেশমী কাপড় এবং যদি অলঙ্কারের সাথে তুলনা করতে হয় তবে বলতে হবে বিভিন্ন রঙের রত্ন খচিত অলঙ্কার যাতে রৌপ্যের বোতাম খচিত।

ময়ূর সদর্পে চলাফেরা করে, ইহার লেজ ও পাখা ছড়িয়ে দেয় এবং ইহার পোষাকের সৌন্দর্যের প্রশংসায় ও রত্নখচিত গলার হারের রঙে হেসে ওঠে, নাচতে থাকে। কিন্তু যখন নিজের পায়ের দিকে তাকায় তখন শোক দুঃখ ও ক্ষোভ প্রকাশক শব্দে কেঁদে ওঠে। কারণ ইহার পাগুলো কুৎসিত, ইন্দো-পারস্য সঙ্কর জাতের মোরগের মত। ইহার জঙ্ঘার শেষভাগে একটা সরু কাঁটা আছে এবং ইহার মাথার মুকুটে একগুচ্ছ সবুজ রঙের কির্মীরিত পালক আছে। ইহার গলা পান-পাত্রের আকৃতির মত এবং পেট পর্যন্ত বিস্তৃতি ইয়েমেনের চুলের কলপের রঙের মত। ইহার কানের পাশে একটা উজ্জ্বল রেখা আছে যা ডেইজি ফুলের রঙের মত এবং কলমের অগ্রভাগের মত সরু। এমন কোন রঙ নেই যার কিছু না কিছু ময়ূরের গায়ে নেই।

ময়ূরের এ সুন্দর পালক ঝরে পড়ে যায়। তখন মনে হয় এরা পোষাক খুলে ফেলেছে। পুচ্ছগুলি ঝরে গিয়ে গাছের পাতার মত পুনরায় গজায়। পালক ঝরে গিয়ে নতুন পালক গজানোর ফলে কোন রঙের পরিবর্তন হয় না বা যে রঙ যেখানে ছিল ঠিক সেখানে তা থাকে। বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা বা ভাষা দ্বারা এহেন একটি সৃষ্টির বর্ণনা করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। চোখের সামনে রাখা সৃষ্টির রূপ বৈচিত্র্য ও গুণাবলী সম্পূর্ণ বর্ণনা করার জন্য মহিমান্বিত আল্লাহ্ মানুষের ভাষা ও বুদ্ধিমত্তাকে অক্ষম করেছেন।

স্রষ্টার ক্ষুদ্র সৃষ্টিতেও চমৎকারিত্ব

তিনিই মহিমান্বিত আল্লাহ্ যিনি ক্ষুদ্র পিপীলিকা ও ছারপোকাকে পা দিয়েছেন। আবার সরীসৃপ এবং হস্তিকেও পা দিয়েছেন। তিনি ইহা বাধ্যতামূলক করেছেন যে, রূহ সঞ্চার না করলে কোন প্রকার কঙ্কাল নড়াচড়া করতে পারবে না এবং মৃত্যু উহার প্রতিশ্রুত স্থান ও ধ্বংস উহার চূড়ান্ত পরিণতি।

জান্নাতের বর্ণনা

জান্নাতের যে বর্ণনা তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে তৎপ্রতি যদি তোমরা তোমাদের মনের চোখ দিয়ে একবার দৃষ্টিপাত কর তাহলে তোমরা এ দুনিয়ার যা কিছু সৌন্দর্য দেখছো উহাকে ঘৃণা করতে শুরু করবে। দুনিয়ার কামনা-বাসনা, ইহার আনন্দ উপভোগ, ইহার চাকচিক্য ও সৌন্দর্য—এসব কিছুকে তোমরা ঘৃণা করবে। জান্নাতের স্রোতস্বিনীর পাড়ে গাছের মরমর শব্দে তোমরা নিজেদেরকে হারিয়ে ফেলবে। গাছের ডালে সুশোভিত ফুল ও ফল দেখে তোমরা মোহিত হয়ে পড়বে। এসব ফল পাড়তে কোন কষ্ট হয় না; পাওয়ার ইচ্ছা হলেই ফল তোমাদের কাছে চলে আসবে। বিশুদ্ধ মধু ও উত্তেজক মদ তাদের চারপাশে থাকবে যারা সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করবে।

তারা সেসব লোক সম্মান যাদেরকে চিরস্থায়ী বাসস্থানে যাবার পূর্ব পর্যন্ত অনুসরণ করে এবং ভ্রমণের কষ্টের পর তারা সেখানে বিশ্রাম গ্রহণ করে। হে শ্রোতৃমন্ডলী, এসব বিস্ময়কর দৃশ্য দেখার জন্য যদি তোমরা ব্যস্ত হও তবে নিশ্চয়ই আগ্রহের কারণে তোমাদের হৃদয় মরে যাবে এবং আমার সম্মুখ থেকে উঠে সরাসরি তাদের সঙ্গী হবার প্রস্তুতি নিতে যারা কবরে আছে। আল্লাহ্ তার অসীম দয়া দ্বারা আমাদের ও তোমাদের হৃদয়ে জান্নাতে বসবাসের লালসা জাগরুক করুন।

★★★★★

খোৎবা-১৬৫

উমাইয়াদের স্বৈরশাসন ও অত্যাচার সম্পর্কে

তোমাদের মধ্যে যারা বয়ঃকনিষ্ঠ তারা বয়ঃজ্যেষ্ঠদের অনুসরণ করবে এবং বয়ঃজ্যেষ্ঠগণ কনিষ্ঠগণের প্রতি সদয় আচরণ করবে। জাহেলিয়া যুগের রূঢ় লোকদের মত হয়ো না যারা দ্বীনের চর্চা করেনি এবং আল্লাহ্র ব্যাপারে তাদের বুদ্ধিমত্তা কাজে লাগায়নি। তাদের নিয়ে বিপজ্জনক পাখীর বাসায় ডিম ভেঙ্গে দেয়ার অবস্থা দাঁড়িয়েছে। কারণ ডিম ভাঙ্গার কাজ দেখতে খারাপ দেখায়। আবার না ভাঙ্গা মানেই হলো বিপদজনক পাখীর সংখ্যা বেড়ে যাওয়া।

তাদের ঐক্যের পর তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হবে এবং তারা তাদের কেন্দ্র হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে ছড়িয়ে পড়বে। তাদের কতেক লোক শাখার সঙ্গে লেগে থাকবে এবং শাখা নুয়ে পড়লে তারাও নুয়ে পড়বে। মহিমান্বিত আল্লাহ্ যেদিন তাদেরকে শরতের ছড়ানো ছিটানো মেঘের মত একত্রিত করবে সেদিনটি উমাইয়াদের জন্য বড়ই দুর্ভাগ্যজনক হবে। আল্লাহ্ তাদের মধ্যে মায়া-মমতার সঞ্চার করবেন। তৎপর তিনি তাদেরকে একটা শক্তিশালী জনগোষ্ঠিতে পরিণত করবেন। অতঃপর তিনি তাদেরকে তাদের যাত্রাস্থল হতে প্রবাহিত হবার জন্য দরজা খুলে দেবেন যেভাবে বন্যা প্রবাহিত হয়েছিল সাবার দু'টি বাগান থেকে, যে প্রবাহ থেকে উচু পর্বত ও ছোট পাহাড় কিছুই রক্ষা পায়নি এবং পাহাড়, পর্বত, উচু ভূমি কোন কিছুই সেই প্রবাহ থামিয়ে দিতে পারেনি। আল্লাহ্ তাদেরকে উপত্যকার নীচু ভূমিতে ছড়িয়ে দেবেন এবং তিনি তাদেরকে স্রোতের মত সারা পৃথিবীতে প্রবাহিত করবেন। তিনি তাদের মাধ্যমে একজনের অধিকার অন্যজনকে দিয়ে হরণ করাবেন এবং একজনের ঘরে অন্যজনকে বসবাসের ব্যবস্থা করাবেন। আল্লাহ্র কসম, তাদের সকল মর্যাদা, সুনাম ও প্রতিপত্তি এমনভাবে গলে যাবে যেভাবে আগুনে চর্বি গলে যায়।

হে জনমন্ডলী, যদি তোমরা সত্যকে সমর্থন দেয়া কৌশলে এড়িয়ে না যেতে এবং অন্যায়কে ধ্বংস করতে দুর্বলতা অনুভব না করতে তাহলে যারা তোমাদের সমকক্ষ ছিল না তাদের লক্ষ্যস্থলে তোমরা পরিণত হতে না এবং যারা তোমাদেরকে পরাভূত করেছিল তারা তা করতে পারতো না। কিন্তু বনি ইসরাইলের মত তোমরা (অবাধ্যতার) মরুভূমিতে ঘুরে বেড়িয়েছিলে। আমার জীবনের শপথ করে বলছি যে, আমার পরে তোমাদের দুঃখ-দুর্দশা বহুগুণ বেড়ে যাবে। কারণ তোমরা সত্যকে পরিত্যাগ করবে, আপনজনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে এবং দূরবর্তীগণের সাথে আত্মীয়ের সম্পর্ক স্থাপন করবে। জেনে রাখো, যে ব্যক্তি তোমাদেরকে হেদায়েতের দিকে আহবান করতেছিলো তোমরা যদি তাঁকে অনুসরণ করতে তবে তিনি তোমাদেরকে রাসুলের (সঃ) পথে নিয়ে যেতেন। তাতে তোমরা গোমরাহীর বিপদ হতে রক্ষা পেতে এবং সেক্ষেত্রে তোমাদের ঘাড় হতে অন্যায়ের বোঝা নামিয়ে ফেলতে পারতে।

★★★★★

খোৎবা-১৬৬

দায়িত্ব ও কর্তব্য পরিপূরণের জন্য খেলাফতের প্রারম্ভে প্রদত্ত ভাষণ

মহিমান্বিত আল্লাহ্ একটি হেদায়েতপূর্ণ কিতাব প্রেরণ করেছেন যাতে পাপ ও পূণ্য এবং ন্যায় ও অন্যায়ের বিশদ ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। তোমরা দ্বীনের পথ অবলম্বন করবে, তাতে হেদায়েত লাভ করতে পারবে এবং পাপের পথ হতে দূরে সরে থাকবে যাতে তোমরা ন্যায় পথে থাকতে পার। তোমাদের দায়িত্বের কথা স্মরণ কর, দায়িত্বের কথা মনে কর। আল্লাহ্র জন্য সেসব দায়িত্ব পরিপূর্ণ কর এবং উহাই তোমাদেরকে জান্নাতে নিয়ে যাবে। নিশ্চয়ই, আল্লাহ্ সেসব বস্তু হারাম করেছেন যা অজানা নয় এবং সেসব বস্তু হালাল করেছেন যাতে কোন ত্রুটি নেই। তিনি ঘোষণা করেছেন মুসলিমকে সম্মান দেখানোই সেরা সম্মান। মুসলিমদের অধিকারকে তিনি তাঁর নিজের ও তাঁর একত্বের প্রতি অনুরাগের সমতুল্য গুরুত্ব প্রদান করেছেন। সুতরাং সত্যের ব্যাপার ছাড়া অন্য যে কোন বিষয়ে যে ব্যক্তির জিহ্বা ও হাত হতে অন্য মুসলিম নিরাপদ প্রকৃত অর্থে তিনিই মুসলিম। ফলে একান্ত বাধ্যতামূলক না হলে কোন মুসলিমকে উৎপীড়ন করা বৈধ নয়।

প্রত্যেকের জন্য যে ব্যাপারটি সাধারণ উহার প্রতি খেয়াল কর এবং এটা হচ্ছে মৃত্যু। নিশ্চয়ই, যারা তোমাদের পূর্বে চলে গেছে তাদের সে ক্ষণটি তোমাদেরকে পেছন হতে তাড়া করছে। নিজেকে হালকা রাখ যেন তোমরা তাদের নাগাল ধরতে পার। তোমাদের অতীতকে ভবিষ্যতের জন্য অপেক্ষা করানো হচ্ছে। আল্লাহ্কে তাঁর বান্দা ও তাঁর নগরীর জন্য ভয় কর। কারণ, ভূমি ও পশু সম্বন্ধেও তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে। আল্লাহ্র অনুগত হও এবং তাঁর অবাধ্য হয়ো না। যখনই ন্যায় দেখ তখনই উহা গ্রহণ করো এবং যখনই পাপ দেখ তখনি উহা পরিহার করো।

★★★★★

খোৎবা-১৬৭

আমিরুল মোমেনিনের হাতে বায়াত গ্রহণের পর রাসুলের কতিপয় সাহাবী বললেন, "যারা উসমানকে হত্যা করেছে তাদেরকে শাস্তি দেয়া উচিত।" এতে আমিরুল মোমেনিন বললেন ঃ

হে ভ্রাতৃবৃন্দ, তোমরা যা জান সে বিষয়ে আমি অজ্ঞ নই। কিন্তু যারা উসমানকে হত্যা করেছে তারা ক্ষমতার উচ্চ শিখরে বসে আছে; তাদেরকে শাস্তি দেয়ার শক্তি আমি কোথায় পাব। তাদের সৈন্য-সামন্ত ও সুযোগ-সুবিধা আমাদের চেয়ে অনেক বেশী। তারা এখন এমন অবস্থানে আছে যে, তোমাদের ক্রীতদাস ও আরব বেদুঈনগণ তাদের সাথে যোগ দিয়েছে। তারা এখন তোমাদের মাঝেই রয়েছে এবং যেমন খুশী তোমাদের ক্ষতিসাধন করে চলছে। তোমরা যে লক্ষ্য স্থির করেছো তা অর্জনের উপায় কি তোমরা আমাকে বলে দিতে পার?

এ দাবি নিশ্চয়ই জাহেলিয়া যুগের এবং এ সমস্ত লোকের পেছনে অনেকের সমর্থন রয়েছে। আমরা এ ব্যাপারটি এখন হাতে নিলে মানুষ এ বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করবে। তোমরা যা ভাবছো একদল তা-ই ভাববে কিন্তু অন্যদল তোমাদের সঙ্গে একমত হবে না। আবার অন্যদল হবে যারা এদিকও ভাববে না ওদিকও ভাববে না।

জনগণ শান্ত হওয়া ও তাদের হৃদয়ে স্থিরতা ফিরে আসা পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ কর। তাতে অধিকার আদায় করা মানুষের জন্য সহজ হবে। আমার প্রতি আস্থা রাখ এবং দেখ আমি তোমাদের জন্য কি করতে পারি। এমন কিছু এখন করো না যা তোমাদের ক্ষমতাকে ভেঙ্গে চুরমার করে দেবে, তোমাদের শক্তিকে দুর্বল করে দেবে এবং যা তোমাদের মনোবল ও সম্মান ক্ষুন্ন করবে। এ ব্যাপারটা আমি যতটুকু সম্ভব নিয়ন্ত্রণ করবো এবং প্রয়োজনে শেষ চিকিৎসা হিসাবে উত্তপ্ত লোহার ছেঁকা দ্বারা (যুদ্ধের মাধ্যমে) ফয়সালা করবো।

★★★★★

খোৎবা-১৬৮

জামালের যুদ্ধের জন্য জনগণ যখন বসরা অভিমুখে যাত্রা করেছিলো তখন আমিরুল মোমেনিন বলেন ঃ

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, মহিমান্বিত আল্লাহ্ একটি বাগ্মী কিতাব ও একটি স্থায়ী আদেশসহ রাসুলকে (সঃ) পথ প্রদর্শক হিসাবে প্রেরণ করেছেন। নিজেকে নিজে ধ্বংসকারী ছাড়া ইহা দ্বারা আর কেউ ধ্বংস হবে না। নিশ্চয়ই, বিদা'ত ধ্বংসের কারণ যদি না তা হতে আল্লাহ্ রক্ষা করেন। তোমাদের কর্মকান্ডের নিরাপত্তা আল্লাহ্র কর্তৃত্বের মধ্যে নিহিত। সুতরাং তাঁর এমন আনুগত্য কর যা হবে দোষ-ত্রুটিমুক্ত ও গভীরভাবে আন্তরিক। আল্লাহ্র কসম, তোমরা দোষ-ত্রুটি মুক্ত আন্তরিক আনুগত্য স্বীকার না করলে আল্লাহ্ তোমাদের কাছ থেকে ইসলামের শক্তি কেড়ে নিয়ে যাবেন এবং আর কোন দিন তা ফিরিয়ে না দিয়ে অন্যের ওপর উহা অর্পণ করবেন।

নিশ্চয়ই, এসব লোক আমার কর্তৃত্ব অস্বীকার করতে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। আমি তোমাদের মধ্যে অনৈক্য দেখা পর্যন্ত সহ্য করে যাব। কারণ তাদের অসার ও অযৌক্তিক মতের ফলেও যদি তারা কৃতকার্য হয় তবে সমগ্র মুসলিম সংগঠন ভেঙ্গে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে। তারা ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে দুনিয়ার প্রতি লালায়িত হয়ে পড়েছে। তারা এমন একজনকে ক্ষমতাচ্যুত করতে চায় যাকে আল্লাহ্ উহা দান করেছেন। সুতরাং তারা সকল বিষয়কে তাদের অতীতে (জাহেলি যুগে) ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায়। অপরপক্ষে, তোমাদের খাতিরে মহিমান্বিত আল্লাহ্র কিতাবকে (কুরআন) মেনে চলা আমাদের জন্য বাধ্যতামূলক। আল্লাহ্র রাসুলের (সঃ) আচরণ বিধি, আল্লাহর অধিকার রক্ষা করা ও সুন্নাহ্ পুনরুজ্জীবিত করে উহা কায়েম রাখাও আমাদের জন্য বাধ্যতামূলক।

★★★★★

খোৎবা-১৬৯

আমিরুল মোমেনিন যখন বসরায় পৌঁছলেন তখন একজন আরব তাঁর কাছে এসে বললো, "আমি বসরার একটি দলের প্রতিনিধি হিসাবে আপনার ও জামালের লোকদের অবস্থান সম্পর্কে জানতে এসেছি।" আমিরুল মোমেনিন তাদের সাথে তাঁর অবস্থানের বিষয় ব্যাখ্যা করে লোকটিকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। এতে লোকটি বললো, "আপনি সত্য ও ন্যায় পথে আছেন।" আমিরুল মোমেনিন তাকে বায়াত

গ্রহণ করতে বললেন। প্রত্যুত্তরে লোকটি বললো" আমি শুধুমাত্র একজন বার্তাবাহক হিসাবে এখানে এসেছি। আমার লোকদের কাছে ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত এ বিষয়ে আমি কিছু বলতে পারবো না।" তার কথা শুনে আমিরুল মোমেনিন বললেন ঃ

তোমার পেছনে যেসব লোক রয়েছে তারা যদি তোমাকে তাদের জন্য একটা বৃষ্টি-বিধৌত এলাকা খুঁজে বের করতে প্রেরণ করে এবং তুমি তাদের কাছে ফিরে গিয়ে সবুজ-শ্যামলীমাপূর্ণ ও জলসমৃদ্ধ কোন জায়গার সংবাদ তাদের কাছে বলো এবং তারা যদি তোমার কথায় কর্ণপাত না করে শুষ্ক ও অনুর্বর ভূমির দিকে চলে যায় তখন তুমি কি করবে? সে বললো, "আমি তাদেরকে ত্যাগ করে সবুজ-শ্যামল ও জলসমৃদ্ধ এলাকায় যাব।" আমিরুল মোমেনিন বললেন, "তাহলে বায়াতের জন্য তোমার হাত বাড়াও।"

পরবর্তীকালে এই লোকটি বর্ণনা করেছিল, "আল্লাহ্র কসম, এরূপ সুস্পষ্ট যুক্তিপূর্ণ কথার পর আমি আমিরুল মোমেনিনের হাতে বায়াত গ্রহণ না করে থাকতে পারিনি।" এ লোকটি হলেন কুলায়েব আল-যারমী।

★★★★★

খোৎবা-১৭০

সিফফিনে শত্রুর মুখোমুখী যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর আমিরুল মোমেনিন বলেন ঃ

হে আল্লাহ্, আকাশ ও নভোমন্ডলের তুমিই রক্ষক। তুমি উহাদেরকে দিবা ও রাত্রির আশ্রয়স্থল করেছো। তুমিই সূর্য ও চন্দ্রের জন্য কক্ষপথ এবং ঘূর্ণায়মান নক্ষত্ররাজীর চলার পথ তৈরী করেছো এবং উহাকে জনাকীর্ণ করার জন্য ফেরেশতা সৃষ্টি করেছো যারা তোমার ইবাদতে কখনো ক্লান্ত হয় না। হে এ পৃথিবীর রক্ষক, তুমি পৃথিবীকে মানুষের আবাসস্থল করেছো এবং পোকা-মাকড়, পশু-পাখী, দৃশ্যমান ও অদৃশ্য অগণন সৃষ্টির বিচরণ ক্ষেত্র করেছো। হে পর্বতমালার ধারক, তুমিই পর্বতমালাকে পৃথিবীর জন্য পেরাক ও মানুষের জন্য অবলম্বনের উপায় স্বরূপ করেছো। যদি তুমি আমাদেরকে শত্রুর ওপর বিজয়ী কর তবে আমাদেরকে সীমালঙ্ঘন হতে রক্ষা করো এবং সত্যের সরল পথে প্রতিষ্ঠিত রেখো। আর যদি শত্রুকে আমাদের ওপর বিজয়ী কর তবে আমাদেরকে শহীদ হিসাবে গ্রহণ করো এবং ফেতনা থেকে আমাদেরকে রক্ষা করো।

কোথায় সেসব লোক যারা সম্মান রক্ষা করে এবং কোথায় সেসব আত্ম-সম্মানী লোক যারা সম্মানী লোককে বিপদে সাহায্য করে? তোমাদের পেছনে লজ্জা আর সম্মুখে জান্নাত রয়েছে।

★★★★★

খোৎবা-১৭১

উমর ইবনে খাত্তাবের মৃত্যুর পর গঠিত পরামর্শক পর্ষদ ও জামালের যুদ্ধের লোকদের সম্পর্কে

প্রতিষ্ঠিত প্রশংসা আল্লাহ্র যাঁর দৃষ্টি হতে একটা আকাশ অন্যটিকে এবং একটা পৃথিবী অন্যটিকে গোপন করে রাখতে পারে না।

কেউ একজন আমাকে বললো, "হে আবি তালিবের পুত্র, তুমি খেলাফতের জন্য লোভাতুর[১] হয়ে পড়েছো।" আমি তাকে বললাম ঃ

> *আল্লাহ্র কসম, তুমিই বরং অনেক দূরবর্তী (অনধিকারী) হওয়া সত্ত্বেও অধিক লোভাতুর। অপরপক্ষে, আমি ইহার সুযোগ্য ও নিকটবর্তী (অধিকারী)। আমি আমার অধিকার হিসাবে খেলাফত দাবী করেছি। অপরপক্ষে, আমার ও খেলাফতের মধ্যে তোমরা অবৈধ হস্তক্ষেপ করছো এবং আমার মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে দিচ্ছো। যখন আমি উপস্থিত জনতার সম্মুখে যুক্তি দ্বারা তার কানে আঘাত করলাম তখন সে চমকে উঠলো এবং কি জবাব দিবে তা খুঁজে না পেয়ে যেন হতবুদ্ধি হয়ে গেল।*

হে আল্লাহ্ ,কুরাইশ ও তাদের সাহায্যকারীদের বিরুদ্ধে আমি তোমার সাহায্য প্রার্থনা করি। তারা আমার আত্মীয়তার অধিকার অস্বীকার করছে, আমার মর্যাদা ক্ষুন্ন করেছে এবং খেলাফতের ব্যাপারে আমার বিরোধিতার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। অথচ খেলাফত আমার অধিকার। তৎপর তারা আমাকে বললো, "জেনে রাখো, তোমার খেলাফত পাওয়া অথবা উহা পরিত্যাগ করা—দু'ই ন্যায়সঙ্গত[২]।"

জামালের জনগণের বর্ণনা

তারা (তালহা, জুবায়র ও তাদের সমর্থকগণ) আল্লাহ্র রাসুলের স্ত্রীকে এমনভাবে হেঁচড়িয়ে বের করে এনেছিল যেন কোন ক্রীতদাসীকে বিক্রির জন্য নেয়া হচ্ছিলো। তারা তাকে বসরা নিয়ে গিয়েছিল যেখানে ওদুটোর (তালহা ও জুবায়র) স্ত্রীগণ ঘরের মধ্যে ছিল, কিন্তু আল্লাহ্র রাসুলের স্ত্রীকে তাদের ও সৈন্যদের মাঝে প্রকাশ্যভাবে নিয়ে এলো। এদের মধ্যে একজন লোকও ছিল না যারা স্বেচ্ছায় ও বিনা বাধ্যবাধকতায় আমার হাতে বায়াত গ্রহণ করেনি।

বসরায় এসে তারা আমার গভর্ণর, কোষাধ্যক্ষ ও অন্যান্য অধিবাসীকে আমার বিরোধিতা করার জন্য নির্দেশ দিয়েছিল। তারা কতেক লোককে আটক করে এবং কতেক লোককে বিশ্বাসঘাতকতা করে হত্যা করেছিল। আল্লাহ্র কসম, যদি তারা বিনা দোষে ইচ্ছাকৃতভাবে একজন মুসলিমকেও হত্যা করে থাকে তবে তাদের সকল সৈন্যকে হত্যা করা আমার জন্য বৈধ হবে। কারণ, তারা বিনা দোষে হত্যায় উপস্থিত ছিল কিন্তু দ্বিমত পোষণ করেনি এবং মুখে অথবা হাতে কোন প্রকার বাধার সৃষ্টি করেনি। বিনা দোষে মুসলিমগণকে হত্যা করার জন্য যে সংখ্যক লোক এগিয়ে এসেছিল তাদের কথা বলাই বাহুল্য।

১। উমর ইবনে খাত্তাবের মৃত্যুর পর তাঁর মনোনীত পরামর্শক পর্ষদের বৈঠকে সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস উমরের একটি উক্তি বারবার আমিরুল মোমেনিনকে শুনাচ্ছিলেন যা উমর তাঁর মৃত্যুশয্যায় বলেছিলেন। উমর বলেছিলেন, "হে আলী, খেলাফতের জন্য তুমি বড়ই লোভাতুর।" তখনই আলী প্রত্যুত্তরে বলেছিলেন, "কেউ নিজের অধিকার দাবী করলে তাকে লোভাতুর বলা যায় না বরং তাকেই লোভী বলা যায় যে আমার ন্যায়সঙ্গত অধিকার আদায় প্রতিহত করছে এবং অযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও খেলাফতকে আঁকড়ে ধরে রাখার চেষ্টা করছে।"

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, আমিরুল মোমেনিন খেলাফতকে তাঁর ন্যায়সঙ্গত অধিকার মনে করতেন এবং তাঁর অধিকার হিসাবে খেলাফত দাবী করতেন। কোন অধিকার আদায়ের দাবী উত্থাপনের জন্য সে অধিকার উড়িয়ে দেয়া যায় না এবং খেলাফত হতে তাঁকে বঞ্চিত করার জন্য তাঁর দাবীকে ওজর হিসাবে দাঁড় করানো যায় না এবং তাঁর দাবীকে লোভ হিসাবে আখ্যায়িত করা যায় না। ধরা যাক, তাঁর দাবী লোভের কারণে তিনি উত্থাপন করেছেন, তা হলে এ লোভ থেকে কি কেউ মুক্ত ছিল? মুহাজির ও আনসারগণের মধ্যে দড়ি-টানাটানি, পরামর্শক পর্ষদের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সংগ্রাম এবং তালহা ও জুবায়রের কুচক্র কি লোভের ফল নয়? যদি খেলাফতের প্রতি আমিরুল মোমেনিনের কোন লোভ থাকতো তাহলে আব্বাস (রাসুলের চাচা) ও আবু সুফিয়ান যখন বায়াত গ্রহণ করতে এসেছিল তখন তিনি সকল পরিণামের প্রতি

চোখ বন্ধ করে খেলাফত গ্রহণে রাজী হতেন এবং তৃতীয় খলিফার মৃত্যুর পর যখন মানুষ তাঁর কাছে ছুটে এসে ভিড় জমিয়ে বায়াত গ্রহনের জন্য চাপ দিয়েছিলো তখন তিনি বিরাজমান অবস্থার অবনতির কথা বিবেচনা না করেই তাদের প্রস্তাবে রাজী হতেন। আমিরুল মোমেনিনের পূর্বাপর পদক্ষেপসমূহের কোনটিতেই এটা প্রমাণিত হবে না যে, তিনি শুধুমাত্র খলিফা হবার জন্যই খেলাফত দাবী করেছিলেন। বরং খেলাফতের জন্য তাঁর দাবীর উদ্দেশ্য ছিল ইহার বৈশিষ্ট্য যেন পরিবর্তীত হয়ে না পড়ে এবং দ্বীন যেন অন্যদের লালসার শিকার না হয়ে পড়ে। খেলাফত দ্বারা জীবনের আনন্দ ও আরাম-আয়েশ উপভোগের উদ্দেশ্য থাকলেই উহাকে লোভ বলা যায়।

২। এ উক্তির ব্যাখ্যা লেখতে গিয়ে হাদীদ[১৫২] (৯ম খন্ড, পৃঃ ৩০৬) লিখেছে যে, আমিরুল মোমেনিন বুঝাতে চেয়েছেন :

> *তারা (কুরাইশ ও তাদের সাহায্যকারীগণ) আমাকে খেলাফতের অধিকার হতে বঞ্চিত করেই তৃপ্ত হয়নি যা তারা অন্যায়ভাবে দখল করে রেখেছিলো। বরং তারা পাল্টা দাবী তুলেছিল যে, আমাকে খেলাফত দেয়া আর না দেয়া সম্পূর্ণরূপে তাদের এখতিয়ারভুক্ত এবং এ বিষয়ে তাদের সাথে কোন যুক্তির অবতারণা করার অধিকার আমার নেই। আমাকে খেলাফত হতে সরিয়ে রাখা ন্যায়সঙ্গত কাজ—এ কথাটা অন্ততঃ যদি তারা না বলতো তাহলে আমি সহ্য করতে পারতাম। কারণ এতে আমার অধিকার কিছুটা স্বীকার করা হতো যদিও উহা সমর্পণ করার জন্য কখনো তারা প্রস্তুত ছিল না।*

★★★★★

খোৎবা-১৭২

খেলাফতের যোগ্যতা সম্পর্কে

রাসুল (সঃ) ছিলেন আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশের আমানতদার, খাতিমুল আম্বিয়া, আল্লাহ্‌র রহমতের সুসংবাদ প্রদানকারী এবং তাঁর কঠোর শাস্তি সম্বন্ধে সতর্ককারী।

হে জনমন্ডলী, খেলাফতের ব্যাপারে সে ব্যক্তি সব চাইতে উপযুক্ত যে ইহা সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করতে সক্ষম এবং যে এ বিষয়ে আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধ উত্তমরূপে জ্ঞাত আছে। যদি কোন ফেতনা সৃষ্টিকারী ফেতনা সৃষ্টি করে তাকে তওবা করতে বলতে হবে। যদি সে তওবা করতে অস্বীকার করে তবে প্রয়োজনে তার সাথে যুদ্ধ করতে হবে। আমার জীবনে শপথ[১] যদি ইমামমতের (নেতৃত্বের) প্রশ্নে সকল লোক উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা না হয়ে থাকে তবে এমন ঘটনা (ইমাম নিয়োগ) ঘটেনি। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেছে, যারা সেই সিদ্ধান্তে একমত হয়েছিল তারা অনুপস্থিতগণের ওপর তাদের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিয়েছিল। এমন অবস্থা সৃষ্টি করা হয়েছিল যে, যারা উপস্থিত ছিল তাদের ভিন্নমত পোষণ করা নিষিদ্ধ করা হয়েছিল এবং যারা অনুপস্থিত ছিল তারা অন্য কাউকে মনোনীত করাও নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। জেনে রাখো, আমি দু'ব্যক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো—তাদের একজন হলো সেব্যক্তি যে এমন কিছু দাবী করে যা তার নয় এবং অপর ব্যক্তি হলো সে যে তার নিজের দায়িত্বকে উপেক্ষা করে।

মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিচার-বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা

হে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ, আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি আল্লাহ্‌কে ভয় করার জন্য কারণ পরস্পরের প্রতি এটাই সর্বোৎকৃষ্ট উপদেশ এবং আল্লাহ্‌র দরবারে সবকিছু হতে এটাই উত্তম। তোমাদের ও অন্যান্য মুসলিমদের

মধ্যে যুদ্ধ বাধানোর জন্য দরজা খুলে দেয়া হয়েছে এবং এ ঝান্ডা এমন এক ব্যক্তি দ্বারা বাহিত হবে যিনি দৃষ্টিমান, ধৈর্যশীল ও ন্যায়পরায়ণতার অবস্থান সম্পর্কে জ্ঞানবান। সুতরাং তোমাদেরকে যা বলা হয়েছে সেদিকে এগিয়ে যাওয়া এবং যা কিছু হতে বিরত থাকতে বলা হয়েছে তা প্রতিহত করা তোমাদের উচিত। কোন ব্যাপারে তাড়াহুড়া করো না যে পর্যন্ত না উহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানতে পার। কারণ তোমরা যা অপছন্দ কর উহা পরিবর্তন করার অধিকার আমাদের রয়েছে।

দুনিয়াদারের প্রতি দুনিয়ার আচরণ

জেনে রাখো, এ দুনিয়াকে তোমরা প্রবলভাবে কামনা কর এবং ইহাকে পেতে তোমরা দারুণভাবে লালায়িত যা তোমাদেরকে কখনো ক্রুদ্ধ করে, কখনো আনন্দ দান করে। অথচ ইহা তোমাদের স্থায়ী আবাসস্থল নয় এবং যে স্থানে থাকার জন্য তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে ইহা সে স্থলও নয় এবং ইহার প্রতি তোমাদেরকে আমন্ত্রণও জানানো হয়নি। মনে রেখো, ইহা তোমাদের চিরস্থায়ী সঙ্গী হবে না এবং তোমরাও ইহাকে নিয়ে চিরদিন বেঁচে থাকবে না। এ দুনিয়ার কোন কিছুর আকর্ষণ যদি তোমাদেরকে প্রভাবিত করে তবে উহার কুফলও তোমাদেরকে সতর্ক করে। তোমাদের সকলের উচিত ইহার আকর্ষণ পরিহার করে সতর্কাদেশ গ্রহণ করা এবং ইহার প্রভাব পরিহার করে আতঙ্ক গ্রহণ করা। যতক্ষণ এখানে থাকো দুনিয়া হতে হৃদয়কে ফিরিয়ে রেখো এবং সেই ঘরের দিকে এগিয়ে যাও যার প্রতি তোমাদেরকে আহবান করা হয়েছে। ক্রীতদাসী কোন কিছু হতে বঞ্চিত হলে যেভাবে ক্রন্দন করে সেভাবে (দুনিয়ার জন্য) ক্রন্দন করা তোমাদের উচিত নয়। ধৈর্যসহকারে আল্লাহ্‌র অনুগত হয়ে এবং তাঁর কিতাবের হেফাজত করে (যা তিনি বলেছেন) তাঁর পরিপূর্ণ নেয়ামত যাচনা কর।

জেনে রাখো, এ দুনিয়ার কোন কিছু হারিয়ে গেলে তোমাদের কোন ক্ষতি হবে না যদি তোমরা দ্বীনের নীতিমালার হেফাজত কর। আরো জেনে রাখো, তোমাদের দ্বীন হারিয়ে গেলে দুনিয়ার কোন কিছুই তোমাদের উপকারে আসবে না। আল্লাহ্ আমাদের ও তোমাদের হৃদয়কে ন্যায়মুখী করুন এবং আমাদেরকে ও তোমাদেরকে ধৈর্যধারণ করার তৌফিক দিন।

১। বনি সাঈদার সকিফাহ্‌তে খলিফা নির্বাচনের জন্য যখন জনগণ জড়ো হয়েছিল তখন একটা নীতি নির্ধারণ করা হয়েছিল যে, যারা সেখানে উপস্থিত ছিল বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করা বা বায়াত ভঙ্গ করার কোন অধিকার তাদের থাকবে না এবং অনুপস্থিতগণ বিনা প্রতিবাদে সেই সিদ্ধান্ত মেনে নেয়া ছাড়া আর কিছুই করণীয় থাকবে না। কিন্তু মদিনার লোকেরা যখন আমিরুল মোমেনিনের হাতে বায়াত গ্রহণ করেছিলো তখন সিরিয়ার গভর্ণর মুয়াবিয়া বায়াত গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়ে বলেছিলেন যে, বায়াত গ্রহণের সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন না বলে ইহা তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। ইহার জবাব আমিরুল মোমেনিন এ খোৎবায় প্রদান করে বলেছিলেন যে, তাদের তৈরী ও স্বীকৃত নীতি অনুযায়ী "যখন মদিনার সকল লোক এবং আনসার ও মুহাজিরগণ মিলিতভাবে সর্বসম্মতিক্রমে আমার হাতে বায়াত গ্রহণ করেছে তখন অনুপস্থিতির কারণ দেখিয়ে বায়াত হতে দূরে সরে থাকার কোন অধিকার মুয়াবিয়ার নেই এবং তালহা ও জুবায়র বায়াত ভঙ্গ করার কোন অধিকার রাখে না।"

★★★★★

খোৎবা-১৭৩

আমিরুল মোমেনিন যখন সংবাদ পেলেন যে, তালহা ও জুবায়র তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য বসরা অভিমুখে যাত্রা করেছিল তখন তিনি তালহা ইবনে উবায়দিল্লাহ্ সম্পর্কে বলেন ঃ

আমি কখনো যুদ্ধের জন্য ভীত হইনি বা ন্যায়ের স্বার্থে আঘাত করতে ভয় পাইনি। কারণ আমার প্রতি আল্লাহ্র সাহায্যের প্রতিশ্রুতিতে আমি সন্তুষ্ট। আল্লাহ্র কসম, তালহা তাড়াহুড়া করে উসমানের রক্তের বদলা নেয়ার ধুয়া তুলে তরবারি উন্মুক্ত করেছে এভয়ে যে পাছে উসমানের রক্তের দায়-দায়িত্ব তার ঘাড়ে পড়ে। কারণ এ ব্যাপারে তার সম্বন্ধে জনগণের ধারণা ও প্রকৃত অবস্থা হলো উসমানকে হত্যা করার জন্য তালহা সবচাইতে বেশী উদ্বিগ্ন ছিল। সুতরাং সে সৈন্য সংগ্রহ করে তার দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে মানুষের মধ্যে সংশয় ও ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি করেছে এবং বিষয়টিতে তালগোল পাকিয়ে সমস্যার সৃষ্টি করেছে।

আল্লাহ্র কসম, উসমান সম্বন্ধে তিনটি পথের কোনটিতেই সে কাজ করেনি। প্রথমতঃ তালহার বিশ্বাস অনুযায়ী ইবনে আফফান (উসমান) যদি অন্যায় করে থাকে তবে তালহার জন্য প্রয়োজনীয় হলো তাদের সমর্থন করা যারা উসমানকে হত্যা করেছে অথবা উসমানের সমর্থকদের থেকে দূরে সরে থাকা। দ্বিতীয়তঃ যদি উসমান জুলুমের শিকার হয়ে থাকে তাহলে তালহা তাদের মধ্যে ছিল যারা উসমানকে আক্রমণের সময় দূরে সরে ছিল অথবা নানা প্রকার ওজর উথাপন করেছিল। তৃতীয়তঃ যদি এ দু'টি বিকল্পে তালহার কোন সংশয় থাকতো তাহলে তালহার অবশ্য কর্তব্য ছিল উসমানকে পরিত্যাগ করা ও একদিকে সরে পড়া। কিন্তু সে এ তিনটি পথের কোনটি অবলম্বন করেনি। বরং এমন একটা জিনিস নিয়ে এসেছে যাতে কোন মঙ্গল নেই এবং তার কোন ওজর গ্রহণযোগ্য নয়।

★★★★★

খোৎবা-১৭৪

গাফেলদের প্রতি সতর্কবাণী ও তার নিজের জ্ঞানের গভীরতা সম্পর্কে

হে জনমন্ডলী, তোমরা আল্লাহ্র প্রতি গাফেল হলেও আল্লাহ্ কখনো তোমাদের প্রতি গাফেল নহেন। মনে রেখো, তোমাদের মধ্যে যারা আমলে সালেহা হতে দূরে সরে থাকে তারা ধৃত হবে। এটা কত দুঃখজনক যে, তোমরা আল্লাহ্ হতে সরে যাচ্ছ এবং অন্য কিছুতে উৎসাহী হয়ে পড়ছো। তোমরা সেসব উটের মত যাদেরকে উহাদের রাখাল মড়ক-লাগা চারণ-ভূমি ও খরাপীড়িত শুষ্ক এলাকার দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যায়। তারা সেসব পশুর মত যাদেরকে ভালভাবে খাওয়ানো হয় জবাই করার জন্য, কিন্তু সেই পশু জানে না কি উদ্দেশ্যে ভালভাবে খাওয়ানো হচ্ছে। উহাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করলে উহারা মনে করে এভাবে তাদের সারাজীবন যাবে এবং পেটভরে খাওয়া পাওয়াই তাদের লক্ষ্য।

আল্লাহ্র কসম, যদি আমি ইচ্ছা করি, আমি বলে দিতে পারি তোমরা কে কোথা হতে এসেছো, কোথায় যাবে এবং তোমাদের সকল কর্মকান্ডের খবর। কিন্তু আমার ভয় হয় এরূপ করলে পাছে তোমরা আল্লাহ্র রাসুলকে (সঃ) পরিত্যাগ করে আমাকে গ্রহণ কর। নিশ্চয়ই, আমি এসব বিষয় বাছা-বাছা দু'একজনকে জ্ঞাপন করবো যাদের ক্ষেত্রে সে ভয় নেই। সেই আল্লাহ্র কসম, যিনি রাসুলকে (সঃ) সত্য সহকারে ও সমগ্র সৃষ্টির ওপর বৈশিষ্ট্য

মন্ডিত করে প্রেরণ করেছেন, আমি সত্য ছাড়া কোন কথা বলি না। তিনি (রাসুল) আমাকে এসব জ্ঞান অবহিত করেছেন এবং এমনকি যারা মরে যায় তাদের প্রত্যেকের মৃত্যু সম্বন্ধে, যাদেরকে মুক্তি প্রদান করা হয় তাদের প্রত্যেকের মুক্তি সম্বন্ধে এবং খেলাফতের পরিণতি সম্বন্ধেও তিনি আমাকে অবহিত করেছেন। আমার মাথার মধ্য দিয়ে যেতে পারে এমন কোন কিছু তিনি আমার কানে না দিয়ে ও আমাকে না বলে রাখেননি[১]।

হে জনমন্ডলী, আল্লাহ্‌র কসম, আমি নিজে পালন করার পূর্বে কখনো কোন বিষয় পালনের জন্য তোমাদেরকে অনুপ্রাণিত করি না এবং নিজে বিরত থাকার পূর্বে কোন বিষয়ে তোমাদেরকে বিরত থাকতে বলি না।

১। যারা প্রত্যাদেশের ঝর্ণাধারা ও ঐশী প্রেরণার মদিরা পান করে তারা অজানা পর্দার অন্তরালে গুপ্ত ও ভবিষ্যতে যা ঘটবে তা এমনভাবে দেখতে পায় যেন সবকিছু তাদের চোখের সামনে। এ কথা কুরআনের নিম্নবর্ণিত আয়াতের সাথে সাংঘর্ষিক নয় যাতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

বল, 'আল্লাহ্ ব্যতীত আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে কেউ অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখে না'। (কুরআন-২৭ : ৬৫)

এই আয়াতে অজানা ও গুপ্ত বিষয়ে ব্যক্তিগত জ্ঞানের কথা অস্বীকার করা হয়েছে, কিন্তু নবী ও অলিগণ যাঁরা ঐশী প্রেরণার মাধ্যমে জ্ঞানপ্রাপ্ত তাদের জ্ঞানের কথা অস্বীকার করা হয়নি। সেকারণে তাঁরা ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেন এবং বহু গুপ্ত ঘটনা ও বিষয়ের ঘোমটা উন্মোচন করে দিতে পারেন। কুরআনের বহু আয়াত একথা সমর্থন করে, যেমন ঃ

নবী তাঁর স্ত্রীগণের একজনকে গোপনে কিছু বলেছিলেন, অতঃপর সে যখন উহা অন্য একজনকে বলে দিয়েছিল এবং আল্লাহ্ নবীকে উহা জানিয়ে দিয়েছিলেন তখন নবী এ বিষয়ে কিছু ব্যক্ত করলেন ও কিছু অব্যক্ত রাখলেন; যখন নবী উহা তাঁর সেই স্ত্রীকে জানালেন তখন সে বললো, "কে আপনাকে ইহা অবহিত করলো?" নবী বললেন, 'আমাকে অবহিত করেছেন তিনি যিনি সর্বজ্ঞ ও সম্যক অবগত" (কুরআন-৬৬ :৩)।

(হে নবী) এই সমস্ত অদৃশ্য-লোকের সংবাদ আমরা ওহী (প্রত্যাদেশ) দ্বারা আপনাকে অবহিত করছি (কুরআন-১১ :৪৯)।

সুতরাং নবী ও অলিগণ গুপ্ত বিষয়ের জ্ঞানের অধিকারী -একথা বললে যারা মনে করে আল্লাহ্‌র গুণাবলীতে দ্বৈততা সৃষ্টি করা হয় তাদের এ যুক্তি সঠিক নয়। দ্বৈততা তখনই বুঝাবে যখন বলা হবে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো গুপ্ত বিষয়ে ব্যক্তিগত জ্ঞান আছে। যখন এটা স্বীকৃত যে, নবী ও ইমামগণ যে জ্ঞানের অধিকারী তা শুধু আল্লাহ্‌রই দান মাত্র তখন দ্বৈততার প্রশ্ন ওঠে না। অদৃশ্য সম্বন্ধে জ্ঞান থাকাই যদি দ্বৈততা হয় তাহলে ঈশা (আঃ) সম্পর্কে কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতের অবস্থান কি হবে ঃ

মাটি দ্বারা আমি তোমাদের জন্য একটি পাখীর আকৃতি তৈরী করবো; অতঃপর উহাতে ফুৎকার দেব; ফলে উহা আল্লাহ্‌র হুকুমে পাখী হয়ে যাবে। আমি জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে নিরাময় করবো এবং আল্লাহর হুকুমে মৃতকে জীবিত করবো। তোমরা তোমাদের গৃহে যা আহার কর ও মওজুদ কর আমি তোমাদেরকে তা বলে দেব। (কুরআন-৩:৪৯)

যদি একথা বিশ্বাস করা হয় যে আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে ঈশা (আঃ) পাখী সৃষ্টি করে উহাকে প্রাণ দিয়েছিলেন তা হলে কি তিনি আল্লাহ্‌র সৃষ্টি কর্মের অংশীদার ও প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে গেলেন? যদি তা না হয় তাহলে আল্লাহ্ যাকে গুপ্ত বিষয়ের জ্ঞান দান করেন কি করে তাকে আল্লাহ্‌র গুণাবলীর অংশীদার বলা যায় এবং কি করে গুপ্ত বিষয়ের জ্ঞানে দ্বৈততা বুঝায়?

এ কথা অস্বীকৃত নয় যে, ভবিষ্যতে ঘটবে এমন কিছু মানুষ স্বপ্নে দেখে অথবা স্বপ্নের ব্যাখ্যা দ্বারা ভবিষ্যতে ঘটবে এমন কিছু মানুষ বুঝতে পারে। মানুষ যখন স্বপ্নে দেখে তখন সে অচেতন অবস্থায় থাকে—তার দেখার শক্তি, বুঝার শক্তি, বোধশক্তি ও চিন্তাশক্তি কোনটাই তখন কাজ করে না। ফলে যদি জাগরিত অবস্থায় কোন অজানা ঘটনা কেউ জানতে পারে তবে তাতে আশ্চর্য হবার কি আছে এবং উহা বাতিল করে দেয়ার কোন কারণ থাকতে পারে না। ইহা যুক্তির কথা যে, অচেতন অবস্থায় স্বপ্নে যা সম্ভব জাগরিত অবস্থায় তা সম্ভব হবে না কেন? ইবনে মীছাম আল-বাহারানী[১০১] লিখেছেন যে,

অচেতন অবস্থায় স্বপ্নে মানুষের রূহ (আত্মা) দেহ হতে বিমুক্ত হয়ে পড়ে এবং দেহের বন্ধন ছিন্ন করে চলে যায়। ফলে ইহা এমন সব গুপ্ত বিষয় দেখতে পায় যা দেহের প্রতিবন্ধকতার কারণে সচেতন অবস্থায় দেখা যায় না। একইভাবে ইনসানুল কামেলগণের মধ্যে যারা সচেতন অবস্থায় তাদের আত্মাকে দেহ-বন্ধন নিরপেক্ষ করে জ্ঞানের কেন্দ্রবিন্দুর দিকে ধাবিত করতে পারে তারা তখন অনেক অদৃশ্য বিষয় দেখতে পায় যা স্বাভাবিক দৃষ্টিতে দেখা অসম্ভব। কাজেই আহলুল বাইতগণের আত্মিক শ্রেষ্ঠত্বের কথা বিবেচনা করলে ভবিষ্যতের অদৃশ্য বিষয় তাদের জ্ঞাত হওয়াতে আশ্চর্যের কিছু নেই। ইবনে খালদুন[৫৫] (পৃঃ ২৩) লিখেছেন ঃ

> *যেখানে অন্য লোকেরা অলৌকিক কৃতিত্ব সম্পাদন করে সেখানে তোমরা তাঁদের সম্পর্কে কি চিন্তা কর যাঁরা জ্ঞানে ও সততায় বৈশিষ্ট্যমন্ডিত এবং রাসুলের (সঃ) চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের আয়না স্বরূপ। তাঁদের মহান ভিত্তিমূল (রাসুল) সম্পর্কে মহিমান্বিত আল্লাহ্ উচ্চ প্রশংসা করেন। কাজেই সেই মূলই ইহার পবিত্র শাখা-প্রশাখার (আহলুল বাইত) উঁচুস্তরের কর্মকান্ডের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ফলে অদৃশ্য বিষয়ে আহলুল বাইতের জ্ঞান সম্পর্কে অনেক ঘটনা প্রকাশিত ও বর্ণিত হয়েছে যা অন্য কারো বেলায় নেই।*

এমতাবস্থায় অদৃশ্য বিষয় জানা সম্বন্ধে আমিরুল মোমেনিনের দাবীর প্রেক্ষিতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কারণ তিনি রাসুল (সঃ) কর্তৃক লালিত-পালিত হয়েছিলেন, রেসালত প্রকাশের প্রারম্ভ হতেই রাসুলের পাশে পাশে ছিলেন এবং আল্লাহ্র স্কুলের ছাত্র ছিলেন। অবশ্য যাদের জ্ঞান ভৌত বস্তুর সীমার বাইরে প্রসারিত হতে অক্ষম এবং যাদের শিক্ষার বাহন শারীরিক ইন্দ্রিয়ের মধ্যে আবদ্ধ তারা ঐশী জ্ঞানের বাস্তবতায় বিশ্বাস করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। এহেন দাবী যদি একক হতো এবং শুধুমাত্র আমিরুল মোমেনিনের মুখেই শুনা যেতো তাহলে ইহা বিশ্বাস করতে হয়ত মনে সংশয় জাগতো। কিন্তু ঈশার (আঃ) এহেন জ্ঞান সম্পর্কে কুরআন সাক্ষ্য বহন করে। সেক্ষেত্রে আমিরুল মোমেনিনের দাবীতে সংশয় থাকতে পারে না। ইহা সর্বসম্মত যে, আমিরুল মোমেনিন রাসুলের (সঃ) জ্ঞান ও বৈশিষ্ট্যের উত্তরসূরী ছিলেন এবং তাঁকে সকল জ্ঞানে জ্ঞানবান করে ঘোষণা করেছেন, "আমি জ্ঞানের মহানগর আর আলী উহার দরজা।" যেহেতু একথা বলা যায় না যে, ঈশা (আঃ) যা জানতেন রাসুল (সঃ) সেসব অবহিত ছিলেন না সেহেতু রাসুল (সঃ) যা জ্ঞাত ছিলেন তাঁর উত্তরসূরী আলী তা জানতেন না- একথাও বলা যায় না। (অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান সম্পর্কে আরো অধিক জানতে হলে আল-গাজ্জালীর কিমিয়ায়ে সা'আদাত, ১ম খন্ড, পৃঃ ৪০ -৫০ দেখার জন্য অনুরোধ করা গেল— বাংলা অনুবাদক)।

এতদসংক্রান্ত বিষয়ে এটাই বিস্ময়কর যে, আমিরুল মোমেনিন তাঁর কথায় বা কাজে কখনো ঘুণাক্ষরেও মানুষের গোপন বিষয় প্রকাশ করেননি। সায়ইদ ইবনে তাউস[৭২] লিখেছে ঃ

> *আমিরুল মোমেনিনের দাবীর একটা বিস্ময়কর দিক হলো তিনি সকল অবস্থা ও ঘটনা সম্বন্ধে জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও তাঁর কথায় ও কাজে এমন আচরণ করতেন যে, কেউ দেখলে বিশ্বাস করতে পারতো না যে, তিনি গুপ্ত বিষয় ও অন্যের অদৃশ্য কর্মকান্ড সম্বন্ধে অবহিত আছেন। জ্ঞানীগণ এ বিষয়ে একমত যে, যদি কোন ব্যক্তি ভবিষ্যতে কি ঘটবে তা জানতে পারে অথবা তার অনুচরগণ কি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে যাচ্ছে তা বলতে পারে অথবা মানুষের গুপ্ত বিষয় জানতে পারে তবে এহেন জ্ঞান সেই ব্যক্তির চালচলন ও কথাবার্তার মাধ্যমে প্রকাশ হয়ে পড়ে। কিন্তু এহেন জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও যখন কেউ এমন আচরণ করে যেন তিনি কিছুই জানেন না তখন এটা নিঃসন্দেহে মনের দ্বন্দ্ব সৃষ্টিকারী অলৌকিক।*

এখানে একটা প্রশ্ন ওঠে যে, আমিরুল মোমেনিন কেন তাঁর গুপ্ত বিষয়ে জ্ঞানের নির্দেশের ভিত্তিতে কাজ করেননি। এ প্রশ্নের জবাব হলো, শরিয়তের আদেশ স্পষ্ট শর্তের ওপর প্রতিষ্ঠিত। শরিয়ত ভঙ্গ করলে সমাজে বিশৃংখলা দেখা দেয় এবং মানুষ আল্লাহ্‌কে ভুলে গিয়ে অলৌকিকত্বের দিকে ছুটে যাবে। নবী ও অলিগণ আল্লাহ্ কতৃক মঞ্জুরীকৃত অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও শুধুমাত্র যেক্ষেত্রে আল্লাহ্ অনুমতি দিয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে উহা প্রয়োগ করতে পারেন। ঈশা (আঃ) অন্ধকে চক্ষু দান ও মৃতকে জীবিত করতে পারতেন। তাই বলে তিনি তৎকালীন সকল অন্ধকে চক্ষু দান করেননি এবং সকল মৃতকে জীবিত করে তোলেননি। শুধুমাত্র যে ক্ষেত্রে আল্লাহ্ অনুমতি প্রদান করেছেন সে ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করেছেন।

যদি নবী ও অলিগণ তাঁদের গুপ্ত জ্ঞানের ভিত্তিতে কাজ করতেন তবে সমাজের জনগণের কাজে-কর্মে দারুণ বিশৃঙ্খলা ও অচলাবস্থা দেখা দিতো। উদাহরণ স্বরূপ নবী বা অলি গুপ্ত জ্ঞানের ভিত্তিতে একজন মারাত্মক পাপিষ্ঠকে যদি হত্যা করে শাস্তি প্রদান করে তখন সমাজে দারুণ গোলযোগ সৃষ্টি হবে। কারণ সমাজ দেখবে তিনি একজন নিরপরাধ লোককে হত্যা করেছেন। সেকারণে আল্লাহ্ কিছু কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে গুপ্ত জ্ঞান প্রয়োগের অনুমতি দিয়েছেন। সেই জন্যই রাসুল (সঃ) মোনাফেকদের সকল কর্মকান্ড জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও তাদের সঙ্গে এরূপ ব্যবহার করতেন যেরূপ ব্যবহার তিনি মুসলিমদের সাথে করতেন।

এখন একথা বুঝা গেল যে, গুপ্ত জ্ঞানের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও কেন আমিরুল মোমেনিন তদানুযায়ী কাজ করতেন না। অবশ্য, অবস্থার প্রেক্ষিতে তিনি কিছু গুপ্ত বিষয় প্রকাশ করেছিলেন এবং তা শুধুমাত্র মানুষের শিক্ষা, উপদেশ প্রদান, সুসংবাদ প্রদান ও শাস্তির সতর্কতার জন্য প্রকাশ করেছিলেন। উদাহরন স্বরূপ ইমাম জাফর আস-সাদিক ইয়াহিয়া ইবনে জায়েদকে জানিয়েছিলেন যে, তিনি বাইরে গেলেই নিহত হবেন। ইবনে খালদুন[৫৫] (পৃঃ ২৩৩) লিখেছেন ঃ

> *ইমাম জাফর আস-সাদিক হতে প্রামাণিকভাবে বর্ণিত আছে যে, তিনি তাঁর কতিপয় আত্মীয় -স্বজনকে ভবিষ্যতে তাদের ওপর আপতিত হবে এমন কিছু ঘটনা বলে দিতেন। উদাহরণ স্বরূপ, তিনি তাঁর চাচাতো ভাই ইয়াহিয়া ইবনে জায়েদকে তার নিহত হবার সংবাদ বলে দিয়েছিলেন। কিন্তু সে তাঁর কথা অমান্য করে বাহির হয়ে গেলে যুজাযানে নিহত হয়েছিল।*

এতদসত্ত্বেও যেখানে আশঙ্কা আছে যে, মানুষের মনে উদ্বিগ্নতা সৃষ্টি হতে পারে সেখানে কোন কিছুই প্রকাশ করা হতো না। সেকারণে এখোৎবায় আমিরুল মোমেনিন বিস্তারিত কিছু বলেন নি, এ ভয়ে যে, মানুষ তাঁকে রাসুল অপেক্ষা বেশী সম্মান দেখানো শুরু করে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। ঈশা (আঃ) সম্পর্কে মানুষ নানা কথা বলে যেভাবে বিপথগামী হয়েছে তাঁর বেলায়ও একইভাবে অতিরঞ্জিত কথা বলে তারা গোমরাহীতে ডুবে যেতে পারে।

★★★★★

খোৎবা-১৭৫

ধর্মোপদেশ সম্পর্কে

হে আল্লাহ্র বান্দাগণ, তোমরা মহিমান্বিত আল্লাহ্র বাণী থেকে উপকৃত হবার পথ অনুসন্ধান কর। আল্লাহ্র সতর্কাদেশাবলী মান্য কর এবং তাঁর উপদেশাবলী গ্রাহ্য করে চলো। কারণ তিনি সুস্পষ্টভাবে হেদায়েতের পথ নির্দেশ করে দিয়ে তোমাদের জন্য কোন ওজর উত্থাপনের সুযোগ রাখেননি। যেসকল কর্মকাণ্ড তিনি পছন্দ করেন এবং যা তিনি ঘৃণা করেন তা বিস্তারিত ও স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করে তোমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। কাজেই তোমরা অন্য সকল পথ পরিহার করে শুধুমাত্র তাঁর পছন্দনীয় পথেই চলো। আল্লাহ্র রাসুল বলতেন, "অপ্রিয় বস্তু সামগ্রী জান্নাতকে পরিবেষ্টন করে আছে, অপরপক্ষে কামনা-বাসনা জাহান্নামকে ঘিরে আছে।"

জেনে রাখো, আল্লাহ্র আনুগত্য বাহ্যিকভাবে নিরানন্দময় এবং আল্লাহ্র অবাধ্যতা বাহ্যিকভাবে আনন্দদায়ক ও উপভোগ্য। তার ওপর আল্লাহ্র রহমত বর্ষিত হয় যে কামনা-বাসনা হতে নিজেকে সম্বরণ করতে পেরেছে এবং তার হৃদয়ের ক্ষুধার (আকাঙ্খার) মূলোৎপাটন করতে পেরেছে। কারণ হৃদয়ের দূরদর্শী লক্ষ্য রয়েছে এবং ইহা কামনা-বাসনার মাধ্যমে অবাধ্যতার দিকে ধাবিত হয়।

তোমরা আরো জেনে রাখো, হে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ, একজন মোমিনের উচিত সকাল-সন্ধ্যায় তার হৃদয়কে অবিশ্বাস করা। হৃদয়ের দোষ-ত্রুটির জন্য উহাকে নিন্দাবাদ করা তার উচিত এবং আমলে সালেহায় প্রবৃত্ত হবার জন্য হৃদয়কে সর্বদা শাসনে রাখা উচিত। যারা তোমাদের পূর্বে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে তাদের মত আচরণ করা তোমাদের উচিত এবং তোমাদের সামনে যেসব নজির রয়েছে সেরূপ আচরণ করা তোমাদের উচিত। তারা পথিকের মত এ পৃথিবী ত্যাগ করে চলে গেছে এবং দূরত্ব যেমন ঢাকা পড়ে যায় ইহাও তদ্রুপ ঢাকা পড়ে গেছে।

পবিত্র কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে

জেনে রাখো, এ কুরআন এমন উপদেশদাতা যে কখনো প্রতারণা করে না, এমন নেতা যে কখনো বিপথগামী করে না এবং এমন বর্ণনাকারী যে কখনো মিথ্যা কথা বলে না। যে কেউ কুরআন নিয়ে বসে সে উঠে যেতে দু'টো জিনিস পেয়ে থাকে—একটি হলো হেদায়েত এবং অপরটি হলো আধ্যাত্মিক অন্ধত্ব বিমোচন। আরো জেনে রাখো, কুরআন হতে হেদায়েত প্রাপ্তির পর কারো কোন কিছু প্রয়োজন হবে না, আবার কুরআন হতে হেদায়েত প্রাপ্তির পূর্বে কেউ অভাবমুক্ত হবে না। সুতরাং তোমাদের অসুস্থতার জন্য কুরআন হতে চিকিৎসা অন্বেষণ কর এবং বিপদে ও দুঃখ-দুর্দশায় ইহা হতে সাহায্য প্রার্থনা কর। কুরআনে কঠিনতম রোগের চিকিৎসা রয়েছে, যেমন—কুফরী, মোনাফেকী, বিদ্রোহ ও গোমরাহী। ইহার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা কর এবং ইহার প্রতি ভালবাসা সঞ্চার করে আল্লাহ্‌র দিকে মুখ ফেরাও। ইহার মাধ্যমে মানুষকে কিছু জিজ্ঞেস করো না। মহিমান্বিত আল্লাহ্‌র প্রতি মুখ ফেরাবার জন্য ইহার মাধ্যমের মত অন্য কিছু নেই।

জেনে রাখো, কুরআন হলো মধ্যস্থতাকারী এবং ইহার মধ্যস্থতা গৃহীত হবে। ইহা পরীক্ষিত সত্য বক্তা। কারণ বিচার দিনে ইহা যার জন্যই মধ্যস্থতা করবে তার জন্য ইহার মধ্যস্থতা গৃহীত হবে। বিচার দিনে ইহা যার জন্য খারাপ বলবে তার অবস্থা দুঃখজনক। বিচার দিনে একজন নকিব ঘোষণা করবে, সাবধান, কুরআন বপনকারী ব্যতীত সকল বপনকারী বিপদগ্রস্থ। সুতরাং কুরআন বপনকারী ও ইহার অনুসরণকারী হওয়া তোমাদের একান্ত উচিত। আল্লাহ্‌র দিকে পথ নির্দেশক হিসাবে কুরআনকে গ্রহণ কর। তোমাদের নিজেদের জন্যই ইহার উপদেশ অনুসন্ধান কর। ইহার বিরুদ্ধে তোমাদের কোন অভিমতে আস্থা স্থাপন করো না এবং কুরআনের ব্যাপারে তোমাদের কামনা-বাসনাকে ছলনা মনে করো।

মোমিন ও মোনাফিক সম্পর্কে

আমল কর! আমল কর! তৎপর পরিণতির দিকে লক্ষ্য কর; লক্ষ্য কর এবং দৃঢ় থাক; আমলে দৃঢ় থাক। অতঃপর ধৈর্যধারণ কর; ধৈর্য এবং তাকওয়া কর; তাকওয়া। তোমাদের একটা উদ্দেশ্য আছে। সেই উদ্দেশ্যের দিকে অগ্রসর হও। তোমাদের একটা নিদর্শন আছে। সেই নিদর্শন হতে হেদায়েত গ্রহণ কর। ইসলামের একটা উদ্দেশ্য আছে। ইহার উদ্দেশ্যের দিকে অগ্রসর হও। আল্লাহ্‌র হক আদায় কর এবং যা তিনি আদেশ করেছেন তা পালন করে তাঁর দিকে অগ্রসর হও। তোমাদের ওপর তাঁর দাবী তিনি স্পষ্ট করে বিবৃত করেছেন। আমি তোমাদের সাক্ষী এবং বিচার দিনে তোমাদের পক্ষে ওজর উত্থাপন করে ওকালতি করবো।

সাবধান! যা পূর্ব নির্ধারিত ছিল তা ঘটেছে এবং ভাগ্যলিপিতে যা ছিল তা স্ফুরিত হয়েছে। আল্লাহ্‌র প্রতিজ্ঞা ও ওয়াদার ভিত্তিতে আমি তোমাদের সাথে কথা বলছি। মহিমান্বিত আল্লাহ্ বলেন ঃ

> *নিশ্চয়ই যারা বলে আল্লাহ্ আমাদের রব, তারপর উহাতে স্থির থাকে, তাদের ওপর ফেরেশতা নাজেল হয় এবং বলে (রব হতে বলা হয়)"ভীত হয়ো না, আক্ষেপ করো না এবং জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ কর যার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে।" (কুরআন-৪১:৩)*

তোমরা বলেছো, "আল্লাহ্ আমাদের রব।" এখন তাঁর কিতাবের প্রতি, তাঁর নির্দেশিত পথের প্রতি এবং তাঁর ইবাদতের প্রতি সুদৃঢ় থাকো। তৎপর কখনো এপথ হতে সরে যেয়ো না; ইহাতে কোন বিদা'তের উদ্ভাবন করো না এবং ইহা হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না। কারণ এ পথ থেকে যারা সরে যায় তারা বিচার দিনে আল্লাহ্‌র রহমত হতে বঞ্চিত হবে।

সাবধান, তোমাদের আচার-আচরণকে ধ্বংস ও পরিবর্তনশীলতা হতে রক্ষা করার জন্য এক কথায় থেকো। সর্বদা জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণে রেখো। কারণ জিহবা দুর্দমনীয়। আল্লাহ্‌র কসম, আল্লাহ্‌কে ভয় করে কোন লোক উপকৃত হতে পারে না যে পর্যন্ত না সে জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে। নিশ্চয়ই, মোমিনের জিহ্বা তার হৃদয়ের পেছনে; আর মোনাফিকের হৃদয় তার জিহ্বার পেছনে। কারণ মোমিন যখন কিছু বলতে চায় তখন সে উহা মনে মনে চিন্তা-ভাবনা করে বলে। যদি তার মনে হয় উহা ভাল তখন সে উহা প্রকাশ করে; আর যদি মনে করে খারাপ তখন উহা গোপন রাখে—প্রকাশ করে না। অপরপক্ষে, মোনাফিকের মুখে যা আসে তা-ই বলে ফেলে। কোন্‌টা তার পক্ষে ও কোন্‌টা বিপক্ষে এটা সে চিন্তা করে না।

আল্লাহ্‌র রাসুল (সঃ) বলেছেন ঃ

> *হৃদয় সুদৃঢ় না হওয়া পর্যন্ত কারো ঈমান দৃঢ় হয় না এবং জিহ্বা সুদৃঢ় না হওয়া পর্যন্ত কারো হৃদয় দৃঢ় হয় না।*

সুতরাং তোমাদের মধ্যে কেউ যদি মুসলিমদের রক্ত ও সম্পদ দ্বারা হাত কলঙ্কিত না করে এবং তার জিহবা হতে তাদেরকে নিরাপদ রেখে আল্লাহ্‌র সাক্ষাত লাভের ব্যবস্থা করতে পারে তবে সে যেন তা করে।

সুন্নাহ্‌র অনুসরণ ও বিদা'ত পরিত্যাগ প্রসঙ্গে।

হে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ, জেনে রাখো, একজন মোমিন গত বছর যেটাকে হালাল মনে করেছে, এ বছরও সেটাকে হালাল মনে করবে এবং গত বছর যেটাকে হারাম মনে করেছে, এ বছরও সেটাকে হারাম মনে করবে। নিশ্চয়ই, মানুষের উদ্ভাবিত বিদা'ত হালাল করা যাবে না যা হারাম বলে ঘোষিত হয়েছে। বরং হালাল হলো উহা যা আল্লাহ্ হালাল করেছেন এবং হারাম হলো উহা যা আল্লাহ্ হারাম করেছেন। হালাল বিষয়গুলো তোমাদের দ্বারা পরীক্ষিত হয়েছে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীগণ এসব বিষয় তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। তারা তোমাদেরকে বিবিধ উপমা দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন এবং সুস্পষ্ট বিষয়ের দিকে তোমাদেরকে আহবান করেছেন। শুধুমাত্র বধিরগণ এসব শুনতে পায়নি এবং অন্ধগণ দেখতে পায়নি।

আল্লাহ্ যাকে পরীক্ষা ও উপমা হতে উপকারিতা প্রদান করেন না সে উপদেশ হতেও উপকার পায় না। সে সর্বদা ক্ষতির সম্মুখীন হবে তাতে সে মন্দকে অনুমোদন করবে এবং ভালকে অনুমোদন করবে। মানুষ দু'শ্রেণীর—শরিয়তের অনুসারী এবং বিদা'তের অনুসারী যাদেরকে আল্লাহ্ সুন্নাহ্ বা কোন ওজরের আলোকে সনদ প্রদান করেননি।

কুরআন হতে হেদায়েত সম্পর্কে

মহিমান্বিত আল্লাহ্ এ কুরআনের দিক নির্দেশনা কারো সাথে পরামর্শ করে ঠিক করেননি। কাজেই ইহা আল্লাহ্‌র সুদৃঢ় রশি ও তাঁর বিশ্বস্ত পথ। ইহাতে রয়েছে হৃদয়ের প্রস্ফুটন ও জ্ঞানের ঝর্ণাধারা। হৃদয়ের জন্য কুরআন ব্যতীত অন্য কোন দ্যুতি নেই যদিও যারা ইহা স্মরণ করতো তারা পরলোকগত এবং যারা ইহা ভুলে গেছে বা ভুলে যাবার ভান করছে তারা বেঁচে আছে। যদি তোমরা ভাল কিছু দেখ তবে উহাকে সমর্থন দিয়ো এবং মন্দ কিছু

দেখলে উহাকে এড়িয়ে চলো। কারণ আল্লাহ্‌র রাসুল বলতেন, "হে আদম সন্তানগণ, ভাল কাজ কর এবং পাপ এড়িয়ে চল; এতে তোমরা সঠিক পথে প্রতিষ্ঠিত থাকবে।"

অত্যাচারের প্রকারভেদ সম্পর্কে

জেনে রাখো, অন্যায়-অবিচার তিন প্রকারের—এক, যে অন্যায়-অবিচারের কোন ক্ষমা নেই; দুই, যে অন্যায়-অবিচারের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হওয়া থেকে নিস্তার নেই; তিন, যে অন্যায়-অবিচার বিনা জিজ্ঞাসায় ক্ষমা করা হবে। আল্লাহ্‌র দ্বৈততা বা শিরক করার অন্যায় কখনো ক্ষমা করা হবে না। আল্লাহ্ বলেছেন, "আল্লাহ্ তাঁর শরীক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না" (কুরআন -৪ :৪৮ ও ১১৬)। মানুষ মানুষের প্রতি যে অপরাধ করে উহা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করা ছাড়া কাউকে ছাড়া হবে না এবং মানুষ নিজের প্রতি যেসব ক্ষুদ্র পাপ করে উহা জিজ্ঞাসাবাদ ছাড়াই ক্ষমা করা হবে। যে সকল অপরাধ সম্পর্কে মানুষ জিজ্ঞাসিত হবে উহার শাস্তি বড়ই কঠোর। এ শাস্তি ছুরিকাঘাত বা বেত্রাঘাত নয়। ইহা এতই কঠোর যে বেত্রাঘাত বা ছুরিকাঘাত ইহার কাছে নিতান্ত তুচ্ছ। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র দ্বীনের পরিবর্তন এড়িয়ে চলো এবং সত্য ও ন্যায় বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ হও যদিও ইহা তোমাদের পছন্দনীয় নয় এবং অন্যায়ে ঐক্যবদ্ধ হওয়া তোমাদের অধিক পছন্দনীয়। নিশ্চয়ই, মহিমান্বিত আল্লাহ্, জীবিত বা মৃত কাউকেই সত্য বিষয়ে অনৈক্যের জন্য কোন কল্যাণ প্রদান করেন না।

হে জনমন্ডলী, সেব্যক্তি সৌভাগ্যশালী যে নিজের দোষ-ত্রুটির কথা সর্বদা চিন্তা করে—অন্যের দোষত্রুটি খুঁজে বেড়ানো থেকে নিজেকে বিরত রাখে। সেব্যক্তিও আশীর্বাদপুষ্ঠ যে নিজের ঘরে আবদ্ধ থাকে, নিজের খাবার খায়, আল্লাহ্‌র আনুগত্যে নিজকে নিমগ্ন রাখে এবং নিজের পাপের জন্য ক্রন্দন করে। এসব লোক নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে এবং মানুষ তার থেকে নিরাপদ থাকে।

★★★★★

খোৎবা-১৭৬

সিফ্‌ফিনের সালিশদ্বয় সম্পর্কে

তোমাদের দল দু'ব্যক্তিকে সালিশ মনোনয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। ফলে আমরা তাদের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছিলাম যে, তারা কুরআন অনুযায়ী কাজ করবে এবং কোন প্রকার বাড়াবাড়ি করবে না। তারা মুখে ও অন্তরে প্রতিশ্রুতি পালনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ থাকবে। কিন্তু তারা তাদের প্রতিশ্রুতি হতে সরে গিয়ে তাদের চোখের সামনে যা সত্য ও ন্যায় ছিল তা পরিত্যাগ করলো। এরকম অন্যায় করাই তাদের ইচ্ছা ছিল এবং বিপথে চলে যাওয়াই তাদের অভ্যাস। তাদের সাথে আমাদের কথা ছিল যে, তারা ন্যায়-নীতি অনুসারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে; কুরআনের আলোকে কাজ করবে এবং তাদের ভুল বিচার ও মন্দ অভিমত পরিহার করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। এখন তারা ন্যায়ের পথ পরিহার করেছে এবং যা কথা ছিল উহার বিপরীত কাজ করে বেরিয়ে এসেছে। সুতরাং তাদের এহেন রোয়েদাদ অস্বীকার করার জন্য আমাদের জোরালো যুক্তি ও ক্ষেত্র রয়েছে।

★★★★★

খোৎবা-১৭৭

আল্লাহ্‌র প্রশংসা, দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ীত্ব ও আল্লাহ্‌র আশীর্বাদ হ্রাসের কারণ সম্পর্কে
(উসমান নিহত হবার পর আমিরুল মোমেনিনের খেলাফতের প্রারম্ভে প্রদত্ত ভাষণ)

এক অবস্থা হতে অন্য অবস্থায় প্রবেশ করতে আল্লাহ্‌কে কোন কিছুই প্রতিহত করতে পারে না। সময় তাঁর কোন পরিবর্তন আনতে পারে না। স্থান তাঁকে চিহ্নিত করতে পারে না এবং ভাষা দ্বারা তাঁর বর্ণনা করা যায় না। পানির বিন্দুর সংখ্যা, আকাশে তারকার সংখ্যা বা শূন্যে বায়ু-স্রোতের সংখ্যা— কোন কিছুই তাঁর অজানা নয়। পাথরের ওপর দিয়ে পিপীলিকার চলাচল অথবা অন্ধকার রাতে কীট-পতঙ্গের আশ্রয়স্থল— এসবও তাঁর অজানা নয়। তিনি জানেন কোথায় গাছের পাতা ঝরে পড়ে এবং চোখের মণির গোপন নড়াচড়াও তাঁর অজানা নয়।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই, তাঁর সমকক্ষ কোন কিছু নেই, তাঁর অস্তিত্বে কোন সংশয় নেই, তাঁর দ্বীনে অস্বীকার করার কিছু নেই এবং তাঁর সৃষ্টি ক্ষমতায় প্রশ্ন তোলার কোন কিছু নেই। আমার সাক্ষ্য সেব্যক্তির সাক্ষ্য যার নিয়্যত অবাধ ও মুক্ত, যার বিবেক স্বচ্ছ, যার ইমান পুত-পবিত্র এবং যার (আমলে সালেহার) পাল্লা ভারী। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহ্‌র বান্দা ও রাসুল, যাঁকে তিনি সৃষ্টির মধ্যে পছন্দনীয় করেছেন তাঁর বাস্তবতাকে নিয়ে কর্মসাধনের জন্য নির্বাচিত করেছেন এবং তাঁর নির্বাচিত সম্মান ও মহান বাণীবাহক হিসাবে মনোনীত করেছেন। তাঁর মাধ্যমে হেদায়েতের নিদর্শনাবলী ঘোষিত হয়েছে এবং গোমরাহী বিদূরিত হয়েছে।

হে জনমন্ডলী, যে ব্যক্তি দুনিয়ার লালসা করে ইহার প্রতি আকৃষ্ট হয় দুনিয়া তাকে প্রবঞ্চনা করে। যে দুনিয়ার প্রত্যাশা করে দুনিয়া তার সাথে অকৃপণ আচরণ করে এবং যে দুনিয়াতে অভিভূত হয় দুনিয়া তাকে পরাভূত করে। আল্লাহ্‌র কসম, কোন লোক জীবনের আস্বাদন গ্রহণের পর উহা হতে বঞ্চিত হয় না যে পর্যন্ত সে উহা দ্বারা পাপে লিপ্ত না হয়। আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের প্রতি কখনো অবিচার করেন না। এতদসত্ত্বেও মানুষের ওপর যখন বিপদাপদ নেমে আসে এবং তাদের আনন্দ-আয়েশ চলে যায় তখন তারা খালেস নিয়্যত ও হৃদয়ে অনুভূতি দিয়ে আল্লাহ্‌র দিকে মুখ ফেরায় এই উদ্দেশ্যে যে, তিনি যেন তাদেরকে সব কিছু ফিরিয়ে দেন যা তাদের কাছ থেকে চলে গেছে এবং যেন তাদের সকল অসুস্থতা নিরাময় করেন।

আমার ভয় হয় পাছে তোমরা (রাসুলের আগমনের পূর্বেকার) জাহিলিয়াতে নিপতিত হও। অতীতে কিছু বিষয় ছিল যাতে তোমরা বিভ্রষ্ট ছিলে এবং আমার মতে তোমরা প্রশংসার যোগ্য নও। যদি তোমাদেরকে পূর্বেকার অবস্থা হতে ফিরিয়ে আনা যেত তবেই তোমরা ধার্মিক হতে। আমি শুধুমাত্র সংগ্রাম করে যেতে পারি; আমাকে কথা বলতে হলে আমি শুধু বলবো আল্লাহ্ তোমাদের অতীত আমলসমূহ ক্ষমা করুন।

★★★★★

খোৎবা-১৭৮

যিলিব আল-ইয়েমেনী আমিরুল মোমেনিনকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, তিনি আল্লাহ্‌কে দেখেছিলেন কিনা। উত্তরে তিনি বললেন, "আমি কি এমন একজনের ইবাদত করি যাকে আমি দেখিনি?" যিলিব জানতে চাইলো, আপনি তাঁকে কিরূপে দেখেছেন। তিনি প্রত্যুত্তরে বললেন ;

চোখ দ্বারা তাঁকে মুখোমুখি দেখা যায় না; কিন্তু ইমানের বাস্তবতার মাধ্যমে হৃদয় দিয়ে তাঁকে উপলব্ধি করা যায়। তিনি বস্তুর অতি সন্নিকটবর্তী কিন্তু ভৌত নৈকট্য দ্বারা নয়। তিনি সকল কিছু হতে দূরবর্তী কিন্তু ভৌতভাবে

আলাদা হয়ে নয়। তিনি বক্তা কিন্তু অভিব্যক্তি দ্বারা নয়। তিনি ইচ্ছা করেন কিন্তু প্রস্তুতি দ্বারা নয়। তিনি নির্মাণ করেন কিন্তু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা নয়। তিনি ইন্দ্রিয়ের অগোচর কিন্তু তাঁকে গুপ্ত বলা যায় না। তিনি মহান কিন্তু তাঁকে উদ্ধত বলা যায় না। তিনি দেখেন কিন্তু দৃষ্টি ইন্দ্রিয় দ্বারা নয়। তিনি করুণাপ্রবণ কিন্তু ইহাকে হৃদয়ের দুর্বলতা বলা যায় না। তাঁর মহত্বের কাছে সকল মস্তক অবনত হয় এবং তাঁর ভয়ে সকল হৃদয় কম্পিত হয়।

★★★★★

খোৎবা-১৭৯

আমিরুল মোমেনিনের অবাধ্য লোকদের নিন্দা সম্পর্কে

আমি আল্লাহ্র প্রশংসা করি, সেসব ব্যাপারে যা তিনি নির্ধারিত করে দিয়েছেন এবং যা তিনি অদৃষ্টে লিপিবদ্ধ করেছেন। হে জনতার দল, তোমরা যারা আমার আদেশ পালন কর না এবং আমার আহবানে সাড়া দাও না তোমাদের সাথে আমার বিচারের জন্য আমি আল্লাহ্র প্রশংসা করি। যখন তোমরা একটু সুখে থাক তখন তোমরা আত্মগর্বে বাগাড়ম্বর কর, কিন্তু যুদ্ধের কথা শুনলেই দুর্বল হয়ে পড়। যখন মানুষ ইমামের সাথে ঐকমত্য পোষণ করে তখন তোমরা একে অপরকে উপহাস কর। যদি তোমরা কষ্টসাধ্য কোন বিষয়ের সম্মুখীন হও তবে তোমরা উহা হতে মুখ ফিরিয়ে নাও। তোমরা পিতৃহীন হও (তোমাদের ওপর লানত!), তোমাদের অধিকার আদায়ের জন্য যুদ্ধ করতে তোমরা কার সাহায্যের আশায় অপেক্ষা করে আছো? তোমাদের জন্য রয়েছে হয় মৃত্যু না হয় অসম্মানজনক জীবন। আল্লাহ্র কসম, তোমাদের সাথী হয়ে আমি পীড়িত এবং তোমাদের সঙ্গে থেকেও আমি নিজকে একাকী মনে করি। আমার দিন ঘনিয়ে এসে তোমাদের সাথে বিচ্ছেদ ঘটলে উত্তম হতো।

আল্লাহ্ তোমাদের ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। তোমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারে এমন কোন দ্বীন বা তোমাদেরকে তেজস্বী করতে পারে এমন কোন লজ্জাবোধ কি নেই? এটা কি আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, মুয়াবিয়া কতিপয় রূঢ় নীচ লোককে ডাক দিয়েছে, তারা তাকে কোন প্রকার দ্বিধা ব্যতিরেকে অনুসরণ করছে; আর আমি যখন তোমাদেরকে আহ্বান করি, তোমরা ইসলামের উত্তরাধিকারী ও যোগ্য লোক হওয়া সত্ত্বেও আমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড় এবং আমার বিরোধিতা কর? সত্য কথা হলো, আমার ও তোমাদের মধ্যে এমন কিছু নেই যা আমি পছন্দ করি এবং তোমরাও পছন্দ কর; অথবা যে বিষয়ে আমি রাগান্বিত হই উহার বিরুদ্ধে তোমরা ঐক্যবদ্ধ হতে পার। আমি এখন যেটা সবচাইতে বেশী ভালবাসি তা হলো মৃত্যু। আমি তোমাদেরকে কুরআন শিক্ষা দিয়েছি, যুক্তিসমূহ তোমাদের কাছে ব্যাখ্যা করে বলেছি, যে বিষয়ে তোমরা অজ্ঞ ছিলে তা তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছি এবং যা তোমরা থুথুর মত ফেলে দিচ্ছিলে তা তোমাদেরকে গিলিয়ে দিয়েছি। সব কিছু এমনভাবে বলে দিয়েছি যাতে একজন অন্ধলোকও দেখতে পায় এবং একজন ঘুমন্ত লোকও জেগে ওঠে। অপরপক্ষে তাদের নেতা মুয়াবিয়া ও তাদের প্রশিক্ষক ইবনে আন-নাবিগাহ্[১] আল্লাহ্ সম্পর্কে কতই না অজ্ঞ।

১। লায়লা বিনতে হারমালাহ্ আল-আনাজিয়াহ্-এর ডাক নাম হলো আন-নাবিগাহ্। সে আমর ইবনে আ'স-এর মাতা। আমরকে তার মায়ের নামানুসারে 'ইবনে নাবিগাহ্' বলে উল্লেখ করার কারণ হলো একটা বিশেষ চরিত্রের জন্য তাকে (আমরের মাকে) সবাই চিনতো। একদিন আরওয়া বিনতে আল-হারিছ ইবনে আবদাল মুত্তালিব মুয়াবিয়ার কাছে গিয়ে কথা বলতেছিলেন। তাদের কথোপকথনের মধ্যে আমর ইবনে আ'স হস্তক্ষেপ করলে আরওয়া বললেন, "ওহে নাবিগাহ্র পুত্র, তুই কোন্ সাহসে আমার কথার মধ্যে হস্তক্ষেপ করিস্। তোর মা ছিল জনগণের জন্য খোলা ও মক্কার গায়িকা। সেজন্য পাঁচজন লোকে তোকে পুত্র বলে দাবী করেছিল। তোর মাকে জিজ্ঞেস করা হলে সেও স্বীকার করেছিল যে, পাঁচজন লোক

তার কাছে গিয়েছিলো। অবশেষে সিদ্ধান্ত হলো যার সাথে তোর চেহারার বেশী মিল হবে তার পুত্র বলেই তুই পরিচিত হবি। তোর চেহারা আ'স ইবনে ওয়াইলের সাথে বেশী মিল আছে বলেই তুই তার পুত্র বলে পরিচিত।"

উক্ত পাঁচজন লোকের নাম হলো–(১) আ'স ইবনে ওয়াইল, (২) আবু লাহাব, (৩) উমাইয়া ইবনে খালাফ, (৪) হিশাম ইবনে মুগিরাহ্ ও (৫) আবু সুফিয়ান ইবনে হারব (রাব্বিহ[১১৮], ২য় খন্ড, পৃঃ ১২০; বাগদাদী[৯২], পৃঃ ২৭; হামাবী[১৫৯], ১ম খন্ড, পৃঃ ১৩২; সাফওয়াত[১৪০], ২য় খন্ড, পৃঃ ৩৬৩; হাদীদ[১৫২], ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃঃ ২৮৩-২৮৫, ২৯১; শাফেয়ী[১৩৩], ১ম খন্ড, পৃঃ ৪৬)।

★★★★★

খোৎবা-১৮০

কুফার একটি সৈন্যদল খারিজীদের সঙ্গে যোগ দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে আমিরুল মোমেনিন তাদের সংবাদ আনার জন্য তাঁর একজন লোককে পাঠিয়েছিলেন। সে ফিরে এলে আমিরুল মোমেনিন জিজ্ঞেস করলেন, "তারা কি সন্তুষ্ট ও পথে ফিরে আসবে নাকি দুর্বলতা অনুভব করছে ও বিপথগামী হয়ে যাচ্ছে?" লোকটি প্রত্যুত্তরে বললো, "তারা চলে গেছে, হে আমিরুল মোমেনিন।" তখন তিনি বললেনঃ

তাদের কাছ থেকে আল্লাহ্র রহমত দূরে সরে থাকুক যেমনটি হয়েছিল ছামুদ জাতির বেলায়। জেনে রাখো, যখন তাদের প্রতি সজোরে বর্শা নিক্ষিপ্ত হবে এবং তাদের মাথায় তরবারির আঘাত পড়বে তখন তারা তাদের কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা করবে। নিশ্চয়ই, আজ শয়তান তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করেছে; কাল সে তাদের সাথে সকল সম্পর্ক অস্বীকার করবে এবং তাদেরকে পরিত্যাগ করবে। হেদায়েত থেকে সরে পড়া, গোমরাহী ও অন্ধত্বের দিকে ফিরে যাওয়া, সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া এবং বিভ্রান্তিতে নিপতিত হওয়াই তাদের শাস্তির জন্য যথেষ্ট।

১। সিফ্‌ফিনের যুদ্ধে বনি নাযিয়াহ্ গোত্রের খিররিট ইবনে রশিদ আন-নাযি নামক একজন লোক আমিরুল মোমেনিনের পক্ষে ছিল। কিন্তু সালিশীর পর সে বিদ্রোহী হয়ে ত্রিশজন লোকসহ আমিরুল মোমিনের নিকট এসে বললো, "আল্লাহ্র কসম, আমি আর আপনার আদেশ মান্য করবো না; আপনার পেছনে সালাত আদায় করবো না এবং আগামীকাল আপনাকে পরিত্যাগ করে চলে যাবো।" তার কথা শুনে আমিরুল মোমেনিন বললেন, "প্রথমে তুমি সালিশীর প্রকৃত কারণ ও ইহার ক্ষেত্র বিবেচনা করে দেখ এবং তৎপর এ বিষয়ে আমার সাথে আলোচনা কর। যদি তাতে তুমি সন্তুষ্ট না হও তবে তোমার যা ইচ্ছা করো।" সে বললো যে, সে পরদিন আলোচনা করতে আসবে। আমিরুল মোমেনিন তাকে সতর্ক করে দিয়ে বললেন, " দেখ, এখান থেকে যাবার পর তুমি যেন অন্যদের দ্বারা বিপথগামী হয়ে না যাও। তুমি অন্য কোন পথ গ্রহণ করো না। যদি তোমার বুঝবার ইচ্ছা থাকে তবে আমি তোমাকে এই বিভ্রান্ত পথ থেকে বের করে আনবো এবং হেদায়েতের পথ তোমাকে দেখিয়ে দেব।" একথা বলার পর সে চলে গেল। যাবার কালে তার মুখের ভাব থেকে বুঝা গিয়েছিল যে, বিদ্রোহের দিকেই তার ঝোঁক বেশী এবং সে কোন যুক্তি গ্রহণ করতে নারাজ। প্রকৃতপক্ষে হয়েছিলও তা-ই। সে তার গোত্রের লোকদের কাছে ফিরে গিয়ে বললো, "আমরা যখন আলীকে ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি তখন আর তার কাছে ফিরে যাবার কোন দরকার নেই। আমরা আমাদের সিদ্ধান্তানুযায়ী কাজ করবো।" অতঃপর আবদুল্লাহ্ ইবনে কুয়ান আল-আজদি বিষয়টি জানার জন্য তাদের কাছে গেল। অবস্থা জানতে পেরে তিনি মাদ্রিক ইবনে রায়ান আন-নাযিকে অনুরোধ করেছিলেন যেন তার সাথে কথা বলে এবং বিদ্রোহের ধ্বংসাত্মক পরিণতি সম্বন্ধে তাকে বুঝিয়ে বলেছিলেন। এতে মাদ্রিক তাকে নিশ্চয়তা প্রদান করেছিল যে, এরূপ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে খিররিটকে অনুমতি দেয়া হবে না। তৎপর

আবদুল্লাহ্ সন্তুষ্ট হয়ে ফিরে এসে আমিরুল মোমেনিনকে ঘটনা সবিস্তারে জানালেন। আমিরুল মোমেনিন বললেন, "দেখা যাক, সে আসলে অবস্থা কি দাড়ায়।" কিন্তু নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হবার পরও সে না আসায় আমিরুল মোমেনিন আবদুল্লাহ্‌কে আবার পাঠালেন। আবদুল্লাহ্ গিয়ে দেখলেন যে তারা সেই স্থান ত্যাগ করে চলে গেছে। তিনি ফিরে এসে আমিরুল মোমেনিনকে বিষয়টি জানালে তিনি এ খোৎবা প্রদান করেন। খিররিটের দুর্ভাগ্যজনক অবস্থা ৪৪ নং খোৎবায় বর্ণিত হয়েছে।

★★★★★

খোৎবা-১৮১

আল্লাহ্‌র গুণরাজী, তাঁর সত্তা ও তাঁর বান্দা সম্পর্কে

(নাওয়াফ আল বিকালী বর্ণনা করেছেন যে, আমিরুল মোমেনিন আলী কুফায় এ খোৎবা প্রদান করেছিলেন। জাদাহ্ ইবনে হুবায়রাহ্ আল-মাখদুমী একটি পাথর এগিয়ে দিলে উহার ওপর দাঁড়িয়ে এ খোৎবা দেয়া হয়েছিল। এ সময় আমিরুল মোমেনিনের গায়ে পশমী পোষাক ছিল। তাঁর তরবারির বেল্ট পাতার তৈরী এবং তাঁর পায়ের সেন্ডেল তাল পাতার তৈরী ছিল। তাঁর কপালে দীর্ঘ সেজদার কারণে একটা শক্ত কাল দাগ ছিল)

প্রতিষ্ঠিত প্রশংসা আল্লাহ্‌র যাঁর কাছে সকল সৃষ্টির প্রত্যাবর্তন এবং সকল বিষয়ের পরিসমাপ্তি। আমরা তাঁর মহান উদার্যের জন্য প্রশংসা করি, তাঁর প্রমাণের দয়ার জন্য প্রশংসা করি এবং তাঁর নেয়ামত ও অনুকম্পার জন্য প্রশংসা করি। এমন প্রশংসা করি যা তাঁর অধিকার পূর্ণ করতে পারে (অর্থাৎ যা তাঁর প্রাপ্য), যা তাঁর আশীর্বাদের প্রতিদান হতে পারে, যা তাঁর পুরস্কারের কাছে আমাদেরকে নিয়ে যেতে পারে এবং যাতে আমাদের প্রতি তাঁর দয়া বৃদ্ধি পেতে পারে। আমরা সেসব লোকের মত তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করি যারা তাঁর নেয়ামতের জন্য আশান্বিত, তাঁর উপকারের জন্য আকাঙ্খিত, তাঁর দুর্যোগ প্রতিরোধের জন্য দৃঢ়ভাবে আশ্বস্ত; যারা তাঁর দানের স্বীকৃতি দেয় এবং কথায় ও কাজে তাঁর প্রতি অনুগত। আমরা সেব্যক্তির মত তাঁকে বিশ্বাস করি যে সুদৃঢ় আস্থা সহকারে তাঁর আশা করে, মোমেনের মত তাঁর প্রতি ঝুঁকে থাকে, নিতান্ত দীনতার সাথে তাঁর আনুগত্য করে, তাঁর একত্বকে নির্ভেজালভাবে বিশ্বাস করে, তাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করে, তাঁর মহিমা স্বীকার করে এবং সর্বান্তঃকরণে তাঁর আশ্রয় প্রার্থনা করে।

মহিমান্বিত আল্লাহ্ জন্মগ্রহণ করেননি যাতে কেউ মর্যাদায় তাঁর অংশীদার হতে পারে। তিনি কাউকে জন্ম দেন নি যাতে তাঁর কোন উত্তরাধিকারী থাকতে পারে। সময় ও কাল তাঁকে অতিক্রম করতে পারে না (অর্থাৎ তাঁর কাছে সময় ও কাল বলতে কিছু নেই)। তাঁর কোন হ্রাস-বৃদ্ধি নেই। কিন্তু তিনি তাঁর কঠোর নিয়ন্ত্রণ ও সুদৃঢ় রায় প্রত্যক্ষণের মাধ্যমে আমাদের অনুভূতিতে নিজকে প্রকাশ করেছেন। তাঁর সৃষ্টির বিস্ময়কর প্রমাণ হলো আকাশসমূহ যা তিনি কোন স্তম্ভ ছাড়াই ঝুলিয়ে রেখেছেন। তিনি উহাদেরকে আহ্বান করেছিলেন এবং উহারা কোন প্রকার অলসতা বা বিরক্তি ছাড়াই বিনীত ও অনুগতভবে তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়েছিল। যদি উহারা তাঁর প্রভুত্ব স্বীকার না করতো এবং তাঁকে মান্য না করতো তবে তিনি উহাতে তাঁর আরশ স্থাপন করতেন না, তাঁর ফেরেশতাদের বসতি স্থাপন করতেন না এবং তাঁর বান্দাদের সকল পবিত্র কথা ও ন্যায় কাজেরও গন্তব্যস্থল হিসাবে উহাদেরকে নির্দিষ্ট করতেন না।

তিনি আকাশের নক্ষত্ররাজীকে নিদর্শন করেছেন যাতে পৃথিবীর বিভিন্ন পথে ভ্রমণকারীগণ পথের দিশা পায়। রাতের নিকশ কালো অন্ধকারের পর্দা উহাদের আলোক শিখা প্রতিহত করতে পারে না। আকাশে ছড়িয়ে পড়া চাঁদের কিরণকেও রাতের কালো-ঘোমটা ফিরিয়ে দেয়ার ক্ষমতা রাখে না। সকল মহিমা আল্লাহ্র যাঁর কাছে অন্ধকারের কৃষ্ণতা, পৃথিবীর নীচু অংশে ও পর্বতের চূড়ায় পতিত নিকশ কালো অন্ধকার, মেঘের গর্জন, দিক বলয়ের বিদ্যুত চমকানো, বাতাসে ঝরে পড়া পাতা, আকাশ হতে বারি বর্ষণ— কোন কিছুই গোপন নয়। তিনি জানেন কোথায় ফোঁটা পড়ে, কোথায় উহা অবস্থান করে, কোথায় শুককীট উহাদের পথ পরিত্যাগ করে বা কোথায় নিজকে টেনে নিয়ে যায়, কি জীবিকা মশার জন্য যথেষ্ট এবং নারী তার গর্ভাশয়ে কি বহন করে।

প্রতিষ্ঠিত প্রশংসা আল্লাহ্র যিনি কুরসি, আরশ, আকাশ, পৃথিবী, জিন ও ইনসান অস্তিত্বমান হওয়ার পূর্বেই বিদ্যমান ছিলেন। কল্পনা দ্বারা তাঁকে অনুভব করা যায় না এবং বোধগম্যতা দ্বারা তাঁকে পরিমাপ করা যায় না। কেউ তাঁর কাছে যাচ্না করলে অন্যদের দিক হতে তাঁর দৃষ্টি সরে যায় না এবং দান করে তাঁর ভান্ডে কখনো ঘাটতি দেখা দেয় না। চোখের দৃষ্টি দ্বারা তিনি দেখেন না এবং তিনি কোন নির্দিষ্ট স্থানে সীমাবদ্ধ নন। তাঁর কোন সাথী-সঙ্গী নেই। অঙ্গ-প্রতঙ্গের সাহায্যে তিনি সৃষ্টি করেন না। ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে তাঁকে উপলব্ধি করা যায় না। কোন মানুষ বা কোন কিছুর মত তাঁকে চিন্তা করা যায় না।

তিনি আলজিহ্বা বা অন্য কোন শব্দ-ইন্দ্রিয় ছাড়াই মুসার সাথে সুস্পষ্টভাবে কথা বলেছিলেন এবং কোন প্রকার শারীরিক প্রকাশ ছাড়াই মুসাকে তাঁর মহান নিদর্শন দেখিয়েছিলেন। ওহে, তোমরা যারা আল্লাহ্র বর্ণনা করতে নিজেদেরকে নিয়োজিত করতে চাও এবং যদি তোমরা এ বিষয়ে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হও তবে প্রথমে জিব্রাইল, মিকাঈল বা অন্য ফেরেশতাদের বর্ণনা করতে চেষ্টা করো। এসব ফেরেশতাগণ আল্লাহ্র মহিমার আধারের নিকটবর্তী; কিন্তু তাদের মস্তক সর্বদা অবনত এবং মহান স্রষ্টার পরিসীমা নির্ণয় করতে তাদের বুদ্ধিমত্তা স্থবির হয়ে পড়ে। এর কারণ হলো, সে সব বস্তু গুণের মাধ্যমে অনুভব করা যায় যার আকৃতি আছে, অংশ আছে এবং যা সময় অতিক্রান্ত হলে মৃত্যুর অধীন। তিনি ব্যতীত আর কোন মাবুদ নেই। তিনি তাঁর দ্যুতি দ্বারা সকল অন্ধকারকে আলোকিত করেছেন এবং মৃত্যু দ্বারা সকল আলোকে অন্ধকার করেছেন।

অতীত লোকদের থেকে শিক্ষা গ্রহণ সম্পর্কে

হে আল্লাহ্র বান্দাগণ, আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি যে, আল্লাহ্কে ভয় করা তোমাদের অভ্যাসে পরিণত কর। তিনি তোমাদেরকে জীবনধারণের প্রচুর উপকরণ দান করেছেন এবং তোমাদেরকে উত্তম পরিধেয় দিয়েছেন। যদি কারো পক্ষে অনন্ত জীবন লাভ করা সম্ভব হতো এবং মৃত্যুকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হতো তবে তিনি ছিলেন সুলায়মান ইবনে দাউদ। আল্লাহ্ তাঁকে নবুওয়াত দান করেছিলেন এবং তৎসাথে জীন ও ইনসানের ওপর নিয়ন্ত্রণ ও বাদশাহী দান করেছিলেন। কিন্তু যখন তাঁর জন্য নির্ধারিত জীবনোপকরণ নিঃশেষ হয়ে গেল এবং তাঁর সময় ফুরিয়ে গেল তখন ধ্বংসের ধনুক তাঁর প্রতি মৃত্যু-তীর নিক্ষেপ করলো। তাঁর ঘর শূন্য হয়ে গেল এবং তাঁর বসতি খালি হয়ে গেল। অন্য একদল লোক তাঁর উত্তরাধিকারী হয়ে গেল। নিশ্চয়ই, অতীত হয়ে যাওয়া শতাব্দীগুলোতে তোমাদের জন্য শিক্ষা রয়েছে।

কোথায় আজ আমালে কিটগণ[১] ও তাদের পুত্রগণ? কোথায় আজ ফেরাউনগণ[২]? কোথায় আজ আর-রাশ[৩] নগরীর জনগণ? যারা তাদের নবীকে হত্যা করেছিল এবং নবীর সুন্নাত ধ্বংস করে স্বৈরশাসকের বিধান পুনরুজ্জীবিত করেছিল? কোথায় আজ সেইসব লোক যারা সসৈন্যে অগ্রসর হয়ে হাজার হাজার লোককে পরাজিত করে দেশ জয় করে নিয়েছিল এবং নগরীর পর নগরী জয় করে বসতি স্থাপন করেছিল?

ইমাম মাহ্দী সম্পর্কে

তিনি জ্ঞানের বর্ম পরিধান করবেন যা তাঁকে সকল অবস্থায় নিরাপদ রাখবে। তাঁর জ্ঞান-বর্মের প্রতি সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকবে এবং সকলেই উহার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়বে। তাঁর জন্য এটা এমন জিনিসের মত হবে যা হারিয়ে গিয়েছিল এবং খোঁজা-খুঁজি করা হচ্ছিলো। অথবা উহা এমন প্রয়োজনের মত হবে যা মিটানোর জন্য চেষ্টা করা হচ্ছিলো। যদি ইসলাম কোন বিপদের সম্মুখীন হয় তবে তিনি ভ্রমণকারী পথিকের মত বিচলিত হয়ে পড়বেন এবং মাটিতে শুয়ে থাকা পরিশ্রান্ত উটের লেজের অগ্রভাগে আঘাত করলে যেভাবে লাফিয়ে ওঠে তদ্রূপ লাফিয়ে ওঠবেন। তিনি আল্লাহ্র সর্বশেষ প্রমাণ এবং রাসুলের (সঃ) মনোনীত প্রতিনিধিদের অন্যতম।

নিজের শাসন পদ্ধতি ও অনুচরদের শাহাদত বরণে শোক

হে জনমন্ডলী, পয়গম্বরগণ যেভাবে তাঁদের লোকদের উপদেশ দিতেন আমিও সেভাবেই তোমাদেরকে উপদেশ দিয়েছি এবং পয়গম্বরগণের তিরোধানের পর তাঁদের মনোনীত প্রতিনিধিগণ মানুষকে যা বলতেন আমিও তাই বলেছি। আমি তোমাদেরকে প্রশিক্ষণ দিতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছি, কিন্তু তোমরা সোজা হলে না। আমি তোমাদেরকে সতর্কাদেশসহ পরিচালিত করেছিলাম, কিন্তু তোমরা যথাযথ আচরণ অর্জন করতে পারনি। আল্লাহ্ তোমাদের বিচার করুন! তোমাদেরকে সত্যপথে নেয়ার জন্য সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য তোমরা কি আমি ছাড়া অন্য কোন ইমাম চাও?

সাবধান, এ পৃথিবীতে যা অগ্রণী ছিল তা আজ অতীত হয়ে গেছে এবং যা পেছনে পড়েছিলো তা আজ অগ্রণী হয়ে পড়েছে। আল্লাহ্র দ্বীনে প্রতিষ্ঠিত লোকগণ এ পৃথিবী ত্যাগ করে চলে যাবার জন্য মনস্থির করে ফেলেছে এবং তারা নশ্বর দুনিয়ার ভোগ-বিলাসের বিনিময়ে আখেরাতের প্রচুর পুরস্কার ক্রয় করে নিয়েছে যা চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে। আমাদের যেসব ভাই সিফ্ফিনে তাদের রক্ত দিয়ে শহীদ হয়েছে, আজ বেঁচে নেই বলে তাদের কি ক্ষতি হয়েছে? শুধু এটুকু হয়েছে যে, তারা আজ শ্বাসরুদ্ধকর খাদ্য ও ঘোলাটে পানির কষ্ট পোহাচ্ছে না। আল্লাহ্র কসম, তারা আল্লাহ্র সাক্ষাৎ লাভ করেছে এবং তিনি তাদেরকে তাদের পুরস্কার প্রদান করেছেন। নিশ্চয়ই, তিনি তাদেরকে নিরাপদ আশ্রয়ে রেখেছেন।

কোথায় আমার সেসব ভ্রাতৃবৃন্দ যারা সত্যপথ অবলম্বন করেছিল এবং ন্যায়ের পথে পদচারণা করেছিল? কোথায় আম্মার[৪]? কোথায় ইবনে তাইহান[৫]? কোথায় যুশ শাহাদাতাইন[৬]? কোথায় তাদের মত অন্যান্য ভ্রাতৃবৃন্দ যারা শাহাদতকে আলিঙ্গন করেছিল এবং যাদের দ্বিখন্ডিত মস্তক দুরাচার শত্রুগণ নিয়ে গিয়েছিল।

এরপর আমিরুল মোমেনিন তার পবিত্র দাড়িতে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে অনেকক্ষণ কাঁদলেন এবং তারপর বলতে লাগলেন ঃ

হে আমার ভ্রাতৃবৃন্দ, তোমরা আজ কোথায় যারা কুরআন তেলওয়াত করেছিলে ও উহাকে শক্তিশালী করেছিলে, নিজেদের দায়িত্ব সম্বন্ধে চিন্তা করেছিলে ও উহা পরিপূর্ণ করেছিলে, সুন্নাহ্ পুনরুজ্জীবিত করেছিলে এবং বিদা'ত ধ্বংস করেছিলে। যখন তাদেরকে জিহাদে আহ্বান করা হয়েছিল তারা সাড়া দিয়েছিল এবং তাদের নেতার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তাকে অনুসরণ করেছিল।

এরপর আমিরুল মোমেনিন তারস্বরে চিৎকার করে বললেন ঃ

জিহাদ, জিহাদ, হে আল্লাহ্র বান্দাগণ, আল্লাহ্র কসম, আমি আজই সৈন্যবাহিনী সমবেত করে প্রস্তুত করবো। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র দিকে অগ্রসর হতে চায় সে এগিয়ে আসতে পারে।

(বর্ণনাকারী নাওয়াফ আল-বিকালী বলেনঃ অতঃপর আমিরুল মোমেনিন তাঁর পুত্র হুসাইনকে দশ হাজার, কায়েস ইবনে সা'দকে দশ হাজার এবং আবু আইউব আল-আনসারীকে দশ হাজার সৈন্যের অধিনায়ক নিয়োগ করেছিলেন এবং অন্য কয়েকজনকেও বিভিন্ন সংখ্যক সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক নিয়োগ করেছিলেন। পরবর্তী শুক্রবার সিফ্‌ফিন অভিমুখে যাত্রা করার জন্য অধিনায়কগণকে নির্দেশ দিলেন। কিন্তু সেই শুক্রবার আর ফিরে এলো না। অভিশপ্ত ইবনে মুলজান (তার ওপর আল্লাহর লানত) তৎপূর্বেই তাঁকে নিহত করেছিল। ফলে তাঁর সৈন্যবাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লো এবং রাখাল বিহীন ভেড়ার পালের মত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিলো এবং তাদেরকে নেকড়ের দল ধরে নিয়ে যেতে লাগলো)।

১। আমালে কিট্‌স ঃ এরা হলো প্রাচীন যাযাবর গোত্রসমষ্টি যাদের কথা তৌরাতে উল্লেখ করা হয়েছে এবং এরা ছিল ইসরাইলদের ঘোরতর শত্রু। কিন্তু এরা ছিল বারটি ইসরাইল গোত্রের অন্তর্ভুক্ত এফ্রাইম গোত্রের নিকট আত্মীয়। আমালেক নামক আরবীয় সংস্কৃতির একজন লোকের নামানুসারে এদের নামকরণ করা হয়, কিন্তু এখন আর সুনির্দিষ্টভাবে তার পরিচয় পাওয়া যায় না। যে এলাকায় এদের বসবাস ছিল বলে ধরা হয় তা হলে যুদাহ্ পর্বতের দক্ষিণ হতে উত্তর-আরব পর্যন্ত। হিব্রুগণ যখন সদলে মিশর পরিত্যাগ করে যাচ্ছিলো তখন এরা সিনাই পর্বতের নিকটবর্তী রেফিডিম নামক স্থানে তাদেরকে আক্রমণ করেছিল। সেখানে এরা যোসুয়ার নিকট পরাজয় বরণ করে। এরা যাযাবর লুটেরা দলে পরিণত হলে গিভিয়ন কর্তৃক পরাজিত হয় এবং স্যামুয়েল এদেরকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেয়। হেজেকিয়ার সময়ে একটি অনন্ত অভিশাপের কারণে এরা বিলুপ্ত হয়ে যায় (এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা, ১ম খন্ড; ১৯৭৩-৭৪, পৃঃ ২৮৮ এবং এনসাইক্লোপেডিয়া আমেরিকানা, ১ম খন্ড, ১৯৭৫, পৃঃ ৬৫১)

২। ফেরাউনঃ মিশরীয় হিব্রু ভাষায় 'পারও' (মহৎ ঘর বা রাজপ্রাসাদ) হতে ফেরাউন শব্দটি আসে। মিশরের রাজকীয় উপাধি হিসাবে পরবর্তীতে ইহা গৃহীত হয়। বাইশতম বংশ হতে রাজার ব্যক্তিগত উপাধি হিসাবে শব্দটি গৃহীত হয়। সরকারী দলিল-পত্রে মিশরের রাজার পাঁচটি উপাধি দেখা যায়। প্রথম, 'হোরাস' যা বাজপাখীর প্রতিমূর্তি এবং প্রাসাদে অঙ্কিত থাকতো। দ্বিতীয়, 'দুই নারী' যা নেকবেত ও বুটু দেবীর আশ্রয়ে রাজাকে রাখা হয় বলে মনে করা হতো। তৃতীয়, 'গোল্ডেন হোরাস' যা সম্ভবতঃ শত্রুর ওপর জয়ী বোঝাতো। চতুর্থ ' প্রেয়েনোমেন' যা সূর্য দেব 'রি' এর সাথে সম্পর্কযুক্ত মনে করা হতো। পঞ্চম, 'নোমেন' যা 'রি-এর পুত্র' বা দু'দেশের রাজা বুঝাতো। দু'দেশ বলতে মিশরের উচ্চভূমি ও নিম্নভূমি বুঝানো হয়েছে (এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা, ৭ম খন্ড, ১৯৭৩-৭৪, পৃঃ ৯২৭; এনসাইক্লোপেডিয়া আমেরিকানা, ২১তম খন্ড, ১৯৭৫, পৃ; ৭০৭)।

ফেরাউনদের মধ্যে মুসার (আঃ) সময়কার ফেরাউনের অহঙ্কার, গর্ব ও ঔদ্ধত্য এমন পর্যায়ে গিয়েছিল যে, সে নিজকে খোদা বলে দাবী করেছিল। সে মনে করতো পৃথিবীর অন্য সকল শক্তি তার নিয়ন্ত্রণে এবং তার হাত থেকে কোন শক্তিই তার রাজত্ব কেড়ে নিতে পারবে না। ক্ষমতায় মদমত্ত হয়ে সে আল্লাহ্‌কে ভুলে গিয়েছিল। তার দাবি সম্বন্ধে আল্লাহ্ বলেন :

> *ফেরাউন তার সম্প্রদায়ের কাছে ঘোষণা করেছিলো ' হে আমার সম্প্রদায় মিশর রাজ্য কি আমার নয়? এ নদীগুলো আমার পায়ের নীচ দিয়ে প্রবাহিত; তোমরা কি তা দেখ না?' (কুরআন-৪৩ঃ৫১)*

কিন্তু তার রাজ্য কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ধ্বংস হয়ে গেল। তার কোন মর্যাদা বা রাজ্যের বিশালত্ব এ ধ্বংস ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি। বরং যে নদীকে সে পদতলগত বলে দাবি করেছিল সে নদীর ঢেউ তাকে ডুবিয়ে তার রূহকে জাহান্নামে প্রেরণ করে দেহকে কূলে নিক্ষেপ করেছিল যাতে সমগ্র সৃষ্টি শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

৩। আর-রাশ নগরী ঃ একইভাবে রাশ নগরীর জনগণ তাদের নবীর উপদেশ অমান্য করে আল্লাহ্‌র অবাধ্য হওয়ায় তাদেরকে হত্যা করে ধ্বংস করা হয়েছিল। আল্লাহ্ বলেন ঃ

> *আমি ধ্বংস করেছিলাম আদ, ছামুদ ও রাশবাসীগণকে এবং তাদের অন্তবর্তীকালে বহু সম্প্রদায়কেও। আমি তাদের প্রত্যেকের জন্য দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছিলাম এবং উহাদের সকলকেই আমি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস*

করেছিলাম (কুরআন-২৫ঃ৩৮-৩৯)। তাদের পূর্বেও সত্য প্রত্যাখ্যান করেছিল নূহের সম্প্রদায়, রাশ ও ছামুদ সম্প্রদায়; আদ, ফেরাউন ও লুত সম্প্রদায় এবং আইকার অধিবাসী ও তুব্বা সম্প্রদায়; উহারা সকলেই রাসুলগণকে মিথ্যাবাদী বলেছিল। ফলে তাদের ওপর আমার শাস্তি আপতিত হয়েছে (কুরআন-৫০ঃ১২-১৪)।

৪। আম্মার ইবনে ইয়াসির ইবনে আমির আল-মাখযুমি ছিলেন বনি মাখযুমের মুখপাত্র। ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় যে ক'জন ইসলাম গ্রহণ করেছিল তাদের মধ্যে তিনি অন্যতম। তিনিই প্রথম মুসলিম যিনি নিজের ঘরে মসজিদ নির্মাণ করে আল্লাহ্‌র ইবাদত করতেন (সা'দ[১৩৭], ৩য় খন্ড, পৃঃ ১৭৮; আছীর[১], ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ৪৬; কাছীর[৩৯], ৭ম খন্ড, পৃঃ ৩১১)।

আম্মার তাঁর পিতা ইয়াসির ও মাতা সুমাইয়ার সাথে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। ইসলাম গ্রহণের কারণে তারা কুরাইশদের হাতে অনেক নির্যাতন ভোগ করেছিলেন। এমনকি নির্যাতনের চোটে আম্মার তার বাবা ও মাকে হারিয়েছিলেন এবং তারা উভয়ে ইসলামের প্রথম শহীদ।

যারা আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছিল তাদের মধ্যে আম্মারও ছিলেন এবং তিনি আবিসিনিয়া হতে প্রথম দিকেই মদিনায় হিজরত করেছিলেন। তিনি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং রাসুলের (সঃ) সময়ের সকল যুদ্ধ ও মুসলিম সমাবেশে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ইসলামের জন্য তিনি ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ। তাঁর ধার্মিকতা, বিশিষ্ট চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও সৎকর্মের জন্য রাসুলের (সঃ) অনেক হাদিস রয়েছে। আয়শা ও অন্যান্য বেশ কয়েকজন হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুল (সঃ) বলেছেন, "আম্মারের আপাদমস্তক ইমানে ভরপুর" (মাজাহ[১০৫], ১ম খন্ড, পৃঃ ৬৫; ইসফাহানী[৩১], ১ম খন্ড, পৃঃ ১৩৯; শাফেয়ী[১২৮], ৯ম খন্ড, পৃঃ ২৯৫; বার[৯৭], ৩ খন্ড, পৃঃ ১১৩৭; হাজর[১৫০], ২য় খন্ড, পৃঃ ৫১২)।

আম্মার সম্পর্কে অন্য একটি হাদিসে বর্ণিত আছে যে রাসুল (সঃ) বলেছেনঃ

আম্মার সত্যের সাথে এবং সত্য আম্মারের সাথে। সত্য যেদিকে আম্মার সেদিকে। চক্ষু নাকের যেরূপ নিকটবর্তী আম্মার আমার তদ্রূপ নিকটবর্তী। হায়, হায়! একটি বিদ্রোহী দল তাকে হত্যা করবে (সা'দ[১৩৭], ৩য় খন্ড, পৃঃ১৮৭; নায়সাবুরী[৮৪], ৩য় খন্ড, পৃঃ ৩৯২; হিশাম[১৬২], ৩য় খন্ড, পৃঃ ১৪৩; কাছীর[৩৯], ৭ম খন্ড, পৃঃ ২৬৮ ও ২৭০)।

পঁচিশজন সাহাবার সূত্রে প্রায় সকল হাদিস গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসুল (সঃ) বলেছেন ঃ

হায়, হায়! সত্যত্যাগী একদল বিদ্রোহী আম্মারকে হত্যা করবে। আম্মার তাদেরকে জান্নাতের দিকে আহ্বান করবে এবং তারা আম্মারকে জাহান্নামের দিকে ডাকবে। তার হত্যাকারী এবং যারা তার অস্ত্র ও পরিচ্ছদ খুলে ফেলবে তারা জাহান্নামের অধিবাসী (বুখারী[১০২], ৮ম খন্ড, পৃঃ ১৮৫-১৮৬; তিরমিযী[৮০], ৫ম খন্ড; পৃঃ ৬৬৯; হাম্বল[১৬০], ২য় খন্ড, পৃঃ ১৬১, ১৬৪, ২০৬; ৩য় খন্ড, পৃঃ ৫, ২২, ২৮, ৯১; ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ১৯৭, ১৯৯; ৫ম খন্ড, পৃঃ ২১৫, ৩০৬, ৩০৭; ৬ষ্ট খন্ড, পৃঃ ২৮৯, ৩০০, ৩১১, ৩১৫)।

এই হাদিসটির সত্যতা ও সঠিকতা সম্পর্কে প্রায় সকল হাদিসবেত্তা ও ঐতিহাসিক একমত পোষণ করেন। আসকালানী[২৫] (৭ম খন্ড, পৃঃ ৪০৯), হাজর[১৫০] (২য় খন্ড, পৃঃ ৫১২) ও সুয়ুতি[১৪৬] (২য় খন্ড, পৃঃ ১৪০) লিখেছেন যে, এই হাদিসটির বর্ণনা অত্যন্ত মুতাওয়াছির (অর্থাৎ এত বেশী লোক দ্বারা বর্ণিত যে, এতে কোন প্রকার সন্দেহ থাকার অবকাশ নেই)। বার[৯৭] (৩য় খন্ড, পৃঃ ১১৪০) লিখেছেন যে, রাসুলের (সঃ) সময় হতে এ হাদিসটির "একটি বিদ্রোহী দল আম্মারকে হত্যা করবে" অংশ অবিকৃত অবস্থায় রয়েছে এবং ইহা রাসুলের (সঃ) গুপ্ত জ্ঞান দ্বারা একটি ভবিষ্যদ্বাণী।

রাসুলের (সঃ) তিরোধানের পর প্রথম খলিফার রাজত্বকালে আম্মার আমিরুল মোমেনিনের বিশেষ সমর্থক ও অনুচর ছিলেন। উসমানের খেলাফতকালে বায়তুল মাল বন্টনে দূর্নীতিমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যখন জনগণ সোচ্চার হয়ে উঠলো তখন এক জনসমাবেশে উসমান বলেছিলেন, "বায়তুল মাল পবিত্র এবং ইহা আল্লাহ্‌র সম্পদ। রাসুলের উত্তরসূরী হিসাবে আমার ইচ্ছামত ইহা বন্টন করার অধিকার আমার আছে। যারা আমার কথা ও কাজের সমালোচনা করে তারা অভিশপ্ত এবং তাদেরকে কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে।" তখন আম্মার জোর গলায় বলেছিলেন যে, উসমান জনসাধারণের স্বার্থ উপেক্ষা করে রাসুল (সঃ) কর্তৃক নিষিদ্ধ গোত্র-স্বার্থ ও স্বজনপ্রীতির প্রবর্তন করেছে। এতে উসমান রাগান্বিত হয়ে আম্মারকে পিটিয়ে

চেষ্টা করে দেয়ার জন্য তার লোকজনকে আদেশ দিলেন। ফলে কয়েকজন উমাইয়া আম্মারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে বেদম প্রহার করেছিল। এমনকি খলিফা নিজেই জুতা পরিহিত পায়ে তার মুখে পদাঘাত করেছিলেন। এতে আম্মার অজ্ঞান হয়ে পড়েন এবং উম্মুল মোমেনিন উম্মে সালমার পরিচর্যায় তিন দিন পর জ্ঞান ফিরে পান (বালাজুরী[১০০], ৫ম খন্ড, পৃঃ ৪৮, ৫৪, ৮৮; হাদীদ[১৫২], ৩য় খন্ড, পৃঃ ৪৭-৫২; কুতায়বাহ্[৪৭], ১ম খন্ড, পৃঃ ৩৫-৩৬; রাব্বিহ্[১১৮], ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ৩০৭; সা'দ[১৩৭], ৩য় খন্ড, পৃঃ ১৮৫; বাকরী[৯০], ২য় খন্ড; পৃঃ ২৭১)।

আমিরুল মোমেনিন খলিফা হবার পর আম্মার তাঁর একজন একনিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন। এসময় তিনি সকল প্রকার সামাজিক, রাজনৈতিক ও প্রতিরক্ষামূলক কাজে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বিশেষ করে জামালের যুদ্ধে ও সিফ্‌ফিনের যুদ্ধে তিনি বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। যা হোক, ৩৭ হিজরী সনের ৯ই সফর সিফ্‌ফিনের যুদ্ধে তিনি নব্বই বছরের কিছু অধিক বয়সে শহীদ হয়েছিলেন। শহীদ হবার দিন আম্মার আকাশের দিকে মুখ তুলে বললেন ঃ

হে আমার আল্লাহ্, নিশ্চয়ই তুমি অবগত আছো যে, যদি আমি জানতে পারি ফোরাত নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আমার ডুবে যাওয়াই তোমার ইচ্ছা তবে আমি তাই করবো। হে আমার আল্লাহ্, নিশ্চয়ই তুমি অবগত আছো যে, যদি আমি জানতে পারি আমার এই শমশের বুকের গভীরে ঢুকিয়ে পিঠ দিয়ে বের করে নিলে তুমি খুশী হবে তবে আমি তাই করবো। হে আমার আল্লাহ, আমি মনে করি এই পাপাচারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার চেয়ে সন্তোষজনক তোমার কাছে আর কিছু নেই এবং যদি আমি জানতে পারি তাদের বিরুদ্ধে অন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ তোমার কাছে অধিক প্রিয় তবে আমি তাই করবো।

আবু আবদার রহমান আস-সুলামী বর্ণনা করেছেন ঃ

আমিরুল মোমেনিনের সাথে আমরাও সিফ্‌ফিনে উপস্থিত ছিলাম। আমি দেখেছি আম্মার ইবনে ইয়াসির কোনদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে শত্রুর ব্যূহ ভেদ করে চলেছে এবং রাসুলের সাহাবাগণ এমনভাবে তাকে অনুসরণ করে চলেছিল যেন সে তাদের জন্য একটা নিদর্শন। তৎপর আমি শুনলাম আম্মার হাশিম ইবনে উতবাহকে ডেকে বললেন, ' হে হাশিম শত্রুর ব্যূহের মধ্যে দ্রুত ঢুকে পড়ো। মনে রেখো, জান্নাত তরবারির নীচে। আজ আমি আমার সব চাইতে প্রিয় ব্যক্তি মুহাম্মদ ও তাঁর দলের সাক্ষাত পেয়েছি। ' আল্লাহ্‌র কসম, তারা যদি হাজরের (বাহারাইনের একটি শহর) খেজুর বিথী অঞ্চল পর্যন্তও আমাদেরকে তাড়িয়ে নিয়ে যায় তবুও আমি বলবো নিশ্চয়ই আমরা ন্যায় ও সত্যের পথে রয়েছি এবং তারা বিপথগামী ও বিভ্রান্ত। অতঃপর শত্রুকে সম্বোধন করে আম্মারকে বলতে শুনলাম,'পবিত্র কুরআনের প্রত্যাদেশ বিশ্বাস করার জন্য আমরা তোমাদেরকে আঘাত করেছিলাম; এবং আজ উহার ব্যাখ্যা বিশ্বাস করার জন্য আঘাত করছি; এমন আঘাত হানবো যাতে মস্তক দ্বিখন্ডিত হয়ে তোমরা চির বিশ্রাম স্থলে চলে যাও; এবং যাতে তোমরা এক বন্ধু অপর বন্ধুর নাম ভুলে যাও; এ আঘাত ততক্ষণ পর্যন্ত চলবে যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা সত্যের দিকে ফিরে না আস।' আমি অন্য কোন যুদ্ধে রাসুলের (সঃ) এত বেশী সংখ্যক সাহাবাকে শহীদ হতে দেখিনি যত হয়েছিল আম্মারের নেতৃত্বে সে দিন।"

আম্মার শত্রু সৈন্যব্যূহের মধ্যে প্রবেশ করে একের পর এক আক্রমণ রচনা করে তাদের নাস্তানাবুদ করে দিচ্ছিলো। এ সময় একদল নীচ প্রকৃতির সিরিয়ান তাঁকে চতুর্দিক হতে ঘিরে ফেলেছিল এবং আবু ঘাদিয়া আল-যুহরী নামক এক পিশাচ তাঁকে এমন আঘাত করেছিল যা সহ্য করতে না পেরে তিনি ক্যাম্পে ফিরে গেলেন। ক্যাম্পে ফিরেই তিনি পানি চাইলেন। লোকেরা তাঁর জন্য এক বাটি দুধ নিয়ে এলো। দুধ দেখেই আম্মার বললেন, "আল্লাহ্‌র রাসুল ঠিক কথাই বলেছেন।" লোকেরা এক কথার অর্থ জানতে চাইলে তিনি বললেন, "আল্লাহ্‌র রাসুল আমাকে একদিন বলেছিলেন এ পৃথিবীতে আমার শেষ খাদ্য হবে দুধ।" অতঃপর তিনি দুধ পান করলেন এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র কাছে তাঁর প্রাণ সমর্পণ করলেন। তাঁর মৃত্যু সংবাদ শুনে আমিরুল মোমেনিন তাঁর ক্যাম্পে এলেন এবং তাঁর মাথা নিজের কোলে তুলে নিয়ে বললেন, "নিশ্চয়ই, যদি কোন মুসলিম আম্মারের মৃত্যুতে মানসিকভাবে আহত না হয়ে থাকে এবং শোকাহত না হয়ে থাকে তবে তার ইমান যথার্থ নয়।" তৎপর আমিরুল মোমেনিন ছন্দাকারে বললেন ঃ

আম্মারের ইসলাম গ্রহণের দিন আল্লাহ্ তাকে রহমত বর্ষণ করুন, আম্মারের শাহাদতের দিন আল্লাহ্ তাকে রহমত বর্ষণ করুন, আম্মারের পুনরুত্থানের দিন আল্লাহ্ তাকে রহমত বর্ষণ করুন।

আমিরুল মোমেনিন অশ্রুসিক্ত নয়নে অতঃপর বললেন, "নিশ্চয়ই, আমার কাছে আম্মারের মর্যাদা এত উঁচু মাপের যে, রাসুলের তিনজন সাহাবার নাম করা যাবে না যদি তাকে চতুর্থজন ধরা না হয়; চারজনের নাম করা যাবে না যদি তাকে পঞ্চম ধরা না হয়। নিশ্চয়ই, রাসুল (সঃ) বলেছিলেন, 'আম্মার সত্যের সাথে এবং সত্য আম্মারের সাথে। সত্য যেদিকে আম্মার সেদিকে। তার হত্যাকারী জাহান্নামবাসী হবে।" তৎপর আমিরুল মোমেনিন নিজেই তাঁর জানাজা পড়লেন এবং তাঁর রক্তাক্ত পোশাকসহ তাঁকে নিজ হাতে কবরে শুইয়ে দিলেন।

এদিকে আম্মারের মৃত্যু মুয়াবিয়ার সৈন্যদের মধ্যে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। তাদের মনে একটা ধারণা দেয়া হয়েছিল যে, তারা ন্যায়ের জন্যই আমিরুল মোমেনিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেছিলো। কিন্তু তাদের অনেকেই আম্মার সম্পর্কে রাসুলের (সঃ) উক্ত বাণীর বিষয় অবগত ছিল। আম্মারের মৃত্যুতে তাদের ভুল ভেঙ্গে গেল। তারা বুঝতে পারলো যে, তারা অন্যায় যুদ্ধে লিপ্ত এবং আমিরুল মোমেনিন ন্যায় পথে রয়েছেন। এ চিন্তা অফিসার হতে সাধারণ সৈনিক পর্যন্ত সকলের মনে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলো। অবস্থা বেগতিক দেখে মুয়াবিয়া তার চিরাচরিত মিথ্যা, ছলনা ও কুট চালের আশ্রয় গ্রহণ করে বললো, "আম্মারের মৃত্যুর জন্য আমরা দায়ী নই। আলীই তো তাকে যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে এসেছে। কাজেই তার মৃত্যুর জন্য আলী দায়ী।" মুয়াবিয়ার এহেন ছলনাপূর্ণ উক্তি যখন আমিরুল মোমেনিনকে অবহিত করা হলো তখন তিনি মুয়াবিয়ার মূর্খতা ও মিথ্যা উক্তির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বললেন, "মুয়াবিয়া বুঝাতে চায় হামজার মৃত্যুর জন্য রাসুল দায়ী, কারণ তিনিই তাকে ওহুদের যুদ্ধে এনেছিলেন" (তাবারী[৭৫], ১ম খন্ড, পৃঃ ৩৩১৬-৩৩২২; ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৩১৪-২৩১৯; সা'দ[১৩৭], ৩য় খন্ড, পৃঃ ১৭৬-১৮৯; আছীর[২], ৩য় খন্ড, পৃ ৩০৮-৩১২ কাছীর[৩৯], ৭ম খন্ড, পৃঃ২৬৭-২৭২; মিনকারী[১১০], পৃঃ ৩২০-৩৪৫; বার[৯৭], ৩য় খন্ড, পৃঃ ১১৩৫-১১৪০; ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ১৭২৫; আছীর[১], ৪র্থ খন্ড, পৃঃ৪৩-৪৭; ৫ম খন্ড, পৃঃ২৬৭; হাদীদ[১৫২], ৫ম খন্ড, পৃঃ ২৫২-২৫৮; ৮ম খন্ড, পৃঃ ১০-২৮; ১০ম খন্ড, পৃঃ ১০২-১০৭; নায়সাবুরী[৮৪], ৩য় খন্ড, পৃঃ ৩৮৪-৩৯৪; রাব্বিহ[১১৮], ৪র্থ খন্ড, পৃঃ৩৪০-৩৪৩; মাসুদী[১০৯], ২য় খন্ড, পৃঃ ৩৮১-৩৮২; শাফেয়ী[১২৮], ৭ম খন্ড, পৃঃ ২৩৮-২৪৪; ৯ম খন্ড, পৃঃ ২৯১-২৯৮; বালাজুরী[১০০], পৃঃ ৩০১-৩১৯)

৫। ইবনে তাইহানের পূর্ণ নাম হলো আবুল হায়ছাম (মালিক) ইবনে তাইহান আল-আনসারী। তিনি ছিলেন আনসারদের বারজন নকিবের (প্রধান) অন্যতম যারা প্রথমে আকাবাহ্‌র মেলায় রাসুলের সাথে আলোচনা করেছিলেন এবং দ্বিতীয় আকাবায় যারা রাসুলকে ইসলাম গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তিনি তাদেরও অন্যতম ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন বদরী (অর্থাৎ বদর যুদ্ধে অংশগ্রহনকারী) এবং রাসুলের সময়কার সকল যুদ্ধ ও মুসলিম সমাবেশে তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি আমিরুল মোমেনিনের একনিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন। তিনি জামালের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং সিফ্‌ফিনের যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন। (বার[৯৭], ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ১৭৭৩; মিনকারী[১১০], পৃঃ ৩৬৫; আছীর[১], ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ২৭৪; ৫ম খন্ড, পৃঃ ৩১৮; হাজর[১৫০], ৩য় খন্ড, পৃঃ ৩৪১; ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ৩১২-৩১৩; হাদীদ[১৫২], ১০ম খন্ড,পৃঃ ১০৭-১০৮; বালাজুরী[১০০], পৃঃ ৩১৯)।

৬। যুশ-শাহাদাতাইনের আসল নাম হলো খুজায়মাহ্ ইবনে ছাবিত আল-আনসারী। রাসুল (সঃ) তার সাক্ষ্যকে দু'জন লোকের সাক্ষ্যের সমতুল্য সত্য বলে মনে করতেন। সেই কারণে তিনি যুশ-শাহাদাতাইন বলে পরিচিত ছিলেন। তিনি ছিলেন বদরী এবং রাসুলের জীবৎকালে তিনি সকল যুদ্ধে ও মুসলিম সমাবেশে অংশগ্রহণ করেছিলেন। যারা প্রথমেই আমিরুল মোমেনিনের বায়াত গ্রহণ করেছিল তাদের মধ্যে তিনি অন্যতম। আবদার রহমান ইবনে আবি লায়লা বর্ণনা করেছেন যে, সিফ্‌ফিনের যুদ্ধে একজন লোককে বীর বিক্রমে যুদ্ধ করতে তিনি দেখছেন এবং তিনি তার কাছাকাছি হলে সে চিৎকার দিয়ে বলেছিল, "আমি খুজায়মাহ্ ইবনে ছাবিত আল-আনসারী। আমি রাসুলকে (সঃ) বলতে শুনেছি, 'যুদ্ধ কর, যুদ্ধ কর, আলীর পক্ষে যুদ্ধ কর।' আম্মার ইবনে ইয়াসিরের অল্প কিছুক্ষণ পরের খুজায়মাহ্ শাহাদত বরণ করেন।" (বাগদাদী[৯৩],

১ম খন্ড, পৃঃ ২৭৭; আসকারী[২০], ২য় খন্ড, পৃঃ১৭৫-১৮৯; হাদীদ[১৫২], ১০ম খন্ড, পৃঃ ১০৯-১১০; সাদ[১৩৭], ৩য় খন্ড, পৃঃ ১৮৫-১৮৮; নায়সাবুরী[৮৪], ৩য় খন্ড, পৃঃ ৩৮৫-৩৯৭; আছীর[১], ২য় খন্ড, পৃঃ ১১৪; ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ৪৭; বার[৯৭], ২য় খন্ড, পৃঃ ৪৪৮; তাবারী[৭৫], ৩য় খন্ড, পৃঃ ২৩১৬-২৩১৯, ২৪০১; আছীর[২], ৩য় খন্ড, পৃঃ ২৩৫; মিনকারী[১১০], পৃঃ ৩৬৩, ৩৯৮; বালাজুরী[১০০], পৃঃ ৩১৩-৩১৪)।

৭। জামালের যুদ্ধে যারা আমিরুল মোমেনিনের পক্ষে অংশগ্রহণ করেছিল তাদের মধ্যে একশত ত্রিশ জন ছিলেন বদরী (বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী) এবং সাতশত জন ছিলেন বায়াতুর রিদওয়ানী (গাছের নীচে রাসুলের হাত ধরে যারা বায়াত গ্রহণ করেছিল)। জামালের যুদ্ধে আমিরুল মোমেনিনের পক্ষের পাঁচশত জন শহীদ হয়েছিল (মতান্তরে সাতশত জন শহীদ হয়েছিল)। আমিরুল মোমেনিনের বিপক্ষ দলের বিশ হাজার সৈন্য নিহত হয়েছিল (জাহাবী[৬৮], ২য় খন্ড, পৃঃ ১৭১; খায়াত[৫৭], ১ম খন্ড, পৃঃ ১৬৪; রাব্বিহ[১১৮], ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ৩২৬)।

সিফ্‌ফিনের যুদ্ধে আমিরুল মোমেনিনের পক্ষে আশিজন বদরী ও আটশতজন বায়াতুর রিদওয়ানী অংশগ্রহণ করেছিলেন। এ যুদ্ধে আমিরুল মোমেনিনের পক্ষের পঁচিশ হাজার জন শহীদ হয়েছিলেন। তন্মধ্যে ছাব্বিশ জন বদরী ও তিনশত তিনজন বায়াতুর রিদওয়ানী ছিলেন। আম্মার, যুশ-শাহাজাতাইন ও ইবনে তাইহান ছাড়াও দু'জন বিশিষ্ট ব্যক্তি শহীদ হয়েছিলেন। তারা হলেন-হাশিম ইবনে উতবাহ্ ইবনে আবি ওয়াক্কাস আল-মিরকল ও আবদুল্লাহ্ ইবনে বুদায়েল ইবনে ওয়ার্‌কা আল-খুজাই।

আম্মার শহীদ হবার কিছুক্ষণ পরেই হাশিম শাহাদত বরণ করেন। সেইদিন আমিরুল মোমেনিনের ঝান্ডা বাহক ছিলেন হাশিম এবং পদাতিক বাহিনীর কমান্ডার ছিলেন আবদুল্লাহ্ ইবনে বুদায়েল। সিফ্‌ফিনের যুদ্ধে মুয়াবিয়ার পক্ষে নিহত হয়েছিল পঁয়তাল্লিশ হাজার জন (নায়সাবুরী[৮৪], ৩য় খন্ড, পৃঃ ১০৪; বার[৯৭], ৩য় খন্ড, পৃঃ ১১৩৮; হাজর[১৫০], ২য় খন্ড, পৃঃ ৩৮৯; ইয়াকুবী[২৮], ২য় খন্ড, পৃঃ ১৮৮; মিনকারী[১১০], পৃঃ ৫৫৮; বার[৯৭], ২য় খন্ড, পৃঃ ৩৮৯; বালাজুরী[১০০], পৃঃ ৩২২; হাদীদ[১৫২], ১০ম খন্ড, পৃঃ ১০৪; ফিদা[৮৯], ১ম খন্ড, পৃঃ ১৭৫; ওয়ার্‌দী[৩৮], ১ম খন্ড, পৃঃ২৪০; কাছীর[৩৯], ৭ম খন্ড, পৃঃ ২৭৫; বাকরী[৯০], ২য় খন্ড, পৃঃ২৭৭)।

★★★★★

খোৎবা-১৮২

আল্লাহ্‌র নেয়ামতের জন্য প্রশংসা

প্রতিষ্ঠিত প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি দৃশ্যমান না হয়েও স্বীকৃত এবং যিনি কোন প্রকার পরিশ্রম ছাড়াই সৃষ্টি করেন। তিনি তাঁর কুদরতের সাহায্যে সৃষ্টিকে সৃষ্টিতে এনেছেন এবং তাঁর মর্যাদা ও মহত্ত্বের কারণে সকল শাসনকর্তার আনুগত্য লাভ করেন। তিনি তাঁর মহত্ত্বের মাধ্যমে সকল মহৎ মানুষের ওপর তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখেন। তিনি পৃথিবীকে তাঁর সৃষ্টি দ্বারা পরিপূর্ণ করেছেন এবং জিন ও ইনসানের প্রতি তাঁর পয়গম্বর প্রেরণ করেছেন যেন তাদের কাছে দুনিয়া উন্মোচন করা হয়, যেন দুনিয়ার ক্ষতি সম্বন্ধে তাদেরকে সতর্ক করা হয়, যেন দুনিয়ার দৃষ্টান্ত তাদের কাছে উপস্থাপন করা হয়, যেন দুনিয়ার ত্রুটি-বিচ্যুতি তাদেরকে দেখিয়ে দেয়া হয় এবং সামগ্রিক বিষয়াবলী যেন তাদের শিক্ষার জন্য তাদের সামনে উপস্থাপন করা হয়, যেমন-স্বাস্থ্যের পরিবর্তন ও রোগ-ব্যাধি, হালাল ও হারাম বিষয়াদি এবং অনুগত ও অবাধ্যের জন্য আল্লাহ্ যা নির্ধারিত করে রেখেছেন (বেহেশত ও দোযখ)। আমি তাঁর সত্তার সেরূপ প্রশংসা করি যেরূপ তিনি তাঁর বান্দার কাছে প্রত্যাশা করেন। তিনি সকল কিছুর জন্য একটি পরিমাপ নির্ধারিত করেছেন, প্রতিটি পরিমাপের জন্য একটি সময়সীমা এবং প্রতিটি সময়সীমার জন্য একটি দলিল নির্ধারিত করেছেন।

পবিত্র কুরআনের মহত্ব ও গুরুত্ব সম্পর্কে

পবিত্র কুরআন আদেশ দেয় আবার বিরতও থাকে; নীরব থাকে আবার কথাও বলে। বান্দার সম্মুখে ইহা আল্লাহ্‌র প্রমাণ। কুরআনের বিধান অনুযায়ী কাজ করার জন্য তিনি বান্দার অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন। তিনি কুরআনের দীপ্তিকে নিখুঁত করেছেন এবং ইহার মাধ্যমে তাঁর দ্বীনকে পূর্ণতা দান করেছেন। কুরআনের মাধ্যমে তাঁর হেদায়েতের আদেশাবলী মানুষের কাছে পৌছানোর পর তিনি রাসুলকে (সঃ) পৃথিবী ত্যাগ করতে দিয়েছেন। যেভাবে আল্লাহ্ নিজকে মহান হিসাবে অধিষ্ঠিত করেছেন সেভাবে তাঁকে মহান মনে করা তোমাদের উচিত। কারণ তিনি তাঁর দ্বীনের কোন কিছুই তোমাদের কাছে গোপন করেননি এবং তাঁর পছন্দ অপছন্দ সম্বন্ধে কোন কিছুই বাদ দেননি। এগুলোকে হেদায়েতের সুস্পষ্ট প্রতীক ও নিদর্শন করে দিয়েছেন যাতে মানুষ উহার দিকে এগিয়ে যেতে পারে অথবা বিরত থাকতে পারে। অনন্তকালের জন্য তাঁর সন্তোষ একই রকম।

মনে রেখো, তিনি যে সব বিষয়ে তোমাদের পূর্ববর্তীগণের ওপর অসন্তুষ্ট ছিলেন সেসব বিষয়ে তোমাদের ওপর সন্তুষ্ট হবেন না এবং তোমাদের পূর্ববর্তীগণের ওপর যেসব বিষয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন তোমাদের ওপর সে সব বিষয়ে অসন্তুষ্ট হবেন না। তোমরা সুস্পষ্ট পথের ওপর পদচারণা করছো এবং তোমাদের পূর্ববর্তীগণ যা বলতো তাই বলছো। এ পৃথিবীতে তোমাদের প্রয়োজন মিটানোর জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকার জন্য তিনি তোমাদেরকে আদেশ করেছেন এবং মুখে তাঁর নামোল্লেখ করা তোমাদের জন্য বাধ্যতামূলক করেছেন।

বিচার দিনের শাস্তির সতর্কতা

তাঁকে ভয় করা অভ্যাসে পরিণত করার জন্য তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দিয়েছেন। এ ভয়কে তিনি তাঁর সন্তোষের সর্বোচ্চ বিন্দু করে দিয়েছেন এবং বান্দার কাছে এটাই তিনি চান। সুতরাং তোমরা এমনভাবে আল্লাহ্‌কে ভয় করবে যেন তোমরা তাঁর সম্মুখে রয়েছো এবং তোমাদের সম্মুখভাগের কেশগুচ্ছ তাঁর মুষ্টির মধ্যে ও তোমাদের অবস্থার পরিবর্তন তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন। যদি তোমরা কোন বিষয় গোপন কর, তিনি তা জ্ঞাত থাকবেন। যদি তোমরা কোন বিষয় প্রকাশ কর, তিনি তা রেকর্ড করবেন। এ কাজে তিনি সম্মানিত প্রহরী নিয়োগ করেছেন যারা কোন সঠিক বিষয় বাদ দেয় না এবং বেঠিক কিছু সংযোজন করে না। জেনে রাখো, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে ভয় করে তাকে বিপদ হতে বেরিয়ে আসার পথ তিনি করে দেন এবং অন্ধকার হতে বেরিয়ে আসার জন্য আলো মঞ্জুর করেন। যে অবস্থায় থাকতে সে ইচ্ছা পোষণ করে তিনি তাকে সে অবস্থায় রাখবেন এবং তাঁর নৈকট্যে সম্মানিত অবস্থানে তাকে রাখবেন। এ অবস্থান হলো তাঁর আরশের ছায়া এবং তাঁর নূরের দ্যুতির আলো। এ অবস্থানের দর্শনার্থী হলো তাঁর ফেরেশতাগণ এবং সাথী হলো পয়গম্বরগণ।

সুতরাং প্রত্যাবর্তন স্থলের দিকে দ্রুত এগিয়ে যাও এবং পরকালের রসদ সংগ্রহ করে মৃত্যুর দিকে অগ্রবর্তী হও। অকস্মাৎ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে এবং মৃত্যু তাদেরকে পরাভূত করবে, তখন তাদের তওবা করার দরজাও বন্ধ হয়ে যাবে। তোমরা এখনো এমন এক স্থানে আছো যেখানে তোমাদের পূর্ববর্তীগণ ছিল এবং তারা ফিরে আশার জন্য উদগ্র বাসনা পোষণ করছে। এ পৃথিবী তোমাদের আবাসস্থল নয়— এখানে তোমরা ভ্রাম্যমান পর্যটকের মত। এস্থান ত্যাগ করার জন্য তোমাদেরকে ডাক দেয়া হয়েছে এবং এস্থানে থাকাকালে রসদ সংগ্রহ করার জন্য তোমাদেরকে আদেশ দেয়া হয়েছে। জেনে রাখো, তোমাদের এই পাতলা চামড়া আগুনের জ্বালা (জাহান্নামের) সহ্য করতে পারবে না। সুতরাং তোমরা নিজেদের প্রতি অনুকম্পা কর, কারণ দুনিয়ার দুঃখ-দুর্দশায় তোমরা ইহার আভাস পেয়েছো।

কোন লোকের পায়ে কাঁটা বিঁধলে কিভাবে কাঁদে তা কি তোমরা দেখেছো? অথবা কেউ হোঁচট খেয়ে কেটে গিয়ে রক্ত বের হলে বা উত্তপ্ত বালিতে পুড়ে গেলে কি করে তা কি দেখেছো? তাহলে একবার ভেবে দেখ, জ্বলন্ত আগুনে উত্তপ্ত প্রস্থরের মাঝে শয়তানের সঙ্গী হিসাবে অবস্থাটা কেমন হবে? তোমরা কি জানো দোযখের প্রধান প্রহরী মালিক যখন আগুনের প্রতি রাগান্বিত হয়ে উহাকে গালাগালি করতে থাকবে এবং তাতে আগুনের লেলিহান শিখা চারিদিকে পরিব্যপ্ত হয়ে পড়বে তখন অবস্থাটা কি হবে?

ওহে, তোমরা যারা বয়োঃবৃদ্ধ এবং বার্দ্ধক্য যাদেরকে শুভ্রকেশী করেছে, তোমরা একবার ভেবে দেখ, আগুনের বৃত্ত যখন তোমাদের ঘাড় ঘিরে ধরবে এবং তোমাদেরকে এমন শক্ত হাতকড়া লাগানো হবে যা তোমাদের বাহুর মাংশ খসিয়ে দেবে তখন তোমরা কি করবে? আল্লাহ্‌কে ভয় কর! আল্লাহ্‌কে ভয় কর! হে জনমন্ডলী, রোগাক্রান্ত হবার আগেই সুস্থ্ থাকাকালে আল্লাহ্‌কে ভয় কর। বার্দ্ধক্যের জরা দ্বারা পরাভূত হবার আগেই আল্লাহ্‌কে ভয় কর। তোমাদের ঘাড়ের রেহান তামাদি হয়ে দখল করে নেয়ার আগেই উহা অবমুক্ত করার চেষ্টা কর। তোমাদের চোখ খোলা রাখো, তোমাদের পেটকে কৃশ করো (অর্থাৎ লোভ-লালসা কমাও), তোমাদের পা কাজে লাগাও, তোমাদের অর্থ ব্যয় করো (আল্লাহ্‌র পথে), তোমাদের দেহকে নিজের উপকারার্থে খরচ কর (অর্থাৎ ইবাদতে মশগুল হও এবং জিহাদে মনোনিবেশ কর) এবং এসব বিষয়ে কৃপণতা পরিহার করো। কারণ মহিমান্বিত আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

> *.... যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে সাহায্য কর, আল্লাহ্ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পদসমূহ (অবস্থান) সুদৃঢ় করবেন (কুরআন-৪৭:৭)*
>
> *কে আছে আল্লাহ্‌কে দেবে উত্তম ঋণ? যাতে তিনি উহাকে তার জন্য বহুগুণ বৃদ্ধি করবেন এবং তার জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার (কুরআন-৫৭ :১১)।*

কোন দুর্বলতার কারণে তিনি তোমাদের কাছে সাহায্য চাননি এবং কোন অভাবের কারণে তিনি ঋণ চাননি। আকাশ ও পৃথিবীর সকল সৈনিক যাঁর করতলগত এবং যিনি নিজেই সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞানী তিনি তোমাদের সাহায্য চান। সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মান্ডের অধিকারী হয়েও তিনি তোমাদের কাছে ঋণ চান। তিনি হলেন গণি ও প্রতিষ্ঠিত প্রশংসার অধিকারী। তাঁর এসব বাণীর অভিপ্রায় হলো তোমরা যেন আমলে সালেহায় প্রবৃত্ত হও। সুতরাং আমলে সালেহায় প্রবৃত্ত হতে তোমরা বিলম্ব করো না যাতে তাঁর বাসস্থানে তাঁর প্রতিবেশীদের সাথে তোমরা বাস করতে পার। এসব প্রতিবেশীকে তিনি তাঁর পয়গম্বরগণের সাথী করেছেন এবং ফেরেশতাগণ সেখানে তাদের দর্শনার্থী। তিনি তাদের কানকে সম্মানিত করেছেন যাতে দোযখের আগুনের শব্দ তাদের কাছে পৌঁছায় না এবং তাদের দেহকে তিনি ক্লান্তি ও অবসাদ হতে সুরক্ষিত করেছেন। মহিমান্বিত আল্লাহ্ বলেন ঃ

> *তোমরা অগ্রণী হও তোমাদের রবের ক্ষমার প্রতি এবং সেই জান্নাত লাভের আশায় যা আকাশ ও পৃথিবীর মত প্রশস্ত; এবং যা প্রস্তুত করা হয়েছে আল্লাহ্ ও রাসুলগণে বিশ্বাসীদের জন্য। ইহা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তিনি ইহা দান করেন; আল্লাহ্ মহাঅনুগ্রহশীল (কুরআন-৫৭:২১)।*

তোমরা যা শুনতেছ আমি তাই বলি। আমার ও তোমাদের জন্য আমি আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা করি। তিনিই আমার জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই সর্বোত্তম কর্মবিধায়ক।

★★★★★

খোৎবা-১৮৩

খারিজীদের মধ্য হতে বুরজ ইবনে মুশির তাঈ আমিরুল মোমেনিনকে শুনিয়ে শুনিয়ে শ্লোগান দিয়েছিল, "আদেশ শুধু আল্লাহ্‌র।" ইহা শুনে তিনি বললেন ঃ

চুপ কর, হে ভাঙ্গা দাঁতওয়ালা, আল্লাহ্ তোমাকে কুৎসিত করুন! আল্লাহ্‌র কসম, সত্য যখন সুস্পষ্ট হয়ে প্রতিভাত হয়েছিল তখনও তোমার ব্যক্তিত্ব ছিল অতিদুর্বল এবং তোমার স্বর ছিল ক্ষীণ। অন্যায় যখন সজোরে চিৎকার দিতে আরম্ভ করলো তখন তুমি বাছুরের শিং-এর মত আবার গজিয়ে উঠেছো।

★★★★★

খোৎবা-১৮৪

আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও তাঁর বিস্ময়কর সৃষ্টি সম্পর্কে

প্রতিষ্ঠিত প্রশংসা আল্লাহ্‌র। তিনি এমন যাঁকে ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না, স্থান ও কালে আবদ্ধ করা যায় না, চক্ষু দ্বারা দেখা যায় না এবং আবরণ দ্বারা আবৃত করা যায় না। সৃষ্টির অস্তিত্ব দ্বারাই তিনি তাঁর অনন্ত-অসীমতা প্রমাণ করেছেন এবং কোন প্রকার নমুনা ছাড়া সৃষ্টির সূচনা করেই তিনি তাঁর অস্তিত্ব প্রমাণ করেছেন। সৃষ্টির পারস্পরিক সাদৃশ্য দ্বারা তিনি প্রমাণ করেছেন যে, তাঁর সদৃশ কোন কিছুই নেই। তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতিতে সদা-সত্য। তিনি এত সমুচ্চ যে তাঁর বান্দাদের প্রতি অবিচার করেন না। তিনি তাঁর ন্যায়পরায়ণতা দ্বারা সৃষ্টির মধ্যে বিরাজমান এবং তাঁর আদেশের মাধ্যমে তাদের মধ্যে ন্যায় বিধান করেন। বস্তুনিচয়ের সৃষ্টির মধ্যে তিনি তার চির সত্তার সাক্ষ্য প্রদান করেন, সৃষ্টির অক্ষমতার মাধ্যমে তাঁর ক্ষমতা প্রকাশ করেন এবং মৃত্যুর বিরুদ্ধে অসহায়ত্বের মাধ্যমে তিনি তাঁর চিরন্তনতার সাক্ষ্য প্রদান করেন।

তিনি এক কিন্তু গণনার দ্বারা নয়। কোন প্রকার সীমা ছাড়াই তিনি চিরস্থায়ী। কোন প্রকার সমর্থন ছাড়াই তিনি বিদ্যমান। কোন প্রকার ইন্দ্রানুভূতি ছাড়াই মন তাঁর স্বীকৃতি দেয়। দৃশ্যমান সকল বস্তুই কোন প্রকার বিরোধ ছাড়া তার সাক্ষ্য বহন করে। কল্পনাশক্তি তাঁকে ধারণ করতে পারে না। তিনি দয়া করে কাউকে যখন চিন্তাশক্তি দ্বারা সাহায্য করেন তখনই তার চিন্তা-চেতনায় তিনি নিজকে প্রকাশ করেন। কিন্তু কেউ যদি কল্পনা দ্বারা তাঁকে অনুভব করতে চায় তবে তিনি তার কল্পনাকে প্রত্যাখ্যান করেন। এ বিষয়ে তিনি কল্পনাকে মধ্যস্থতাকারী করেছেন। তিনি এ অর্থে বিশাল নন যে, তার আকার বা দেহ বিশাল। তিনি এ অর্থে মহান নন যে, তাঁর সীমা সর্বশেষ পর্যন্ত প্রসারিত এবং তাঁর কাঠামো ব্যাপক। তিনি মর্যাদায় বড় এবং কর্তৃত্বে মহান।

রাসুল (সঃ) সম্পর্কে

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর বান্দা এবং তাঁর মনোনীত রাসুল ও তাঁর দায়িত্বশীল আমানত। আল্লাহ্ তাঁকে অকাট্য প্রমাণ, সুস্পষ্ট বিজয় ও খোলা পথসহ প্রেরণ করেছেন। সুতরাং তিনি সত্য ঘোষণা দ্বারা মানুষের কাছে তাঁর বাণী পৌঁছে দিয়েছেন। তিনি মানুষকে সত্য-সঠিক প্রশস্ত পথে পরিচালিত করেছেন, মানুষের জন্য হেদায়েতের নিদর্শন ও আলোর মিনার প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং ইসলামের রজ্জুকে শক্তিশালী ও গ্রন্থিকে সুদৃঢ় করেছেন।

প্রাণী সৃষ্টি সম্পর্কে

যদি মানুষ আল্লাহ্‌র ক্ষমতার বিশালত্ব নিয়ে চিন্তা করতো এবং তাঁর নেয়ামতের প্রাচুর্য সম্পর্কে ভেবে দেখতো তবে তারা অবশ্যই সঠিক পথে ফিরে আসতো ও দোযখের শাস্তির ভয়ে আতঙ্কিত হতো। কিন্তু তাদের হৃদয় পীড়িত এবং চোখ অপবিত্র। তারা কি ক্ষুদ্র প্রাণীদের দেখে না কিভাবে তিনি তাদের জীবন পদ্ধতিতে শক্তি সঞ্চার করেছেন, কিভাবে তাদের শ্রবণশক্তি খুলে দিয়েছেন, কিভাবে তাদের দৃষ্টিশক্তি খুলে দিয়েছেন এবং কিভাবে তাদের হাড় ও চামড়া দিয়েছেন? পিপীলিকার দিকে লক্ষ্য কর—কত ক্ষুদ্র এদের দেহ অথচ এদের দেহের গঠন কত সূক্ষ্ম। অনেক সময় এরা চোখেও ধরা পড়ে না। একবার কি চিন্তা করে দেখেছো কি করে এরা পৃথিবীতে চলাফেরা করে এবং খাদ্য সংগ্রহ করে? এরা শস্যদানা বহন করে এদের গর্তে নিয়ে যায় এবং সেখানে তা জমিয়ে রাখে। এরা গ্রীষ্মকালে শীতকালের জন্য সঞ্চয় করে এবং শক্তি থাকাকালে দুর্বলতার সময়ের জন্য সঞ্চয় করে। আল্লাহ্ তাদের জীবিকা নিশ্চিত করে দিয়েছেন এবং তাদের উপযোগী খাদ্য প্রদান করেছেন। দয়াময় আল্লাহ্ তাদেরকে ভুলে যান না এবং পরমদাতা আল্লাহ্ তাদেরকে বঞ্চিত করেন না, হোক না কেন তা কঠিন পাথরে বা পাহাড়ের চূড়ায়।

যদি তোমরা পিপীলিকার পরিপাকনালী, পেটের খোলস এবং ইহার মাথায় চোখ ও কানের দিকে লক্ষ্য কর তবে তোমরা ইহার গঠন দেখে বিস্মিত হয়ে যাবে এবং ইহার বর্ণনা দেওয়া তোমাদের জন্য কষ্টসাধ্য হয়ে পড়বে। তিনি মহিমান্বিত যিনি এদেরকে পায়ের উপর দাঁড়াতে এবং (অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের) স্তম্ভের ওপর সোজা হতে দিয়েছেন। এদের সৃষ্টিকর্মে অন্য কোন উদ্ভাবক তাঁর সাথে অংশগ্রহণ করেনি বা অন্য কোন শক্তি তাঁকে সাহায্য করেনি। তোমরা যদি তোমাদের কল্পনা শক্তিকে ধাবিত করে একেবারে শেষ সীমা পর্যন্ত নিয়ে যাও তবুও দেখতে পাবে ক্ষুদ্র পিপীলিকা আর বৃহৎ খেজুর গাছের স্রষ্টা একজন। কারণ সকল সৃষ্টির মধ্যে একই নৈপুণ্য ও পূর্ণতা রয়েছে এবং জীবকুলের মধ্যে অতি সামান্য ব্যবধান রয়েছে।

বিশ্বচরাচর সৃষ্টি প্রসঙ্গে

মহান আল্লাহ্‌র সৃষ্টিতে ক্ষুদ্র, বৃহৎ, হালকা, ভারী, কোমল, শক্ত, দুর্বল—সকল কিছুই সমান। আকাশ, বাতাস, পানি সব কিছুই একই রকম। সুতরাং সূর্য, চন্দ্র, বৃক্ষ-লতা-গুল্ম, পানি, পাথর, দিবা-রাত্রির ব্যবধান, ঝর্ণা-ধারা, পর্বতমালা, উচু শৃঙ্গ ও ভাষার বিভিন্নতার দিকে লক্ষ্য কর। তারপরও যে ব্যক্তি সৃষ্টিকর্তাকে বিশ্বাস না করে এবং তাঁর শাসন অমান্য করে তার ওপর লানত। তারা মনে করে তারা ঘাসের মত যা গজাতে কৃষকের প্রয়োজন হয় না এবং তাদের আকার-আকৃতির বিভিন্নতার জন্য কোন নির্মাতা নেই। তারা যা ধারণা করে উহার বাইরে কোন যুক্তিই মানতে চায় না অথবা তারা যা শুনেছে তার ওপর কোন গবেষণা কার্যও করে না। নির্মাতা ছাড়া কি কোন নির্মাণ হতে পারে? অথবা অপরাধী ছাড়া কি কোন অপরাধ হতে পারে?

পঙ্গপালের বিস্ময়কর সৃষ্টি প্রসঙ্গে

তোমরা পঙ্গপালের প্রতিও দৃষ্টিপাত করে দেখ। আল্লাহ্ তাদেরকে দু'টি লাল চোখ দিয়েছেন, ক্ষুদ্র কান দিয়েছেন, একটা যথোপযোগী মুখ দিয়েছেন, তীক্ষ্ম ইন্দ্রিয় দিয়েছেন, দু'টি দাঁত দিয়েছেন যা দিয়ে কাটতে পারে এবং কাস্তের মত দু'টি পা দিয়েছেন যা দিয়ে জড়িয়ে ধরতে পারে। শস্যের জন্য কৃষকগণ এই ক্ষুদ্র পতঙ্গের ভয়ে আতঙ্কিত। কারণ তারা শতচেষ্টা করেও এদের তাড়িয়ে দিতে পারে না। পঙ্গপাল শস্যক্ষেত্র আক্রমণ করে তাদের ক্ষুধা মেটায় অথচ এদের দেহ কৃষকের কনিষ্ঠ আঙ্গুলের সমানও নয়।

আল্লাহ্র মহত্ত্ব সম্পর্কে

আল্লাহ্ মহিমাময় যাঁকে আকাশ ও পৃথিবীর সবকিছু ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় সেজদা করে। কপাল ও মুখ ধুলায় লুণ্ঠিত করে বিনীতভাবে ও নির্দ্বিধায় আনুগত্য স্বীকার করে এবং ভয়ে ও আশঙ্কায় সকল ক্ষমতা তাঁর বলে মেনে নেয়।

পক্ষীকুল তার আজ্ঞাবহ। তাদের পলক ও শ্বাস-প্রশ্বাসের সংখ্যা সম্বন্ধে তিনি অবগত আছেন। তিনি তাদের পা এমনভাবে তৈরী করেছেন যাতে তারা জলে ও স্থলে দাঁড়াতে পারে। তিনি তাদের জীবিকা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তিনি তাদের প্রজাতি সম্বন্ধে জ্ঞাত আছেন—এটা কাক, এটা ঈগল, এটা কবুতর এবং এটা উটপাখী। সৃষ্টিকালেই তিনি প্রতিটি প্রজাতির নাম দিয়ে দিয়েছেন এবং তাদের প্রত্যেকের জন্য জীবিকা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তিনি ঘন মেঘ সৃষ্টি করেছেন এবং উহা হতে ভারি বৃষ্টিপাত সৃষ্টি করে বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে দিয়েছেন। পৃথিবী শুকিয়ে গেলে তিনি বৃষ্টি দ্বারা ভিজিয়ে দেন এবং তৃণহীন হয়ে গেলে তাতে শ্যামল লতা-গুল্ম গজিয়ে তোলেন।

★★★★★

খোৎবা-১৮৫

আল্লাহ্র একত্ব সম্পর্কে

যে ব্যক্তি আল্লাহ্তে বিভিন্ন শর্ত আরোপ করে সে আল্লাহ্র একত্বে বিশ্বাস করেনা। যে ব্যক্তি তাঁর সাদৃশ্য দাঁড় করায় সে তাঁর বাস্তবতা উপলব্ধি করে না। যে ব্যক্তি উপমা দেয় সে তাঁকে বুঝে না। যে ব্যক্তি তাঁর অবস্থান নির্দেশ করে এবং তাঁকে কল্পনা করে সে তাঁকে বুঝায় না। যত কিছু আকার-আকৃতিতে জানা যায় উহার সবই সৃষ্ট এবং যা কিছু অন্য কিছু দ্বারা অস্তিত্ববান তা হলো উহার কারণ এবং আল্লাহ্ হলেন সকল কারণের কারণ। তিনি কাজ করেন কিন্তু কোন হাতিয়ারের সাহায্যে নয়। তিনি সকল কিছুর সীমা নির্ধারণ করেন কিন্তু চিন্তার সাহায্যে নয়। তিনি ধনবান কিন্তু সম্পদ সংগ্রহ করার মাধ্যমে নয়।

তিনি সময়ের গন্ডিতে আবদ্ধ নন এবং পরিকল্পনার কোন প্রয়োজন তাঁর হয় না। তাঁর সত্তা কালের অতীত। তাঁর অস্তিত্ব সকল অনস্তিত্বের অতীত এবং তাঁর চিরন্তনতা প্রারম্ভের অতীত। ইন্দ্রিয়সমূহ সৃষ্টির মাধ্যমে জানা যায় যে, তাঁর কোন ইন্দ্রিয় নেই। বিভিন্ন বিষয়ের বিপরীতধর্মী বিষয় সৃষ্টির মাধ্যমে জানা যায় যে, তাঁর বিপরীত কোন কিছু নেই এবং বস্তুর সামঞ্জস্য দ্বারা বুঝা যায় যে, তাঁর কোন সামঞ্জস্য নেই। তিনি আলোর বিপরীতে অন্ধকার, ঔজ্জ্বল্যের বিপরীতে আচ্ছন্নতা, শুষ্কতার বিপরীতে আদ্রতা, উষ্ণতার বিপরীতে শীতলতা সৃষ্টি করেছেন। পরস্পর বিপরীতধর্মী বস্তুর মাঝে তিনি অনুরাগ সৃষ্টি করেছেন।

তিনি বিভিন্ন বস্তুকে একীভূত করেন, একীভূত বস্তুকে আলাদা করেন এবং দূরবর্তীকে নিকটবর্তী ও নিকটবর্তীকে দূরবর্তী করেন। তিনি কোন প্রকার সীমার মধ্যে আবদ্ধ নন এবং সংখ্যা দ্বারা গণনীয় নন। তিনি বস্তু নিরপেক্ষ। বস্তু শুধুমাত্র স্বগোত্রিয় জিনিসকে ঘিরে থাকতে পারে এবং দেহযন্ত্র শুধুমাত্র নিজের সাদৃশ্য বস্তুকে নির্দেশ করতে পারে। 'মুনযু' (অর্থাৎ থেকে বা হতে—ইংরেজী সিনস্) শব্দ বস্তুর চিরন্তনতা মিথ্যা প্রমাণ করে, 'কাদ' (অর্থাৎ সংঘটিত হওয়ার কাল) শব্দ বস্তুর অনাদিত্বকে মিথ্যা প্রমাণ করে এবং 'লাওয়ালা' (অর্থাৎ যদি এমন হতো) শব্দ বস্তুর পূর্ণতা বা উৎকর্ষ অস্বীকার করে।

বস্তুর মাধ্যমেই স্রষ্টা নিজেকে প্রকাশ করেন এবং বস্তুর মাধ্যমেই তিনি দৃষ্টির অন্তরালে সুরক্ষিত। স্থবিরতা ও গতি তাঁর মধ্যে সংঘটিত হয় না। তিনি যা প্রথমে সৃষ্টি করেছেন তা কি করে তাঁর মধ্যে সংঘটিত হতে পারে? তিনি প্রথমে যা সৃষ্টি করেছেন তা কি করে তাঁর দিকে ফিরে যেতে পারে (অর্থাৎ তাঁর সাদৃশ্য হতে পারে)? তিনি প্রথমে যা আকৃতি দান করেছেন কি করে তা তাঁর মাঝে উপস্থিত থাকতে পারে? যদি এমন হতো তবে তাঁর সত্তা বিভিন্নতার অন্তর্ভূক্ত হয়ে পড়তো। তাঁর সত্তা বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হয়ে পড়তো এবং তিনি তাঁর চিরন্তনতা হারিয়ে ফেলতেন। যদি তাঁর সম্মুখভাগ থাকতো তাহলে অবশ্যই তাঁর পশ্চাদ্ভাগও থাকতো। যদি কোন কিছুতে তার কমতি থাকতো তবে পূর্ণতারও প্রশ্ন উঠতো। সেক্ষেত্রে সৃষ্টির আয়াত (নিদর্শন) তাঁর মাঝে ফুটে উঠতো এবং সৃষ্টি তাঁর আয়াত না হয়ে তিনি নিজেই একটি আয়াত হয়ে যেতেন। তাঁর নিরপেক্ষতার কুদরত দ্বারা তিনি বস্তুমোহের অতীত। কিন্তু বস্তু একে অপরের মুখাপেক্ষী।

তিনি এমন যাঁর কোন পরিবর্তন বা ধ্বংস নেই। অধিষ্ঠান প্রক্রিয়া তার বেলায় প্রযোজ্য নয়। তিনি কাউকে জন্ম দেননি পাছে মনে করা হয় যে, তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি অন্য কোনভাবে আবির্ভূত হন নি যাতে তাকে সীমার অন্তর্ভুক্ত করা যায়। তিনি সন্তান উৎপাদন ও নারীর সংস্পর্শ হতে অনেক অনেক পবিত্র। কল্পনাশক্তি তাঁর কাছে পৌঁছায় না যাতে তাঁর কোন পরিমাণ নির্ধারণ করা যায়। কোন বোধগম্যতা দ্বারা তাঁকে চিন্তা করা যায় না যাতে তাঁর কোন আকৃতি দেয়া যায়। ইন্দ্রিয়শক্তি তাঁকে উপলব্ধি করতে পারে না যাতে তাঁকে অনুভব করা যায়। হাতে তাঁকে স্পর্শ করা যায় না যাতে তাঁকে মালিশ করা যায়। তিনি কোন অবস্থায় পরিবর্তিত হন না। তিনি কখনো এক অবস্থা অতিক্রম করে অন্য অবস্থায় যান না। দিবা-রাত্রির অতিক্রমণে তিনি বার্ধক্য প্রাপ্ত হন না। আলো ও অন্ধকার তাঁর কোন পরিবর্তন আনতে পারে না।

একথা বলা যাবে না যে, তাঁর সীমা আছে, শেষ আছে, আদি আছে বা অন্ত আছে। তিনি কোন কিছুর নিয়ন্ত্রণাধীন নন যাতে তাঁর উত্থান-পতন থাকতে পারে। কোন কিছুই তাঁর ধারক ও বাহক নয় যা তাঁকে বক্র করতে ও সোজা রাখতে পারে। তিনি বস্তুর ভেতরেও নন বাহিরেও নন। তিনি সংবাদ প্রেরণ করেন; কিন্তু জিহবা বা স্বরের সাহায্যে নয়। তিনি শোনেন কিন্তু কানের ছিদ্র বা শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে নয়। তিনি কথা বলেন কিন্তু শব্দ উচ্চারণ করে নয়। তিনি স্মরণ করেন কিন্তু মুখস্থ করেন না। তিনি মনস্থ করেন কিন্তু মনের সাহায্যে নয়। তিনি ভালবাসেন ও অনুমোদন দান করেন কিন্তু হৃদয়ের আবেগপ্রবণতা দ্বারা নয়। তিনি ঘৃণা করেন এবং রাগান্বিত হন কিন্তু কোন কষ্ট সহিষ্ণুতা দ্বারা নয়। যখন তিনি কোন কিছু সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেন তখন তিনি বলেন 'হও'; আর অমনি তা হয়ে যায়। কিন্তু তাঁর এই 'হও' বলাও স্বরের সাহায্যে নয় যা কান শুনতে পারে। তাঁর কথা বলাও একটি সৃষ্টিকর্ম। তাঁর সাদৃশ্য কোন কিছুর অস্তিত্ব কস্মিনকালেও ছিল না। যদি এমন কিছু থাকতো তাহলে অবশ্যই দ্বিতীয় খোদা থাকতো।

একথা বলা যাবে না যে, অনস্তিত্ব হতে তাঁর সত্তা অস্তিত্বে এসেছে। কারণ সেক্ষেত্রে সৃষ্ট বস্তুর গুণাবলী তাঁর ওপর আরোপ করা হবে এবং সৃষ্টি ও তার মধ্যে কোন ব্যবধান থাকে না এবং সৃষ্টির ওপর তাঁর কোন বিশিষ্টতা থাকে না। এতে স্রষ্টা ও সৃষ্টি সমপর্যায়ের হয়ে যায় এবং উদ্ভাবক ও উদ্ভাবিত একই স্তরের হয়ে পড়ে। অন্য কারো উপমা বা নমুনা অনুসরণ না করেই তিনি সমগ্র সৃষ্টিকে সৃষ্টিতে এনেছেন এবং এ সৃষ্টিকর্মে তিনি কারো সাহায্য গ্রহণ করেননি।

এ পৃথিবী ও নভোমন্ডল সৃষ্টি করতে এবং উহাকে বিস্তৃত করতে তাঁর কোন ব্যস্ততার প্রয়োজন হয়নি। তিনি এটাকে কোন স্তম্ভের সাহায্যে দাঁড় করিয়ে রাখেননি এবং এটাকে বেঁকে যাওয়া ও খন্ড বিখন্ড হয়ে যাওয়া হতে সুরক্ষিত করেছেন। কর্তিত গাছের গোড়ার মত তিনি পর্বতকে স্থাপন করেছেন, ইহার পাথরকে কঠিন করেছেন,

স্রোতধারাকে প্রবাহিত করেছেন এবং উপত্যকাকে বিস্তৃত করেছেন। যা কিছু তিনি সৃষ্টি করেছেন তাতে কোন খুঁত নেই এবং যা কিছু তিনি শক্তিশালী করেছেন তাতে কোন দুর্বলতা নেই।

তাঁর কর্তৃত্ব ও মহত্ব দিয়ে পৃথিবীতে তিনি নিজকে প্রকাশ করেছেন। তিনি তাঁর জ্ঞান ও বোধির মাধ্যমে এর অভ্যন্তরভাগ সম্পর্কে অবহিত আছেন। তাঁর মহিমা ও মর্যাদা বলে তিনি বিশ্বের সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান। বিশ্বের কোন কিছুই তাঁকে অমান্য করতে পারে না এবং তাঁকে পরাভূত করার জন্য বিরোধিতা করতে পারে না। কোন দ্রুতপদ সম্পন্ন বান্দা তাঁর কাছ থেকে দৌড়ে পালিয়ে যেতে পারে না যাতে তাঁকে ছাড়িয়ে যাওয়া যায়। পৃথিবীর কোন ধনবান ব্যক্তির তিনি মুখাপেক্ষী নন। তিনি পৃথিবীর কোন কিছুর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন না। সবকিছুই তাঁর কাছে মাথা নত করে এবং তাঁর মহত্ত্বের কাছে নগণ্য। কোন কিছুই তাঁর কর্তৃত্ব হতে পালিয়ে যেতে পারে না যাতে তাঁর ক্ষতি বা উপকার এড়িয়ে যেতে পারে। তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই, তাঁর সাদৃশ্য কেউ নেই এবং তাঁর সমান কেউ নেই।

তিনি পৃথিবীকে এমনভাবে ধ্বংস করবেন যাতে ইহার সব কিছুর বিলয় ঘটে। কিন্তু বিশ্বের এ ধ্বংস ইহার প্রথম সৃষ্টি ও আবিষ্কার হতে আশ্চর্যজনক নয়। আল্লাহ্‌র বান্দাদের সকল বুদ্ধিমত্তা খাটিয়েও একটি মশাকে অস্তিত্বে আনতে পারবে না। কি করে এটা সম্ভব হবে? সকল জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা একত্রিত করলেও একটি মশা সৃষ্টির উপায় বুঝতে পারবে না। একটা মশা সৃষ্টি করতে গেলে তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি স্থবির হয়ে পড়বে, সকল ক্ষমতা অসাড় হয়ে পড়বে এবং তারা ক্লান্ত ও হতাশ হয়ে অপারগতা স্বীকার করবে।

নিশ্চয়ই, পৃথিবী বিলয় হওয়ার পরও মহিমান্বিত আল্লাহ্ বিরাজ করবেন এবং তাঁর পাশে কিছুই থাকবে না। পৃথিবী সৃষ্টির পূর্বে তিনি যেরূপ ছিলেন, পৃথিবীর বিলয়ের পরও তিনি তদ্রূপ থাকবেন। তাঁর বিরাজমানতায় কোন সময়, কাল, স্থান বা গতি নেই। সর্বশক্তিমান এক আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন কিছুই থাকবে না। সকল কিছুরই প্রত্যাবর্তন তাঁর দিকে। সৃষ্টি করা যেমন কারো ক্ষমতাভুক্ত নয়, বিলয় ঠেকানোও তদ্রূপ কারো ক্ষমতাভুক্ত নয়। বিলয় ঠেকাতে পারলে পৃথিবী চিরস্থায়ী হতো। কিন্তু বাস্তবে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন কিছুই চিরস্থায়ী নয়। এ বিশ্বজগতের কোন কিছুই তৈরী করতে তিনি কোন প্রকার অসুবিধার সন্মুখীন হননি এবং এতকিছু সৃষ্টি করতে তিনি কোনরূপ শ্রান্তিবোধ করেননি। এ বিশ্বচরাচর তিনি তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য সৃষ্টি করেননি, বা কোন ক্ষতি ও লোকসানের ভয়ে সৃষ্টি করেননি, বা কোন প্রতাপশালী শত্রুর বিরুদ্ধে সাহায্য পাওয়ার আশায় সৃষ্টি করেননি, বা প্রতিশোধের নেশায় মত্ত কোন বিরুদ্ধবাদীর হাত হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য সৃষ্টি করেননি, বা কোন দাম্ভিক অংশীদারের বিরুদ্ধে সৃষ্টি করেননি, বা তিনি একাকীত্ব অনুভব করে সঙ্গ পাওয়ার জন্য সৃষ্টি করেননি।

সৃষ্টির পর তিনি ইহাকে ধ্বংস করবেন, কিন্তু ইহার রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনায় উদ্বিগ্নতার কারণে নয়, বা কোন প্রকার আনন্দ উপভোগ করার কারণে নয়, বা তাঁর ওপর কোন ঝামেলা-ঝঞ্ঝাটের কারণে নয়। ইহার জীবনের দৈর্ঘ্য তাঁকে উদ্বিগ্ন করে না যে তিনি তাড়াতাড়ি ইহা ধ্বংস করতে চাহেন। মহিমান্বিত আল্লাহ্ তাঁর দয়ায় ইহাকে রক্ষণাবেক্ষণ করছেন, তাঁর আদেশ দ্বারা ইহাকে সঠিক রেখেছেন এবং তাঁর কুদরত দ্বারা ইহাকে পরিপূর্ণতা দান করেছেন। ইহার ধ্বংসের পর তিনি ইহাকে পুনরুজ্জীবিত করবেন; কিন্তু তাঁর নিজের কোন প্রয়োজনে নয়, বা ইহার কোন কিছুর সহায়তা পাওয়ার জন্য নয়, বা একাকীত্ব দূরীভূত করার জন্য নয়, বা কোন কিছুর সঙ্গ পাওয়ার জন্য নয়, বা অজ্ঞতা ও অন্ধকার হতে বের হয়ে জ্ঞান ও গবেষণার পথ পাওয়ার জন্য নয়, বা স্বল্পতা ও অভাবের কারণে প্রচুর ও পর্যাপ্তের জন্য নয়, বা অমর্যাদা ও হীন অবস্থার কারণে সম্মান ও ইজ্জতের জন্য নয়।

★★★★★

খোৎবা-১৮৬

সময়ের উত্থান-পতন সম্পর্কে

যে ক'জনের নাম আকাশে সুপরিচিত অথচ জমিনে অজানা তাঁদের নামে আমার পিতা-মাতা কুরবান হোক। সাবধান, তোমাদের ওপর যা আপতিত হতে যাচ্ছে তা হলো তোমাদের কাজে-কর্মে প্রতিকূল অবস্থা, আত্মীয়ের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ ও নিকৃষ্টতর লোকের উত্থান। এ অবস্থা তখন ঘটবে যখন একজন মোমিন হালাল উপায়ে একটি দিরহাম সংগ্রহ করা অপেক্ষা তরবারির আঘাত সহজতর হবে; এ অবস্থা তখন ঘটবে[১] যখন দানকারী অপেক্ষা ভিক্ষুকের পুরস্কার বেশী হবে; এ অবস্থা তখন ঘটবে যখন তোমরা নেশাগ্রস্থ হবে— পানীয় দ্বারা নয়— সম্পদ ও প্রাচুর্য দ্বারা, মানুষ প্রতিশ্রুতি দেবে কিন্তু উহার কোন বাধ্যবাধকতা থাকবে না এবং বাধ্য না করা হলেও মানুষ মিথ্যা কথা বলবে; এ অবস্থা তখন ঘটবে যখন বিপদাপদ তোমাদেরকে চেপে ধরবে যেভাবে জিন্‌ উটের কুঁজকে চেপে ধরে। কতকাল এ দুর্দশা চলতে থাকবে এবং তা সংঘটিত হতে আর কতদিন বাকী?

হে জনমন্ডলী, যে ঘোড়া উহার পিঠে তোমাদের হাতের ওজন (অর্থাৎ পাপ) বহন করে উহার লাগাম ছুঁড়ে ফেলে দাও। তোমাদের ইমামের কাছ থেকে কেটে পড়ো না; তাহলে তোমাদের কর্মকান্ডের জন্য তোমরা নিজেদেরকে দোষী করবে। তোমাদের সম্মুখস্থ জলন্ত আগুনে ঝাঁপ দিয়ো না; ইহার পথ হতে দূরে সরে থাক এবং মধ্যপথ অবলম্বন কর। কারণ আমার জীবনের শপথ, এ আগুনের শিখায় মোমিনগণ মৃত্যুবরণ করবে এবং অন্যরা নিরাপদ থাকবে।

অন্ধকারে প্রদীপের মত আমি তোমাদের মাঝে আছি। যে কেউ ইহার নিকটবর্তী হবে সে-ই আলোক প্রাপ্ত হবে। সুতরাং শোন হে মানুষ, এ প্রদীপ সংরক্ষণ কর এবং হৃদয়ের কান দিয়ে ইহার প্রতি মনোযোগী থাক যাতে তোমরা বুঝতে পার।

১। "ভিক্ষুকের পুরস্কার দানকারী অপেক্ষা বেশী হবে"- একথা দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, ধনীগণ হারাম উপায়ে সম্পদ আহরণ করবে এবং তাদের দান হবে মোনাফেকীপূর্ণ, লোক দেখানো ও সুনাম অর্জনের উদ্দেশ্যে। ফলে এহেন দানের জন্য তারা কোন পুরস্কার পাবে না। অপরপক্ষে, দরিদ্রগণ অভাবের তাড়নায় দান গ্রহণ করে সঠিক পথে ব্যয় করবে এবং তাতে তারা অধিক পুরস্কার ও বিনিময় আশা করতে পারে।

ইবনে আবিল হাদীদ[১৫২] (খন্ড ১৩, পৃঃ ৯৭) অন্যভাবেও ইহার ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেন যে, দরিদ্রগণ ধনবানদের নিকট থেকে দান গ্রহণ না করলে ধনীগণ আমোদ-প্রমোদ, ভোগ-বিলাস ও অবৈধ পথে উহা ব্যয় করবে। কাজেই দান গ্রহণ করে দরিদ্রগণ ধনবানগণকে অবৈধ ও অসৎপথে ব্যয় করা থেকে রক্ষা করে বলে অধিক পুরস্কার ও বিনিময় পাওয়ার যোগ্য।

★★★★★

খোৎবা-১৮৭

দুনিয়া ও আখিরাত সম্পর্কে

হে লোকসকল, আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি আল্লাহ্‌কে ভয় করার জন্য এবং তাঁর আনুকূল্য ও পুরস্কারের জন্য উচ্ছ্বসিত প্রশংসা কর। দেখ, কিভাবে আনুকূল্য প্রদানের জন্য তিনি তোমাদেরকে নির্বাচিত করেছেন এবং তাঁর রহমত কিভাবে তোমাদের জন্য প্রদান করেছেন। তোমরা প্রকাশ্যে পাপে লিপ্ত হও, আর তিনি

তোমাদের পাপ ঢেকে রাখেন। তোমরা এমন আচরণ কর যা তাঁর শাস্তিকে দ্রুত ডেকে আনে অথচ তিনি তোমাদেরকে সময় দিচ্ছেন।

আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি মৃত্যুকে স্মরণ করার জন্য এবং ইহার প্রতি তোমাদের অমনোযোগিতা কমিয়ে ফেলতে। তিনি তো তোমাদের প্রতি অমনোযোগী নন; তবে কেন তোমরা তাঁর প্রতি অমনোযোগী হবে? কেন তোমরা মৃত্যু-দূতের প্রত্যাশা কর যেখানে সে তোমাদেরকে একটুও সময় দেবে না। যারা তোমাদের সামনে মৃত্যুবরণ করেছে তারা কি শিক্ষক (উপদেশদাতা) হিসাবে যথেষ্ট নয়? তোমরা তাদেরকে কবরে নিয়ে গেছো— তারা নিজেরা যেতে পারেনি; তোমরা তাদেরকে কবরে শুইয়ে দিয়েছো— তারা নিজেদের থেকে তা করতে পারেনি। মনে হয় তারা যেন কখনো এ পৃথিবীতে বসবাস করেনি এবং পরকালই তাদের আবাসস্থল ছিল। তারা যে স্থানকে সরগরম করে বসবাস করতো তা নির্জন করে চলে গেল আর যে স্থানকে নির্জন মনে করতো সেখানে গিয়ে বসবাস করতেছে। যা পরিত্যাগ করতে হবে তা নিয়ে তারা ব্যস্ত ছিল এবং যে স্থানে যেতে হবে সেই স্থানকে বেমালুম ভুলেই ছিল। এখন তারা তাদের পাপ স্খলন করতে পারছে না এবং তাদের পূণ্য এতটুকুও বাড়াতে পারছে না। তারা দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ইহার প্রতি ঝুঁকে পড়েছিলো এবং দুনিয়া তাদেরকে নিদারুণভাবে বঞ্চনা করেছে। তারা দুনিয়াকে বিশ্বাস করেছিলো; এখন দুনিয়া তাদের প্রতি মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি সদয় হোন। যে ঘরে চিরস্থায়ীভাবে থাকার আদেশ করা হয়েছে সেদিকে দ্রুত এগিয়ে যাবার প্রস্তুতি গ্রহণ কর। কারণ সেদিকে প্রতিনিয়ত তোমাদেরকে আহ্বান ও আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। ধৈর্য্যসহকারে আল্লাহ্‌র আনুগত্য স্বীকার কর এবং তাঁর অবাধ্যতা হতে বিরত থেকে তোমাদের প্রতি তাঁর পূর্ণ আনুকূল্য যাচনা কর। কারণ 'আগামীকাল' তোমাদের জন্য আজই রুদ্ধ হয়ে যেতে পারে। লক্ষ্য কর, দিনের ঘন্টাগুলো, মাসের দিনগুলো, বছরের মাসগুলো এবং জীবনের বছরগুলো কত দ্রুত পেরিয়ে যাচ্ছে।

★★★★★

খোৎবা-১৮৮

দৃঢ় ও দুর্বল ইমান সম্পর্কে

কারো কারো ইমান দৃঢ় এবং হৃদয়ে তা বদ্ধমূল ও প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। আবার কারো কারো ইমান ক্ষণস্থায়ী হৃদয়ে তা কিছুকাল মাত্র থাকে। যদি তুমি কারো কাছে নিজেকে নির্দোষ প্রতিপন্ন করার ইচ্ছা পোষণ কর তবে তার মৃত্যু পর্যন্ত তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে। কারণ নির্দোষ প্রতিপন্ন হওয়ার জন্য এটাই সময়সীমা।

অভিবাসন (হিজরত) উহার মূল অবস্থানের মত থেকে যায়। যারা গোপনে ইমান গ্রহণ করে অথবা প্রকাশ্যে ইমানের কাজ করে, এরূপ কারো কাছে আল্লাহ্‌র কোন প্রয়োজন নেই। এ পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র প্রমাণের স্বীকৃতি না দেয়া পর্যন্ত কারো জন্য অভিবাসন (হিজরত) প্রযোজ্য হয় না। কোন ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রমাণকে সত্য ও বাস্তব বলে স্বীকৃতি দান করলে সে হবে মুহাজির (অভিবাসক)। ইস্‌তিদ'আফ (অভিবাসনের দায়িত্ব হতে মুক্তি) তার জন্য প্রযোজ্য হবে না যার কাছে আল্লাহ্‌র প্রমাণ পৌছে এবং সে উহা শুনে ও তার হৃদয়ে উহা সংরক্ষণ করে[১]।

আমাকে হারাবার আগে যা জানার জেনে নাও এবং উমাইয়াদের সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী

নিশ্চয়ই, আমাদের বিষয় জটিল ও বিপদসঙ্কুল। যার হৃদয়কে আল্লাহ্ ইমান দ্বারা পরীক্ষা করেছেন এমন মোমিন ব্যতীত অন্য কেউ ইহা ধারণ করতে পারে না। বিশ্বস্ত হৃদয় ও স্বচ্ছ বোধগম্যতাবিহীন কেউ আমাদের

হাদীস সংরক্ষণ করতে পারবে না। হে লোকসকল, আমাকে হারাবার আগে যা কিছু জানার আছে জিজ্ঞেস করে জেনে নাও। নিশ্চয়ই, আমি পৃথিবীর পথ অপেক্ষা আকাশের পথের সাথে অধিক পরিচিত[২] এবং তৎপূর্বেই ফেতনা-ফ্যাসাদ ইহার পায়ের ওপর ভর দিয়ে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠবে যা মানুষকে আতঙ্কিত করবে এবং মানুষ জ্ঞান-বুদ্ধি হারা হয়ে পড়বে।

১। আমিরুল মোমেনিনের এই উক্তিগুলো হলো 'মুহাজির' ও 'মুসতাদ'আফ' শব্দদ্বয়ের ব্যাখ্যা। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে ঃ

> *নিশ্চয়ই যারা আপন নফসের ওপর জুলুম করে তাদের মৃত্যুদানকালে ফেরেশতাগণ বলে, "তোমরা কি অবস্থায় ছিলে?" তারা বলে, "আমরা পৃথিবীতে দুর্বল ও অসহায় ছিলাম।" তারা (ফেরেশতাগণ) বলে, "আল্লাহ্‌র পৃথিবী কি প্রশস্ত ছিল না, যাতে তোমরা হিজরত করতে পারতে?" সুতরাং এরূপ লোকের অবস্থানস্থল হলো জাহান্নাম; এবং ইহা কত মন্দ আশ্রয়স্থল। তবে যেসব দুর্বল পুরুষ, নারী ও শিশু কোন উপায় অবলম্বন করতে পারে না এবং কোন হেদায়েত পায় না, আল্লাহ্ হয়ত তাদেরকে ক্ষমা করবেন, কারণ আল্লাহ্ পাপমোচনকারী ও ক্ষমাশীল (৪ : ৯৭-৯৯)।*

আমিরুল মোমেনিন এখানে বুঝাতে চেয়েছেন যে, হিজরত শুধুমাত্র রাসুলের (সঃ) জীবৎকালেই বাধ্যতামূলক কাজ নয়—বরং ইহা একটি স্থায়ী বাধ্যতামূলক প্রক্রিয়া। এ হিজরত বর্তমানে আল্লাহ্‌র প্রমাণ এবং সত্য দ্বীনের জন্যও বাধ্যতামূলক। সুতরাং যে ব্যক্তি মুশরিকদের মাঝে থেকেও আল্লাহ্‌র প্রমাণ অর্জন করতে পারে এবং তাতে ইমান রাখতে পারে তারজন্য হিজরত বাধ্যতামূলক নয়।

মুসতাদ'আফ (দুর্বল ও অসহায়) সেই ব্যক্তি যে অবিশ্বাসীদের মাঝে বসবাস করছে এবং আল্লাহ্‌র প্রমাণ সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার কোন সুযোগ নেই, আবার আল্লাহ্ প্রমাণ লাভ করার জন্য হিজরত করতেও অসমর্থ।

২। কেউ কেউ ব্যাখ্যা করেছেন যে, আমিরুল মোমেনিন 'আকাশের পথ' বলতে দ্বীনের বিধান ও মিনহাজ এবং 'পৃথিবীর পথ' বলতে দুনিয়ার কর্মকান্ড বুঝিয়েছেন। বাহ্‌রানী[১০১] (৪র্থ খন্ড, পৃঃ ২০০-২০১) লিখেছেন ঃ

> *আল্লামা আল-ওয়াবারী হতে বর্ণিত আছে যে, আমিরুল মোমেনিনের উক্তির অর্থ হলো তাঁর জ্ঞানের পরিধি দুনিয়ার বিষয় অপেক্ষা দ্বীনের বিষয়ে অধিক।*

মূল বিষয়টি বিবেচনা করলে বাহ্‌রানীর উপর্যুক্ত ব্যাখ্যা সঠিক বলে গ্রহণ করা যায় না। কারন "আমাকে হারাবার আগেই যা জানতে চাও জিজ্ঞেস কর"—এ কথার কারণ হিসাবে ব্যাখ্যাধীন বাক্যটি লিখা হয়েছে। অথচ আমিরুল মোমেনিন তাঁর এ উক্তির পরেই ফেতনা ও বিদ্রোহ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। এ দু'টি বাক্যের মধ্যে "আমি দুনিয়া অপেক্ষা দ্বীনের বিষয় বেশী জানি"- উক্তিটি গুরুত্বহীন। আবার কারো কারো মতে ভবিষ্যদ্বাণী বিষয়ে অধিক গুরুত্ব প্রদান করার জন্য এ উক্তিটি করা হয়েছে। কারণ সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী করা সচরাচরভাবে মানুষের সাধ্যাতীত। তদুপরি, আমিরুল মোমেনিনের চ্যালেঞ্জে স্পষ্টতঃ বলা হয়েছে যে, যা কিছু মানুষ জানতে চায় তা যেন জিজ্ঞেস করে। এ কথার অর্থ এমন হতে পারে না যে, তিনি শুধু দ্বীনের বিধি-বিধান জেনে নেয়ার আহ্বান করেছিলেন। তার চ্যালেঞ্জ সাধারণত মানুষের জন্য দুঃসাধ্য ভবিষ্যৎ বিষয়াবলী জিজ্ঞেস করতেও বারিত করেননি। বরং সেদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে "আকাশের পথ" শব্দ দ্বারা। বিদ্রোহের উত্থান সম্পর্কে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী দ্বীনের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়। কাজেই একথা শুধু দ্বীনের জ্ঞানের প্রমাণ বহন করে না। শব্দের স্পষ্টভাব উপেক্ষা করে মনগড়া ব্যাখ্যা দ্বারা সঠিক ভাবধারা তুলে ধরা যায় না। প্রকৃতপক্ষে আমিরুল মোমেনিন উমাইয়া-ফেতনার বিরুদ্ধে সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন, "তোমাদের যা ইচ্ছে হয় আমাকে জিজ্ঞেস কর; কারণ, আমি দুনিয়ার পথ অপেক্ষা ঐশী নিয়তির পথ অধিক জানি। সুতরাং যদি তোমরা আমাকে স্মৃতিফলকে নির্ধারিত নিয়তির বিষয়েও জিজ্ঞেস কর আমি তোমাদেরকে তা বলে দিতে পারি। এমনকি যেসব বিষয়ে আমার বিরুদ্ধে মারাত্মক ষড়যন্ত্র মাথাচাড়া দিতে যাচ্ছে, অথচ তোমরা সে বিষয়ে সন্দিহান, তাও আমি বলে দিতে পারি। কারন আমার চোখ সেই স্বর্গীয় দিকের সাথে বেশী পরিচিত যা ঘটনা প্রবাহ ও ফেতনার প্রতি দৃষ্টি রাখে এবং পৃথিবীতে বিরাজমান জীবনসমূহের প্রতি তত

বেশী দৃষ্টি রাখে না। এই ফেতনা এত নিশ্চিত যেন চোখের সামনে উপস্থিত কোন বস্তু। তোমরা আমাকে এ বিষয়ে বিস্তারিত জিজ্ঞেস করতে পার এবং সময় হলে কি উপায়ে নিজেদের প্রতিরক্ষা গড়ে তুলে ফেতনা হতে নিরাপদ থাকতে পারবে তাও জেনে নিতে পার।" হাদীদ[১৫২] (খণ্ড-১৩, পৃঃ ১০৬) মন্তব্য করেছেন ঃ

> *আমিরুল মোমেনিনের এ দাবীর সমর্থন মেলে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীগুলোতে যা তিনি একবার নন, শতবার নন, প্রতিনিয়ত একের পর এক বলে গেছেন। এতে কোন সন্দেহ থাকে না যে, তিনি যা বলেছিলেন তা জ্ঞানের ভিত্তিতে নিশ্চিত জেনেই বলেছেন—সম্ভাব্যতার ভিত্তিতে বলেননি।*

আমিরুল মোমেনিনের ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে খোৎবা-৯২ এর টীকা-২ এ কিছুটা বর্ণনা করা হয়েছে। এ বিষয়ে আরো অধিক জানতে হলে হাদীদ[১৫২], ৭ম খন্ড, পৃঃ ৪৭-৫১ এবং মারআশী[১০৭], ৮ম খন্ড, পৃঃ ৮৭-১৮২ দেখার সুপারিশ করা গেল।

★★★★★

খোৎবা-১৮৯

আল্লাহ্‌র ভয়ের গুরুত্ব, কবরের নির্জনতা এবং আহ্‌লুল বাইতের অনুরাগীর মৃত্যু শহীদের মত হওয়া সম্পর্কে

আল্লাহ্‌র পুরস্কারের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ আমি তাঁর প্রশংসা করি এবং তাঁর অধিকার পরিপূরণের জন্য আমি তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করি। তাঁর একটি শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী আছে। তাঁর মহত্ব চির অম্লান। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর বান্দা ও রাসুল। তিনি আল্লাহ্‌র আনুগত্য স্বীকার করার জন্য মানুষকে আহ্বান করেছিলেন এবং আল্লাহ্‌র দ্বীনের খাতিরে তাঁর শত্রুদের সাথে লড়াই করে তাদেরকে পরাভুত করেছিলেন। জনগণ তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্য একজোট হয়েছিল এবং তাঁর আলো নিভিয়ে দেয়ার জন্য তাদের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা তাঁকে প্রতিহত করতে পারেনি।

সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র ভয় অনুশীলন কর। কারণ ইহার একটা রশি আছে যার পাক খুবই শক্ত এবং ইহার চূড়া সুউচ্চ ও অভেদ্য। আমলে সালেহা দ্বারা অনুশোচনার মাধ্যমে মৃত্যুর দিকে দ্রুত এগিয়ে যাও এবং মৃত্যু উপস্থিত হওয়ার আগেই উহার জন্য প্রস্তুত থাক। কারণ বিচার দিন হলো চূড়ান্ত অবস্থা। শিক্ষাদানের জন্য এটাই যথেষ্ট যে বুঝে এবং শিক্ষা গ্রহণের জন্য এটাই যথেষ্ট যে জানে না। কবরে পৌঁছার আগে কবরের সংকীর্ণতা, একাকীত্বের দুঃখ, পরকালের পথের ভয়, ভীতির তীক্ষ্ণ বেদনা, হাড়গোড়ের বিচ্ছিন্নতা, কানের বধিরতা, কবরের অন্ধকার, প্রতিশ্রুত শাস্তির ভয়—এসব বিষয়ে কি তোমাদের কোন ধারণা আছে?

কাজেই, হে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ, আল্লাহ্‌কে ভয় কর— ভয় কর, কারণ এ দুনিয়া তোমাদের সাথে গতানুগতিক আচরণই করছে। কিন্তু তুমি আর বিচার-দিন এক রশিতে বাঁধা। যদিও দুনিয়া নানা ওজর দেখিয়ে ইহার পাপরাশি নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছে এবং তোমাদেরকে ইহার পথে নিয়ে এসেছে, যদিও ইহা সকল প্রকার লোভ-লালসা নিয়ে তোমাদের দিকে এগিয়ে এসেছে এবং তোমাদেরকে সাদরে বুকে টেনে নিয়েছে, তবুও মৃত্যুর সাথে সাথেই ইহা তোমাদের কাছ থেকে আলাদা হয়ে যাবে এবং ইহার কোল থেকে তোমাদেরকে ছুড়ে ফেলে দেবে। ইহা এমনভাবে তোমাদেরকে ত্যাগ করবে, মনে হবে যেন একটি দিন গত হয়ে গেছে অথবা একটি মাস অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। ইহার নতুন জিনিসগুলো যেন পুরাতন হয়ে গেছে এবং মোটাগুলো যেন চিকন হয়ে গেছে।

তারা (মৃত ব্যক্তিগণ) তখন সংকীর্ণ জায়গায়, বড় জটিল অবস্থায় তীব্র বেদনাদায়ক আগুনে থাকবে যেখানে ক্রন্দন হবে বিলাপময়, শিখা দাউ দাউ করে ওঠবে, শব্দ হবে প্রকম্পিত, দহন হবে অতি তীব্র যা কখনো প্রশমিত হবে না। ইহার জ্বালানি প্রজ্জ্বলিত, ইহার ভয় শঙ্কাকুল, ইহার গর্তগুলো গুপ্ত, ইহার চতুর্দিক অন্ধকার, ইহার পাত্রগুলো জলন্ত এবং ইহার প্রতিটি জিনিষ ঘৃণ্য ও পুঁতি গন্ধময়।

এবং যারা তাদের প্রভুর ক্রোধকে ভয় করে তাদেরকে জানিয়ে দেয়া হবে উদ্যানের সঙ্গীদের কথা (কুরআন-৩৯ :৭৩)

তারা (যারা প্রভুর ক্রোধকে ভয় করে) লাঞ্চনা হতে নিরাপদ, শাস্তি হতে দূরে এবং আগুন হতে তাদেরকে সরিয়ে রাখা হয়েছে। তাদের বাসস্থান শান্তিপূর্ণ এবং তারা তাদের আশা-আকাঙ্খা ও থাকার স্থান নিয়ে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হবে। এরা হলো সেসব লোক যারা পৃথিবীতে সৎ আমল করেছে, তাদের চোখ ছিল অশ্রুপূর্ণ। আল্লাহ্‌র ভয়ে ও তাঁর ক্ষমা প্রার্থনায় তাদের রাত দিনের মতই কেটেছে এবং দুনিয়া হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে একাকীত্বের কারণে তাদের দিন রাতের মতই ছিল। পরিণামে তাদের পুরস্কার ও বিনিময়ের জন্য আল্লাহ্ বেহেশ্‌ত তৈরী করেছিলেন যা তাদের চিরস্থায়ী রাজ্য ও চির-আনুকূল্য।

তারাই সে স্থানের জন্য সবচাইতে যোগ্য ও উপযুক্ত (কুরআন-৪৮ : ২৬)

হে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ, যেদিকে মনোযোগী হলে কেউ কৃতকার্য হতে পারে সেদিকে মনোযোগী হও এবং যাতে কেউ লোকসানের সম্মুখীন হয় তা পরিহার কর। সৎ আমল নিয়ে মৃত্যুর দিকে দ্রুত এগিয়ে যাও, কারণ অতীতে যা করেছো তজ্জন্য তোমাদেরকে হিসাব দিতে হবে এবং যা কিছু সৎ আমল পূর্বাহ্নে প্রেরণ করবে তা শুধু তোমাদের নিজ নিজ হিসাবেই জমা হয়ে থাকবে। পৃথিবীতে এমনভাবে আচরণ কর যেন সেই ভীতিপ্রদ মূহুর্ত (মৃত্যু) এসে গেছে যাতে তোমরা কৃত পাপ মোচন করার জন্য সৎ আমলের আর সুযোগ পাবে না। আল্লাহ্ তাঁর ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করার জন্য আমাদেরকে ও তোমাদেরকে তৌফিক দান করুন এবং তাঁর রহমতের দ্বারা আমাদেরকে ও তোমাদেরকে ক্ষমা করুন।

মাটির সাথে লেগে থাক (অর্থাৎ সহিষ্ণু হও), পরীক্ষায় ধৈর্য ধারণ কর, জিহ্বার সাথে সাথে (অর্থাৎ কথায় কথায়) হাত ও তরবারি নেড়ো না এবং যে বিষয়ে আল্লাহ্ ত্বরা করতে বলেননি সে বিষয়ে তাড়াহুড়া করো না। কারণ তোমাদের মধ্যে কেউ যদি শয্যায় মৃত্যুবরণ করে তখন যদি তার আল্লাহ্, রাসুল ও রাসুলের আহলুল বাইতের অধিকার ও মর্যাদা সম্পর্কে জ্ঞান থাকে তবে সে শহীদ হিসাবে মৃত্যুবরণ করবে। তার পুরস্কার স্বয়ং আল্লাহ্‌র হাতে। যেসব সৎ আমল করার জন্য তার ইচ্ছা ছিল (কিন্তু করতে পারেনি) সেসব আমলেরও পুরস্কার ও বিনিময় তাকে দেয়া হবে। নিশ্চয়ই, প্রত্যেক জিনিসের সময় ও সীমা নির্ধারিত রয়েছে।

★★★★★

খোৎবা-১৯০

আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও ভয় সম্পর্কে

প্রতিষ্ঠিত প্রশংসা আল্লাহ্‌র; যাঁর প্রশংসা সুবিস্তৃত, যাঁর সৈন্য-বাহিনী অপরাজেয় এবং যাঁর মর্যাদা চির অম্লান। আমি তাঁর ক্রমাগত নেয়ামত ও মহা-রহমতের জন্য প্রশংসা করি। তাঁর ক্ষমা সুমহান এবং সেজন্যই তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। যাকিছু বর্তমানে ঘটছে এবং অতীতে যাকিছু ঘটেছে উহার সব কিছুই তিনি জানেন। তিনি তাঁর জ্ঞান দ্বারা সমগ্র সৃষ্টির শিল্প-কৌশল তৈরী করেছেন এবং কোন প্রকার সীমাবদ্ধতা, শিক্ষা, অনুকরণ, ভুলভ্রান্তি ও সাহায্যকারী ছাড়াই নিজের থেকেই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর বান্দা ও

রাসুল, যাঁকে তিনি এমন সময় প্রেরণ করেছেন যখন মানুষ রসাতলে চলে গিয়েছিল এবং বিভ্রান্তিতে ঘুরপাক খাচ্ছিলো। ধ্বংসের লাগাম তাদেরকে হেঁচড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিলো এবং তাদের হৃদয়ে পাপের তালা স্থায়ীভাবে লেগেছিলো।

হে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ, আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি আল্লাহ্‌কে ভয় করার জন্য, কারণ এটা হলো তোমাদের ওপর আল্লাহ্‌র অধিকার এবং এতে আল্লাহ্‌র ওপর তোমাদের অধিকারও বর্তায়। তোমরা ইহার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা করতে পার এবং ইহার সাহায্যে আল্লাহ্‌র সাক্ষাতের আশা করতে পার। নিশ্চয়ই, ইহকালে আল্লাহ্‌র ভয় তোমাদের প্রতিরক্ষা ও ঢাল এবং পরকালে ইহা বেহেশ্‌তের রাস্তা। ইহার পথ সুস্পষ্ট এবং যে কেউ এ পথে পদচারণা করে সে লাভবান হয়। যে কেউ ইহা ধারণ করে সে ইহাকে রক্ষা করে। ইহা সেসব লোকের কাছে নিজেকে উপস্থাপন করে যারা পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে এবং যারা পেছন থেকে এগিয়ে আসছে; কারণ আগামীকাল (বিচার দিনে) তাদের এটার প্রয়োজন হবে যখন আল্লাহ্ তাঁর বান্দাকে পুনরায় গ্রহণ করবে, যা তিনি দিয়েছিলেন তা ফেরত নেবেন এবং যেসব নেয়ামত তিনি দান করেছিলেন উহার হিসাব নেবেন। আহা! কত অল্প সংখ্যক লোক এটা গ্রহণ করে এবং যত লোক এটার অনুশীলন করা দরকার তার তুলনায় কত অল্প সংখ্যক ইহা অনুশীলন করে। তারা সংখ্যায় অত্যল্প এবং তাদের সম্বন্ধেই মহিমান্বিত আল্লাহ্ বলেন ঃ

... এবং আমার বান্দাগণের অল্পই কৃতজ্ঞ (কুরআন-৩৪ঃ১৩)

সুতরাং তোমাদের কান খাড়া রেখে ইহার দিকে দ্রুত এগিয়ে যাও এবং ইহার জন্য তোমাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা বাড়িয়ে নাও। এটাকে তোমাদের অতীতের সকল ত্রুটি-বিচ্যুতির বিকল্প করে নাও যেমন করে উত্তরাধিকারী পূর্বসূরীর স্থলাভিষিক্ত হয় এবং সকল বিরোধীর বিরুদ্ধে এটাকে সহায়তাকারী করে নাও। ইহার সাহায্যে নিদ্রাকে জাগরণে পরিণত কর এবং ইহার সাথে দিন যাপন কর। ইহাকে হৃদয়ের হাতিয়ার করে নাও, ইহার সাহায্যে সকল পাপ ধুয়ে-মুছে ফেল, ইহার সাহায্যে তোমাদের রোগের চিকিৎসা কর এবং ইহাকে সঙ্গে নিয়ে মৃত্যুর দিকে দ্রুত এগিয়ে যাও। যারা ইহাকে অবহেলা করে তাদের থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর যাতে অন্যরা তোমার থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে না পারে। সাবধান, তোমরা ইহার প্রতি যত্নবান হও এবং ইহার মাধ্যমে নিজেদের প্রতি যত্নশীল থেকো।

এ দুনিয়া হতে দূরে সরে থেকো এবং মোহাচ্ছন্ন অবস্থায় পরকালের দিকে অগ্রসর হয়ো না। আল্লাহ্‌র ভয় যাকে উচ্চমর্যাদা দান করেছে তাকে দীনহীন মনে করো না এবং দুনিয়া যাকে উচ্চ মর্যাদা দিয়েছে তাকে মর্যাদাশালী মনে করো না। দুনিয়ার চাকচিক্যের দিকে নজর দিয়ো না, যারা দুনিয়ার কথা বলে তাদের কথা শুনো না, যারা দুনিয়ার দিকে আহ্বান করে তাদের ডাকে সাড়া দিয়ো না, দুনিয়ার ঝলমলানি হতে আলোর অনুসন্ধান করো না এবং ইহার মূল্যবান বস্তুর মাঝে মৃত্যুবরণ করো না। কারণ ইহার ঔজ্জ্বল্য প্রতারণাপূর্ণ (মরিচিকা), ইহার কথা মিথ্যা, ইহার সম্পদ লুণ্ঠিত হয় এবং ইহার বস্তু সামগ্রী কেড়ে নেয়া হয়।

সাবধান, এ দুনিয়া প্রথমে আকর্ষণ করে এবং পরে মুখ ফিরিয়ে নেয়। ইহা এতই অবাধ্য যে, সামনে এগুতে অস্বীকার করে। ইহা মিথ্যা কথা বলে এবং তসরুফ করে। ইহা সহজে পরিত্যাগ করে এবং অকৃতজ্ঞ। ইহা পাপপূর্ণ এবং (ইহার প্রেমিককে) বর্জন করে। ইহা আকৃষ্ট করে কিন্তু বিপদে ঠেলে দেয়। ইহার অবস্থা পরিবর্তনশীল, ইহার পদক্ষেপ কম্পবান, ইহার সম্মান অমর্যাদাকর, ইহার রাশভারীভাব হাস্যকর এবং ইহার উচ্চতা হীনতা বই কিছু নয়। ইহা ডাকাতি ও লুটের স্থান এবং বিনষ্ট ও ধ্বংসের স্থান। ইহার মানুষগুলো তাড়া খাবার জন্য, অতিক্রম করে যাবার জন্য এবং প্রস্থান করার জন্য তাদের পায়ের ওপর দণ্ডায়মান অবস্থায় প্রস্তুত হয়ে আছে। ইহার পথ বিভ্রান্তকর, ইহার বহির্গমন ধাঁধাঁপূর্ণ এবং ইহার কর্মসূচী হতাশাপূর্ণ। ফলতঃ যারা শক্ত করে হাল ধরে তারা এটাকে তাড়িয়ে দেয়, ঘর হতে বাহিরে নিক্ষেপ করে এবং সুচতুর ব্যক্তি ইহাকে ব্যর্থ করে দেয়।

যারা দুনিয়ার খপ্পরে পড়েছে তাদের কতেক এখন খোঁড়া উটের মত, কতেক কর্তিত মাংশের মত, কতেক বিচ্ছিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মত, কতেক ঝরা-রক্তের মত, কতেক তাদের হাত কামড়াচ্ছে (বেদনায়), কতেক হাত কচলাচ্ছে (অনুতাপে), কতেক গালে হাত দিয়ে রেখেছে (উদ্বিগ্নতায়), কতেক নিজের অভিমতকে অভিশাপ দিচ্ছে এবং কতেক তাদের সংকল্প হতে ফিরে আসছে। কিন্তু আমলের সময় চলে গেছে এবং দুর্যোগের ঘনঘটা দেখা দিয়েছে–"এখন আর রক্ষা পাবার কোন সময় নেই" (কুরআন-৩৮ঃ৩)। হায়! হায়!! যা হারিয়ে গেছে তা চিরতরে চলে গেছে। দুনিয়া ইহার স্বাভাবিক নিয়মে চলছে।

সুতরাং আকাশ ও পৃথিবীর কেউ তাদের জন্য অশ্রুপাত করেনি এবং তাদের অবকাশও দেয়া হয়নি (কুরআন-৪৪ঃ২৯)।

★★★★★

খোৎবা-১৯১

খোৎবাতুল কাসিআহ্

প্রতিষ্ঠিত প্রশংসা আল্লাহর যিনি সম্মান ও মর্যাদার ভূষণে ভূষিত এবং ইহা তিনি তাঁর বান্দার পরিবর্তে নিজের জন্যই নির্ধারিত করেছেন। এই সম্মান ও মর্যাদাকে তিনি অন্যের জন্য অপ্রবেশ্য ও অবৈধ করেছেন। তিনি তার মহিমান্বিত জাতের জন্য ইহা নির্ধারণ করেছেন এবং যে কেউ এ বিষয়ে তাঁর সাথে প্রতিযোগিতা করবে তার প্রতি লানত দিয়েছেন।

ইবলীসের আত্মম্ভরিতা সম্পর্কে

তিনি তাঁর ফেরেশতাগণকে এসব গুণাবলী সম্বন্ধে পরীক্ষায় ফেললেন যাতে তাদের মধ্যে কারা বিনয়ী আর কারা দুর্বিণীত তা পরখ করা যায়। হৃদয়ে যা লুক্কায়িত ও অদৃশ্যে যা বিরাজমান সে বিষয়ে জ্ঞাত আল্লাহ্ বলেন ঃ

...নিশ্চয়ই আমি কর্দম হতে মানুষ সৃষ্টি করতে যাচ্ছি। যখন আমি উহাকে সুষম করবো এবং উহাতে আমার রুহ সঞ্চার করবো, তখন তোমরা উহার প্রতি সিজদাবনত হয়ো। তখন ফেরেশতাগণ সকলেই সিজদাবনত হলো, কেবল ইবলীস ব্যতীত, সে অহংকার করলো, ফলে কাফিরদের অন্তর্ভূক্ত হলো (কুরআন-৩৮ঃ৭১-৭৪)

ইবলীসের অসার দম্ভ তার পথে বাধা হয়ে দাড়ালো। সুতরাং সে নিজের সৃষ্টি ও মূল উৎস বিষয়ে গর্ব অনুভব করে আদমের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করলো। এভাবেই আল্লাহ্র এ শত্রু দাম্ভিক ও উদ্ধতগণের নেতা হলো। এ ইবলীসই বিরোধিতার গোড়া পত্তন করেছিলো, মর্যাদা সম্পর্কে আল্লাহ্র সাথে কলহে লিপ্ত হয়েছিলো, ঔদ্ধত্যের পোষাক পরিধান করেছিলো এবং বিনম্রতার আবরণ অপসারিত করেছিলো। তোমরা কি দেখ না অসাড় দম্ভ ও কল্পিত মর্যাদার গর্ব করার ফলে আল্লাহ্ তাকে কিভাবে হতমান ও মর্যাদাহীন করেছেন? আল্লাহ্ তাকে ইহকালে পরিত্যাগ করেছেন এবং পরকালে তার জন্য জ্বলন্ত অনল প্রস্তুত রেখেছেন।

যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করতেন তবে আদমকে এমন নূর হতে সৃষ্টি করতে পারতেন যার তাজাল্লী চোখ ধাঁধিয়ে দিতো, যার সৌন্দর্য সকলকে বিহ্বল করে দিতো এবং যার সুগন্ধ শ্বাস-প্রশ্বাসে অনুভূত হতো; যদি তিনি এমনটি করতেন তবে ফেরেশতাগণের পরীক্ষা সহজতর হতো। কিন্তু মহিমান্বিত আল্লাহ্ তাঁর বান্দাগণকে এমন জিনিস দ্বারা পরীক্ষা করলেন যার আসল প্রকৃতি তারা জানে না যাতে তারা পরখ করে ভাল মন্দ ব্যবধান করতে পারে এবং যাতে তারা তাদের দম্ভ দূরীভূত করে আত্মম্ভরিতা ও আত্ম-প্রশংসা হতে দূরে থাকতে পারে।

শয়তানের সাথে আল্লাহ্ যে ব্যবহার করেছেন তা হতে তোমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। এক মুহূর্তের আত্মম্ভরিতার কারণে তার সকল মহৎ আমল ও ইবাদত তিনি বাতিল করে দিয়েছেন–যদিও সে ছয় হাজার বছর আল্লাহ্র ইবাদত করেছিলো—এটা ইহকাল অথবা পরকাল গণনা করে কিনা জানা নেই। শয়তানের পরে একই রকম অবাধ্যতা দেখিয়ে তোমাদের কেউ কি আল্লাহ্ হতে নিরাপদ থাকতে পারবে? মোটেই কেউ না। মহিমান্বিত আল্লাহ্ যে কারণে বেহেশ্ত হতে একজন ফেরেশতাকে বহিষ্কার করেছেন সে কাজ করলে তিনি কোন মানুষকে বেহেশতে প্রবেশ করতে দেবেন না। আকাশ ও ভূমন্ডলের সকলের প্রতি তাঁর আদেশ সমভাবে প্রযোজ্য। আল্লাহ্র সঙ্গে কারো এমন কোন বন্ধুত্ব নেই যেজন্য তিনি কাউকে কোন অবাঞ্ছিত বিষয়ে লাইসেন্স দিয়েছেন এবং অন্য কারো জন্য উহা অবৈধ করেছেন।

শয়তানের বিরুদ্ধে সতর্কতা সম্পর্কে

সুতরাং তোমরা ভয়ে থেকো পাছে শয়তান তার রোগ তোমাদের মাঝে সংক্রমণ করে দেয় অথবা তার আহ্বানের মাধ্যমে তোমাদেরকে বিপথগামী করে দেয় অথবা তার অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী নিয়ে তোমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কারণ আমার জীবনের শপথ, সে তোমাদের বিরুদ্ধে তার ধনুকে শর যোজনা করেছে, শক্তভাবে ধনুকে টঙ্কার তুলেছে এবং নিকটবর্তী অবস্থান হতে তোমাদের প্রতি লক্ষ্য স্থির করেছে। সে বলেছিল ঃ

> *হে আমার প্রভু, যার কারণে আপনি আমাকে পরিত্যাগ করে ধ্বংসে নিপতিত করেছেন, নিশ্চয়ই আমি তাদেরকে ভ্রান্তির পথে পরিচালিত করবো এবং নিশ্চয়ই আমি তাদের সকলকে বিপথে নিয়ে যাব (কুরআন-১৫ঃ৩৯)*

যদিও অজানা ভবিষ্যৎ বিষয়ে অনুমান করে শয়তান এই উক্তি করেছিলো তবুও অসাড় দম্ভের পুত্রগণ, ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের ভ্রাতাগণ এবং অহমিকা ও অধৈর্য্যের অশ্বারোহীগণ তার কথা সত্য বলে প্রমাণিত করেছে; অন্ততঃপক্ষে তোমাদের মধ্য হতে অবাধ্যগণ যখন তার সামনে মাথা নত করে, তোমাদের সম্বন্ধে তার লোভ শক্তিলাভ করে এবং যা ছিল গুপ্ত তা স্পষ্ট হয়ে পড়ে, তোমাদের ওপর তার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ এসে যায় ও তার বাহিনী নিয়ে কুচকাওয়াজ করে তোমাদের দিকে এগিয়ে আসে।

তৎপর তারা তোমাদেরকে অসম্মানের গর্তে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিল, জবাই করার যাঁতাকলে নিক্ষেপ করেছিল, তোমাদেরকে পদদলিত করেছিল, বর্শা দ্বারা চোখে আঘাত করে তামাদেরকে আহত করেছিল, তোমাদের গলা কেটে দিয়েছিল, তোমাদের নাক ছিঁড়ে ফেলেছিল, তোমাদের অঙ্গ-প্রতঙ্গ ভেঙ্গে ফেলেছিল এবং তার নিয়ন্ত্রণ-রশিতে তোমাদেরকে বেঁধে জ্বলন্ত আগুনের দিকে নিয়ে গেল। এভাবে সে তোমাদের দ্বীনের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর হলো এবং তোমাদের দুনিয়াদারীতে ফেতনা-শিখা প্রজ্জলনকারী হিসাবে পরিগণিত হলো। যে সকল শত্রুর বিরুদ্ধে তোমরা সৈন্য চালনা কর, শয়তান তাদের চেয়ে অধিক ঘোরতর শত্রু।

সুতরাং শয়তানের বিরুদ্ধে তোমাদের সমুদয় শক্তি ও সামর্থ্য নিয়োগ করা উচিত। কারণ আল্লাহ্র কসম, সে তোমাদের মূল উৎসের প্রতি দম্ভোক্তি করেছিল, তোমাদের মর্যাদা সম্পর্কে প্রশ্নের অবতারণা করেছিল এবং তোমাদের বংশধারার ওপর বাজে মন্তব্য করেছিল। সে তার সৈন্যবাহিনীসহ তোমাদের দিকে অগ্রসর হয়েছিল এবং তোমাদের পথের দিকে তার পদাতিক বাহিনী নিয়ে এসেছিল। তারা প্রতিটি স্থান হতে তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করছে এবং তারা তোমাদের আঙ্গুলের প্রতিটি জোড়ায় আঘাত করছে। তোমরা কোন উপায়েই আত্মরক্ষা করতে সমর্থ নও এবং কোন সংকল্প দ্বারাই তাদের প্রতিহত করতে পারছো না। তোমরা অসম্মানের কুয়াশায় ঘেরা, দুর্দশার জালে আবদ্ধ, মৃত্যুর মাঠে রয়েছো এবং মহাবিপদের পথে রয়েছো।

সুতরাং তোমাদের হৃদয়ের গুপ্ত ঔদ্ধত্যের আগুন ও অসহিষ্ণুতার শিখা নিভিয়ে ফেল। একজন মুসলিমের হৃদয়ে এহেন আত্মম্ভরিতা শুধুমাত্র শয়তানের প্ররোচনায় ও কুমন্ত্রণায় হতে পারে। বিনয়ী হবার জন্য মনস্থির কর, আত্মশ্লাঘাকে পদদলিত কর এবং তোমাদের স্কন্ধ হতে আত্মম্ভরিতা দূরে ছুঁড়ে ফেল। বিনয়কে তোমরা তোমাদের শত্রু অর্থাৎ শয়তান ও তার বাহিনীর বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসাবে গ্রহণ কর। নিশ্চয়ই, সকল জনগোষ্ঠী হতেই তার যোদ্ধা, সহায়তাকারী, পদাতিক ও অশ্বারোহী রয়েছে। তোমরা সেই লোকের মত হয়ো না, যে আল্লাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত কোন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী না হয়েও নিজ মায়ের পুত্রের (অর্থাৎ ভাই) ওপর শ্রেষ্ঠত্ব উদ্ভাবন করে। এসব লোকের হৃদয়ে সর্বদা ঈর্ষা ও ক্রোধের আগুন প্রজ্জ্বলিত থাকে যা তাকে আত্মম্ভরিতা ও শ্রেষ্ঠত্বের দাবীর দিকে ঠেলে দেয়। শয়তান তার আত্মম্ভরিতা নিজের নাকে ছুঁড়ে মেরেছিল এবং তাতে আল্লাহ্ তাকে গভীর আক্ষেপে ফেললেন এবং শেষ বিচার দিন পর্যন্ত সকল হত্যাকারীর পাপের জন্য তাকে দায়ী করলেন।

অজ্ঞতা সম্পর্কে আত্মগর্ব

সাবধান, এ পৃথিবীতে আল্লাহ্র প্রকাশ্য বিরোধিতা করে যেসব বিদ্রোহ ও ফেতনা সংঘটিত হচ্ছে এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কারণে মোমিনগণকে চ্যালেঞ্জ করা হচ্ছে, তোমরা উহার বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রামে লিপ্ত হও। আত্মশ্লাঘা ও অসার দম্ভ অনুভব করতে আল্লাহ্কে ভয় কর! আল্লাহ্কে! কারণ, এটাই শত্রুতার মূল এবং শয়তানের নকশা যদ্দারা শয়তান অতীতেও মানুষকে ধোঁকা দিয়েছে। ফলে তারা অজ্ঞতার অন্ধকারে পতিত হয়েছিল এবং তার দ্বারা পরিচালিত হয়েও তার নেতৃত্ব মেনে নিয়ে গোমরাহীর অতল গহ্বরে ডুবে গিয়েছিল। যুগের পর যুগ, শতব্দীর পর শতাব্দী চলে গেছে, কিন্তু আত্মশ্লাঘা বিষয়ে মানুষের হৃদয় একই রকম রয়ে গেছে–মানুষের হৃদয় আত্মম্ভরিতায় ভরপুর হয়ে আছে।

আত্মম্ভরী নেতাকে মান্য করা সম্পর্কে

সাবধান, তোমরা সেসব নেতা ও প্রবীণদের মান্য করতে সতর্কতা অবলম্বন করো যারা নিজেদের কৃতিত্বে আত্মম্ভরিতা অনুভব করে এবং নিজেদের বংশ মর্যাদা নিয়ে গৌরব করে। তারা সকল বিষয়ে দায়-দায়িত্ব আল্লাহ্র প্রতি নিক্ষেপ করে, আল্লাহ্ তাদের জন্য যা করেছেন তজ্জন্য তাঁর সাথে কলহে লিপ্ত হয়, তাঁর রায়ের প্রতিবাদ করে এবং তাঁর নেয়ামত সম্বন্ধে তর্কের অবতারণা করে। নিশ্চয়ই, তারা একঘুঁয়েমির ভিত্তিমূল, ফেতনার প্রধান স্তম্ভ এবং প্রাক-ইসলামী যুগের বংশ-গৌরবকারীদের তরবারি। সুতরাং আল্লাহ্কে ভয় কর; তোমাদের ওপর তাঁর আনুকূল্যের বিরোধিতা করো না এবং তোমাদের ওপর তাঁর নেয়ামতের জন্য ঈর্ষান্বিত হয়ো না। ইসলামের দাবিদারদের মধ্যে যাদের ময়লাযুক্ত পানি তোমরা তোমাদের পরিষ্কার পানির সাথে পান কর, যাদের পীড়া তোমরা তোমাদের সুস্থতার সাথে মিশ্রন কর এবং যাদের ভ্রান্তি তোমরা তোমাদের সঠিক ও ন্যায় বিষয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে ফেল, তাদের মান্য করো না।

তারা পাপের ভিত্তিমূল এবং অবাধ্যতার শক্তিবর্ধক। শয়তান তাদেরকে গোমরাহীর বাহক ও সৈন্যে পরিণত করেছে যাদের সাহায্যে সে মানুষকে আক্রমণ করে। তারা ব্যাখ্যাকারক যাদের মাধ্যমে সে কথা বলে যাতে তোমাদের বুদ্ধিমত্তা চুরি করা যায় এবং তোমাদের চোখ ও কানে প্রবেশ করা যায়। এভাবে সে তোমাদেরকে তার তীরের শিকার করে নেয় এবং তার পদচারণার ভূমি ও শক্তির উৎস করে নেয়। অতীতে যেসব লোক ব্যর্থ হয়ে গেছে তাদের ওপর কিভাবে সে আল্লাহ্র রোষ ও শাস্তি এনেছিল উহা হতে শিক্ষা গ্রহণ কর। তাদের কাত হয়ে গালের ওপর শুয়ে থাকা (মৃত্যু) হতে উপদেশ গ্রহণ কর এবং আত্মশ্লাঘার বিপদ হতে রক্ষা পাবার জন্য আল্লাহ্র করুণা ভিক্ষা কর যেভাবে দুর্যোগের সময় তাঁর নিরাপত্তা যাচনা কর।

পয়গম্বরগণের বিনয় সম্পর্কে

নিশ্চয়ই, আল্লাহ্ যদি কাউকে আত্মশ্লাঘা ও গর্ব করার অনুমতি দিতেন তবে তাঁর মনোনীত পয়গম্বরগণ ও তাঁদের স্থলাভিষিক্তগণকেই তা দিতেন। কিন্তু মহিমান্বিত আল্লাহ্ তাঁদের জন্য আত্মম্ভরিতাকে নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন এবং তাদের বিনয়কে পছন্দ করেছেন। সুতরাং তাঁরা মাটিতে মাথা নত করেছে, তাঁদের মুখমন্ডলকে ধুলা-ধুসরিত করেছিল, মোমিনদের জন্য নিজদেরকে বক্র করেছিল (অর্থাৎ সেজদায় পড়েছে) এবং নিজেরা সর্বদা বিনয়ী হয়ে রয়েছিল। আল্লাহ্ তাদেরকে দারিদ্র ও ক্ষুধা দ্বারা, যন্ত্রণাদায়ক বিপদাপদ ও ভীতি দ্বারা, দুঃখ ও দুর্দশা দ্বারা পরীক্ষা করেছিলেন। সুতরাং সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দেখে তোমরা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কি অসন্তুষ্টি নির্ণয় করো না। কারণ সম্পদশালী ও ক্ষমতাবান থাকাকালে তোমাদের পাপ সমূহের কথা তোমরা বেমালুম ভুলে থাক। মহিমান্বিত আল্লাহ্ বলেন ঃ

> *কি! তারা কি মনে করে যে, আমরা তাদেরকে ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি দান করি বলে তাদের জন্য সকল প্রকার মঙ্গল ত্বরান্বিত করছি? না, তারা বুঝে না। (কুরআন-২৩ঃ৫৫-৫৬)*

নিশ্চয়ই, মহিমান্বিত আল্লাহ্ আত্মম্ভরী বান্দাগণকে তাঁর প্রিয়জনের মাধ্যমে পরীক্ষা করেন যাঁরা তাদের চোখে হীন। যখন ইমরানের পুত্র মুসা তাঁর ভ্রাতা হারুনকে সঙ্গে নিয়ে মোটা পশমী কাপড় পরে লাঠি হাতে ফেরাউনের নিকট গিয়েছিল এবং বলেছিল যে, যদি সে আত্মসমর্পণ করে তবে তার রাজ্য রক্ষা পাবে এবং তার সম্মান অব্যাহত থাকবে। কিন্তু ফেরাউন তার লোকদের দিকে তাকিয়ে বললো, "তোমাদের কি অবাক লাগছে না যে, এ দু'ব্যক্তি আমার রাজত্ব রক্ষা পাবার ও সম্মান অব্যাহত থাকার নিশ্চয়তা দিচ্ছে? অথচ দেখ, এ দু'জন কত দরিদ্র ও হীনাবস্থা সম্পন্ন। এ রকম নিশ্চয়তা প্রদানকারী হলে তারা তাদের হাতে স্বর্ণের বালা পরে আসেনি কেন?" ফেরাউন তার বিপুল ঐশ্বর্য ও সম্পদের কারণে গর্বিত হয়ে পশমী পোষাককে তুচ্ছ মনে করেছিল।

মহিমান্বিত আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে সমস্ত জাগতিক সম্পদ, স্বর্ণের খনি, সুসজ্জিত বাগান ও সমস্ত পশু-পাখী তাঁর মনোনীত পয়গম্বরগণের চারপাশে জড়ো করতে পারতেন। যদি তিনি তা করতেন তবে পরীক্ষা করার কোন সুযোগ থাকতো না, বিনিময় প্রদানের সুযোগ থাকতো না এবং পরকালের সুসংবাদের প্রয়োজন হতো না। তদুপরি যারা তাঁর বাণী গ্রহণ করেছে, তাদেরকে বিচারের পর প্রতিদান দেয়া যেতো না, মোমিনগণ তাদের সৎ আমলের জন্য পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য হতেন না এবং এসব শব্দাবলীর কোন অর্থই থাকতো না। কিন্তু মহিমান্বিত আল্লাহ্ তাঁর পয়গম্বরগণকে বাহ্যিকভাবে দুর্বল করেছেন কিন্তু সংকল্পে সুদৃঢ় করেছেন এবং অভাব-অনটনের যন্ত্রণা দিয়েছেন কিন্তু হৃদয়-ভরা পরিতৃপ্তি দিয়েছেন।

যদি পয়গম্বরগণ অনাক্রমণ্য ক্ষমতার অধিকারী হতেন, অপ্রতিরোধ্য সম্মানের অধিকারী হতেন এবং অপরাজেয় রাজত্বের অধিকারী হতেন তাহলে শিক্ষা গ্রহণ করা মানুষের জন্য সহজতর হতো এবং আত্মশ্লাঘা অনুভব করা মানুষের পক্ষে কষ্টসাধ্য হতো। তখন মানুষ ভয়ে অথবা লোভে ঈমান আনতো এবং তাদের আমল ভিন্ন ভিন্ন হলেও তাদের নিয়্যত (উদ্দেশ্য) একই রকম হতো। সুতরাং মহিমান্বিত আল্লাহ্ চাইলেন যে, মানুষ একবিন্দু লোভ-লালসা ব্যতিরেকে আন্তরিকভাবে তাঁর পয়গম্বরকে অনুসরণ করুক, তাঁর কিতাবকে স্বীকার করুক, তাঁর কাছে আনত হোক, তাঁর আদেশ মান্য করুক এবং তাঁর অনুগত হয়ে থাকুক যাতে একবিন্দুও খাদ থাকবে না। পরীক্ষা ও দুঃখ-দুর্দশা যতই কঠোর হবে পুরস্কার ও বিনিময় ততই বিশাল হবে।

পবিত্র কা'বা সম্পর্কে

তোমরা কি দেখ না, মহিমান্বিত আল্লাহ্ আদম হতে শুরু করে সকলকে পাথর দ্বারা পরীক্ষ করেছেন; যে পাথর কোন উপকার বা ক্ষতি সাধন করতে পারে না এবং ইহা দেখেও না শুনেও না। সেসব পাথর তিনি তাঁর

পবিত্র গৃহে লাগিয়ে উহাকে নিরাপদ আশ্রয় করলেন। পৃথিবীর সবচাইতে এবড়ো-থেবড়ো প্রস্তরময় এলাকার উচ্চভূমিতে উহা স্থাপন করলেন যেখানে মাটির পরিমাণ খুবই কম এবং সেই এলাকা পাথুরে পাহাড়ের মাঝে অত্যন্ত সংকীর্ণ উপত্যকা যেখানে সমতলভূমি বালিময়, কোন পানির ঝরণা ছিল না ও লোকবসতি ছিল বিরল। সে এলাকায় উট, ঘোড়া, গরু, ভেড়া পালন করা যেত না।

তৎপর তিনি আদম ও তার পুত্রগণকে উহার দিকে তাদের দৃষ্টি ফেরাতে আদেশ দিলেন। এভাবে চারণভূমির অনুসন্ধানে উহা তাদের ভ্রমণের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হলো এবং তাদের বাহন-পশু পাবার জন্য মিলনস্থলে পরিণত হলো যাতে দূরের পানিবিহীন মরুভূমি, নিচু উপত্যকা ও সমুদ্রের বিচ্ছিন্ন দ্বীপাঞ্চল হতে মানুষ এখানে চলে আসে। বিনয়াবনতী স্বরূপ তাদের স্কন্ধ নাড়ায়, তাদের উপস্থিতির শ্লোগান দেয়, এলোমেলো চুল ও ধুলি-ধুসরিত মুখমন্ডল নিয়ে তওয়াফ করে, তাদের কাপড় পিঠে নিক্ষেপ করে (এহরাম বাঁধা) এবং চুল কেটে মুখের সৌন্দর্য নষ্ট করে ফেলে। এটা ছিল মহাপরীক্ষা, চরম দুঃখ-দুর্দশা, প্রকাশ্য বিচার ও পরম পরিশুদ্ধি। আল্লাহ্ এটাকে তাঁর রহমতের পথ এবং বেহেশতের সোপান করেছেন।

মহিমান্বিত আল্লাহ্ যদি তাঁর পবিত্র ঘর ও মহান নির্দশনাবলী বৃক্ষরাজী সুশোভিত এলাকায়, স্রোতস্বিনী এলাকায়, নরম সমতল ভূমি এলাকায়, ফলে-ফুলে পরিপূর্ণ এলাকায়, ঘন বসতিপূর্ণ এলাকায়, সোনালী গমের এলাকায়, হৃদয়গ্রাহী উদ্যান ও বাগান এলাকায়, শস্য-শ্যামল এলাকায়, জল-প্রাচুর্য সমতল এলাকায়, ফলের বাগান ও জনকোলাহলপূর্ণ রাস্তা এলাকায় স্থাপন করতেন তবে হালকা পরীক্ষার জন্য বিনিময়ও কমে যেতো। যদি এ পবিত্র ঘরের ভিত ও পাথর যেভাবে আছে সেভাবে না হয়ে সবুজ মর্মর বা লালচুনি পাথরের হতো এবং উহা হতে আলো বিচ্ছুরিত হয়ে পড়তো তবে তা মানুষের অন্তরের সংশয় কমিয়ে দিতো, অন্তর হতে শয়তানের কর্মকান্ড দূরীভূত হতো এবং মানুষের মধ্যে সন্দেহ স্ফীত করে তুলতো না। কিন্তু আল্লাহ্ তাঁর বান্দাগণকে বিবিধ বিপদাপদের মধ্য দিয়ে পরীক্ষা করেন। তিনি চাহেন অভাব-অনটনের মাঝেও বান্দাগণ তাঁর ইবাদত করুক এবং তাদেরকে তিনি দুঃখ-দুর্দশায় নিপতিত করেন। এসব কিছুই তাদের হৃদয় হতে আত্মশ্লাঘা বিদূরিত করার জন্য, তাদেরকে বিনয়ী করে তোলার জন্য এবং এসব কিছু তাঁর দয়া ও ক্ষমা সহজতর করার উপায় হিসেবে বিবেচিত।

বিদ্রোহ ও জুলুম সম্পর্কে সতর্কাদেশ

আল্লাহ্‌কে ভয় কর! আল্লাহ্‌কে! বিদ্রোহের ইহকালীন পরিণাম আর জুলুমের পরকালীন পরিণাম ও আত্মশ্লাঘার কুফল সম্পর্কে আল্লাহ্‌কে ভয় কর। কারণ এগুলো হলো শয়তানের মারাত্মক ফাঁদ ও তার মস্তবড় প্রবঞ্চনা যা প্রাণঘাতী বিষের মত মানুষের হৃদয়ে প্রবেশ করে। তার এ ফাঁদ কখনো ব্যর্থ হয় না– না সুশিক্ষিত ব্যক্তির কাছে তার জ্ঞানের জন্য আর না দরিদ্র ব্যক্তির কাছে তার ছিন্ন বস্ত্রের জন্য। এটা এমন এক বিষয় যা হতে আল্লাহ্ তাঁর সেসব বান্দাকে নিরাপদ রাখে যারা সালাত, সিয়াম, ও সাদ্‌কা দ্বারা মোমিন। কোমল মুখ ধুলা-ধুসরিত করে, বিনয়াবনত হয়ে মাটিতে সেজদায় পড়ে থাকলে, উপোসের কারণে পেট পিঠের সঙ্গে লেগে গেলে, আল্লাহ্‌র ভয়ে চোখ কোটরাগত হয়ে গেলেই এসব অর্জিত হয়।

দেখ, এসব আমল গর্বের চেহারা কুঁকড়ে দেবে এবং আত্মশ্লাঘাকে দাবিয়ে রাখবে। আমি লক্ষ্য করে দেখেছি, কোন কিছুর কারণ ছাড়াই তোমরা আত্মশ্লাঘা অনুভব কর যা অজ্ঞতা ছাড়া কিছু নয় অথবা তোমরা এমন কিছু নিয়ে আত্মম্ভরিতা কর যার কোন মূল্য নেই।

শয়তান নিজের মূলোৎস নিয়ে আদমের ওপর গর্ব করে বলেছিল “আমি আগুনের তৈরী আর আদম মাটির তৈরী।” একইভাবে সমাজের ধনীশ্রেণী তাদের ঐশ্বর্যের জন্য আত্মশ্লাঘা অনুভব করে। আল্লাহ্ বলেন ঃ

> *তারা আরো বলতো, 'আমরা ধনে-জনে সমৃদ্ধশালী; সুতরাং আমাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে না (কুরআন-৩৪ঃ৩৫)*

যদি তোমরা কোনক্রমেই আত্মশ্লাঘাকে এড়াতে না পার তবে সৎগুণের জন্য, প্রশংসনীয় আমলের জন্য, আকর্ষণীয় আচরণের জন্য, উঁচুস্তরের চিন্তার জন্য, সম্মানজনক অবস্থানের জন্য এবং কল্যাণ সাধনের জন্য গর্ববোধ করো। প্রতিবেশীর সংরক্ষণ, চুক্তি পরিপূরণ, ধার্মিকগণের আনুগত্য, উদ্ধতগণের বিরোধিতা, অন্যের প্রতি সদয় হওয়া, বিদ্রোহ হতে বিরত থাকা, রক্তপাত হতে সরে থাকা, ন্যায় বিচার করা, ক্রোধ সংবরণ করা, পৃথিবীতে ফেতনা সৃষ্টি না করা–এসব প্রশংসনীয় অভ্যাসের জন্য তোমরা আত্মগর্ব অনুভব করতে পার। তোমাদের পূর্ববর্তীগণের ওপর তাদের কুকর্মের জন্য যেসব বিপদ ও দুর্যোগ আপতিত হয়েছিল তা স্মরণ করে ভয় কর। মনে রেখো, ভাল অথবা খারাপ অবস্থায় তাদের যা ঘটেছিল, তোমাদের বেলায় যেন তা না ঘটে সে বিষয়ে সতর্ক থেকো।

সেসব লোকের উভয় অবস্থা সম্পর্কে তোমরা চিন্তা কর। যে কাজ তাদের অবস্থানকে সম্মানজনক করেছিল উহার সাথে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত কর। যে সব কাজের জন্য শত্রু তাদের কাছ থেকে দূরে সরেছিল, নিরাপত্তা তাদের ওপর ছড়িয়েছিল, ধনৈশ্বর্য তাদের কাছে মাথা নত করেছিল এবং ইহার ফলশ্রুতিতে তারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়েছিল। এসব বিষয় ছিল বিচ্ছিন্নতা হতে সরে থাকা, ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা এবং একে অপরকে ইহার প্রতি আহ্বান করা ও উপদেশ দেয়া। যেসব বিষয় পূর্ববর্তীগণের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়েছিল এবং তাদের শক্তি খর্ব করে দিয়েছিল, তোমরা উহা হতে সাবধান থেকো। এসব বিষয় হলো ঘৃণা-বিদ্বেষ ও পাপ, একে অপরের প্রতি মুখ ফিরিয়ে নেয়া এবং অন্যের সাহায্য ও সহায়তায় হাত গুটিয়ে রাখা।

তোমাদের পূর্বে যেসকল মোমিন গত হয়ে গেছে তাদের অবস্থা একবার চিন্তা কর। তারা কতই না দুঃখ-কষ্ট ও পরীক্ষার মধ্যে দিন কাটিয়েছে! তারা কি মানুষের মধ্যে গুরুদায়িত্ব বহনকারী ও দারিদ্র পীড়িত ছিল না? ফেরাউন তাদেরকে দাসে পরিণত করেছিল। তাদের ওপর কঠোর শাস্তি ও নিদারুণ ভোগান্তি আরোপ করেছিল। তারা ক্রমাগত ধ্বংসাত্মক অবমাননা ও বন্দিদশায় জীবন কাটিয়েছিল। তারা পলায়নের কোন পথ খুঁজে পায়নি এবং আত্মরক্ষারও কোন উপায় বের করতে পারে নি। যখন মহিমান্বিত আল্লাহ্ দেখলেন যে, তারা তাঁর মহব্বতে বিপদাপদ সহ্য করেছিলো এবং তাঁর ভয়ে দুঃখ-কষ্ট বরণ করে যাচ্ছিলো তখন তিনি তাদেরকে এই পরীক্ষামূলক দুর্দশা হতে মুক্তির সুযোগ করে দিলেন। সুতরাং তিনি তাদের অবমাননাকে সম্মানে এবং ভয়কে নিরাপত্তায় রূপান্তরিত করলেন। ফলতঃ তারা শাসনকারী বাদশা ও বিশিষ্ট নেতায় পরিণত হলো। আল্লাহ্র আনুকূল্য তাদের ওপর এত পরিমাণ বর্ষিত হলো যা তারা আশাও করতে পারে নি।

লক্ষ্য কর, তারা কিরূপ ছিল যখন তাদের মধ্যে একতা ছিল, তাদের ঐকমত্য ছিল, তাদের একের হৃদয় অন্যের প্রতি কোমল ছিল, তাদের হাত একে অপরকে সাহায্য করতো, তাদের একের তরবারি অন্যের সহায়তার জন্য উন্মুক্ত ছিল, তাদের দৃষ্টি শ্যেন ছিল এবং তাদের লক্ষ্যস্থল এক ছিল। তারা কি এ পৃথিবীতে প্রভুত্ব করেনি এবং সারা পৃথিবী শাসন করেনি? অতঃপর দেখ, তাদের কি অবস্থা হয়েছিল যখন তারা শেষের দিকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো, তাদের ঐক্যে ফাটল ধরলো, তাদের কথায় ও হৃদয়ে মতানৈক্য দেখা দিলো, তারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়লো এবং বিক্ষিপ্তভাবে নিজেদের মধ্যে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়লো। তখন আল্লাহ্ তাদের কাছ থেকে তাঁর সম্মানের পরিচ্ছদ তুলে নিয়ে গেলেন এবং তাঁর নেয়ামত দ্বারা সৃষ্ট ঐশ্বর্য হতে তাদেরকে বঞ্চিত করলেন। তাদের কাহিনী শুধুমাত্র যারা হেদায়েত গ্রহণ করে তাদের শিক্ষার জন্য রয়ে গেল।

ইসমাঈলের বংশধর, ইসহাকের পুত্রগণ ও ইসরাঈলের পুত্রদের কাহিনী হতেও তোমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। তাদের কর্মকাণ্ড ও তাদের উদাহরণে কতই না মিল রয়েছে। তাদের বিভেদ ও অনৈক্য সম্পর্কে চিন্তা করে দেখ, কিভাবে পারস্যের কিসরাস ও রোমের সিজার তাদের প্রভু[১] হয়ে গিয়েছিল। তারা তাদেরকে তাদের চারণভূমি হতে, ইরাকের নদীবাহিত এলাকা হতে এবং উর্বর এলাকা হতে কন্টকময় বনাঞ্চলে, উত্তপ্ত বায়ু

এলাকায় ও জীবিকা নির্বাহের কষ্টসাধ্য এলাকায় তাড়িয়ে দিয়েছিল। এভাবে তারা উটের রাখালে পরিণত হলো। তাদের ঘর ছিল নিকৃষ্টতম এবং খরা-পীড়িত অঞ্চলে ছিল তাদের বসতি। তাদেরকে রক্ষা করার জন্য একটা বাক্যও উচ্চারণ করার মত কেউ ছিল না। তাদেরকে স্নেহচ্ছায়া দেয়ার মত কেউ ছিল না যাকে তারা বিশ্বাস করতে পারতো।

তাদের অবস্থা ছিল দুর্দশাপূর্ণ। তারা বিভক্ত হয়ে পড়েছিল এবং তাতে তাদের হাতগুলোও ছড়িয়ে পড়েছিল। তারা মহাযন্ত্রণা ও অজ্ঞতার অন্ধকারে নিপতিত হয়েছিল। তারা কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দিতো, মূর্তি পূজা করতো, জ্ঞাতিত্বের কোন মূল্য দিত না এবং ডাকাতি ও লুণ্ঠন করতো।

এখন তাদের ওপর আল্লাহ্‌র রহমতের প্রতি লক্ষ্য করে দেখ। তিনি তাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে একজন নবী প্রেরণ করলেন যিনি তাদেরকে আনুগত্যের অঙ্গীকারে আবদ্ধ করলেন এবং তাঁর আহ্বানে তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করলেন। দেখ, কিভাবে আল্লাহ্‌র নেয়ামত তাদের ওপর বিস্তৃত হলো এবং তাঁর রহমতের স্রোতধারা কিভাবে প্রবাহিত হলো যাতে তারা ঐশ্বর্যশালী হয়ে গেলো। ফলে তারা সুখী-সমৃদ্ধশালী জীবন-যাপন করেছিল। তাদের কর্মকান্ড একজন ক্ষমতাশালী শাসকের হেফাজতে সংরক্ষিত হলো এবং তারা একটি শক্তিশালী দেশের অধিবাসীর মর্যাদা লাভ করেছিল। তারা দুনিয়ার শাসক হয়ে গিয়েছিল। আগে যারা তাদেরকে শাসন করতো তারা তাদের শাসক হয়েছিল এবং আগে যারা তাদেরকে আদেশ দিত তাদেরকে তারা আদেশ দিয়েছিল। তারা এত শক্তিশালী ছিল যে, কখনো বর্শা পরীক্ষা করতে হয়নি এবং তরবারি কোষমুক্ত করার প্রয়োজন পড়েনি।

নিজের লোকদের তিরস্কার

সাবধান, তোমরা আনুগত্যের রশি হতে তোমাদের হাত সরিয়ে নিয়েছো এবং প্রাক-ইসলামী নিয়ম-কানুন দ্বারা তোমাদের চারপাশের ঐশীদুর্গ ভেঙ্গে ফেলেছো। নিশ্চয়ই, ইহা মহিমান্বিত আল্লাহ্‌র পরম দয়া যে, তিনি মায়া-মমতার রশি দ্বারা তাদের মধ্যে একতা সৃষ্টি করেছেন যার ছায়ায় তারা চলাফেরা করে ও আশ্রয় গ্রহণ করে। এ আশীর্বাদের মূল্য পৃথিবীতে কেউ অনুধাবন করে না। কারণ ইহা যেকোন ঐশ্বর্য হতে মূল্যবান এবং যে কোন সম্পদ হতে উঁচুমানের। তোমরা ইসলাম গ্রহণ করার পরও এখন আবার আরব-বেদুঈনদের অবস্থার দিকে ফিরে যাচ্ছো এবং একবার ঐক্যবদ্ধ হয়ে এখন আবার বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছো। এখন তোমরা শুধুমাত্র ইসলামের নাম ছাড়া আর কিছুই ধারণ করে রাখনি এবং লোক দেখানো ছাড়া ইমানের আর কিছুই জান না। তোমরা বল, "আগুন, —হাঁ, তা কোন লজ্জাস্কর অবস্থা নয়," মনে হয়, ইসলামের সম্মান ক্ষুন্ন করার জন্য ও ইহার ভ্রাতৃত্বের অঙ্গীকার ভঙ্গ করার জন্য তোমরা ইসলামকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছো। অথচ এই ভ্রাতৃত্ববোধকে আল্লাহ্ তোমাদের কাছে পবিত্র আমানত হিসাবে এবং তাঁর পৃথিবীতে মানুষের মধ্যে শান্তির উৎস হিসাবে দিয়েছিলেন। এ বিষয়ে নিশ্চিত থাক যে, তোমরা ইসলাম ছাড়া অন্য কিছুর প্রতি ঝুঁকে পড়লে অবিশ্বাসীগণ তোমাদের সাথে যুদ্ধ করবে। তখন কিন্তু জিব্রাইল, মিকাইল, মোহাজির বা আনসার কেউ তোমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে না। তখন শুধু অস্ত্রের ঝনঝনানি শুনা যাবে এবং যে পর্যন্ত আল্লাহ্ দয়াপরবশ হয়ে একটা ফয়সালা করে দেন সে পর্যন্ত এ অবস্থা চলবে।

নিশ্চয়ই, তোমাদের হাতের কাছে আল্লাহ্‌র ক্রোধ, শাস্তি, চরম দুর্দশা ও ঘটনা-প্রবাহের অনেক নিদর্শন রয়েছে। সুতরাং তাঁর প্রতিশ্রুতির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করো না, তাঁর শাস্তির প্রতি উদাসীন হয়ো না, তাঁর ক্রোধকে হালকা করে দেখো না এবং তাঁর রোষকে ত্বরান্বিত করো না। কারণ মহিমান্বিত আল্লাহ্ অতীতে কাউকে ধ্বংস করেননি যে পর্যন্ত তারা অন্যকে সৎ আমল করতে বারিত করেছে এবং অসৎ আমল করতে উৎসাহিত করেছে। বস্তুতঃ আল্লাহ্ অজ্ঞগণকে তাদের পাপের জন্য এবং জ্ঞানীগণকে পাপে বাধা না দেওয়ার জন্য ধ্বংস করেছিলেন। সাবধান, তোমরা ইসলামের শিকল ভঙ্গ করছো, ইহার সীমালঙ্ঘন করছো এবং ইহার আদেশ বিনষ্ট করছো।

ইসলামে তাঁর উচ্চ মর্যাদা সম্পর্কে

সাবধান, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আমাকে আদেশ দিয়েছেন তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যারা বিদ্রোহ করে, যারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করে ও যারা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে। অঙ্গীকার ভঙ্গকারীদের সাথে আমি জিহাদ করেছি, সত্যত্যাগীদের বিরুদ্ধে আমি জিহাদ ঘোষণা করছি এবং যারা ইমানের বন্ধন হতে বেরিয়ে গেছে তাদেরকে আমি দারুণ অসম্মানে[২] রেখেছি। নরকের শয়তানের[৩] বিরুদ্ধেও আমি হায়দরী হাঁকের মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি এবং এতে তার হৃদয়ের আর্তনাদ ও বুকের কম্পন শ্রুত হচ্ছিলো। শুধুমাত্র বিদ্রোহীদের একটা ক্ষুদ্র অংশ বাকী রয়েছে। যদি আল্লাহ্ আমাকে একটি মাত্র সুযোগ প্রদান করেন তবে আমি তাদেরকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে ছাড়বো। তখন শুধু শহরতলীগুলোতে ছড়ানো ছিটানো যৎসামান্য সংখ্যক থেকে যেতে পারে।

আমার বাল্যকালেও আমি আরবের প্রসিদ্ধ লোকদের বুক মাটিতে লাগিয়েছিলাম এবং রাবিয়াহ্ ও মুদার গোত্রের সূচালো শিং ভেঙ্গে দিয়েছিলাম (অর্থাৎ গোত্রপ্রধানকে পরাজিত করেছিলাম)। আল্লাহ্র রাসুলের (সঃ) সাথে আমার নিকট জ্ঞাতিত্ব ও বিশেষ আত্মীয়তার কারণে আমার মর্যাদা সম্পর্কে নিশ্চয়ই তোমরা জ্ঞাত আছো। যখন আমি শিশু ছিলাম তখনই তিনি আমার দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন। তিনি আমাকে তাঁর পবিত্র বুকে চেপে ধরতেন, তাঁর বিছানায় তাঁর পাশে শোয়াতেন, আমাকে তাঁর কাছে টেনে নিতেন এবং তাতে তাঁর পবিত্র শরীরের ঘ্রাণ আমি নিয়েছি। অনেক সময় তিনি কিছু চিবিয়ে আমার মুখে পুরে দিতেন। তিনি আমার কথায় কখনো কোন মিথ্যা পাননি এবং আমার কোন কাজে দুর্বলতা পাননি।

তাঁর শিশুকাল হতেই আল্লাহ্ একজন শক্তিধর ফেরেশতাকে নিয়োজিত করে রেখেছিলেন যাতে তাঁকে উচ্চমানের স্বভাব ও উন্নত আচরণের পথে নিয়ে যায়। সে সময় হতেই আমি তাঁকে অনুসরণ করে চলতাম যেভাবে একটা উষ্ট্র-শাবক উহার মায়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করে। প্রতিদিন তিনি ব্যানার আকারে তাঁর কিছু বৈশিষ্ট্য আমাকে দেখাতেন এবং তা অনুসরণ করতে আমাকে আদেশ দিতেন। প্রতি বছর তিনি হেরা পাহাড়ে নির্জনবাসে যেতেন। সেখানে আমি ব্যতীত আর কেউ তাঁকে দেখেনি। সে সময় আল্লাহ্র রাসুল (সঃ) ও খাদিজার ঘর ছাড়া অন্য কোথাও ইসলামের অস্তিত্ব ছিল না এবং সে সময় এ দু'জনের পর আমিই ছিলাম তৃতীয়। আল্লাহ্র প্রত্যাদেশ ও বাণীর তাজাল্লী আমি দেখতাম এবং নবুয়তের ঘ্রাণ প্রাণভরে গ্রহণ করতাম।

যখন আল্লাহ্র রাসুলের ওপর অহি নাজিল হয়েছিল তখন আমি শয়তানের বিলাপ শুনেছিলাম। আমি বললাম, "হে আল্লাহ্র রাসুল, এই বিলাপ কিসের?" উত্তরে তিনি বললেন, "এটা শয়তান যে পূজিত হবার সকল আশা-ভরসা হারিয়ে ফেলেছে। হে আলী, আমি যা কিছু দেখি, তুমিও তা-ই দেখ, এবং আমি যা কিছু শুনি, তুমিও তা-ই শোন; ব্যবধান শুধু এটুকু যে, তুমি নবী নও, তুমি স্থলাভিষিক্ত (Vicegerent) এবং নিশ্চয়ই তুমি দ্বীনের পথে রয়েছো।"

আমি তখনো তাঁর সাথে ছিলাম যখন একদল কুরাইশ তাঁর কাছে এসে বললো, "হে মুহাম্মদ, তুমি এমন এক বিরাট দাবী উত্থাপন করেছো যা তোমার পূর্ব-পুরুষদের কেউ বা তোমার বংশের কেউ কোন দিন করেনি। আমরা এখন তোমাকে একটা বিষয় জিজ্ঞেস করি; যদি ইহার সঠিক উত্তর দিতে পার এবং আমাদেরকে ইহা দেখাতে পার তবে আমরা বিশ্বাস করবো তুমি একজন নবী ও রাসুল, অন্যথায় আমরা মনে করবো তুমি একজন জাদুকর ও মিথ্যাবাদী।" আল্লাহ্র রাসুল বললেন, "কি তোমরা জিজ্ঞেস করতে চাও?" তারা বললো, "এ গাছটিকে মূলসহ উঠে এসে তোমার সামনে থামতে বলো।" রাসুল (সঃ) বললেন, "নিশ্চয়ই, আল্লাহ্ সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান। যদি আল্লাহ্ তোমাদের ইচ্ছা পূরণ করেন তবে কি তোমরা ইমান আনবে ও সত্যের সাক্ষ্য দেবে?" তারা বললো, "হ্যাঁ"। রাসুল (সঃ) বললেন "তোমরা যা চেয়েছো আমি তোমাদেরকে তা দেখাবো, কিন্তু আমি জানি, তোমরা সত্যের প্রতি ঝুঁকবে না এবং তোমাদের মধ্যে অনেক রয়েছে যারা দোযখে নিক্ষিপ্ত হবে, আর অনেকে আমার

বিরুদ্ধে দলগঠন করবে"। তৎপর রাসুল (সঃ) বললেন, "ওহে গাছ, যদি তুমি আল্লাহ্ ও বিচার দিনে বিশ্বাস কর, এবং যদি তুমি জান যে, আমি আল্লাহ্র রাসুল তাহলে আল্লাহ্র হুকুমে তোমার মূলসহ উঠে এসে আমার সম্মুখে দাঁড়াও।" সেই আল্লাহ্র কসম যিনি রাসুলকে (সঃ) সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, গাছটি বিরাট গুঞ্জন করে এবং পাখীর পাখার মত ঝাপটা মেরে মূলসহ আল্লাহ্র রাসুলের সম্মুখে এসে থমকে দাঁড়িয়েছিল। এ সময় গাছটির কয়েকটি ডাল আমার কাঁধ স্পর্শ করেছিল এবং আমি তখন রাসুলের (সঃ) ডান পার্শ্বে ছিলাম।

যখন মানুষ এ অবস্থা দেখলো তখন তারা বললো, "এখন গাছের অর্ধাংশকে তোমার কাছে থাকতে বল এবং অপর অর্ধাংশকে স্বস্থানে চলে যেতে বলো।" আল্লাহ্র রাসুল বলা মাত্রই গাছ তা-ই করলো। গাছটির অর্ধাংশ হর্ষোৎফুল্ল অবস্থায় গুঞ্জন করতে করতে স্বস্থানে চলে গেল এবং অপর অর্ধাংশ রাসুলকে (সঃ) প্রায় স্পর্শ করেছিল। তখন লোকেরা অবিশ্বাস ও বিদ্রোহ করে বললো, "গাছের এই অর্ধাংশ অপর অর্ধেকের কাছে যেতে বল এবং পূর্ববৎ হয়ে যেতে বল।" আল্লাহ্র রাসুল আদেশ দেয়া মাত্রই গাছটি তা করলো। তৎপর আমি বললাম, "হে আল্লাহ্র রাসুল, আমিই প্রথম যে আপনাকে বিশ্বাস করে এবং আমি স্বীকার করি যে, মহিমান্বিত আল্লাহ্র হুকুমে এইমাত্র গাছটি যা করলো তা শুধু আপনার নবুয়তের স্বীকৃতি ও আপনার বাণীর উচ্চমর্যাদা দানের নিদর্শন স্বরূপ। একথা বলার পর লোকেরা চিৎকার করে বললো, "জাদু; মিথ্যা; এটা এক বিস্ময়কর জাদু; সে এতে অতি সুদক্ষ। একমাত্র এ লোকটি (আমাকে দেখায়ে) তোমাকে ও তোমার কর্মকান্ডকে স্বীকৃতি দিতে পারে।"

নিশ্চয়ই, আমি সেসব লোকের দলভুক্ত যারা আল্লাহ্র ব্যাপারে কারো কোন নিন্দা বা তিরস্কারের তোয়াক্কা করে না। তাদের চেহারা সত্যবাদীর চেহারা এবং তাদের বক্তব্য দ্বীনদারের বক্তব্য। তারা আল্লাহ্র ধ্যানে রাত্রিকালে জাগরণ করে এবং দিবাভাগ হেদায়েতের আলোক-বর্তিকা হিসাবে কাটায়। তারা কুরআনের রজ্জু শক্ত করে ধরে এবং আল্লাহ্ ও রাসুলের (সঃ) আদেশ-নিষেধ পুনরুজ্জীবিত করে। তারা আত্মম্ভরিতা করে না, আত্মবঞ্চনায় প্রবৃত্ত হয় না, পরস্বহরণ করে না এবং ফেতনা সৃষ্টি করে না। তাদের হৃদয় থাকে বেহেশতে এবং দেহ থাকে কল্যাণকর আমলে ব্যস্ত।

১। অতীত লোকদের উত্থান-পতনের ঘটনা প্রবাহের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে একটা বিষয় দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে ওঠবে যে, তাদের উত্থান-পতন ভাগ্যের পরিণাম বা কোন দৈবদুর্বিপাক নয়। এটা ছিল তাদের কৃতকর্ম ও আমলের ফল। তাদের ওপর আপতিত ঘটনাবলী তাদের প্রকাশ্য জুলুম ও পাপ কাজের বিনিময় যা তাদের জন্য ধ্বংস ডেকে এনেছে। অপরপক্ষে দ্বীনের আমল ও শান্তিপূর্ণ বসবাস সর্বদা সৌভাগ্য ও কৃতকার্যতা বয়ে আনে। যদি বারংবার একই আমল ও অবস্থার পুনরাবৃত্তি ঘটে তবে উহার পরিণতিও একই রকম হবে। কারণ ভাল কাজের ফল ভাল আর মন্দ কাজের ফল মন্দ। এ রকম না হলে অতীত ঘটনাবলী বর্ণনা করে মজলুম দুর্দশাগ্রস্তের হৃদয়ে আশার সঞ্চার সম্ভব হতোনা এবং জালেম ও স্বৈরাচারের কর্মকান্ডের কুফল সম্পর্কে সতর্ক করা সম্ভব হতো না। তাই ইহা চিরন্তন স্বতঃসিদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, অতীতের ঘটনাবলী পরবর্তীগণের জন্য একটা উত্তম শিক্ষা গ্রহণের বিষয়। সেই কারণেই আমিরুল মোমেনিন পারস্য ও রোম সম্রাটদের হাতে বনি ইসমাঈল, বনি ইসহাক ও বনি ইসরাঈলগণের দুঃখ-দুর্দশার বর্ণনা দিয়েছিলেন।

হজরত ইব্রাহীমের (আঃ) জ্যেষ্ঠপুত্র হজরত ইসমাঈলের বংশধরগণকে বনি ইসমাঈল এবং কনিষ্ঠপুত্র হজরত ইসহাকের বংশধরগণকে বনি ইসহাক বলা হয়। এ দু'টি বংশধারা পরবর্তীতে বিভিন্ন প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন নামে পরিচিতি লাভ করে। তাদের আদিবাস ছিল প্যালেষ্টাইনের কেনান অঞ্চলে। ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রীস নদীর সমতল এলাকা হতে হিজরত করে হজরত ইব্রাহীম কেনান অঞ্চলে বসতিস্থাপন করেন। হজরত ইব্রাহীম তাঁর পুত্র ইসমাঈল ও তার মাতা হাজেরাকে হিজাজ অঞ্চলে নির্বাসন দিলে তথায় হজরত ইসমাঈল বসতি স্থাপন করেন। হিজাজ অঞ্চলে বসবাসরত জুরহাম গোত্রের সাইয়্যেদাহ্ বিনতে মুদাদ নাম্নী এক মহিলাকে হজরত ইসমাঈল বিয়ে করেছিলেন এবং সাইয়্যেদাহ্ হতেই ইসমাঈলের বংশ বিস্তার লাভ করে। হজরত ইব্রাহীমের কণিষ্ঠ পুত্র ইসহাক কেনান অঞ্চলে বসবাস করতেন। তার পুত্রের

নাম ছিল ইয়াকুব (ইসরাঈল)। ইয়াকুব তার মামাতো বোন লিয়াকে বিয়ে করেছিলেন এবং লিয়ার মৃত্যুর পর তার বোনকে বিয়ে করেন। এ দু'বোন হতেই ইয়াকুবের বংশ বিস্তার লাভ করে যারা বনি ইসরাঈল নামে পরিচিত। ইয়াকুবের এক পুত্রের নাম ছিল ইউসুফ (যোসেফ) যিনি একটা দুর্ঘটনার কারণে প্রতিবেশী দেশ মিশরে পৌছে দাসত্ব ও বন্দিদশা হতে ঘটনাক্রমে শাসক হয়ে সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন।

এরপর তিনি তাঁর জ্ঞাতি-গোষ্ঠি ও আত্মীয়-স্বজনদেরকে মিশরে নিয়ে যান এবং এভাবে মিশরে বনি ইসরাঈলের বসতি গড়ে উঠেছিল। কিছুকাল তারা সেখানে সুনাম ও সম্মানের সাথে ছিল। কিন্তু কালক্রমে স্থানীয় লোকদের ঘৃণা ও অবজ্ঞা তাদের প্রতি নিক্ষেপিত হতে লাগলো এবং তারা সকল প্রকার জুলুমের শিকার হতে লাগলো। তাদের প্রতি অত্যাচার এতটুকু পর্যন্ত পৌছেছিলো যে, পুত্র সন্তানকে হত্যা করা হতো এবং কন্যাগণকে ক্রীতদাসীরূপে রেখে দেয়া হতো। চারশত বছর এভাবে জুলুম আর দুঃখ-দুর্দশা পোহানোর পর তাদের অবস্থার পরিবর্তন হলো, লাঞ্ছনার অবসান হলো এবং গোলামীর শিকল ভেঙ্গেছিল যখন আল্লাহ্ মুসাকে (আঃ) প্রেরণ করলেন। মুসা তাদেরকে নিয়ে মিশর ত্যাগ করে চলে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ফেরাউনকে ধ্বংস করার জন্য আল্লাহ্ তাদেরকে নীল নদের দিকে নিয়ে গেলেন। তাদের সম্মুখে ছিল নীল নদের অথৈ পানি আর পেছনে ছিল ফেরাউনের বিশাল বাহিনী। এতে তারা হতবুদ্ধি হয়ে পড়লো, কিন্তু নির্ভয়ে পানিতে নেমে পড়তে আল্লাহ্ মুসাকে আদেশ দিলেন। যখন মুসা এগিয়ে গিয়ে পানিতে পা রাখলেন অমনি নদীতে অনেক পথ হয়ে গেল। সে পথ দিয়ে মুসা বনী ইসরাঈলগণকে নিয়ে নদী অতিক্রম করে চলে গেলেন। ফেরাউন সে পথ ধরে মুসার পিছু এগিয়ে গেল, কিন্তু নদীর মাঝখানে পৌছা মাত্রই পানি ফেরাউন ও তার সৈন্যবাহিনীকে গিলে ফেললো এবং তারা সকলেই পানিতে তলিয়ে মারা গেল। তাদের সম্পর্কে কুরআন বলে ঃ

> *এবং স্মরণ কর সে সময়ের কথা যখন আমরা ফেরাউনের হাত হতে তোমাদেরকে রক্ষা করেছিলাম, যারা তোমাদেরকে নিদারুণ নিপীড়ন করতো, তোমাদের পুত্রগণকে কতল করতো এবং তোমাদের নারীগণকে জীবিত রাখতো এবং উহা ছিল তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে একটা মহাপরীক্ষা(২ঃ৪৯)।*

যা হোক, মিশরের সীমানা অতিক্রম করে তারা তাদের মাতৃভূমি প্যালেস্টাইনে প্রবেশ করেছিল এবং সেখানে নিজেদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে স্বাধীনভাবে বসবাস করতে লাগলো। আল্লাহ্ তাদের হীন ও অমর্যাদাকর অবস্থা পরিবর্তন করে তাদেরকে প্রতাপ ও শাসন ক্ষমতা প্রদান করলেন। আল্লাহ্ বলেন ঃ

> *যে সম্প্রদায়কে দুর্বল গণ্য করা হতো তাদেরকে আমি আমার কল্যাণপ্রাপ্ত রাজ্যের পূর্ব ও পশ্চিমের অধিকারী করেছিলাম এবং বনি ইসরাঈল সম্বন্ধে তোমার প্রভুর শুভ বাণী সত্যে পরিণত হলো, যেহেতু তারা ধৈর্য ধারণ করেছিল এবং ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের শিল্প ও প্রাসাদ আমরা ধ্বংস করেছিলাম (কুরআন-৭ঃ১৩৭)।*

শাসনের সিংহাসনের অধিকারী হয়ে ঐশ্বর্য ও সুখ-শান্তি পাওয়ার পর বনি ইসরাঈলগণ তাদের অসম্মান ও অমর্যাদাপূর্ণ দাসত্বের কথা ভুলে গিয়েছিল। তাদের দুর্ভাগ্যজনক অবস্থা পরিবর্তনের জন্য আল্লাহ্র কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পরিবর্তে তারা খোদাদ্রোহী হয়ে গিয়েছিল। তারা নির্লজ্জের মত পাপ ও অসদাচরণে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল এবং সর্বদা ফেতনা ও মন্দ কাজে লিপ্ত থাকতো। তারা মিথ্যা যুক্তি দেখিয়ে হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল করেছিল। আল্লাহ্র আদেশে যেসব নবী তাদেরকে সত্যপথে এনে পরিশুদ্ধ করার চেষ্টা করেছিল তারা তাঁদেরকে অমান্য করেছিল, এমন কি তাঁদের কাউকে হত্যাও করেছিল। তাদের পাপ কর্মের স্বাভাবিক পরিণামে শাস্তি তাদেরকে পাকড়াও করেছিল। ফলতঃ বেবিলনের (ইরাক) শাসনকর্তা নেবুচাদনেজার খৃষ্টপূর্ব ৬০০ অব্দে সিরিয়া ও ফিলিস্তিন আক্রমণ করে সত্তর হাজার বনি-ইসরাঈলকে হত্যা করেছিল এবং তাদের সকল নগরী ধ্বংসস্তুপে পরিণত করে জীবিতদেরকে তার সাথে ধরে নিয়ে ক্রতিদাসে পরিণত করে গ্লানিকর জীবনযাপনে বাধ্য করেছিল। এ ধ্বংসযজ্ঞের পর যদিও মনে হয়েছিল যে, তারা আর কোনদিন তাদের হৃত মর্যাদা ও ক্ষমতা ফিরে পাবে না, তবুও আল্লাহ্ তাদেরকে পুনরায় একটি সুযোগ দিয়েছিলেন। নেবুচাদনেজারের মৃত্যুর পর শাসন ক্ষমতা বেলশাজারের হাতে গিয়েছিল। সে জনগণের ওপর সর্বপ্রকার জুলুম শুরু করেছিল। তার অত্যাচার-অবিচারে অতিষ্ঠ হয়ে জনগণ পারস্যের শাসনকর্তার সাথে গোপনে যোগাযোগ করে বেলশাজারের অত্যাচার হতে তাদেরকে রক্ষা করার জন্য

তাকে অনুরোধ করেছিল। সে সময়ে পারস্যের শাসনকর্তা মহামতি সাইরাস ন্যায়পরায়ণ শাসক ছিলেন। তিনি জনগণের অনুরোধে বেলশাজারকে ক্ষমতাচ্যুত করেছিলেন। ফলে বনি ইসরাঈলের স্কন্ধ হতে দাসত্বের জোয়াল সরে গিয়েছিল এবং তাদেরকে ফিলিস্তিনে ফিরে যাবার অনুমতি দেয়া হয়েছিল। এভাবে সত্তর বছর পরাধীনতার পর তারা মাতৃভূমিতে পদার্পণ করে সরকার গঠন করতে সমর্থ হয়েছিল। যদি তারা তাদের অতীত দুঃখ-কষ্ট ও ঘটনাবলী হতে শিক্ষা গ্রহণ করতো তবে তারা পূর্ববৎ পাপে লিপ্ত হতো না যা তাদেরকে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করেছিল। কিন্তু জনগোষ্ঠির মানসিক ও চারিত্রিক অবস্থা এমন ছিল যে, এরা যখনই স্বাধীনতা ও উন্নতি লাভ করতো এমনি ভোগ-বিলাস ও ঐশ্বর্যের নেশায় দ্বীনের নিয়ম-কানুন বিসর্জন দিতো; নবীগণকে উপহাস করতো; এমনকি নবীকে হত্যা করা পর্যন্ত তাদের কাছে তেমন কিছু মনে হতো না। তাদের রাজা হেরোড তার প্রেয়সীকে খুশী করার জন্য হজরত ইয়াহিয়ার (জোন) মাথা দ্বিখণ্ডিত করে তাকে উপহার দিয়েছিল। এ নিষ্ঠুর ও পাপ কাজের জন্য একটি লোক উচ্চবাচ্য করেনি। তাদের এহেন নৈতিক অধঃপতন ও হিংস্রতা চলাকালেই ঈশা (আঃ) আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি তাদেরকে পাপ কাজ পরিত্যাগ করে সদাচরণের দিকে আহ্বান করলেন। কিন্তু তারা তাঁকে নানাভাবে অত্যাচার করেছিল এবং অনেক দুঃখ দিয়েছিল। এমনকি তাঁর প্রাণনাশের চেষ্টা পর্যন্ত করেছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তাদের সকল কৌশল নস্যাৎ করে ঈশাকে (আঃ) রক্ষা করলেন। যখন তাদের অবাধ্যতা ও পাপকার্য এমন পর্যায়ে গিয়েছিল যে, হেদায়েত গ্রহণের সকল ক্ষমতা তারা হারিয়ে ফেলেছিল তখন আল্লাহ্ তাদেরকে ধ্বংস করার ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। রোমা (বাইজান্টিয়া) রাজ্যের শাসনকর্তা ভেসপাসিয়ানাস তার পুত্র তিতাসকে সিরিয়া আক্রমণের জন্য প্রেরণ করেছিল। সে জেরুজালেম অবরোধ করে বাড়ি-ঘর সব ধ্বংস করে দিয়েছিল এবং উপাসনালয়ের দেয়াল ভেঙ্গে দিয়েছিল। ফলে হাজার হাজার বনি ইসরাঈল বাড়ি-ঘর ছেড়ে বিদেশে পালিয়ে গিয়েছিল এবং হাজার হাজার লোক অন্নাভাবে মৃত্যুবরণ করেছিল। অবশিষ্টরা তরবারির নীচে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিল। পলাতক বনি ইসরাঈলগণের অধিকাংশ হিজাজ অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিল। কিন্তু মুহাম্মদকে (সঃ) নবী হিসাবে গ্রহণ না করায় তাদের একতা চিরতরে বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল এবং তারা সম্মানজনক জীবন ও মর্যাদা আর কখনো লাভ করতে পারে নি।

একইভাবে পারস্যের শাসক আরব এলাকাও আক্রমণ করেছিল এবং সেসব স্থানের অধিবাসীদেরকে পদানত করেছিল। শাপুর ইবনে হুরমুজ ষোল বছর বয়সে চার হাজার যোদ্ধা নিয়ে পারস্য সীমানায় বসবাসরত আরবদের আক্রমণ করেছিল এবং তৎপর বাহরাইন, কাতিফ ও হাজর এলাকার দিকে অগ্রসর হয়ে বনি তামিম, বনি বকর ইবনে ওয়াইল ও বনি আবদাল কায়েস ধ্বংস করে দিয়েছিল এবং সত্তর হাজার আরবের স্কন্ধ কেটে ফেলেছিল। সেজন্য পরবর্তীতে সে "যুল-আকতাফ" নামে পরিচিত হয়েছিল। সে আরবদেরকে তাবুতে বাস করতে বাধ্য করেছিল, মাথায় লম্বা চুল রাখতে বাধ্য করেছিল, সাদা কাপড় পরা নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল এবং জিনবিহীন ঘোড়ায় চড়ার বিধান করে দিয়েছিল। অতঃপর সে ইরাক ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী স্থানে ইস্পাহান ও পারস্যের অন্যান্য স্থানের বার হাজার লোকের বসতি স্থাপন করে দিয়েছিল এবং সেইসব এলাকার অধিবাসীকে বনাঞ্চল, অনুর্বর ও পানি-বিহীন অঞ্চলের দিকে তাড়িয়ে দিয়েছিল যেখানে তারা অতিকষ্টে জীবিকা নির্বাহ করতো। এভাবে আরবের জনগণ তাদের অনৈক্য ও বিভেদের জন্য দীর্ঘকাল অন্যের অত্যাচারের শিকার ছিল। অবশেষে মহিমান্বিত আল্লাহ্ রাসুলকে (সঃ) প্রেরণ করলেন এবং গ্লানিকর অবস্থা হতে তাদেরকে সম্মানজনক ও উন্নত অবস্থায় ফিরিয়ে আনলেন।

২। আলী ইবনে আবি তালিব, আবু আইউব আল-আনসারী, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ আল-আনসারী, আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ, আম্মার ইবনে ইয়াসির, আবু সাঈদ আল-খুদরী ও আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুল (সঃ) আলী ইবনে আবি তালিবকে আদেশ দিয়েছিলেন যেন তিনি বায়াত ভঙ্গকারী (নাকিছিন), সত্যত্যাগী (কাসিতিন) ও ইমান পরিত্যাগকারীদের (মারিকিন) সাথে জিহাদ করেন (নায়সাবুরী[৮৪], ৩য় খন্ড, পৃঃ ১৩৯; বার[৯৭], ৩য় খন্ড, পৃঃ ১১১৭; আছীর[১], ৩য় খন্ড, পৃঃ ৩২-৩৩; শাফী[১২১], ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃঃ ১৮; সুয়ূতী[১৪৬], ২য় খন্ড, পৃঃ ১৩৮; শাফী[১২৮], ৫ খন্ড, পৃঃ ১৮৬; ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃঃ ২৩৫; ৭ম খন্ড, পৃঃ ২৩৮; হিন্দি[১৬৭], ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃঃ ৭২, ৮২, ৮৮, ১৫৫, ২১৫, ৩১৯, ৩৯১, ৩৯২; বাগদাদী[৯৪], ৮ম খন্ড, পৃঃ ৩৪০; ১৩ শ খন্ড, পৃঃ ১৮৬-১৮৭; আসাকীর[২৬], ৫ম খন্ড, পৃঃ ৪১; কাছীর[৩৯], ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৩০৪-৩০৬; শাফী[১২৪], ২য় খন্ড, পৃঃ ২৪০; জুরকানী[৭১], ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩১৬-৩১৭; বাগদাদী[৯৩], ১ম খন্ড, পৃঃ ৩৮৬)।

ইবনে আবিল হাদীদ[১৫২] লিখেছেন, "সহী রাবীদের রেওয়াৎ হতে যথাযথভাবেই প্রমাণিত হয়েছে যে, রাসুল (সঃ) বলেছেন, তাঁর অবর্তমানে আলী যেসব লোকের সাথে জিহাদ করবে যারা বায়াত ভঙ্গকারী, সত্যত্যাগী ও ইমানের সীমালঙ্ঘনকারী। জামালের যুদ্ধে যারা আলীর বিরুদ্ধে ছিল তারাই বায়াত ভঙ্গকারী, সিরিয়ার যেসব লোক সিফফিনে তার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিল তারা সত্যত্যাগী, নাহ্রাওয়ানের যুদ্ধে তার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণকারী খারিজীগণ ছিল ইমান পরিত্যাগকারী বা ইমানের সীমালজ্ঞনকারী" (১৩খন্ড পৃঃ ১৮৩)। এই তিনটি দলের প্রথম দল সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন ঃ

যারা তোমার বায়াত গ্রহণ করে তারা তো আল্লাহ্র বায়াত গ্রহণ করে। আল্লাহ্র হাত তাদের হাতের ওপর। সুতরাং যে উহা ভঙ্গ করে সে পরিণামে নিজেরই ক্ষতি করে (কুরআন-৪৮ঃ১০)।

দ্বিতীয় দল সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন ঃ

এবং সত্যত্যাগীগণ দোযখের ইন্ধন হবে (কুরআন-৭২ঃ১৫)

তৃতীয় দল সম্পর্কে ইবনে আবিল হাদীদ ৬টি প্রধান সহী হাদীস গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন যে, বিশিষ্ট সাহাবাগণের রেওয়াৎ হতে দেখা যায় যুল-খুওয়াই সিরাহ্ (খারিজীদের নেতা যুছ-ছুদাইয়াহ্ হুরকাস ইবনে জুহায়র আত-তামিমীর ডাক নাম) সম্বন্ধে রাসুল (সঃ) বলেছিলেন ঃ

এ লোকটির অধঃস্তন বংশধরগণ কুরআন তেলাওয়াত করবে, কিন্তু উহা তাদের গলার নীচে যাবে না (অর্থাৎ আমল করবে না); তারা ইসলামের অনুসারীদেরকে হত্যা করবে এবং মূর্তিপূজকদেরকে জীবিত রাখবে। তারা ইসলামের শিক্ষার প্রতি এত দ্রুত অবলোকন করবে যেভাবে তীর উহার শিকারের দিকে ছুটে যায় (অর্থাৎ ইসলামী শিক্ষাকে হালকাভাবে দেখবে এবং তাতে কোন মনোযোগ থাকবে না।)। যদি আমি তাদেরকে দেখতাম তবে আ'দ জাতির মত তাদেরকে হত্যা করতাম (হাদীদ,[১৫২] ১৩শ খন্ড, পৃঃ ১৮৩; বুখারী,[১০২] ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ১৬৬-১৬৭; নায়সাবুরী,[৮৩] ৩য় খন্ড, পৃঃ ১০৯-১১৭; তিরমিজী,[৮০] ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ৪৮১; মাজাহ্,[১০৫] ১ম খন্ড, পৃঃ ৫৯-৬২; নাসাঈ,[৮৫] ৩য় খন্ড, পৃঃ ৬৫-৬৬; আনাস,[৬] ২য় খন্ড, পৃঃ ২০৪-২০৫; কুস্তি,[৪৯] ৩য় খন্ড, পৃঃ ১৩১-১৩২; আশাছ,[১৮] ৪র্থ খন্ড,পৃঃ ২৪১-২৪৬; নায়সাবুরী,[৮৪] ২য় খন্ড, পৃঃ ১৪৫-১৫৪; ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ৫৩১; হাম্বল,[১৬০] ১ম খন্ড, পৃঃ ৮৮, ১৪০, ১৪৭; ৩য় খন্ড, পৃঃ ৫৬-৬৫; শাফী,[১২৫] ৮ম খণ্ড, পৃঃ ১৭০-১৭১)।

৩। দোযখের শয়তান বলতে যুছ-ছুদাইয়াকে বুঝানো হয়েছে (যার পূর্ণ নাম ২নং টীকায় বর্ণিত হয়েছে)। সে নাহ্রাহওয়ানের যুদ্ধে বজ্রপাতে নিহত হয়েছিল। রাসুল (সঃ) তার মৃত্যু সম্বন্ধে পূর্বেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। নাহ্রাওয়ানের যুদ্ধে খারিজীগণকে ধ্বংস করার পর আমিরুল মোমেনিন অনুসন্ধান করতে বের হয়েছিলেন, কিন্তু কোথায়ও তার লাশ দেখা গেল না। ইতোমধ্যে রায়ান ইবনে সাবিরাহ একটা খালের পাড়ে পঁয়তালিশটি লাশ গর্তের মধ্যে পড়ে থাকতে দেখলো। সেই লাশগুলো তুলে আনার পর যুছ-ছুদাইয়ার মৃত দেহ দেখা গেল। তার কাঁধের মাংশপিন্ডের জন্য তাকে যুছ-ছুদাইয়া বলা হতো। তার লাশ দেখে আমিরুল মোমেনিন বলে ঠলেন, "আল্লাহ্ মহান, আমি মিথ্যা বলিনি বা ভুল বলিনি" (হাদীদ,[১৫২] ১৩শ খণ্ড, পৃঃ ১৮৩-১৮৪; তাবারী,[৭৫] ১ম খন্ড, পৃঃ ৩৩৮৩-৩৩৮৪; আছীর,[২] ৩য় খন্ড, পৃঃ ৩৪৮)।

★★★★★

খোৎবা-১৯২

হাম্মাম[১] নামক আমিরুল মোমেনিনের এক সহচর সর্বদা আল্লাহ্র ইবাদতে মশগুল থাকতেন। তিনি একদিন বললেন, "হে আমিরুল মোমেনিন পরহেযগার লোকদের সম্পর্কে এভাবে একটু বর্ণনা করুন যেন আমি তাদেরকে দেখতে পাই।" আমিরুল মোমেনিন জবাব এড়িয়ে গিয়ে বললেন, "হে হাম্মাম, আল্লাহ্কে ভয় কর এবং আমলে সালেহা কর। 'নিশ্চয়ই, আল্লাহ্ তাদের সাথে আছেন যারা তাকওয়া

অবলম্বন করে এবং যারা সৎকর্মপরায়ণ[১] (কুরআন-১৬ঃ১২৮)।" হাম্মাম এতে সন্তুষ্ট না হয়ে আমিরুল মোমেনিনকে কিছু বলতে অনুরোধ করলেন। এতে তিনি মহিমান্বিত আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও তাঁর রহমত প্রার্থনা করলেন এবং রাসুলের (সঃ)-ওপর সালাম পেশ করে বললেনঃ

এবার শোন, সর্বশক্তিমান ও মহিমান্বিত আল্লাহ্ সৃষ্টি-জগতের সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। বান্দার আনুগত্যের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন বলে তিনি সৃষ্টি করেননি অথবা তাদের পাপ হতে নিরাপদ থাকার জন্য তিনি সৃষ্টি করেননি। কারণ কোন পাপীর পাপ তার কোন ক্ষতি করতে পারে না বা কারো আনুগত্য তাঁর কোন উপকারে আসে না। তিনি সর্বত্র তাদের জীবনোপকরণ ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং দুনিয়াতে তাদের অবস্থান নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

কাজেই, খোদা-ভীরুগণ বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। তাদের কথা-বার্তা যথার্থ, তাদের পোষাক-পরিচ্ছদ মাত্রাবদ্ধ এবং তাদের চাল-চলন বৈশিষ্ট্যমন্ডিত তাদের জন্য আল্লাহ্ যা নিষিদ্ধ করেছেন উহার প্রতি তাদের চোখ বন্ধ এবং যে জ্ঞান তাদের উপকারে আসে উহার প্রতি কান-খাড়া রাখে। পরীক্ষার সময় তারা এমনভাবে থাকে যেন তারা আরাম-আয়েশে রয়েছে। যদি প্রত্যেকের জন্য নির্দিষ্ট সময় নির্ধারিত না থাকতো তাহলে তাদের আত্মা পুরস্কারের আশায় ও শাস্তির ভয়ে এক মুহূর্তের জন্যও তাদের দেহে অবস্থান করতো না। তাদের হৃদয়ে স্রষ্টার মহত্ব গেড়ে বসে আছে এবং স্রষ্টার মহত্ব ছাড়া সব কিছুই তাদের দৃষ্টিতে নগণ্য। এ জন্য বেহেশত তাদের কাছে অতি নগণ্য যদিও তারা ইহার সুখ ভোগ করছে এবং দোযখও তাদের কাছে অতি নগণ্য যদিও তারা ইহার শাস্তি ভোগ করছে।

তাদের হৃদয় শোকাহত, তারা পাপ হতে সংরক্ষিত, তাদের দেহ কৃশ, তাদের অভাব-অনটন নেই বললেই চলে এবং তাদের আত্মা পবিত্র। তারা অল্প সময়ের দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে চিরস্থায়ী আরাম-আয়েশ অর্জন করে। এটা অত্যন্ত উপকারী লেনদেন যা আল্লাহ্ তাদের জন্য সহজ করে দিয়েছেন। দুনিয়া তাদের দিকে তাকিয়ে থাকে, কিন্তু তারা দুনিয়ার দিকে ভ্রুক্ষেপও করে না। দুনিয়া তাদেরকে ঘিরে ধরে, কিন্তু তারা নিজেদেরকে মুক্তিপণ দিয়ে বিনিময়ে দুনিয়া হতে মুক্ত হয়ে গেছে। রাত্রিকালে তারা পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে সুপরিমিত উপায়ে কুরআন তেলাওয়াৎ করে; এতে তাদের হৃদয়ে শোকের সৃষ্টি হয় এবং এতে তারা তাদের রোগের চিকিৎসা অনুসন্ধান করে। যখন তারা বেহেশত সম্বন্ধে কোন আয়াত পড়ে তখন তারা বেহেশতের জন্য লোভী হয়ে পড়ে এবং তাদের আত্মা এমনভাবে উহার প্রতি ঝুঁকে পড়ে যেন তারা উহাকে সম্মুখে দেখতে পায়। আবার যখন তারা দোযখের ভয় সংক্রান্ত আয়াত তেলাওয়াৎ করে তখন তারা এমনভাবে হৃদয়ের কান পেতে রাখে যেন তারা দোযখের শব্দ ও ক্রন্দন শুনতে পাচ্ছে। তারা রুকু করে, সেজদাবনত হয়ে মহিমান্বিত আল্লাহ্‌র কাছে সনির্বন্ধ মিনতি জানায়। দিবাভাগে তারা সহিষ্ণু, প্রাজ্ঞ, পরহেযগার ও খোদা-ভীরু। আল্লাহ্‌র ভয় তাদেরকে তীরের মত কৃশ করে ফেলেছে। যে কেউ তাদের দিকে তাকালে তাদেরকে মনে করবে রুগ্ন; আসলে তা নয়। কেউ কেউ মনে করবে তারা পাগল; আসলে আল্লাহ্‌র ভয় তাদেরকে পাগল করে দিয়েছে।

তারা তাদের অল্প সৎ আমলে সন্তুষ্ট হয় না এবং তাদের সৎ আমলকে বৃহৎ কিছু মনে করে না। তারা সর্বদা নিজেদেরকে দোষারোপ করে এবং তাদের কাজের জন্য ভীত সন্ত্রস্ত থাকে। যদি তাদের কাউকে প্রশংসা করা হয় তখন সে বলে, "আমি আমার নিজকে অন্যদের চেয়ে বেশী জানি এবং আমার প্রভু আমাকে তদাপেক্ষা বেশী জানেন। হে আল্লাহ্, তারা যেরূপ বলে আমার সাথে সেরূপ ব্যবহার করো না, তারা আমার সম্পর্কে যা চিন্তা করে উহা অপেক্ষা আমাকে ভাল করে দাও এবং আমার যেসব দোষের কথা জানে না সেসব অপরাধ আমাকে ক্ষমা করে দাও।"

এসব লোকের বৈশিষ্ট্য হলো–তারা দ্বীনে শক্তিশালী, কোমলতার সাথে দৃঢ়-সংকল্প, ইমানে সুদৃঢ়, জ্ঞানার্জনে আগ্রহী, ঐশ্বর্যে নমনীয়, ইবাদতে আসক্ত, উপোসে তৃপ্ত, দুঃখ-কষ্টে ধৈর্যশীল, হালালের প্রত্যাশি, হেদায়েতে আনন্দিত এবং লোভ-লালসার প্রতি ঘৃণাশীল। তারা ধার্মিকতার কাজ করে, কিন্তু তবুও ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে। সন্ধ্যায় তারা আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশে এবং ভোরে আল্লাহ্‌র জেকেরের জন্য উদ্বিগ্ন থাকে। তারা ভয়ের মধ্যে রাত্রিযাপন করে পাছে আল্লাহ্‌কে ভুলে রাত্রি চলে যায় এবং ভোরে আনন্দে উত্থিত হয় কারণ আল্লাহ্‌র নেয়ামত ও রহমত লাভ করেছে। যদি তারা নিজে কোন কিছু সহ্য করতে অস্বীকার করে তা শত চেষ্টা করেও তাদের কাছে আসতে পারে না। চিরস্থায়ী বিষয় হলো তাদের চোখের শীতলতা। ইহ্‌কালের কোন কিছুই চিরস্থায়ী নয় বলে তারা উহা হতে দূরে সরে থাকে। তারা ধৈর্য সহকারে অন্যের থেকে জ্ঞান আহরণ করে এবং আমল সহকারে বক্তব্য পেশ করে।

তোমরা দেখতে পাবে, তাদের আশা-আকাঙ্খা অতি পরিমিত, দোষ-ত্রুটি নগণ্য, হৃদয় ভয়ে কম্পিত, আত্মা তৃপ্ত, খোরাক সামান্য ও সাধারণ, দ্বীন নিরাপদ, লালসা মৃত এবং ক্রোধ প্রদমিত। তাদের কাছ থেকে শুধু মঙ্গল আর কল্যাণই আশা করা যায়। তাদের কাছ থেকে মন্দ কিছু পাবার ভয় নেই। যারা আল্লাহ্‌কে ভুলে থাকে তাদের মাঝেও তারা আল্লাহ্‌র জেকেরকারী আবার যারা আল্লাহ্‌র জেকেরকারী তাদের মাঝে তারা আল্লাহ্‌কে ভুলে থাকে না। তাদের প্রতি অবিচারকারীদের প্রতিও তারা ক্ষমাশীল এবং যারা তাদেরকে বঞ্চিত করে তাদেরকেও তারা প্রদান করে। তাদের প্রতি যারা অসদাচরণ করে তাদের প্রতি তারা সদাচরণ করে।

অশোভন উক্তি তাদের কাছে পাওয়া যায় না, তাদের গলার স্বর কোমল, তাদের মাঝে মন্দের কোন অস্তিত্ব নেই, সৎগুণ সদা বিরাজমান, কল্যাণে তারা অগ্রণী এবং ফেতনা তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। দুর্যোগের সময় তারা মর্যাদাশীল, দুঃখ-দুর্দশায় ধৈর্যশীল এবং সুসময়ে তারা কৃতজ্ঞচিত্ত। যাকে তারা ঘৃণা করে তার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে না এবং যাকে তারা ভালবাসে তার খাতিরে পাপ করে না। প্রমাণ দাঁড় করানোর আগেই তারা সত্যকে স্বীকৃতি দেয়। তারা কখনো আমানত খেয়ানত করে না এবং যা স্মরণ রাখা দরকার তা কখনো ভুলে যায় না। তারা কখনো অন্যকে গাল-মন্দ করে না, প্রতিবেশীর কোন ক্ষতি সাধন করে না, অন্যের দুর্ভাগ্যে আনন্দ অনুভব করে না, কখনো বিভ্রান্তিতে পা দেয় না এবং ন্যায় ও সত্য হতে কখনো সরে যায় না।

যদি তারা নীরব থাকে তবে তাদের নীরবতা তাদেরকে শোকাহত করে না, যদি তারা হাসে তবে অট্টহাসি দেয় না এবং তাদের প্রতি কেউ অন্যায় করলে আল্লাহ্ কর্তৃক প্রতিশোধ গ্রহণ করা পর্যন্ত তারা ধৈর্যধারণ করে থাকে। তারা নিজের কারণেই দুর্দশাগ্রস্থ, কিন্তু অন্যরা তাদের কাছ থেকে উপকার পায়। তারা পরকালীন জীবনের খাতিরে নিজেকে অভাব-অনটনে রেখেছে এবং মানুষ তাদের কাছ থেকে নিরাপদ বলে অনুভূতি সৃষ্টি করে। কঠোর তপস্যা ও পবিত্রতা দ্বারা তারা অন্যদের কাছ থেকে নিজেকে দূরে রাখে এবং নমনীয়তা ও দয়া দ্বারা তারা তাদের নিকটবর্তী হয়। আত্মশ্লাঘার কারণে তারা অন্যদের কাছ থেকে দূরে থাকে না আবার বঞ্চনা ও প্রতারণা করার জন্য সে কারো নিকটবর্তী হয় না।

বর্নিত আছে যে, আমিরুল মোমেনিনের বক্তব্য শুনে হাম্মাম মুর্ছিত হয়ে পড়েছিল এবং মৃত্যুবরণ করেছিল। তখন আমিরুল মোমেনিন বললেন, আল্লাহ্‌র কসম, এ ভয়েই আমি প্রথমে তার অনুরোধ এড়িয়ে গিয়েছিলাম। মনে দাগ কাটতে সক্ষম উপদেশ ভাবগ্রাহী হৃদয়ে এভাবেই ফলপ্রসূ হয়। কেউ একজন[২] বললো, "হে আমিরুল মোমেনিন, আপনার উপদেশ হাম্মামের ওপর যেরূপ ফলপ্রসূ হয়েছে, আপনার ওপর সেরূপ হয়নি কেন?" আমিরুল মোমেনিন বললেনঃ তোমার ওপর লানত; মৃত্যুর জন্য নির্ধারিত সময় রয়েছে যা এগিয়েও আনা যায় না, পিছিয়েও

নেয়া যায় না এবং মৃত্যুর কারণও পরিবর্তন করা যায় না। দেখ, এ ধরনের কথা, যা শয়তান তোমার জিহ্বায় রেখেছে, আর কখনো পুনরাবৃত্তি করো না।

১। ইবনে আবিল হাদীদ উল্লেখ করেছেন যে, এই হাম্মামই হলো হাম্মাম ইবনে শুরাইয়াহ্। কিন্তু আল্লামা মজলিসী বলেন যে, এ হাম্মাম হলো হাম্মাম ইবনে উবাদাহ্।

২। এ লোকটি হলো আবদুল্লাহ্ ইবনে আল-কাওয়া যে ছিল খারিজী আন্দোলনের পুরোধা এবং আমিরুল মোমেনিনের বিরুদ্ধবাদী।

★★★★★

খোৎবা-১৯৩

মোনাফিকের বর্ণনা

আমরা আল্লাহ্র প্রশংসা করি তাঁর অনুগত থাকার সাহায্যের জন্য, তাঁর অবাধ্যতা হতে আমাদেরকে রক্ষা করার জন্য এবং শুকুর করি তাঁর নেয়ামতের জন্য ও তাঁর রশি ধারণ করার ক্ষমতা প্রদান করার জন্য। আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর বান্দা ও রাসুল। তিনি আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য সকল দুঃখকষ্ট বরণ করে নিয়েছিলেন এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য সকল শোক সহ্য করেছিলেন। তাঁর নিকট আত্মীয়গণ নিজেদেরকে পরিবর্তন করে তাঁর পক্ষে দাঁড়িয়েছিল এবং দূরবর্তী আত্মীয়গণ দলবদ্ধভাবে তাঁর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল। আরবগণ তাঁর বিরুদ্ধে ঘোড়ার লাগাম ঢিলা করে দিয়েছিল (অর্থাৎ দ্রুত তাঁর বিরুদ্ধে দলবদ্ধ হয়েছিল)। তাদের বাহনের পেটে আঘাত করে তারা তাঁর বিরুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিল। অবস্থা এমন হয়েছিল যে, দূর দূরান্ত হতে শত্রু তাঁর বিরুদ্ধে তাঁর দোরগোড়ায় উপস্থিত হয়েছিল।

হে আল্লাহ্র বান্দাগণ, আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি, তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং মোনাফেক সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে সতর্ক করে দিচ্ছি, তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং মোনাফেক সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে সতর্ক করে দিচ্ছি। কারণ তারা নিজেরা গোমরাহ এবং অন্যদেরকেও গোমরাহ্ করে। তারা নিজেরা আছাড় খেয়েছে এবং অন্যদেরকেও আছাড় খাওয়াতে চায়। তারা বহুরূপী এবং বহু পথ অবলম্বন করে। তারা তোমাকে তাদের অনুসারী করতে ওৎপেতে থাকে এবং সকল প্রকারের সহায়তা নিয়ে তোমার দিকে এগিয়ে আসে। তাদের মুখমন্ডল পরিচ্ছন্ন হলেও হৃদয় রোগাক্রান্ত। তারা গোপনে চলাফেরা করে এবং রুগ্নের মত পদচারণা করে। তাদের কথা চিকিৎসার মত কিন্তু তাদের কর্মকান্ড দুরারোগ্য ব্যাধির মত। তারা অন্যের আরাম-আয়েশে ঈর্ষাপরায়ণ; তারা অন্যের দুঃখ-কষ্ট বৃদ্ধি করে এবং আশা-ভরসা বিনষ্ট করে। তাদের শিকার প্রতিটি পথে পড়ে আছে; প্রতিটি হৃদয়ে তারা প্রবেশ করতে পারে এবং শোকাহত মানুষের জন্য তারা লোক-দেখানো (মিথ্যা) অশ্রু ফেলে।

তারা একে অপরের প্রশংসা করে এবং একে অপরের কাছ থেকে পুরস্কার আশা করে। যখন তারা কোন কিছু যাচ্না করে তখন তা পেতে জেদ ধরে; যখন তারা কাউকে দোষারোপ করে তখন তার সম্মানহানী করে এবং যখন তারা রায় প্রদান করে তখন তাতে বাড়াবাড়ি করে। প্রতিটি সত্যের জন্য তারা একটি ভুল পথ অবলম্বন করে এবং প্রতিটি সরল-সহজ পথের জন্য তারা বক্রপথ উদ্ভাবনকারী। প্রতিটি জীবিত ব্যক্তির জন্য তারা এক একটি হত্যাকারী। প্রতিটি রুদ্ধদ্বারের জন্য তারা এক একটি চাবি এবং প্রতিটি বাতির জন্য তারা এক একটি নির্বাপণকারী। তারা কামনা করে কিন্তু হতাশার সাথে যাতে তাদের বাজার ঠিক থাকে এবং তাদের পণ্য সহজে জনপ্রিয় হয়। যখন তারা কথা বলে তখন সংশয় সৃষ্টি করে;যখন তারা বর্ণনা করে তখন অতিরঞ্জিত করে। প্রথমে

তারা সহজ পথের কথা বলে কিন্তু পরে তা সংকীর্ণ করে ফেলে। সংক্ষেপে, তারা হলো শয়তানের দল এবং আগুনের ইন্ধন।

শয়তান তাদেরকে পেয়ে বসেছে। সুতরাং তারা আল্লাহ্‌র জেকের ভুলে গেছে; তারা শয়তানের দলভুক্ত; সাবধান, নিশ্চয়ই শয়তানের দল ক্ষতিগ্রস্থ (কুরআন-৫৮ঃ১৯)।

★★★★★

খোৎবা-১৯৪

আল্লাহ্‌র প্রশংসা, আল্লাহ্‌কে ভয় করার উপদেশ ও বিচার দিনের বর্ণনা

প্রতিষ্ঠিত প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি তাঁর কুদরতের অত্যাচার্যের মাধ্যমে তাঁর ক্ষমতা ও মহত্বের বাস্তবতা এভাবে প্রকাশ করেছেন যে, চক্ষুষ্মান ব্যক্তির চোখে ধাঁধাঁ লেগে যায় এবং তাঁর গুণাবলীর বাস্তবতার প্রশংসা করতে জ্ঞান স্থবির হয়ে পড়ে। আমি ইমানের বলে, নিশ্চয়তা, আন্তরিকতা ও দৃঢ়তার সাথে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর বান্দা ও রাসুল যাকে তিনি এমন এক সময় পাঠিয়েছিলেন যখন হেদায়েতের চিহ্ন বিলোপ হয়ে গিয়েছিল এবং দ্বীনের পথ উৎসাদিত করেছিল। সুতরাং তিনি সত্যকে প্রকাশ্যে সকলের সম্মুখে ছেড়ে দিলেন, জনগণকে উপদেশ দিলেন, ন্যায়ের দিকে তাদেরকে পরিচালিত করলেন এবং মধ্যপন্থী হতে তাদেরকে আদেশ দিলেন। তিনি ও তাঁর আহ্‌লুল বাইতের ওপর আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হোক।

হে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ, জেনে রাখো, তিনি বিনা কারণে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেননি এবং তোমাদেরকে মুক্তভাবে ছেড়েও দেননি। তোমাদের ওপর তার রহমতের পরিমাণ তিনি জানেন এবং তাঁর নেয়ামতের পরিমাণও তিনি জানে। কাজেই, কৃতকার্যতার জন্য ও লক্ষ্য অর্জনের জন্য তাঁর দরবারে প্রার্থনা কর। তাঁর কাছে যাচ্‌না কর এবং তাঁর দয়া ভিক্ষা কর। কোন পর্দা তাঁর কাছ থেকে তোমাদেরকে গোপন করতে পারবে না এবং কোন দরজা বন্ধ করে তাঁর হাত থেকে রক্ষা পাবে না। তিনি সর্বত্র আছেন এবং প্রতি পলে অনুপলে তিনি আছেন। প্রতিটি মানুষ ও জ্বীনের সঙ্গে তিনি আছেন। দান করা তার প্রকৃতি বিরুদ্ধ নয় এবং দান করলে তাঁর কোন কিছুতে কমতি দেখা দেয় না। ভিক্ষুকের দল তাঁর কিছুই নিঃশেষ করতে পারে না এবং দান করে তাঁর ঐশ্বর্য কখনো শেষ হয় না।

একজন আহ্বান করলে তাঁর দৃষ্টি অন্যদের ওপর হতে সরে যায় না; একজনের স্বর তাঁর কাছে অন্যদের স্বরকে অশ্রুত রাখে না এবং একজনের প্রতি নেয়ামত মঞ্জুরী অন্যদের প্রতি না-মঞ্জুর করতে তাঁকে বারিত করে না। কারো প্রতি তাঁর দয়া অন্যদেরকে শাস্তি প্রদান হতে তাঁকে বিরত রাখে না। তাঁর গুপ্তাবস্থা তাঁর স্বপ্রকাশকে বারিত করে না এবং স্বপ্রকাশ গুপ্তাবস্থাকে প্রতিহত করতে পারে না। তিনি নিকটবর্তী এবং একই সময়ে তিনি দূরবর্তী। তিনি সমুচ্চ এবং একই সময়ে নীচ। তিনি প্রকাশ্য এবং গুপ্ত। তিনি গুপ্ত তবুও সুপরিচিত (সুজ্ঞাত)। তিনি ঋণ প্রদান করেন কিন্তু কোন কিছুই ঋণ গ্রহণ করেন না। তিনি নমুনা এঁকে কোন কিছু সৃষ্টি করেননি এবং ক্লান্তির কারণে কারো কোন সাহায্য গ্রহণ করেননি।

হে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ, আমি তোদেরকে উপদেশ দিচ্ছি, তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর। কারণ, ইহা দ্বীনের প্রধান রজ্জু। ইহার বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত বিষয়গুলো দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং ইহার বাস্তবতাকে আঁকড়ে ধরো। ইহা তোমাদেরকে বিচার দিনে সুখের বাসস্থানে, নিরাপদ অবস্থানে এবং মহাসম্মানের ঘরে নিয়ে যাবে, তখন তোমাদের চোখ বিস্ফারিত হয়ে যাবে (কুরআন-১৪ঃ৪২)। যখন চতুর্দিক অন্ধকারময় হবে, যখন দশ মাসের গর্ভবতী উষ্ট্রির ক্ষুদ্রদলকে মুক্তভাবে চরে খাবার অনুমতি দেয়া হবে এবং যখন শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে তখন সকল জীবিত

প্রাণী মরে যাবে, সকল কণ্ঠস্বর বাকরুদ্ধ হয়ে যাবে, উঁচু পর্বতমালা ও কঠিন শিলাখণ্ড চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে উড়ন্ত বালিতে পরিণত হবে। তখন কোন মধ্যস্থতাকারী থাকবে না, বিপদ হতে রক্ষা করার জন্য কোন আত্মীয়-স্বজন থাকবে না এবং কোন প্রকার ওজর গ্রাহ্য করা হবে না।

★★★★★

খোৎবা-১৯৫
নবুয়ত ঘোষণাকালে পৃথিবীর অবস্থা সম্পর্কে

আল্লাহ্ রাসুলকে (সঃ) এমন এক সময় প্রেরণ করেছিলেন যখন হেদায়েতের কোন চিহ্ন ছিল না, দেশনা দেয়ার মত কোন আলোকবর্তিকা ছিল না এবং কোন পথ সুস্পষ্ট ছিল না।

হে আল্লাহ্র বান্দাগণ, আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি, তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং আমি তোমাদেরকে সতর্ক করে দিচ্ছি, এ পৃথিবী একটা অস্বস্তিকর আবাসস্থল যেখান থেকে প্রস্থান অবধারিত। যে কেউ এতে বাস করে তাকে প্রস্থান করতেই হবে এবং যে কেউ জাগতিক বিষয় নিয়ে থাকে তাকে উহা পরিত্যাগ করতেই হবে। গভীর সমুদ্রে যাত্রিবাহী নৌকা যেমন তরঙ্গের দোলায় দুলতে থাকে তদ্রূপ মানুষ এখানে প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর দোলায় দুলছে। তাদের কতক ডুবে মরে যায় এবং কতক রক্ষা পেলেও বাতাস ও স্রোত পুনরায় তাদেরকে বিপদের মধ্যে টেনে নিয়ে যায়। সুতরাং যা কিছু ডুবে যায় তা আর ফিরিয়ে আনা যায় না এবং যা কিছু রক্ষা পায় তা আবার ধ্বংসের পথে চলে যায়।

হে আল্লাহ্র বান্দাগণ, তোমাদের জেনে রাখা উচিত যে, এখনই তোমাদের আমলে সালেহায় ব্রতী হওয়া দরকার; কারণ এখন তোমাদের জিহ্বা মুক্ত, তোমাদের শরীর সুস্থ, তোমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সচল, তোমাদের চলাচলের এলাকা বিশাল এবং তোমাদের দৌড়ের পথ প্রশস্ত। কাজেই সুযোগ হারাবার আগে বা মৃত্যু উপস্থিত হবার আগে সৎআমলে প্রবৃত্ত হও। সর্বদা মনে রেখো, মৃত্যুর উপস্থিতি একটা আকস্মিক ঘটনা এবং কখনো মনে করো না যে, মৃত্যু কিছুকাল পরে আসবে।

★★★★★

খোৎবা-১৯৬
রাসুলের (সঃ) প্রতি আমিরুল মোমেনিনের অনুরাগ সম্পর্কে

মুহাম্মদের (সঃ) সাহাবাগণের মধ্যে যারা আল্লাহ্র বাণীর সংরক্ষক তারা সকলেই জানে যে, আমি কখনো আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের[১] অবাধ্য হইনি। আল্লাহ্ আমাকে যে সাহস[২] দিয়ে সম্মানিত করেছেন তদ্বারা জীবন বাজি রেখেও আমি তাঁকে সহায়তা করেছি এবং তাঁর দুর্যোগের মুহূর্তে আমি তাঁর পাশে ছিলাম যখন বিরুদ্ধবাদীদের বড় বড় সাহসী বীরেরাও পিছিয়ে গেছে—একপা এগুবার সাহস পায়নি।

রাসুলের (সঃ) ইনতিকালের সময় তাঁর পবিত্র মাথা আমার বুকে ছিল এবং তাঁর পবিত্র নিশ্বাস আমার হাতের তালুতে লেগেছিল এবং আমি উহা আমার মুখমন্ডলে লাগিয়েছিলাম। আমি তাঁকে শেষ গোসল করিয়েছিলাম এবং একাজে ফেরেশতাগণ আমাকে সাহায্য করেছিল। তাঁর ঘর ও আঙ্গিনা ফেরেশতায় পরিপূর্ণ ছিল। তাদের একদল ওপরের দিকে অন্যদল নীচের দিকে আসা-যাওয়ায় ছিল। তাদের কলগুঞ্জন আমি নিজ কানে শুনেছিলাম। রাসুলকে

(সঃ) কবরে শায়িত করা পর্যন্ত তারা শুধু দরূদ ও সালাম পেশ করেছিল। এভাবে তাঁর জীবৎকাল ও ইনতিকালের পর তাঁর সাথে আমা অপেক্ষা অধিক সম্পর্ক ও অধিকার আর কার আছে? সুতরাং তোমাদের বিবেক বুদ্ধি খাটাও এবং তোমাদের শক্রর বিরুদ্ধে জিহাদ করতে তোমাদের নিয়্যত পরিশুদ্ধ কর। কারণ আমি সেই আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলছি যিনি ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই, আমি সত্যের পথে আছি এবং তারা (শক্রগণ) ভ্রান্ত পথে ও তারা বিপথগামী। আমি যা বলি তা তোমরা শোন; আমি নিজের জন্য ও তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র ক্ষমা প্রার্থনা করি।

১। "আমি কখনো রাসুলের (সঃ) কোন আদেশ অমান্য করিনি"–আমিরুল মোমেনিনের এ উক্তিটি ছিল তাদের প্রতি বিদ্রূপবাণ যারা রাসুলের আদেশ অমান্য করতে লজ্জাবোধ করেনি। কখনো কখনো এমনও হয়েছে যে, রাসুলকে পরীক্ষা করতেও তারা লজ্জা অনুভব করেনি। উদাহরণ স্বরূপ, হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় যখন রাসুল (সঃ) কুরাইশ মোশরেকদের সাথে আলাপ-আলোচনা করার জন্য রাজী হয়েছিলেন তখন একজন সাহাবী এত ক্ষেপে গিয়েছিল যে, সে রাসুলের সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক শুরু করে দিয়েছিল এবং "আপনি কি আল্লাহ্‌র নবী নন" জিজ্ঞেস করে নবুয়তের ওপর সংশয় প্রকাশ করতে দ্বিধা করেনি। আর এহেন কথায় আবু বকর বলেছিলেনঃ

"তোমার ওপর লানত! তাঁর সাথে তর্ক করো না। তাঁর কথা শোন। নিশ্চয়ই তিনি আল্লাহ্‌র রাসুল এবং আল্লাহ্ তাকে ধ্বংস করবেন না (হাদীদ,[১৫২] ১০ম খন্ড, পৃঃ ১৮০-১৮৩)। মোমিন হতে হলে ইমানের শর্ত হলো—ইমান হবে সংশয়হীন ও সম্পূর্ণ সন্দেহমুক্ত। সংশয় বা সন্দেহযুক্ত হলে ইমান ক্রটিযুক্ত হয়ে পড়ে। ইমানের শর্ত সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন ঃ

> *তারাই মোমিন যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের প্রতি ইমান আনার পর কোন সন্দেহ পোষণ করে না (কুরআন-৪৯ঃ১৫)।*

রাসুল (সঃ) যখন উবাই ইবনে সলুলের জানাজা পড়তে মনস্থ করেছিলেন তখন এই একই সাহাবী বলেছিল, "কিভাবে আপনি মোনাফিক সর্দারের ক্ষমার জন্য প্রার্থনা করতে মনস্থ করেন।" এমনকি রাসুলের শার্ট ধরে সে তাঁকে টেনে ফিরিয়ে নিতে চেষ্টা করেছিল। এ অবস্থায় রাসুলকে বলতে হয়েছিল, "আল্লাহ্‌র আদেশ ছাড়া আমি কোন কাজ করি না।" একইভাবে উসামা ইবনের যায়েদের নেতৃত্বে প্রেরিত বাহিনীতে যোগদান করার জন্য রাসুলের আদেশ উপেক্ষা করা হয়েছিল। এ সমস্ত ঘটনার মধ্যে সবচাইতে বড় ধৃষ্টতা দেখানো হয়েছিল যখন রাসুল (সঃ) মৃত্যু-শয্যায় থাকাকালে তাঁর উপদেশ লিখিয়ে দেয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। তখন রাসুলকে (সঃ) এমনভাবে দোষারোপ করা হয়েছিল, শরিয়তের দৃষ্টিতে তাতে ইমানের অনুপস্থিতিই প্রমাণিত হয়। তখন এই একই সাহাবী যেসব কথা বলেছিল তাতে বুঝা যায় তার সন্দেহ ছিল যে, রাসুলের এসব আদেশ আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশের ওপর ভিত্তি করে নাকি তাঁর মানসিক গোলযোগের (নাউজুবিল্লাহ্) কারণে করা হয়েছিলো।

২। একথা অস্বীকার করার কোন যো নেই যে, শের-ই খোদা আলী ইবনে আবি তালিব প্রতিটি বিপদ সঙ্কুল সময়ে রাসুলকে (সঃ) বর্মের মত ঘিরে রেখেছিলেন এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত শক্তি ও সাহস দ্বারা তাঁকে রক্ষা করার দায়িত্ব পালন করেছিলেন। প্রথমেই তিনি নিজের জীবনকে বাজি রেখেছিলেন যখন কুরাইশ কাফেরগণ রাসুলকে হত্যা করার জন্য তাঁর ঘর ঘেরাও করে রেখেছিল এবং আলী তাঁর বিছানায় শুয়ে রয়েছিলেন যাতে তাদের পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। এরপর সেসব যুদ্ধে যেখানে শক্রগণ রাসুলকে (সঃ) আঘাত হানার চেষ্টা করেছিল সেখানে আলী আরবের নামকরা বীরদের পা স্থির রাখতে দেননি। প্রতিটি যুদ্ধেই আমিরুল মোমেনিন ইসলামের ঝান্ডা হাতে নিয়ে দৃঢ়ভাবে থাকতেন। বর্ণিত আছে যে–

> *ইবনে আব্বাস বলেছেন, আলীর চারটি গুণ ছিল যা অন্য আর কারো ছিল না। প্রথমতঃ আরব ও অনারবের মধ্যে তিনিই প্রথম ব্যক্তি যে আল্লাহ্‌র রাসুলের সাথে সালাত করেছে। দ্বিতীয়তঃ প্রত্যেক যুদ্ধেই তার হাতে ইসলামের ঝান্ডা থাকতো। তৃতীয়তঃ যখন লোকেরা রাসুলের কাছে থেকে দৌড়ে পালিয়ে যেতো তখনো আলী তাঁর পাশেই থাকতেন। চুতর্থতঃ আলীই রাসুলকে শেষ গোসল করিয়েছিলেন এবং তিনিই রাসুলকে কবরে শায়িত করেছিলেন (বার,[৯৭] ৩য় খন্ড, পৃঃ ১০৯০; নায়সাবুরী,[৮৪] ৩য় খন্ড, পৃঃ ১১১)।*

রাসুলের (সঃ) জীবৎকালের ইসলামের সকল জিহাদ পর্যালোচনা করলে এতে কোন সন্দেহ থাকে না যে, তাবুকের যুদ্ধ ব্যতীত অন্য সকল যুদ্ধে আলী যুদ্ধ করেছিলেন এবং তাঁর শক্তিমত্তা ও বুদ্ধির কারণে প্রতিটি যুদ্ধে কৃতকার্যতা এসেছিল। বদরের যুদ্ধে নিহত সত্তরজন কাফেরের মধ্যে অর্ধেক আলীর তরবারিতে নিহত হয়েছিল। অহুদের যুদ্ধে যখন মুসলিমগণ গণিমত সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলো তখন তাদের জয় পরাজয়ে পরিণত হয়েছিল। শত্রুর আচমকা আক্রমণে তারা পালিয়ে গেল। তখনো আলী জিহাদকে দ্বীনের দায়িত্ব হিসাবে গ্রহণ করে নির্ভিকভাবে যুদ্ধ করে রাসুলের (সঃ) প্ররক্ষা বিধান করেছিলেন। তাঁর এ কাজের প্রশংসা রাসুল (সঃ) ও ফেরেশতাগণ করেছিলেন। খন্দকের যুদ্ধে রাসুলের পক্ষের তিন হাজার যোদ্ধার কেউ আমর ইবনে আবদাওয়াদের মুখোমুখি হতে সাহস করেনি। অবশেষে আমিরুল মোমেনিন তাকে সম্মুখ সমরে নিহত করে গ্লানিকর অবস্থা হতে মুসলিমদের রক্ষা করেছিলেন। হুনায়েনের যুদ্ধে মুসলিমগণ তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য গর্বিত ছিল; এ যুদ্ধে তারা ছিল সংখ্যায় দশ হাজার আর শত্রু ছিল চার হাজার। কিন্তু এ যুদ্ধেও তারা গণিমত সংগ্রহে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। ফলে সুযোগ বুঝে শত্রু তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। শত্রুর হঠাৎ আক্রমণে মুসলিমগণ হতবুদ্ধি ও দিশেহারা হয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেনঃ

আল্লাহ্ তোমাদেরকে তো বহুক্ষেত্রে সাহায্য করেছেন এবং হুনায়েনের দিনেও যখন তোমরা তোমাদের সংখ্যাধিক্যের জন্য উৎফুল্ল ছিলে; কিন্তু এই সংখ্যাধিক্য তোমাদের কোন কাজে আসে নি এবং বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবী তোমাদের জন্য সঙ্কুচিত হয়েছিল ও পরে তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালিয়ে গিয়েছিলে (কুরআন-৯ঃ২৫)।

এ যুদ্ধেও আমিরুল মোমেনিন পর্বতের মত দৃঢ় থেকে যুদ্ধ চালিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করে বিজয় অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেনঃ

অতঃপর আল্লাহ্ তাঁর রাসুল ও মোমিনগণের ওপর প্রশান্তি বর্ষণ করেন এবং এমন এক সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন যা তোমরা দেখনি....... (কুরআন-৯ঃ২৬)।

★★★★★

খোৎবা—১৯৭

আল্লাহ্ সর্বজ্ঞাতা সম্পর্কে

গভীর অরণ্যে পশুর চীৎকার, নির্জনবাসীর পাপ, গভীর সমুদ্রে মাছের চলাফেরা, বিক্ষুব্ধ বাতাসে পানির উচ্ছ্বাস—এসব কিছু আল্লাহ্ জানেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মদ আল্লাহ্র মনোনীত, তাঁর প্রত্যাদেশের বাহক এবং তাঁর করুণার বাণীবাহক। আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি সেই আল্লাহ্কে ভয় করার জন্য যিনি তোমাদেরকে প্রথম সৃষ্টি করেছেন, যাঁর কাছে তোমাদের প্রত্যাবর্তন, যাঁর হাতে তোমাদের লক্ষ্য সমূহের সফলতা, যাঁকে পাবার জন্য তোমাদের সকল আকাঙ্খা নিঃশেষিত, যাঁর দিকে তোমাদের সিরাতুল মোস্তাকীন এবং যিনি (প্রতিরক্ষা প্রার্থনার জন্য) তোমাদের ভয়ের লক্ষ্য। নিশ্চয়ই, আল্লাহ্র ভয় তোমাদের হৃদয়ের জন্য ঔষধ, তোমাদের আত্মার অন্ধত্বের জন্য দৃষ্টিশক্তি, তোমাদের শারীরিক রোগের চিকিৎসা, তোমাদের বক্ষে লুক্কায়িত পাপের বিশোধক, তোমাদের হৃদয়কে দূষণমুক্ত করার পরিশোধক, তোমাদের চোখের আচ্ছন্নতার জন্য আলো, তোমাদের হৃদয়ে ভয়ের জন্য সান্ত্বনা এবং তোমাদের অজ্ঞতার অন্ধকারের জন্য উজ্জ্বলতা। সুতরাং আল্লাহ্র আনুগত্যকে জীবনের পথ হিসাবে গ্রহণ করো।

এ আনুগত্য শুধু বাহ্যিকভাবে নয়–তোমাদের বাতেনকেও এই আনুগত্যের দিকে পরিচালিত করো। এই আনুগত্যকে রুটিন কাজের পরিবর্তে বাতেন অভ্যাসে পরিণত করো। এটাকে অন্তরের অন্তঃস্থলে বদ্ধমূল করো, সকল কর্মকান্ডে দেশনা হিসাবে গ্রহণ করো, বিচার দিনে জলাধার হিসাবে মনে করো। তোমাদের লক্ষ্য অর্জনের জন্য এটা মধ্যস্থতাকারী। এটা তোমাদের ভয়ের দিনের (হাশর) আশ্রয়স্থল, কবরের অন্ধকারে বাতি, দীর্ঘ

একাকীত্বের সময়ের সাথী এবং চির আবাসস্থলের বিপদে রক্ষী। নিশ্চয়ই, আল্লাহ্র আনুগত্য চতুর্দিক হতে আগত দুর্যোগের বিরুদ্ধে ও জলন্ত আগুনের শিখার বিরুদ্ধে একটা প্রতিরক্ষা।

সুতরাং যে কেউ আল্লাহ্র ভয়কে আয়ত্বাধীন করে; বিপদাপদ তার কাছে এসেও দূরে সরে যায়, তার কর্মকান্ড তিক্ততার পর মধুর হয়ে পড়ে, বিপদের ঢল তার ওপর পড়তে এসে থেমে যায়, অসুবিধা সংঘটিত হবার পর তার কাছে সহজ হয়ে যায়, দুর্ভিক্ষ কবলিত হবার পর তার ওপর দ্রুত নেয়ামত বর্ষিত হয়, আশা হারিয়ে ফেলার পর তার ওপর দয়া ও আনুকূল্যের ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হয়, হতাশ হবার পর তার ওপর বৃষ্টির মত আশীর্বাদ নেমে আসে। সুতরাং আল্লাহ্কে ভয় কর যিনি তাঁর সদোপদেশ দ্বারা তোমাদের উপকার করেন, যিনি তাঁর রাসুলের মাধ্যমে তোমাদের শিক্ষা দেন এবং তাঁর আনুকূল্য দ্বারা তোমাদেরকে কৃতার্থ করেন। তাঁর ইবাদতে নিজেকে মশগুল কর এবং তাঁকে মান্য করার দায়িত্ব হতে নিজেদেরকে মুক্ত কর।

ইসলাম সম্বন্ধে

এ ইসলাম এমন এক দ্বীন যা আল্লাহ্ নিজের জন্য মনোনীত করেছেন, তাঁর চোখের সম্মুখে এটাকে উন্নত করেছেন, তাঁর সৃষ্টির মধ্যে এটাকে সর্বোৎকৃষ্ট করেছেন এবং তাঁর প্রেমের ওপর ইহার স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ইসলামকে সম্মান প্রদান করে অন্য ধর্মকে তিনি মর্যাদাহীন করেছেন। ইসলামের মহত্ত্বের কাছে তিনি সকল সম্প্রদায়কে অবমানিত করেছেন। তিনি তাঁর করুণা দ্বারা ইসলামের শত্রুকে হীন করেছেন এবং তাঁর সমর্থন দ্বারা ইহার বিরুদ্ধবাদীকে একাকী করেছেন। ইসলামের স্তম্ভ দ্বারা তিনি গোমরাহীর ভিত্তি বিচূর্ণ করেছেন। ইসলামের জলাধার থেকে তৃষ্ণার্তের তৃষ্ণা নিবারণ করেছেন এবং তাদের দ্বারা সেই জলাধার পূর্ণ করিয়েছেন যারা উহা হতে পানি নিয়েছে।

তিনি ইসলামকে এমনভাবে তৈরী করেছেন যে, ইহার মৌলিক অংশ ভঙ্গ করা যায় না, ইহার জোড়াসমূহ পৃথক করা যায় না, ইহার নির্মাণ কখনো পতিত হয় না, ইহার স্তম্ভ কখনো বিনষ্ট হয় না, ইহার গাছের কখনো মূলোৎপাটন করা যায় না, ইহার সময় কখনো শেষ হয় না, ইহার বিধি-বিধান কখনো অতীত হয় না, ইহার একটি ক্ষুদ্র ডালও কাটা যায় না, ইহার কোন অংশ কখনো সংকীর্ণ হয় না। ইহার সহজ-সরলতা কখনো কষ্টকর অবস্থায় রূপান্তরিত হয় না, ইহার ব্যাখ্যা কখনো অজ্ঞতার অন্ধকার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হয় না, ইহার সোজা পথ কখনো বক্র হয় না, ইহার কাঠে কোন বক্রতা নেই, ইহার বিশাল পথে কোন সংকীর্ণতা নেই, ইহার বাতি কখনো নিভে না এবং ইহার মধুরতায় কোন তিক্ততা নেই।

ইহা এমন এক স্তম্ভের ওপর প্রতিষ্ঠিত, মহিমান্বিত আল্লাহ্ সত্যবাদিতাকে যার ভিত্তি নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ ইহার ভিত্তিকে মজবুত করে দিয়েছেন এবং এমন উৎস হতে ইহাকে প্রবাহিত করেছেন যার স্রোতধারা চিরদিন জলপূর্ণ থাকে। তিনি ইহাকে এমন এক প্রদীপ করেছেন যার আলো চির দেদীপ্যমান এবং এ আলোক-বর্তিকা হতে ভ্রমণকারীগণ চিরদিন পথের দেশনা (হেদায়েত) পেয়ে থাকে। ইহার নির্দশনগুলো এমন যার মাধ্যমে ইহার রাজপথের দিশা পাওয়া যায় এবং জলাধারের দিক নির্দেশনা পাওয়া যায়। মহিমান্বিত আল্লাহ্ ইসলামে তাঁর সর্বোচ্চ সন্তোষ বিধান করেছেন। ইহা তাঁর স্তম্ভের সর্বোচ্চ চূড়া এবং তাঁর আনুগত্যের সর্বোচ্চ ব্যবস্থা। সুতরাং আল্লাহ্র কাছে ইসলামের স্তম্ভ মজবুত, ইহার নির্মাণ সুউচ্চ, ইহার প্রমাণ জলন্ত, ইহার আগুন শিখাপূর্ণ, ইহার কৃতিত্ব শক্তিশালী, ইহার আলোকবর্তিকা উচ্চ এবং ইহার ধ্বংস দুঃসাধ্য। কাজেই ইসলামের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা, ইসলামকে অনুসরণ করা, ইহার প্রতি দায়িত্ব পরিপূর্ণ করা এবং যথাযোগ্য মর্যাদা দেয়া তোমাদের একান্ত উচিত।

রাসুল (সঃ) সম্পর্কে

তৎপর মহিমান্বিত আল্লাহ্ মুহাম্মদকে (সঃ) এমন এক সময় সত্যসহ প্রেরণ করলেন যখন পৃথিবীর ধ্বংস নিকটবর্তী হয়ে গিয়েছিল এবং পরকাল হাতের কাছে এসে পড়েছিল; যখন পৃথিবীর ঔজ্জ্বল্য গাঢ় অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছিলো, পৃথিবী ইহার অধিবাসীদের জন্য বিপদ সঙ্কুল হয়ে পড়েছিল, ইহার উপরিভাগ রুক্ষ ও কঠিন হয়ে পড়েছিল এবং ইহার ধ্বংস নিকটবর্তী হয়ে পড়েছিল। এটা ছিল পৃথিবীর জীবনকাল শেষে ধ্বংসের চিহ্ন উপস্থিতির সময়, পৃথিবীর অধিবাসীগণের নির্মূল হবার সময়, ইহার বন্ধন ছিন্ন হবার সময়, ইহার কর্মকান্ড পরিত্যাগের সময়, ইহার হেদায়েতের চিহ্নসমূহ নিশ্চিহ্ন হবার সময়, ইহার গোপন তথ্য ফাঁস করার সময় এবং ইহার দৈর্ঘ্য কমিয়ে আনার সময়। এ সময় তাঁর বাণী পৌছে দেয়ার জন্য আল্লাহ্ রাসুলকে (সঃ) দায়িত্ব অর্পণ করলেন এবং এটা তাঁর জনগণের জন্য একটা সম্মানের পথ হয়ে গেল। তাঁর সময়কার মানুষের জন্য এটা প্রস্ফুটন কাল হয়ে গেল, তাঁর সমর্থকদের জন্য মর্যাদার উৎস এবং তাঁর সাহায্যকারীদের জন্য একটা সম্মান হয়ে গেল।

পবিত্র কুরআন সম্পর্কে

তৎপর আল্লাহ্ আলোকবর্তিকা স্বরূপ তাঁর নিকট কিতাব নাজেল করেন যার শিখা কখনো নির্বাপিত হয় না এবং যার উজ্জ্বল্য কখনো কমে না।

এটা এমন এক সমুদ্র যার গভীরতা নির্ণয় করা যায় না, এমন এক পথ যা অনুসরণ করলে কখনো গোমরাহ্ হয় না, এমন এক রশ্মি যা কখনো ম্লান হয় না, (ভাল ও মন্দ নির্ণয়ে) এমন এক যুক্তি যা কখনো দুর্বল হয় না, এমন এক ব্যাখ্যাকারক যার ভিত্তি বিনষ্ট হয় না, এমন এক চিকিৎসা যাতে রোগের আর ভয় থাকে না, এমন এক সম্মান যার সমর্থক কখনো পরাজিত হয় না এবং এমন এক সত্য যার সাহায্যকারী কখনো পরিত্যক্ত হয় না। সুতরাং ইহা ইমানের খনি ও কেন্দ্রবিন্দু, জ্ঞানের উৎস ও সমুদ্র, ন্যায় বিচারের বাগান ও ইহার জলাধার, ইসলামের ভিত্তিপ্রস্তর ও ইহার ইমারত, সত্যের উপত্যকা ও ইহার সমতল ভূমি এবং এ সমুদ্র হতে পানি নিয়ে নিঃশেষ করা যায় না, এ ঝর্ণার পানি নিয়ে ইহাকে শুকানো যায় না, এ জলাধার কেউ নিঃশেষ করতে পারে না, এ পথের পথিক কখনো দিকভ্রান্ত হয় না, এ পথে পদচারী নিদর্শন দেখতে ব্যর্থ হয় না এবং এ উঁচুস্থানে অবস্থানকারী কখনো ডুবে যায় না।

আল্লাহ্ কুরআনকে এরূপভাবে দিয়েছেন যা জ্ঞানপিপাসুর তৃষ্ণা নিবারক, ফেকাহ্‌বিদদের হৃদয়ের জন্য বিকাশ সৌন্দর্য, ন্যায়পরায়ণদের জন্য রাজপথ, এমন চিকিৎসা যারপর আর রোগ থাকে না, এমন দ্যুতি যাতে আর অন্ধকার থাকে না, এমন রশি যা শক্ত করে জড়িয়ে ধরে, এমন দুর্গ যার চুড়া ধ্বসে পড়ে না। ইহা তার জন্য মহাসম্মান যে এটাকে ভালবাসে, তার জন্য শান্তি যে এতে প্রবেশ করে, তার জন্য হেদায়েত যে এটাকে অনুসরণ করে, তার জন্য ক্ষমা যে এটাকে গ্রহণ করে, তার জন্য যুক্তি যে যুক্তিবাদী, তার জন্য সাক্ষী যে ইহার সাথে বিবাদ করে, তার জন্য কৃতকার্যতা যে ইহার সাহায্যে যুক্তি দেখায়, তার জন্য বাহন যে ইহা বহন করে, তার জন্য পরিবহণ যে ইহা আমল করে, তার জন্য নিদর্শন যে পথের সন্ধান করে, তার জন্য বর্ম যে নিজকে গোমরাহী হতে রক্ষা করতে চায়, তার জন্য জ্ঞান যে মনোযোগ সহকারে শুনে, তার জন্য একটা সুন্দর কাহিনী যে বর্ণনা করে এবং তার জন্য চূড়ান্ত রায় যে বিচার করে।

★★★★★

খোৎবা-১৯৮

অনুচরদের প্রতি উপদেশ

সালাত সম্পর্কে

সালাতে নিজকে ব্রত করো এবং এতে দৃঢ় থেকো; যত বেশী পারো সালাত কায়েম করো এবং ইহার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নৈকট্য অনুসন্ধান করো।

নির্ধারিত সময়ের সালাত মোমিনদের জন্য অত্যাবশ্যকীয় (কুরআন ৪ : ১০৩)।

তোমরা কি দোযখবাসীদের জিজ্ঞাসার জবাব শুনতে পাওনি ঃ

কিসে তোমাদেরকে সাকারে (জাহান্নামের অপর নাম) নিক্ষেপ করেছে? তারা বললো, আমরা মুসল্লী ছিলাম না (কুরআন -৭৪ ঃ ৪২-৪৩)।

নিশ্চয়ই, বাতাস যেভাবে গাছের পাতা ঝরায় সালাত সেরূপ পাপকে ঝরিয়ে দেয় এবং গরুর ঘাড় হতে যেভাবে রশি সরিয়ে ফেলা হয় সেভাবে পাপকে সরিয়ে দেয়। আল্লাহ্‌র রাসুল সালাতকে দৈনিক পাঁচবার গরম পানিতে গোসলের সাথে তুলনা করতেন। এরপরও কি কারো গায়ে ময়লা থাকতে পারে?

সেসব মোমিন কর্তৃক ইহার দায়িত্ব স্বীকৃত হয়েছে যাদেরকে ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য বা সন্তান-সন্ততির কারণে চোখের শীতলতা সালাত হতে ফিরিয়ে নিতে পারেনি। মহিমান্বিত আল্লাহ্ বলেন ঃ

সেসব লোক, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহ্‌র জেকের হতে, সালাত কায়েম হতে এবং জাকাত হতে বিরত রাখে না; তারা ভয় করে সে দিনকে যে দিন তাদের অন্তর ও দৃষ্টি উল্টে যাবে (কুরআন -২৪ঃ৩৭)

আল্লাহর রাসুল বেহেশতের নিশ্চয়তা পাওয়ার পরও সালাত কায়েম করতেন। কারণ মহিমান্বিত আল্লাহ্ বলেনঃ

এবং তোমার পরিবারবর্গকে সালাত কায়েমের আদেশ দাও এবং নিজেও উহাতে অবিচল থাক .... (কুরআন-২০ঃ১৩২)

জাকাত সম্পর্কে

তৎপর সালাতের সাথে জাকাত ও আরোপিত হয়েছে ত্যাগ হিসাবে। যে কেউ জাকাত আদায় করে তার আত্মা পবিত্রতা লাভ করে। কারণ ইহা বিশোধক হিসাবে কাজ করে এবং দোযখের আগুন হতে রক্ষা পাবার বর্ম হিসাবে কাজ করে। সুতরাং জাকাত প্রদানের পর ইহার প্রতি কোনরূপ আসক্তি অনুভব করো না এবং ইহার কারণে শোকাহতও হয়ো না। আত্মার বিশুদ্ধির নিয়্যত ব্যতীত জাকাত প্রদান করলে প্রাপ্য অপেক্ষা অধিক কিছু আশা করা হয়। নিশ্চয়ই, সুন্নাহ্ সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তি জাকাতের জন্য কোন পুরস্কার পাবে না; তার সকল আমল নষ্ট হয়ে যায় এবং তার তওবা বৃথা যায়।

আমানতের প্রতি দায়িত্ব পরিপূরণ

যে কেউ আল্লাহ্‌র আমানতের (কুরআন) প্রতি দায়িত্ব পরিপূরণে অমনোযোগী হবে সে হতাশাগ্রস্থ হবে। শক্তিশালী আকাশ, বিশাল পৃথিবী ও সুউচ্চ পর্বতের সম্মুখে ইহাকে রাখা হয়েছিল। কিন্তু কেউ উহা অপেক্ষা শক্তিশালী, বিশাল অথবা উচ্চ প্রমাণিত হয়নি। উহারা কুরআনের প্রতি দায়িত্ব পরিপূরণে ব্যর্থতার ভয়ে ভীত হয়ে গেল এবং লক্ষ্য করেছিল যে, একটা দুর্বল সত্তা এ গুরু দায়িত্ব অনুধাবন করতে পারেনি— এরা হলো মানুষ। মহিমান্বিত আল্লাহ্ বলেন ঃ

আমি তো আসমান, যমীন ও পর্বতমালার প্রতি এ আমানত অর্পণ করেছিলাম, উহারা ইহা বহন করতে অস্বীকার করলো এবং উহাতে শঙ্কিত হলো, কিন্তু মানুষ উহা বহন করলো, সে তো অতিশয় জালিম, অতিশয় অজ্ঞ (কুরআন -৩৩ ঃ ৭২)

নিশ্চয়ই, আল্লাহ্ মহিমান্বিত। মানুষ দিনে অথবা রাতে যা করে তার কোন কিছুই তাঁর কাছে গোপন থাকে না। তিনি সবকিছু বিস্তারিত জানেন এবং তাঁর জ্ঞানে সবকিছু ধারণ করা আছে। তোমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সাক্ষী, তোমাদের দেহের অঙ্গসমূহ তোমাদের বিরুদ্ধে সৈন্যবাহিনীর মত। তোমাদের বাতেন তাঁর চোখের মত কাজ করে (যা তোমাদের পাপকে পাহারা দেয়) এবং তোমাদের একাকীত্ব তাঁর কাছে প্রকাশ্য।

★★★★★

খোৎবা-১৯৯

মুয়াবিয়ার শঠতা ও বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে

আল্লাহ্র কসম, মুয়াবিয়া আমার চেয়ে বেশী চতুর নয়, কিন্তু সে প্রবঞ্চনা[১] করে ও কুকর্মে লিপ্ত হয়। যদি আমি প্রবঞ্চনাকে ঘৃণা না করতাম তবে সকল মানুষ হতে চালাক হতাম। কিন্তু (প্রকৃত বিষয় হলো) প্রতিটি প্রবঞ্চনাই পাপ এবং প্রতিটি পাপই আল্লাহ্র অবাধ্যতা। প্রত্যেক প্রবঞ্চক ব্যক্তিই শেষ বিচারে একটা ঝান্ডা বহন করবে যাতে তাকে সহজে চেনা যাবে। আল্লাহর কসম, কোন কৌশল দ্বারা আমাকে ভুলিয়ে রাখতে পারবে না এবং দুঃখ-কষ্ট দ্বারা আমাকে পরাজিত করতে পারবে না।

১। যে সব লোক দ্বীন ও নীতিজ্ঞান সম্বন্ধে অজ্ঞ, দ্বীনের বিধি-বিধানের ধার ধারে না এবং শাস্তি ও পুরস্কারের ধারণা যাদের নেই তারা নিজেদের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য উপায় ও ওজরের কোন অভাব অনুভব করে না। তারা প্রতিক্ষেত্রেই কৃতকার্যতার পথ খুঁজে বের করে নেয়। কিন্তু যখন মানবতাবোধ অথবা ইসলাম অথবা নীতিজ্ঞানের আরোপিত সীমা বা দ্বীনের বিধান বাধা হয়ে দাঁড়ায় তখন কৌশল ও উপায় অনুসন্ধানের পথ সংকীর্ণ হয়ে পড়ে এবং তাদের কর্মকান্ডের সম্ভাব্যতাও সীমিত হয়ে পড়ে। মুয়াবিয়ার প্রভাব ও প্রতিপত্তি ছিল এ ধরনের কৌশলেরই ফল—যে উপায় অবলম্বন করে সে হালাল-হারাম ও ন্যায়-অন্যায়—কোন কিছুই চিন্তা করে দেখতো না; এমন কি বিচার দিনের ভয়ও তাকে এসব কর্মকান্ড হতে নিবারিত করতে পারেনি। ইসফাহানী[৩২] তার চরিত্র সম্বন্ধে লিখেছেন ঃ

সর্বদা উদ্দেশ্য হাসিল করাই ছিল তার লক্ষ্য। উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য সে হালাল হারামের ধার ধারতো না। সে দ্বীনের তোয়াক্কা করতো না এবং আল্লাহ্র শাস্তির কথা কখনো চিন্তা করতো না। তার ক্ষমতা আঁকড়ে রাখার জন্য সে মিথ্যা ও বানোয়াট বক্তব্য প্রদান করতো এবং সকল প্রকার প্রতারণা-প্রবঞ্চনা ও ফন্দি-ফিকিরে লিপ্ত থাকতো। যখন সে দেখলো আমিরুল মোমেনিনকে যুদ্ধে জড়িয়ে না ফেললে তার স্বার্থসিদ্ধি হবে না তখন সে তালহা ও জুবায়রকে তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলেছিল। এ উপায়ে সে কৃতকার্য হতে না পেরে সিরীয়দেরকে প্ররোচিত করে সিফ্ফিনের গৃহযুদ্ধ সংঘটিত করেছিল। আম্মার শহীদ হবার কারণে রাসুলের (সঃ) ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী যখন প্রমাণিত হলো যে, মুয়াবিয়া বিদ্রোহী ও বাতিল পথে রয়েছে তখনই সে লোক নিয়োজিত করে প্রচার করতে লাগলো যে, আম্মারের মৃত্যুর জন্য আলীই দায়ী; কারণ তিনি আম্মারকে যুদ্ধক্ষেত্রে এনেছেন। অন্য এক উপলক্ষে সে ব্যাখ্যা করেছিল, "বিদ্রোহী দল" বলতে রাসুল (সঃ) "প্রতিশোধ গ্রহণকারী দল" বুঝিয়েছেন। কাজেই উসমানের রক্তের বদলা গ্রহণকারী দলের হাতে আম্মার নিহত হবে এটাই ছিল রাসুলের (সঃ) কথার মর্ম। এসব ধূর্ততার পথ অবলম্বন করেও যখন সে জয়ের আশা হারিয়ে ফেললো তখন সে বর্শার মাথায় কুরআন তুলে ধরার

ফন্দি আঁটলো। যদি সে সত্যিকার অর্থে কুরআন মানতো তাহলে যুদ্ধ আরম্ভ হবার আগেই সে কুরআন অনুযায়ী তার দাবী উত্থাপন করতো। আবু মুসা আল-আশারীর সঙ্গে চাতুরী করে আমর ইবনে আ'স যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল উহার সঙ্গে কুরআনের কোন সংশ্রব নেই। এহেন কুরআন বিরোধী প্রতারণার জন্য আমরকে শাস্তি দেয়া তো দূরের কথা একটা কটু কথাও মুয়াবিয়া বলেনি। বরং মুয়াবিয়া আমরের গর্হিত কাজের প্রশংসা করে পুরস্কার স্বরূপ তাকে মিশরের গভর্ণর করেছিল।

অপরপক্ষে আমিরুল মোমেনিনের আচরণ ছিল দ্বীনের বিধি-বিধান ও নীতিজ্ঞানবোধের সুউচ্চ নমুনা। বিরূপ অবস্থাতেও তিনি সত্য ও ন্যায়পরায়ণতার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতেন এবং তাঁর পবিত্র জীবনকে ফন্দি-ফিকির ও প্রবঞ্চনার মত নোংরামি দ্বারা কলুষিত করেননি। তিনি ইচ্ছা করলে ধূর্ততা দিয়ে ধূর্ততার মোকাবেলা করতে পারতেন এবং মুয়াবিয়ার নির্লজ্জ কর্মকান্ডের জবাব একইভাবে দিতে পারতেন। উদাহরণ স্বরূপ, মুয়াবিয়া ফোরাতকূলে সৈন্য দ্বারা চৌকি বসিয়ে আমিরুল মোমেনিনের লোকদের পানি বন্ধ করে দিয়েছিল যাতে তারা পানির অভাবে দুর্বল হয়ে পরাজয় বরণ করে। আমিরুল মোমেনিন মুয়াবিয়ার সৈন্যদেরকে হটিয়ে দিয়ে ফোরাতকূল দখল করে নিয়েছিলেন। জালিম মুয়াবিয়ার সৈন্যদের প্রতি আমিরুল মোমেনিন একই আচরণ করে পানি বন্ধ করে দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি এহেন অমানবিক ও নীতিশাস্ত্র বিবর্জিত কাজ করে তাঁর হাত কলুষিত করেননি যদিও তিনি জানতেন যে, পানি বন্ধ করে দিলে শত্রুকে সহজে পরাজিত করা যায়। মুয়াবিয়ার মত লোকেরাই এহেন অমানবিক কাজকে কূটনীতি বা যুদ্ধ-কৌশল বা প্রশাসনিক দক্ষতা বলে আখ্যায়িত করে থাকে। কিন্তু আমিরুল মোমেনিন কখনো কূট-কৌশল ও জালিয়াতি দ্বারা নিজের শক্তি বৃদ্ধির কথা চিন্তা করেননি। তাই, তাঁর কিছু সংখ্যক অনুচর যখন তাঁকে উপদেশ দিল যে, উসমানের সময়কার অফিসারদের চাকুরী বহাল রাখতে, তালহা ও জুবায়রকে কুফা ও বসরার গভর্ণর নিয়োগ করে তাদের সঙ্গে সখ্যতা গড়ে তুলতে এবং মুয়াবিয়াকে সিরিয়ার সরকার দিয়ে দিতে তখন তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি দ্বীনের বিধানকে জাগতিক সুবিধার উর্ধ্বে স্থান দিয়ে মুয়াবিয়া সম্পর্কে প্রকাশ্যে নিম্নরূপ ভাষণ দিয়েছিলেন ঃ

মুয়াবিয়া যে অবস্থায় আছে যদি আমি তাকে সে অবস্থায় থাকতে দেই তবে আমি তাদেরই একজন হবো "যারা মানুষকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যেতে সাহায্য করে" (কুরআন- ১৮ ঃ ৫১)। যারা আপাতঃ কৃতকার্যতার মূল্য দেয় অথচ চিন্তা করে না যে, কি উপায়ে কৃতকার্যতা অর্জিত হয়েছে — আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হবো না। মানুষ সেসব লোককে সমর্থন দেয় যারা ধূর্ততা ও প্রবঞ্চনার আশ্রয় গ্রহণ করে কৃতকার্য হয় এবং তাদেরকে ভাল প্রশাসক, বুদ্ধিমান রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিবৃত্তিক মেধাবী ইত্যাদিতে আখ্যায়িত করে। পক্ষান্তরে যারা ইসলামের প্রত্যাদেশ ও ঐশী নির্দেশের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে, ধূর্ততা ও জালিয়াতির আশ্রয় গ্রহণ করে অন্যায়ভাবে জয়লাভ করার চেয়ে পরাজয়কে বেশী পছন্দ করে, মানুষ তাদেরকে রাজনীতিতে অজ্ঞ ও দূরদর্শীতায় দুর্বল বলে আখ্যায়িত করে। তারা একবার ভেবেও দেখে না যে, যে ব্যক্তি ন্যায়নীতি মেনে চলে তার পথে কি বাধা রয়েছে যা তাকে কৃতকার্যতার কাছাকাছি পৌঁছা সত্ত্বেও অগ্রসর হতে বারিত করেছে।

★★★★★

খোৎবা-২০০

ন্যায় পথে চলার লোকের স্বল্পতার জন্য ভীত না হওয়ার উপদেশ

হে জনমন্ডলী, ন্যায় পথের অনুসারীর সংখ্যাস্বল্পতায় তোমরা বিস্মিত হয়ো না। কারণ (এ দুনিয়াতে) মানুষ শুধু সেই টেবিলের পাশে ভিড় জমায় যাতে অনেক কিছুর মধ্যে ভক্ষণীয় জিনিস অল্প কিন্তু ক্ষুধা চির অতৃপ্ত।

হে জনমন্ডলী, নিশ্চয়ই, যে বিষয় মানুষকে একত্রিত করে তা হলো ভাল অথবা খারাপের জন্য তাদের ঐকমত্য অথবা অনৈকমত্য। ছামুদ[১] জাতির এক ব্যক্তি উষ্ট্রীহত্যা করেছিল; কিন্তু আল্লাহ্ তাদের সকলকে শাস্তি

দিয়েছিলেন। কারন তারা সকলেই লোকটির গর্হিত কাজের প্রতি মৌন সম্মতি প্রদর্শন করেছিল। তাই মহিমান্বিত আল্লাহ্ বলেন, "তৎপর তারা উহার পায়ের শিরা কেটে দিয়েছিল এবং পরিণামে তারা অনুতপ্ত হলো" (কুরআন - ২৬ঃ ১৫৭)।

এরপর তাদের ভূমি তলিয়ে গিয়ে কমে গিয়েছিল যেমন করে লাঙ্গলের ফলা অকর্ষিত ভূমিকে ভেদ করে। হে জনমন্ডলী, যে ব্যক্তি হেদায়েতের সুস্পষ্ট পথে চলে সে পানির ঝর্ণার ধারে পৌছতে পারে এবং যে ইহা পরিত্যাগ করে সে পানিবিহীন মরুভূমিতে ঘুরে বেড়ায়।

১। প্রাচীন আরবে খৃষ্টপূর্ব ৪র্থ হতে ৭ম শতাব্দীর মধ্যে ছামুদ নামক একটি গোত্র বা গোত্রসমষ্টি বাস করতো। হিজাজ ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী আল-কুরা উপত্যকায় এ জাতি বসবাস করতো। সালিহ্ নামক একজন নবীকে আল্লাহ্ তাদের হেদায়েতের জন্য প্রেরণ করেছিলেন। আল্লাহ্ বলেন ঃ

> *ছামুদ জাতির নিকট তাদের ভ্রাতা সালিহ্-কে পাঠিয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন, 'হে আমার কাওম, তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ্ নেই। তোমাদের নিকট তোমাদের রব হতে স্পষ্ট নিদর্শন এসেছে। আল্লাহ্র এ উষ্ট্রী তোমাদের জন্য একটা নিদর্শন। ইহাকে আল্লাহ্র জমিতে চরে খেতে দাও, ইহাকে কোন ক্লেশ দিও না, দিলে মর্মন্তুত শাস্তি তোমাদের ওপর আপতিত হবে। এবং স্মরণ কর, আদ জাতির পর তিনি তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছেন। তিনি তোমাদেরকে পৃথিবীতে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে, তোমরা সমতল ভূমিতে প্রাসাদ ও পাহাড় কেটে বাসগৃহ নির্মাণ করছো। সুতরাং আল্লাহ্র অনুগ্রহ স্মরণ কর এবং পৃথিবীতে ফেতনা সৃষ্টি করো না। তার সম্প্রদায়ের দাম্ভিক প্রধানেরা ইমানদারগণকে দুর্বল মনে করে বললো, 'তোমরা কি জান যে, সালিহ্ আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত? তারা বললো, 'তার প্রতি যে বাণী প্রেরিত হয়েছে আমরা তাতে বিশ্বাসী।' দাম্ভিকেরা বললো, 'তোমরা যা বিশ্বাস কর আমরা তা প্রত্যাখ্যান করি'। অতঃপর তারা সেই উষ্ট্রী বধ করে এবং আল্লাহ্র আদেশ অমান্য করে এবং বলে, 'হে সালিহ্! তুমি রাসুল হলে আমাদেরকে যে ভয় দেখিয়েছো তা আনয়ন কর।' অতঃপর তারা ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হয়, ফলে তাদের প্রভাত হলো নিজগৃহে মুখ থুবড়ে পতিত অবস্থায়। তৎপর তিনি তাদের নিকট হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললেন, 'আমি তো আমার রবের বাণী তোমাদের নিকট পৌছে দিয়েছিলাম, কিন্তু তোমরা তো হিতাকাঙ্খীদেরকে পছন্দ করনা' (কুরআন -৭ঃ৭৩-৭৯)*
>
> *ছামুদ সম্প্রদায় সতর্ককারীকে মিথ্যাবাদী বলেছিল। তারা বলেছিলো 'আমরা কি আমাদের মধ্য হতেই এক ব্যক্তিকে অনুসরণ করবো? তা হলে তো আমরা বিপথগামী ও উন্মাদ বলে গণ্য হবো। আমাদের মধ্যে কি উহার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়েছে? না , সে তো একজন মিথ্যাবাদী ও দাম্ভিক'। আগামীকাল উহারা জানবে, কে মিথ্যাবাদী, দাম্ভিক। আমি উহাদের পরীক্ষার জন্য পাঠিয়েছি এক উষ্ট্রী; অতএব, তুমি উহাদের আচরণ লক্ষ্য কর এবং ধৈর্যশীল হও। এবং উহাদেরকে জানিয়ে দাও যে, উহাদের মধ্যে পানি বন্টন নির্ধারিত এবং পানির অংশের জন্য প্রত্যেকে উপস্থিত হবে পালাক্রমে। অতঃপর উহারা উহাদের এক সঙ্গীকে আহ্বান করলো, সে উষ্ট্রীটিকে হত্যা করলো। কী কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী। আমি উহাদেরকে আঘাত হেনেছিলাম এক মহানাদ দ্বারা; ফলে উহারা হয়ে গেল খোয়াড়-নির্মাণকারীর বিখন্ডিত শুষ্ক শাখা-প্রশাখার মত (৫৪ঃ২৩-৩১)।*

★★★★★

খোৎবা-২০১

সাইয়্যেদুন্নিছা খাতুনে জান্নাতের দাফনের সময় আমিরুল মোমেনিন বলেন ঃ

হে আল্লাহ্‌র রাসুল, আমার সালাম ও আপনার কন্যার সালাম গ্রহণ করুন। আপনার কন্যা আপনার কাছে আসছেন এবং তিনি আপনার সাক্ষাত লাভের জন্য তাড়াহুড়া করেছিলেন। হে আল্লাহ্‌র রাসুল, আপনার প্রাণপ্রিয় কন্যার মৃত্যু আমাকে ধৈর্যহারা করে দিয়েছে এবং আমার সহ্যশক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছে। আমার সান্ত্বনার ক্ষেত্র এটুকু যে, আপনার দুঃখজনক ও হৃদয় বিদারক বিচ্ছেদ-বেদনা আমি ধৈর্য সহকারে সহ্য করেছি। আপনাকে আমি নিজ হাতে কবরে শায়িত করেছি। আমার গ্রীবা ও বুকের মাঝখানে আপনার পবিত্র মস্তক থাকাবস্থায় আপনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

আমরা তো আল্লাহ্‌রই এবং নিশ্চিতভাবে তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী (কুরআন-২ঃ১৫৬)

এক্ষণে, আপনার আমানত ফেরত নেয়া হয়েছে এবং যা দেয়া হয়েছিল তা আবার ফিরিয়ে নেয়া হলো। আমার শোকের আর কোন সীমা রইলো না এবং আমার রাত্রি নিদ্রাবিহীন হয়ে গেল যে পর্যন্ত না আপনি এখন যে ঘরে আছেন আল্লাহ্ আমার জন্য সে ঘর মঞ্জুর করেন।

নিশ্চয়ই, আপনার কন্যা আপনার সাক্ষাত লাভ করেই আপনাকে বিস্তারিত বলেছেন যে, আপনার উম্মাহ্[১] তাঁর প্রতি কতই না অত্যাচার করেছে। আপনি দয়া করে তাঁকে জিজ্ঞেস করে বিস্তারিত খবর জেনে নেবেন। এসব ঘটনা এত অল্পকালের মধ্যে ঘটেছে যে, লোকেরা এখনো আপনাকে স্মরণ করে এবং আপনার কথা বলাবলি করে। আপনাদের উভয়ের প্রতি আমার সালাম। এ সালাম একজন শোকাহতের— কোন বিরক্ত বা সঘৃণ ব্যক্তির নয়। আমার এখান থেকে চলে যাওয়ার কারণ এ নয় যে, আমি শ্রান্ত হয়ে পড়েছি এবং যদি আমি এখানে থাকি তার কারণ এ নয় যে, আল্লাহ্ ছবরকারীদের জন্য যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আমি তাতে বিশ্বাস হারিয়েছি।

১। রাসুলের (সঃ) ইনতিকালের পর তাঁর প্রাণপ্রিয় কন্যার প্রতি যে পরিমাণ জুলুম ও দুর্ব্যবহার করা হয়েছিল তা অত্যন্ত দুঃখজনক, দুর্ভাগ্যজনক ও হৃদয় -বিদারক। যদিও রাসুলের ইনতিকালের পর সাইয়্যেদুন্নিছা ফাতিমা মাত্র কয়েক মাস বেঁচে ছিলেন তবুও এ অল্প সময়ের শোক ও দুঃখ-দুর্দশা বর্ণনাতীত। এ বিষয়ে প্রথমে যে দৃশ্য চোখে পড়ে তা হলো রাসুলের কাফন-দাফনের কথা চিন্তা না করে তাঁর পবিত্র মরদেহ ফেলে রেখে ক্ষমতা গ্রহণের জন্য তারা সকলেই সকিফা-ই-সাইদায় চলে গিয়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই তাদের এহেন আচরণ খাতুনে জান্নাতকে আহত করেছিল। যখন তিনি দেখলেন যে, রাসুলের জীবদ্দশায় যারা তাঁর প্রতি আনুগত্য ও ভালবাসার কথা বলতো তারা ক্ষমতা দখলের জন্য এমনভাবে পাগলপারা হয়ে পড়েছিল যে, রাসুলের একমাত্র শোকাহত কন্যাকে একটু সান্ত্বনা দিতেও এলো না তখন তার হৃদয় ব্যথাতুর হওয়া স্বাভাবিক। এমন কি কখন রাসুলকে শেষ গোসল দেয়া হয়েছিল এবং কখন তাঁকে দাফন করা হয়েছিল— এসবের কিছুই তারা জানলো না। যেভাবে তারা রাসুল-কন্যার কাছে এসেছিল তা হলো— তারা আগুন জ্বালাবার উপকরণসহ দল বেঁধে তাঁর ঘরের সামনে জড়ো হয়ে জোরপূর্বক বায়াত গ্রহণের জন্য অত্যাচার ও বিশৃঙ্খলা প্রদর্শন করেছিল। এসব বাড়াবাড়ির মূল উদ্দেশ্য ছিল খাতুনে জান্নাতের ঘরের মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান তারা এমনভাবে মুছে ফেলতে চেয়েছিল যেন ভবিষ্যতে আর সেই মর্যাদা ফিরে না পায়। এসব উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাঁকে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল করে দেয়ার মানসে 'ফদক'-এর দাবী মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল যার ফলশ্রুতিতে খাতুনে জান্নাত মৃত্যুকালে অছিয়ত করেছিলেন যে, তারা কেউ যেন তাঁর দাফন কালে উপস্থিত না থাকে।

★★★★★

খোৎবা-২০২

পরকালের রসদ সংগ্রহের উপদেশ

হে জনমন্ডলী, নিশ্চয়ই এ পৃথিবী একটা যাত্রাপথ আর পরকাল হলো স্থায়ী আবাসস্থল। সুতরাং যাত্রাপথ হতে স্থায়ী আবাস স্থলের রসদ সংগ্রহ কর। যিনি তোমাদের সকল গুপ্ত বিষয় অবগত আছেন তাঁর সম্মুখে তোমাদের পর্দা ছিঁড়ে ফেলো না। এ পৃথিবী হতে তোমাদের দেহ চলে যাবার আগে তোমাদের হৃদয়কে পাঠিয়ে দাও। কারণ পরীক্ষার জন্য তোমাদেরকে এখানে রাখা হয়েছে এবং পরকালের জন্য তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। যখন কোন মানুষ মারা যায় তখন অন্যরা জিজ্ঞেস করে কি কি সম্পদ সে রেখে গেছে, আর ফেরেশতাগণ জিজ্ঞেস করে কি সৎ আমল সে অগ্রে প্রেরণ করেছে। আল্লাহ্ তোমাদেরকে আশীর্বাদ করুন, তোমরা অগ্রে কিছু প্রেরণ কর; ইহা তোমাদের নিকট হতে ঋণ হিসাবে বিবেচিত হবে এবং সবকিছু পেছনে ফেলে যেয়ো না; কারণ এটা তোমাদের জন্য বোঝা হয়ে যাবে।

★★★★★

খোৎবা-২০৩

বিচার দিনের বিপদ সম্বন্ধে সতর্কাদেশ

তোমাদের ওপর আল্লাহ্র রহমত বর্ষিত হোক। পরপারে যাত্রার সামগ্রী সংগ্রহ করো; কারণ প্রস্থানের আহ্বান ঘোষিত হয়ে গেছে। এ পৃথিবীতে তোমাদের অবস্থান ক্ষণকালের এবং উত্তম কিছু নিয়ে আল্লাহ্র কাছে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। কারণ সম্মুখের উপত্যকায় আরোহণ বড়ই কষ্টসাধ্য এবং বাসস্থান বড়ই ভয়বহুল ও বিপদসঙ্কুল। তোমাদেরকে সেখানে পৌঁছতে হবে এবং থাকতে হবে। জেনে রাখো, মৃত্যুর চোখ তোমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। মনে হয় যেন তোমরা মৃত্যুর থাবার নখের মধ্যেই রয়েছো। তোমাদের উচিত এ দুনিয়ার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা এবং আল্লাহ্র ভয়ের রসদ দ্বারা তোমাদের নিজেদেরকে সহায়তা করা।

★★★★★

খোৎবা-২০৪

আমিরুল মোমেনিনের বায়াত গ্রহণের পর তালহা ও জুবায়র অভিযোগ উত্থাপন করলো যে, তিনি রাষ্ট্রীয় কার্যে তাদের সাথে পরামর্শ করেন না বা তাদের সহায়তা গ্রহণ করতে চান না। প্রত্যুত্তরে আমিরুল মোমেনিন বলেন ঃ

তোমরা উভয়ে ক্ষুদ্র বিষয়ে তোমাদের বিরাগ প্রকাশ করে থাক এবং বৃহৎ বিষয় পরিহার করে চলো। তোমরা কি বলতে পার আমি তোমাদেরকে তোমাদের কোন অধিকার হতে বঞ্চিত করেছি অথবা কোন কিছুতে তোমাদের প্রাপ্য অংশ তোমাদেরকে দেই নি? কোন মুসলিমের দাবীর (যা আমার কাছে আনা হয়েছে) বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিতে কি আমি কখনো অপারগ হয়েছি? আমি কি কোন বিষয়ে অজ্ঞ ছিলাম? আমি কি কোন বিষয়ে ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছি?

আল্লাহ্র কসম, খেলাফতের প্রতি আমার কোন লোভ ছিল না বা সরকার পরিচালনার প্রতি আমার কোন আকর্ষণ নেই। কিন্তু তোমরা নিজেরাই আমাকে আমন্ত্রণ করে এ দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছ। যখন খেলাফতের দায়িত্ব আমার কাছে এলো আমি আল্লাহ্র কিতাবকে সকল কাজে আমার সামনে রাখলাম। আল্লাহ্ উহাতে আমাদের

জন্য যা কিছু রেখেছেন এবং যেভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন সেভাবেই আমি কুরআনকে অনুসরণ করতে লাগলাম। কুরআনের বিষয়ে আমাকে উপদেশ দেয়ার মত তোমাদের কোন কিছু নেই বা কুরআন সংক্রান্ত বিষয়ে অন্য কারো উপদেশ আমার প্রয়োজন নেই। আমার অজানা এমন কোন আদেশ নেই যে বিষয়ে তোমাদের বা অন্য কোন মুসলিমের সাথে আলোচনা করার প্রয়োজন আমার হতে পারে। যদি এমন হতো যে, কোন কিছু আমার অজানা রয়েছে তাহলে অবশ্যই আমি তা তোমাদের সাথে বা অন্য কারো সাথে পরামর্শ করতাম।

বায়তুল মালের সমবন্টন সম্পর্কে তোমরা যে প্রশ্ন তুলেছো সে বিষয়ে আমি নিজের খেয়ালখুশি মত কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিনি। আমি দেখেছি এবং তোমরাও দেখেছো যে, রাসুল (সঃ) যা কিছু আনতেন তা নিঃশেষ করে দিতেন। সুতরাং অংশ বিষয়ে তোমাদের প্রতি নজর রাখার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। কারণ সে বিষয় আল্লাহ্ই নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আল্লাহ্র কসম, এ বিষয়ে তোমরা দু'জন বা অন্য কেউ আমার কাছে কোন প্রকার আনুকূল্য পাবে না। আল্লাহ আমাদের ও তোমাদের হৃদয়কে ন্যায়ের প্রতি ঝুঁকিয়ে দিন এবং তিনি আমাদেরকে ও তোমাদেরকে ছবর করা তৌফিক দান করুন। সেই ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ্র রহমত বর্ষিত হোক যে সত্য দেখলে সমর্থন করে এবং অন্যায় দেখলে তা পরিহার করে। আল্লাহ্ তার প্রতিও রহমত বর্ষণ করুন যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সত্যের সাহায্য করে।

★★★★★

খোৎবা-২০৫

সিফফিনের যুদ্ধে যখন আমিরুল মোমেনিন শুনলেন যে, তাঁর লোকেরা সিরীয়দের গালি-গালাজ করছে তখন তিনি বললেন ঃ

তোমরা তাদেরকে গালি দিচ্ছ— এটা আমি অপছন্দ করি। যদি তোমরা তাদের কর্মকান্ডের বর্ণনা বা সমালোচনা করে থাক তবে উহা কথা বলার একটা ভাল প্রক্রিয়া এবং যুক্তি প্রদর্শনের জন্য অধিক গ্রহণীয় উপায় বলে বিবেচিত হবে। তাদেরকে গালি-গালাজ না করে তোমরা বলো, "হে আল্লাহ্, আমাদেরকে ও তাদেরকে রক্তক্ষয় হতে রক্ষা করুন, আমাদের ও তাদের মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টি করুন; এবং তাদেরকে বিপথ হতে ফিরিয়ে আনুন যেন তাদের মধ্যে যারা সত্য সম্বন্ধে অজ্ঞাত তারা তা জানতে পারে। তাদের মধ্যে যারা বিদ্রোহের দিকে ঝুঁকে পড়ে বিদ্রোহী হয়েছে তাদেরকে ফিরিয়ে আনুন।"

★★★★★

খোৎবা-২০৬

সিফফিনের যুদ্ধে ইমাম হাসান যুদ্ধ করতে দ্রুত এগিয়ে গেলে আমিরুল মোমেনিন বলেন ঃ

এ যুবককে আমার পক্ষ হতে যুদ্ধে যেতে বারণ করে ধরে রাখো, পাছে সে আমার ধ্বংসের কারণ হয়ে পড়ে। এ দু'জনকে (হাসান ও হুসাইন) মৃত্যুর দিকে পাঠাতে আমি সম্পূর্ণরূপে অনিচ্ছুক; কারণ তাদের মৃত্যুতে রাসুলের (সঃ) বংশধারা শেষ হয়ে যাবে।

★★★★★

খোৎবা-২০৭

শালিসী[১] সম্পর্কে আমিরুল মোমেনিনের মনোভাবে তাঁর অনুচরগণ অসন্তোষ প্রকাশ করলে তিনি বললেন ঃ

হে জনমন্ডলী, আমার ও তোমাদের মধ্যে যে ব্যাপার হয়েছে তা হলো আমি চেয়েছিলাম তোমরা নিঃশেষিত হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাবে। আল্লাহ্‌র কসম, যদিও যুদ্ধ তোমাদের কতেক লোককে নিয়ে গেছে তবুও তোমাদের শত্রু সম্পূর্ণরূপে দুর্বল হয়ে পড়েছে। গতকাল পর্যন্ত আমি আদেশ দিচ্ছিলাম, আর আজ আমি আদিষ্ট হচ্ছি। গতকাল পর্যন্ত অন্যায় কাজ হতে বিরত থাকার জন্য আমি মানুষকে উপদেশ দিচ্ছিলাম, আর আজ আমাকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে। তোমরা এ পৃথিবীতে বাস করার প্রবল ইচ্ছা দেখিয়েছো। কাজেই তোমরা যা অপছন্দ কর তার প্রতি তোমাদেরকে টেনে আনা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

১। সিফফিনের যুদ্ধে সিরীয় সৈন্যগণ যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান হারিয়ে ফেলে পালিয়ে যাবার জন্য যখন প্রস্তুত হয়েছিল তখন মুয়াবিয়া তার চিরাচরিত ধূর্তামীর একটা কৌশল হিসাবে কুরআনকে ব্যবহার করেছিল। এতে ইরাকী সৈন্যদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হলো। তারা আমিরুল মোমেনিনের সকল উপদেশ অমান্য করে যুদ্ধে এক পাও এগুতে রাজী হলো না। অধিকন্তু যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য তারা জেদ ধরেছিল। এতে আমিরুল মোমেনিন শালিসীতে সম্মতি দিতে বাধ্য হলেন। এসব লোকের মধ্যে কতেক প্রকৃতপক্ষেই প্রতারিত হয়েছিল এবং তারা মনে করেছিল কুরআনকে মেনে চলার জন্যই বুঝি সত্যি সত্যি বলা হচ্ছিলো। আবার কিছু সংখ্যক লোক দীর্ঘ সময়ের যুদ্ধে ক্লান্ত হয়ে সাহস হারিয়ে ফেলেছিল। তারা এ সুযোগে যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য চিৎকার শুরু করে দিয়েছিল। আবার এমন কিছু লোক ছিল যারা খেলাফতের ক্ষমতার কারণে আমিরুল মোমেনিনের সঙ্গী হয়েছিল, কিন্তু তারা হৃদয় দিয়ে তাঁকে সমর্থন করতো না বা তাঁর বিজয়ও কামনা করতো না। এমন কতেক লোক ছিল যারা মুয়াবিয়ার কাছ থেকে অনেক কিছুর আশা পেয়েছিল এবং সেই আশা পূরণের জন্য মুয়াবিয়ার স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখেছিল। এ ছাড়াও এমন কতেক লোক ছিল যারা প্রথম হতেই মুয়াবিয়ার সাথে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। এমন একটা অবস্থায় এবং এমন প্রকৃতির সৈন্য নিয়ে এত বড় একটা যুদ্ধে জয়ের মুখোমুখী হওয়া শুধুমাত্র আমিরুল মোমেনিনের সৈন্য নিয়ন্ত্রণ কৌশল, রাজনৈতিক সক্ষমতা ও প্রশাসনিক দক্ষতার জন্যই সম্ভব হয়েছে। তাঁর সৈন্যগণ মুয়াবিয়ার ধূর্তামীর শিকার না হলে তাঁর জয় ছিল সুনিশ্চিত। কারণ সিরীয়দের শক্তি প্রায় নিঃশেষ হয়ে পড়েছিল এবং পরাজয় তাদের মাথার ওপর ঘুরপাক খাচ্ছিলো। এ ব্যাপারে ইবনে আবিল হাদীদ [১৫২] লিখেছেন ঃ

> *মালিক আশতার মুয়াবিয়ার কাছ পর্যন্ত পৌছে গিয়েছিল এবং তার ঘাড় আঁকড়ে ধরার অল্প বাকী ছিল। সিরীয়দের সকল শক্তি চুরমার হয়ে পড়েছিল। একটা মৃত টিকটিকির লেজ যেভাবে নড়াচড়া করে সিরীয়দের ঠিক তদ্রূপ নড়াচড়া পরিলক্ষিত হচ্ছিলো (১১শ খন্ড, পৃঃ ৩০-৩১)।*

★★★★★

খোৎবা-২০৮

আমিরুল মোমেনিন তাঁর অনুচর আ'লা ইবনে জিয়াদ আল-হারিছিকে দেখতে গিয়ে তার বিশাল বাড়ী দেখে বললেন ঃ

এ পৃথিবীতে এরকম বিশাল বাড়ী দিয়ে তুমি কি করবে? পরকালে তোমার এমন একটি বাড়ীর প্রয়োজন রয়েছে। যদি তুমি এ বাড়ীটি পরকালে নিয়ে যেতে চাও তবে এতে অতিথিদের আপ্যায়ন করো; আত্মীয়-স্বজনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ো এবং তাদের প্রতি তোমার যতটুকু দায়িত্ব রয়েছে তা পালন করো। এসব কাজ করলে এ বাড়ী তুমি পরকালে নিয়ে যেতে সক্ষম হবে।

আ'লা বললো ঃ হে আমিরুল মোমেনিন, আমি আমার ভ্রাতা আসিম ইবনে জিয়াদের বিরুদ্ধে আপনার কাছে অভিযোগ করতে চাই।

আমিরুল মোমেনিন বললেন ঃ সে কি করেছে?

আ'লা বললো ঃ সে একটা পশমী কোট পরে থাকে এবং পৃথিবীর সব কিছুর সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করেছে।

আমিরুল মোমেনিন বললেন ঃ তাকে আমার সামনে নিয়ে আস।

যখন সে সামনে এলো আমিরুল মোমেনিন তাকে বললেন ঃ ওহে, তুমি তো তোমার নিজের শত্রু। নিশ্চয়ই, শয়তান তোমাকে বিভ্রান্ত করেছে। তোমার স্ত্রী ও সন্তানদের জন্য কি তোমার কোন মায়া হয় না? আল্লাহ্ তোমার জন্য যা হালাল করেছেন তা পরিধান করলে তিনি তোমাকে অপছন্দ করবেন বলে কি তুমি মনে কর? আল্লাহ্র জন্য তুমি অতি গুরুত্বহীন যে তিনি এমনটি করবেন।

আসিম বললো ঃ হে আমিরুল মোমেনিন, আপনিও তো মোটা কাপড় পরিধান করেন এবং সাধারণ খাদ্য গ্রহণ করেন।

আমিরুল মোমেনিন বললেন ঃ তোমার ওপর লানত, আমি তোমার মত নই। নিশ্চয়ই, মহিমান্বিত আল্লাহ্ প্রকৃত নেতার জন্য এটা বাধ্যতামূলক করেছেন যে, তারা সমাজের নীচু স্তরের লোকদের সাথে সামঞ্জস্য রেখে জীবনযাপন করবেন যাতে গরীব-দুঃখীগণ তাদের দারিদ্রের[১] জন্য দুঃখ প্রকাশ না করে।

১। প্রাচীনকাল হতেই সংসারের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে তাপস জীবনযাপনকে আত্মার পবিত্রতা অর্জন করার ও চরিত্র গঠনের উপায় হিসাবে মনে করা হয়। ফলে যারা ভোগ-বিলাস ও পানাহারে সংযমী জীবনযাপন করা ও ধ্যানমগ্ন হয়ে থাকার ইচ্ছা করতো তারা শহর ও জনজীবনের বাহিরে চলে যেতো এবং বনে-জঙ্গলে বা পাহাড়ের গুহায় তাদের মতাদর্শ অনুযায়ী আল্লাহ্র ধ্যানে মগ্ন হয়ে থাকতো। কোন পথচারী বা পার্শ্ববর্তী বাসিন্দাদের কেউ কিছু খেতে দিলে তারা তা খেতো। অন্যথায় বন্য ফলমূল ও ঝর্ণার পানি খেয়ে তারা জীবন কাটাতো। শাসকদের অত্যাচার ও নিপীড়িনের ফল শ্রুতিতে এহেন ইবাদতের সূত্রপাত হয়। শাসকের হাত হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য কোন কোন লোক বনে-জঙ্গলে ও পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করে আল্লাহর ইবাদত ও ধ্যান করতে বাধ্য হয়েছিল। এভাবে সূত্রপাত হয়েই পরবর্তীতে এ ধরনের ইবাদত মানুষ স্বেচ্ছায় বরণ করে নিতে থাকে। ফলে ইহা স্বীকৃত হয়ে গেল যে, আত্মিক উন্নতির জন্য জাগতিক বন্ধন ছিন্ন করে এহেন জীবনযাপন করতে হবে। শতাব্দীর পর শতাব্দী হতে এ পদ্ধতির ইবাদত চলে আসছে। বর্তমানেও বৌদ্ধ এবং খৃষ্টানদের মধ্যে এ পদ্ধতি দেখা যায়।

ইসলাম এহেন সন্যাস জীবনের অনুমোদন দেয় না। কারণ আত্মিক উন্নতি অর্জনের জন্য জাগতিক কর্মকান্ড পরিত্যাগের স্বীকৃতি ইসলামে নেই। কোন মুসলিম তার ঘর-সংসার ও পরিবার-পরিজনদের ত্যাগ করে গোপন স্থানে আনুষ্ঠানিক ইবাদতে নিজেকে মশগুল করে রাখবে—এরূপ ইবাদতের অনুমোদন ইসলামে নেই। ইসলামে ইবাদতের ধারণা শুধুমাত্র কতিপয় নির্ধারিত অনুষ্ঠান নয়। ইহা এত ব্যাপক যে, হালাল উপায়ে জীবিকা অর্জন, একে অন্যের প্রতি সহানুভূতিশীলতা, অন্যের সাথে সদাচরণ এবং সৎ ও কল্যাণকর কাজে সহযোগিতা—এসব কিছু ইবাদতের পর্যায়ভুক্ত। যদি কোন ব্যক্তি জাগতিক দায়িত্ব ও কর্তব্যে অবহেলা করে, তার সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীর প্রতি দায়িত্ব পালন না করে এবং জীবিকা অর্জনের চেষ্টা না করে সারাক্ষণ ধ্যানে মগ্ন থাকে সে নিজেকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায় এবং সে বাঁচার উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ করে না। সব কিছু ত্যাগ করে ইবাদত ও ধ্যানে মগ্ন থাকাই যদি আল্লাহ্র উদ্দেশ্য হতো তবে মানুষ সৃষ্টির কোন প্রয়োজন ছিল না। কারণ এহেন ইবাদতের জন্য তো ফেরেশতাই যথেষ্টা ছিল।

আল্লাহ্ মানুষকে চৌরাস্তায় দাঁড় করিয়েছেন যেখানে মধ্য-পথই হেদায়েতের কেন্দ্রবিন্দু। এ মধ্যপথ হতে একটুখানিক এদিক সেদিক হলেই তা নির্ঘাত পথভ্রষ্টতা ছাড়া আর কিছু নয়। এ মধ্যপথ হলো কেউ জাগতিক বিষয়ে এমনভাবে ঝুঁকে পড়তে পারবে না যাতে সে পরকালকে ভুলে সম্পূর্ণরূপে দুনিয়াদারিতে ডুবে থাকবে। আবার সে জাগতিক সবকিছু পরিত্যাগ করে নির্জনে নিজকে অবরুদ্ধ রেখে ইবাদত করে কাটাতে পারবে না। যেহেতু আল্লাহ্ এ পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টি করেছেন সেহেতু বেঁচে থাকার জন্য তাকে জীবনের কোড অনুসরণ করতে হবে এবং আল্লাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত নেয়ামত ও আরাম-আয়েশ পরিমিতভাবে ভোগ করতে হবে। হালাল জিনিস খেতে ও ব্যবহার করতে আল্লাহ্ নিষেধ করেননি। কাজেই

এটা আল্লাহ্‌র ইবাদতের বিরোধীও নয়। বরং আল্লাহ্‌ এসব জিনিস সৃষ্টি করেছেন যেন মানুষ এসবের সুযোগ গ্রহণ করে শুকরিয়া আদায় করে। এ জন্যই আল্লাহ্‌র নবীগণ পৃথিবীতে অন্যদের সাথে বসবাস করতেন এবং অন্যদের মতই পানাহার করতেন। তাঁরা বনে-জঙ্গলে বা পাহাড়ের গুহায় নির্জন স্থানে বাস করার বা দুনিয়ার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করার প্রয়োজনীয়তা কখনো অনুভব করেননি।

অপরপক্ষে তাঁরা আল্লাহ্‌র জেকের করেছেন, জাগতিক কর্মকান্ডেও নিজেদেরকে সম্পূর্ণ জড়িয়ে রাখেননি এবং আনন্দ ও উপভোগের মাঝেও মৃত্যুকে ভুলে থাকেননি।

তাপস জীবন অনেক সময় এমন মন্দ অবস্থার সৃষ্টি করে যাতে ইহকাল ও পরকাল উভয়ই ধ্বংস হয়ে যায়। মানুষের প্রাকৃতিক প্রণোদনাসমূহ হালাল উপায়ে মিটানো না হলে মনে কুধারণার সৃষ্টি হয় এবং তাতে শান্তি ও মনোনিবেশ সহকারে ইবাদতের বিঘ্ন ঘটে। কখনো কখনো মানুষের অতৃপ্ত আবেগ ও অনুরাগ তাপসভাবকে পরাভূত করে সকল নৈতিক বেড়ি ছিন্ন করে দেয় এবং এমনভাবে অন্যায়ে লিপ্ত করে দেয় যে, নফসের খাহেশ মিটাতে গিয়ে সে ধ্বংসের অতল তলে তলিয়ে যায়। এ কারণেই ধর্মীয় বিধান একজন পরিবারবদ্ধ লোকের ইবাদতকে অপরিবারবদ্ধ লোকের ইবাদতের উর্ধ্বে স্থান দিয়েছে।

যে সব লোক সুফিবাদের আলখিল্লা পরে তাদের আত্মিক বড়ত্বের বাগাড়াম্বর করে তারা প্রকৃতপক্ষে ইসলামের পথ হতে সরে গেছে এবং ইসলামের প্রশস্ত শিক্ষা সম্পর্কে তারা অজ্ঞ। শয়তান তাদেরকে বিপথগামী করেছে এবং তারা তাদের স্বরচিত ধারণার বশবর্তী হয়ে ভ্রান্ত পথে পদাচারণা করে। তাদের গোমরাহী এতদূর পর্যন্ত গেছে যে, তারা নেতার কথাকে আল্লাহ্‌র কথা এবং নেতার কাজকে আল্লাহ্‌র কাজ বলে মনে করে। কখনো কখনো এরা নিজেদেরকে ধর্মীয় সকল বিধি-বিধান ও সীমার উর্ধ্বে মনে করে এবং সকল পাপ কাজকে তাদের জন্য বৈধ মনে করে। ইমান হতে এহেন স্খলন ও ধর্মহীনতাকে 'সুফিবাদ' (আল্লার প্রতি সম্পূর্ণ আসক্তি) নাম দেয়া হয়েছে। ইহার অবৈধ নিয়মনীতিকে বলা হয় 'তরিকা' এবং এর অনুসারীকে বলা হয় 'সুফী'। সর্বপ্রথম আবু হাশীম আল-কুফী ও শ্যামী এ নাম ধারণ করেছিল। সে ছিল উমাইয়া বংশোদ্ভুত ও অদৃষ্টবাদী (সে বিশ্বাস করতো মানুষ যা কিছু করে তা আল্লাহ্‌ কর্তৃক পূর্ব নির্ধারিত)। তাকে সুফী বলার কারণ ছিলো, সে দরবেশী ও আল্লাহ্‌র ভয় জাহির করার জন্য পশমী আলখিল্লা পরিধান করতো। পরবর্তীতে এ নাম সর্বত্র ব্যবহৃত হতে লাগলো এবং সুফী নামের মূল হিসাবে বহু কারণ বের করা হলো। উদাহরণ স্বরূপ, সুফী শব্দে আরবী তিনটি বর্ণ রয়েছে- 'ছোয়াদ', 'ওয়াও' এবং ফে'। সুফীরা মনে করে 'ছোয়াদ' দ্বারা ছবর (ধৈর্য), সিদক (সত্যবাদীতা) ও সাফা (পবিত্রতা); 'ওয়াও' দ্বারা উদ (প্রেম), উরদ (আল্লাহ্‌র নাম জপ) ও ওয়াফা (আল্লাহ্‌র প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস) এবং 'ফে' দ্বারা ফরদ (ঐক্য), ফকর (দীনহীনভাব) ও ফানা (ঐশীপ্রেমে আত্ম বিলয়) বুঝায়। সুফী শব্দ সম্পর্কে দ্বিতীয় মত হলো—এটা সুফ্‌ফা শব্দ হতে আগত। সুফ্‌ফা হলো মসজিদে নব্বীর একটা বারান্দা। সেখানে যারা থাকতো তাদের বলা হতো অসাহাবুস সুফ্‌ফা (বারান্দার অধিবাসী)। সুফী শব্দ সম্পর্কে তৃতীয় মত হলো— আরবের একটা গোত্রের আদিপুরুষের নাম ছিল সুফাহ্‌। এগোত্রের লোকেরা কাবা ও হাজীদের সেবা করার কাজে নিয়োজিত ছিল। সে কারণে পরবর্তীতে এ কাজে নিয়োজিতদেরকে সুফী বলা হতো।

সুফীগণ বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত। তন্মধ্যে ৭টি উপদল প্রধান।

এরা হলো ঃ-

(১) ওয়াহ্‌দাতিয়া (মৌলিক একত্ববাদ) ঃ এ উপদল সকল অস্তিত্বের একত্বে বিশ্বাস করে। এরা মনে করে পৃথিবীর কোন কিছু হতে আল্লাহ্‌ ভিন্ন নন—সবকিছুতেই আল্লাহ্‌। এমন কি দূষিত বস্তুসমূহকেও এরা তাই মনে করে। এরা নদী ও নদীর তরঙ্গমালাকে আল্লাহ্‌র সঙ্গে তুলনা করে। এরা যুক্তি দেখায় যে, তরঙ্গ কখনো ফুলে উঠে আবার কখনো পড়ে যায়- তাতে কিন্তু নদীর বাহিরে তরঙ্গের কোন অস্তিত্ব নেই। তরঙ্গের অস্তিত্ব নদীর অস্তিত্বের মতই। কাজেই কোন কিছুকে তার মৌলিক অস্তিত্ব হতে আলাদা করা যায় না।

(২) ইত্তিহাদিয়াহ্‌ (ঐক্যবাদী)ঃ এ উপদল বিশ্বাস করে যে, তারা আল্লাহ্‌তে একীভূত হয়ে আছে এবং আল্লাহ্‌ও তাদের সাথে একীভূত হয়ে আছে। এরা আল্লাহ্‌কে আগুন হিসাবে ধরে নিয়ে নিজেদেরকে আগুনে পড়ে থাকা লোহা মনে করে এবং নিজেদেরকে আগুনে পোড়া লোহার গুণার্জিত বলে মনে করে।

(৩) হুলুলিয়া (স্বরূপবাদী) ঃ এ উপদল বিশ্বাস করে, যারা আল্লাহ্‌কে জানার দাবী করে এবং যারা পূর্ণতা (ইনসানুল কামেল) অর্জন করেছে আল্লাহ্ তাদের স্বরূপ পরিগ্রহ করেন। এরা মনে করে পূর্ণতা প্রাপ্ত মানবদেহ আল্লাহ্‌র বাসস্থান। এধরনের পূর্ণমানব দৃশ্যতঃ মানুষ কিন্তু বাস্তবে এরা আল্লাহ্।

(৪) ওয়াসিলিয়াহ্ (মিলনবাদী) ঃ এ উপদল নিজদেরকে আল্লাহ্‌র সাথে মিলিত বলে মনে করে। এরা বিশ্বাস করে শরিয়তের বিধি-বিধান মানুষের ব্যক্তিত্ব ও চারিত্রিক উন্নতির একটা উপায় মাত্র। মানব সত্তা যখন আল্লাহ্‌র সাথে মিলিত হয়ে যায় তখন তার আর কোন পূর্ণতা বা উন্নতির প্রয়োজন হয় না। ফলে 'ওয়াসিলিন'- এর জন্য ইবাদত ও অনুষ্ঠান অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। কারণ তারা মনে করে, যখন সত্য ও বাস্তব সত্তা অর্জিত হয় তখন শরিয়তের বিধি-বিধান পালন করা অর্থহীন। ফলে তারা যা খুশী করতে পারে এবং তজ্জন্য জবাবদিহি হতে হবে না।

(৫) জাররাকিয়াহ্ (প্রমোদবাদী) ঃ এ উপদল মৌখিক ও বাদ্যযন্ত্রের সুরকে ইবাদত মনে করে। এরা দ্বারে দ্বারে গান গেয়ে ভিক্ষা করে এবং দরবেশী দেখিয়ে দুনিয়ার আনন্দ উপভোগ করে। এরা সর্বদা এদের নেতা সম্পর্কে বানোয়াট কাহিনী ও অলৌকিক ঘটনা বর্ণনা করে যাতে সাধারণ মানুষ বিস্ময়াভিভূত হয়।

(৬) উশশাকিয়াহ্ (প্রেমবাদী বা ভাববাদী) ঃ এ উপদলের মতবাদ হলো প্রেমের ব্যাকুলতাই মহাসত্য ও বাস্তব সত্তা অর্জনের একমাত্র উপায়। তারা মনে করে, ইন্দ্রিয়গত প্রেম আল্লাহ্‌র প্রেম অর্জনের উপায়। আল্লাহ্‌র প্রেমের পর্যায়ে পৌছার জন্য কোন মানব সত্তার প্রতি প্রেমাসক্ত হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। কিন্তু যে প্রেমকে তারা ঐশীপ্রেম বলে মনে করে তা মানসিক বৈকল্য ছাড়া আর কিছু নয় এবং এসব কথার মূল উদ্দেশ্য হলো প্রিয়াকে ভোগ করা। এ ধরনের প্রেম মানুষকে পাপ ও অন্যায়ের দিকে নিয়ে যেতে পারে। আল্লাহ্‌র প্রেমের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই।
একজন পারস্য কবি বলেছেন ঃ

সত্যি বলতে কি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রেম জীনের মত আর জীন থেকে কোন হেদায়েত লাভ করা যায় না।

(৭) তালকিনিয়াহ্ (অভিজ্ঞতাবাদী) ঃ এ উপদলের মতে ধর্মীয় বিজ্ঞান ও বই-পুস্তক পড়া অবৈধ। বরঞ্চ সুফীদের কাছে আত্মিক উন্নতির জন্য এক ঘন্টা বসে চেষ্টা করলে যা পাওয়া যাবে তা সত্তর বছর বই পড়েও অর্জন করা যাবে না।

শিয়া আলেমদের মতে এ উপদলগুলো ভ্রান্ত পথে চলে গেছে। এরা ইসলামের সীমালঙ্ঘন করেছে। এতদবিষয়ে ইমামগণের অনেক বাণী রয়েছে। এ খুৎবায় আমিরুল মোমেনিন আসিম ইবনে জিয়াদের দুনিয়ার সাথে সম্পর্কচ্ছেদকে শয়তানের কর্মকান্ড বলে উল্লেখ করেছেন এবং এপথ থেকে দূরে থাকার জন্য জোর দিয়ে তাকে নির্দেশ দিয়েছেন (এ বিষয়ে অধিক জানতে হলে খুই [৫৮], ১৩শ খন্ড, পৃঃ ১৩২-৪১৭; ১৪শ খন্ড, পৃঃ ২-২২ পড়া যেতে পারে)।

(উপর্যুক্ত টীকার সাথে বাংলা অনুবাদক দ্বিমত পোষণ করে। সুফী-দর্শনের মূল বিষয় সম্পর্কে টীকাকারকের জ্ঞানের দৈন্যতার কারণে তিনি ধর্মের দর্শনকে ত্যাগ করে অনুষ্ঠানকে প্রাধান্য দিয়েছেন। সে কারণেই তিনি কোন বক ধার্মিকের চাল-চলন ও আচার-আচরণকে সুফী দর্শন বলে আখ্যায়িত করেছেন। শিয়া আলেমগণ ইসলামের দর্শন তথা আমিরুল মোমেনিনের মৌলিক দর্শন হতে কতটুকু সরে গেছে তা সকলের জানা আছে। কারবালার মূল দর্শনের প্রতি কোনরূপ ভ্রুক্ষেপ না করে তাজিয়া নিয়ে রাস্তায় মাতামাতি করে ইসলামের মৌলিক বিষয়ে কোন উন্নতি হচ্ছে কিনা তারাই বলতে পারেন। ইমাম আলী কর্তৃক প্রদর্শিত পথই হলো সুফী দর্শন। অসহাবুস সুফফাগণ রাসূলের (সঃ) সময়কার সুফী। ইমাম আলী সুফী দর্শন ও আরবী ভাষার স্ট্যান্ডার্ড। তিনি সুফী দর্শনের আদি পুরুষ। কিন্তু টীকাকারক বৈষ্ণববাদ ও সুফী দর্শনের মধ্যে তালগোল পাকিয়ে ফেলেছেন। ইমাম আলীর সুফী দর্শন পরবর্তীতে বহু ইসলামিক দার্শনিক বিভিন্নভাবে থিওরীবদ্ধ করেছেন, যেমন- ইবনুল আরাবীর সর্বেশ্বরবাদ, জালালউদ্দিন রুমীর প্রেমবাদ, মনসুর হাল্লাজের বিনাশনবাদ (আনাল হক), খাজা মঈনউদ্দিন চিশতীর প্রত্যক্ষণবাদ, লালন শাহের ভাববাদ ইত্যাদি। দার্শনিক ধারণা ও থিওরী বাদ দিয়ে টীকাকারক ইসলামকে অনুষ্ঠান সর্বস্ব করে কুরআনিক দর্শন খর্ব করেই দিতে চেয়েছেন। কুরআনের দর্শন ও আনুষ্ঠানিক ইবাদত-এ দুয়ের সামঞ্জস্য বিধানই হলো প্রকৃত ইসলামী জীবন। দর্শন বর্জিত ইবাদত যেমন রূঢ়তা ইবাদত বর্জিত দর্শনও তেমনি ফাঁপা চিন্তা মাত্র—বাংলা অনুবাদক)।

★★★★★

খোৎবা-২০৯

কেউ একজন[১] বানোয়াট হাদীস ও মানুষের মধ্যে প্রচলিত রাসুলের (সঃ) পরস্পর বিরোধী বক্তব্য সম্পর্কে আমিরুল মোমেনিনকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন ঃ

নিশ্চয়ই, আজ মানুষের মাঝে যা প্রচলিত হয়ে আছে উহাতে সত্য-মিথ্যা ও শুদ্ধ-অশুদ্ধের সংমিশ্রণ রয়েছে। এ সবের কিছু কিছু বাতিল যোগ্য এবং কিছু কিছু বাতিলকৃত; কিছু কিছু সাধারণ ও কিছু কিছু বিশেষ; কিছু কিছু নির্দিষ্ট ও কিছু কিছু অনির্দিষ্ট; কিছু কিছু অবিকল ও কিছু কিছু অনুমান আশ্রিত। এমনকি রাসুলের (সঃ) জীবৎকালেও তাঁর নামে মিথ্যা বক্তব্য চালানো হয়েছিল। সে জন্য তিনি বলেছিলেন, "যে ব্যক্তি আমার নাম দিয়ে কোন মিথ্যা বিষয় চালিয়ে দেয় সে নিজের জন্য দোযখে স্থায়ী আবাস তৈরী করে।" যারা হাদীস বর্ণনা করে তারা চার শ্রেণীর[২] বেশী নয়।

প্রথম ঃ মিথ্যাবাদী ও মোনাফিক

মোনাফিক সে ব্যক্তি যে ইমানের ভান করে এবং বাহ্যিক আবরণে ও অবয়বে মুসলিমের ভাব দেখায়। এরা পাপে লিপ্ত হতে কোন দ্বিধা করে না এবং পাপ হতে দূরে সরে থাকার চেষ্টাও করে না। এরা ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহ্‌র নবীর নামে মিথ্যা কথা বানিয়ে বলে। মানুষ যদি জানতে পারতো যে, এরা মোনাফিক ও মিথ্যাবাদী তাহলে কখনো তাদের কথা গ্রহণ করতো না এবং এদের কথা বিশ্বাস করতো না। বরং মানুষ মনে করে এরা আল্লাহ্‌র নবীর সাহাবি, তাঁর দেখা পেয়েছে, তাঁর মুখনিঃসৃত বাণী শুনেছে এবং তাঁর কাছ থেক জ্ঞানার্জন করেছে। এ কারণে মানুষ তাদের কথা গ্রহণ করে। মহিমান্বিত আল্লাহ্ মোনাফিক সম্পর্কে তোমাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন এবং তাদের সম্পর্কে তোমাদের কাছে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। রাসুলের (সঃ) পরে তারা তাদের মিথ্যার বেসাত চালিয়ে যাচ্ছে। গোমরাহীর নেতা ও মিথ্যার মাধ্যমে দোযখের দিকে আহবানকারীদের কাছে তারা উচ্চ মর্যাদা লাভ করেছে। সুতরাং তারা এদেরকে উচ্চপদে আসীন করেছে; অফিসার বানিয়ে জনগণের মাথার ওপর বসিয়েছে এবং এদের মাধ্যমে সম্পদ স্তূপীকৃত করেছে। আল্লাহ্ যাদের রক্ষা করেন তারা ছাড়া সকল মানুষ শাসকদের পেছনে ও দুনিয়ার পেছনে থাকে।

দ্বিতীয় ঃ যারা ভুল করে

কিছু কিছু লোক আছে যারা রাসুলের (সঃ) মুখনিঃসৃত বানী শুনেছে কিন্তু তা অবিকল মনে রাখতে পারেনি। এরা রাসুলের (সঃ) বানীকে সংক্ষিপ্তাকারে নিজের থেকে বর্ণনা করতে গিয়ে অনুমানভিত্তিক কথা বলে। এরা ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বলে না। এরা যেভাবে হাদীস বর্ণনা করে সেভাবে আমলও করে এবং দাবী করে, "আমি আল্লার নবীর মুখে একথা শুনেছি।" যদি মানুষ জানতে পারতো যে, এদের বর্ণনায় ভুল রয়েছে তাহলে কেউ তা গ্রহণ করতো না। এমন কি এরা নিজেরাও যদি বুঝতে পারতো যে, এরা ভুল বর্ণনা করছে তবে এরা নিজেরা তা পরিত্যাগ করতো।

তৃতীয় ঃ যারা অজ্ঞ

এরা এমন লোক যারা হয়ত শুনেছে রাসুল (সঃ) কোন কিছু করতে বলেছেন। কিন্তু পরবর্তীতে হয়ত রাসুল (সঃ) সে কাজ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন— এরা তা শুনেনি। আবার, হয়ত রাসুল (সঃ) কোন কিছু করতে বারণ করেছেন- এরা তা শুনেছে। কিন্তু পরবর্তীতে হয়ত তিনি তা করার অনুমতি দিয়েছেন-এরা তা শুনেনি। এরা যেটুকু আংশিক শুনেছে সেটুকু বর্ণনা করে। এতে প্রকৃত অবস্থার বিপরীত হয়ে যায়। আবার অনেক সময় এরা

নিজেদের অজ্ঞতার কারণে রাসুলের বক্তব্যের অন্তর্নিহিত অর্থ বা ব্যাখ্যা বুঝতে পারেনি- এমনকি রাসুলকে (সঃ) জিজ্ঞেস করেও অন্তর্নিহিত ভাব জেনে নেয়নি। নিজেরা যেভাবে বুঝেছে সেভাবে বর্ণনা করছে। যদি মুসলিমগণ এদের অজ্ঞতার বিষয় জানতে পারতো তাহলে তারা এদের বর্ণনা গ্রহণ করতো না।

চতুর্থ ঃ যারা সত্যিকারভাবে অবিকল মনে রাখতে পেরেছে

এ ধরনের লোক কখনো আল্লাহ্ ও রাসুলের বাণী সম্পর্কে কোন মিথ্যা কথা বলে না। আল্লাহ্র ভয়ে এরা মিথ্যাকে ঘৃণা করে এবং আল্লাহ্র নবীকে সম্মান করে। এরা ভুল করে না এবং রাসুলের কাছে যা শুনেছে তা অবিকল মনে রাখে। এরা যা শুনেছে তাতে কোন কিছু সংযোজন ও বিয়োজন না করে অবিকল বর্ণনা করে। রাসুল (সঃ) যেভাবে বলেছেন এরা সেভাবেই আমল করে। যখন কিছু করতে বলেছেন তখন সেভাবে করেছে। আবার যখন নিষেধ করেছেন অমনি তা পরিত্যাগ করেছে। এরা রাসুলের কথার সাধারণ ও বিশেষ অর্থ বুঝতে পেরেছে এবং যথোপযুক্ত গুরুত্বসহকারে রাসুলের কথার সুনির্দিষ্ট ও অনির্দিষ্ট ভাব জানতে পেরেছে।

রাসুলের বাণী দু'ভাবে অর্থ করা যায়— একটি হলো বিশেষ বা গুঢ়ার্থবোধক এবং অপরটি হলো সাধারণ বা ভাসার্থবোধক। কখনো কখনো এমন হয়েছে যে, একজন লোক রাসুলের বাণী শুনেছে কিন্তু এতে মহিমান্বিত আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুল কি বুঝাতে চেয়েছেন সে শ্রোতা তা বুঝতে পারেনি। ফলে এ ধরনের শ্রোতা তাঁর বাণী মনে রেখেছে বটে, কিন্তু এর প্রকৃত অর্থ কী বা একথা বলার প্রকৃত উদ্দেশ্য ও কারণ বুঝতে পারেনি। আল্লাহ্র নবীর সাহাবাগণের মধ্যে অনেকেই তাঁকে প্রশ্ন করে বা জিজ্ঞেস করে তাঁর কাছ থেকে কোন কিছুর অর্থ জেনে নেয়ায় অভ্যস্ত ছিল না। কোন বেদুঈন বা আগন্তুক এসে তাঁকে প্রশ্ন করবে এবং তাতে তারা মনে করতো তারাও শুনে অর্থ জেনে নিতে পারবে। আমি এরূপ বিষয় তাঁকে জিজ্ঞেস করে প্রকৃত অর্থ জেনে নিতাম এবং তা সংরক্ষণ করতাম। হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন মতের কারণই এগুলো।

১। এ লোকটির নাম হলো সুলায়েম ইবনে কায়েস আল-হিলালী। ইনি আমিরুল মোমেনিনের মাধ্যমে হাদীস বর্ণনা করতেন।

২। এ খোৎবায় আমিরুল মোমেনিন হাদীসের রাবীগণকে চার শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন ঃ

প্রথম শ্রেণী হলো তারা যারা বানোয়াট হাদীস বর্ণনা করে রাসুলের নামে চালিয়ে দিয়েছে। একথা অস্বীকার করার কোন যো নেই যে, রাসুলের (সঃ) সহী হাদীস যখন প্রকাশ পেতে লাগলো তখন বিভিন্ন দল তাদের স্বার্থে মিথ্যা হাদীস রাসুলের নামে চালিয়ে দিয়েছিল। এ কথা কেউ অস্বীকার করলে সে তা জ্ঞানের ভিত্তিতে নয়- শুধু তর্কের খাতিরে অস্বীকার করবে। একবার আলামুল হুদা সাঈদ মুরতাজা কিছু সংখ্যক সুন্নী উলামার সাথে তর্কে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। সাঈদ মুরতাজা ঐতিহাসিক ঘটনাবলী বর্ণনা করে প্রমাণ করলেন যে, সাহাবাগণের মর্যাদা সম্পর্কে প্রচলিত হাদীসগুলোর সব ক'টি বানোয়াট ও মিথ্যা। সুন্নী উলামাগণ যুক্তি দেখালেন যে, কেউ মিথ্যা হাদীস রচনা করে রাসুলের নামে চালিয়ে দেয়ার সাহস করবে একথা অবিশ্বাস্য ও অসম্ভব। তখন সাঈদ মুরতাজা একটা সহী হাদীসের কথা উল্লেখ করে বলেন যে, রাসুল (সঃ) বলেছেন ঃ

> *আমার মৃত্যুর পর আমার নামে অসংখ্য মিথ্যা বিষয় প্রচলিত হবে এবং যে কেউ আমার নাম দিয়ে মিথ্যা প্রচার করবে সে দোযখে নিজ আবাস তৈরী করবে। (বুখারী[১০২], ১ম খন্ড, পৃঃ ৩৮; ২য় খন্ড, পৃঃ ১০২; ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ২০৭; ৮ম খন্ড, পৃঃ ৫৪; নায়সাবুরী[৮৩], ৮ম খন্ড, পৃঃ ২২৯; আশাছ[১৮], ৩য় খন্ড, পৃঃ ৩১৯-৩২০; তিরমিযী[৮০], ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ৫২৪; ৫ম খন্ড, পৃঃ ৩৫-৩৬, ৪০, ১৯৯, ৬৩৪; মাযাহ[১০৫], ১ম খন্ড, পৃঃ ১৩-১৫)।*

যদি কেউ মনে করে এ হাদীসটি সত্য তা হলে সে অবশ্যই একমত হবে যে, রাসুলের (সঃ) নামে অনেক মিথ্যা বিষয় চালিয়ে দেয়া হয়েছে। আবার যদি কেউ মনে করে এ হাদীসটি মিথ্যা তাহলে রাসূলের (সঃ) নামে মিথ্যা বিষয় চালিয়ে

দেয়ার প্রমাণ এ হাদীসটিই বহন করে। যাহোক, যাদের হৃদয় ছিল মুনাফেকিতে পরিপূর্ণ, যারা দ্বীনে ফেতনা ও বিভেদ সৃষ্টি করে দুর্বল ইমানসম্পন্ন মুসলিমদেরকে পথভ্রষ্ট করে স্বীয় স্বার্থ হাসিলের জন্য দলে ভিড়িয়েছিল তারাই রাসুলের নামে মিথ্যা হাদীস রচনা করেছিল। এ ধরনের লোক রাসুলের জীবদ্দশায়ও ছিল যারা মোমিনগণের সাথেই মিশে থাকতো এবং সারাক্ষণ মুসলিমের অকল্যাণ ও ক্ষতির চিন্তায় ব্যস্ত থাকতো। রাসুলের ইনতিকালের পর এ ধরনের লোকের সংখ্যা আরো বেড়ে গিয়েছিল এবং তাদের অসৎ কর্মতৎপরতায় আরো মনোযোগী হয়ে পড়েছিল। এরা ইসলামের মহান শিক্ষা ও আদর্শে নানা প্রকার বিকৃতি ও পরিবর্তন করতে দ্বিধা করতো না। কারণ রাসুলের জীবদ্দশায় তারা কিছুটা ভয়ে থাকতো পাছে তিনি তাদের মোনাফেকী ফাঁস করে দিয়ে লজ্জায় ফেলে দেন। কিন্তু রাসুলের পর তাদের সে ভয় কেটে গেছে। বিভিন্নভাবে এরা ক্ষমতাধর হয়ে স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির জন্য এ রকম মোনাফেকী করার পরও জনগণ তাদেরকে অবিশ্বাস করতো না। কারণ তারা দাবী করতো যে, তারা রাসুলের সাহাবা এবং যা বলে তা সত্য ও সঠিক। এরাই নিজেদের জন্য হাদীস বানিয়ে নিল— "রাসুলের সাহাবাগণ যে কোন প্রকার সমালোচনা ও প্রশ্নের উর্দ্ধে; তাদের কোন কাজের আলোচনা-পর্যালোচনা করা যাবে না এবং তাদের কাজের তিরস্কার করা যাবে না।" আমিরুল মোমেনিন এহেন উক্তির মুখ থুবড়ে দিয়ে বলেন ঃ

> *এসব লোক গোমরাহীর নেতার কাছে মর্যাদা লাভ করেছে এবং এরা মিথ্যা ও অপবাদের মাধ্যমে দোযখের দিকে আহ্বানকারী। সুতরাং এসব নেতারা মোনাফেকদেরকে উচ্চপদে পদায়ন করে জনগণের মাথার ওপর বসিয়ে দিয়েছিল।*

মোনাফিকগণ ইসলামের ক্ষতি সাধনের পাশাপাশি সম্পদ স্তূপীকৃত করেছিল। মুসলিমের মুখোশ পরে তারা যথেচ্ছভাবে বানোয়াট হাদীস বর্ণনা করে ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলীতে বিভেদ সৃষ্টি করে তাদের স্বার্থসিদ্ধি করেছিলো। ইবনে আবিল হাদীদ লিখেছেন ঃ

> *যখন তারা যদৃচ্ছভাবে চলার সুযোগ পেল তখন তারা ইসলামের অনেক কিছু পরিত্যাগ করেছিলো। যখন মানুষ তাদের কর্মকান্ড সম্পর্কে নিশ্চুপ থাকতো তখন তারাও ইসলাম সম্পর্কে নিশ্চুপ থাকতো। কিন্তু তারা তলে তলে মিথ্যার জাল বুনায় তৎপর থাকতো যা আমিরুল মোমেনিন পরোক্ষভাবে উল্লেখ করেছেন। এ সব লোক রাসুলের হাদীসে অনেক মিথ্যার সংমিশ্রণ ঘটিয়েছে— যাদের লক্ষ্য ছিল মানুষের ইমানে ফাটল ধরিয়ে গোমরাহীর দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া। অপরপক্ষে এদের কারো কারো লক্ষ্য ছিল কোন বিশেষ দলের উচ্চ প্রশংসা করা- যাদের সঙ্গে এদের জাগতিক বিষয়াবলীর স্বার্থ সংশ্লিষ্টতা ছিল।*

এ সময় অতিবাহিত হবার পর যখন মুয়াবিয়া ধর্মের নেতৃত্ব ও ইহকালীন কর্তৃত্বের সিংহাসন দখল করেছিলো তখন সে মিথ্যা হাদীস রচনা করে তাতে জনমত গঠন করার জন্য একটি সরকারী বিভাগ খুলেছিলো। সে তার অফিসারদেরকে নির্দেশ দিয়েছিল যেন তারা আহলুল বাইতের মর্যাদাহানিকর হাদীস রচনা করে তা জনপ্রিয় করে তোলে। একই সাথে সে আদেশ দিয়েছিল যেন তারা (অফিসারগণ) উসমান ও উমাইয়াদের উচ্চকিত প্রশংসা চারিদিকে ছড়িয়ে দেয়। এ কাজের জন্য সে পুরস্কার ঘোষণা করে এবং জমি বরাদ্দ দেয়। ফলে হাদীস গ্রন্থগুলোতে অসংখ্য স্বঘোষিত বানোয়াট বক্তব্য স্থান লাভ করে । আবুল হাসান আল মাদায়নীর 'কিতাবুল আহদাছ" হতে ইবনে আবিল হাদীদ উদ্ধৃত করেছেন ঃ

> *মুয়াবিয়া তার অফিসারদের কাছে লিখেছিল যে, তারা যেন সেসব লোকের প্রতি বিশেষ যত্নশীল থাকে যারা উসমানের কথা বলে, তার শুভাকাঙ্খী ও তাকে ভালবাসে। যারা উসমানের উচ্চ মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে হাদীস বর্ণনা করে তাদেরকে যেন বিশেষ পদমর্যাদা ও সম্মান প্রদান করা হয় এবং রাবীর নাম, পিতার নাম ও গোত্র পরিচয়সহ যেন হাদীসটি তার কাছে প্রেরণ করা হয়। মুয়াবিয়া কর্তৃক প্রদত্ত সরকারী মর্যাদা, জমি, পোষাক ও অন্যাবিধি পুরস্কারের ফলে উসমানের প্রশংসাসূচক হাদীস স্তূপীকৃত হয়ে গেল।*

উসমানের উচ্চ মর্যাদা সম্পর্কীয় এসব বানোয়াট হাদীস যখন রাজ্যময় ছড়িয়ে দেয়া হলো তখন পূর্ববর্তী খলিফাদের মর্যাদা যাতে ক্ষুন্ন না হয় সে জন্য মুয়াবিয়া তার অফিসারগণকে লিখেছিল—

আমার এ আদেশ পাওয়া মাত্র তোমরা জনগণকে বলো যেন তারা সাহাবাগণ ও অন্য খলিফাদেরও প্রশংসাসূচক হাদীস তৈরী করে এবং সাবধান থেকো, যদি কোন লোক আবু তুরাব (আলী) সম্পর্কে কোন হাদীস বলে তবে তোমরাও অন্য সাহাবাগণ সম্বন্ধে অনুরূপ হাদীস রচনা করো। মনে রেখো, এতে আমি আনন্দিত হবো এবং আমার চক্ষু শীতল হবে। এতে আবু তুরাব ও তার দলের মর্যাদা ক্ষীণ হয়ে পড়বে এবং উসমান বিশেষভাবে মর্যাদাশীল হবে।

মুয়াবিয়ার এ পত্রের বিষয় জনগণকে জানানোর পর সাহাবাগণের উচ্ছসিত প্রশংসাসূচক অসংখ্য বানোয়াট হাদীস লোকেরা বর্ণনা করেছিল, সত্যের সাথে যেগুলির কোন সংশ্রব ছিল না (হাদীদ[১৫২], ১১শ খন্ড, পৃঃ ৪৩-৪৭)।

এ বিষয়ে প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ আবু আবদুল্লাহ্ ইব্রাহীম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আরাফাহ্ (ডাক নাম নিফতাওয়াহ্— হিঃ ২৪৪-৩২৩ সন)-এর উক্তি হাদীদ উদ্ধৃত করেছেন ঃ

সাহাবাদের মর্যাদা সম্পর্কিত অধিকাংশ মিথ্যা হাদীস মুয়াবিয়ার সময় রচিত হয়েছিল। এসব বানোয়াট হাদীস দ্বারা সে জনগণের কাছে মর্যাদা লাভে কৃতকার্য হয়েছিল। তার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল বনি হাশিমকে অমর্যাদাকর ও হেয় করে দেখানো (প্রাগুপ্ত)

এরপর মিথ্যা ও বানোয়াট হাদীস বর্ণনা করা মানুষের অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। দুনিয়াদারগণ রাজা-বাদশাহদের কাছে মর্যাদা পাওয়া ও ঐশ্বর্য অর্জনের উপায় হিসাবে হাদীস বর্ণনাকে বেছে নিয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ, হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতে আব্বাসীয় খলিফা আল-মাহদী ইবনে আল-মনসুরকে খুশী করে মর্যাদা লাভের আশায় গিয়াস ইবনে ইব্রাহীম আন-নাখাই কবুতর উড়িয়ে দেয়া সম্পর্কে একটা বানোয়াট হাদীস বর্ণনা করেছিল (বাগদাদী, [৯৪] ১২শ খন্ড, পৃঃ ৩২৩-৩২৭; জাহাবী,[৬৬] ৩য় খন্ড, পৃঃ ৩৩৭-৩৩৮; আসকালানী[২৩], ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ৪২২)। আবু সাঈদ মাদায়নী ও অন্যান্যরা বানোয়াট হাদীস বর্ণনাকে জীবিকা উপার্জনের উপায় হিসাবে বেছে নিয়েছিল। এসময় সীমালজ্ঞনের পর্যায় এতদূর গিয়েছিল যে, কাররামিয়াহ্ ও কতিপয় মুতাসাওয়াফাহ্ ফতোয়া জারী করে বলেছিল— পাপ হতে বিরত রাখার জন্য অথবা আনুগত্যের প্রতি প্রলুব্ধ করার জন্য মিথ্যা ও বানোয়াট হাদীস বর্ণনা করা জায়েজ। এ ফতোয়ার ফলে প্রকাশ্যে যথেচ্ছভাবে হাদীস বর্ণনা শুরু হয়ে গেল এবং একে নৈতিক ও ধর্মীয় বিধানের পরিপন্থী মনে করা হতো না। বরং যাদেরকে বাহ্যিক আচার-আচরণে পরহেজগার বলে মনে করা হতো এবং যারা সারাদিন নামাজরত থাকতো তারা সারারাত বিভিন্ন বানোয়াট হাদীস লিখে তাদের খাতা-পত্র ভরে ফেলতো। এধরনের বানোয়াট হাদীসের সংখ্যা বিষয়ে কতিপয় ঘটনা হতে অনুমান করা যাবে। ছয় লক্ষ হাদীস হতে বুখারী মাত্র দুই হাজার সাত শত একষট্টিটি হাদীস গ্রহণ করেছিলেন (বাগদাদী[৯৪], ২য় খন্ড, পৃঃ ৮; কাস্তালানী[৪৩], ১ম খন্ড, পৃঃ ২৮; হাম্বলী,[১৬৩] ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ১৪৩)। মুসলিম তিন লক্ষ হাদীস হতে মাত্র চার হাজার হাদীস গ্রহণ করেছিলেন (বাগদাদী[৯৪], ১৩শ খন্ড, পৃঃ ১০১; হাম্বলী[১৬২], ৫ম খন্ড, পৃঃ ৩২; জাহাবী [৬৭], ২য় খন্ড, পৃঃ ১৫১, ১৫৭; খাল্লিকান [৫৬], ৫ম খন্ড, পৃঃ ১৯৪)। আবু দাউদ পাঁচ লক্ষ হাদীস হতে মাত্র চার হাজার আট শত হাদীস গ্রহণ করেছিলেন (বাগদাদী[৯৪], ৯ম খন্ড, পৃঃ ৫৭; জাহাবী,[৬৭] ২য় খন্ড, পৃঃ ১৫৪; হাম্বলী[১৬২], ৫ম খন্ড, পৃঃ ৯৭; খাল্লিকান [৫৬], ২য় খন্ড, পৃঃ ৪০৪)। আহমদ ইবনে হাম্বল প্রায় দশ লক্ষ হাদীস হতে মাত্র ত্রিশ হাজার হাদীস গ্রহণ করেছিলেন (বাগদাদী [৯৪], ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ৪১৯-৪২০; হাম্বলী [১৬২], ২য় খন্ড, পৃঃ ১৭; খাল্লিকান [৫৬], ১ম খন্ড, পৃঃ ৬৪; আসকালানী [২৫], ১ম খন্ড, পৃঃ ৭৪)। এসব বাছাইকৃত হাদীসগুলোর মধ্যে কিছু কিছু মিথ্যা ও বানোয়াট হাদীস যে এসে পড়েনি সে কথা নিশ্চয়তা দিয়ে বলা যায় না। এ বিষয়ে আরো অধিক জানতে হলে আল-গাদির (আমিনী[১২]) গ্রন্থের ৫ম খন্ডের ২০৮-৩৭৮ পৃষ্ঠা পড়ার সুপারিশ করা গেল।

দ্বিতীয় প্রকার রাবী হলো তারা যারা বিষয় বা উপলক্ষ বিবেচনা না করে শুদ্ধ-অশুদ্ধ যাকিছু মনে ছিল উহাই বর্ণনা করেছে। উদাহরণ স্বরূপ, খলিফা উমর যখন আহত হলেন তখন সুহায়েব তাঁর কাছে এসে কাঁদতে লাগলো। এতে উমর বললেন ঃ

হে সুহায়েব, তুমি আমার জন্য কাঁদছো অথচ রাসুল (সঃ) বলেছেন যে, মৃত ব্যক্তির লোকেরা তার জন্য কান্নাকাটি করলে তার (মৃতব্যক্তির) শাস্তি হয় (বুখারী, [১০২] ২য় খন্ড, পৃঃ ১০০-১০২; নায়সাবুরী [৮৩],

৩য় খন্ড, পৃঃ ৪১-৪৫; তিরমিযী [৮০], ৩য় খন্ড, পৃঃ ৩২৭-৩২৯; নাসাঈ [১৮৫], ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ১৮; মাযাহ্,[১০৫] ১ম খন্ড, পৃঃ ৫০৮-৫০৯; আনাস[৬], ১ম খন্ড, পৃঃ ২৩৪; শাফী [১২২], ৭ম খন্ড, পৃঃ ২৬৬; আশাহ,[১৮] ৩য় খন্ড, পৃঃ ১৯৪; হাম্বল [১৬০], ১ম খন্ড, পৃঃ ৪১ ও ৪২; শাফী [১২৫], ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ৭২-৭৪)।

খলিফা উমরের মৃত্যুর পর আয়শা কাঁদতেছিলেন। তখন তাকে উমরের বর্ণিত উক্ত হাদীস বলা হলে তিনি বললেন ঃ

আল্লাহ্ উমরকে মাফ করুন। আত্মীয়-স্বজন কাঁদলে মৃতের শাস্তি হয় আল্লাহ্‌র নবী এমন কথা বলেননি।

এরপর তিনি বলেন যেখানে কুরআন বলেছে একজনের বোঝা অন্যজন বহন করবে না সেখানে কি করে জীবিতের কান্নার জন্য মৃত শাস্তি পেতে পারে! অতঃপর তিনি কুরআনের আয়াত উদ্ধৃত করলেন ঃ

কারো পাপের বোঝা অন্য কেউ বহন করবে না (৬ ঃ ১৬৪, ১৭ঃ১৫, ৩৫ঃ১৮, ৩৯ঃ৭, ৫৩ঃ৩৮)।

তৎপর আয়শা বিষয়টি ব্যাখ্যা করে বললেন যে, একদিন রাসুল (সঃ) এক ইহুদী মহিলার কবরের পাশ দিয়ে যেতে দেখেন তার আত্মীয়-স্বজন তার জন্য কান্নাকাটি করছে। তখন রাসুল (সঃ) বলেছিলেন, "তার লোকেরা তার জন্য কাঁদছে। অথচ করবে তার শাস্তি চলছে।" রাসুলের (সঃ) এ কথার অর্থ এ নয় যে, আত্মীয়-স্বজনের কান্নার জন্য তার শাস্তি হচ্ছে। বরং তিনি বুঝাতে চেয়েছেন কৃতকর্মের শাস্তির জন্য আত্মীয়-স্বজনের কান্না কোন কাজে আসছে না।

তৃতীয় প্রকার রাবী হলো তারা যারা রাসুলের (সঃ) নিকট হতে এমন কিছু শুনেছে যা হয়ত পরবর্তীকালে রদ হয়ে গেছে। কিন্তু রাসুল (সঃ) কর্তৃক এহেন রদ করার বিষয়টি শুনার সৌভাগ্য এদের হয়নি বিধায় এরা সে বিষয়ে অনবহিত। উদাহরণ স্বরূপ- রাসুল (সঃ) বলেছেন ঃ

কবর জেয়ারত করতে আমি তোমাদেরকে নিষেধ করেছিলাম কিন্তু এখন তোমরা তা করতে পার (নায়সাবুরী [৮৩], ৩য় খন্ড, পৃঃ ৬৫; তিরমিযী[৮০], ৩য় খন্ড, পৃঃ ৩৭০; আশাহ [১৮], ৩য় খন্ড, পৃঃ ২১৮ ও ৩৩২; নাসাঈ [৮৫], ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ৮৯; মাযাহ্ [১০৫], পৃঃ ৫০০-৫০১; আনাস [৬], ২য় খন্ড, পৃঃ ৪৮৫; হাম্বল [১৬০], ১ম খন্ড, পৃঃ ১৪৫ ও ৪৫২; ৩য় খন্ড, ৩৮, ৬৩, ৬৬, ২৩৭ ও ৩৫০; ৫ম খন্ড, পৃঃ ৩৫০, ৩৫৫, ৩৫৬, ৩৫৭, ৩৫৯ ও ৩৬১; নায়সাবুরী [৮৪], ১ম খন্ড, পৃঃ ৩৭৪-৩৭৬)।

এ হাদীস হতে বুঝা যায় যে, রাসুল (সঃ) কোন এক সময়ে কবর জেয়ারত করতে নিষেধ করেছিলেন। এ হাদীস দ্বারা সেই নিষেধাজ্ঞা রদ করেছেন। কিন্তু যারা এ হাদীসটি শুনেনি তারা পূর্বের নিষেধাজ্ঞা অনুযায়ী কাজ করেছে এবং উহাই প্রচার করে বেড়াচ্ছে।

চতুর্থ প্রকার রাবী হলো তারা যারা ন্যায়নীতি সম্পর্কে ওয়াকেফহাল এবং যাদের বুদ্ধিমত্তা ও প্রজ্ঞা রয়েছে। তারা হাদীসের উপলক্ষ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত এবং তারা বাতিলকৃত হাদীস ও তৎস্থলে প্রতিস্থাপিত হাদীস সম্পর্কে অবহিত। তারা সাধারণ (আম) ও বিশেষ (খাস) ভাবধারা ও হাদীসে স্থান, কাল ও পাত্র বিষয়ে সবিশেষ অবহিত। তারা কোন প্রকার মিথ্যামিথ্যি, বাড়াবাড়ি, অতিরঞ্জন ও বানোয়াট কথার ধার ধারেনি। তারা যাকিছু শুনেছে তাদের স্মৃতিতে তা অবিকল ধারণ করে রেখেছে এবং সামান্যতম পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ব্যতিরেকে সম্পূর্ণ অবিকলতা রক্ষা করে উহা মানুষের কাছে বর্ণনা করেছে। এদের বর্ণিত হাদীসই ইসলামের অমূল্য সম্পদ এবং এ ধরনের হাদীস অনুযায়ী আমল করতেই হবে। এ ধরনের হাদীসগুলোর মধ্যে আমিরুল মোমেনিন কর্তৃক বর্ণিত হাদিসগুলো প্রধান। জ্ঞানমার্গে আমিরুল মোমেনিনের অবস্থান রাসুলের (সঃ) নিম্নের হাদীসগুলো হতে সহজেই অনুমেয়। আমিরুল মোমেনিন, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্, ইবনে আব্বাস ও আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুল (সঃ) বলেছেন ঃ

আমি জ্ঞানের মহানগরী এবং আলী উহার দরজা। যে কেউ আমার জ্ঞান অর্জন করতে চায় তাকে অবশ্যই এ দরজার মধ্য দিয়ে আসতে হবে (নায়সাবুরী [৮৪], ৩য় খন্ড, পৃঃ ১২৬-১২৭; বার [৯৭], ৩য় খন্ড, পৃঃ ১১০২; আছীর[১], ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ২২; বাগদাদী [৯৪], ২য় খন্ড, পৃঃ ৩৭৭; ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ৩৪৮; ৭ম খন্ড, পৃঃ ১৭২; ১১শ খন্ড, পৃঃ ৪৮-৫০; জাহাবী [৬৭], ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ২৮; শাফী [১২৮], ৯ম খন্ড, পৃঃ ১১৪;

আসকালানী [২৫], ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃঃ ৩২০; ৭ম খন্ড, পৃঃ ৩৩৭; আসকালানী[২৩], ২য় খন্ড, পৃঃ ১২২-১২৩; সুয়ূতী [১৪৭], পৃঃ ১৭০; হিন্দি [১৬৭], ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃঃ ১৫২, ১৫৬ ও ৪০১; হানাফী,[১৫৫] ৭ম খন্ড, পৃঃ ৬৩১; জুরকানী [৭১], ৩য় খন্ড, পৃঃ ১৪৩)।

আমিরুল মোমেনিন ও ইবনে আব্বাস হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুল (সঃ) বলেছেন ঃ

আমি প্রজ্ঞার মহাভান্ডার এবং আলী উহার দরজা। যদি কেউ প্রজ্ঞাবান হতে চায় তবে তাকে এ দরজা দিয়েই আসতে হবে (ইসফাহানী [৩১], ১ম খন্ড, পৃঃ ৬৪; শাফী [১৩০], ২য় খন্ড, পৃঃ ২৭৫; বাগদাদী [৯৪], ১১শ খন্ড, পৃঃ ২০৪; হিন্দি [১৬৭], ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃঃ ৪০১; শাফী [১২৪], ২য় খন্ড, পৃঃ ১৯৩)।

এসব হাদীস হতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, রাসুলের (সঃ) জ্ঞান সাগরে পাড়ি দিয়ে তাঁর অনুকম্পা লাভ করার উপায় হচ্ছে আহ্‌লুল বাইতের মাধ্যমে প্রবাহিত ধারা অনুসরণ করা। আর মানুষ যদি তা করতো তবে তা কতইনা উত্তম হতো। কিন্তু ইতিহাসের এক বিষাদময় অধ্যায় হলো এই যে, খারেজী ও আহ্‌লুল বাইতের শত্রুগণের বর্ণিত হাদীস ক্ষমতাসীনগণ সাদরে গ্রহণ করেছে অথচ রাবীদের নামের তালিকায় যখনই কোন আহ্‌লুল বাইতের সদস্যের নামোল্লেখ করা হয়েছে অমনি সে হাদীস বাতিল করে দেয়া হয়েছে।

★★★★★

খোৎবা-২১০

আল্লাহ্‌র মহত্ব ও বিশ্বচরাচর সৃষ্টি

আল্লাহ্ তাঁর মহান কুদরত ও সূক্ষ্ম সৃজনি শক্তি দ্বারা অথৈ, ঘন ও উচ্চন্ড পানি হতে শক্ত শুষ্ক মাটি তৈরী করলেন। তৎপর তিনি উহার স্তর বিন্যাস করলেন এবং একত্রিত হয়ে জোড়া লাগার পর উহাকে সপ্ত আকাশে বিভক্ত করলেন। সুতরাং তাঁর আদেশে উহা স্থির হয়ে গেল এবং তাঁর নির্ধারিত সীমায় উহা আবদ্ধ হয়ে গেল। তিনি পৃথিবীকে এরূপে তৈরী করলেন যে,উহা গাঢ় নীল, পরিবেষ্টিত ও আলম্বিত পানি হতে জন্ম নিল যা তার আদেশের প্রতি অনুগত এবং যখন তাঁর ভয়ে প্রবাহ থেমে গেল তখন তাঁর সম্মানে অবনত হয়ে রইলো।

তিনি উঁচু পাহাড়, শক্ত পাথর ও সুউচ্চ পর্বতমালা সৃষ্টি করেছেন। তিনি এগুলোকে যথাস্থানে স্থাপন করলেন এবং স্থির করে রাখলেন। এদের চূড়া আকাশে উঠে গেল এবং মূল পানিতে রয়ে গেল। এভাবে তিনি পর্বতকে সমতল ভূমির ওপরে তুলে দিলেন এবং এদের ভিত্তি বিশাল বিস্তারে এঁটে দিলেন যেখানে এরা দাঁড়িয়ে আছে। তিনি এসব পাহাড়ের চূড়াকে সুউচ্চ করেছেন এবং এদের বিস্তৃতি বিশাল করেছেন। তিনি এগুলোকে পৃথিবীর জন্য স্তম্ভ স্বরূপ করেছেন এবং পেরাকের মত আটকিয়ে দিয়েছেন। ফলে পৃথিবী স্থির হয়েছে; অন্যথায় পৃথিবী ইহার অধিবাসীদেরকে নিয়ে বক্র হয়ে যেত অথবা নিজভারে নীচের দিকে তলিয়ে যেত অথবা স্বীয় অবস্থান থেকে সরে পড়তো।

সুতরাং তিনিই মহিমান্বিত যিনি পানির প্রবাহের পর ইহা বন্ধ করে দিয়েছেন এবং ইহার পার্শ্বদেশ জলাকীর্ণ অবস্থার পর ইহাকে শক্ত করে দিয়েছেন। এভাবে তিনি পৃথিবীকে তাঁর বান্দাদের জন্য দোলনা করে দিয়েছেন এবং গভীর সমুদ্রের ওপরে উহাকে তাদের জন্য মেঝের মত বিছিয়ে দিয়েছেন যা স্থির, অনড়, নিশ্চল। তীব্র বাতাস পানির প্রবাহকে এদিক সেদিক নাড়াতে পারে এবং মেঘমালা এর থেকে পানি গ্রহণ করে।

নিশ্চয়ই এতে তাদের জন্য শিক্ষা রয়েছে যারা আল্লাহ্‌কে ভয় করে (কুরআন-৭৯ঃ২৬)

★★★★★

খোৎবা-২১১

যারা ন্যায়ের সমর্থন পরিত্যাগ করে তাদের সম্পর্কে

হে আমার আল্লাহ্, আমরা সর্বদা তোমার দ্বীনের স্বার্থে, ন্যায়ের স্বার্থে এবং মানুষের জাগতিক জীবনের উন্নতির উদ্দেশ্যে কথা বলি। আমরা কখনো ফেতনা সৃষ্টির জন্য কথা বলি না। যে কেউ আমাদের কথা শুনে এবং সেমত আমল করে নিশ্চয়ই তারা তোমার অনুগ্রহ প্রাপ্ত। আর যারা আমাদের কথা শুনার পর উহা প্রত্যাখ্যান করে, নিশ্চয়ই তারা তোমার অনুগ্রহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তোমার দ্বীনকে শক্তিশালী করার পথে বাধা সৃষ্টি করে। এসব লোকের জন্য আমরা তোমাকে সাক্ষী করি এবং তুমিই সর্বশ্রেষ্ঠ সাক্ষী। আমরা তোমার পৃথিবীর সকল বাসিন্দাকে ও তোমার আকাশের সকল বাসিন্দাকে তাদের বিষয়ে সাক্ষী করি। এরপর কেবলমাত্র তুমিই তাদের সমর্থনকে আমাদের কাছে অপ্রয়োজনীয় করে দিতে পার এবং তাদের পাপের জন্য তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে।

★★★★★

খোৎবা-২১২

আল্লাহ্র মহিমা ও রাসুলের (সঃ) প্রশংসা

প্রতিষ্ঠিত প্রশংসা আল্লাহ্র যিনি সকল বান্দার সাদৃশ্যের উর্ধ্বে, বর্ণনাকারীগণের বর্ণনার উর্ধ্বে; যিনি দৃষ্টিবানগণকে তাঁর ব্যবস্থাপনা দেখিয়ে দিয়ে হতবাক করেছেন; যিনি স্বীয় মহিমায় চিন্তাবিদগণের কল্পনা হতে গুপ্ত; যিনি জ্ঞানার্জন ছাড়াই জ্ঞানী, যাতে কোন বাড়তিও নেই, কমতিও নেই; এবং যিনি কোন প্রকার চিন্তা ও প্রতিফলন ছাড়াই সকল বিষয়ের নিয়ামক। তিনি এমন যে, গাঢ় অন্ধকারে তাঁর কিছু আসে যায় না, অথবা উজ্জ্বলতার কাছ থেকেও তাঁর কোন আলোর প্রয়োজন হয় না। রাত তাঁকে অতিক্রম করে না, দিবাভাগও তাঁর জন্য পার হয়ে যায় না (অর্থাৎ দিবারাত্রির পরিবর্তন তাঁকে প্রভাবিত করে না)। কোন জিনিস সম্পর্কে তাঁর উপলব্ধি চক্ষু দ্বারা নয় এবং তাঁর জ্ঞান অবহিতির ওপর নির্ভরশীল নয়।

আল্লাহ্ রাসুলকে (সঃ) আলোর দিশারী হিসাবে প্রেরণ করেছেন এবং তাঁর মনোনীতগণের মধ্যে সর্বোচ্চ মর্যাদা দান করেছেন। তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ্ বিচ্ছিন্নগণকে ঐক্যবদ্ধ করলেন, শক্তিশালীগণকে পরাভূত করলেন, সকল বিপদগ্রস্থতা দূরীভূত করলেন, অসমতল ভূমিকে সমতল করলেন এবং এভাবে চতুর্দিকের গোমরাহী দূরীভূত করলেন।

★★★★★

খোৎবা-২১৩

রাসুলের (সঃ) অধঃবংশের মহত্ব প্রসঙ্গে

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ন্যায়পরায়ণ এবং ন্যায় বিচার করেন। তিনি সর্বনিয়ন্তা যিনি ন্যায় ও অন্যায়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর বান্দা, তাঁর নবী ও তাঁর সৃষ্টির সেরা। যখন আল্লাহ্ বংশধারাকে বিভক্ত করলেন তখন তিনি তাঁকে সর্বোত্তম বংশে প্রেরণ করলেন। সেহেতু কোন মন্দ লোক তাঁর বংশে ছিল না বা কোন পাপাচারী তাঁর অংশীদার ছিল না।

সাবধান! মহিমান্বিত আল্লাহ্ নিশ্চয়ই, তাদেরকে দ্বীনের পথে রেখেছেন যারা এর উপযুক্ত এবং তিনি সত্যকে তাদের স্তম্ভ করে দিয়েছেন (যাতে তারা ভয় করতে পারে) ও আনুগত্যকে তাদের প্রতিরক্ষা করে দিয়েছেন (যাতে তারা বিপথগামী না হয়)। আনুগত্যের প্রতিটি বিষয়ে, কথার মাধ্যমে ও অন্তরের দৃঢ়তার মাধ্যমে মহিমান্বিত আল্লাহ্র সাহায্য তোমরা দেখতে পাবে। এতে তাদের জন্য যথেষ্ট কিছু রয়েছে যারা প্রচুর চায় এবং রোগের চিকিৎসা রয়েছে যারা চিকিৎসা চায়।

যাদের হেদায়েত মেনে চলতে হবে তাদের বৈশিষ্ট্য

জেনে রাখো, আল্লাহ্র যেসব বান্দা তাঁর জ্ঞান সংরক্ষণ করে, সেসব বিষয়ের প্রতিরক্ষা বিধান করে যা তিনি রক্ষা করতে ইচ্ছা করেন এবং (অন্যদের উপকারার্থে) তাঁর ঝর্ণা প্রবাহিত করেন; তারা বন্ধুভাবাপন্ন হয়ে একে অপরের সাথে যোগাযোগ করে এবং স্নেহ পরবশ হয়ে একে অপরের সাথে সাক্ষাৎ করে। তারা পেয়ালা হতে পান করে যা তৃষ্ণা নিবারণ করে এবং জলাধারের কাছ থেকে পরিপূর্ণ সন্তোষ নিয়ে ফিরে আসে। সন্দেহ তাদেরকে প্রভাবিত করে না এবং গীবত তাদের ক্ষেত্রে সুবিধা করতে পারে না। এভাবে আল্লাহ্ তাদের স্বভাবে সদাচরণ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এ কারণে তারা একে অপরকে ভালবাসে এবং একে অপরের সাথে সাক্ষাৎ করে। তারা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে বীজের মত যা বাছাই করে মাত্র কয়েকটি রাখা হয় এবং বাকীগুলো ফেলে দেয়া হয়। এ বাছাই তাদেরকে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করেছে এবং মনোনয়নের প্রক্রিয়া তাদেরকে পবিত্র করেছে।

সুতরাং এসব গুণাবলী অর্জন করে মানুষ সম্মানিত হতে পারে। কেয়ামত উপস্থিত হবার আগেই উহার ভয়ে ভীত হওয়া উচিত। জীবনের ক্ষণস্থায়ীত্বের কথা স্মরণ রাখা দরকার। আরো মনে রাখা দরকার যে, পরকালে পাড়ি জমাবার জন্য মানুষ এখানে কিছুকাল অবস্থান করছে। এ পট পরিবর্তন ও অবধারিত প্রস্থানের জন্য প্রত্যেকেরই কিছু করা দরকার। সে ব্যক্তি আশীর্বাদপুষ্ট যার হৃদয়ে ধার্মিকতা রয়েছে, যে তার পথ প্রদর্শককে মান্য করে এবং সেসব লোককে প্রতিহত করে যারা তাকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। সে ব্যক্তি আশীর্বাদপুষ্ট যে সেসব লোকের সাহায্যে নিরাপত্তার পথ ধরে চলে যারা তাকে হেদায়েতের আলোর সন্ধান দেয়। সে ব্যক্তি আশীর্বাদ পুষ্ট যে নেতার আদেশ মান্য করে নিরাপত্তার পথে চলে, হেদায়েতের দরজা বন্ধ হবার আগেই সেদিকে দ্রুত অগ্রসর হয় এবং তওবার দরজা খোলা থাকতেই পাপ বিদূরিত করে। নিশ্চয়ই, তাকে সত্য পথে ও সিরাতুল মোস্তাকীনে পরিচালিত করা হয়েছে।

★★★★★

খোৎবা-২১৪

একটি প্রার্থনা যা আমিরুল মোমেনিন প্রায়শই করতেন

প্রতিষ্ঠিত প্রশংসা আল্লাহ্র যিনি আমাকে এরূপ তৈরী করেছেন যে, আমি এখনো মৃত্যুবরণ করিনি, আমি রুগ্ন নই, আমার শিরাসমূহ রোগে সংক্রমিত নয়, কোন খারাপ কাজের জন্য আমি তিরস্কৃত নই, আমি আটকুড়ে নই, আমি আমার দ্বীন পরিত্যাগ করিনি, আমার প্রভুর প্রতি আমার কোন অবিশ্বাস নেই, আমার ইমানে অজানিতপূর্ব বিস্ময় নেই, আমার বুদ্ধিমত্তা ক্ষতিগ্রস্থ নয় এবং আমার পূর্বে মানুষকে যেরূপ শাস্তি দেয়া হয়েছে সেরূপ শাস্তি আমাকে দেয়া হয়নি। হে আল্লাহ্, আমি তোমার করতলগত দাস; আমি নিজের প্রতি বাড়াবাড়ির দোষে দোষী। আমার ওপর তোমার ওজর তুমি শেষ করেছো এবং তোমার সম্মুখে আমার কোন ওজর নেই। যা তুমি দান কর তাছাড়া আর কিছু গ্রহণের ক্ষমতা আমার নেই এবং তুমি রক্ষা না করলে কোন কিছু এড়ানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

হে আমার আল্লাহ্! তোমার ধনৈশ্বর্য থাকা সত্ত্বেও দুর্দশাগ্রস্থ হওয়া হতে আমি তোমার প্ররক্ষা প্রার্থনা করি। তোমার হেদায়েত থাকা সত্ত্বেও আমি গোমরাহী হতে তোমার প্ররক্ষা প্রার্থনা করি। তোমার রাজ্যে নিগৃহীত হওয়া হতে এবং যেহেতু সকল কর্তৃত্ব তোমার সেহেতু অবমানিত হওয়া হতে তোমার প্ররক্ষা প্রার্থনা করি।

হে আমার আল্লাহ্, আমার কাছ থেকে যেসব কল্যাণকর বস্তু তুমি গ্রহণ কর তাতে যেন আমার আত্মা প্রথম হয় এবং তোমার নেয়ামতসমূহের মধ্যে যে বিশ্বাস তুমি আমাকে দিয়েছো সে বিশ্বাস যেন প্রথম হয়।

হে আমার আল্লাহ্, তোমার আদেশ হতে মুখ না ফেরানোর জন্য বা তোমার দ্বীনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করার জন্য বা তোমার নিকট হতে আগত হেদায়েতের পরিবর্তে কামনা-বাসনা দ্বারা তাড়িত না হওয়ার জন্য তোমার প্ররক্ষা প্রার্থনা করি।

★★★★★

খোৎবা-২১৫

শাসক ও শাসিতের পারস্পরিক অধিকার সম্বন্ধে সিফ্‌ফিনের যুদ্ধের সময় এ খোৎবা দিয়েছিলেন

মহিমান্বিত আল্লাহ্ তোমাদের বিষয়াদি দেখার দায়িত্ব আমার ওপর ন্যস্ত করে তোমাদের ওপর আমার অধিকার এবং আমার ওপর তোমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছেন। অধিকার কথাটি বর্ণনা করতে গেলে বিশাল, কিন্তু কর্মের ন্যায়পরায়ণতা ও নিরপেক্ষতা থাকলে এটা খুবই সংকীর্ণ। কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত অধিকার প্রাপ্য হয় না যে পর্যন্ত এটা তার জন্য প্রদেয় না হয়; আবার ততক্ষণ পর্যন্ত অধিকার প্রদেয় হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত এটা প্রাপ্য না হয়। যদি এমন কোন অধিকার থেকে থাকে যা শুধুমাত্র প্রাপ্য (যাতে প্রদেয় নেই) তা কেবল মহিমান্বিত আল্লাহ্‌র (আল্লাহ্ ব্যাতীত আর কারো একক অধিকার হয় না)। সৃষ্টির ওপর তাঁর একচ্ছত্র আধিপত্য ও তাঁর সকল রায় ন্যায়-পরিব্যাপ্ত বিধায় তাঁর অধিকার একক। সৃষ্টির একক অধিকার হয় না। অবশ্য সৃষ্টির ওপর মহিমান্বিত আল্লাহ্ তাঁর এ অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে, বান্দা তাঁর ইবাদত করবে এবং তিনি নিজের জন্য এটা নির্ধারণ করেছেন যে, তাঁর নেয়ামত ও দয়ার চিহ্ন হিসেবে বান্দাকে বিনিময়ে কয়েকগুণ বেশী পুরষ্কার প্রদান করবেন।

তৎপর মহিমান্বিত আল্লাহ্ তাঁর অধিকার হতে কোন কোন লোকের জন্য অন্যদের ওপর কতিপয় অধিকার প্রতিষ্ঠিত করলেন। তিনি একের সাথে অপরের সমতা বিধান করার জন্য এসব অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এসব অধিকারের কতেকগুলো অন্য অধিকারের উৎপত্তি ঘটায়। আবার কতেকগুলো এমন যে, অন্য অধিকার ছাড়া এগুলো প্রাপ্য হয় না। এসব অধিকারের সেরা (যা মহিমান্বিত আল্লাহ বাধ্যতামূলক করেছেন) হলো, শাসিতের ওপর শাসকের অধিকার এবং শাসকের ওপর শাসিতের অধিকার। এটা একটা বাধ্যতামূলক দায়িত্ব যা মহিমান্বিত আল্লাহ্ একের ওপর অন্যের প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এটাকে তিনি তাদের পারস্পরিক স্নেহ-মমতার ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং তাদের দ্বীনের জন্য এটা একটা সম্মান। ফলে সুপ্রতিষ্ঠিত শাসক না হলে শাসিত উন্নতি লাভ করতে পারে না এবং অবিচলিত শাসিত না হলে শাসক সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।

যদি শাসক ও শাসিতগণ উভয়ে একের প্রতি অপরের অধিকার পরিপূরণ করে তখন অধিকার তাদের মধ্যে সম্মানের স্থান লাভ করে, দ্বীনের পথ প্রতিষ্ঠিত হয়ে পড়ে, ন্যায় বিচারের নিদর্শন নির্ধারিত হয়ে পড়ে এবং সুন্নাহ প্রসার লাভ করে।

এভাবে সময়ের উন্নতি সাধিত হবে, সরকারের স্থায়ীত্ব আশা করা যাবে এবং শত্রুর লক্ষ্য নৈরাশ্যে পরিণত হবে। কিন্তু যদি শাসিতগণ শাসককে নিয়ন্ত্রিত করে অথবা শাসকগণ শাসিতের ওপর জুলুম-অত্যাচার চালায় তবে প্রতিটি কথায় বিভেদ-বিরোধ দানা বেঁধে ওঠে, অত্যাচারের নিদর্শন দেখা দেয়, দ্বীনে ফেতনা প্রবেশ করে এবং সুন্নাহ্র পথ পরিত্যক্ত হয়। তখন কামনা-বাসনা কার্যকর হয়, দ্বীনের আদেশ-নিষেধ অগ্রাহ্য করা হয়, আত্মা ব্যধিগ্রস্থ হয়ে পড়ে এবং বৃহৎ অধিকার অগ্রাহ্য করা বা কবীরা গুনাহ করতে দ্বিধাবোধ করে না। এ অবস্থায় ধার্মিকগণ অবমানিত হয় এবং পাপাচারীগণ সম্মানিত হয়। এ অবস্থায় মহিমান্বিত আল্লাহ্ জনগণের ওপর মারত্মক শাস্তি আপতন করেন।

কাজেই তোমরা তোমাদের দায়িত্ব পরিপূরণের জন্য একে অপরের সাথে পরামর্শ করো এবং একে অপরকে সহযোগিতা করো। আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য একজন লোক যতই আগ্রাহান্বিত ও উদগ্রীব হোক না কেন এবং সেজন্য যতই সাগ্রহ চেষ্টা করুক না কেন, মহিমান্বিত আল্লাহ্র যতটুকু আনুগত্য প্রাপ্য ততটুকু সে পালন করতে পারে না। মানুষের ওপর এটা আল্লাহ্র একটা বাধ্যতামূলক অধিকার যে, তারা নিজেদের সাধ্যমত একে অপরকে উপদেশ দেবে এবং তাদের মধ্যে সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য একে অপরকে সহায়তা করবে। সত্যের ব্যাপারে কোন লোকের অবস্থান যত বড়ই হোক না কেন, দ্বীনের ব্যাপারে সে যত অগ্রণীই হোক না কেন, আল্লাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব পালন সম্পর্কে সে পারস্পরিক সহযোগিতার উর্দ্ধে নয়। আবার, কোন লোককে অন্যরা যতই ক্ষুদ্র মনে করুক না কেন ও দৃষ্টিতে তাকে যতই দীনহীন মনে হোক না কেন, সহযোগিতার ব্যাপারে সে ক্ষুদ্র বা হীন নয়।

আমিরুল মোমেনিনের অনুচরদের মধ্য হতে একজন তাঁর কথার উত্তরে একটা দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে তাঁর প্রশংসা করলেন এবং আমিরুল মোমেনিনের নির্দেশ পালনে নিজের দৃঢ়তা ও তাঁর প্রতি নিজের আনুগত্য ও মান্যতার বিষয় বর্ণনা করলেন। এতে আমিরুল মোমেনিন বললেন ঃ

যদি কোন লোক তার মনে আল্লাহ্র মহিমাকে সমুচ্চ রাখে এবং তার হৃদয়ে এ বিশ্বাস রাখে যে, আল্লাহ্ মহামহিমান্বিত তখন অন্য সবকিছুকে ক্ষুদ্র জ্ঞান করা তার অধিকার হয়ে পড়ে (আল্লাহ্র মহত্ব হৃদয়ে থাকার কারণে)। এরকম লোকের মধ্যে সে ব্যক্তির দায়িত্ব বেশী যার ওপর আল্লাহ্র নেয়ামত ও রহমত বেশী। কারণ কারো ওপর আল্লাহ্র নেয়ামত বৃদ্ধি পায় না যে পর্যন্ত তার ওপর আল্লাহ্র অধিকার বৃদ্ধি না পায়।

দ্বীনদার লোকদের মতে শাসকগণের নিকৃষ্টতম অবস্থা হলো তখন যখন তারা যশকে ভালবাসে এবং তাদের কাজকে তারা গর্বের মনে করে। প্রকৃতপক্ষেই আমি এটাকে ঘৃণা করি যে, তোমরা আমাকে প্রশংসা কর বা আমার সম্বন্ধে প্রশংসাত্মক উক্তি কর। মহান আল্লাহ্র দয়ায় আমি আমার প্রশংসাসূচক উক্তিতে দুঃখ বোধ করি। এমন কি মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ক প্রশংসাসূচক উক্তি ভালবাসা তো দূরের কথা আমি এসব শুনতেও বিরক্তি বোধ করি। কারণ মহিমান্বিত আল্লাহ্ই এ সবের একমাত্র প্রাপক। সাধারণতঃ ভাল কাজের জন্য প্রশংসায় মানুষ আনন্দ লাভ করে। কিন্তু আমি আল্লাহ্ ও তোমাদের প্রতি যে দায়িত্ব পালন করেছি তজ্জন্য আমার প্রশংসা করো না। কারণ যে সব দায়িত্ব আমি এখনো পালন করতে পারিনি সেগুলোর জন্য আমি ভীত-সন্ত্রস্ত। স্বৈরশাসকগণকে যেভাবে সম্বোধন করা হয় আমাকে সেভাবে সম্বোধন করো না।

কামনা-বাসনার অনুগত লোকদের যেভাবে এড়িয়ে চলতে হয় আমাকে সেভাবে এড়িয়ে চলো না। তোষামোদ করার জন্য আমার সাথে সাক্ষাৎ করো না। কখনো এরূপ মনে করো না যে, আমার কাছে কোন বিষয়ে সত্য কথা বললে আমি খারাপ মনে করবো। কারণ সত্য কথা বললে বা ন্যায়সঙ্গত বিষয় নিয়ে হাজির হলে যদি কেউ বিরক্ত হয় তবে সে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে কাজ করতে পারে না। সুতরাং কখনো সত্য কথা বলা হতে বিরত

থেকো না অথবা কোন একটা ন্যায় বিষয় আমার সামনে উল্লেখ করতে দ্বিধা করোনা। কারণ আমি নিজেকে ভুলের[১] উর্দ্ধে মনে করি না। আমার কর্মকান্ডে ভুল হতেও পারে, কিন্তু ভুল এড়িয়ে যাবার জন্য আল্লাহ্ আমাকে সাহায্য করেন এবং এ বিষয়ে তিনি আমা অপেক্ষা অধিক ক্ষমতাবান। নিশ্চয়ই, আমি ও তোমরা সকলেই আল্লাহ্র অধিকারভুক্ত দাস এবং তিনি ব্যতীত আর কোন প্রভু নেই। তিনিই আমাদের মালিক। আমরা যেখানে ছিলাম তিনি আমাদেরকে সেখানে উন্নতির দিকে নিয়ে যান। তিনি আমাদের পথভ্রষ্টতাকে হেদায়েতে পরিণত করেছেন এবং অন্ধত্বের পর জ্ঞান-বুদ্ধি প্রদান করেছেন।

১। মানুষের নিষ্পাপ হওয়া আর ফেরেশতাদের নিষ্পাপ হওয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের— একথা আলোচনার অপেক্ষা রাখে না। ফেরেশতাগণ পাপের কোন প্রণোদনার আওতাভুক্ত নহে। অপরপক্ষে মানুষ মানবিক দুর্বলতা ও কামনা-বাসনার আওতাভুক্ত। তবুও মানুষের মধ্যে এমন ক্ষমতা দেয়া হয়েছে যাতে সে এসব দুর্বলতা ও কামনাকে প্রতিহত করতে পারে এবং যাতে সে এসবের কাছে পরাভূত না হয়ে পাপ হতে নিজকে রক্ষা করতে পারে। মানুষের এ ক্ষমতাকেই নিষ্পাপতা বলা হয়। এ ক্ষমতাই রিপুকে প্রদমিত করে। "আমি নিজেকে ভুলের উর্দ্ধে মনে করি না"— আমিরুল মোমেনিন এ কথা দ্বারা সেসব মানবিক তাড়না ও কামনার বিষয় বুঝিয়েছেন এবং "ভুল এড়িয়ে চলার জন্য আল্লাহ্ আমাকে সাহায্য করেন"— একথা দ্বারা মা'সুমত্ব বুঝিয়েছেন। একই সুর কুরআনেও পরিলক্ষিত হয় যখন ইউসুফ (আঃ) বলেছিলেন ঃ

> *আমি নিজেকে নির্দোষ মনে করি না, মানুষের মন অবশ্যই মন্দকর্ম প্রবণ, কিন্তু সে নয়, যার প্রতি আমার প্রতিপালক দয়া করেন। আমার প্রতিপালক অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু (কুরআন ১২ ঃ ৫৩)*

উক্ত আয়াতের "যার প্রতি আমার রব দয়া করেন"-এ ব্যতিক্রমের কারণের ইউসুফের (আঃ) মা'সুমত্বের বিরুদ্ধে "আমি নিজেকে নির্দোষ মনে করি না"-উক্তি যুক্তি হিসেবে দাঁড় করানো যায় না। তদ্রুপ "ভুল এড়িয়ে যেতে আল্লাহ্ আমাকে সাহায্য করেন"-এ ব্যতিক্রমের ফলে আমিরুল মোমেনিনের বক্তব্যের প্রথম অংশ তার মা'সুমত্বের বিরুদ্ধে যুক্তি হিসেবে দাঁড় করানো যায় না। এর অন্যথা হলে নবীর মা'সুম হওয়া পরিত্যাজ্য হয়ে যাবে। একইভাবে এ খোৎবার শেষ বাক্য কোনক্রমেই এ অর্থে গ্রহণ করা যাবে না যে, রেসালত প্রকাশের আগে তিনি প্রাক-ইসলামী বিশ্বাসে প্রভাবিত ছিলেন এবং অন্যান্য অবিশ্বাসীদের মত তিনিও পথভ্রষ্ট ও অন্ধকারে ছিলেন। কারণ জন্মলগ্ন হতেই আমিরুল মোমেনিন রাসুল (সঃ) কর্তৃক লালিত-পালিত হয়েছিলেন এবং রাসুলের প্রশিক্ষণ ও আখলাক তাঁর হৃদয়ে প্রবিষ্ট হয়েছিল। কাজেই একথা কল্পনাও করা যায় না যে, যিনি শিশুকাল থেকেই রাসুলের (সঃ) পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন তিনি এক মুহূর্তের জন্য হেদায়েতের পথ হতে বিচ্যুত হয়েছেন।

মাসুদী [১০৯] লিখেছেন ঃ

> *আমিরুল মোমেনিন কখনো আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন উপাস্যে বিশ্বাস করেননি। এতে তাঁর বেলায় ইসলাম গ্রহণের প্রশ্নই উঠতে পারে না। যারা অন্য বিশ্বাস ত্যাগ করে ইসলামে প্রবেশ করেছে তাদের ক্ষেত্রে "ইসলাম গ্রহণ" বিষয়টি প্রযোজ্য। জীবনের প্রারম্ভ হতেই তিনি রাসুলের (সঃ) সকল কর্মকান্ড অনুসরণ করেছিলেন, তাঁর পাশে থেকে তাঁকে উৎসাহ দিয়েছিলেন এবং রাসুলের (সঃ) জীবৎকালে তাঁর সহায়তায় সদা প্রস্তুত ছিলেন (২য় খন্ড, পৃঃ ৩)।*

ইবনে আবিল হাদীদ [১৫২] লিখেছেন ঃ

> *এখানে আমিরুল মোমেনিন তাঁর নিজের প্রতি ইঙ্গিত করেননি। কারণ তিনি কখনো অবিশ্বাসী ছিলেন না যাতে তাঁর ইসলাম গ্রহণের প্রশ্ন উঠতে পারে। যাদের তিনি সম্বোধন করেছিলেন এসব কথায় তিনি তাদের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। (১১শ খন্ড, পৃঃ ১০৮)।*

★★★★★

খোৎবা-২১৬

কুরাইশদের বাড়াবাড়ি সম্বন্ধে

হে আমার আল্লাহ্, আমি তোমার কাছে প্রার্থনা জানাই— তুমি যেন কুরাইশ ও তাদের সাহায্যকারীদের ওপর প্রতিশোধ গ্রহণ কর। কারণ তারা আমার জ্ঞাতিত্বকে কেটে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে এবং আমার পেয়ালা উপুড় করে ঢেলে দিয়েছে। তারা সকলে জোট বেঁধে এমন একটা অধিকার নিয়ে আমার বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতায় নেমেছে যাতে আমার চেয়ে বেশী প্রাধিকারভুক্ত আর কেউ নেই। তারা আমাকে বলেছিল, "যদি তুমি তোমার অধিকার ফিরে পাও তবে তা ন্যায়-সঙ্গত হবে; আর যদি তোমাকে সে অধিকার না দেয়া হয় তাও ন্যায়-সঙ্গত হবে। দুঃখ সহকারে এটা সহ্য কর অথবা শোকে নিজেকে হত্যা কর।" আমি চারিদিকে তাকিয়ে দেখলাম আমার পরিবারের সদস্যগণ ছাড়া আমাকে সাহায্য করার মত আর কেউ নেই। আমি তাদেরকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়া হতে বিরত রইলাম। চোখে বালি পড়া অবস্থায়ও চোখ বন্ধ করে রইলাম। শ্বাসরুদ্ধকর শোকের মধ্যেও মুখের লালা গলাধঃকরণ করতে থাকলাম এবং ক্রোধের যন্ত্রণা সহ্য করতে লাগলাম যদিও এটা 'কলোসিন্থ' হতে তিক্ত ও ছুরির আঘাত হতে বেদনাদায়ক।

তারা আমার নিয়ন্ত্রণাধীন অফিসার ও ট্রেজারী রক্ষককে আক্রমণ করেছে। তারা আমার অনুগত নগরবাসীগণকে আক্রমণ করেছে। তারা নগরবাসীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছে। আমার বিরুদ্ধে তাদের দলকে ক্ষেপিয়ে তুলেছে এবং আমার অনুসারীদেরকে আক্রমণ করেছে। তারা ছলনা করে আমার অনুসারীদের একদলকে হত্যা করেছে এবং অপর একদল তাদের বিরুদ্ধে তরবারি ধারণ করে সত্যের খাতিরে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করেছে যে পর্যন্ত না তারা শাহাদাত বরণ করে আল্লাহ্র সাক্ষাৎ লাভ করেছে।

★★★★★

খোৎবা-২১৭

জামালের যুদ্ধের পর যখন আমিরুল মোমেনিন তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ্ ও আবদার রহমান ইবনে আত্তাব ইবনে আসিদের লাশের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন তিনি বললেন ঃ

আবু মুহাম্মদ (তালহা) তার নিজের দেশ হতে অনেক দূরে এখানে শুয়ে আছে। আল্লাহ্র কসম, আমি কখনো চাইনি যে, কুরাইশগণ এভাবে আকাশের নীচে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকুক। আবদ মনাফের বংশধরগণের কাছ থেকে আমি নিজেই প্রতিশোধ গ্রহণ করেছি, কিন্তু বনি জুমাহ্র[১] প্রধানগণ আমার হাত হতে ফস্কে গেল। যে বিষয়ে তারা উপযুক্ত নয় সে বিষয়ে তারা নাক গলাতে গিয়েছিল। সুতরাং লক্ষ্যে পৌছার আগেই তাদের ঘাড় মট্‌কে গেল।

১। বনি জুমাহ্র প্রধানগণের ক'জন হলো ঃ আবদুল্লাহ্ অত-তাওয়াইল ইবনে সাফওয়ান, ইয়াহিয়া ইবনে হাকিম, আমির ইবনে মাসুদ ও আইউব ইবনে হাবিব। এরা পালিয়ে জীবন রক্ষা করেছিল। জামালের যুদ্ধে বনি জুমাহ্র মাত্র দু'জন নিহত হয়েছিল।

★★★★★

খোৎবা-২১৮

খোদা-ভীরু ও দ্বীনদারের গুণাবলী

ইমানদারগণ তাদের মনকে জীবিত রাখে এবং হৃদয়ের কামনা-বাসনাকে হত্যা করে যে পর্যন্ত না তাদের দেহ শীর্ণ হয়ে পড়ে, দেহের ওজন পাতলা হয়ে যায় ও তাদের থেকে একটা উজ্জ্বল দ্যুতি বের হয়। এ দ্যুতি তাদেরকে পথ দেখায় এবং ন্যায়ের পথে নিয়ে যায়। বিভিন্ন দরজা তাদেরকে নিরাপত্তার দরজা ও স্থায়ী আবাসের দিকে নিয়ে যায়। তাদের পা দেহের ভারসাম্য রক্ষা করে। এতে তাদের অবস্থান নিরাপত্তা ও আরামে পরিণত হয়। কারণ, তারা সৎকাজে হৃদয়কে নিয়োজিত রাখে এবং তাদের আল্লাহ্‌কে খুশী করে।

★★★★★

খোৎবা-২১৯

প্রাচুর্যের দম্ভ সম্বন্ধে আমিরুল মোমেনিন নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করলেন ঃ

প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন রাখে, যতক্ষণ না তোমরা কবরে উপনীত হও (কুরআন-১০২ ঃ ১-২)।

তৎপর তিনি বললেন ঃ

তাদের লক্ষ্য অর্জনের আর কতদূর রয়েছে। এসব লোক কতই না গাফেল এবং তাদের কর্মকান্ড কতই না কঠিন। শিক্ষাপূর্ণ বিষয়গুলো হতে তারা শিক্ষা গ্রহণ করছে না, কিন্তু তারা দূর-দূরান্ত হতে ঐশ্বর্য সংগ্রহ করেছে। তারা কি তাদের পূর্বপুরুষের মৃতদেহের ওপরও দম্ভ করে অথবা তারা কি মৃত লোকদেরকেও তাদের সংখ্যার অন্তর্ভুক্ত করে সংখ্যাধিক্যের গর্ব অনুভব করে? যে সব দেহ আত্মাহীন ও নিশ্চল হয়ে গেছে তারা সেগুলোকে পুনরুজ্জীবিত করতে চায়। মৃতগণ গর্ব অপেক্ষা শিক্ষার অধিক উপযোগী। তারা সম্মান অপেক্ষা বিনয়াবনতার উৎস হিসাবে অধিক উপযোগী।

তারা দুর্বল-দৃষ্টি সম্পন্ন চোখে মৃতদের দিকে তাকায় এবং অজ্ঞতার গহ্বরে নেমে আসে। যদি তারা জীর্ণ কুটির ও শূন্য আঙ্গিনা হতে মৃতদের জিজ্ঞেস করতো, তবে তারা বলতো যে, তারা পথভ্রষ্ট অবস্থায় মাটির নীচে চলে গেছে এবং তোমরাও অজ্ঞভাবে তাদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছো। তোমরা তাদের মাথার খুলি মাড়িয়ে চলো এবং তাদের শবদেহের উপর ইমারত তুলতে চাও। তোমরা তাদের চারণভূমিতে পশু চরাও এবং যে ঘর তারা খালি করেছে সে ঘরে তোমরা বাস কর। তাদের ও তোমাদের মধ্যে যে সময়ের ব্যবধান হয়েছে তাতে শোক প্রকাশ ও শোক-গান এখনো শেষ হয়নি।

লক্ষ্যে পৌছার ব্যাপারে তারা তোমাদের পূর্বসুরী এবং তোমাদের পূর্বেই তারা জলাধারের নিকট পৌছেছে। তাদের মর্যাদাকর অবস্থা ও অসামান্য গর্ব ছিল। তারা ছিল শাসক ও পদমর্যাদাধারী। এখন তারা মাটির সংকীর্ণ ফাঁকের মধ্যে চলে গেছে যেখানে মাটি তাদেরকে চারিদিক হতে চেপে ধরে তাদের মাংশ খাচ্ছে ও রক্ত চুষে নিচ্ছে। তারা প্রাণহীন অবস্থায় কবরের সংকীর্ণ গর্তে পড়ে আছে। তারা আর কোনদিন ফিরে আসবে না এবং কেউ তাদেরকে আর দেখতে পাবে না। বিপদের আশঙ্কা তাদেরকে আর শঙ্কিত করবে না এবং অবস্থার অনানুকূল্য আর তাদেরকে শোকাহত করবে না। ভূমিকম্পে তাদের কিছু যায় আসে না এবং বজ্রপাতেও তারা কর্ণপাত করে না। তারা চলে গেছে এবং আর ফেরার কোন আশা করা যায় না। তারা বিদ্যমান কিন্তু অদৃশ্য। তারা ছিল ঐক্যবদ্ধ কিন্তু এখন তারা বিচ্ছিন্ন। তারা ছিল পরস্পর বন্ধুভাবাপন্ন কিন্তু এখন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন।

তাদের হিসাব-নিকাশ অজানা এবং তাদের গৃহগুলো নিশ্চুপ। এটা সময়ের দৈর্ঘ্য বা স্থানের দূরত্বের জন্য নয়। এটা এ কারণে যে, তাদেরকে মৃত্যুর পেয়ালা পান করানো হয়েছে। এতে তাদের সবাক মুখ নির্বাক হয়ে গেছে, তাদের শ্রুতি বধির হয়ে গেছে এবং তাদের চলাচল নিশ্চল হয়ে গেছে। তারা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে আছে। তারা পরস্পরের প্রতিবেশী কিন্তু একের প্রতি অপরের কোন মমত্ববোধ নেই। তারা একে অপরের বন্ধু কিন্তু কেউ কারো সাথে দেখা করে না। তাদের একে অপরকে জানার রশি ছিন্ন হয়ে গেছে এবং তাদের বন্ধুত্বের বন্ধন কেটে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। তাদের প্রত্যেকেই এখন একাকী যদিও তারা এক সময় দলবদ্ধ ছিল এবং এখন তারা একে অপরের অপরিচিত যদিও একসময় তারা বন্ধু ছিল। রাতের অবসানে ভোর ও দিনের অবসানে সন্ধ্যা সম্বন্ধে তারা অনবহিত। প্রস্থানের পর হতেই রাত অথবা দিন তাদের কাছে চির বিদ্যমান হয়ে গেছে। তারা দেখেছিলো যে, তাদের স্থায়ী আবাসের বিপদ তাদের অনুমান হতে অনেক বেশী মারাত্মক এবং তারা লক্ষ্য করেছিলো যে, এর চিহ্নসমূহ তাদের ধারণা হতে অনেক বৃহৎ। দু'টি লক্ষ্যবস্তু (বেহেশত ও দোযখ) ভয় ও আশার নাগালের বাইরে একটা বিন্দুতে তাদেরকে টেনে নিয়ে গেছে। যদি তারা কথা বলতে পারতো তবে তারা যা দেখেছে তা বর্ণনা করতে গিয়ে বোবা হয়ে যেতো।

যদি তাদের চিহ্ন মুছেও ফেলা হয় এবং তাদের সংবাদ প্রচার বন্ধ করে দেয়া হয় তবুও চক্ষুস্মানগণ যেহেতু তাদের দিকে তাকিয়েছিল সেহেতু তাদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। তারা কোন প্রকার শব্দ না করে কথা বললেও বুদ্ধিমানের কান তাদের কথা শুনতে পায়। সুতরাং তারা বলে, সুন্দর মুখমন্ডল ধ্বংস হয়ে গেছে এবং কোমল দেহ মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। আমরা জীর্ণ কাফন পরে আছি, কবরের সংকীর্ণতা আমাদেরকে অসহায় করে রেখেছে এবং অপরিচিতি আমাদের মাঝে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে। আমাদের নীরব বাসস্থান ধ্বংস করা হয়েছে। আমাদের দেহের সৌন্দর্য চলে গেছে। আমাদের সর্বজ্ঞাত বৈশিষ্ট্যসমূহ ঘৃণিত হয়ে পড়েছে। অপরিচিত স্থানে আমাদের বাস দীর্ঘায়িত হয়ে গেছে। আমরা যন্ত্রনা হতে মুক্তি এবং সংকীর্ণতা হতে নিষ্কৃতি পাচ্ছি না।

এখন যদি তোমরা তোমাদের মনের মধ্যে তাদের প্রতিকৃতি অঙ্কন কর অথবা যে সব পর্দা তাদেরকে তোমাদের কাছ থেকে গোপন করে রেখেছে তা সরিয়ে ফেল তবে নিশ্চয়ই, তোমরা দেখতে পাবে যে, তাদের কান শ্রবণ ক্ষমতা হারিয়ে বধির হয়ে আছে, তাদের চোখ কোটরাগত হয়ে তাতে বালি ভরে আছে, তাদের সক্রিয় জিহ্বা টুকরো টুকরো হয়ে আছে, তাদের চিরজাগ্রত হৃদপিঁন্ড স্পন্দনহীন হয়ে পড়ে আছে এবং তাদের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে একটা অদ্ভুত ধ্বংস সংঘটিত হয়ে সেগুলো বিকৃত ও ক্ষমতাহীন অবস্থায় পড়ে আছে। তাদেরকে সাহায্য করার কেউ নেই এবং তাদের জন্য শোক প্রকাশ করার কেউ নেই।

তাদের প্রতিটি বিপদ এমন যে, এর অবস্থার পরবর্তন হয় না এবং দুঃখ-দুর্দশা কখনো শেষ হয় না। আহা! কতইনা মর্যাদাসম্পন্ন দেহ ও মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্য এ মাটি গলাধঃকরণ করেছে। অথচ এ পৃথিবীতে থাকাকালে তারা প্রচুর আরাম আয়েশ ও সুখ-সম্ভোগ উপভোগ করেছিল এবং সম্মানের মাঝে লালিত-পালিত হয়েছে। শোকের সময়েও তারা আনন্দ-উল্লাসে ছিল। দুঃখ-দুর্দশা আপতিত হলে তারা আনন্দ-উল্লাস ও খেলা-ধুলায় সান্ত্বনা খুঁজে পেত। পৃথিবী তাকে উপহাস করলে সেও পৃথিবীকে উপহাস করতো, কারণ তার জীবন ছিল বিস্মরণপূর্ণ। তৎপর সময় তাকে রূঢ়ভাবে পদদলিত করলো, দিন দিন তার শক্তিমত্তা দুর্বল হয়ে পড়তে লাগলো এবং মৃত্যু তার সন্নিকট হতে তার দিকে তাকাতে লাগলো। এরপর সে এক প্রকার শোকে অভিভূত হতে লাগলো যা জীবনে কখনো অনুভব করেনি এবং তার সুস্থ-সবল শরীর রোগাক্রান্ত হয়ে পড়তে লাগলো।

তৎপর সে এমন অবস্থায় পতিত হয় যাতে সে চিকিৎসকের নিকট অতি পরিচিত হয়ে ওঠে। চিকিৎসকগণ ঠান্ডা (ঔষধ) দ্বারা গরম (রোগ) দাবিয়ে রেখে চিকিৎসা করে। কিন্তু গরম বৃদ্ধি পেলে ঠান্ডা বস্তু কোন কাজে আসে না। এভাবে তার রোগ বৃদ্ধি পেয়ে চিকিৎসকগণ উপায়হীন হয়ে পড়ে, তার সেবায় নিয়োজিতগণ ক্লান্ত হয়ে

পড়ে, তার আপনজন তার রোগের বর্ণনা দিতে বিরক্তিবোধ করে, কেউ তার অবস্থা জিজ্ঞেস করলে জবাব এড়িয়ে যায় এবং কেউ তার সম্মুখে অবস্থার অবনতির কথা বললে রাগান্বিত হয়। তাই কেউ কেউ তার আরোগ্যের আশা ব্যক্ত করে সান্ত্বনা দেয়, কেউ কেউ তাকে হারাবার জন্য ধৈর্য ধারণ করতে উপদেশ দেয় এবং তার পূর্ববর্তীগণের প্রস্থানের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

এ অবস্থায় যখন সে প্রিয়জনদের ত্যাগ করে এ পৃথিবী হতে চির প্রস্থানের জন্য প্রস্তুত হয় তখন এমন শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা তাকে ঘিরে ধরে যে, তার সকল অনুভূতি হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে এবং তার জিহ্বার আদ্রতা শুকিয়ে যায়। এ সময় অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর তার জানা থাকা সত্ত্বেও সে কিছুই উচ্চারণ করতে পারে না। এ সময় অনেকের কথা সে শুনে যা তার হৃদয়ের জন্য পীড়াদায়ক, কিন্তু তবুও সে নিশ্চুপ হয়ে পড়ে থাকে যেন সে বধির—কারো কথা শুনতে পায় না—না জ্যেষ্ঠদের যাদের সে শ্রদ্ধা করতো, আর না কনিষ্ঠদের যাদের সে স্নেহ করতো। মৃত্যুর যন্ত্রণা এতই কষ্টদায়ক যে, মানুষ তা পারে না ভাষায় বর্ণনা করতে, আর না পারে তা হৃদয়ে অনুভব করতে।

★★★★★

খোৎবা-২২০

আল্লাহ্‌র জেকের সম্বন্ধে আমিরুল মোমেনিন নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয় পাঠ করলেন ঃ

সেসব গৃহে যাকে সমুন্নত করতে এবং যাতে তাঁর নাম স্মরণ করতে আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়েছেন, সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে; সেসব লোক, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহ্‌র স্মরণ হতে এবং সালাত কায়েম ও যাকাত আদায় হতে বিরত রাখে না, তারা ভয় করে সেদিনকে যেদিন তাদের অন্তর ও দৃষ্টি বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে (কুরআন-২৪ ঃ ৩৬-৩৭)।

অতঃপর আমিরুল মোমেনিন বললেন ঃ

নিশ্চয়ই, মহিমান্বিত আল্লাহ্ তাঁর জেকেরকে মানুষের হৃদয়ের জন্য আলো করে দিয়েছেন যদ্বারা মানুষ বধিরতা সত্ত্বেও শুনতে পায়, অন্ধত্ব সত্ত্বেও দেখতে পায় এবং অদম্যতা সত্ত্বেও অনুগত হয়। যে সময়গুলোতে কোন নবী ছিলেন না সে সময়গুলোতে আল্লাহ্ তাঁর অসীম রহমতে এ ধরনের লোকের এলহামের দ্বারা মনের মাধ্যমে গোপনে কথা বলতেন। তারা তাদের জাগ্রত কান, চক্ষু ও হৃদয়ের সাহায্যে অন্যদেরকে আল্লাহ্‌র জেকেরের কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন এবং নির্জন স্থানের পথের দিশারীর মত অন্যদেরকে আল্লাহ্‌র ভয় স্মরণ করিয়ে দিতেন। যে কেউ মধ্যপথ অবলম্বন করতো তারা তার পথের প্রশংসা করতো এবং তাকে হেদায়েতের স্রোতধারা প্রদান করতো। আর যদি কেউ ডানে ও বায়ে যেতো তারা তার পথের নিন্দা করতো এবং ধ্বংস সম্বন্ধে তাকে ভয় দেখাতো। এভাবে তারা অন্ধকারের প্রদীপ ও বিভ্রান্তির দেশনা হিসাবে কাজ করেছিল।

কিছু কিছু লোক আছে যারা জাগতিক কর্মকান্ডের পরিবর্তে আল্লাহ্‌র জেকেরে এমনভাবে মগ্ন যে, ব্যবসা-বাণিজ্য কোন কিছুই তাদেরকে এ ধ্যান হতে ফিরিয়ে আনতে পারছে না। তারা আল্লাহ্‌র জেকেরে জীবন কাটিয়ে দেয়। তারা গাফেলগণের হৃদয়ে আল্লাহ্ কর্তৃক ঘোষিত হারাম বিষয়াবলী সম্পর্কে সতর্কাদেশ ঢুকিয়ে দেয়। তারা নিজেরা ন্যায়বিচার করে এবং অন্যদেরকেও ন্যায়বিচার করার আদেশ দেয়। তারা নিজেদেরকে হারাম বিষয় হতে বিরত রাখে এবং অন্যদেরকেও বারিত করে। তাদের অবস্থা এমন যেন তারা এ পৃথিবী ভ্রমণ শেষ করে পরকালে পাড়ি জমিয়েছে এবং এ পৃথিবীর বাইরে যা আছে তারা যেন তা দেখতে পায়। ফলে কবরের সংকীর্ণ ফাঁকে দীর্ঘ

অবস্থানে ও বিচার দিনে যা ঘটবে সে বিষয়ে তারা অবগত আছে। সুতরাং পৃথিবীর মানুষের জন্য এসব বিষয়ের পর্দা তারা অপসারণ করে দেয় যেন মানুষ তা দেখতে পায় যা তারা দেখেছিল এবং মানুষ তা শুনতে পায় যা তারা শুনেছিল।

যদি তোমরা মনের মধ্যে তাদের প্রশংসনীয় অবস্থা ও সুপরিচিত আসনের ছবি আঁক তবে দেখতে পাবে তারা তাদের আমলের রেকর্ড খুলে বসে আছে এবং ছোট-বড় সব কিছুর হিসাব মিলিয়ে দেখছে যে, যা তাদেরকে আদেশ করা হয়েছে উহার কতটুকু করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং যা কিছু হতে বিরত থাকতে বলা হয়েছে উহার কতটুকুতে জড়িয়ে পড়েছে। তাদের কোন খারাপ আমল থাকলে উহার ভার তারা নিজেদের পিঠেই অনুভব করে এবং এ ভার বহনে নিজেকে খুব দুর্বল মনে করে। এতে তারা ভীষণভাবে কাঁদতে শুরু করে এবং কেঁদে কেঁদে একে অপরের কাছে বলাবলি করে। তারা আল্লাহ্‌র দরবারে বিলাপ করে নিজের দোষ স্বীকার করে এবং খালেছ অন্তরে তওবা করে। এরা হলো হেদায়েতের প্রতীক ও অন্ধকারের প্রদীপ। ফেরেশতাগণ এদের চারদিকে ঘিরে থাকে, এদের ওপর শান্তি নেমে আসে, আকাশের দরজা এদের জন্য খোলা থাকে এবং যে স্থানের বিষয়ে আল্লাহ্ এদেরকে অবহিত করেছিলেন সে স্থান সম্মানিত অবস্থায় এদের জন্য নির্ধারিত থাকে। তারা আল্লাহ্‌কে ডাকে এবং ক্ষমার হাওয়ায় নিশ্বাস গ্রহণ করে। তারা আল্লাহ্‌র নেয়ামতের চির-মুখাপেক্ষী এবং তাঁর মহত্বের কাছে হীনাবস্থায় থাকে। তাদের শোকের দৈর্ঘ্য তাদের হৃদয়কে ব্যথাতুর করেছে এবং তাদের কান্নার দৈর্ঘ্য তাদের চোখকে ব্যথাতুর করেছে। আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের প্রতিটি দরজায় তারা আঘাত করে। তারা তাঁরই কাছে যাচনা করে, দান যাঁকে নিঃস্ব করে না এবং যাঁর কাছে যাচনা করে কেউ নিরাশ হয় না।

সুতরাং তোমরা নিজের জন্যই নিজের হিসাব মিলিয়ে নাও, কারণ অন্যের হিসাব মিলিয়ে দেখার জন্য অন্য একজন রয়েছেন।

★★★★★

খোৎবা-২২১

আল্লাহ্‌কে ভুলে থাকা সম্বন্ধে আমিরুল মোমেনিন কুরআনের নিম্নের আয়াত তেলাওয়াত করলেন ঃ

হে মানুষ! কিসে তোমাকে তোমার মহান রব সম্বন্ধে বিভ্রান্ত করলো (৮২ ঃ ৬)।

তৎপর আমিরুল মোমেনিন বলতে লাগলেন ঃ

এ আয়াতে যাদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে তাদের কোন যুক্তি থাকতে পারে না এবং তাদের ওজর খুবই প্রতারণাপূর্ণ। তারা নিজেদেরকে অজ্ঞতার মাঝে নিমজ্জিত করে রেখেছে।

হে মানুষ! কিসে তোমাদেরকে এত সাহসী করে তুলেছে যে, তোমরা পাপে লিপ্ত হও; কিসে তোমাদের আল্লাহ্ সম্পর্কে তোমাদেরকে প্রতারণা করেছে; নিজেদের ধ্বংসে কিসে তোমাদেরকে আনন্দ দান করছে? তোমাদের রোগের কি কোন চিকিৎসা নেই? তোমাদেরকে ঘুম হতে জাগিয়ে তোলার কি কিছুই নেই? অন্যদের প্রতি তোমাদের যেরূপ দরদ রয়েছে নিজেদের প্রতি কি তোমাদের সেরূপ দরদ নেই? সাধারণতঃ কাউকে রৌদ্রতাপে দেখলে তোমরা তাকে ছায়া দ্বারা ঢেকে দাও অথবা কাউকে বেদনা-কাতর বা শোকাহত দেখলে তার প্রতি মমত্ববোধের কারণে নিজেরা কেঁদে ফেল। নিজেদের রোগের ব্যাপারে কিসে তোমাদেরকে ধৈর্য্যশীল করেছে? কিসে তোমাদেরকে নিজেদের দুর্দশায় দৃঢ়চিত্ত করে রাখলো? তোমার নিজের জীবন তোমার কাছে অন্য যে কোন

জীবন হতে মূল্যবান হওয়া সত্ত্বেও কিসে তোমাদেরকে নিজের জীবনের জন্য ক্রন্দনে বারিত করলো? রাত্রিকালে তোমাদের ওপর মারাত্মক বিপর্যয় নেমে আসতে পারে—এ ভয়ে কেন তোমরা জাগরিত থাক না? তোমাদের পাপের কারণে তোমরা আল্লাহ্‌র রোষের পথে শুয়ে থাক—এ কথা কি তোমরা বুঝ না?

তোমাদের হৃদয়ের অসাড়তার রোগ দৃঢ়সংকল্প দ্বারা চিকিৎসা কর এবং গাফেলতির নিদ্রা চোখের জাগরণ দ্বারা চিকিৎসা কর। আল্লাহ্‌র প্রতি অনুগত হও এবং তাঁর জেকেরকে ভালবাস। সর্বদা মনে রেখো, তিনি তোমাদের দিকে এগিয়ে আসেন আর তোমরা দৌড়ে পালিয়ে যাও। তিনি তাঁর ক্ষমার দিকে তোমাদেরকে আহ্বান করছেন এবং তাঁর পরম দয়ার কারণে তোমাদের অপরাধ গোপন করে রেখেছেন আর তোমরা তাঁর দিকে না গিয়ে অন্যদের দিকে দৌড়ে যাচ্ছো। নিশ্চয়ই, মহিমান্বিত আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান ও পরম করুণাময়। তোমরা কতই না দুর্বল ও হীনাবস্থাসম্পন্ন, অথচ তাঁর নিরাপত্তার মধ্যে বসবাস করে এবং তাঁর অসীম দয়ার মধ্যে জীবনের পরিবর্তনসমূহ অতিক্রম করেও কি করে তাঁর অবাধ্য হতে সাহস কর? তিনি তোমাদের ওপর থেকে তাঁর নিরাপত্তা ও দয়া কখনো সরিয়ে নেন না। বস্তুতঃ তাঁর দয়া ব্যতীত একটি মুহূর্তও তোমরা থাকতে পার না—হতে পারে এটা তাঁর কোন নেয়ামত যা তিনি তোমাদেরকে দান করছেন অথবা কোন পাপ যা তিনি গোপন করে রেখেছেন অথবা কোন দুর্যোগ যা তিনি তোমাদের ওপর থেকে সরিয়ে দিয়েছেন। যদি তোমরা তাঁর আনুগত্য করতে তাহলে তাঁর সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কেমন হতো? আল্লাহ্‌র কসম, এ অবস্থা যদি এমন দু'ব্যক্তির মধ্যে হতো যারা ক্ষমতায় ও শক্তিতে সমান (একজন অমনোযোগী ও অপরজন তোমাদের ওপর নেয়ামত বর্ষণ করেই যাচ্ছে) তাহলে তোমরা নিজেরাই তোমাদের অসদাচরণ ও মন্দকাজগুলো সাব্যস্ত করতে পারতে।

আমি সত্যিকারভাবে বলছি যে, দুনিয়া তোমাদেরকে প্রতারণা করেনি—তোমরা নিজেরাই এর দ্বারা প্রতারিত হচ্ছো। দুনিয়া তোমাদের প্রতি পর্দা উন্মোচন করে রেখেছে এবং সবকিছু সমভাবে ফাঁস করে রেখেছে। এতদসত্ত্বেও তোমাদের ওপর সংঘটিতব্য বিপদ ও তোমাদের ক্ষমতার ধ্বংসের কথা পূর্বাহ্নেই বলে দেয়া হয়েছে। দুনিয়া উহার কথায় অতি সত্যবাদী, প্রতিশ্রুতির প্রতি বিশ্বস্ত, মিথ্যা কথা বলেনি বা তোমাদেরকে প্রতারণাও করেনি। অনেকেই তোমাদেরকে দুনিয়া সম্পর্কে উপদেশ দিয়েছে কিন্তু তোমরা তাদেরকে দোষারোপ করেছো; অনেকেই দুনিয়া সম্পর্কে তোমাদেরকে সত্য কথা বলেছে কিন্তু তোমরা তাদের বিরোধিতা করেছো। জীর্ণ কুটির ও অবহেলিত বাসস্থান দ্বারা যদি তোমরা দুনিয়াকে বুঝ তবে তোমাদের বুঝ-পরবত ও শিক্ষা গ্রহণের সুদূরপ্রসারী ক্ষমতা দ্বারা দেখতে পাবে যে, এটা এমন একজনের মত যে তোমাদের প্রতি দয়াবান ও তোমাদেরকে সতর্ক করে দেয়। যে ব্যক্তি দুনিয়াকে আবাসস্থল হিসাবে পছন্দ করে না তার জন্য এটা উত্তম আবাসস্থল। যে ব্যক্তি দুনিয়াকে বসবাসের স্থায়ী আবাস মনে করে না তার জন্য এটা উত্তম বাসস্থান।

যারা আজ দুনিয়া হতে দৌড়ে পালায় তারাই আগামীকাল দ্বীনদার বলে বিবেচিত হবে। ভূমিকম্প সংঘটিত হলে, কেয়ামত এসে পড়লে প্রতিটি ইবাদত স্থানের মানুষ উহার সাথে থাকবে, প্রত্যেক আসক্ত ব্যক্তি তার আসক্তির বস্তুর সাথে থাকবে এবং প্রত্যেক অনুসারী তার নেতার সাথে থাকবে। সেদিন চোখের প্রতিটি উন্মিলন ও প্রতিটি পদশব্দ আল্লাহ্‌র ন্যায় বিচারের মাধ্যমে যতটুকু প্রাপ্য হবে ততটুকু পাবে। সেদিন অনেক যুক্তি ও ওজর নাকচ হয়ে যাবে।

সুতরাং তোমরা এখনই এমন পথ অবলম্বন কর যাতে তোমাদের যুক্তি প্রমাণিত হয় এবং ওজর গৃহীত হয়। এ দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী বস্তু হতে সেটুকু গ্রহণ কর যেটুকু পরকালে তোমাদের জন্য থাকবে, তোমাদের যাত্রার রসদ হবে, মুক্তির উজ্জ্বলতা আনবে এবং তোমাদের দুঃখ উপশমের জন্য প্রস্তুত থাকবে।

★★★★★

খোৎবা-২২২

জুলুম ও তসরুফ হতে দূরে থাকা সম্বন্ধে

আল্লাহ্র কসম, বিচার দিনে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের সম্মুখে মানুষের প্রতি অত্যাচারী অথবা দুনিয়ার সম্পদ হতে কোন কিছু অন্যায়ভাবে পরিগ্রহকারী হিসাবে উপস্থিত হবার ভয়ে আমি সারারাত জাগরিত থেকে 'মাদান' (এক প্রকার লম্বা ধারালো কাঁটা) কাঁটার যন্ত্রণা অথবা শিকলে বাঁধা বন্দির মত যন্ত্রণা ভোগ করি। যে জীবন ধ্বংসের দিকে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে এবং দীর্ঘ সময় ধরে মাটির নীচে পড়ে থাকবে সে জীবনের জন্য কি করে আমি কাউকে অত্যাচার করতে পারি?

আল্লাহ্র কসম, আমার ভ্রাতা আকীলকে অতি দুঃখ-কষ্টে দিনাতিপাত করতে আমি দেখেছি। সে আমার কাছে এসে তোমাদের অংশ হতে এক 'সা' (প্রায় তিন কিলোগ্রাম) গম চেয়েছিল। আমি তার সন্তানগণকে ক্ষুধার তাড়নায় আলুথালু চুলে ও ধুলিধুসর চেহারায় দেখেছিলাম যেন তাদের মুখ নীল দ্বারা কালো করা হয়েছিল। সে কয়েকবার আমার কাছে এসে একই অনুরোধ করেছিল। আমি তার দুঃখ-কষ্টের কথা শুনেছিলাম। সে মনে করেছিলো আমি আমার ঈমান তার কাছে বিক্রি করে আমার নিজের পথ পরিত্যাগ করে তার পথ অনুসরণ করবো। আমি এক টুকরো লোহা উত্তপ্ত করলাম এবং উহা তার শরীরের কাছে রাখলাম যেন সে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। তৎপর দীর্ঘদিনের রোগাক্রান্ত লোক যেভাবে বেদনায় চিৎকার দেয় সে তদ্রুপ চিৎকার করে উঠলো। এ সময় লোহার উত্তাপে সে প্রায় পুড়ে যাচ্ছিলো। তখন আমি তাকে বললাম, "রোদনকারিনী নারী তোমার জন্য রোদন করুক, হে আকীল! এক টুকরো উত্তপ্ত লোহার গরমে তুমি চিৎকার করছো যা আমি কৌতুক করার জন্য করেছি; আর তুমি আমাকে এমন আগুনের দিকে তাড়িত করতে চাও যা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাঁর রোষের কারণে তৈরী করেছেন। ক্ষুধার যন্ত্রণায় তুমি কাঁদতে পার, কিন্তু অগ্নিশিখার যন্ত্রণায় আমি কাঁদতে পারবো না।"

এটা অপেক্ষা আরো আশ্চর্যজনক একটা ঘটনা হলো— এক রাতে একজন লোক (কথিত আছে যে, এ লোক হলো আশাছ ইবনে কায়েস) এক ফ্লাকস্ মধুর পেষ্টি নিয়ে আমাদের কাছে এসেছিলো। এসব জিনিস আমি এমনভাবে ঘৃণা করতাম যে, এগুলো আমার কাছে সরীসৃপের লালা বা বমি মনে হতো। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম এটা কি পুরস্কার, নাকি জাকাত, নাকি দান; কারণ এগুলো আহলুল বাইতের জন্য নিষিদ্ধ। সে বললো এটা ওগুলোর কিছুই নয়— এটা একটা উপঢৌকন। তৎপর আমি বললাম, "নিঃসন্তান নারী তোমার জন্য রোদন করুক, তুমি কি আমাকে আল্লাহ্র দ্বীন হতে সরিয়ে নিতে এসেছো, নাকি তুমি একটা পাগল, নাকি তোমাকে জ্বিনে ধরেছে, নাকি তুমি জ্ঞানহীন হয়ে কথা বলছো?"

আল্লাহ্র কসম, আমাকে সপ্ত আকাশ ও জমিনের রাজত্ব দিলেও আমি পিপীলিকার মুখে বাহিত যবের দানা পরিমাণও আল্লাহ্র অবাধ্য হতে পারবো না। তোমাদের দুনিয়া আমার কাছে একটা পতঙ্গের মুখে চর্বিত পাতা অপেক্ষাও মূল্যহীন। যে সম্পদের কোন স্থায়ীত্ব নেই এবং যে আনন্দ-উপভোগ সহসাই চলে যাবে তা দিয়ে আলী কি করবে? প্রজ্ঞা হতে স্লিপ করা ও ভুলের কুফল বিষয়ে আমরা আল্লাহ্র নিরাপত্তা প্রার্থনা করি এবং আমরা তাঁর নেয়ামত ও রহমত যাচনা করি।

★★★★★

খোৎবা-২২৩

মোনাজাত

হে আমার আল্লাহ্, আমার মুখমন্ডলে জীবনের সহজ-সরলতা ফুটিয়ে তোল এবং আমার মুখায়বে দুঃখ-কষ্ট ও দুর্দশার অমর্যাদাকর অবস্থায় ছায়া ফেলো না পাছে যারা তোমার কাছে জীবিকা যাচনা করে তাদের কাছে আমাকে জীবিকা চাইতে হয়। আমাকে যেন তোমার খারাপ বান্দাদের অনুগ্রহ চাইতে না হয়। আমি নিজে যেন তাদের প্রশংসায় ব্যস্ত না থাকি যারা আমাকে দেয় অথবা তাদেরকে গালি না দেই যারা আমাকে দেয় না। অবশ্য এসব কিছুর পেছনে তুমিই দেয়া বা না দেয়ার মালিক।

নিশ্চয়ই, তুমি সকল কিছুর ওপর সর্বশক্তিমান (কুরআন- ৬৬ :৪)।

★★★★★

খোৎবা-২২৪

দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ীত্ব ও কবরের অসহায়ত্ব সম্বন্ধে

এ দুনিয়া একটা বিপদ-ঘেরা আবাসস্থল এবং এটা প্রতারণার জন্য সুপরিচিত। দুনিয়ার অবস্থার কোন স্থায়ীত্ব নেই এবং এর অধিবাসীগণ নিরাপদ থাকে না। ইহার অবস্থা স্থির থাকে না এবং ইহার পথসমূহ সর্বদা পরিবর্তনশীল। জীবন এতে নিন্দনীয় এবং এতে নিরাপত্তার কোন অস্তিত্ব নেই। তবুও মানুষ দুনিয়ার লক্ষ্যবস্তু। দুনিয়া মানুষকে ইহার তীর দ্বারা আঘাত করে এবং মৃত্যুর মাধ্যমে তাদেরকে ধ্বংস করে।

হে আল্লাহ্র বান্দাগণ, জেনে রাখো, তোমরা এবং এ দুনিয়াতে তোমাদের যা কিছু আছে—সব কিছুই সে দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে যে দিকে তোমাদের পূর্ববর্তীগণ চলে গেছে। তারা দীর্ঘায়ু পেয়েছিল, তাদের ঘর জনাকীর্ণ ছিল এবং তাদের চিহ্ন বেশী স্থায়ী ছিল। তাদের কণ্ঠস্বর স্তব্ধ হয়ে গেছে, তাদের চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে, তাদের দেহ পঁচে গেছে, তাদের ঘর শূন্য হয়ে গেছে এবং তাদের চিহ্নও মুছে গেছে। তাদের জাঁকজমকপূর্ণ স্থান ও বিস্তৃত গালিচা পাথরে পরিণত হয়ে গেছে। তারা এখন সংকীর্ণ গর্ত আকারের কবরে শুয়ে আছে যার ভিত্তি ধ্বংসের ওপর এবং নির্মাণ মাটি দ্বারা করা হয়েছে। এ নির্মাণ এত সংকীর্ণ যে ইহার ছাদ তাদেরকে প্রায় ছুঁয়ে ফেলে এবং যারা এতে স্থায়ী বাসা বেঁধেছে তারা যেন দূরে সরিয়ে দেয়া অপরিচিত ব্যক্তি। তারা নিজেদের এলাকার জনগণের একজন কিন্তু কবরে নিতান্ত একাকী। তারা সকল কাজ হতে মুক্ত কিন্তু এখনো কর্মে জড়িত। জন্মভূমির সাথে তাদের কোন সংশ্রব নেই এবং প্রতিবেশীর মত তারা নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করে না যদিও তারা বসবাসের দিক থেকে একে অপরের খুব নিকটবর্তী। কি করেই বা তারা একে অপরের সাথে সাক্ষাত করবে যেখানে ধ্বংস উহার বুক দিয়ে চেপে ধরে তাদেরকে ধরাশায়ী করে রেখেছে এবং পাথর ও মাটি তাদেরকে খেয়ে ফেলেছে।

তারা যেখানে গেছে তোমাদেরকেও সেখানে যেতে হবে। যে নিদ্রা তাদেরকে আচ্ছন্ন করেছে সে নিদ্রায় তোমাদেরকেও ধরবে। যতটুকু স্থান তাদের জন্য নির্ধারিত হয়েছে ততটুকু তোমাদের জন্যও নির্ধারিত। তখন তোমাদের অবস্থা কি হবে যখন তোমাদের আমলসমূহ তাদের কাছ পর্যন্ত পৌছবে এবং কবরসমূহ ওলট-পালট হবে?

সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি পূর্ব-কৃতকর্ম সম্বন্ধে অবহিত হবে এবং তাদেরকে তাদের প্রকৃত প্রভু আল্লাহ্র নিকট ফিরিয়ে আনা হবে এবং তাদের উদ্ভাবিত মিথ্যাসমূহ তাদের নিকট থেকে অন্তর্হিত হবে (কুরআন- ১০ :৩০)

★★★★★

খোৎবা-২২৫

মোনাজাত

হে আমার আল্লাহ্, তুমি তোমার প্রেমিকদের খুবই নিকটবর্তী এবং যারা তোমাকে বিশ্বাস করে তাদেরকে সহায়তা করতে তুমি সদা প্রস্তুত। মানুষ যা গোপন করে তা তুমি দেখ, তাদের মনের মধ্যে যা কিছু আছে তা তুমি জান এবং তাদের জ্ঞান-বুদ্ধির বহর সম্পর্কেও তুমি অবহিত। কাজেই তাদের গুপ্ত বিষয় তোমার কাছে প্রকাশ্য এবং তাদের হৃদয় তোমার প্রতি আকুল। যদি একাকীত্বে তারা ক্লান্ত হয়ে পড়তো তবে তোমার জেকেরে তারা প্রবোধ পেতো। তাদের ওপর দুঃখ-দুর্দশা আপতিত হলে তারা তোমার কাছে নিরাপত্তা যাচনা করে। কারণ তারা জানে সকল কর্মকান্ডের লাগাম তোমার হাতে এবং তাদের নড়চড় পর্যন্ত তোমার আদেশের ওপর নির্ভরশীল।

হে আমার আল্লাহ্ , যদি আমি আমার মনের আকুতি প্রকাশে অক্ষম হই অথবা আমার অভাবসমূহ তোমাকে দেখাতে না পারি তবে তুমি আমাকে মঙ্গলের দিকে পরিচালিত করো এবং আমার হৃদয়কে সঠিক লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যেয়ো। এটা তোমার হেদায়েতের পরিপন্থী নয় এবং তোমার সমর্থিত পথের পরিপন্থী নতুন কিছু নয়।

হে আমার আল্লাহ্, আমার প্রতি তোমার দ্বার অবারিত রেখো এবং আমার প্রতি ক্ষমাসুন্দর আচরণ করো। আমার প্রতি তুমি বিচারকসুলভ আচরণ করো না।

★★★★★

খোৎবা-২২৬

দুর্যোগপূর্ণ অবস্থা সংঘটিত হবার আগেই যেসব অনুচর পৃথিবী হতে চলে গেছে তাদের সম্বন্ধে

আল্লাহ, অমুক অমুক ব্যক্তিকে পুরস্কৃত করুন, যারা বক্রকে সোজা করেছে, রোগের চিকিৎসা করেছে, ফেতনা পরিহার করেছে এবং সুন্নাহকে[১] পুরস্কৃত করেছে। সে এ পৃথিবী হতে নির্দাগ কাপড় ও অতি সামান্য দোষক্রটি নিয়ে প্রস্থান করেছিলো। সে এ দুনিয়ার সত্য-সুন্দর-মঙ্গলকে আঁকড়ে ধরেছিলো এবং দুনিয়ার অকল্যাণ ও পাপ হতে নিজেকে নিরাপদ রাখতে পেরেছিলো। সে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করেছিল এবং তাঁকে যতটুকু ভয় করা দরকার ততটুকু ভয় করেছিলো। সে চলে গেল কিন্তু বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত পথে মানুষকে রেখে গেছে যাতে পথভ্রষ্টগণ হেদায়েতও পাচ্ছে না এবং হেদায়েত প্রাপ্তগণ কোন নিশ্চয়তা পাচ্ছে না।

১। ইবনে আবিল হাদীদ[১৫২] (১৪শ খন্ড, পৃঃ ৩-৪) লিখেছেন যে, আমিরুল মোমেনিন এ খোৎবায় দ্বিতীয় খলিফা উমরকে ইঙ্গিত করেছেন এবং তার প্রশংসা করেছেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, শরীফ রাজীর স্বহস্তে লিখিত নাহজ আল-বালাঘার পান্ডুলিপিতে 'অমুক অমুক' শব্দের নীচে 'উমর' শব্দটি লিখিত আছে।

ইরাকের আল-মুসিল বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুলিপিকর ইয়াকুত আল-মুস্তাসিমীর লিখিত নাহজ আল-বালাঘার সবচেয়ে পুরানো পন্ডুলিপি এখনো রয়েছে। এ পান্ডুলিপিতে 'অমুক অমুক' শব্দের নীচে 'উমর' শব্দটি লেখা আছে বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। শরীফ রাজীর সমসাময়িক অনেকেই নাহজ আল-বালাঘার টিকা লিখেছেন। তাদের কেউ এমন কথা লিখেননি যে, 'অমুক অমুক" শব্দের নীচে 'উমর' শব্দটি ছিল। হাদীদ ব্যতীত আর কোন লেখক বা ঐতিহাসিক একথা বলেনি। শরীফ রাজীর দুইশত পঞ্চাশ বছর পরে হাদীদ কোথায় কিভাবে রাজীর স্বহস্তে লিখিত পান্ডুলিপি দেখতে পেয়েছে তার কোন উল্লেখ তিনি করেননি। হাদীদের কথা মেনে নিয়ে যদি ধরা হয় যে, 'অমুক অমুক' শব্দের নীচে রাজীর হাতের

লেখায় 'উমর' শব্দটি লেখা ছিল তবুও এটা রাজীর একান্ত নিজস্ব টীকা ব্যতীত অন্য কিছু নয়। অনেক খোৎবাতেই রাজী এ রকম টীকা লিখেছেন। এ রকম টীকাকে মূল খোৎবা বলে গ্রহণ করা যায় না।

শরীফ রাজীর সমসাময়িক আল্লামা আলী ইবনে নাসির নাহজ আল-বালাঘার বিস্তারিত টীকা লিখে যে গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন উহার নাম "আলাম নাহজ আল-বালাঘা।" এ খোৎবাটি সম্পর্কে উক্ত টীকা গ্রন্থে তিনি লিখেছেন ঃ

আমিরুল মোমেনিন তাঁর নিজের একজন অনুচরের সদাচরণে তাঁর প্রশংসা করে এ খোৎবা দিয়েছিলেন। আল্লাহ্‌র রাসুলের ইনতিকালের পর যে সব বিপদাপদ ও দুর্যোগ আপতিত হয়েছিল উহার পূর্বেই সে মারা গেছে।

আল্লামা কুতবুদ্দিন আর -রাওয়ান্দি (মৃত্যু ৫৭৩ হিঃ) তার লিখিত নাহজ আল-বালাঘার টীকা গ্রন্থে নাসিরের উপরোক্ত মতের সমর্থন করেন।

বাহারানী [১০১] (৪র্থ খন্ড, পৃঃ ৯৭) শারহে নাহাজ আল-বালাঘা গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

আমিরুল মোমেনিন এ খোৎবায় তাঁর নিজের একজন অনুচরকে উদ্দেশ্য করেছিলেন যিনি আল্লাহ্‌র রাসুলের ইনতিকালের সাথে সাথে যে সব ফেতনা ও অনৈক্য দেখা দিয়েছিল উহার পূর্বেই মারা গেছেন।

ইবনে আবিল হাদীদ [১৫২] তার গ্রন্থে বাহারানীর উপরোক্ত মত সমর্থনও করেছেন (১৪শ খন্ড, পৃ ঃ ৪)।

আল্লামা আলহাজ্ব মীর্জা হাবিবুল্লাহ্‌ আল-খুই [৫৯] (১৪শ খন্ড, পৃঃ ৩৭৪-৩৭৫) মত প্রকাশ করেন যে, এ খোৎবায় আমিরুল মোমেনিন যার উদ্দেশ্যে কথাগুলো বলেছিলেন তিনি হলেন মালিক ইবনে হারিছ আল-আশতার। মালিক নিহত হবার পর মুসলিম উম্মাহ্‌র যে অবস্থা হয়েছিল এখোৎবায় উহাই বর্ণিত হয়েছে। খুই আরো উল্লেখ করেন ঃ

আমিরুল মোমেনিন বিভিন্ন সময়ে মালিকের প্রশংসা করতেন। মালিককে মিশরের গভর্ণর নিয়োগ করে মিশরের জনগণের নিকট যে পত্র লিখেছিলেন তাতে তিনি বারংবার মালিকের ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। মালিক নিহত হবার সংবাদ যখন আমিরুল মোমেনিন পেয়েছিলেন তখন তিনি বললেন, "মালিক! কে এ মালিক? যদি মালিক পাথর হতো তাহলে সে শক্ত ও কঠিন পাথর। যদি মালিক পাহাড় হতো তবে সে মহান পাহাড় যার কোন তুলনা হয় না। মালিকের মত আরেক জনকে প্রসব করতে নারীগণ বন্ধ্যা হয়ে গেছে।" কোন কোন বর্ণনায় দেখা যায় আমিরুল মোমেনিন বলেছিলেন, "আমি রাসুলের নিকট যেরূপ ছিলাম মালিক আমার নিকট তদ্রুপ।" সুতরাং আমিরুল মোমেনিনের কাছে যার মর্যাদা এত সমুচ্চ তার সম্পর্কেই এ খোৎবার উক্তিগুলো যথার্থ।

যদি খোৎবাটি খলিফা উমর সম্পর্কে বলা হতে তবে তা ইতিহাসে উল্লেখ থাকতো, মানুষের তা জানা থাকতো এবং হাদীদও সূত্র উল্লেখ করতে পারতো। কিন্তু একথার সত্যতা সম্পর্কে কোন প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না। শুধুমাত্র কয়েকটি বানোয়াট তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। এ খোৎবায় দু'টো সর্বনাম ব্যবহৃত হয়েছে-'খায়রাহা' ও 'শাররাহা'। হাদীদ এ দু'টো সর্বনামকে খেলাফতের সর্বনাম হিসাবে উল্লেখ করে লিখেছেন যে, এ শব্দদ্বয় শুধু তার প্রতি প্রযোজ্য যিনি শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকেন। কারণ শাসন ক্ষমতা ছাড়া সুন্নাহ্‌ প্রতিষ্ঠিত করা ও বিদা'ত প্রতিহত করা অসম্ভব। হাদীদের এসব উক্তির সমর্থনে কোন ঐতিহাসিক সত্যতা নেই এবং যুক্তিতর্কেও এগুলো গ্রহণযোগ্য নয়। মানুষের স্বার্থসংরক্ষণ ও সুন্নাহ্‌ প্রতিষ্ঠিত করার পূর্বশর্ত হিসাবে তিনি শাসন ক্ষমতার কথা উল্লেখ করেছেন। তার এ কথা দ্বারা বুঝা যায় যে, কল্যাণের পথে যাওয়া ও পাপ হতে সরে থাকার আদেশ দানের ক্ষমতা শাসনকর্তা ছাড়া আর কারো নেই। অথচ আল্লাহ্‌ শাসন ক্ষমতার শর্ত ছাড়াই একদল লোককে এ দায়িত্ব অর্পণ করেছেন ঃ

তোমাদের মধ্যে এমন একদল হোক যারা কল্যাণের দিকে আহবান করবে এবং সৎকার্যের আদেশ দেবে ও অসৎকার্যে নিষেধ করবে; এরাই সফলকাম (কুরআন- ৩ ঃ ১০৪)।

একইভাবে রাসুল (সঃ) বলেছিলেন ঃ

যে পর্যন্ত মানুষ ভাল কাজে আদেশ ও মন্দ কাজে নিষেধ করতে থাকবে এবং দ্বীন ও তাকওয়ায় একে অপরকে সাহায্য করতে থাকবে সে পর্যন্ত তারা ন্যায়ের পথে থাকবে।

আমিরুল মোমেনিনও বলেছিলেন ঃ

আল্লাহ্‌র তৌহিদ ও সুন্নাহ্‌য় প্রতিষ্ঠিত থেকো এবং এ দু'টি প্রদীপ সর্বদা প্রজ্জ্বলিত রেখো।

এসব বাণীতে এমন কোন ইঙ্গিত নেই যে শাসন ক্ষমতা ছাড়া এ দায়িত্ব পালন করা যাবে না। ঘটনা প্রবাহে দেখা গেছে যে, শাসন ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও সৈন্যবাহিনী থাকা সত্ত্বেও শাসক ও বাদশাহ্‌গণ ততটুকু অকল্যাণ প্রতিহত ও ধর্ম প্রচার করতে পারেনি যতটুকু পেরেছিল পূণ্যাত্মা অজ্ঞাত ব্যক্তিগণ তাদের সদাচরণ ও নৈতিক মূল্যবোধের ছাপ অন্যের হৃদয়ে ফেলে। তারা কখনো সেনাবাহিনীর সহায়তা গ্রহণ করেনি। এমনকি অভাব অনটন ছাড়া তাদের আর কোন অস্ত্রপাতিও ছিল না। একথা ঠিক যে, শাসন ক্ষমতা মানুষের মাথা নোয়াতে পারে কিন্তু হৃদয় জয় করে ধর্মভাব সৃষ্টি করতে পারে না। ইতিহাসে যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে যে, অনেক শাসক ইসলামের বৈশিষ্ট্য বিনষ্ট করে দিয়েছিলো। দারিদ্র ও দুঃখ যাদের নিত্য সাথী এমন অসহায় পূণ্যাত্মাগণের প্রচেষ্টায় ইসলামের অগ্রগতি ও অস্তিত্ব টিকে আছে।

যদি আমিরুল মোমেনিনের উক্তি শাসকের উদ্দেশ্যেই হয়ে থাকে তবে তা সালমান আল-ফারিসীর মত সাহাবির জন্য হওয়াই যুক্তিযুক্ত যিনি একটা প্রদেশের প্রধান ছিলেন এবং যার দাফনে যোগ দেয়ার জন্য আমিরুল মোমেনিন সুদূর মাদায়েনে গিয়েছিলেন। এটা যুক্তিসংগত যে, আমিরুল মোমেনিন সালমানের দাফনের পর তার জীবন ও শাসন সম্বন্ধে প্রশংসা করে এ খোৎবা দিয়েছিলেন। আমিরুল মোমেনিন খলিফা উমর সম্পর্কে এ কথাগুলো বলেছিলেন এমন কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। বিশেষ করে উমর সম্পর্কে এমন একটা মোক্ষম উক্তি উমর প্রেমিকগণ ফলাও করে প্রচার না করে ছাড়তো না। যাহোক ইবনে আবিল হাদীদ তার অনুমানের (Hypothesis) প্রমাণ হিসাবে ঐতিহাসিক আবুল ফিদার নিম্নোক্ত বর্ণনা উল্লেখ করেন ঃ

মুঘিরা ইবনে শুবাহ্ হতে বর্ণিত আছে যে, খলিফা উমর মারা যাবার পর ইবনাহ্ আবি হাছমাহ্ কেঁদে কেঁদে বলেছিল, 'হে উমর, তুমি সে ব্যক্তি যে বাঁকাকে সোজা করেছিলো, পীড়া দূরীভূত করেছিলো, ফেতনা ধ্বংস করেছিলো, সুন্নাহ পুনুরুজ্জীবিত করেছিলো, সততা রক্ষা করেছিলো এবং কোন পাপে না জড়িয়ে চলে গেছো।' ফিদা আরো উল্লেখ করে যে, মুঘিরা বলেছিলো, 'উমরকে দাফন করার পর আমি আলীর নিকট এসেছিলাম এবং উমর সম্পর্কে তার কাছে কিছু কথা শুনতে চেয়েছিলাম। তখন আলী তাঁর গোসল সেরে একখানা চাদরে নিজকে জড়িয়ে চুল ও দাড়ি ঝাড়তেছিলেন। পরবর্তী খলিফা হওয়া সম্বন্ধে তার কোন সন্দেহ ছিল না। তিনি বললেন, 'আল্লাহ্‌র আশীর্বাদ উমরের ওপর বর্ষিত হোক। ইবনাহ্ আবি হাছমাহ্ সঠিকভাবেই বলেছে যে, উমর খিলাফতের কল্যাণ উপভোগ করেছেন এবং এর অমঙ্গল হতে নিরাপদ ছিলেন। আল্লাহ্‌র কসম, সে (হাছমা) একথা নিজের থেকে বলেনি—এটা তাকে দিয়ে বলানো হয়েছে। (ফিদা [৮৯], ১ম খন্ড, পৃঃ ২৭৬৩; হাদীদ [১৫২], ১২শ খন্ড, পৃঃ ৫; কাছীর [৩৯], ৭ম খন্ড, পৃ; ১৪০)।

এ ঘটনার বর্ণনাকারী হলো মুঘিরা ইবনে শুবাহ্ যে উম্মে জামিলের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত ছিল। সাক্ষ্যপ্রমাণ থাকা সত্ত্বেও উমর তাকে শাস্তি প্রদান করেনি। এছাড়াও ইতিহাস সাক্ষ্য বহন করে যে, এ মুঘিরাই মুয়াবিয়ার নির্দেশে কুফায় আমিরুল মোমেনিনকে গালিগালাজ করেছিলো। এ রকম একজন বাজে লোকের কথার কতটুকু মূল্য থাকতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণ করলেও মুঘিরার কথার অসাড়তা প্রমাণিত হয়। মুঘিরা বলেছিলো যে, পরবর্তী খলিফা হবার বিষয়ে আমিরুল মোমেনিনের কোন সন্দেহ ছিল না। তার একথা বাস্তব অবস্থার বিপরীত। কিসের ভিত্তিতে সে একথা বলেছে তা উল্লেখ করেনি। বাস্তবে খেলাফত শুধু উসমানের জন্যই নিশ্চিত ছিলো। কারণ খলিফা মনোনয়ের জন্য উমর যে

কমিটি গঠন করেছিল উহার প্রধান সদস্য আবদার রহমান ইবনে আউফ আমিরুল মোমেনিনকে বলেছিলো, "হে আলী, আপনি নিজের বিরুদ্ধে অবস্থার সৃষ্টি করবেন না। আমি মানুষের সাথে আলাপ করে দেখেছি তারা সকলেই উসমানকে চায়" (ফিদা[৮৯], ১ম খন্ড , পৃঃ ১৬৬; তাবারী[৭৫], ১ম খন্ড, পৃঃ ২৭৮৬, আছীর[২], ৩য় খন্ড, পৃঃ ৭১)।

খলিফা মনোনয়নের জন্য উমর কর্তৃক গঠিত কমিটি দেখেই আমিরুল মোমেনিন নিশ্চিতভাবে বুঝতে পেরেছিলেন যে, তিনি খেলাফত পাবেন না যা ৩নং খোৎবার টীকায় বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে। তাই তিনি তাঁর চাচা আব্বাস ইবনে আবদাল মুত্তালিবকে বলেছিলেন যে, উসমান ছাড়া আর কাউকেও খেলাফত দেয়া হবে না। কারণ এ বিষয়ে সকল ক্ষমতা আবদার রহমান ইবনে আউফ ও সাদ ইবনে ওয়াক্কাসকে দেয়া হয়েছে। আবদার রহমান হলো উসমানের ভগ্নিপতি এবং সাদ তার আত্মীয় ও গোত্রোদ্ভুত। এ দু'জন যে কোন উপায়ে উসমানকে খেলাফত দেবেই। এখানে একটা প্রশ্ন ওঠে যে, উমর নিজেই যখন উসমানের খেলাফত পাবার পথ পাকাপোক্ত করে গেছে সেখানে মুঘিরা কি জন্য উমর সম্পর্কে আমিরুল মোমেনিনের কাছে কিছু জানতে চেয়েছিল। এ অবস্থায় উমরের প্রতি আমিরুল মোমেনিনের মনোভাব নিশ্চয়ই মুঘিবার জানা ছিল। অপরপক্ষে পরামর্শক কমিটি যখন শর্ত আরোপ করেছিল যে, যিনি খলিফা হবেন তাকে তার পূর্ববর্তী খলিফাদ্বয়ের নীতি-প্রকৃতি মেনে চলতে হবে। আমিরুল মোমেনিন এ শর্ত মেনে নেননি। বরং তিনি বলেছিলেন যে, পূর্ববর্তী খলিফাদ্বয়ের নীতি-প্রকৃতি যদি কুরআন ও সুন্নাহ্ অনুযায়ী হয় তবে কে তা অমান্য করবে? আর যদি তা কুরআন ও সুন্নাহ্ বিরোধী হয়ে থাকে তবে কে তা পালন করবে? আমিরুল মোমেনিন বলেছেন উমর সুন্নাহ্ প্রতিষ্ঠিত করেছে ও বিদা'ত বিনষ্ট করেছে বলে মুঘিরা যে উক্তি করেছে তা ওপরের বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয় না। উমর যদি সুন্নাহ্ প্রতিষ্ঠিত করেই থাকে তবে তার নীতি না মেনে সুন্নাহ্ মান্য করার কোন অর্থ হয় না। সুতরাং মুঘিরার বক্তব্য বানোয়াট ছাড়া আর কিছুই নয়।

★★★★★

খোৎবা-২২৭

খলিফা হবার জন্য আমিরুল মোমেনিনের প্রতি বায়াত সম্পর্কে

আমার বায়াত গ্রহণের জন্য তোমরা আমার হাত তোমাদের দিকে টেনে নিয়েছিলে কিন্তু আমি হাত ফিরিয়ে নিয়েছি। আবার তোমরা আমার হাত টেনে ধরে রেখেছিলে কিন্তু আমি জোর করে তা সঙ্কুচিত করেছিলাম। তৎপর তৃষ্ণার্ত উট যেভাবে জলাধারে ভিড় করে তোমরাও সেভাবে আমার চারদিকে ভিড় করে এমন অবস্থার সৃষ্টি করেছিলে যে, আমার জুতা ছিঁড়ে গিয়েছিল, কাঁধের কাপড় পড়ে গিয়েছিল এবং দুর্বলেরা পদদলিত হয়েছিল। আমার বায়াত গ্রহণ করে মানুষ আনন্দে এতবেশী উল্লসিত হয়েছিল যে, শিশু-কিশোরগণ নাচতে শুরু করেছিল, বৃদ্ধরা কাঁপতে কাঁপতে (বার্ধক্যের কারণে) আমার কাছে চলে এসেছিল, রুগ্নগণ এলোপাতাড়িভাবে এবং কিশোরীগণ মাথার ঘোমটা ফেলে আমার দিকে ছুটে এসেছিলো।

★★★★★

খোৎবা-২২৮

আল্লাহ্‌কে ভয় করার উপদেশ

নিশ্চয়ই, আল্লাহ্‌র ভয় হেদায়েতের চাবিকাঠি, পরকালের পাথেয়, সকল গোলামীর মুক্তি এবং যে কোন ধ্বংস হতে নিষ্কৃতি পাবার উপায়। এতে মানুষের কৃতকার্যতা আসে, নিরাপত্তা লাভ করা যায় এবং জীবনের লক্ষ্য অর্জিত হয়।

সৎ আমল কর। এতে তোমাদের মূল্যবোধ বেড়ে যাবে, তওবা উপকারে আসবে, প্রার্থনা কবুল হবে, অবস্থা শান্তিপূর্ণ হবে, কেরামন কাতেবিনের (সম্মানিত লেখকদ্বয়) কলম সর্বদা চলতে থাকবে। বয়স পরিবর্তনের (বৃদ্ধ হবার) আগেই আমলে সালেহার দিকে দ্রুত এগিয়ে যাও। তা না হলে দীর্ঘ জ্বরা-ব্যধি ও মৃত্যু তোমাদের সে ক্ষমতা কেড়ে নিতে পারে। নিশ্চয়ই, মৃত্যু তোমাদের ভোগ-বিলাস নিঃশেষ করে দেবে, আনন্দ-উল্লাস বিনাশ করে দেবে এবং তোমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যাহত করে দেবে। মৃত্যু হলো অবাঞ্ছিত দর্শনার্থী, অপ্রতিরোধ্য শত্রু ও বেহিসাব হত্যাকারী। মৃত্যুর রশি তোমাদেরকে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে, এর কুফল তোমাদের চারদিকে ঘিরে রেখেছে, এর শর তোমাদের প্রতি তাক হয়ে আছে এবং লক্ষ্যভ্রষ্ট হবার কোন সম্ভাবনা নেই। তোমাদের ওপর মৃত্যুর নিয়ন্ত্রণ নিরঙ্কুশ এবং এর অত্যাচার লাগাতর।

সহসাই গাঢ় কালোছায়া, কঠিন পীড়া, দুঃখের অন্ধকার, বেদনার কাতরানি, ধ্বংসের শোক, অন্ধকারের বেষ্টনী ও মৃত্যুর বিস্বাদ তোমাদেরকে অসহায় করে ফেলবে। মনে হবে এটা আচমকা অতি সন্তর্পণে তোমার কাছে এসেছে এবং তোমাকে দলচ্যুত করে দিয়েছে। তোমার সকল ক্রিয়াকলাপ বিনষ্ট করে দিয়েছে, তোমার ঘর চুরমার করে দিয়েছে এবং তোমার কষ্টার্জিত সম্পদ ওয়ারিশগণের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করে দিয়েছে। অথচ এ ওয়ারিশগণ তোমার কোন উপকার করতে পারেনি এবং সাময়িক শোক প্রকাশ করলেও তোমাকে রক্ষা করতে পারেনি এবং ক'দিনের মধ্যেই তারা তোমাকে ভুলে আনন্দে মেতে ওঠবে।

সুতরাং এ পৃথিবী হতে রসদ সংগ্রহ করে পরপারের প্রস্তুতি গ্রহণ করা ও পরপারের জন্য নিজেকে তৈরী করা তোমাদের নিজেদের ওপর নির্ভর করে। এ দুনিয়া যেন তোমাদেরকে,প্রতারণা করতে না পারে সেদিকে সতর্ক থেকো। দুনিয়া তোমাদের পূর্ববর্তীগণকেও ধোকা দিয়েছে। তারা দুনিয়া হতে দুগ্ধ দোহন করেছিল, গাফলতি দ্বারা দুনিয়া হতে উপকৃত হয়েছিল এবং দীর্ঘদিন পৃথিবীতে থেকে বার্ধক্যপ্রাপ্ত হয়েছিল। তাদের বাসস্থানও কবরে হয়েছে এবং তাদের সম্পদের মালিকানা অন্যরা পেয়েছে। কে তাদের কবরের কাছে এসেছে তারা তা জানে না, যারা তাদের জন্য কাঁদে তাদের কান্না তারা শুনতে পায় না এবং কারো ডাকে তারা সাড়া দেয় না। ফলে এ দুনিয়া সম্বন্ধে সাবধান হও। কারণ দুনিয়া প্রতারক, প্রবঞ্চক ও ধোকাবাজ। দুনিয়া যা দেয় তা আবার কেড়ে নিয়ে যায়। দুনিয়ার আনন্দ চিরস্থায়ী নয়, এতে দুঃখ কষ্টের শেষ নেই এবং এতে দুর্যোগ কখনো থেমে থাকে না।

আত্মনিরোধীগণ দুনিয়াবাসীগণের অন্তর্ভূক্ত হলেও প্রকৃতপক্ষে তারা দুনিয়াবাসী নয়। কারণ তারা এমনভাবে থাকে যেন তারা দুনিয়ার মধ্যে নেই। তারা এখানে যা কিছু পর্যবেক্ষণ করে তদানুযায়ী কাজ করে এবং যা তারা ভয় করে তা দ্রুত এড়িয়ে যায়। এ পৃথিবীতে তারা এমনভাবে থাকে যেন তাদের শরীর পরকালবাসীদের মধ্যে চলাফেরা করে। তারা দেখে যে, দুনিয়াবাসীগণ দেহের মৃত্যুকে গুরুত্ব দেয়, কিন্তু তারা নিজেরা জীবিতদের আত্মার মৃত্যুকে গুরুত্ব দেয়।

★★★★★

খোৎবা-২২৯

রাসুল (সঃ) সম্বন্ধে

(বসরার পথে জিকর নামক স্থানে আমিরুল মোমেনিন এ খোৎবা দিয়েছিলেন। ঐতিহাসিক ওয়াকিদি তার রচিত "কিতাবুল জামাল" গ্রন্থে এটা উল্লেখ করেছেন।)

রাসুল (সঃ) যা কিছু আদিষ্ট হয়েছেন উহাই প্রকাশ করে গেছেন এবং তিনি তাঁর প্রভুর বাণী যথাযথভাবে পৌছে দিয়ে গেছেন। ফলে মহিমান্বিত আল্লাহ্ তার মাধ্যমে ফাটল মেরামত করেছেন, খন্ড-বিখন্ডকে জোড়া

লাগিয়েছেন এবং জ্ঞাতিদের মধ্যে স্নেহ-মমতা সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু তারা তাদের বক্ষে ঘোরতর শত্রুতা ও হৃদয়ে গভীর বিদ্বেষ পোষণ করতো।

★★★★★

খোৎবা-২৩০

আবদুল্লাহ্ ইবনে জামাআহ্ নামক আমিরুল মোমেনিনের একজন অনুচর বায়তুল মাল হতে কিছু টাকা চেয়েছিল। তখন আমিরুল মোমেনিন বলেন ঃ

এ টাকা তোমারও নয় আমারও নয়। এটা মুসলিম জনসাধারনের সম্পদ এবং এটা তাদের তরবারির অর্জন। যদি তুমি তাদের সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে তবে তুমিও তাদের সমান অংশ পেতে। কাজেই তাদের হাতের অর্জিত অর্থ তাদের মুখ ছাড়া অন্য কারো মুখে যেতে পারে না।

★★★★★

খোৎবা-২৩১

জা'দাহ্ ইবনে হুবায়রাহ্ আল-মখযুমির[১] খোৎবা প্রদানের অক্ষমতা প্রসঙ্গে

জেনে রাখো, জিহ্বা মানুষের শরীরের একটা অংশ। যদি মানুষ এটাকে নিবৃত্ত রাখে তবে বক্তব্য তাকে সহযোগিতা করবে না। আর যদি এটাকে প্রসারিত করা হয় তবে বক্তব্য তাকে থেমে যাবার সুযোগ দেবে না। নিশ্চয়ই, আমরা বক্তৃতার মাষ্টার। বক্তৃতার শিরা-উপশিরা আমাদের মাঝে নির্ধারিত এবং এর শাখা-প্রশাখা আমাদের ওপর ঝুলে আছে।

জেনে রাখো— তোমাদের ওপর আল্লাহ্‌র আশীর্বাদ বর্ষিত হোক, তোমরা এমন এক সময়ে রয়েছো যখন ন্যায় কথা বলার লোকের সংখ্যা নগণ্য— যখন সত্য বিষয় বলতে জিহ্বা আড়ষ্ট হয়ে আসে এবং যারা ন্যায়ের প্রতি অটল থাকে তারা অবমানিত হয়। এখনকার মানুষ অবাধ্যতায় লিপ্ত। এখনকার যুবকেরা দুষ্ট প্রকৃতির, বৃদ্ধরা পাপী, শিক্ষিতগণ মোনাফিক এবং বক্তারা তোষামুদে। এদের বয়ঃকনিষ্ঠগণ বয়ঃজ্যেষ্ঠকে শ্রদ্ধা করে না এবং এদের ধনীগণ দরিদ্রগণকে সাহায্য করে না।

১। একদা আমিরুল মোমেনিন তাঁর ভাগিনেয় জা'দাহ্ ইবনে হুবায়রাহ্ আল-মখযুমিকে খোৎবা দেয়ার জন্য বলেছিলেন। কিন্তু বক্তৃতায় দাঁড়ালে তার জিহ্বা তোতলাতে শুরু করেছিল। এতে সে কোন কিছুই উচ্চারণ করতে পারেনি। এমতাবস্থায় আমিরুল মোমেনিন মিম্বারে আরোহণ করে একটা সুদীর্ঘ খোৎবা প্রদান করেছিলেন। সে খোৎবার কিছু অংশ আল-রাজী এখানে সংকলন করেছেন।

★★★★★

খোৎবা-২৩২

মানুষের বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি বিভিন্ন হবার কারণ সম্পর্কে এ খোৎবাটি আহ্মদ ইবনে কুতায়বাহ্ হতে জিলিব ইয়েমেনী, তিনি আবদুল্লাহ্ ইবনে ইয়াজিদ হতে এবং তিনি মালিক ইবনে জিহায়াহ্ হতে বর্ণনা করেছেন। মালিক বলেন, "একদিন আমরা আমিরুল মোমেনিনের সাথে মানুষের বৈশিষ্ট্য ও আচরণের বিভিন্নতা সম্পর্কে আলোচনা উত্থাপন করলাম। তখন তিনি বললেন":

মানুষের মধ্যে বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতিগত বিভিন্নতার কারণ হলো তাদের মাটির উৎসের[১] বিভিন্নতা (যে মাটি হতে তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে)। হয় লবণাক্ত মাটি, না হয় মিষ্ট মাটি, না হয় শক্ত মাটি, না হয় কোমল মাটি হতে সৃষ্টির কারণে তাদের মধ্যে বিভিন্নতা দেখা যায়। মাটির সাদৃশ্যের কারণে মানুষের মধ্যে সাদৃশ্য হয়ে থাকে এবং মাটির বিসাদৃশ্যের কারণে মানুষের মধ্যে বিভিন্নতা দেখা যায়। সুতরাং কখনো সুন্দর আকৃতির মানুষও বুদ্ধিমত্তায় দুর্বল হয়ে থাকে; লম্বা গড়নের মানুষও ভীরু প্রকৃতির হয়ে থাকে; কুৎসিত চেহারার লোকও ধার্মিক হয়ে থাকে; খাট গড়নের লোকও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হয়ে থাকে; সুস্বভাবের লোকও মন্দ বৈশিষ্ট্যের হয়ে থাকে; জটিল হৃদয়ের লোকও বিভ্রান্ত মনের হয়ে থাকে এবং তীক্ষ্ণ কথার লোকও জাগ্রত হৃদয়ের হয়ে থাকে।

১। আমিরুল মোমেনিন বর্ণনা করেছেন যে, মানুষের বৈশিষ্ট্য ও চরিত্র বিভিন্ন হবার মূল কারণ হলো— যে মাটি হতে তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে সে মাটির উৎসের বিভিন্নতা। মাটির উৎসের বৈশিষ্ট্য অনুসারেই তাদের বৈশিষ্ট্য ও চরিত্র গঠিত হয়ে থাকে। সুতরাং সমগোত্রীয় মাটির মানুষের মানসিক বিকাশ ও চিন্তা-চেতনার ভাবধারা একই রকম হয়ে থাকে। কোনকিছুর উৎস বলতে ওটাকে বুঝায় যার ওপর উহার অস্তিত্বে আসা নির্ভরশীল। কিন্তু এটা অস্তিত্বের কারণ নহে। আরবীতে 'তিন' শব্দের বহুবচন 'তিনাহ্' যা উৎস অথবা ভিত্তি বুঝায়। এখানে 'তিনাহ্' বলতে বীর্যকে বুঝানো হয়েছে যা বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে মানুষের আকৃতি ধারণ করে। এর মূলোৎস বলতে সে সব উপাদানকে বুঝানো হয়েছে যা বীর্যের উৎপত্তির সহায়ক। তাই লবণাক্ত, মিষ্ট, কোমল ও শক্ত শব্দগুলো দ্বারা বীর্যের মৌলিক উপাদানকে বুঝানো হয়েছে। যেহেতু মৌলিক উপাদানগুলোতে বিভিন্ন প্রকার গুণাবলী থাকে সেহেতু উহা হতে উৎপন্ন বীর্যও বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের হয়ে থাকে। ফলে মানুষের বৈশিষ্ট্য ও আচরণ বিভিন্ন রকমের হয়।

হাদীদ [১৫২] (১৩শ খন্ড, পৃঃ১৯) লিখেছেন যে, 'তিনাহ্র মৌল' বলতে সেসব সংরক্ষক উপাদনকে বুঝায় যা ভিন্ন ভিন্ন গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যের হয়ে থাকে। প্ল্যাটো এবং অন্যান্য দার্শনিকগণও এ বিষয়ে একই ধারনা পোষণ করে। এগুলোকে তিনাহ্র মৌল বলার কারণ হলো এরা মানবদেহের জন্য আশ্রয় হিসেবে কাজ করে এবং উপাদানগুলোর বিভাজন প্রতিহত করে। কোন কিছুর অস্তিত্ব যেভাবে উহার ভিত্তির ওপর নির্ভর করে, একইভাবে দেহের অস্তিত্ব সংরক্ষক উপাদানের (Preservative factors) ওপর নির্ভরশীল। যতক্ষণ সংরক্ষক উপাদান থাকবে ততক্ষণ দেহ ভাঙ্গন ও বিখন্ডায়ন হতে নিরাপদ থাকবে এবং উপাদনগুলোও বিভাজন ও বিচ্ছুরণ হতে রক্ষা পায়। সংরক্ষক উপাদান দেহ ত্যাগ করলে অন্যান্য উপাদানও বিচ্ছুরিত হয়ে পড়ে।

এসব ব্যাখ্যা দ্বারা আমিরুল মোমেনিনের বক্তব্য হতে বুঝা যায় যে, আল্লাহ্ বিবিধ মৌল উপাদান সৃষ্টি করেছেন যার মধ্যে কতেক দূষিত, কতেক বিশুদ্ধ, কতেক দুর্বল ও কতেক শক্তিশালী এবং মানুষ তার মৌল উপাদান অনুযায়ী আচরণ ও কার্য করে। যদি কোন দু'ব্যক্তির মাঝে সাদৃশ্য পাওয়া যায় তবে বুঝতে হবে যে, তাদের মৌল উপাদান অভিন্ন। ফলে দু'ব্যক্তির মধ্যে বিসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হলেও বুঝতে হবে এটা মৌল উপাদানের কারণেই।

যাহোক, মানুষের বৈশিষ্ট্য ও আচরণে বিভিন্নতার কারণ মৌল উপাদান বা প্রাথমিক গঠন মানতে হলে মানুষের কর্মকান্ডে নির্ধারিত ভাগ্যলিপির কথা স্বীকার করতে হয়। সেক্ষেত্রে 'ইচ্ছার স্বাধীনতা' স্বীকার করা যায় না। যদি মানুষের

চিন্তা-চেতনা ও কর্মকান্ড 'তিনাহ্র' ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে তবে যা নির্ধারিত আছে তা ঘটবেই এবং সে কারণে কাউকে ভাল কাজের জন্য প্রশংসা করা অথবা খারাপ কাজের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা যায় না। কিন্তু এ 'হাইপোথেসিস' সঠিক নহে। কারণ সৃষ্টি অস্তিত্বে আসার পরে মহিমান্বিত আল্লাহ্ যেভাবে এর সবকিছু জানেন সেভাবে অস্তিত্বশীল হবার পূর্বেও তিনি উহা জানতেন। এটা প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, মানুষ মুক্ত-ইচ্ছা দ্বারা কি করবে আর কি করবে না এটা মহিমান্বিত আল্লাহ্ জানতেন। সুতরাং আল্লাহ্ মানুষকে স্বাধীন ইচ্ছানুযায়ী কাজ করার ক্ষমতা দিয়েছেন এবং উপযুক্ত 'তিনাহ্' হতে তাকে সৃষ্টি করেছেন। এ 'তিনাহ্' তার কর্মকান্ডের কারণ নহে এবং তার মুক্ত ইচ্ছার প্রতিফলনে বাধার সৃষ্টি করে না। 'উপযুক্ত তিনাহ্ হতে সৃষ্টি করা দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, আল্লাহ্ জোরপূর্বক মানুষের পথে বাধার সৃষ্টি করেন না। কিন্তু মানুষ তার মুক্ত ইচ্ছা দ্বারা যে পথে যেতে চায় আল্লাহ্ সে পথে যাবার অনুমতি দেন।

(ইচ্ছার স্বাধীনতা বিষয়ে উপরোক্ত অভিমতের সাথে বাংলা অনুবাদক দ্বিমত পোষণ করে। মানুষ সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাধীন একথা স্বীকার করা যায় না। ধরা যাক, একজন লোক ইচ্ছা করলে এক পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে অন্য পা শূন্যে তুলে রাখতে পারে। কিন্তু সে ইচ্ছা করলেই দু'পা শূন্যে তুলে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। এতে স্পষ্ট বুঝা যায় মানুষ একই সাথে স্বেচ্ছাধীন ও আল্লাহ্র ইচ্ছাধীন। মূলতঃ আল্লাহ্র ইচ্ছাধীন সব কিছুতেই সম্ভাবনাময় শুভ বা মঙ্গল নিহিত। সে কারণেই আল্লাহ্ মঙ্গলময়। কিন্তু 'তিনাহ্র' প্রভাব হোক আর ইচ্ছার কারণেই হোক সে শুভ আমল না করলেই অমঙ্গল সংঘটিত হয়। একটা আমের আঁটি হাতে নিয়ে চিন্তা করলে দেখা যাবে আঁটিটির মধ্যে একটা সম্ভাবনাময় প্রকান্ড আম গাছ রয়েছে যাতে অনেক সুমিষ্ট আম ফলতে পারে। এ সম্ভাবনাটির প্রধান শর্ত হলো আঁটিটিকে উপযুক্ত মাটিতে পুতে রাখতে হবে। মাটিতে না পুতে আঁটিটিকে দেয়ালে টাঙ্গিয়ে রাখলে উক্ত সম্ভাবনা কখনো বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করবে না।

আল্লাহ্ জোর করে দেয়ালে ঝুলানো আঁটি হতে প্রকান্ড আম গাছ বানিয়ে দেবেন না। এ শর্তটি হলো- 'তিনাহ্'—বাংলা অনুবাদক)

★★★★★

খোৎবা-২৩৩

রাসুলকে (সঃ) শেষ গোসল দিয়ে কাফন পরানোর সময় এ খোৎবা দিয়েছিলেন।

আপনার জন্য আমার পিতা-মাতা কুরবানী হোক, হে আল্লাহ্র রাসুল, আপনার দেহত্যাগের সাথে সাথে নবুওয়াতের ধারা, ঐশী প্রত্যাদেশ নাজেল ও স্বর্গীয় বাণী চিরতরে বন্ধ হয়ে গেল যা অন্য নবীদের বেলায় হয়নি। আপনার আহলুল বাইতের কাছে আপনার মর্যাদা এতই বিশেষ ধরনের যে, আপনার শোক আমাদের কাছে সান্ত্বনার উৎস হয়ে গেছে যা অন্যদের হয়নি। আপনার তিরোধানের শোকে সাধারনভাবে সকল মুসলিমই অংশীদার। ধৈর্যধারণ করতে যদি আপনি আদেশ না দিতেন এবং বিলাপ করতে নিষেধ না করতেন তবে আমরা অশ্রুর জলাধার সৃষ্টি করতাম এবং তাতেও আপনাকে হারাবার ব্যথা উপশম হতো না, আমাদের শোক নিবারিত হতো না। আমাদের যে কোন শোক আপনাকে হারাবার শোকের তুলনায় অতি নগণ্য। কিন্তু মৃত্যু এমন এক ব্যাপার যা পরিবর্তন করা যায় না—ফেরানো যায় না। আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবানী হোক; আল্লাহ্র কাছে আমাদেরকে স্মরণ করবেন এবং আমাদের প্রতি খেয়াল রাখবেন।

★★★★★

খোৎবা-২৩৪

হিজরতের পর[১] রাসুলের সাথে সাক্ষাৎ হবার পূর্ব পর্যন্ত নিজের অবস্থা এ খোৎবায় বর্ণনা করেছেন

রাসুল (সঃ) যে পথে গেছেন সে পথ অনুসরণ করে আমি চলতে লাগলাম এবং আল-আর্‌জ পৌছার পূর্ব পর্যন্ত যে পথের কথা তিনি বলে গিয়েছিলেন সে পথ স্মরণ করেই অগ্রসর হয়েছিলাম।

১। নবুয়ত প্রকাশের পর হতে ১৩ বছর রাসুল (সঃ) মক্কায় ছিলেন। মক্কী জীবনের এ ১৩ টি বছর তিনি নিদারুণ অত্যাচার ও নিপীড়িন ভোগ করেছিলেন। কোরেশ কাফেরগণ তাঁর জীবিকার সকল দ্বার পর্যন্ত রুদ্ধ করে দিয়েছিল। তাকে দুঃখ-কষ্ট দেয়ার কোন পথ হতে তারা বিরত থাকেনি। এমন কি তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রেও তারা লিপ্ত হয়েছিল। তাদের নেতৃস্থানীয় ৪০ জন লোক 'দর-আন-নাদওয়াহ' নামক স্থানে বৈঠক করে তাঁকে হত্যা করার শলা-পরামর্শ পূর্বক সাব্যস্ত করলো যে, প্রত্যেক গোত্রের একজন করে একত্রিত হয়ে যৌথভাবে তাঁকে আক্রমণ করে হত্যা করবে। এতে বনি হাশিম সকল গোত্রের সাথে মোকাবেলা করার সাহস পাবে না এবং তাতে রক্তের মূল্য দিয়ে দিলেই বনি হাশিম শান্ত হয়ে যাবে। তাদের এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তাঁরা ১লা রবিউল আউয়াল রাতে রাসুলের ঘরের আশে-পাশে ওৎপেতে বসেছিল যাতে রাসুল (সঃ) ঘুমিয়ে পড়লে তাঁকে আক্রমণ করা যায়। এদিকে আল্লাহ্ তাদের সকল পরিকল্পনা রাসুলকে জানিয়ে দিয়ে আলীকে তাঁর বিছানায় শুইয়ে রেখে মদীনায় হিজরত করার আদেশ দিলেন। রাসুল (সঃ) আলীকে ডেকে পাঠালেন এবং তাঁর কাছে সবকিছু ব্যক্ত করে বললেন, "আলী, আমার বিছানায় শুয়ে থাক।' আলী বললেন, "হে আল্লাহ্‌র রাসুল, এতে কি আপনার জীবন রক্ষা পাবে।" রাসুল (সঃ) বললেন, "হাঁ।" আলী সেজদায় পড়ে শুকরিয়া আদায় করে রাসুলের বিছানায় শুয়ে পড়লেন। রাসুল (সঃ) পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। গভীর রাতে কোরেশ কাফেরগণ উঁকি-ঝুঁকি দিয়ে আক্রমণের প্রস্তুতি নিয়েছিল। এ সময় আবু লাহাব বললো, "ঘরের মধ্যে নারী ও শিশু আছে। ফলে এত রাতে আক্রমণ করা ঠিক হবে না। ভোরবেলা আক্রমণ করো। কিন্তু ভোর হবার পূর্ব পর্যন্ত ভালভাবে পাহারা দাও যাতে অন্যত্র সরে যেতে না পারে।" ফলে সারারাত তারা পাহারায় ছিল। ভোরের আলো দেখা দিতে না দিতেই তারা ঘরের চারদিকে ঘেরাও করলো। তাদের পায়ের শব্দ শুনে আমিরুল মোমেনিন মুখের কাপড় সরিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। কোরেশগণ স্তম্ভিত হয়ে ভাবতে লাগলো এটা কি যাদু নাকি বাস্তব ঘটনা। তারা জিজ্ঞেস করলো, "মুহাম্মদ কোথায়?" আলী উত্তর দিলেন, "তোমরা কি তাঁকে আমার কাছে রেখে গিয়েছিলে যে এখন আমাকে জিজ্ঞেস করছো।" এতে তারা নিরুত্তর হয়ে তাঁর পিছু ধাওয়া করতে লাগলো কিন্তু ছাওয়ার গুহার পরে আর কোন পদচিহ্ন দেখতে না পেয়ে হতবুদ্ধি হয়ে ফিরে এলো। রাসুল (সঃ) তিন দিন ঐ গুহায় অবস্থান করে মদিনাভিমুখে যাত্রা করলেন। এ তিন দিন আমিরুল মোমেনিন মক্কায় থেকে রাসুলের কাছে আমানত দেয়া সবকিছু মানুষকে ফেরত দিয়ে মদিনা অভিমুখে যাত্রা করলেন। মক্কা ও মদিনার মধ্যবর্তী আল-আর্‌জ নামক স্থানে পৌছার পূর্ব পর্যন্ত তিনি রাসুলের সংবাদ পেতে থাকলেন এবং ১২ই রবিউল আউয়াল তিনি কুবায় রাসুলের সাথে মিলিত হয়ে মদিনায় প্রবেশ করলেন (তাবারী [৭৪], ৯ম খন্ড, পৃঃ ১৪৮-১৫১; আছীর [২], ১ম খন্ড, পৃঃ ১২৩২-১২৩৪; সাদ, [১৩৭] ১ম খন্ড, পৃঃ ১৫৩-১৫৪; হিশাম, [১৬৯] ২য় খন্ড, পৃঃ ১২৪-১২৮; আছীর [১], ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ২৫; আছীর [২], ২য় খন্ড, পৃঃ ১০১-১০৪; কাছীর [৪০], ২য় খন্ড, পৃঃ ৩০২-৩০৩; তাবারী, [৭৫] ৩য় খন্ড, পৃঃ ১৮০-১৮১; হাদীদ [১৫২], ১৩শ খন্ড, পৃঃ ৩০৩-৩০৬; শাফী, [১২১] ৩য় খন্ড, পৃঃ ১৭৯-১৮০; মজলিসী, [১০৩] ১৯শ খন্ড, পৃঃ ২৮-১০৩)।

★★★★★

খোৎবা-২৩৫

মৃত্যুর পূর্বে আখেরাতের রসদ সংগ্রহ প্রসঙ্গে

আমলে সালেহা কর যদিও তোমরা জীবনের বিশালতার মধ্যে আছো। এখনো তোমাদের আমল রেকর্ড করার জন্য বই খোলা আছে, এখনো তওবা কবুল হবার সময় আছে। আমলের আলো নিভে যাবার আগে যারা আল্লাহ্ হতে দৌড়ে পালাচ্ছে তাদেরকে আহ্বান করা হচ্ছে এবং যারা পাপী তাদেরকে ক্ষমা করার আশ্বাস দেয়া হচ্ছে। সুতরাং সময় শেষ হবার আগে, জীবন প্রদীপ নির্বাপিত হবার আগে, তওবার দরজা বন্ধ হবার আগে এবং ফেরেশতাগণ আকাশে উঠে যাবার আগে আমলে সালেহায় ব্যাপৃত হও।

কাজেই, নিজের জন্যই নিজের কাছ থেকে সুবিধা গ্রহণ করা মানুষের উচিত। মৃতের জন্য জীবিতের কাছ থেকে, অবিনশ্বরের জন্য নশ্বরের কাছ থেকে এবং অবস্থানকারীদের জন্য বিদায়ীদের কাছ থেকে উপকার গ্রহণ করা তাদের উচিত। আল্লাহ্কে ভয় করা মানুষের উচিত, কারণ তাকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবিত থেকে আমল করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। মানুষের উচিত শক্ত হাতে লাগাম ধরে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং এ লাগাম এমনভাবে ধরতে হবে যেন আল্লাহ্র অবাধ্যতা হতে বিরত থেকে আল্লাহ্র আনুগত্যের দিকে এগিয়ে যাওয়া যায়।

★★★★★

খোৎবা-২৩৬

সিফফিনের সালিশদ্বয় (আবু মুসা আল-আশআরী ও আমর ইবনে আস) ও সিরীয়দের হীনমন্যতা সম্বন্ধে

অসভ্য, রূঢ় ও নীচ দাসদেরকে চারিদিক হতে সংগ্রহ করা হয়েছে এবং নীচ প্রকৃতিগণের বিভিন্ন দল হতে তাদেরকে তুলে আনা হয়েছে। তাদেরকে ইসলামের বিধান ও শৃঙ্খলা শিক্ষা দেয়ার প্রয়োজন রয়েছে। এসব বিষয়ে কারো প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে তাদেরকে হাতেখড়ি দিয়ে প্রশিক্ষণ দেয়ার প্রয়োজন। কারণ তারা মুহাজির নয়, আনসারও নয় এবং তারা মদিনায় বসবাসকারী ইমানদারও নয়।

দেখ! তারা এমন একজনকে সালিশ মনোনীত করেছে যে ব্যক্তি তারা যা চায় উহার অতিনিকটবর্তী। আর তোমরা এমন একজনকে মনোনীত করেছো যে ব্যক্তি তোমরা যা অপছন্দ কর উহার খুবই নিকটবর্তী। নিশ্চয়ই তোমাদের মনে আছে যে সেদিন আবদুল্লাহ্ ইবনে কায়েস (আবু মুসা) বলেছিল, "এটা (সিফফিনের যুদ্ধ) একটা ফেতনা। কাজেই তোমাদের ধনুকের রশি কেটে দাও এবং তরবারি কোষবদ্ধ করো।" যদি তার বক্তব্য ঠিক হয়ে থাকে তাহলে জোর-জবরদস্তি ছাড়া আমাদের সাথে এগিয়ে আসা তার ভুল হয়েছে। যদি তার বক্তব্য মিথ্যা হয়ে থাকে তবে তাকে সন্দেহ করা উচিত। সুতরাং আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসকে আমর ইবনে আ'সের মোকাবেলায় পাঠাও। এ দিনগুলোর সদ্ব্যবহার করো এবং ইসলামের সীমান্ত ঘিরে থাকো। তোমরা কি দেখো না তোমাদর শহরগুলো আক্রান্ত হচ্ছে এবং তোমাদের শৌর্য ও বিক্রম তাদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হচ্ছে।

★★★★★

খোৎবা-২৩৭

আহ্লুল বাইত সম্পর্কে

তাঁরা হলেন জ্ঞানের জীবন ও অজ্ঞতার মৃত্যু। তাঁদের ধৈর্যই তোমাদেরকে তাদের জ্ঞান সম্পর্কে বলে দেবে এবং তাদের প্রজ্ঞার নীরবতাই তাঁদের মুখের কথা। তাঁরা কখনো ন্যায়ের বিপক্ষে যায় না এবং ন্যায় বিষয়ে কখনো তারা নিজেদের মধ্যে দ্বিমত পোষণ করে না। তাঁরা হলেন ইসলামের স্তম্ভ এবং ইসলামের সংরক্ষণাগার। তাঁদের দ্বারাই সত্য ও ন্যায় উহার অবস্থান ফিরে পেয়েছে এবং অন্যায় দূরীভূত হয়েছে ও অন্যায়ের জিহ্বা কেটে ফেলা হয়েছে। তাঁরা মনোযোগ ও সতর্কতার সাথে গভীরভাবে দ্বীনকে বুঝেছে। শুধুমাত্র প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধে বিশ্বাস স্থাপন করে বা বর্ণনাকারীদের নিকট শুনে শুনে তাঁরা দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করেনি। দ্বীনের বর্ণনাকারী অনেক হলেও দ্বীনকে প্রকৃতভাবে বুঝার মত লোকের সংখ্যা নগণ্য।

★★★★★

খোৎবা-২৩৮

যখন উসমান ইবনে আফফানকে জনগণ ঘেরাও করেছিল তখন আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস উসমানের একখানা পত্র আমিরুল মোমেনিনের কাছে নিয়ে এসেছিল যাতে উসমান ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল যে, আমিরুল মোমেনিন যেন তার ইয়ানবু এষ্টেটে চলে যান এবং তাতে তাঁর খলিফা হওয়া সম্বন্ধে যে দাবী উত্থাপিত হয়েছে তা চাপা পড়ে যাবে। উসমান এর আগেও এরূপ অনুরোধ করেছিল। পত্র পেয়ে আমিরুল মোমেনিন বলেন ঃ

হে ইবনে আব্বাস ! উসমান আমার সাথে পানি-টানা উটের মত ব্যবহার করছে। পানি-টানা উট যেরূপ মশক নিয়ে একবার পেছনে আবার সামনের দিকে যায়, সে চায় আমিও যেন তদ্রুপ করি। একবার সে আমাকে খবর পাঠালো আমি যেন চলে যাই। আবার সে খবর পাঠালো আমি যেন ফিরে আসি। এখন আবার সে খবর পাঠায় আমি যেন চলে যাই। আল্লাহ্র কসম, আমি ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে রক্ষা করার চেষ্টা চালিয়ে যাব যে পর্যন্ত আমি পাপী না হয়ে যাই।

★★★★★

খোৎবা-২৩৯

নিজের লোকদেরকে জিহাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে আরাম-আয়েশ পরিহার করার উপদেশ।

আল্লাহ্ চান তোমরা যেন তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকো এবং তিনি তাঁর কাজ তোমাদের নিকট অর্পণ করেছেন। তিনি তোমাদেরকে সীমিত সময় ও সীমিত জীবন-ক্ষেত্র নির্ধারণ করে দিয়েছেন যেন তোমরা তাঁর পুরস্কার পাবার জন্য একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করতে পার। সুতরাং শক্ত করে তোমাদের কটিবন্ধ বেঁধে নাও এবং পরনের কাপড় এঁটে নাও। সাহসিকতা ও ভোজন বিলাসিতা একসাথে চলতে পারে না। দিনের অনেক বড় বড় কাজেও নিদ্রা দুর্বলতার সৃষ্টি করে এবং নিদ্রার অন্ধকার সাহসের স্মৃতি মুছে ফেলে।

★★★★★

দ্বিতীয় অধ্যায়

আমিরুল মোমেনিনের পত্রাবলী ও নির্দেশাবলী

পত্র–১

মদিনা হতে বসরাভিমুখে[১] যাত্রাকালে কুফার জনগণকে লিখেছিলেন

আল্লাহ্র বান্দা ও মোমেনগণের কমান্ডার আলীর নিকট হতে কুফার জনগণের প্রতি যারা সহায়তা দানে অগ্রণী ও আরবদের প্রধান।

উসমানের ওপর যা আপতিত হয়েছিল এখন আমি তা এমন সঠিকভাবে তোমাদের কাছে বর্ণনা করছি যাতে তোমরা স্বচক্ষে দেখার মত বুঝতে পার। জনগণ তার সমালোচনা করেছিল। মুহাজিরদের মধ্যে আমিই একমাত্র ব্যক্তি যে মুসলিমদের সন্তুষ্ট রাখার এবং ক্ষেপিয়ে না তোলার জন্য তাকে উপদেশ দিয়েছিল। তালহা ও জোবায়র তার বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল এবং তারা তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিল। আয়শাও তার ওপর খুব ক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিল। ফলে একটি দল তাকে আক্রমণ করে হত্যা করেছিল। তৎপর জনগণ আমার কাছে বায়াত গ্রহণ করে। এ বায়াতে কোন প্রকার জোর-জবরদস্তি ছিল না বা কাউকে বায়াত গ্রহণে বাধ্য করা হয়নি। স্বেচ্ছায় ও স্বাধীনভাবে তারা বায়াত গ্রহণ করেছে।

তোমরা জেনে নাও, মদিনা আজ জনশূন্য হয়ে পড়েছে। বিদ্রোহ দমনের জন্য মদিনা আজ বিশাল পাত্রের ফুটন্ত পানির ন্যায় উত্তপ্ত হয়ে আছে। অপরদিকে বিদ্রোহীরাও পূর্ণ শক্তি নিয়ে তাদের অক্ষরেখায় আবর্তিত হচ্ছে। সুতরাং তোমরা তোমাদের আমীরের (কমান্ডার) দিকে দ্রুত এগিয়ে আস— এগিয়ে আস তোমাদের শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ করতে। যদি তোমরা তা কর তবে সর্বশক্তির আধার আল্লাহ্ তোমাদের ওপর সন্তুষ্ট হবেন।

১। বাহারানী[১০১] (৪র্থ খন্ড, পৃঃ ৩৩৩) লিখেছেন যে, তালহা ও জোবায়র কর্তৃক ফেতনা সংঘটনের সংবাদ শুনেই আমিরুল মোমেনিন বসরা অভিমুখে যাত্রা করেছিলেন। পথিমধ্যে মা'আল আয্ব নামক স্থান হতে তিনি স্বীয় পুত্র ইমাম হাসান ও আম্মার ইবনে ইয়াসিরের মারফত কুফাবাসীদের নিকট এ পত্র প্রেরণ করেন।

হাদীদ[১৫২] (১৪শ খন্ড, পৃঃ ৮-১৬), আছীর[২] (৩য় খন্ড, পৃঃ ২২৩) ও তাবারী[৭৫] (১ম খন্ড, পৃঃ ৩১৩৯) লিখেছেন যে, বসরার বিদ্রোহ দমনের জন্য যাত্রা করে আমিরুল মোমেনিন পথিমধ্যে আর-রাবাযাহ নামক স্থানে ক্যাম্প করেছিলেন। যে ক্যাম্প হতে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র মুহাম্মদ ইবনে জাফর ও মুহাম্মদ ইবনে আবু বকরের মারফত এ পত্র প্রেরণ করেছিলেন। এ পত্রে আমিরুল মোমেনিন প্রকাশ্যে বলেছেন যে, উসমানের হত্যা মূলতঃ আয়শা, তালহা ও জুবায়রের প্রচেষ্টার ফল এবং তারাই এ হত্যাকান্ডে প্রধান ভূমিকা পালন করেছে। বস্তুতঃপক্ষে আয়শা এতই উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন যে, তিনি প্রকাশ্য জনসভায় উসমানের দোষত্রুটি প্রকাশ করে তাকে হত্যা করা জায়েজ বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন।

আবদুহ[৭] (২য় খন্ড, পৃঃ ৩), ফিদা[৮৯] (১ খন্ড, পৃঃ ১৭২) ও বালাজুরী[১০০] (৫ম খন্ড, পৃঃ ৮৮) লিখেছেন ঃ

> *একদিন উসমান মিম্বারের ওপর ছিলেন। এমন সময় উম্মুল মোমেনিন আয়শা তার বোরখার ভেতর হতে রাসুলের (সঃ) জুতা ও কামিজ বের করে বললেন, "এ জুতা ও কামিজ আল্লাহ্র রাসুলের যা এখনো বিনষ্ট হয়নি। এরই মধ্যে তোমরা তাঁর দ্বীন ও সুন্নাহ্ পরিবর্তন করে ফেলেছো।" আয়শার কথায় উসমান ক্ষেপে গিয়ে তার সাথে উচ্চবাচ্য শুরু করেছিল। কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে আয়শা বললেন," এ নাছালকে হত্যা করা জায়েজ" (নাছাল অর্থ হলো—লম্বা দাড়িওয়ালা ইহুদী)।*

এমনিতেই জনগণ উসমানের ওপর অসন্তুষ্ট ও ক্ষিপ্ত ছিল। এ ঘটনা তাদের সাহস আরো বাড়িয়ে দিল এবং তারা তাকে ঘেরাও করে দু'টি দাবী পেশ করেছিল। দাবীগুলো হলো—উসমান তার ভুল-ভ্রান্তি সংশোধন করবে, না হয় খেলাফত হতে সরে যাবে। ঘেরাওকারীগণ এত বেশী ক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিল যে, তাদের দু'টো দাবীর যে কোন একটা মেনে না নিলে উসমান নিহত হবার সম্ভাবনা প্রকট হয়ে উঠেছিল। আয়শা অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছিলেন কিন্তু তিনি কোন কথা বলেননি। বরং

উসমানকে অবরোধে ফেলে তিনি মক্কা চলে যাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এ সময় মারওয়ান ইবনে হাকাম ও আত্তাব ইবনে আসিদ আয়শার কাছে এসে তাকে বললো, "আপনি এখন মক্কা যাওয়া স্থগিত করলে উসমানের জীবন রক্ষা করা সম্ভব হবে এবং জনতা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে।" তাদের কথায় আয়শা বললেন যে, তিনি হজ্ব করার নিয়্যত করেছেন। কাজেই তা পরিবর্তন করা সম্ভব হবে না। এতে মারওয়ান একটা প্রবাদ বাক্য বললো, যার অর্থ হলো ঃ

কায়েস আমার নগরে আগুন লাগিয়ে দিলো,
এবং যখন অগ্নিশিখা জ্বলে উঠলো,
সে নিজকে রক্ষা করে কেটে পড়লো।

একইভাবে তালহা ও জুবায়র উসমানের ওপর ক্ষিপ্ত ছিল এবং তারাই উসমানের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ঘনীভূত করা ও বিদ্রোহের আগুন প্রজ্জ্বলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল। এ দৃষ্টিকোণ থেকে তারাই উসমানের হত্যাকান্ডের জন্য দায়ী এবং তারাই তাতে অংশগ্রহণকারী। অধিকাংশ মানুষ তাদের কর্মকান্ড সম্বন্ধে অবহিত ছিল এবং তাদেরকেই উসমানের খুনী বলে মনে করতো। তাদের সমর্থকগণও তাদের এ অপরাধ খণ্ডন করে কোন ব্যাখ্যা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। কুতায়বাহ[৪৭] (১ম খন্ড, পৃঃ ৬০) লিখেছেন ঃ

বসরার পথে আওতাম নামক স্থানে আয়শার সাথে মুঘিরা ইবনে শুবাহ্র সাক্ষাত হলে মুঘিরা জিজ্ঞেস করেছিল, "হে উম্মুল মোমেনিন, আপনি কোথায় যাচ্ছেন ?" উত্তরে আয়শা বললেন, "আমি বসরা যাচ্ছি।" মুঘিরা বসরা যাবার উদ্দেশ্য জানতে চাইলে আয়শা বললেন, "উসমানের রক্তের বদলা নেয়ার জন্য যাচ্ছি।" মুঘিরা স্তম্ভিত হয়ে বললেন, "সে কি, উসমানের হত্যাকারীগণ তো আপনার সাথেই আছে।" তৎপর মুঘিরা মারওয়ানের দিকে ফিরে তার গন্তব্যস্থল জানতে চাইলেন। উত্তরে মারওয়ান বললো, "উসমানের রক্তের বদলা নিতে আমিও বসরা যাচ্ছি।" মুঘিরা বললেন, "উসমানের খুনীরা তো তোমার সাথেই রয়েছে—এ তালহা ও জুবায়র তাকে হত্যা করেছে।"

প্রকৃতপক্ষে যে দলটি উসমানকে হত্যা করেছিল এবং হত্যার সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত ছিল তারা উসমান হত্যার দোষ আমিরুল মোমেনিনের ওপর চাপিয়ে দিয়ে বসরা চলে গিয়েছিল এবং তথায় ফেতনা সৃষ্টি করেছিল। আমিরুল মোমেনিনও বিদ্রোহ দমনের জন্য বসরা পৌছলেন। পথিমধ্যে উক্ত পত্রে কুফাবাসীদের সমর্থন চাইলেন। পত্র পাওয়া মাত্র কুফার যোদ্ধাগণ আমিরুল মোমেনিনের সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিয়েছিল। এ যুদ্ধ 'জামালের যুদ্ধ' নামে খ্যাত।

★★★★★

পত্র-২

বসরার 'জামাল যুদ্ধে' জয়লাভের পর কুফাবাসীদেরকে লিখেছিলেন

হে কুফার শহরবাসীগণ, রাসুলের (সঃ) আহলুল বাইতের পক্ষ থেকে আল্লাহ্ তাঁর সর্বোৎকৃষ্ট পুরস্কার দ্বারা তোমাদেরকে পুরস্কৃত করুন। যারা আল্লাহ্র আনুগত্যের জন্য কাজ করে তাদেরকে যে পুরস্কার দেয়া হয়, সে পুরস্কার তোমাদেরকে প্রদান করুন। যারা আল্লাহ্র নেয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে তাদের পুরস্কারে তিনি তোমাদেরকে পুরস্কৃত করুন। নিশ্চয়ই, তোমরা আমার ডাকে সাড়া দিয়েছো এবং আমাকে মান্য করেছো। আমার আহ্বানের সাথে সাথে তোমরা সাড়া দিয়েছো।

★★★★★

দলিল-৩

কুফার কাজী শুরাইয়াহ্ ইবনে হারিছের (আল-কিন্দি) জন্য লিখেছিলেন।

বর্ণিত আছে যে, আমিরুল মোমেনিন কর্তৃক নিয়োজিত কুফার কাজী শুরাইয়াহ্ ইবনে হারিছ (আল-কিন্দি) আশি দিনার মূল্য দিয়ে একটা বাড়ী ক্রয় করেছিল। আমিরুল মোমেনিন এ সংবাদ অবগত হয়ে কাজীকে ডেকে এনে বললেন, "আমি জানতে পেরেছি তুমি নাকি আশি দিনার মূল্যে একটি বাড়ী ক্রয় করেছো এবং সেজন্য একটা দলিল করে তাতেও স্বাক্ষর করেছো।" শুরাইয়াহ্ বললেন, "হ্যাঁ; আমিরুল মোমেনিন, আপনি যা শুনেছেন তা সত্য।" আমিরুল মোমেনিন রাগত চোখে তার দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ

হে শুরাইয়াহ্, সাবধান হও, সহসাই আজরাইল তোমার কাছে আসবে। সে তোমার দলিলের দিকে ফিরেও তাকাবে না বা তোমার স্বাক্ষর প্রদান বিষয়ে তোমাকে কোন কিছু জিজ্ঞেসও করবে না। কিন্তু সে তোমাকে তোমার ক্রয়কৃত বাড়ী হতে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে যাবে এবং তোমাকে নির্জন করবে একাকী অবস্থায় রেখে দেবে। দেখ, হে শুরাইয়াহ্, যদি তুমি তোমার হালাল উপার্জন ব্যতীত কোন অবৈধ উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থ দ্বারা বাড়ীর মূল্য দিয়ে থাক তবে তোমার ইহকাল ও পরকাল বিনষ্ট করে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছো। যদি তুমি বাড়ী ক্রয় করার আগে আমার কাছে আসতে তা হলে আমি তোমার জন্য একখানা দলিল লিখে দিতাম যা দেখলে তুমি ওই বাড়ীটি এক দিনার মূলেও ক্রয় করতে না। এ বলে আমিরুল মোমেনিন একখানা দলিল শুরাইয়াকে দিলেন যাতে লেখা ছিল ঃ

এটা একটা ক্রয় দলিল যাতে আল্লাহ্র একজন দীনহীন বান্দা ক্রেতা এবং পরকালে প্রস্থানোদ্যত অন্য বান্দা বিক্রেতা। ক্রেতা ধ্বংসশীল স্থানের মরণশীলগণের এলাকার প্রবঞ্চনার বাড়ীগুলোর মধ্য হতে একটা বাড়ী খরিদ করেছে। এ বাড়ীটির চারদিকের ঘের-চৌহুদ্দি নিম্নরূপ ঃ প্রথম দিকের সীমানা—দুর্যোগের উৎসস্থলের অতি নিকটবর্তী; দ্বিতীয় দিকের সীমানা—দুঃখ-দুর্দশার উৎসের সাথে যুক্ত; তৃতীয় দিকের সীমানা—ধ্বংসাত্মক কামনা-বাসনার সাথে যুক্ত; চতুর্থ দিকের সীমানা—প্রবঞ্চক শয়তানের সাথে যুক্ত এবং এদিকেই বাড়ীটির দরজা খোলার পথ। এ বাড়ীটি এমন এক ব্যক্তি ক্রয় করেছে যাকে কামনা-বাসনা আক্রমণ করে সর্বস্ব অপহরণ করে নিয়েছে এবং এমন এক ব্যক্তি বিক্রয় করেছে যাকে মৃত্যু তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। বাড়ীটির মূল্য হলো—পরিতৃপ্তির মর্যাদা পরিত্যাগ পূর্বক হতমান ও দুঃখ-দুর্দশায় প্রবেশ। যদি ক্রেতা এ লেনদেনের কুফলের সম্মুখীন হয় তবে তা হবে সেব্যক্তির জন্য যে (আজরাইল) রাজা-বাদশাদের সযত্নে লালিত দেহ গলিয়ে বিনষ্ট করে দিয়েছে, স্বৈরশাসকদের জীবন কেড়ে নিয়েছে এবং ফেরাউন, কিসরাস[১], সিজার[২], তুব্বা[৩] ও হিমায়রদের[৪] বিশাল সাম্রাজ্য ধ্বংস করে দিয়েছে। তারা সকলেই সম্পদের পর সম্পদ স্তূপীকৃত করেছিল এবং সম্পদ বাড়িয়েই যাচ্ছিলো। তারা সুউচ্চ ইমারত নির্মাণ করেছিল এবং উহা চোখ ঝলসানো সাজে সুসজ্জিত করেছিল। তারা ধন-রত্ন সংগ্রহ করেছিল এবং তাদের ধ্যান-ধারণা অনুযায়ী তারা দাবী করেছিল যে, তাদের সন্তান-সন্ততিদের জন্য ওগুলো সঞ্চিত করেছিল যারা তাদেরকে হিসাব-নিকাশ ও বিচারস্থলে পুরস্কার ও শাস্তির সময় সহায়তা করবে। তখন নির্দেশ হবে "যারা মিথ্যার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল তার আজ ক্ষতিগ্রস্থ "(কুরআন-৪ঃ৭৮)।

এ দলিল প্রজ্ঞা দ্বারা স্বাক্ষরিত, এটা কামনা-বাসনার শিকলমুক্ত এবং দুনিয়ার চাকচিক্য হতে দূরে সরানো।

১। কিসরাস ঃ এটা 'খুসরাও' শব্দের আরবী রূপান্তর, যার অর্থ হলো বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী রাজা। ইরানের শাসনকর্তাদের উপাধি ছিল 'খুসরাও'।

২। সিজার ঃ- রোমের শাসকদের উপাধি 'সিজার'। ল্যাটিন ভাষায় এর অর্থ হলো যে শিশুর মাতা প্রসবের পূর্বে মারা গেছে এবং মাতার পেট কেটে তাকে বের করে আনা হয়েছে। রোমের শাসকদের মধ্যে অগাষ্টাস এভাবে জন্মেছিল বলে তাকে 'সিজার' বলা হতো এবং পরবর্তীতে রোমের শাসকগণ এটাকে উপাধি হিসাবে গ্রহণ করে।

৩। তুব্বা ঃ ইয়েমেনের রাজাদের উপাধি ছিল 'তুব্বা'। তারা হিমায়র ও হাদ্রামাউত দখল করেছিল। তাদের নাম পবিত্র কুরআনের ৪৪ঃ ৩৭ ও ৫০ঃ১৪ আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে।

৪। হিমায়র ঃ দক্ষিণ-পশ্চিম আরবের প্রাচীন সাবাইন রাজ্যের একটি প্রসিদ্ধ গোত্রের নাম। খৃষ্টপূর্ব ১১৫ সন হতে ৫২৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তারা দক্ষিণ আরবের শক্তিশালী শাসক ছিল। হিমায়রগণ আজকের ইয়েমেনের উপকূলীয় অঞ্চল জুরায়দান (পরবর্তীতে কাতায়বান) নামক এলাকায় ঘনবসতি স্থাপন করেছিল। তারা সম্ভবতঃ তাদের জ্ঞাতি সাবাইনদের ডিঙ্গিয়ে মিশর হতে ভারত পর্যন্ত সমুদ্র পথে ব্যবসায়-বাণিজ্যের একটা পথ বের করেছিল। হিমায়রদের ভাষা ও কৃষ্টি ছিল সাবাইনদের মতই এবং তাদের রাজধানী ছিল জাফর। তাদের রাজ্য পূর্ব দিকে পারস্য উপসাগর ও উত্তর দিকে আরব মরুভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। চতুর্থ শতাব্দীতে হিমায়রদের রাজধানী উত্তর দিকে সরিয়ে সানায় স্থানান্তরিত করা হয় এবং এ শতাব্দীর শেষভাগে ইহুদী ও খৃষ্টানগণ এ এলাকায় শক্ত সিঁড়ি গেড়ে বসেছিল। অভ্যন্তরীণ গোলযোগের সুযোগে ৫২৫ খৃষ্টাব্দে আবিসিনিয়ানগণ হিমায়রদেরকে ধ্বংস করে দেয় (নিউ এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা, ৫ম খন্ড, পৃঃ ৪৯)।

★★★★★

পত্র-৪

সেনাবাহিনীর একজন অফিসারকে লিখেছিলেন

যদি তারা[১] আনুগত্যের ছাতার নীচে ফিরে আসে তবে তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করো না; কারণ আমরা তো শুধু এটাই চাই যে, তারা আনুগত্য ভঙ্গ না করুক। কিন্তু যদি এসব লোকের আচরণ গোলযোগ সৃষ্টি ও অনানুগত্যসূচক হয় তবে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ো। এদের মোকাবেলা করতে শুধু তাদের সঙ্গে রেখো যারা তোমাকে মান্য করে এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তোমার সাথে যাবে তারাই তোমার প্রকৃত অনুসারী। যারা তোমার সাথে যাওয়া থেকে পিছিয়ে থাকবে তাদের সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হয়ো না। কারণ স্বতঃস্ফুর্ত উদ্যমহীন লোকের উপস্থিতি অপেক্ষা অনুপস্থিতি অধিকতর ভাল। নিরুদ্যম লোকের বাগাড়ম্বর অপেক্ষা চুপচাপ বসে থাকা অনেক ভাল।

১। বসরার গভর্ণর উসমান ইবনে হুনায়ফ যখন তালহা ও জুবায়রের উপস্থিতি ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমিরুল মোমেনিনকে জানালেন তখন তিনি তাকে এ পত্র লিখেছিলেন। এ পত্রে আমিরুল মোমেনিন নির্দেশ দিয়েছিলেন যে শত্রু যদি একান্তই যুদ্ধের দিকে ঝুঁকে পড়ে তবে তা যেন মোকাবেলা করা হয় এবং এতে উসমানের সৈন্য তালিকায় তাদের যেন না নেয়া হয় যারা একদিকে তালহা, জুবায়র ও আয়শার ব্যক্তিত্বের প্রতি গুরুত্ব দেয় অপর দিকে শুধুমাত্র যুক্তির খাতিরে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে রাজী হয়েছে। এ ধরনের লোক দৃঢ়পদে অবিচলিতভাবে যুদ্ধ করবে না এবং যুদ্ধের জন্য এ ধরনের লোক নির্ভরযোগ্যও নয়। বরং এ ধরনের লোক দলের অন্যদেরকে নিরুদ্যম করে ফেলে। সুতরাং এসব লোককে দল হতে সরিয়ে রাখাই উত্তম।

★★★★★

পত্র-৫

আজারবাইজানের গভর্ণর আশআছ ইবনে কায়েসকে (আল-কিন্দি) লিখেছিলেন

নিশ্চয়ই, তোমার ওপর অর্পিত দায়িত্ব[১] এক গ্রাস খাদ্য নয়। এটা এমন এক বিষয় যা তোমার গ্রীবা জড়িয়ে রয়েছে এবং জনগণের নিরাপত্তার জন্য তোমার ওপরস্থদের পক্ষে তোমাকেই জবাবদিহি হতে হবে। জনগণের প্রতি অত্যাচারী হওয়া তোমার সাজে না, আবার যথাযথ ক্ষেত্র ব্যতীত নিজকে বিপদাপন্ন করাও তোমার উচিত হবে না। তোমার হাতে যে পরিমাণ অর্থ-সম্পদের তহবিল আছে তা সর্বশক্তিমান ও ক্ষমতাশীল আল্লাহ্‌র সম্পদ। যে পর্যন্ত তুমি উহা আমার কাছে পাঠিয়ে না দেবে সে পর্যন্ত উহার দায়-দায়িত্ব তোমার। আমি কোনমতেই তোমার জন্য কুশাসকদের একজন হতে পারবো না এবং বিষয়টি এখানেই শেষ করলাম।

১। জামালের যুদ্ধ শেষ হবার পর আজারবাইজানের গভর্ণর আশআছ ইবনে কায়েসকে (আল-কিন্দি) আমিরুল মোমেনিন এ পত্র লিখেছিলেন। আশআছ উসমানের সময়কাল হতে আজারবাইজান এলাকার গভর্ণর ছিল। এ প্রদেশের রাজস্ব আয় প্রেরণ করার জন্য এ পত্রে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। উসমান হত্যার পর হতে আশআছ নিজের অবস্থা সম্পর্কে ভীত হয়ে পড়ে। ফলে উসমানের সময়কার অন্যান্য অফিসারের মত সেও প্রাপ্ত রাজস্ব আত্মসাৎ করার ফন্দি এঁটেছিলো। এ পত্র পাওয়ার পর সে তার প্রধান আমাত্যগণকে ডেকে বললো, "আমার ভয় হয়, এ অর্থ আমার নিকট হতে নিয়ে যাবে। কাজেই মুয়াবিয়ার সাথে যোগদান করাই বাঞ্ছণীয়।" উপস্থিত সকলেই বললো, "আমরা তোমার জ্ঞাতি গোষ্ঠি। আমাদেরকে ফেলে তুমি মুয়াবিয়ার আশ্রয়ে চলে যেতে চাচ্ছো— এটা বড়ই লজ্জার বিষয়।" তাদের কথা শুনে আশআছ পালিয়ে যাবার ইচ্ছা পরিত্যাগ করলো। কিন্তু সে রাজস্ব প্রেরণ করতে রাজী হলো না। ইতোমধ্যে সংবাদ পেয়ে আমিরুল মোমেনিন তাকে কুফায় নিয়ে যাবার জন্য হুজর ইবনে আদি আল-কিন্দিকে প্রেরণ করলেন। হুজর তাকে বুঝিয়ে-শুজিয়ে কুফায় নিয়ে এলো। কুফায় এসে সে চার লক্ষ দিরহাম জমা দিলে আমিরুল মোমেনিন তাকে ত্রিশ হাজার দিরহাম দিয়ে দিলেন এবং অবশিষ্ট অর্থ সরকারী তহবিলে জমা দিয়েছিলেন।

★★★★★

পত্র-৬

মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ানকে লিখেছিলেন

নিশ্চয়ই, যারা আবু বকর, উমর ও উসমানের বায়াত[১] গ্রহণ করেছিল তারা একই ভিত্তিতে আমার বায়াত গ্রহণ করেছে। (সে ভিত্তিতে) যারা উপস্থিত ছিল তাদের বিকল্প চিন্তা ছিল না এবং যারা অনুপস্থিত ছিল তাদের প্রত্যাখ্যান করার কোন অধিকার নেই এবং এ বিষয়ে আলাপ-আলোচনা মুহাজিরগণ ও আনসারগণের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। যদি তারা ঐকমত্যের ভিত্তিতে কাউকে খলিফা হিসাবে গ্রহণ করে তবে তা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি বলেই মনে করতে হবে। যদি কেউ আপত্তি প্রদর্শনের জন্য দূরে সরে থেকে থাকে তাহলে তারা তাকে সে অবস্থা থেকে ফিরিয়ে দেবে যেখান থেকে সে দূরে সরে ছিলো। সে অস্বীকার করলে তারা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে এ জন্য যে, সে মোমিনের পথ ছেড়ে অন্য পথ অনুসরণ করেছে এবং আল্লাহ্ তাকে সেখানে ফিরিয়ে আনবেন যেখান থেকে সে পালিয়ে গেছে। আমার জীবনের শপথ, হে মুয়াবিয়া, যদি তুমি তোমার মস্তিস্ক হতে সকল আবেগ ও রোষ বিদূরিত করে নিরপেক্ষভাবে দেখ, তাহলে তুমি দেখতে পাবে যে, উসমানের হত্যার জন্য আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ। যা তোমার কাছে দিবালোকের মত সত্য, তা যদি তুমি গোপন না কর তাহলে নিশ্চয়ই, তুমি জান আমি উসমানের

সাথে সব কিছুতেই অসম্পৃক্ত ছিলাম এবং তার থেকে আমি দূরে সরে থাকতাম। এরপরও যদি তুমি ভাল মনে কর আমার ওপর আঘাত হানতে পার এবং এখানেই বিষয়টি শেষ করলাম।

১। মদিনার সকল লোক যখন ঐকমত্যে আমিরুল মোমেনিনের বায়াত গ্রহণ করেছিলো তখন মুয়াবিয়া তার ক্ষমতা বিপদাপন্ন মনে করে চারদিকে ছড়াতে লাগলো যে, আমিরুল মোমেনিন ঐকমত্যের ভিত্তিতে খলিফা নির্বাচিত হননি। এ ধুয়া তুলে সে পুনরায় সাধারণ নির্বাচন দাবী করতে লাগলো। আবু বকরের সময় হতেই একটা রীতি প্রচলিত হয়ে এসেছিল যে, মদীনাবাসীগণ যাকে খলিফা নির্বাচিত করবে সে সমগ্র মুসলিম জাহানের খলিফা বলেই গণ্য হবে। এতে কারো কোন প্রশ্ন করার অধিকার থাকবে না। এ নীতি অনুযায়ী আমিরুল মোমেনিনের ক্ষেত্রে পুনঃ নির্বাচন দাবী করার কোন অধিকার মুয়াবিয়ার নেই এবং মদিনাবাসীদের বায়াত অস্বীকার করার অধিকারও তার নেই। আমিরুল মোমেনিন এ পত্রে তাকে সে কথাই স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। তার প্রচারণার প্রেক্ষিতে তাকে প্রদমিত করার জন্য আমিরুল মোমেনিন এ যুক্তি দেখিয়েছেন। মূলতঃ তিনি কখনো গোত্র প্রধানদের আলোচনা বা সাধারণ লোকের ভোটের ভিত্তিতে খলিফা নির্বাচনের নীতি মেনে নিতেন না। সে কারণেই মুহাজির ও আনসারদের ঐকমত্যে মনোনীত খলিফার হাতে তিনি বায়াত গ্রহণ করেনি। তিনি খেলাফতের এ স্বরচিত নীতি-পদ্ধতি বৈধ মনে করতেন না। সে কারণেই তিনি সর্বদা খেলাফতে তার অধিকারের কথা বলতেন যা তাকে রাসুল (সঃ) মুখে ও দলিলে দিয়েছিলেন। কিন্তু মুয়াবিয়ার প্রতিশ্রুতি ও বিশ্বাস মতে তার মুখ বন্ধ করার জন্যই ঐকমত্যের যুক্তি দেখিয়েছেন। বস্তুতঃ মুয়াবিয়ার মূল উদ্দেশ্য ছিল নানা প্রকার ছুতানাতা ধরে কালক্ষেপণ করা এবং তার অনুকূলে জনসমর্থন নেয়া।

★★★★★

পত্র-৭
মুয়াবিয়ার প্রতি

আমি তোমার প্রেরিত অলঙ্কারপূর্ণ পত্রে বর্ণিত অসংলগ্ন উপদেশের প্যাকেট পেয়েছি। তুমি তোমার গোমরাহীর কারণে এসব লিখেছো এবং অজ্ঞতার কারণে তা আমার কাছে প্রেরণ করেছো। এ পত্রখানা এমন ব্যক্তির কাছ থেকে এসেছে অন্যকে পথ দেখাবার মত আলো যার নেই এবং অন্যকে ন্যায় পথে পরিচালিত করার মত নেতৃত্ব যার নেই। কামন-বাসনা-লালসা তোমাকে চেপে বসেছে, আর উহার তাড়নায় তুমি এ পত্র লিখেছো। গোমরাহী তোমাকে পেয়ে বসেছে, তাই তুমি গোমরাহ হয়ে গেছো। সে কারণেই তুমি আবোল-তাবোল কথা বলেছো এবং বলগাহীনভাবে বিপথগামী হয়ে পড়েছো।

তোমার জানা উচিত, বায়াত একবারই হয়ে থাকে। এটা পুনর্বিবেচনা করার কোন অবকাশ নেই এবং পুনঃ নির্বাচন করার কোন যো নেই। যে ব্যক্তি বায়াত হতে সরে থাকে সে ইসলামের ক্ষতিকারক এবং যে ব্যক্তি কৌশলে সত্যকে এড়িয়ে যায় সে মোনাফিক।

★★★★★

পত্র-৮
জারির ইবনে আবদিল্লাহ্ আল-বাজালীকে মুয়াবিয়ার নিকট প্রেরণ করলে তার ফিরে আসতে বিলম্ব দেখে আমিরুল মোমেনিন তাকে এ পত্র লিখেছেন।

আমার এ পত্র পাওয়া মাত্র মুয়াবিয়াকে বলো যেন সে তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং সে যেন একটা নির্দিষ্ট পথ অনুসরণ করে। তাকে স্পষ্ট করে জিজ্ঞেস করো—যে যুদ্ধের নেশা তাকে ঘরছাড়া করেছে সে কি তা

চায় নাকি শান্তি (তার দৃষ্টিতে যা অপমানকর) চায়। যদি সে যুদ্ধ চায় তবে তাকে ত্যাগ করে চলে এসো; আর যদি সে শান্তি চায় তবে তার বায়াত গ্রহণ করো। বিষয়টি এখানে শেষ করলাম।

★★★★★

পত্র-৯
মুয়াবিয়ার প্রতি

কোরেশগণ[১] আমাদের রাসুলকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল এবং আমাদের মূলোৎপাটন করতে চেয়েছিল। তারা আমাদেরকে সর্বদা উদ্বিগ্ন অবস্থায় রাখতো, আমাদের সাথে চরম দুর্ব্যবহার করতো, আমাদের জীবনের আরাম-আয়েশ দূর করে দিয়েছিলো, আমাদেরকে সর্বদা আতঙ্কিত রাখতো, পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করতে আমাদেরকে বাধ্য করেছিলো এবং আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধানল প্রজ্জ্বলিত করেছিলো।

এ অবস্থায় মহান আল্লাহ্ তাঁর দ্বীনকে রক্ষা করা ও তাঁর সম্মানকে সমর্থন করার জন্য আমাদেরকে দৃঢ়-সংকল্প-চিত্ত করে দিলেন। আমাদের মধ্যকার ইমানদারগণ ঐশী পুরস্কারের আশায় এবং অবিশ্বাসীগণ জ্ঞাতিত্বের টানে আমাদেরকে সমর্থন দিয়েছিল। কুরায়েশদের মধ্যে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল তারা আমাদের চেয়ে অনেক কম দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করেছিল। এর কারণ হলো- হয় তারা প্রতিরক্ষামূলক প্রতিশ্রুতির আওতাভুক্ত ছিল, না হয় তাদের গোত্রগত অবস্থান (অর্থাৎ তাদের বিরুদ্ধে কিছু করলে গোটা গোত্র তার সমর্থনে চলে যাবে)। সেজন্য তারা হত্যা হতে নিরাপদ ছিল। রাসুলের (সঃ) হাতে যে একটা পথ ছিল তা হলো যুদ্ধ যখন ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করতো এবং তাঁর যোদ্ধাদের যখন অবস্থান হারানোর উপক্রম হতো তখন তিনি স্বজনদেরকে অগ্রগামী করে পাঠাতেন এবং তাদের মাধ্যমে নিজের অনুচরদেরকে তরবারি ও বর্শা হতে রক্ষা করতেন। এভাবেই বদরের যুদ্ধে উবদাহ্ ইবনে আল-হারিছ, ওহুদের যুদ্ধে হামজাহ্ ইবনে আবদাল মুত্তালিব এবং মুতা যুদ্ধে জাফর ইবনে আবি তালিব শহীদ হয়েছিলেন। রাসুল (সঃ) তাঁর আপনজনদের মধ্যে আরেকজনকেও (যার নাম তুমি ভালভাবে জান) বার বার যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রগামী করে প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু শাহাদত বরণ করার জন্য তার প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও মৃত্যু নির্ধারিত ছিল না বলে সে এখনো বেঁচে আছে।

এটা বড়ই আশ্চর্যের বিষয় যে, আমি কিরূপে এমন একজনের দলভুক্ত হতে পারি যে ধর্ম বিষয়ে আমার মত কর্মচঞ্চল পদক্ষেপ কখনো দেখেনি অথবা এ বিষয়ে আমার মত কোন অবস্থান যার নেই এবং সে এমন কিছু অবদান দাবি করে যা আমার জানা নেই এবং আমি মনে করি তাঁর এসব দাবি সম্পর্কে আল্লাহ্ও অবহিত নহেন। যা হোক, সকল প্রশংসা মহিমান্বিত আল্লাহ্র।

উসমানের হত্যাকারীদেরকে তোমার হাতে তুলে দেবার জন্য তোমার অনুরোধের প্রেক্ষিতে আমি বলতে চাই যে , আমি বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করে দেখেছি এবং তাদেরকে তোমার হাতে বা অন্য কারো হাতে তুলে দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমার জীবনের শপথ, যদি তুমি তোমার ভ্রান্ত পথ ও ফেতনামূলক কর্মকান্ড পরিত্যাগ না কর তবে নিশ্চয়ই তুমি তাদেরকে চেন। তারা সহসাই তোমাকে খোঁজ করে নেবে। তাদেরকে জলে-স্থলে-পর্বতে- সমতলে খোঁজার কষ্ট তারা তোমাকে দেবে না। কিন্তু তাদের এ অনুসন্ধান তোমার জন্য বেদনাদায়ক হবে এবং তাদের সাক্ষাত তোমাকে আনন্দ দেবে না। যারা শান্তি চায় তাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।

১। আল্লাহ্ কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে আল্লাহ্র রাসুল যখন আল্লাহ্র একত্বে বিশ্বাস স্থাপনের জন্য মানুষকে আহ্বান করেছিলেন তখন কাফের কোরেশ গোত্র এ সত্যের বাণী স্তব্ধ করে দেয়ার জন্য তাদের সমগ্র শক্তি দিয়ে রুখে দাঁড়িয়েছিল। এ প্রতিমা পূজারী দলের হৃদয়ে প্রতিমা-প্রীতি এত প্রকট ছিল যে, তারা তাদের প্রতিমার বিরুদ্ধে একটা কথাও শুনতে রাজী

ছিল না। এক আল্লাহ্‌র ধারণা তাদের সকল ধৈর্যচ্যুতির জন্য যথেষ্ট ছিল। এ অবস্থায় তারা শুনতে পেল তাদের দেবতাগুলো সামান্য নির্জীব, নিশ্চল ও জড় পাথর ছাড়া আর কিছুই নয়। যখন তারা দেখলো তাদের বিশ্বাস ও নীতি বিপদাপন্ন হয়ে পড়ছে তখন তারা রাসুলকে (সঃ) বিপদগ্রস্থ করার জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ ও সকল উপায় অবলম্বন করতে লাগলো। তারা এমন সব ক্লেশদায়ক উপায় অবলম্বন করলো যে, ঘরের বাহিরে যাওয়া পর্যন্ত রাসুলের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়লো। এ সময় যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল তাদের ওপর অবারিত অত্যাচার তারা চালিয়ে যাচ্ছিলো। এ সময় নওমুসলিমগণ সিজদা করলে তাদেরকে জ্ঞান হারানো পর্যন্ত বেত্রাঘাত ও প্রস্তরাঘাত করা হতো। কোরেশদের এরূপ নিষ্ঠুর অত্যাচার দেখে রেসালতের পঞ্চম বছরে রাসুল (সঃ) তাঁর অনুসারীগণকে আবিসিনিয়া হিজরত করার অনুমতি দিয়েছিলেন। নিষ্ঠুর কোরেশগণ তাদের পিছু নিয়ে আবিসিনিয়াও গিয়েছিল, কিন্তু আবিসিনিয়ার শাসক রাসুলের অনুসারীদেরকে কোরেশদের হাতে তুলে দেননি এবং তার মহত্বের ফলে তারা সেখানে কোন বিপদে পড়েনি।

এদিকে রাসুলের বাণী ক্রমাগত বেড়েই চলছে এবং সত্যের আকর্ষণ মানুষের মনে দোলা দিতে লাগলো। মানুষ তাঁর বাণী ও ব্যক্তিত্বে মোহিত হয়ে দলে দলে তাঁর ছাতার নীচে আশ্রয় গ্রহণ করতে দেখে কোরেশগণ জ্বলে পুড়ে যাচ্ছিলো এবং তাদের অবলম্বিত সকল উপায় ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে দেখে বনি হাশিমের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলো। তারা আশা করেছিল সকল প্রকার সামাজিক সম্পর্ক ও লেনদেন বন্ধ করে দিলে বনি হাশিম ও বনি আবদ-আল মুত্তালিব রাসুলকে (সঃ) সমর্থন দেয়া বন্ধ করে দেবে এবং তাতে স্বাভাবিকভাবেই রাসুল (সঃ) দমে পড়বেন। কোরেশগণ নিজেদের মধ্যে এ বয়কট বাস্তবায়নের জন্য পরস্পর চুক্তিবদ্ধ হলো। এ চুক্তির ফলে বনি হাশিম একঘরে হয়ে পড়লো। কেউ তাদের সঙ্গে সাক্ষাত করে না—তাদের দেখলে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। এমনকি তাদের সঙ্গে মালপত্র বেচাকেনা করাও বন্ধ করে দেয়। এ সময় বনি হাশিমের জন্য একটা দুশ্চিন্তা প্রকট হয়ে উঠেছিলো; তা হলো শহরের বাইরের উপত্যকায় যে কোন সময় রাসুল (সঃ) আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। সবকিছু বিবেচনা করে বনি হাশিম "আবি তালিবের শিব (বাসা)" নামক স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। বনি হাশিমের যে সকল সদস্য ইসলাম গ্রহণ করেছিল তারা সকলেই "শিব-ই- আবি তালিব"-এ আশ্রয় নিয়েছিল। আর যারা তখনো ইসলাম গ্রহণ করেনি তারা জ্ঞাতিত্ব ও গোত্র টানে তাদের প্রতিরক্ষা বিধান করেছিল। এ সময় হামজা ও আবি তালিব নিজেদের আরাম আয়েশ ত্যাগ করে রাসুলের (সঃ) প্রতিরক্ষা বিধান করেছিল এবং তারা সারাক্ষণ রাসুলকে (সঃ) সান্ত্বনা দিতেন। শত্রুর আক্রমণের ভয়ে প্রতিরাতে রাসুলকে কয়েকবার বিছানা বদল করে ঘুমাতে দিতেন। রাসুলকে একটা বিছানা হতে সরিয়ে তাঁর স্থলে আলীকে শুইয়ে রাখতেন।

বয়কটের এ দিনগুলো বনি হাশিমের জন্য বড়ই কষ্টদায়ক ছিল। তারা দিনের পর দিন উপোস করে কাটিয়েছে—এমন কি গাছের পাতা খেয়েও দিনাতিপাত করেছে। তিন বছর এভাবে নিদারুণ কষ্টে কাটানোর পর জুহায়র ইবনে আবি উমাইয়া (যার মাতা ছিল আতিকা বিনতে আবদ আল মুত্তলিব), হিশাম ইবনে আমর ইবনে রাবিয়াহ্ (যে তার মায়ের দিক থেকে বনি হাশিমের আত্মীয়), আল মুতিম ইবনে আদি ইবনে নওফল ইবনে আবদ মনাফ, আবুল বখতারী আল-আস ইবনে হিশাম ইবনে আল-মুঘিরাহ এবং জামাআহ্ ইবনে আল-আসওয়াদ ইবনে আল-মুত্তালিব বয়কট চুক্তি বাতিলের প্রস্তাব করলে কোরেশ নেতাগণ কাবায় একটা আলোচনা বৈঠক করে। আবু তালিব উপত্যকার নির্বাসন স্থান হতে এ বৈঠকে হাজির হয়ে বললেন, "আমার ভ্রাতুষ্পুত্র মুহাম্মদ বলেছে তোমাদের চুক্তির সমুদয় লেখা সাদা-পিপীলিকায় খেয়ে ফেলেছে; শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র নামটুকু অবশিষ্ট আছে। তোমরা চুক্তিপত্রটি আন। যদি তার কথা সত্য হয় তবে তোমরা তার শত্রুতা পরিহার কর। আর যদি তার কথা সত্য না হয় তবে আমি তাকে তোমাদের হাতে তুলে দেব।" এতে তারা রাজী হয়ে চুক্তিপত্র এনে দেখতে পেলো যে, আল্লাহ্‌র নাম ব্যতীত অপর সকল লেখা সাদা-পিপড়ায় খেয়ে ফেলেছে। এ অবস্থা দেখে আল-মুতিম ইবনে আদি চুক্তি পত্রটি ছিড়ে ফেলে দিয়েছিলো। এভাবে বয়কট চুক্তির অবসান ঘটে এবং বনি হাশিম নিদারুণ দুঃখ কষ্ট হতে নিষ্কৃতি পায়। এরপরও রাসুলের (সঃ) প্রতি কাফেরদের আচরণে তেমন কোন পরিবর্তন আসেনি; বরং তারা রাসুলের (সঃ) প্রাণনাশের ফন্দি এটেছিল, যে কারণে তাঁকে মক্কা হতে মদিনায় হিজরত করতে হয়েছিল। অবশ্য এ সময় আবু তালিব জীবিত ছিলেন না। হিজরতের সময়ও আলী রাসুলের (সঃ) বিছানায় শুয়ে থেকে রাসুলকে রক্ষা করার শেখানো পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন।

এসব ঘটনা মুয়াবিয়ার অজানা ছিল না। তবুও আমিরুল মোমেনিন তার পূর্ব পুরুষদের আচরণ তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। যাতে সে সত্যের অনুসারী ও মিথ্যার অনুসারীদের আচরণ বুঝতে পেরে ন্যায়, সত্য ও হেদায়েতের পথে আসতে পারে।

★★★★★

পত্র-১০
মুয়াবিয়ার প্রতি

এ দুনিয়ার যা কিছু তোমাকে ঘিরে রেখেছে উহা হতে যখন তোমাকে সরিয়ে নেয়া হবে তখন তুমি কি করবে? দুনিয়া উহার চাকচিক্য দিয়ে তোমাকে আকৃষ্ট করেছে এবং ভোগ-বিলাস ও আনন্দ-উল্লাস দিয়ে তোমাকে প্রতারিত করছে। দুনিয়া তোমাকে আহ্বান করেছে আর তুমি সে আহ্বান উৎফুল্ল চিত্তে সাড়া দিয়েছো। দুনিয়া তোমাকে পরিচালিত করছে, আর তুমি দুনিয়াকে অনুসরণ করে চলছো। দুনিয়া তোমাকে আদেশ দিচ্ছে, আর তুমি সে আদেশ অবনত মস্তকে মেনে চলছো। সহসাই এক নকীব তোমাকে সব কিছু অবহিত করাবে যার হাত হতে তোমাকে রক্ষা করার মত কোন বর্ম নেই। সুতরাং দুনিয়ার ধান্দাবাজী হতে দূরে সরে থাক, শেষ-বিচারের হিসাব-নিকাশের প্রতি খেয়ালী হও, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাক যা তোমাকে যে কোন মুহূর্তে পরাভূত করবে এবং যারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে তাদের কথায় কান দিয়ো না। আমার উপদেশ মেনে চলো; তোমার আরাম-আয়েশ ও বিলাসবহুল জীবন যাপনের ফলে তুমি যা ভুলে গেছ আমি শুধু তা তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। শয়তান তার দৃঢ় মুষ্টিতে তোমাকে এঁটে ধরেছে, তোমার মাধ্যমে তার আকাঙ্খা পরিপূর্ণ করছে এবং তোমার আত্মা ও রক্তের যেরূপ নিয়ন্ত্রণ তোমার ওপর রয়েছে শয়তান তোমাকে তদ্রূপ নিয়ন্ত্রণ করছে।

হে মুয়াবিয়া, কোন প্রকার অগ্রণী ভূমিকা ও বৈশিষ্ট্য ছাড়াই তুমি কখন জনগণের রক্ষাকর্তা (?) ও তাদের কর্মকান্ডের অভিভাবক (?) বনেছো? অতীতে দুর্ভাগ্যজনক ধ্বংস হতে আমরা আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করি। আমি তোমাকে সর্তক করছি পাছে তুমি কামনা-বাসনার তাড়নায় আরো অধিক তাড়িত হও এবং তোমার বাতেন ও জাহের যেন ভিন্নধরনের না থাকে।

তুমি আমাকে যুদ্ধের আহ্বান করছো। জনগণকে এক দিকে সরিয়ে রেখে তুমি নিজে আমার মোকাবেলা করলে ভাল হয়। উভয় পক্ষের জনগণকে যুদ্ধ হতে অব্যাহতি দিয়ে আমার সম্মুখে চলে আসো। তোমার ও আমার যুদ্ধেই প্রমাণিত হবে কার হৃদয় মরচে পড়া এবং কার চোখ অজ্ঞতায় ঢাকা। মনে রেখো, আমি আবুল হাসান যে তোমার পিতামহকে (উতবা ইবনে রাবিআহ), তোমার ভ্রাতাকে (হানযালাহ ইবনে আবি সুফিয়ান), তোমার চাচাকে (অলিদ ইবনে উতবা) বদরের যুদ্ধে খন্ড বিখন্ড করে হত্যা করেছিল। সে-ই তরবারিটি এখনো আমার কাছে আছে এবং আমি এখনো সে দিনের মত একই মনোভাব নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করি। আমি দ্বীনের কোন কিছুই পরিবর্তন করিনি এবং আমি কোন নতুন নবী নির্বাচিত করিনি। নিশ্চয়ই, আমি দ্বীনের রাজপথে চলছি যা তুমি ইচ্ছাকৃতভাবে পরিত্যাগ করেছো এবং জোর জবরদস্তির পথ বেছে নিয়েছো। তুমি প্রচার কর যে, তুমি উসমানের রক্তের বদলা নেয়ার জন্য বের হয়েছো। নিশ্চয়ই তুমি জান, কিভাবে উসমানের রক্তপাত ঘটেছিল। যদি তুমি উসমানের রক্তের বদলা নিতে চাও তবে যেখানে তার রক্তপাত ঘটেছে সেখানে বদলা নাও। আমি দেখতে পাচ্ছি যুদ্ধ যখন দাঁত কটমটিয়ে তোমার দিকে তাকায় তখন তুমি সেরূপ চিৎকার কর, বোঝার ভারে উট যেরূপ চিৎকার করে। আমি আরো দেখতে পাচ্ছি, তরবারির অবিরাম আঘাতে মৃতদেহ পড়তে দেখে তোমার দল

হতবুদ্ধি হয়ে আমাকে কুরআনের[১] আহ্বান করছে। যদিও এসব লোক হয় অবিশ্বাসী না হয় সত্যত্যাগী না হয় বায়াত ভঙ্গকারী।

১। সিফফিনের যুদ্ধ যাত্রার আগে আমিরুল মোমেনিন মুয়াবিয়াকে এ পত্র লিখেছিলেন। এখানে অল্প কথায় তিনি সিফফিনের পূর্ণ দৃশ্য ব্যক্ত করেছেন। ইরাকীদের আক্রমণে সিরিয় বাহিনী হতবুদ্ধি হয়ে পালিয়ে যাবার চিন্তা করছিলো। তখন রক্ষা পাবার জন্য বর্শার ডগায় কুরআন তুলে শান্তির জন্য চিৎকার করছিলো। হাদীদ[১৫২] লিখেছেন ঃ

আমিরুল মোমেনিনের এ ভবিষ্যদ্বানী হতে একটা বিষয় স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তাঁর ইলমুল গায়েব অত্যন্ত প্রখর ছিল। এহেন ভবিষ্যদ্বানী প্রকৃতই একটা অত্যাশ্চার্য বিষয় (১৫শ খন্ড, পৃঃ ৮৩-৮৫)।

★★★★★

নির্দেশনামা -১১

শত্রুর মোকাবেলায় প্রেরিত সৈন্যবাহিনীর প্রতি

যখন তোমরা শত্রুর দিকে এগিয়ে যাও অথবা শত্রু তোমাদের দিকে এগিয়ে আসে তখন তোমরা উচু স্থানের বা পাহাড়ের ঢালে অথবা নদীর বাঁকে এমন স্থানে অবস্থান গ্রহণ করো যে স্থান তোমাদেরকে সুবিধাজনক অবস্থানে রাখবে এবং প্রয়োজনে একটু পিছিয়ে যাবার উপায় থাকে। তোমাদের আক্রমণ যেন এক দিক অথবা দুদিক থেকে রচিত হয়। পর্যবেক্ষকগণকে পাহাড়ের চূড়ায় অথবা এলাকার উঁচু স্থানে উঠে শত্রুর অবস্থান ও গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করতে দিয়ো; তাতে কোন দিক থেকেই তারা তোমাদের নিকটবর্তী হতে পারবে না এবং আচমকা তোমাদেরকে আক্রমণ করতে পারবে না। জেনে রাখো, কোন সৈন্যবাহিনীর চক্ষু হলো উহার অগ্রগামীদল এবং অগ্রগামীদলের চক্ষু হলো গুপ্তচর দল। সাবধান, কখনো ছড়িয়ে ছিটিয়ে থেকো না। যখন কোথাও থাম সকলে মিলে থেমো, আবার যখন চলতে শুরু করো সকলেই একত্রে চলো। রাত্রি হলে তোমাদের বর্শাগুলো চক্রাকারে মাটিতে দাঁড় করে রেখো এবং রাত্রিকালে ঈষৎ তন্দ্রাচ্ছন্নাতার বেশী ঘুমিয়ো না।

★★★★★

নির্দেশনামা-১২

তিন হাজার সৈন্যের একটি অগ্রগামী বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে সিরিয়া অভিমুখে প্রেরণের প্রাক্কালে মাকিল ইবনে কায়েস আর-রিয়াহিকে বলেছিলেন ঃ

আল্লাহ্কে ভয় কর যাঁর সম্মুখে সকলেরই উপস্থিতি অবধারিত। আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো সাথে সাক্ষাত অবধারিত নয়। যারা তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে তারা ব্যতীত অন্য কারো সাথে যুদ্ধ করো না। দু'টি ঠান্ডা সময়ে (সকাল ও বিকাল) পথ চলো। সৈন্যগণকে দিনের মধ্যভাগে একটু ঘুমোতে দিয়ো। সহজভাবে এগিয়ে যেয়ো এবং রাতের প্রথমভাগে পথ চলো না, কারণ আল্লাহ্ এ সময়কে বিশ্রামের জন্য নির্ধারত করেছেন— ভ্রমণের জন্য নয়। সুতরাং রাতে শরীরকে বিশ্রাম দিয়ো এবং বাহক পশুগুলোকেও বিশ্রাম করতে দিয়ো। ভোরের আগমন নিশ্চিত হয়ে সুবে সাদেকের সময় আল্লাহ্র নাম নিয়ে যাত্রা শুরু করো। শত্রুর মুখোমুখি হওয়া মাত্রই সাথীদের মাঝখানে অবস্থান গ্রহণ করো। আমার আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত সে ব্যক্তির মত শত্রুর নিকটবর্তী হয়ো না যে এখনই যুদ্ধ শুরু করতে চায় অথবা সে ব্যক্তির মত শত্রুর কাছ থেকে দূরে সরে পড়ো না

যে যুদ্ধের ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত। শত্রুর প্রতি ঘৃণা যেন তোমাকে যুদ্ধের প্রতি তাড়িত না করে। যুদ্ধ শুরু করার আগে বারবার শত্রুকে হেদায়েতের দিকে আহ্বান করো যাতে তাদের কাছে তোমার সকল ওজর নিঃশেষিত হয়।

★★★★★

পত্র-১৩
সৈন্যবাহিনীর দু'জন অফিসারের প্রতি

আমি মালিক[১] ইবনে হারিছ আল-আশতারকে তোমাদের ও তোমাদের অধীনস্থ সকলের কমান্ডার হিসাবে নিয়োগ করেছি। সুতরাং তোমরা সকলেই তার আদেশ পালন করে চলবে এবং তাকে তোমাদের বর্ম ও ঢাল হিসাবে মনে করবে। কারণ সে এমন এক ব্যক্তি যার থেকে কোন ভীতি বা ভুলের আশঙ্কা নেই। যেখানে দ্রুততার দরকার সেখানে অলসতা অথবা যেখানে শিথিলতার প্রয়োজন সেখানে দ্রুততা তার কাছে পাওয়া যাবে না।

১। বিয়াদ ইবনে আন-নদর আল-হারিছি ও শুরাইয়াহ্ ইবনে হানি আল-হারিছির নেতৃত্বে আমিরুল মোমেনিন বার হাজারের একটি অগ্রগামী সৈন্যবাহিনী সিরিয়া অভিমুখে প্রেরণ করেছিলেন। পথিমধ্যে সুর আররুম নামক স্থানে তারা আবুল আওয়ার আস-সুলামির মোকাবেলা করলো। আবুল আওয়ার সেখানে একটি সিরিয় বাহিনী নিয়ে ক্যাম্প করেছিল। আমিরুল মোমেনিনকে এ সংবাদ আল-হারিছ ইবনে জুমহান আল-জুফির মাধ্যমে অবহিত করা হলে তিনি মালিক ইবনে আল হারিছ আল-আশতারকে এ পত্রসহ বাহিনী প্রধান করে প্রেরণ করেছিলেন। এ পত্রে অল্প কথায় অতিসুন্দর করে মালিকের বুদ্ধিমত্তা, ব্যক্তিত্ব, শৌর্য-বীর্য, বীরত্ব ও গুরুত্ব ব্যক্ত করেছেন।

★★★★★

নির্দেশনামা-১৪
সিফফিনে[১] শত্রুর সাথে যুদ্ধ শুরু করার পূর্বে সেনাবাহিনীকে এ নির্দেশ দিয়েছিলেন

শত্রুপক্ষ আঘাত হানার পূর্ব পর্যন্ত তোমরা আঘাত করো না। কারণ আল্লাহ্র অসীম রহমতে, তোমরা ন্যায়ের পথে রয়েছো এবং তারা যুদ্ধ শুরু করার পূর্ব পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দিলে তা তোমাদের পক্ষে আরো একটা পয়েন্ট হয়ে দাঁড়াবে। ইনশাল্লাহ্, যদি শত্রুপক্ষ পরাজিত হয় তবে তাদের মধ্যে যারা পলায়নপর তাদেরকে হত্যা করো না, অসহায় কোন ব্যক্তিকে আঘাত করো না এবং আহতগণকে একেবারে শেষ করে দিয়ো না। কোন রমণী যদি তোমাদের সম্মান ক্ষুন্ন করে নোংরা কথা বলে বা তোমাদের অফিসারকে গালি দেয় তবুও তাদেরকে কষ্ট দিয়ো না। কারণ জ্ঞানে, মনে ও চরিত্রে তারা তোমাদের চেয়ে দুর্বল। (রাসুলের যুগে) তারা অবিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও তাদের ওপর আপতিত না হবার জন্য আমাদেরকে আদেশ দেয়া হতো। এমনকি আইয়ামে জাহেলিয়াতেও যদি কোন পুরুষ কোন নারীকে পাথর অথবা ছড়ি দিয়ে আঘাত করতো তবে তার চৌদ্দ-পুরুষসহ তাকে গালাগালি করা হতো।

১। সিফফিনের যুদ্ধ আমিরুল মোমেনিন ও মুয়াবিয়ার মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল। এ যুদ্ধের জন্য মুয়াবিয়া এককভাবে দায়ী। কারণ সে উসমানের হত্যার জন্য আমিরুল মোমেনিনকে মিথ্যা দোষারোপ করে যুদ্ধ সংঘটিত করেছিল। প্রকৃতপক্ষে কে বা কারা এবং কি কারণে হত্যা করেছিল তা মুয়াবিয়ার অজানা ছিল না। সে তার অবৈধ ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য উসমানের রক্তের বদলা নেয়ার ধুয়া তুলে বিদ্রোহ ও যুদ্ধের পথ বেছে নিয়েছিল। কিন্তু শরিয়তের বিধান মতে মুসলিমদের ঐকমত্যে প্রতিষ্ঠিত সত্যের অনুসারী ইমামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা অবৈধ, যেমন–

শাসনকার্যে নিয়োজিত কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো না। তাদের কোন কার্য ইসলাম বিরোধী এটা নিশ্চিত না হয়ে তাদের কাজে বাধার সৃষ্টি করো না। যদি তোমার দৃষ্টিতে তাদের কোন কাজ মন্দ বলে মনে হয় তবে সে বিষয়ে সত্য কথা বলে দিয়ো; কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে উত্থান বা যুদ্ধ ঘোষণা মুসলিমদের ইজমায় নিষিদ্ধ (নাওয়াবী[৮২], ২য় খন্ড, পৃঃ ১২৫; বাকিলানী,[৯১] পৃঃ ১৮৬; তাফতাজানী,[৭৩] ২য় খন্ড, পৃঃ ২৭২)।

মুসলিমদের ঐকমত্যে প্রতিষ্ঠিত কোন ইমামের বিরুদ্ধে যে কেউ বিদ্রোহ করে সে সত্যত্যাগী খারিজী বলে পরিচিত হবে। সাহাবীদের যুগে এটা প্রচলিত ছিল এবং তাদের পরেও একথা প্রযোজ্য (শাহরাস্তানী,[১৩৪] ১ম খন্ড, পৃঃ ১১৪)।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, মুয়াবিয়ার কর্মকান্ড ছিল আমিরুল মোমেনিনের বিরুদ্ধে উত্থান ও তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা। একজন বিদ্রোহীর অগ্রগতি প্রতিরোধ করার জন্য অস্ত্রধারণ করা শান্তির পরিপন্থী কিছু নয়। বরং এটা মজলুমের স্বাভাবিক অধিকার। এ অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করলে জুলুম ও স্বেচ্ছাচারিতা প্রতিহত করার এবং অধিকার প্রতিষ্ঠা করার আর কোন পথ খোলা থাকবে না। সে কারণেই বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করার অনুমতি আল্লাহ্ নিজেই দিয়েছেন। আল্লাহ্ বলেন ঃ

যদি বিশ্বাসীগণের দু'দল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে পড়ে তবে তোমরা তাদের উভয় দলের মধ্যে মীমাংসা করে শান্তি স্থাপন করে দেবে; কিন্তু যদি তাদের একদল অপর দলকে আক্রমণ করে তবে তোমরা সকলে মিলে আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে যতক্ষণ না তারা আল্লাহ্র নির্দেশের দিকে ফিরে না আসে– যদি তারা ফিরে আসে তবে তাদের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত মীমাংসা করে দিয়ো এবং এতে সুবিচার করো। নিশ্চয়ই, আল্লাহ্ সুবিচারকারীকে ভালবাসেন (কুরআন- ৪৯ঃ৯)।

এ কারণেই আমিরুল মোমেনিন- "আল্লাহ্র ফজলে তোমরা ন্যায়ের পথে আছো"— মর্মে দাবী করেছিলেন। এতদসত্ত্বেও তিনি তাঁর সৈন্যবাহিনীকে উপদেশ দিয়েছিলেন যেন তাদের পক্ষ হতে যুদ্ধের সূচনা না হয়। কারণ তিনি শুধু আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ করার ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন। কিন্তু যখন শান্তি-শৃংখলার জন্য তাঁর সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থতার পর্যবসিত হলো এবং শত্রু কোন কথা না শুনে যুদ্ধের দিকেই এগিয়ে গেল তখন জুলুম ও স্বেচ্ছাচারিতা প্রতিহত করার জন্য তাদের মোকাবিলা করা তাঁর দায়িত্ব হয়ে পড়েছিল যা মহান আল্লাহ্ স্পষ্টভাবে অনুমোদন করেছেন ঃ

যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তোমরাও আল্লাহ্র পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর; কিন্তু সীমালজ্ঘন করো না। আল্লাহ্ সীমালজ্ঘনকারীকে ভালবাসেন না। (কুরআন-২ঃ১৯০)।

এ ছাড়াও আমিরুল মোমেনিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা মানেই হলো রাসুলের (সঃ) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। রাসুল (সঃ) বলেছেন ঃ

হে আলী, তোমার শান্তিই আমার শান্তি, তোমার যুদ্ধই আমার যুদ্ধ (হাদীদ,[১৫২] ১৮-শ খন্ড, পৃঃ ২৪)।

এ কারণে রাসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অপরাধে যে শাস্তি প্রাপ্য আমিরুল মোমেনিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেও একই শাস্তি পাওয়ার যোগ্য। রাসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবার শাস্তি মহান আল্লাহ্ নির্ধারণ করে দিয়েছেন ঃ

যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং পৃথিবীতে ফেতনা সৃষ্টি করে বেড়ায় তাদের শাস্তি হলো—তাদের হত্যা করা হবে অথবা ক্রুশ বিদ্ধ করা হবে অথবা বিপরীত দিক হতে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদের দেশ হতে নির্বাসিত করা হবে। ইহকালে এটাই তাদের শাস্তি এবং পরকালে তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি (কুরআন-৫ঃ৩৩)।

এরূপ অনুমতি থাকা সত্ত্বেও পলায়নোন্মুখ ও আহত শত্রুকে হত্যা না করার জন্য আমিরুল মোমেনিন তাঁর সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাঁর এহেন নির্দেশ নৈতিক মূল্যবোধ ও জিহাদের একটি মহোত্তম নিদর্শন। এ নির্দেশ তিনি শুধু মুখে বলেননি লিখেও দিয়েছেন। বস্তুতঃপক্ষে যুদ্ধে পলায়নপর ও অসহায় শত্রু এবং নারী হত্যা তিনি সহ্য করতে পারতেন না। জামালের যুদ্ধে তাঁর শত্রুপক্ষের নেতৃত্বে নারী থাকা সত্ত্বেও তিনি নীতি পরিবর্তন করেননি। পরাজিত হবার পর তিনি আয়শাকে দেহরক্ষী দ্বারা মদিনা প্রেরণ করেন। এ বিষয়ে হাদীদ[১৫২] (১৭শ খন্ড, পৃঃ ২৫৪) লিখেছেন ঃ

আমিরুল মোমেনিনের সাথে আয়শা যেরূপ আচরণ করেছে উমরের সাথে যদি সেরূপ আচরণ করা হতো তাহলে জয়লাভের পর উমর তাকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলতো।

★★★★★

প্রার্থনা-১৫

শত্রুর মোকাবেলা করার পূর্বে আমিরুল মোমেনিন এ প্রার্থনা করতেন

হে আমার আল্লাহ্, তোমার দিকেই হৃদয়ের টান পড়ছে; তোমার প্রতি মস্তক অবনত হচ্ছে; তোমার দিকেই চক্ষু স্থির, তোমার দিকেই পদচারণা চলছে এবং দেহ দুর্বল হয়ে পড়েছে। হে আমার আল্লাহ্, গোপন শত্রুতা প্রকাশ হয়ে পড়েছে এবং বিদ্বেষের পাত্র উত্তপ্ত হচ্ছে।

হে আমার আল্লাহ্, আজ আমাদের রাসুল নেই, তোমার কাছেই ফরিয়াদ জানাই, আমাদের শত্রু সংখ্যা অগণন এবং দুঃখ দ্বারা আমরা পরিব্যপ্ত।

হে প্রভু, আমাদের ও আমাদের জনগণের মধ্যে তুমি সত্যের ফয়সালা করে দাও। তুমিই তো সর্বোত্তম ফয়সালাকারী (কুরআন-৭ঃ৮৯)।

★★★★★

নির্দেশনামা-১৬

যুদ্ধের সময় অনুচরদেরকে এ নির্দেশ দিতেন

ফিরে আসার উদ্দেশ্যে পশ্চাদপসারণ এবং আক্রমণের উদ্দেশ্যে পিছিয়ে যাওয়া তোমাদেরকে যেন বিচলিত না করে। তোমাদের তরবারির প্রতি ন্যায় বিচার করো। (অর্থাৎ তোমাদের তরবারিকে উহার কর্তব্য পালন করতে দিয়ো)। শত্রুর দেহ পতিত হবার জন্য একটা স্থান প্রস্তুত রেখো; সজোরে বর্শা নিক্ষেপ ও পূর্ণ শক্তি দিয়ে তরবারি পরিচালনার জন্য নিজেকে প্রস্তুত রেখো। তোমাদের স্বর নীচু রেখো তাতে কাপুরুষতা স্পর্শ করতে পারবে না।

তাঁর কসম যিনি বীজ হতে অঙ্কুরোদগম করেন ও প্রাণীকূল সৃষ্টি করেছেন, তারা কেউ ইসলাম গ্রহণ করেনি; তারা মৌখিকভাবে ইসলাম গ্রহণের কথা বলে নিরাপত্তা অর্জন করেছিলেন এবং তাদের ফেতনা- ফ্যাসাদ সৃষ্টির স্বভাব গোপন করেছিলো। ফলে যখন তাদের ফেতনার সহযোগী পেয়ে গেল অমনি তারা উহা প্রকাশ করেছিলো।

★★★★★

পত্র-১৭

মুয়াবিয়ার একটি পত্রের প্রত্যুত্তর[১]

তোমার পত্রে তুমি আমার কাছে দাবী করেছো আমি যেন সিরিয়া তোমার কাছে হস্তান্তর করে দেই। এ বিষয়ে তোমাকে স্পষ্ট জানিয়ে দিচ্ছি যে, আমি গতকাল যা অস্বীকার করেছি আজ তা স্বীকার করে তোমাকে দিতে পারি না। তুমি বলেছো যুদ্ধ সমগ্র আরবকে গ্রাস করে ফেলেছে, এখন শুধু শেষ নিশ্বাসটুকু বাকী আছে। এ বিষয়ে জেনে রাখো, সত্য ও ন্যায় যাকে গ্রাস করে সে বেহেশ্‌তে স্থান লাভ করে; আর অন্যায় ও ফেতনা যাকে গ্রাস করে সে দোযখের স্থায়ী বাসিন্দা। যুদ্ধ কৌশল ও জনবলে আমার সমকক্ষতার কথা তুমি বলেছো। এ বিষয়ে তুমি জেনে রাখো, ইমানে সংশয় ঢোকাতে তুমি যতটুকু পারঙ্গম নিশ্চয়ই আমি উহাতে তদাপেক্ষা বেশী দৃঢ় এবং

ইরাকের জনগণ পরকালের জন্য যতটুকু লোভাতুর সিরিয়ার জনগণ ইহকালের জন্য তদাপেক্ষা বেশী লোভাতুর নয়।

তুমি লিখেছো যে, আমরা উভয়েই আবদ মনাফের বংশধর। তোমার একথা নিঃসন্দেহে সত্য। কিন্তু উমাইয়া কোন ক্রমেই হাশিমের সমতুল্য নয়; হারব কোন দিক দিয়েই আবদাল মুত্তালিবের সমতুল্য নয় এবং আবু সুফিয়ান কখনো আবু তালিবের সমতুল্য নয়। সাধারণ ক্ষমতাপ্রাপ্তগণ (মক্কা বিজয়ের পর) কোন অবস্থাতেই মুহাজিরগণের সমতুল্য হতে পারে না। একজন দত্তকপুত্র (পালিতপুত্র) কখনো একজন বিশুদ্ধ বংশধরের সমতুল্য হতে পারে না। কোন বিপদগামী একজন সত্যের অনুসারীর সমতুল্য হতে পারে না এবং কোন মোনাফিক ইমানদারের সমতুল্য হতে পারে না। যারা দোযখে নিক্ষিপ্ত হয়েছে তাদের অনুসরণকারী উত্তরসূরীগণ কতই না মন্দ উত্তরাধিকারী।

এছাড়াও আমাদের বংশ নবুয়তের বৈশিষ্ট্য মন্ডিত এবং এ বৈশিষ্ট্য বলে আমরা পরাক্রান্তগণকে পরাভূত করেছি ও পদদলিতগণকে ওপরে তুলে এনেছি। যখন মহিমান্বিত আল্লাহ্ আরবকে তাঁর দ্বীনের জন্য নির্বাচিত করলেন এবং মানুষ ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক উহাতে আত্মসমর্পণ করেছিলো তখন তুমি তাদেরই একজন ছিলে যারা লোভে অথবা ভয়ে দ্বীনে প্রবেশ করেছিলো। তুমি এমন এক সময়ে দ্বীনে প্রবেশ করেছো যখন তোমার পূর্ববর্তীগণ অনেক এগিয়ে গেছে এবং মুহাজিরগণ একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য অর্জন করে ফেলেছে।

এখন তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি, শয়তানকে তোমার অংশীদার হতে দিয়ো না এবং তোমার নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করার সুযোগ তাকে দিয়ো না। এখনেই বিষয়টি শেষ করলাম।

১। সিফফিনের যুদ্ধ চলাকালে আমিরুল মোমেনিনের কাছে সিরিয়া প্রদেশ দাবী করার জন্য মুয়াবিয়া পুনরায় মনস্থ করলো। তার এ দাবী ছিল একটা ছল-চাতুরির কৌশল মাত্র। বিষয়টি আমর ইবনে আসের সাথে আলোচনা করলে সে মুয়াবিয়ার সাথে দ্বিমত পোষণ করে বললো, 'হে মুয়াবিয়া, একটু চিন্তা করুন, আপনার এ লেখা আলীর ওপর কোন প্রভাব ফেলবে কি? সে কখনো আপনার এ ফাঁদে পড়বে না।" একথা শুনে মুয়াবিয়া বললো, 'আমরা উভয়েই আবদ মনাফের বংশধর। আলী ও আমার মধ্যে এমন কি ব্যবধান আছে যা আলীকে আমার চেয়ে বেশী বৈশিষ্ট্য মন্ডিত করেছে এবং আমি তাকে প্রতারিত করতে ব্যর্থ হবো?' আমর ইবনে আস বললো, "যদি আপনি তাই মনে করেন তবে লিখুন এবং দেখুন কি ফলাফল হয়।" ফলে মুয়াবিয়া সিরিয়া প্রদেশ দাবী করে আমিরুল মোমেনিনকে এক পত্র দিয়েছিল। তার পত্রে সে একথাও লিখছিলো, " আমরা উভয়ই আবদ মনাফের বংশধর। কাজেই আমাদের একের ওপর অপরের কোন বৈশিষ্ট্য নেই।" মুয়াবিয়ার পত্রের জবাবে আমিরুল মোমেনিন এ পত্র লিখেন এবং এতে তাঁর নিজের পূর্বপুরুষদের সাথে মুয়াবিয়ার পূর্বপুরুষগণের তুলনা করে তাঁর সাথে মুয়াবিয়ার সমতা অস্বীকার করেন। তারা উভয়ে আবদ মনাফের বংশধারার হলেও আবদ শামসের বংশধরগণ ছিল চরিত্রহীন, পাপী, নৈতিকতা বিবর্জিত, ধর্মত্যাগী ও মূর্তিপূজক। অপর দিকে হাশিম ছিলেন এক ইলাহ্র উপাসক এবং তিনি কখনো মূর্তিপূজা করতেন না।

একই গাছের বিভিন্ন শাখায় যদি একই ফুল,ফল ও কাঁটা থাকে তবেই উহার সব শাখা সমান বলে মনে করা যায়। শাখা গুলোতে বিভিন্ন ফল ও ফুল হলে একে অন্যের সমতুল্য বলা যায় না। কাজেই সকল ঐতিহাসিক ও জীবনীলেখক এ বিষয়ে একমত যে, উমাইয়া ও হাশিম, হারব ও আবদাল মুত্তালিব এবং আবু সুফিয়ান ও আবু তালিব কোন দিক হতেই একে অন্যের সমতুল্য ছিল না। এ পত্র লিখার পর মুয়াবিয়াও এ বিষয়ে কোন মতদ্বৈধতা করেনি। কারণ এটা সুস্পষ্ট ইতিহাস যে, আবদ মনাফের পর হাশিমই কুরাইশদের মধ্যে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। কাবার দুটি গুরুত্বপূর্ণ পদে তিনি নিয়োজিত ছিলেন। এপদ দু'টি হলো 'মিকায়াহ' (হাজীদের পানি সরবরাহের তত্ত্বাবধায়ন) ও 'রিফাদাহ' (হাজীদের থাকা-খাবার ব্যবস্থাপনা)। ফলে হজ্বের সময় দলে দলে লোক তাঁর কাছে এসে থাকতো। তিনি এত অতিথিপরায়ণ ও উদার ছিলেন যে লোকেরা চলে যাবার পরও অনেক দিন ধরে তার প্রশংসা করতো। তার সুযোগ্য পুত্র হলো আবদাল মুত্তালিব যার নাম ছিল শায়বাহ এবং পরিচিতি ছিল 'সায়্যেদুল বাত্বা' (মক্ক উপত্যকার প্রধান)। আবদাল মুত্তালিবের পুত্র আবু তালিবের কোলেই রাসুল (সঃ) লালিত পালিত হয়েছিলেন এবং নবুয়ত প্রকাশের পর তাঁর শত্রুর বিরুদ্ধে বর্মের মত ছিলেন।

বংশ মর্যাদার ব্যবধান বর্ণনার পর আমিরুল মোমেনিন তাঁর বৈশিষ্ট্যের দ্বিতীয় পয়েন্ট উল্লেখ করে বলেন যে, তিনি একজন মুহাজির। অপর পক্ষে মুয়াবিয়া হলো 'তালিক' (মক্কা বিজয়ের পর যারা সাধারণ ক্ষমা পেয়েছিল)। রাসুল (সঃ) যখন বিজয়ীর বেশে মক্কায় প্রবেশ করলেন তখন তিনি কুরাইশগণকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, তারা কিরূপ ব্যবহার পেতে চায়। তখন তারা এক বাক্যে বলেছিল যে,তারা মহৎ পিতার মহৎ পুত্রের কাছে কল্যাণ ছাড়া আর কিছু আশা করে না। এতে রাসুল (সঃ) বললেন, "যাও, তোমাদের সকলকে ক্ষমা করে দেয়া হলো।" মুয়াবিয়া ও আবু সুফিয়ান এ সাধারণ ক্ষমার অন্তর্ভূক্ত ছিল (হাদীদ[১৫২], ১৭ শ খন্ড, পৃঃ ১১৯; আবদুহ[৭], ৩য় খন্ড, পৃঃ ১৭)।

আমিরুল মোমেনিন তাঁর বৈশিষ্ট্যের তৃতীয় পয়েন্টে উল্লেখ করেন যে, তাঁর বংশধারা সঠিক ও স্পষ্ট এবং এতে কোন স্তরে সন্দেহের অবকাশ নেই। অপরপক্ষে মুয়াবিয়ার বংশধারায় 'লাসিক' (দত্তক বা পালিত বা পিতৃ পরিচয়হীন) রয়েছে। প্রকৃত পক্ষে উমাইয়া আবদে শামসের বাইজেনটাইন কৃতদাস ছিল। আবদে শামস তার বুদ্ধিমত্তা দেখে তাকে মুক্ত করে দিয়ে দত্তক হিসাবে গ্রহণ করে। এতে সে নিজেকে উমাইয়া ইবনে আবদে শামস্ পরিচয় দিতে থাকে (মজলিসী[১০৩], ৮ম খন্ড, পৃঃ ৩৮৩)। তদুপরি হারবও উমাইয়ার পুত্র নয়— পালিত ক্রীতদাস। এ বিষয়ে হাদীদ ও ইস্পাহানী লিখেছেন;

বংশধারা বিশেষজ্ঞ জাফাল ইবনে হানজালাকে মুয়াবিয়া জিজ্ঞেস করেছিল সে আবদাল মুত্তালিবকে দেখেছিল কিনা। সে হাঁ সূচক জবাব দিলে মুয়াবিয়া জিজ্ঞেস করলো আবদুল মুত্তালিব দেখতে কেমন ছিল। জাফাল উত্তরে বললো যে, আবদুল মুত্তালিব অত্যন্ত সুন্দর, সুপুরুষ ও সম্মানী লোক ছিলেন। তাঁর প্রশস্ত কপাল ও উজ্জ্বল মুখ মন্ডলের কমনীয়তা মনোহর ছিল। তৎপর মুয়াবিয়া জিজ্ঞেস করেছিল যে, সে আবদে শামসকে দেখেছে কিনা। সে হাঁ সূচক উত্তর দিল। মুয়াবিয়া জিজ্ঞেস করলো যে, সে দেখতে কেমন ছিল। জাফাল বললো যে, সে দুর্বল ও বাঁকা দেহের অন্ধ ছিল যাকে তার ক্রীতদাস জাকওয়ান এখানে সেখানে ধরে ধরে নিয়ে যেত। মুয়াবিয়া জিজ্ঞেস করলো যে, আবু আমর (হারব) কি তারপুত্র ছিল? জাফাল বললো যে, তোমরা তা বললেও কুরাইশগণ ভালভাবে জানে হারব তার ক্রীতদাস ছিল। (হাদীদ[১৫২], ১৭শ খন্ড, পৃঃ ২৩১-২৩২; ইসপাহানী[৩৪], ১ম খন্ড, পৃঃ ১২)।

(আবদে মনাফ ইবনে কুসাই ইবনে কিলাব ছিলেন কাবার তত্ত্বাবধায়ক। তার পুত্র আবদে শামসের পুত্র উমাইয়া এবং হাশিমের পুত্র আবদাল মুত্তালিব। এ উমাইয়া বংশেই মুয়াবিয়া এবং হাশিমী বংশে আমিরুল মোমেনিন জন্মগ্রহণ করেন। আবদে মনাফের পর হতে মক্কা ও কাবার নেতৃত্ব ছিল হাশিমী বংশের। এজন্য উমাইয়াগণ সর্বদা হাশিমীদের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ ছিল। উমাইয়াগণ এ বিদ্বেষের ফলে হাশিমীদের বিরুদ্ধে কয়েকবার যুদ্ধও করেছিল। হাশিমের হাতে উমাইয়া পরাজিত হয়ে মক্কা হতে বহিষ্কৃত হয়েছিল। উমাইয়ার পুত্র হারব এবং তার পুত্র আবু সুফিয়ান ছিল রাসুলের (সঃ) ঘোরতর শত্রু। বংশগত শত্রুতার জের হিসাবে রাসুলের (সঃ) সকল দুঃখ-কষ্টের মুল কারণ ছিল উমাইয়াগণ। রাসুলের পরেও হাশিমী বংশের সাথে উমাইয়া বংশ বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করতো এবং উমাইয়াগণ চিরদিন হাশিমী বংশকে নিশ্চিহ্ন করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। যার ফলশ্রুতিই হলো সিফ্‌ফিন ও কারাবালা। উমাইয়াগণ চিরকালই অন্যায়, অসত্য ও অধার্মীকতার ভূমিকা পালন করেছে পক্ষান্তরে হাশিমীগণ বংশ মর্যাদা ও ঐতিহ্য গৌরব নিয়ে ধর্মীয় নেতৃত্ব প্রদান করেছে এবং সত্য ও ন্যায়ের ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত ছিল; সাকী, দৈনিক ইনকিলাম, ১২ই জুলাই, ১৯৯২ —বাংলা অনুবাদক)।

★★★★★

পত্র-১৮

বসরার গভর্ণর আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের প্রতি

জেনে রাখো, বসরা এমন এক স্থান যেখানে শয়তান অবতরণ করে ও ফেতনা সংঘটিত হয়। তথাকার জনগণকে ভাল ব্যবহার দ্বারা খুশী রেখো এবং তাদের মন হতে ভয়ের গ্রন্থি খুলে ফেলো। আমি জানতে পেরেছি

তুমি বনি তামিমের[১] প্রতি কঠোর মনোভাব পোষণ কর এবং তাদের সাথে রূঢ় ব্যবহার কর। বনি তামিম এমন গোত্র যাদের জন্য একটি তারকা অস্ত গেলে অন্য একটি উদিত হয়। তারা প্রাক ইসলামী বা ইসলামোত্তর কোন যুদ্ধে কখনো সীমাতিক্রম করেনি। আমাদের সাথে তাদের বিশেষ জ্ঞাতিত্ব ও আত্মীয়তা আছে। যদি আমরা জ্ঞাতিত্বের মর্যাদা রক্ষা করি তবে আমরা পুরস্কৃত হব এবং জ্ঞাতিত্বকে অস্বীকার করলে পাপী হিসাবে বিবেচিত হব। হে আবুল আব্বাস, তোমার ওপর আল্লাহ্‌র করুণা বর্ষিত হোক; জনগণ সম্বন্ধে ভাল মন্দ কোন কিছু করা বা বলা হতে নিজেকে বিরত রাখো। কারণ আমি ও তুমি উভয়ে এ দায়িত্বের অংশীদার। তোমার সম্পর্কে আমার যে ভাল ধারণা রয়েছে তা প্রমাণ কর এবং আমার সে ধারণাকে ভুল বলে প্রমাণ করো না। এখানেই শেষ করলাম।

১। তালহা ও জুবায়র বসরা পৌঁছলে বনি তামিম উসমানের রক্তের বদলা নেয়ার ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে এবং ফেতনা ছড়ানোর কাজে তারা অগ্রণী ছিল। সুতরাং আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস বসরার গভর্ণর হবার পর তাদের শত্রুতার কারণে তাদের প্রতি রূঢ় ব্যবহার করতে লাগলেন; কারণ তিনি মনে করতেন তারা রূঢ় ব্যবহার পাবার যোগ্য। কিন্তু এ গোত্রে আমিরল মোমেনিনের কয়েকজন অনুসারী ছিল। তারা জারিয়া ইবনে কাদামার মাধ্যমে পত্র পাঠিয়ে ইবনে আব্বাসের রূঢ় আচরণের কথা আমিরুল মোমেনিনকে জানালেন। ফলে আমিরুল মোমেনিন এ পত্রে তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করার জন্য ইবনে আব্বাসকে নির্দেশ দিলেন। বনি হাশিম ও বনি তামিমের জ্ঞাতিত্বের প্রতি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। সে জ্ঞাতিত্ব হলো ইলিয়াস ইবনে মুদারের বংশধারা। হাশিম ছিলেন মুদ্রিকাহ্‌ ইবনে ইলিয়াসের বংশধর এবং তামিম ছিল তাবিখাহ্‌ ইবনে ইলিয়াসের বংশধর।

★★★★★

পত্র-১৯

আমিরুল মোমেনিনের একজন অফিসারের প্রতি

তোমার নগরীর কৃষকগণ অভিযোগ করেছে যে, তুমি তাদের প্রতি অবমাননাকর ও রূঢ় ব্যবহার কর। তুমি তাদের প্রতি কঠোর ও দয়ামায়াহীন হৃদয়ের আচরণ কর। এ বিষয়ে আমি চিন্তা করেছি। তাদের সাথে অঙ্গীকারের কারণে অবিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও তাদেরকে দূরে সরিয়ে রাখা যাবে না। আবার কাছেও আনা যাবে না এবং কঠোর ব্যবহারও করা যাবে না। তাদের সাথে কঠোরতা ও নম্রতার মাঝামাঝি আচরণ করো এবং তাদের জন্য মিশ্র মনোভাব গ্রহণ করো অথবা নৈকট্য ও অন্তরঙ্গতার সাথে দূরত্ব ও পৃথকতা অবলম্বন কর।

★★★★★

পত্র-২০

জিয়াদ ইবনে আবিহ্‌র প্রতি (বসরার গভর্ণর আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাসের ডেপুটি)

আমি সত্যিকারভাবে আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলছি, যদি আমি জানতে পারি যে, তুমি মুসলিমদের তহবিল কি অল্প কি বেশী আত্মসাৎ করেছো, আমি তোমাকে এমন শাস্তি দেব যাতে তুমি খালি হাতে, বোঝার ভারে নুব্জ পিঠে ও গ্লানিকরভাবে এ পৃথিবী ত্যাগ করে যাবে এবং এখানেই বিষয়টি শেষ।

★★★★★

পত্র-২১
জিয়াদের প্রতি

তোমার অমিতব্যয়িতা পরিহার করো এবং মাত্রা বজায় রেখো। প্রতিদিন পরবর্তী দিনকে স্মরণ করো। তোমার প্রয়োজনীয় অর্থ তহবিল হতে রেখে দিয়ো এবং অবশিষ্ট অর্থ ভবিষ্যতের প্রয়োজনের জন্য পাঠিয়ে দিয়ো। তুমি কি আশা কর আল্লাহ্ তোমাকে নিরহঙ্কারদের পুরস্কারে পুরস্কৃত করবেন যখন তুমি নিজেই তাঁর উদ্দেশ্য হতে অকার্যকর হয়ে থাক? তুমি কি আশা কর আল্লাহ্ তোমাকে সাদকা প্রদানকারীদের পুরস্কারে পুরস্কৃত করবেন যদিও তুমি নিজে জাকজমকে ও আরাম-আয়েশে থেকে দুঃস্থ ও বিধবাদের প্রতি কোন খেয়াল রাখো না? নিশ্চয়ই, প্রত্যেক মানুষ তার আমল অনুযায়ী পুরস্কৃত হবে এবং পূর্বে যা প্রেরণ করে তাই সে পাবে। বিষয়টি এখানে শেষ করলাম।

★★★★★

পত্র-২২
আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের[১] প্রতি

তোমাকে জানানো দরকার যে, কোন কোন সময় মানুষ একটি জিনিস সংগ্রহ করে আনন্দিত হয় যা সে মোটেই হারাতে চায় না এবং কোন জিনিস হারিয়ে দুঃখ পায় যা সে আর কোন উপায়ে পাবে না। পরকালের জন্য যা সংগ্রহ করতে পার তার জন্য তোমার আনন্দ পাওয়া উচিত এবং পরকালের যা হারিয়ে ফেলছো তজ্জন্য দুঃখ পাওয়া উচিত। এ দুনিয়া হতে যা সংগ্রহ কর সে জন্য খুশী হবার কিছু নেই এবং এ দুনিয়াতে যা হারাচ্ছো সে জন্যও দুঃখ পাবার তেমন কিছু নেই। মৃত্যুর পর যা ঘটবে তাতে উদ্বিগ্ন হওয়া দরকার।

১। আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস প্রায়শই বলতো, "রাসুলের বাণী বাদ দিলে এ কথা ছাড়া অন্য কোন কথায় আমি এত বেশী উপকার পাইনি।"

★★★★★

উইল[১]-২৩

আমি তোমাদেরকে আমার মৃত্যুশয্যার ইচ্ছা হিসাবে নির্দেশ দিচ্ছি আল্লাহ্র সাথে কোন কিছুকে অংশীদার করো না। মুহাম্মদের (সঃ) সুন্নাহর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করো না। এদুটি স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত করো এবং এদুটি প্রদীপ জ্বেলে রেখো। এতে তোমরা পাপ হতে মুক্ত থাকতে পারবে। গতকাল আমি তোমাদের সাথী ছিলাম। আজ আমি তোমাদের জন্য শিক্ষা এবং আগামীকাল তোমাদেরকে ছেড়ে চলে যাচ্ছি। যদি আমি বেঁচে থাকি তবে আমার রক্তের বদলা নেয়া না নেয়ার বিষয়টি শুধুমাত্র আমার এখতিয়ারভুক্ত। যদি আমি মরে যাই তবে মনে রেখো, মৃত্যু অবধারিত ঘটনা। যদি আমি ক্ষমা করি তবে তা হবে আমার জন্য আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের একটা উপায় এবং তোমাদের জন্য সৎ আমল। সুতরাং ক্ষমা করে দিয়ো। "তোমরা কি চাহ না যে, আল্লাহ্ তোমাদের ক্ষমা করেন"(কুরআন, ২৪ঃ২২)।

আল্লাহ্র কসম, এমন আকস্মিক মৃত্যুকে আমি কখনো অপছন্দ করিনি অথবা এমন দুর্ঘটনাকে আমি ঘৃণা করি না। আমি একজন রাত্রিকালীন ভ্রমণকারীর মত যে ভোরে ঝরণার কাছে পৌছেছে অথবা এমন একজন

অনুসন্ধানকারীর মত যে তার লক্ষ্য অর্জন করেছে। "আল্লাহ্ যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন।" (কুরআন—৩ঃ১৯৮)

১। আবদার রহমান ইবনে মুলজামের (তার ওপর আল্লাহর লানত) তরবারির আঘাত প্রাপ্ত হাবার পর মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে এ উইল ব্যক্ত করেছিলেন।

★★★★★

উইল-২৪

আমিরুল মোমেনিনের সম্পদ বন্টন বিষয়ে সিফফিন থেকে ফিরে এসে লিখেছিলেন

এটা হলো তা যা আল্লাহ্র বান্দা আলী ইবনে আবি তালিব আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য তার সম্পত্তি[১] সম্বন্ধে নির্ধারণ করেছে যার জন্য আল্লাহ্ তাকে বেহেশত নসীব করে শান্তি দিতে পারেন।

আমার সম্পত্তি হাসান ইবনে আলী পরিচালনা করবে। এটা হতে তার জীবিকার জন্য যথোপযুক্ত অংশ গ্রহণ করবে এবং অবশিষ্টাংশ জাকাত হিসাবে দান করবে। যদি হাসানের মৃত্যু হয় এবং হোসাইন বেঁচে থাকে তবে হোসাইন উহা পরিচালনা করবে। সেও হাসানের মত জীবিকা গ্রহণ করে অবশিষ্টাংশ দান করবে। ফাতিমার দু'পুত্রের দাতব্য সম্পত্তিতে আলীর অন্যান্য পুত্রদেরও সমান অধিকার থাকবে। আল্লাহ্ ও রাসুলের সন্তুষ্টি ও নৈকট্যের জন্য আমি ফাতিমার পুত্রদের পরিচালনার অধিকার দিয়েছি এবং রাসুলের জ্ঞাতিত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেই আমি এটা করেছি।

এ সম্পত্তির পরিচালকের জন্য এটা অবশ্য কর্তব্য যে, সে উহা অবিকল রাখবে এবং এর আয় যেভাবে নির্দেশ দিয়েছি সেভাবে ব্যয় করবে । সে এ গ্রামগুলোর কোন চারাগাছ বিক্রি করতে পারবে না যতক্ষণ তা বৃক্ষে পরিণত না হয়। আমার দাসীদের মধ্যে যদি কারো সন্তান থেকে থাকে অথবা গর্ভবতী থেকে থাকে তবে সে সন্তানের খাতিরে থেকে যাবে এবং সে তার অংশ পাবে। যদি সন্তান মারা যায় এবং সে বেঁচে থাকে তবে সে মুক্ত হয়ে যাবে এবং কোন বন্ধন থাকবে না।

১। মদিনা, ইয়াম্বু ও সুয়েকাতে আমিরুল মোমেনিন বহু কূপ খনন করে পানির ব্যবস্থা দ্বারা বহু পতিত ও অনুর্বর জমি চাষাবাদ করেছিলেন। এ সম্পত্তি তার নিজের। তবুও এটা তিনি মুসলিমদের জন্য ট্রাস্ট করে পরিত্যাগ করলেন (হাদীদ[১৫২] ৫ম খন্ড, পৃঃ ১৪৬)

★★★★★

নির্দেশনামা-২৫

জাকাত ও দান সংগ্রহের জন্য যাকেই নিয়োগ করতেন তাকে আমিরুল মোমেনিন এ নির্দেশ দিতেন

আল্লাহ্কে ভয় করে চলো যিনি এক এবং তাঁর কোন অংশীদার নেই। কোন মুসলিমকে ভয় দেখিয়ো না। কোন মুসলিমের জমি উপেক্ষা করো না যাতে সে অসুখী হয়। তার নিকট হতে তার সম্পত্তিতে আল্লাহ্র অংশের বেশী নিয়ো না। যখন তুমি কোন গোত্রের কাছে যাবে তখন তাদের ঘরে প্রবেশ করার আগে জলাধারের কাছে অবতরণ করো। তৎপর মর্যাদা ও শান্তি সহকারে তাদের মাঝে যেয়ো। তৎপর তাদেরকে সালাম করো এবং

তাদের প্রতি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করতে অবহেলা করো না। তৎপর তাদেরকে বলো "হে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ, আল্লাহ্‌র খলিফা ও রাসুলের ভাইসজেরেন্ট (Vicegerent) আমাকে তোমাদের নিকট প্ররেণ করেছেন তোমাদের নিকট হতে তোমাদের সম্পদে আল্লাহ্‌র অংশ আদায় করতে। তোমাদের সম্পদে তাঁর কোন অংশ আছে কি? যদি থাকে তবে তা তাঁর ভাইসজেরেন্টের নিকট দাও।" যদি তাদের মধ্যে কেউ 'না' বলে তবে দাবীর পুনরাবৃত্তি করো না। যদি কেউ 'হাঁ' বোধক জবাব দেয় তবে তার সঙ্গে যেয়ো কিন্তু তাকে কোন প্রকার ভয় দেখিয়ো না, কোন ধমক দিয়ো না, চাপ দিয়ো না এবং অত্যাচার করো না। সে স্বর্ণ বা রৌপ্য যা দেয় তা গ্রহণ করো। যদি তার গরু বা উট থেকে থাকে তবে তার অনুমতি ছাড়া উহা স্পর্শ করো না; কারণ এ গুলোর বৃহদাংশ তার। সুতরাং যখন তুমি এগুলো দেখবে তখন এমন লোকের মত সেগুলোর কাছে যেয়ো না যার উহার ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। অথবা ভদ্রতার সীমালঙ্ঘন করে উহার কাছে যেয়ো না। কোন পশুকে আতঙ্কিত করো না। কোন লোককে পরিহাস করো না এবং কাউকে দুঃখ দিয়ো না।

সম্পত্তিকে দু'ভাগ করো এবং মালিক যে ভাগ পছন্দ করে তা নিতে দিয়ো। সে যা পছন্দ করে তাতে আপত্তি করো না। তৎপর অবশিষ্ট অর্ধাংশ আবার দু'ভাগ করো এবং যে কোন ভাগ তাকে পছন্দ করে নিতে দিয়ো। তার পছন্দে কোন আপত্তি করো না। এভাবে ভাগ করতে থেকো যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্‌র পাওনা আদায়ের মত অংশ থাকে। যদি সে কোন আপত্তি করে তবে তার মত ব্যক্ত করতে দিয়ো। তৎপর আলাদা করা দু'টি অংশ আবার একত্রিত করে পূর্বের মত ভাগ করতে থেকো যে পর্যন্ত না তার সম্পত্তি হতে আল্লাহ্‌র পাওনা আদায় হয়। বৃদ্ধ, জ্বরাজীর্ণ, অঙ্গহীন বা রুগ্ন পশু গ্রহণ করো না। মুসলিমের সম্পদের প্রতি যে যত্ন নেবে বলে তুমি বিশ্বাস কর তার কাছ ছাড়া অন্য কারো দায়িত্বে পশুগুলো রেখো না। এমন লোকের কাছে রাখবে যে বন্টনের জন্য নেতার কাছে সেগুলো পৌছাবে। হিতাকাঙ্ক্ষী, খোদাভীরু, বিশ্বস্ত ও সতর্ক লোক ছাড়া কারো কাছে এগুলো রেখোনা। যারা মুসলিমের সম্পদ অপব্যয় করে না, দীর্ঘদিন ধরে রাখে না এবং উহা রক্ষণে ক্লান্তি বা শ্রান্তি বোধ করে না তাদের কাছেই রেখো। তৎপর যা সংগ্রহ কর তা আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়ো। আমরা আল্লাহ্‌র নির্দেশানুযায়ী সেগুলোর ব্যবস্থা নেব।

যখন তোমার কোন মনোনীত ব্যক্তি পশুর দায়িত্ব গ্রহণ করে তখন তাকে বলে দিয়ো যেন বাচ্চাগুলোকে মায়ের কাছ থেকে আলাদা না করে এবং সম্পূর্ণ দুধ যেন দোহন করে না নেয়। কারণ এতে বাচ্চাগুলো কষ্ট পাবে। সে যেন পশুগুলোকে বাহন হিসাবে ব্যবহার না করে। এ বিষয়ে সে যেন ন্যায় ভাবে কাজ করে। উটগুলোকে সে যেন বিশ্রাম দেয় এবং যেগুলোর খুর ঘষায় ঘষায় ক্ষয় হয়েছে সেগুলোকে যেন ধীরে ধীরে চালায়। যখন কোন জলাধারের পাশ দিয়ে যাবে তখন উটগুলোকে পানি খেতে দিয়ো এবং ঘাসের জমি বাদ দিয়ে ঘাসবিহীন পথে চলো না। সময়ে সময়ে উটগুলোকে বিশ্রাম নিতে দিয়ো এবং পানি ও ঘাসের কাছে অপেক্ষা করো। এভাবে যখন পশুগুলো আমাদের কাছে পৌছাবে তখন উহারা খোদার ফজলে সুস্থ-সবল ও মোটা-তাজা অবস্থায় পৌছবে। আমরা তখন এগুলোকে আল্লাহ্‌র কিতাব ও রাসুলের সুন্নাহ অনুযায়ী বন্টন করবো। নিশ্চয়ই, এটা তোমার জন্য পরম পুরস্কার ও হেদায়েতের উপায় হবে, ইনশাল্লাহ্।

★★★★★

নির্দেশনামা-২৬

জাকাত ও দান সংগ্রহের জন্য প্রেরিত একজন অফিসারকে এ নির্দেশ দিয়েছিলেন

তোমার গোপন বিষয় ও গোপন আমল যা আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেউ দেখে না এবং যাতে কোন সাক্ষী নেই সে সব বিষয়ে আল্লাহ্‌কে ভয় করো। আল্লাহ্‌র আনুগত্য স্বীকারে তুমি প্রকাশ্যে যা কর গোপনে যেন তার ব্যতিক্রম

না হয়। যার জাহের ও বাতেনে কোন ব্যবধান নেই এবং যার কথায় ও কাজে কোন ব্যবধান নেই তার ইবাদত পবিত্র। জনগণকে অপদস্ত করো না, তাদের সাথে রূঢ় আচরণ করো না এবং সরকারী ক্ষমতার কারণে তাদের কাছ থেকে দূরে সরে থেকো না। তারা ইমানী ভাই এবং কর আদায়ে তাদেরকে সাহায্য করো।

নিশ্চয়ই, আদায়কৃত করে তোমার একটা নির্ধারিত অংশ ও সুপরিজ্ঞাত অধিকার আছে। মনে রেখো, এ করে অন্য অংশীদারও রয়েছে যারা দরিদ্র, দুর্বল ও বুভুক্ষু। আমরা তোমার অধিকার রক্ষা করবো। সুতরাং তুমি তাদের অধিকার রক্ষা করো। যদি তুমি তা না কর তবে শেষ বিচারে তোমার শত্রু সংখ্যা হবে অগণন। সে ব্যক্তি কতই না হতভাগা আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে যার শত্রু অভাবগ্রস্তগণ, দুঃস্থগণ-ভিক্ষুকগণ, ঋণগ্রস্তগণ ও কপর্দকহীন ভ্রমণকারীগণ। যে বিশ্বস্ততাকে হালকাভাবে গ্রহণ করে, বিশ্বাসঘাতী কাজে লিপ্ত হয় এবং নিজকে ও নিজের ইমানকে স্বচ্ছ রাখে না সে ইহকাল ও পরকালের জন্য অপদস্থতা সংগ্রহ করে। নিঃসন্দেহে, মুসলিম উম্মার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা সব চাইতে বড় বিশ্বাসঘাতকতা এবং সব চাইতে বড় প্রবঞ্চনা হলো মুসলিম নেতার সাথে প্রবঞ্চনা করা। বিষয়টি এখানে শেষ করলাম।

★★★★★

নির্দেশনামা-২৭

মুহাম্মদ ইবনে আবি বকরকে মিশরের শাসনকর্তা নিয়োগ করার পর এ নির্দেশ দিয়েছিলেন

জনগণের সাথে বিনম্র ব্যবহার করো, তাদের প্রতি নিজকে কোমল করে রেখো এবং উদার মনে তাদের সাথে সাক্ষাত করো। সকল মানুষের প্রতি সমান ব্যবহার করো। তাতে বড়লোকেরা তোমার কাছ থেকে অবিচার পাওয়ার কথা বলবে না এবং হীনরা তোমার ন্যায় বিচারে হতাশ হবে না। মহিমান্বিত আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তাঁর বান্দাদের প্রতি তোমার ছোট-বড় ও প্রকাশ্য-গোপন সকল কর্মের জন্য তোমাকে প্রশ্ন করবেন। যদি তিনি তোমাকে শাস্তি দেন তবে তা তোমার অত্যাচারী আচরণের জন্য; আর যদি তিনি তোমাকে ক্ষমা করেন তবে তা তাঁর মহান ক্ষমাশীলতার জন্য।

হে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ, তোমরা জেনে রাখো, খোদাভীরুগণ এ ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার অংশ উপভোগ করে, আবার পরকালের হিস্যাও পায়। কারণ তারা মানুষের সাথে জাগতিক বিষয়ে অংশ গ্রহণ করে পক্ষান্তরে মানুষ তাদের সাথে আখিরাতের কাজে অংশগ্রহণ করে না। মানুষ দুনিয়াতে বসবাসকালে আরাম-আয়েশ ও সুস্বাদু খাদ্য খেয়ে কাটিয়ে ঔদ্ধত্য ও ব্যর্থতা সংগ্রহ করে। অপরপক্ষে খোদাভীরুগণ প্রস্থান করবে তাদের ভ্রমণের জন্য পর্যাপ্ত রসদ সংগ্রহ করে এবং লাভজনক লেনদেন সম্পন্ন করে। তারা এ পৃথিবীতে থাকা কালেই দুনিয়া পরিত্যাগের স্বাদ উপভোগ করেছে এবং তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল আসন্ন পরকালে তারা আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী হবে যেখানে তাদের আহ্বান প্রতিহত করা হবে না এবং তাদের আনন্দের হিস্যাও ক্ষুদ্র করা হবে না।

সুতরাং হে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ, মৃত্যুকে ভয় কর এবং মৃত্যুর জন্য যা প্রয়োজন তার সবকিছু প্রস্তুত রেখো। এটা একটা বিরাট ঘটনা ও কান্ড হয়ে আসবে। এটা মঙ্গলজনক হয়ে আসবে যাতে কোন মন্দের লেশ থাকবে না অথবা মন্দ হয়ে আসবে যাতে কোন মঙ্গলের লেশ থাকবে না। যে বেহেশ্‌তে যাবার মত কাজ করে তার চেয়ে বেহেশতের নিকটবর্তী আর কে আছে? আর যে দোযখে যাবার জন্য কাজ করে তার চেয়ে দোযখের নিকটবর্তী আর কে আছে? তোমারা মৃত্যু দ্বারা তাড়িত হবে। যদি তোমরা থাম মৃত্যু তোমাদেরকে ধরে ফেলবে এবং যদি তোমরা দৌড়ে পালাতে চাও তবে মৃত্যু তোমাদেরকে আটক করে ফেলবে। তোমাদের ছায়ার চেয়েও মৃত্যু অধিক

সংলগ্ন। মৃত্যুকে তোমাদের কপালের চুলের সাথে বেঁধে দেয়া হয়েছে। অপরপক্ষে দুনিয়া তোমাদেরকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে রেখেছে। সুতরাং গভীর গহ্বরের অগ্নিকে ভয় কর, যে আগুনের শিখা অতীব মারত্মক এবং যে শাস্তি অতীব পীড়াদায়ক। এটা এমন এক স্থান যেখানে কোন রেহাই দেয়া হয় না। এখানে কোন ডাক বা সহায়তার আবেদন কেউ শুনে না এবং ব্যথার কোন উপশম হয় না। যদি আল্লাহ্কে ভীষণ ভয় করা ও তাঁর প্রতি আশা রাখা তোমার পক্ষে সম্ভব হয় তবে এ উভয়টাই অভ্যাসে পরিণত করো। কারণ প্রত্যেক ব্যক্তিই তার প্রভুর প্রতি ততটুকু আশা পোষণ করে যতটুকু সে তাঁকে ভয় করে। নিশ্চয়ই, সে ব্যক্তি আল্লাহ্র নেয়ামতের বেশী আশা করতে পারে যে আল্লাহ্কে বেশী ভয় করে।

হে মুহাম্মদ ইবনে আবি বকর, জেনে রাখো, আমি তোমাকে মিশরের দায়িত্ব অর্পণ করেছি যা আমার সবচাইতে বড় শক্তি। সুতরাং তুমি তোমার কামনা-বাসনার বিরুদ্ধে কর্তব্যপরায়ণ থেকো এবং এ পৃথিবীতে এক ঘন্টা সময় পেলেও তা তোমার দ্বীনের বর্ম হিসাবে খেদমত করে ব্যয় করো। কখনো অন্যকে খুশী করার জন্য আল্লাহ্কে ক্ষুব্ধ করো না। মনে রেখো, আল্লাহ্ এমন যিনি অন্যের রাজত্ব কেড়ে নিয়ে যেতে পারেন কিন্তু অন্য কেউ তাঁর রাজত্ব কেড়ে নিতে পারে না। নির্ধারিত সময়ে সালাতে প্রবৃত্ত হয়ো। অবসর যাপনের জন্য কখনো নির্ধারিত সময়ের আগে সালাতে প্রবৃত্ত হয়ো না। অথবা ব্যস্ততার কারণে কখনো বিলম্বে সালাত করো না। স্মরণ রেখো, তোমার প্রতিটি আমল তোমার সালাতের ওপর নির্ভর করে।

জনগণকে বুঝাতে চেষ্টা করো যে, হেদায়েতের নেতা আর ধ্বংস প্রাপ্ত নেতা এক সমান হতে পারে না এবং রাসুলের বন্ধু আর রাসুলের শত্রু এক সমান নয়। আল্লাহ্র রাসুল আমার কাছে বলেছিলেন, "আমার লোকদের বিষয়ে আমি মুমিন আর কাফের সম্বন্ধে শঙ্কিত নই। মুমিনগণকে আল্লাহ্ নিজেই রক্ষা করবেন এবং কাফেরগণকে তিনি নিজেই অপদস্থ করবেন। কিন্তু তোমাদের মাঝে যারা অন্তরে মোনাফিক এবং বক্তব্যে বিজ্ঞ ও ধোপাদুরস্ত তাদের নিয়ে আমি শঙ্কিত। তোমারা যা কল্যাণকর হিসাবে ধরে নাও মোনাফিকগণও সে কথা বলে, কিন্তু তোমরা যা পছন্দ কর না তারা (মোনাফিক) তাই করে।

★★★★★

পত্র-২৮

মুয়াবিয়ার পত্রের প্রত্যুত্তর

তোমার পত্র[১] আমার কাছে পৌছেছে। পত্রে তুমি আমাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছো যে, আল্লাহ্ মুহাম্মদকে (সঃ) তাঁর দ্বীনের জন্য মনোনীত করেছিলেন এবং সাহাবা দ্বারা তাঁকে সাহায্য করেছিলেন। আশ্চর্যের বিষয় হলো, তুমি তোমার সম্বন্ধে সব কিছু গোপন করে আমাদের জন্য আল্লাহ্র বিচারের কথা বলতে শুরু করেছো এবং রাসুল সম্পর্কে আমাদেরকে বুঝাতে চেষ্টা করছো। তোমার এ হাস্যস্পদ কথা ঐ লোকটির মত যে হাযারে খেজুর বহন করে আনে অথবা সে লোকটির মত যে ধনুর্বিদ্যায় তার ওস্তাদকে চ্যালেঞ্জ করে।

তুমি মনে কর অমুক অমুক ইসলামে খুবই বিশিষ্ট ব্যক্তি। তুমি এমন বিষয়ে কথা বলছো যা সত্য হলে তাতে তোমার কিছু করণীয় নেই আর মিথ্যা হলে সে ক্রটিতে তোমার কোন ক্ষতি হবে না। কে ভাল, কে মন্দ অথবা কে শাসক, কে শাসিত এসব প্রশ্নে তোমার প্রয়োজন কি? প্রথম মুহাজিরগণের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা এবং তাদের অবস্থান বা পদবী নির্ধারণে সাধারণ ক্ষমার অন্তভুর্ক্ত লোক ও তাদের পুত্রগণের কাজ কি? কি আফসোস, একটি নকল তীর আসল তীরের শব্দ সৃষ্টি করছে এবং যার বিচার হবার কথা সে আজ বিচারকের আসনে বসে আছে। হে লোক, তুমি কেন নিজের পঙ্গুত্ব দেখ না এবং নিজের গণ্ডির মধ্যে থাক না। তুমি কেন নিজের হীনতা ও

ত্রুটি অনুধাবন কর না এবং নিয়তি তোমাকে যেখানে রেখেছে সেখানে থাক না। পরাজিতের পরাজয়ে বা বিজয়ীর বিজয়ে তুমি ধর্তব্য নও।

তুমি বিভ্রান্তিতে ঘুরে বেড়াচ্ছো এবং ন্যায় পথ ছেড়ে পথভ্রষ্টতায় নিপতিত হয়েছো। তুমি কি এটা অনুধান করতে পার না? আমি তোমাকে কোন খরব দিচ্ছি না; আমি শুধু আল্লাহ্‌র রহমত তোমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছি যে, আনসার ও মুহাজেরদের অনেকেই মহিমান্বিত আল্লাহ্‌র রাস্তায় শহীদ হয়েছে এবং তাদের প্রত্যেকেই বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। কিন্তু আমাদের একজন যখন শাহাদত বরণ করেছিল তখন তাকে শহীদদের প্রধান বলে আখ্যায়িত করা হয়েছিল এবং আল্লাহ্‌র রাসুল তার দাফনের সময় সত্তর বার তকবীর (আল্লাহু আকবার) ধ্বনি করে তাকে বিশেষ সম্মানে ভূষিত করেছিলেন। তুমি জানো না যে, আল্লাহ্‌র রাস্তার অনেকেই তাদের হাত হারিয়েছিল এবং তারা সকলেই বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। কিন্তু আমাদের একজন যখন তার হাত হারিয়েছিল তখন তার নাম রাখা হয়েছিল, "বেহেশতের উড়ন্ত ব্যক্তি" এবং "দুই পাখা বিশিষ্ট ব্যক্তি।" আত্ম-প্রশংসা যদি আল্লাহ্ নিষিদ্ধ না করতেন তবে আমি আমাদের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অনেক কিছু লিখতাম যা মুমিনগণের ভালভাবে জানা আছে এবং যা মুমিন শ্রোতাগণ কখনো ভুলে যাবার ইচ্ছা করে না।

যাদের তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট তাদের সঙ্গে কথা না বলাই ভাল। আমরা হলাম সরাসরি আল্লাহ্‌র নেয়ামত ও রহমতের গ্রহীতা। অপরপক্ষে অন্যরা আমাদের কাছে থেকে তা পেয়ে থাকে। তোমাদের চেয়ে আমাদের দীর্ঘদিনের সুপ্রতিষ্ঠিত সম্মান ও সুপরিজ্ঞাত প্রাধান্য সত্ত্বেও আমরা তোমাদের সাথে মেলামেশা ও বিবাহ বন্ধন করা হতে বিরত থাকিনি। আমরা তোমাদেরকে সমান মনে করতাম যদিও বাস্তবে তোমরা তা ছিলে না। আর কি করেই বা তোমরা আমাদের সমান হবে যেখানে আমাদের মাঝে রয়েছে আল্লাহ্‌র রাসুল আর তোমাদের মাঝে তাঁর বিরোধীরা; আমাদের মাঝে আল্লাহ্‌র সিংহ আর তোমাদের মাঝে বিরোধী দলের সিংহ, আমাদের মাঝে বেহেশতের যুবকদের দু'জন মনিব[২] আর তোমাদের মাঝে দোযখের সন্তান ; আমাদের মাঝে জগতের সেরা নারী[৩] আর তোমাদের মাঝে জ্বালানী কাঠ বহনকারিনী; এভাবে আমাদের রয়েছে হাজারো বৈশিষ্ট্য আর তোমাদের রয়েছে অসংখ্য দোষ-ত্রুটি ও হীনতা।

আমাদের ইসলাম সুপরিজ্ঞাত এবং আমাদেরকে প্রাক-ইসলামী কালেও কেউ অস্বীকার করতে পারেনি। যা অবশিষ্ট রয়েছে তা মহিমান্বিত আল্লাহ্‌র কথায় উল্লেখ করা যায় ঃ

> *"আল্লাহ্‌র কিতাব অনুসারে রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়গণ একে অপরের জন্য অধিকতর ঘনিষ্ট" (কুরআন— ৩৩:৬)।*

মহিমান্বিত আল্লাহ্ আরো বলেছেন ঃ

> *"নিশ্চয়ই, মানুষের মধ্যে তারাই ইব্রাহীম ও এ নবীর (মুহাম্মদ) সব চাইতে নিকটবর্তী যারা তাঁকে অনুসরণ করে ও বিশ্বাস করে; এবং নিশয়ই আল্লাহ্ মুমিনগণের অভিভাবক" (কুরআন— ৩ঃ৬৮)।*

এভাবে আমরা জ্ঞাতিত্ব ও আনুগত্য উভয় দিকেই তোমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। সকিফায় (বনু সায়দার) যখন মুহাজিরগণ আল্লাহ্‌র রাসুলের জ্ঞাতিত্বের কথা বলে আনসারদের সাথে প্রতিযোগিতা করে কৃতকার্য হয়েছিল তখন সে অধিকার আমাদের তোমাদের নয়। একথা স্বীকার না করলে আনসারদের বক্তব্য সঠিক বলে প্রতিষ্ঠিত হবে। তুমি মনে কর যে, আমি প্রত্যেক খলিফার প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ ছিলাম এবং তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলাম। তোমার এ ধারণা সঠিক হলেও এটা তোমার বিরুদ্ধে কোন অপরাধ নয় এবং সেহেতু এতে তোমাকে ব্যাখ্যা দেয়ার মত কিছু নেই।

তুমি বলেছো যে, আমাকে উটের মত নাকে দড়ি দিয়ে আবু বকরের নিকট আনুগত্যের শপথ গ্রহণের জন্য টেনে-হেঁচড়ে নিয়ে গেছে। চিরন্তন আল্লাহ্‌র কসম, তুমি এ কথা দ্বারা আমাকে তীব্রভাবে গালাগালি করার ইচ্ছা

পোষণ করেছো। প্রকৃতপক্ষে তোমার একথা দ্বারা আমার প্রশংসা ব্যক্ত করেছো। আমাকে অপদস্থ করতে গিয়ে তুমি নিজেই অপদস্ত হয়েছো। একজন মুসলিম অত্যাচারের শিকার হলে তাতে তার কি কোন অবমাননা হয়?

একজন মুসলিমের পক্ষে দ্বীনে সন্দেহ পোষণ করা বা তার দৃঢ় ইমানে ফাটল ধরা প্রকৃতপক্ষে অবমাননাকর। আমার এ যুক্তি অন্যদের জন্য হলেও তোমার বেলায় প্রযোজ্য বলে ব্যক্ত করলাম।

তৎপর তুমি উসমান ও আমার মর্যাদা সম্পর্কে লিখেছো। এ বিষয়ে তুমি একটা উত্তর পেতে পার; কারণ উসমান তোমার জ্ঞাতি। সুতরাং এখন তুমি আমাকে বল, তোমাদের মধ্যে কে উসমানের প্রতি বেশী শত্রু ভাবাপন্ন ছিল এবং উসমানের হত্যা সংঘটিত করায় কার ভূমিকা বেশী ছিল। অথবা তুমি আমাকে বল, কে তাকে সমর্থন দিতে গেলে অন্যজন তা থামিয়ে দিয়েছে; অথবা কে সে ব্যক্তি যাকে সে সাহায্যের জন্য আহ্বান করেছিল; কিন্তু সে মুখ ফিরিয়ে চলে গেল এবং তার মৃত্যুকে এগিয়ে নিয়ে এসেছিল? না, না; আল্লাহ্‌র কসম ঃ

আল্লাহ্ অবশ্যই জানেন তোমাদের মধ্যে কারা বাধা দেয় এবং তাদের ভ্রাতৃগণকে বলে, 'আমাদের সঙ্গে আসো।' উহারা অল্পই যুদ্ধে অংশ নেয় (কুরআন - ৩৩ঃ ১৮)।

তার বিদা'তের জন্য আমার ওজর দেখিয়ে আমি তাকে তিরস্কার করতে যাচ্ছি না। কারণ তার প্রতি আমার উত্তম পরামর্শ ও হেদায়েত যদি পাপ হয়ে থাকে তবে প্রায়শই যেব্যক্তিকে দোষারোপ করা হয় তার কোন পাপ নেই। প্রবাদে আছে কখনো কখনো উপদেষ্টার একমাত্র পুরস্কার হলো মন্দের সন্দেহ।

আমি সংস্কার ছাড়া কোন কিছুই আশা করিনি যা আমি করতে সমর্থ; এবং আমার হেদায়েত আল্লাহ্ প্রতি আহবান ছাড়া অন্য কিছু নয়; আমি তাঁর উপর নির্ভর করি এবং তাঁর প্রতি আমার প্রত্যাবর্তন (কুরআন—১১ ঃ ৮৮)।

তুমি লিখেছো আমি ও আমার অনুসারীদের জন্য তোমার তরবারি রয়েছে। তোমার এ কথায় ক্রন্দনরত লোকও হাসবে। তুমি কি কখনো দেখেছো আবদাল মুত্তালিবের বংশ কখনো যুদ্ধ হতে পালিয়ে গেছে? অথবা তরবারিকে ভয় পেয়েছে? "হামাল[৪], যুদ্ধে যোগদান করা পর্যন্ত অপেক্ষা কর"। সহসাই তুমি যাকে খুঁজছো (যুদ্ধ) সে তোমাকে খুঁজবে, তুমি যাকে দূরে ভাবছো সে তোমার নিকটে পৌছবে। সহসাই আমি মুহাজির ও আনসার বাহিনী নিয়ে তোমার দিকে দ্রুত এগিয়ে যাব এবং যারা তাদের অনুসরণ করবে তারা সকলেই ধার্মিক। তাদের সংখ্যা হবে বিশাল এবং তাদের পায়ের আঘাতের ধুলি চতুর্দিক অন্ধকার করে দেবে। তারা তাদের কাফন পরিহিত থাকবে এবং তাদের ঐকান্তিক আকাঙ্খা আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাত। তাদের সাথে থাকবে বদরীদের বংশধর এবং তাদের হাতে থাকবে হাশিমীদের তরবারি যে তরবারির কাটা তুমি তোমার ভাই, মামা, দাদা ও জ্ঞাতি-গোষ্ঠির বেলায় নিজেই প্রত্যক্ষ করেছো।

তারা অন্যায়কারীদের থেকে অনেক দূরে নয় (কুরআন—১১ ঃ ৮৩)

১। আবু উমামাহ্ আল বাহিলী ও আবু মুসলিম আল খাওলানীর মাধ্যমে মুয়াবিয়া কুফায় দু'খানা পত্র প্রেরণ করেছিল। সে পত্র দু'টির প্রত্যুত্তরে আমিরুল মোমেনিন উক্ত পত্র লিখেছিলেন। আবু উমামার মাধ্যমে প্রেরিত পত্রে মুয়াবিয়া রাসুলের প্রেরণ ও ধর্ম প্রচার সম্বন্ধে এমনভাবে লিখেছিলো যেন আমিরুল মোমেনিন তা জানতেন না বা বুঝতে পারেননি। সে জন্য তিনি মুয়াবিয়ার কথাকে হাযারে খেজুর আনার সঙ্গে তুলনা করেছেন। এটা একটা আরবী প্রবাদ। হাযার বাহরাইনের নিকটবর্তী একটি শহর। এখানে প্রচুর খেজুর ফলে। সতুরাং এ স্থলে খেজুর নিয়ে আসা বোকামি ছাড়া আর কিছু নয়। রাসুল সম্বন্ধে লিখার পর মুয়াবিয়া তিনজন খলিফার গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে লিখেছিলোঃ

সাহাবাগণের মধ্যে সব চাইতে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ও উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ছিলেন প্রথম খলিফা যিনি মুসলিমগণকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন এবং যারা ইসলাম পরিত্যাগ করে যাচ্ছিল তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। তার পরে দ্বিতীয় খলিফা বিজয়ী হয়ে শহরসমূহের গোড়া পত্তন করেছিলেন এবং

কাফেরদের অবমানিত করেছিলেন। তৎপর তৃতীয় খলিফা এলেন যিনি অত্যাচারের শিকার হলেন। তিনি ধর্মের প্রসার ঘটিয়েছিলেন এবং দুর-দুরান্তে আল্লাহ্‌র বাণী বিস্তার করেছিলেন (মিনকারী[১০], পৃঃ ৮৬- ৮৭; রাব্বিহ[১৮], ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৩৩৪ - ৩৩৫; হাদীদ[৫২], ১৫শ খণ্ড, পৃঃ ১৮৬)।

আমিরুল মোমেনিনকে এসব লিখার পেছনে মুয়াবিয়ার একটা সুদূর প্রসারী ষড়যন্ত্র ছিল। সে ভেবেছিল তার কথায় আমিরুল মোমেনিন মানসিক আঘাত প্রাপ্ত হয়ে পূর্বের খলিফা সমন্ধে কটূক্তি ও অবজ্ঞাকর উক্তি করলে সে তা সিরিয়া ও ইরাকের জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে তাদের ক্ষেপিয়ে তুলবে। বস্তুতঃ সে অনেক আগ থেকেই সিরিয়ার মানুষের কাছে প্রচার করে বেড়াচ্ছিল যে, আমিরুল মোমেনিন মানুষকে উসমানের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছিল, তালহা ও জুবায়রকে হত্যা করিয়েছিল, আয়শাকে তার ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল এবং হাজার হাজার মুসলিমের রক্তপাত ঘটিয়েছিল। আমিরুল মোমেনিন তার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে এমন জবাব দিয়েছিলেন যাতে তার হীনতা, ইসলামের প্রতি শত্রুতা, পরাজিত হয়ে সাধারণ ক্ষমায় ইসলাম গ্রহণ করা, মুহাজিরগণ সর্বতোভাবে তার চেয়ে উন্নত ইত্যাদি ব্যক্ত করেছিলেন। তাতে সে আমিরুল মোমেনিনের লিখা কাউকে দেখাতেও সাহস করেনি।

অতঃপর আমিরুল মোমেনিন হাশিমী বংশের বিশেষ মর্যদার কথা উল্লেখ করে লিখেছিলেন যে, অনেক লোক রাসুলের সঙ্গে জিহাদে অংশ গ্রহণ করে শাহাদত বরন করেছিল। কিন্তু হামজার শাহাদত বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ছিল। রাসুল নিজেই হামজার জন্য শোক প্রকাশ করেছিলেন। এ বিষয়ে অনেক হাদীস বর্ণিত আছে। রাসুল (সঃ) চৌদ্দবার হামজার জানাযা করেছিলেন। তাতে সত্তরবার তকবির (আল্লাহু আকবর) দিয়েছিলেন। রাসুল তাঁকে শহীদগণের প্রধান বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। একইভাবে বিভিন্ন জিহাদে অনেকেরই হাত কাটা গিয়েছিল। উদাহরণ স্বরূপ বদর যুদ্ধে কূবায়েব ইবনে ইসাফ আল আনসারী ও মু'আজ ইবনে জাবাল এবং অহুদ যুদ্ধে আমর ইবনে আল জামুহ আস-সালামী ও উবায়েদ (আতিক) ইবনে তাঈহান তাদের হাত হারিয়েছিল। কিন্তু মুতাহ্ যুদ্ধে জাফর ইবনে আবি তালিব যখন তার হাত হারালো রাসুল তাকে "বেহেশতের উড়ন্ত মানুষ" ও "দু'পাখা বিশিষ্ট" বলে নামকরণ করলেন। অতঃপর আমিরুল মোমেনিন তাঁর নিজের বৈশিষ্ট্যের কথা ব্যক্ত করলেন। এ বিষয়ে অসংখ্য হাদীস রয়েছে। হাদীসবেত্তা আহমদ ইবনে হাম্বল (হিঃ ১৬৪ - ২৪১), আহম্মাদ ইবনে আলী নাসাঈ (হিঃ ২১৫ - ৩০৩) এবং অন্যান্যরা বলেন ঃ

আলী ইবনে আবি তালিবের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বিশ্বস্ত সুত্র হতে যত হাদীস বর্ণিত আছে তার সংখ্যা সকল সাহাবা অপেক্ষা অধিক (নায়সাবুরী[৮], ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১০৭; বার[৯৭], ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১১১৫; হাম্বলী[৬৫], ১ম খণ্ড, পৃ ঃ ৩১৯, আছীর[২] ৩য় খন্ড, পৃঃ ৩৯৯; আসকালানী [২৫], ৭ম খণ্ড, পৃ ঃ ৫৭; আসকালানী[২২], ৭ম খণ্ড, পৃ ঃ ৩৩৯)।

আহলুল বাইতের একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমিরুল মোমেনিন বলেন, "আমরা সরাসির আল্লাহ্‌র আনুকূল্যের গ্রহীতা আর অন্যরা আমাদের কাছ থেকে আনুকূল্য পেয়ে থাকে।" এর চেয়ে বেশী মর্যদাপূর্ণ অবস্থা আর কিছু হতে পারে না। হাদীদ লিখেছেন ঃ

আমিরুল মোমেনিন মূলতঃ যা বুঝাতে চেয়েছেন তা হলো—তাঁরা কোন মানুষের দায়িত্বাধীন নন, কারণ আল্লাহ্ সরাসরি তাঁদের উপর তাঁর রহমত প্রদান করে থাকেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ ও তাঁদের মধ্যে কোন মধ্যস্থতাকারী নেই। অপরপক্ষে অন্য সকল লোক তাঁদের দায়িত্বাধীন এবং তাঁরা হলেন মহিমান্বিত আল্লাহ্ ও মানুষের মধ্যস্থতাকারী। আমিরুল মোমেনিনের উক্তি বাহ্যিকভাবে শাব্দিক অর্থে যা আছে তাই। কিন্তু নিগুঢ় তত্ত্বপূর্ণ অর্থহলো— আহলুল বাইত আল্লাহ্‌র অনুগত বান্দা এবং অন্য সকলকে অবশ্যই তাঁদের অনুগত অনুসারী হতে হবে। (হাদীদ[৫২], ১৫শ খণ্ড, পৃ ঃ ১৯৪)।

কাজেই যারা আল্লাহ্‌র নেয়ামতের প্রথম গ্রহীতা এবং অন্যদের জন্য সে নেয়ামতের উৎস তাদের সঙ্গে অন্য কারো তুলনা হতে পারে না। সামাজিক সংশ্রবের কারণে অন্য কেউ তাদের সমকক্ষ হতে পারে না। সে ক্ষেত্রে যারা সত্য ও ন্যায়ের বিরোধিতা করে তাদের সঙ্গে সমকক্ষতার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। সে কারণে আমিরুল মোমেনিন উভয় দিকের চিত্র মুয়াবিয়ার সামনে তুলে ধরেছেন ঃ

রাসুল আমাদের মধ্য হতে এসেছিলেন আর তোমার পিতা আবু সুফিয়ান ছিল তাঁর বিরুদ্ধবাদীদের নেতা। হামজা ছিলেন আমাদের মধ্য হতে এবং রাসুল তাকে 'আল্লাহ্‌র সিংহ' উপাধিতে ভূষিত

করেছিলেন; আর তোমার নানা উৎবা ইবনে রাবিয়াহ 'আসাদুল আহলাফ' (রাসুলের বিরুদ্ধে মিত্র শক্তির সিংহ) বলে গর্ব করতো।

বদর যুদ্ধে উৎবা যখন হামজার মুখোমুখি হলো তখন হামজা বললেন, "আমি আবদাল মুত্তালিবের পুত্র হামজা। আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের সিংহ।" এতে উৎবা বললো, "আমি আসাদুল আহলাফ (তোমাদের বিরুদ্ধে মিত্র শক্তির সিংহ)"। কোন কোন টীকাকারক লিখেছেন "আসাদুল আহলাফ"- এ কুখ্যাত উপাধি খন্দকের যুদ্ধে আবু সুফিয়ানের ছিল।

২। তৎপর আমিরুল মোমেনিন তাঁদের বৈশিষ্ট্য হিসাবে বললেন যে, বেহেশতের যুবকগণের সর্দার তাঁদের মধ্যেই রয়েছে। অপরপক্ষে দোযখের যুবকগণ মুয়াবিয়াদের বংশোদ্ভূত। এ বিষয়ে রাসুল (সঃ) বলেছেন, "হাসান ও হোসাইন বেহেশতের যুবকগণের নেতা।" অপরপক্ষে উকবাহ্ ইবনে আবি মুইয়াত সম্পর্কে রাসুল (সঃ) বলেছিলেন, "তুমি ও তোমার সন্তানগণের জন্য দোযখ নির্ধারিত।"

৩। অতঃপর আমিরুল মোমেনিন তাঁদের বৈশিষ্ট্য হিসাবে বললেন যে জগতের সকল নারীর নেত্রী (ফাতিমাতুজ্ জোহরা) তাঁদের মধ্যেই রয়েছে। অপরপক্ষে মুয়াবিয়াদের মাঝে রয়েছে জ্বালানী কাষ্ঠ কুড়ানী মহিলা। আমিরুল মোমেনিন, উমর ইবনে খাত্তাব, আবু হুজায়ফা ইবনে ইয়েমেন, সা'দ খুদরী, আবু হুরায়রাহ্ প্রমুখ হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুল (সঃ) বলেছিলেন ঃ

নিশ্চয়ই, ফাতিমা বেহেশতের সকল নারীর নেত্রী এবং হাসান ও হুসাইন বেহেশতের যুবকদের নেতা। কিন্তু তাদের পিতা (আলী) তাদেরও নেতা।
(তিরমিযী[৮০], ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৬৫৬ ও ৬৬১ ; হাম্বল[১৬০], ৩য় খণ্ড, পৃ ঃ ৩, ৬২, ৬৪ ও ৮২ ; ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩৯১ - ৩৯২ ; মাজাহ[১০৫], ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৬; নায়সবুরী[৮৪], ৩য় খণ্ড, পৃ ঃ ১৬৭; শাফী[১২৮], ৯ম খণ্ড, পৃঃ ১৮৩,১৮৪, ২০১; হিন্দি[১৬৭], ১৩শ খণ্ড, পৃঃ ১২৭, ১২৮; বার[৯৭], ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১৮৯৫; আছীর[২], ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৫৭৪ ; বাগদাদী[৯৪], ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৪০; ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ ঃ ৩৭২; ১০ খণ্ড, পৃঃ ২৩০; আসাকীর[২৬], ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৩৬৫)

ইমরান ইবনে হুসাইন ও আবু ছালাবাহ্ আল-খুশনী হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুল (সঃ) ফাতিমাকে বলেছিলেন ঃ

হে আমার প্রাণপ্রিয় কন্যা, তুমি কি এ সংবাদ শুনে খুশী হবে না যে তুমি রমণীকুলের সম্রাজ্ঞী? ফাতিমা বললেন, পিতা, তাহলে ইমরানের কন্যা মরিয়মের কি হবে? রাসুল (সঃ) বললেন, সে তার যুগে শ্রেষ্ঠ রমণী আর তুমি তোমার যুগ হতে অনাদিকাল শ্রেষ্ঠ। নিশ্চয়ই, আল্লাহ্র কসম, আমি ইহজগত ও পরজগতের নেতার সাথে তোমার বিয়ে দিয়েছি। মোনাফিক ছাড়া আর কেউ তার প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ পোষণ করবে না। (ইসফাহানী[৩১], ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩২; বার[৯৭], ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১৮৯৫)।
আয়শা হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুল (সঃ) বলেছেন ঃ হে ফাতিমা, তুমি কি শুনে খুশী হবে না যে, তুমি আমার উম্মতের সকল নারীর শ্রেষ্ঠ, মুমিন নারীগণের নেত্রী এবং জগতের সকল নারীর শ্রেষ্ঠ? (বুখারী[১০২], ৮ম খণ্ড, পৃ ঃ ৭৯; নায়সাবুরী[৮৩], ৭ম খণ্ড, পৃঃ ১৪২-১৪৪; মাজাহ[১০৫], ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫১৮; হাম্বল[১৬০], ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২৮২, নায়সাবুরী[৮৪], ৩য় খণ্ড, পৃ ঃ ১৫৬)।

অপরপক্ষে মুয়াবিয়ার বংশে ছিল হীনা ও দুশ্চরিত্রা রমণী। এমন কি জ্বালানী কাঠ কুড়ানী রমণীও ছিল যেমন, উম্মে জামিলা যার কথা কুরআনেও অভিসম্পাত হিসাবে এসেছে (কুরআন—১১১ ঃ ৪; নায়সাবুরী[৮৪], ৩য় খন্ড, পৃঃ ১০৭; বার[৯৭], ৩য় খন্ড, পৃঃ ১১১৫; হাম্বলী[১৬৫], ১ম খন্ড, পৃঃ ৩১৯; আছীর[২], ৩য় খন্ড, পৃঃ ৩৯৯; আসকালানী[২৫], ৭ম খন্ড, পৃঃ ৩৩৯; আসকালানী[২২], ৭ খন্ড, পৃঃ ৫৭)।

৪। এটা একটা আরবী প্রবাদ বাক্য। এর কাহিনী হলো— মালিক ইবনে জুহায়েরকে হামাল ইবনে বদর যুদ্ধক্ষেত্রে একথা বলে ধমকিয়ে আক্রমণ করে হত্যা করেছিল। মূল ছন্দটা ছিল, 'হামাল যুদ্ধক্ষেত্রে পৌছা পর্যন্ত একটু অপেক্ষা কর, তবেই দেখতে পাবে মৃত্যু কত সহজ।"

★★★★★

পত্র-২৯

বসবার জনগণের প্রতি

তোমাদের মধ্যে যে অনৈক্য ও বিচ্ছিন্নতা রয়েছে তা তোমাদের কাছে গোপন নয়। তোমাদের মধ্যকার অন্যায়কারীগণকে আমি ক্ষমা করে দিয়েছি এবং যারা পলায়ন করেছিল তাদের ওপর হতে আমার তরবারি সম্বরণ করে রেখেছিলাম। তোমাদের মধ্য হতে যারা আমার কাছে এসেছিল তাদের প্রত্যেককে আমি গ্রহণ করেছিলাম। যদি তোমাদের বিভ্রান্তি ও মূর্খতাপূর্ণ খেয়াল আর বিধ্বস্তকারী বিষয়াদির ফলে তোমরা আমার প্রতি অঙ্গিকার ভঙ্গ কর এবং আমার বিরোধিতা কর তবে শুনে রাখো, আমি আমার অশ্বকে প্রস্তুত রেখেছি এবং আমার উটগুলো জিন্ পরানো অবস্থায় আছে। যদি তোমাদের দিকে ধাবিত হতে আমাকে বাধ্য কর তা হলে এমনভাবে আমি আসব যাতে জামালের যুদ্ধকে তোমরা অতিক্ষুদ্র খণ্ড যুদ্ধ মনে করবে। তোমাদের যারা আমার অনুগত তাদের উচ্চ মর্যাদা সম্বন্ধে আমি জানি। কাজেই অকৃত্রিমদের সাথে অপরাধীর এবং বিশ্বাসীর সাথে অঙ্গীকার ভঙ্গকারীর অধিকার এক হতে পারে না।

★★★★★

পত্র-৩০

মুয়াবিয়ার প্রতি

তুমি ঐশ্বর্যের যে পাহাড় গড়ে তুলেছো সেজন্য আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং সে ঐশ্বর্যে তোমার প্রকৃত অধিকার কতটুকু তা নির্ধারণ কর। সেসব বিষয়ের প্রতি মনোযোগী হয়ে বুঝতে চেষ্টা কর যেসব বিষয়ে অজ্ঞতার ওজর দেখিয়ে পার পেতে পারবে না। নিশ্চয়ই, আনুগত্যের পথ অনুসরণের জন্য সুস্পষ্ট নিদর্শন রয়েছে, উজ্জ্বল পথ রয়েছে, সোজা রাস্তা রয়েছে এবং রয়েছে নির্দিষ্ট লক্ষ্য। বিচক্ষণগণ আনুগত্যের দিকে এগিয়ে যায় আর হীনমন্যগণ সে দিক হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়। যে কেউ মুখ ফিরিয়ে নেয় সে ন্যায় থেকে সরে গিয়ে বিভ্রান্তিতে নিপতিত হয়। তার ওপর থেকে আল্লাহ্ তাঁর রহমত তুলে নিয়ে যান এবং আল্লাহ্‌র শাস্তি তাকে ঘিরে ধরে। সুতরাং তোমার নিজের জন্য সাবধান হও। আল্লাহ্ তোমাকে তোমার পথ ও তোমার কর্মকাণ্ডের প্রান্তিক সীমা দেখিয়ে দিয়েছেন। তুমি অতি দ্রুত বেগে ক্ষতি ও বেঈমানীর অবস্থার দিকে ধাবিত হচ্ছো। তোমার অহমবোধ তোমাকে পাপের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। এতে তুমি পথভ্রষ্টতায় নিপতিত হচ্ছো, ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছো এবং সত্য পথে যেতে বাধার সম্মুখীন হচ্ছো।

★★★★★

পত্র-৩১

সিফফিন হতে ফেরার পথে হাযিরিন নামক স্থানে ক্যাম্প করার পর হাসান ইবনে আলীর[১] উদ্দেশ্যে লিখেছিলেন

এ পত্র এমন পিতা হতে যিনি সহসাই মৃত্যুবরণ করবেন, যিনি সময়ের কষ্টের সারবত্তা স্বীকার করেন, যিনি জীবন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন, যিনি সময়ের দুর্দশার কাছে নিজেকে সমর্পণ করেছেন, যিনি দুনিয়ার পাপরাশিকে অনুধ্যান করতে পারেন, যিনি মৃতের আবাসস্থলে বাস করছেন এবং যিনি যেকোন দিন পৃথিবী হতে প্রস্থানের অপেক্ষায় আছেন।

এমন পুত্রের প্রতি যিনি যা অর্জিত হয়নি তা পাবার আকুল আকাঙ্খা করে, যিনি পদচারণা করছেন তাদের পথে যারা মরে গেছে, যিনি যন্ত্রণার শিকার, যিনি সময়ের উদ্বিগ্নতার সাথে সম্পৃক্ত, যিনি দুর্দশার লক্ষ্য, যিনি দুনিয়ার বঞ্চনার শিকার, যিনি নৈতিকতার কাছে বন্দি, যিনি শোক ও কষ্টের আত্মীয় এবং মৃতদের উত্তরসূরী।

এ দুনিয়াকে আমা হতে ফিরিয়ে দিয়ে আমি যা শিখতে পেরেছি এখন তুমি তা জেনে রাখো। আমার ওপর সময়ের আক্রমণ ও আমার প্রতি পরকালের আগমনই আমার নিজকে ছাড়া অন্য কাউকে স্মরণ করা বা অন্য কিছু চিন্তা না করার জন্য যথেষ্ট। কিন্তু যখন অন্যদের কথা ত্যাগ করে আমার নিজের উদ্বিগ্নতার মধ্যে ডুবে যাই তখন আমার জ্ঞান-বুদ্ধি আমাকে আমার কামনা-বাসনা হতে রক্ষা করে। আমার বিবেক আমার কর্মকাণ্ডের ব্যাখ্যা করে এবং আমাকে দৃঢ়তার দিকে পরিচালিত করে যাতে কোন চাতুরি ও মিথ্যা দ্বারা কলুষিত হবার কিছু নেই। এখানে আমি তোমাকে আমার অংশ হিসাবে দেখেছিলাম। কিন্তু অন্য বিষয়ে তোমাকে আমার সম্পূর্ণ হিসাবে দেখেছিলাম। তাতে তোমার ওপর কিছু আপতিত হলে মনে হতো যেন আমার ওপর আপতিত হয়েছে এবং যদি তোমার কাছে মৃত্যু আসে তবে মনে হতো যেন আমার কাছে এসেছে। ফলে তোমার কর্মকান্ড আমার বলে মনে হতো যেমন করে আমার বিষয়াবলী আমার বলে মনে হতো। সুতরাং আমি তোমাকে এ লেখাটা দিয়েছি যাতে তুমি এতে সাহায্য পেতে পার, আমি বেঁচে থাকি আর না থাকি।

আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি আল্লাহ্কে ভয় করতে, হে আমার পুত্র, তাঁর আদেশ মেনে চলতে, তাঁর জেকেরে তোমার হৃদয় পূর্ণ করে রাখতে এবং তাঁর আশায় লেগে থাকতে। কোন কিছুর সাথে সম্পর্ক এত বিশ্বস্ত নয় যা আল্লাহ্ ও তোমার মধ্যকার সম্পর্কের বেলায়, যদি তুমি তা ধরে রাখ। উপদেশ দ্বারা হৃদয়কে প্রাণচঞ্চল কর, আত্মোৎসর্গ দ্বারা এটাকে হত্যা কর, দৃঢ় ইমান দ্বারা এটার শক্তি যোগাও, প্রজ্ঞার দ্বারা এটাকে ঔজ্জ্বল্য দান কর, নৈতিকতার প্রতি এটাকে বিশ্বাসী কর, মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে এটাকে অবদমিত কর, দুনিয়ার দুর্ভাগ্য এটাকে দেখিয়ে দাও, কালের কর্তৃত্বে দিবা ও রাত্রির পরিবর্তন দিখিয়ে এটাকে ভীত কর, অতীত লোকদের ঘটনাবলী স্মরণ করিয়ে এটাকে ভীত কর। অতীত লোকদের শহরে ভ্রমণ কর এবং লক্ষ্য কর তারা কি করেছিল, কি রেখে চলে গিয়েছে, কোথায় তারা গেছে এবং কোথায় তারা আছে। তুমি দেখবে তারা বন্ধু-বান্ধব সব রেখে একাকীত্বে চলে গেছে। সহসাই তুমিও তাদের মত চলে যাবে। সুতরাং তোমার থাকার স্থানের পরিকল্পনা কর এবং দুনিয়ার কাছে পরকালের জিন্দেগীকে বিক্রি করো না।

যা তুমি জান না সে বিষয়ে আলোচনা পরিহার করো এবং যে বিষয়ে তুমি সম্পৃক্ত নও সে বিষয়ে কথা বলো না। যে পথে গেলে পথভ্রষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকে তা হতে দূরে থেকো। কারণ যে পথে ভয় থাকে সে পথে না চলাই উত্তম। কল্যাণকর কাজ করতে অন্যদেরকে বলো। তাতে তুমি সুলোকদের মাঝে থাকতে পারবে। তোমার কর্মে ও বক্তব্যে পাপ হতে অন্যদের বিরত রেখো। যারা পাপ করে তাদের থেকে দূরে থাকার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করো। আল্লাহ্র জন্য সংগ্রাম করো। যেহেতু এটা তাঁর প্রাপ্য। যারা গালাগালি করে তাদের গালি যেন তোমাকে আল্লাহ্র ব্যাপারে নিবৃত্ত না করে। যে কোন বিপদই হোক না কেন ন্যায়ের খাতিরে ঝাঁপিয়ে পড়ো, অন্তর্দৃষ্টি দ্বীনের বিধানের মধ্যে আবদ্ধ রেখো। কষ্ট সহ্য করার অভ্যাস করো কারণ ন্যায়ের ব্যাপারে ধৈর্য্য চরিত্রের একটি উত্তম বৈশিষ্ট্য। তোমার সকল কাজে নিজকে আল্লাহ্র উপর সোপর্দ করো; কারণ এতে তুমি এক শক্তিশালী রক্ষাকর্তা ও নিরাপদ আশ্রয় পাবে। শুধুমাত্র তোমার প্রভুর কাছে যাচনা করো; কারণ দেয়া না দেয়া শুধুমাত্র তাঁরই হাতে। আল্লাহ্র কাছে যত পার মঙ্গল প্রার্থনা করো। আমার উপদেশ বুঝতে চেষ্টা করো এবং এর প্রতি অমনোযোগী হয়ো না; কারণ সর্বোত্তম বাণী উহা যা হতে উপকার পাওয়া যায়। মনে রেখো, যে জ্ঞান কোন উপকারে আসে না তাতে কোন কল্যাণ নেই এবং জ্ঞান উপাকারে না আসলে তা অর্জনের কোন যৌক্তিকতা নেই।

হে আমার পুত্র, যখন আমি লক্ষ্য করলাম যে, আমি যথেষ্ট বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েছি এবং ক্রমেই আমি দুর্বল হয়ে পড়ছি তখনই আমি তাড়াতাড়ি করে তোমার জন্য আমার উইল করা মনস্থ করে উহার বিশিষ্ট পয়েন্টগুলো

লিখলাম পাছে আমি যা তোমার কাছে প্রকাশ করতে চাই তার পূর্বেই অতর্কিতে মৃত্যু আমাকে পাকড়াও করে অথবা আমার দেহের মত বুদ্ধিমত্তাও দুর্বল হয়ে পড়ে অথবা তোমার আবেগ অথবা দুনিয়ার ফেতনা তোমাকে অদম্য উট-শাবকের মত করে তোলে। নিশ্চয়ই, একজন যুবকের হৃদয় অকর্ষিত ভূমির মত। এতে যে কোন বীজ বপন করা যায়। সুতরাং আমি তোমার মনকে ঢেলে-ছেঁচে যথাযথভাবে তৈরী করার জন্য তড়িঘড়ি করে লিখলাম যাতে তোমার হৃদয় অনমনীয় হবার আগে এবং তোমার মন অন্য কিছুতে পূর্ণ হবার আগে তুমি তোমার জ্ঞান-বুদ্ধির মাধ্যমে অন্যদের অভিজ্ঞতার ফসল আয়ত্ত করতে পার এবং এসব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে নিজের কর্মপন্থা নির্ধারণ করতে পার। এতে তুমি অভিজ্ঞতার অনুসন্ধানের কষ্ট ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিপদ এড়িয়ে যেতে পারবে। এভাবে আমরা যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছি তা তুমি জানতে পারছো। এমনকি আমরা যে সব জিনিস হারিয়ে ফেলেছি তাও তোমার কাছে স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

হে আমার পুত্র, যদিও আমি আমার পূর্ববর্তীগণের বয়সে এখনো উপনীত হইনি তবুও আমি তাদেরকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছি এবং তাদের জীবনের ঘটনা প্রবাহের ওপর গভীর চিন্তা করেছি। আমি তাদের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে ভ্রমণ করেছি। বস্তুতঃ তাদের যেসব কর্মকাণ্ড আমি জ্ঞাত হয়েছি তাতে মনে হলো যেন আমি প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত তাদের সাথে ছিলাম। সে জন্যই আমি অপবিত্রতা হতে পবিত্রতা এবং ক্ষতি হতে উপকার আলাদা করতে সমর্থ হয়েছি। সেসব বিষয়ের সর্বোত্তম অংশ তোমার জন্য বেছে নিয়েছি এবং তাদের উত্তম পয়েন্টগুলো তোমার জন্য সংগ্রহ করেছি এবং তাদের অপ্রয়োজনীয় অংশটুকু বাদ দিয়ে দিয়েছি। একজন জীবিত পিতা যতটুকু করা দরকার আমি তোমার কর্মকাণ্ডের জন্য ততটুকু চিন্তা করি এবং তোমাকে প্রশিক্ষণ দেয়াই আমার লক্ষ্য। আমি মনে করি এটাই যথার্থ সময় যেহেতু তুমি বয়ঃপ্রাপ্ত হতে যাচ্ছো এবং এ দুনিয়ার মধ্যে নতুন। অপরদিকে তোমার নিয়্যত ন্যায়পরায়ণ ও তোমার হৃদয় স্বচ্ছ। কাজেই আল্লাহ্‌র কিতাব হতে তোমার শিক্ষা শুরু করা দরকার। তিনি সর্বশক্তির আধার ও মহামহিম। তাঁর কিতাবের ব্যাখ্যা, এর আদেশ-নিষেধ, হালাল-হারাম এবং ইসলামের বিধি-বিধানের বাইরে আমি যাব না। তৎপরও আমার ভয় হয় অন্য লোকেরা যেভাবে তাদের কামনা-বাসনা ও ভিন্ন মতের কারণে বিভ্রান্ত হয়েছে তুমিও তেমনটি হও কিনা। সুতরাং তোমাকে সতর্ক করা আমার অপছন্দীয় হলেও আমার এ অবস্থানকে শক্ত করা আমি ভাল মনে করি। কারণ আমার দৃষ্টিতে যে অবস্থা তোমার ধ্বংস হতে নিরাপদ নয় সে অবস্থার দিকে তোমাকে যেতে দিতে পারি না। আমি আশা করি সরল-সঠিক পথে চলতে আল্লাহ্‌ তোমাকে সাহায্য করবেন এবং তোমার স্থির সংকল্পে তিনি তোমাকে পথ-প্রদর্শন করবেন। ফলে আমার এ উইল তোমার জন্য লিখলাম।

বৎস, জেনে রাখো, আমার এ উইল থেকে যা তুমি গ্রহণ করলে। আমি সব চাইতে খুশী হবো তা হলো আল্লাহ্‌কে ভয় করা, আল্লাহ্‌ তোমার উপর যা অত্যাবশ্যকীয় করেছেন তাতে নিজকে আবদ্ধ রাখা এবং তোমার পূর্ব-পুরুষগণের আমল অনুসরণ করা ও তোমার আহলুল বাইতের আমলে প্রতিষ্ঠিত থাকা। কারণ তারা কখনো তাদের পথে বিভ্রান্ত হয়নি এবং তাদের কর্মকাণ্ড সঠিক ও আলোকপূর্ণ ছিল। তাদের চিন্তা শক্তি দায়িত্ব পালনের দিকে তাদেরকে পরিচালিত করেছে এবং যা তাদের জন্য করণীয় ছিল না তা হতে তাদেরকে বিরত রেখেছে। জ্ঞানার্জন ছাড়া যদি তোমার হৃদয় এটা গ্রহণ করতে না চায় তবে তোমার প্রথম অনুসন্ধান বোধগম্যতা ও শিক্ষার মাঝে হতে হবে— সংশয়ে পতিত হয়ে বা ঝগড়ায় জড়িয়ে হবে না। এ অনুসন্ধান চালাবার পূর্বে আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা করো এবং অনুসন্ধানের উপযুক্ততা অর্জনের জন্য তাঁর কাছে নিজকে সমর্পণ করো এবং সেসব বিষয় হতে নিজকে সম্পূর্ণ দূরে সরিয়ে নিতে হবে যা তোমাকে সন্দেহ ও বিভ্রান্তিতে নিক্ষেপ করে। যখন তুমি নিশ্চিত হবে যে, তোমার হৃদয় স্বচ্ছ ও বিনয়ী হয়েছে এবং তোমার চিন্তা শক্তি একটি বিষয়ের এক বিন্দুতে (আহলুল বাইত) স্থির হয়েছে তখন আমি যা ব্যাখ্যা করেছি তুমি তা দেখতে পাবে। কিন্তু সে সন্দর্শনের শান্তি যদি তুমি লাভ

করতে সমর্থ না হও তবে জেনে রাখো, তুমি শুধু অন্ধ উষ্ট্রীর মত মাটিতে পদাঘাত করছো এবং অন্ধকারে নিপতিত হচ্ছো অথচ একজন দ্বীনের অনুসন্ধানকারী অন্ধকারে নিপতিত হয় না বা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে না। এমন হলে এ পথ পরিহার করাই উত্তম।

বৎস, আমার উপদেশ মেনে চলো এবং মনে রেখো যিনি মৃত্যুর প্রভু তিনি জীবনেরও প্রভু এবং স্রষ্টা মৃত্যুর কারণও ঘটান। যিনি জীবন ধ্বংসকারী তিনিই আবার জীবন সংরক্ষণকারী এবং যিনি রোগে নিপতিত করেন তিনি আরোগ্য দানকারী। এ পৃথিবী সে পথেই চলছে যেভাবে আল্লাহ্ তৈরী করছেন। এতে তিনি আনন্দ, বিচার, শেষ বিচারের পুরস্কার ইত্যাদি তাঁর ইচ্ছানুযায়ী দিয়েছেন এবং তুমি তা জান না। যদি তুমি এ উপদেশের কোন কিছু বুঝতে না পার তবে মনে করো এটা তোমার অজ্ঞতার কারণে হচ্ছে। কারণ যখন তুমি জন্মগ্রহণ করেছিলে তখন তুমি অজ্ঞ ছিলে। তৎপর তুমি জ্ঞান লাভ করেছিলে। এমন অনেক বিষয় আছে যে বিষয়ে তুমি অনবহিত এবং এসবে তোমার দৃষ্টি বিস্মিত হয়ে যায় এবং তোমার চক্ষু বিচলিত হয়ে যায়। তৎপর তুমি তা দেখ। সুতরাং তার প্রতি ঝুঁকে থাক যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, তোমাকে আহার দিচ্ছেন এবং তোমাকে সুস্থ রেখেছেন। তোমার ইবাদত তাঁরই জন্য হবে, তোমার একাগ্রতা তাঁর প্রতি থাকবে এবং তাঁকেই ভয় করবে। বৎস, জেনে রাখো, রাসুল (সঃ) যে ভাবে মহিমান্বিত আল্লাহ্র বাণী গ্রহণ করেছিলেন সেভাবে আর কেউ পায়নি। সুতরাং তোমার মুক্তির জন্য তাঁকেই নেতা ও অগ্রণী হিসাবে মনে রেখো। নিশ্চয়ই, তোমাকে উপদেশ দিতে আমি আমার চেষ্টার ত্রুটি করবো না এবং নিশ্চয়ই তুমি চেষ্টা করেও সে অন্তর্দৃষ্টি তোমার কল্যাণের জন্য লাভ করতে পারবে না যা আমি তোমাকে দিতে পারবো।

বৎস, জেনে রাখো, তোমার প্রভুর কোন অংশীদার নেই। যদি থাকতো তবে তার নবীও তোমার কাছে আসতো এবং সে ক্ষেত্রে তুমি তার কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা, কাজ ও গুণাবলী জানতে পারতে। কিন্তু তিনি এক মাবুদ যেহেতু তিনি নিজেই তাঁর বর্ণনা করেছেন। তাঁর কর্তৃত্বে কেউ আপত্তি উত্থাপন করার নেই। তিনি অনাদি অতীত হতে অনন্ত ভবিষ্যতে আছেন। তিনি সকল কিছুর পূর্বে আছেন এবং তাঁর কোন প্রারম্ভ নেই। তিনি সব কিছুর পরেও থাকবেন, তাঁর কোন শেষ নেই। তিনি এত মহৎ যে চোখ আর হৃদয়ের সীমায় তাঁর মহত্ব প্রমাণ করা যায় না। যদি তুমি এটা বুঝে থাক তবে তোমার উচিত হবে সে লোকের মত আমল করা যে হীন অবস্থা, কতৃত্বহীনতা, অক্ষমতা ও আনুগত্যের জন্য এবং তাঁর শাস্তির ভয়ে, তাঁর রোষের আশঙ্কায় সন্ত্রস্ত থাকে। তিনি তোমাকে ধার্মিকতা ছাড়া অন্য কিছুর আদেশ দেবেন না এবং পাপ ছাড়া অন্য কিছুতে বারণ করবেন না।

বৎস, আমি তোমাকে এ দুনিয়ার অবস্থা, এর ধ্বংস এবং এর বিদায় সম্বন্ধে অবহিত করেছি। পরকালেও দুনিয়ার মানুষের জন্য কি ব্যবস্থা রাখা হয়েছে আমি তোমাকে তাও অবহিত করেছি। আমি তোমার কাছে এর নীতি-গর্ভ রূপক কাহিনী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করেছি যাতে তুমি উহা হতে উপদেশ গ্রহণ করতে পার এবং সেমত আমল করতে পার। যারা দুনিয়াকে বুঝতে পেরেছে তাদের উদাহরণ হলো সে সব পর্যটকের মত যারা খরাপীড়িত স্থান থেকে শস্য-শ্যামল ও ফল-ফলাদিপূর্ণ স্থানে যাত্রা করে। তৎপর তারা তাদের কাঙ্খিত শস্যপূর্ণ স্থানে পৌছার ও থাকার জন্য পথের কষ্ট সহ্য করে, বন্ধু-বান্ধবের বিচ্ছেদ বেদনা সহ্য করে, ভ্রমণের কষ্ট ও অন্নকষ্ট সহ্য করে। ফলতঃ এসবে তারা কোন বেদনা অনুভব করে না এবং এতে কোন ব্যয়কে অপচয় মনে করে না। তাদের কাছে সে জিনিস ছাড়া অধিক প্রিয় কিছু নেই যা তাদেরকে তাদের লক্ষ্যের কাছে নিয়ে যায় এবং তাদের আবাস স্থানের কাছে নিয়ে যায়। অপরপক্ষে যারা এ দুনিয়া দ্বারা প্রতারিত হয় তাদের উদহারণ হলো সে সব লোকের মত যারা শস্যপূর্ণ স্থান থেকে বিরক্ত হয়ে খরাপীড়িত এলাকায় চলে গেছে। ফলে তাদের কাছে সে স্থান ত্যাগ করা অপেক্ষা বিস্বাদের আর কিছু নেই যেখানে তাদের যেতেই হবে।

বৎস, অন্য লোক ও তোমার মাঝে নিজেকেই আচরণের মাপ কাঠি নির্ধারণ করো। এভাবে তুমি নিজের জন্য যা আশা কর অন্যের জন্যেও তা আশা করো এবং নিজের জন্য যা ঘৃণা কর অন্যের জন্যও তা ঘৃণা করো।

কখনো অত্যাচার করো না যেহেতু তুমি কখনো অত্যাচারিত হতে চাও না। অন্যের কল্যাণ করো যেহেতু তুমি অন্যের থেকে কল্যাণ পেতে চাও। তোমার নিজের জন্য যা মন্দ মনে কর অন্যের জন্য তা মন্দ মনে করো। অন্যদের কাছ থেকে সে রকম ব্যবহার গ্রহণ করো তোমার কাছ থেকে তারা যে রকম ব্যবহার গ্রহণ করে। যা তুমি জান না সে বিষয়ে কথা বলো না, এমন কি যা তুমি অল্প জান সে বিষয়েও না। তোমার নিকট যা বলা তুমি পছন্দ কর না সে রকম কথা অন্যদেরও তুমি বলো না। মনে রেখো, আত্ম-প্রশংসা শোভনতার বিপরীত এবং মনের জন্য একটা দুযোর্গ। সুতরাং তোমার সংগ্রাম বৃদ্ধি কর এবং অন্যের উত্তরাধিকারাধীন সম্পদের ট্রেজারার হয়ো না। যখন তুমি ন্যায় পথে পরিচালিত হবে তখন যতটুকু পার আল্লাহ্‌র কাছে আনত হয়ো। মনে রেখো, তোমার সম্মুখে অনেক দূরত্বের ও কষ্টের রাস্তা রয়ে গেছে এবং সে রাস্তা তুমি এড়িয়ে যেতে পারবে না। তোমর বোঝা হালকা করে সে রাস্তার রসদ নিয়ে যাও। তোমর ক্ষমতার বেশী বোঝা পিঠে নিয়ো না। তাতে ওজন তোমার জন্য ফেতনা হয়ে দাঁড়াবে। যখন কোন অভাবী লোকের দেখা পাবে তখনই সুযোগ হাত ছাড়া না করে তাকে তোমার বোঝা বহন করতে দিয়ো এবং বিচার দিনে অবশ্যই তুমি তা ফেরত পাবে। সে রসদ তুমি তোমার সাধ্য মত রেখে দিয়ো কারণ পরে তা তোমার প্রয়োজন হবে। যদি কোন লোক তোমার কাছ থেকে কর্জ করতে ইচ্ছা করে এবং তোমার প্রয়োজনে ফেরত দিতে রাজী হয় তবে এ সুযোগ হাত ছাড়া করো না।

বৎস, জেনে রাখো, তোমার সামনে একটি দূরাতিক্রম্য উপত্যকা রয়েছে। এতে ভারী বোঝা সম্পন্ন লোক অপেক্ষা হালকা বোঝা সম্পন্ন লোক অপেক্ষাকৃত ভাল অবস্থায় থাকবে। দ্রুতগামীদের চেয়ে ধীরগামীগণ খারাপ অবস্থায় পড়বে। এ পথে তোমার প্রান্তিক স্থান হলো বেহেশত না হয় দোযখ। সুতরাং বসে পড়ার আগে পরীক্ষা দাও এবং নেমে যাবার আগে স্থান তৈরী কর। কারণ মৃত্যুর পর কোন প্রকার প্রস্তুতি নিতে পারবে না এবং এ দুনিয়ায় ফিরেও আসতে পারবে না। মনে রেখো, যিনি স্বর্গ-মর্ত্যের সমুদয় সম্পদের মালিক তিনি তোমাকে তাঁর কাছে প্রার্থনা করার অনুমতি দিয়েছেন এবং তোমার প্রার্থনা কবুল করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তিনি তোমাকে আদেশ দিয়েছেন তাঁর কাছে যাচনা করতে যাতে তিনি তোমাকে দিতে পারেন এবং তাঁর দয়া ভিক্ষা করতে যাতে তিনি তোমার ওপর তার রহমত বর্ষণ করতে পারেন। তোমার আর তাঁর মধ্যে তিনি কোন কিছু রাখেননি যাতে তাঁর ও তোমার মধ্যে পর্দা হতে পারে। তোমার ও তাঁর মধ্যে কোন মধ্যস্থতাকারীর প্রয়োজন তিনি রাখেননি এবং যদি তুমি ভুল কর তিনি তওবা করতে তোমাকে বারণ করেননি। তিনি শাস্তি প্রদানে তাড়াহুড়া করেন না। তিনি তওবা করার জন্য বিদ্রূপ করেন না এবং যখন হুতমান করা যথার্থ হয়ে পড়ে তখন তা না করে ছাড়েন না। তওবা কবুল করতে কখনো তিনি কঠোরতা অবলম্বন করেন না। তোমার পাপ সম্পর্কে কখনো কঠোরভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করেন না। তাঁর দয়া হতে তিনি কখনো নিরাশ করেন না। বরং পাপ হতে বিরত থাকাকে তিনি পূণ্য হিসাবে গ্রহণ করেন। তোমার একটি পাপকে একটি হিসাব করেন; অপরপক্ষে একটি পূণ্যকে দশটি হিসাবে গণনা করেন। তিনি তোমার জন্য তওবার দরজা খোলা রেখেছেন। কাজেই যখনই তুমি তাঁকে ডাক তিনি তোমার ডাক শুনতে পান এবং যা তুমি ফিসফিস করে বলো তিনি তাও শুনতে পান। তুমি তাঁর সন্মুখে তোমার অভাব উপস্থাপন কর, নিজকে তাঁর সম্মুখে উম্মোচিত কর, তোমার দুঃখের বিষয়ে অভিযোগ কর, তোমার কষ্ট দূরীভূত করার জন্য বিনীত প্রার্থনা কর, তোমার কাজে তাঁর সাহায্য যাচনা কর এবং তাঁর রহমতের ভাণ্ডার হতে পাওয়ার প্রার্থনা কর, যেমন-দীর্ঘায়ু, সুস্বাস্থ্য ও রেজেক বৃদ্ধি। তৎপর তিনি তাঁর ভাণ্ডারের চাবি তোমার হাতে দেবেন অর্থাৎ তাঁর কাছে যাচনা করার পথ তোমাকে প্রদর্শন করবেন। সুতরাং যেখানে ইচ্ছা, সালাতের দ্বারা তাঁর আনুকূল্যের দরজা খোল এবং তাঁর রহমতের বারিধারা তোমার উপর পতিত হতে দাও। তোমার প্রার্থনা মঞ্জুর হতে বিলম্ব হলে হতাশ হয়ো না। কারণ প্রার্থনার মঞ্জুরী তোমার নিয়্যতের মাপকাঠিতে হয়। কখনো কখনো প্রার্থনা বিলম্বে মঞ্জুর হয়। এটা যাচনাকারীর অধিক পুরস্কার ও উন্নত দানের উদ্দেশ্যেই হয়ে থাকে। কখনো তুমি হয়ত একটা জিনিস যাচনা

করেছো তা তোমাকে দেয়া হয়নি। তুমি দেখবে পরবর্তীকালে হয় তোমাকে যাচনাকৃত জিনিসটি অপেক্ষা উত্তম কিছু দেয়া হয়েছে, না হয় তোমার কাছে থেকে এমন কিছু সরিয়ে নিয়ে গেছে যা সরিয়ে নেয়া প্রকৃত পক্ষেই তোমার জন্য কল্যাণকর ছিল। কাজেই প্রভুর কাছে এমন কিছু চাইতে হবে যার সৌন্দর্য স্থায়ী হবে এবং যার বোঝা তোমার কাছ থেকে দূরে থাকে। সম্পদের বিষয়টি ধরা যাক—এটা তোমার জন্য স্থায়ী নয় এবং তুমি এর জন্য বেঁচেও থাকবে না।

বৎস, মনে রেখো, পরকালের জন্য তোমাকে সৃষ্টিকরা হয়েছে—ইহকালের জন্য নয়। তোমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে এ দুনিয়া হতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবার জন্য—স্থায়ীভাবে থাকার জন্য নয়—মৃত্যুর জন্য—জীবত থাকার জন্য নয়। তুমি এমন এক স্থানে আছো যা তোমার নয়—এটা প্রস্তুতি নেয়ার ঘর এবং পরকালের দিকের একটি পথ। তোমাকে মৃত্যু দ্বারা পাকড়াও করা হবে এবং এ থেকে দৌড়ে পালিয়ে নিস্তার পাবার কোন উপায় নেই। কারণ যে কাউকে পরাভুত করতে মৃত্যু ক্ষমতাবান। সুতরাং সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে এজন্য যে পাপাবস্থায় উহা যেন তোমাকে পরাভূত না করে এবং তওবা করার বিষয় চিন্তা করার সময় উহা যেন বাধার সৃষ্টি না করে। এমনটি হলে তুমি নিজকেই ধ্বংস করবে।

পুত্র আমার! মৃত্যুকে বেশী করে স্মরণ করো। মৃত্যু আসার পর হঠাৎ তোমাকে কোন্ স্থানে চলে যেতে হবে সে বিষয়ে সর্বদা চিন্তা করো। এরূপ করলে তোমার প্রস্তুতির কারণে মৃত্যুর হঠাৎ আগমন তোমার কাছে দুঃখজনক হবে না। সাবধান, জাগতিক আকর্ষণের শিক্ষার দ্বারা তুমি প্রতারিত হয়ো না। এ বিষয়ে আল্লাহ্ সতর্ক করে দিয়েছেন। দুনিয়ার নৈতিক চরিত্র তোমাকে অবহিত করা হয়েছে এবং এর কুফল তোমার কাছে উন্মোচন করা হয়েছে। নিশ্চয়ই, যারা দুনিয়ার পেছনে দৌড়ায় তারা ঘেউ-ঘেউ করা কুকুরের মত অথবা মাংসাশী হিংসুক প্রাণীর মত, যারা একে অপরকে ঘৃণা করে। উহাদের শক্তিশালীগণ দুর্বলগণকে খেয়ে ফেলে এবং বড়গুলো ছোটগুলোকে পদদলিত করে। তাদের কতেক বাঁধা গরুর মত, আর কতেক বন্ধনহীন গরুর মত যারা দিগ্বিদিগ জ্ঞান হারা হয়ে আজানার উদ্দেশ্যে ছুটছে। তারা অসমতল উপত্যকায় ভ্রাম্যমান দুযোর্গগ্রস্থ দল। তাদের চারণভূমিতে নিয়ে যাওয়া অথবা বাধা দেয়ার মত কোন রাখাল নেই। এ দুনিয়া তাদেরকে অন্ধ করে রেখেছে এবং হেদায়েতের রশ্মি হতে তাদের চোখ ফিরিয়ে নিয়ে গেছে। সে জন্য তারা বিভ্রান্তিতে ঘুরপাক খাচ্ছে এবং দুনিয়ার আনন্দে ডুবে আছে। তারা দুনিয়াকে খোদা মনে করে এবং দুনিয়ার বাইরের সব কিছু ভুলে এর সাথে অদ্রূপ খেলা করে। অন্ধকারাচ্ছন্নতা ক্রমশঃ দূরীভূত হয়ে যাচ্ছে। এখন এটা এরূপ যেন ভ্রমণকারী নীচে নেমে যাচ্ছে এবং দ্রুতগামী সহসা মোলাকাত করবে। হে বৎস, জেনে রাখো, রাত ও দিনের বাহনে যারা চড়ে যাচ্ছে তাদের প্রত্যেকেই দিবারাত্র দ্বারা তাড়িত হচ্ছে যদিও সে স্থির রয়েছে বলে দেখা যায় এবং সে একই স্থানে থেকে দূরত্ব অতিক্রম করে চলছে।

নিশ্চিতভাবে জেনে রাখো, তুমি তোমার আকাঙ্খা পূরণ করতে পারবে না এবং নির্দিষ্ট জীবন অতিক্রান্ত করতে পারবে না। তোমার পূর্বে যারা ছিল তুমি তাদের পথেই আছো। সুতরাং চাহিদায় নমনীয় ও অর্জনে মধ্যপন্থী হও। কারণ অনেক সময় চাহিদা বঞ্চনার দিকে নিয়ে যায়। জীবিকার প্রত্যেক অনুসন্ধানকারী এটা পায় না এবং কোন মধ্যপন্থী অনুসন্ধানকারী বঞ্চিত হয় না। প্রতিটি নীচ জিনিস থেকে নিজকে দূরে সরিয়ে রেখো যদিও বা এসব নীচ জিনিস তোমাকে তোমার ইপ্সিত লক্ষ্যে পৌছাতে পারে; কারণ তুমি নিজের যে সম্মান ব্যয় কর তা আর ফিরে পাবে না। অন্যের গোলাম হয়ো না; কারণ আল্লাহ্ তোমাকে মুক্ত করে দিয়েছেন। যে 'ভাল' মন্দের মাধ্যমে অর্জিত হয় তাতে কোন কল্যাণ নেই এবং কষ্টের মাধ্যমে যে আয়েশ অর্জিত হয় তাতেও কোন কল্যাণ নেই। সাবধান, লোভীরা যেন তোমাকে নিয়ে ধ্বংসের ঝরণায় নামিয়ে না দিতে পারে। যদি তুমি তাদের থেকে নিজকে সংযত রাখতে পার তবে তোমার নিজের ও আল্লাহ্র মাঝে আর কোন সম্পদশালী থাকবে না। কাজেই

সংযত থেকো তাতে তোমার জন্য যা নির্ধারিত তা দেখতে পাবে এবং তোমর অংশ তুমি পাবে। যদিও সবকিছু আল্লাহ্ হতেই প্রাপ্ত তবুও মনে রেখো, মহিমান্বিত আল্লাহ্র কাছ থেকে সরাসরি সামান্য কিছু পাওয়া তাঁর বান্দার কাছ থেকে অনেক পাওয়া অপেক্ষা অনেক বেশী মর্যদাশীল।

যা তুমি নীরব থেকে হারিয়েছো তা সঠিক করে নেয়া অনেক সহজতর, কথা বলে যা বেশী হারিয়েছো তা অর্জন করা অপেক্ষা। কোন পাত্রে যা থাকে ঢাকনা লাগিয়ে দিলে তা থেকে যায়। তোমার হাতে যা আছে তা রক্ষা করা অন্যের হাতে যা আছে তা চাওয়া অপেক্ষা উত্তম ও পছন্দনীয়। অন্যের কাছে যাচনা করা অপেক্ষা নৈরাশ্যের তিক্ততা অনেক ভাল। সততার সাথে কায়িক শ্রম করা জ্বালাময় জীবনের সম্পদ অপেক্ষা অনেক ভাল। একজন লোক তার বাতেনের সর্বোত্তম প্রহরী। অনেক সময় যা তার জন্য ক্ষতিকর মানুষ উহার জন্য সংগ্রাম করে। যে বেশী কথা বলে সে বোকার মত কথা বলে। যে কেউ ভেবে দেখে সে উপলব্ধি করতে পারে। ধার্মিক লোকদের সাথে মেলামেশা করো; তাতে তুমিও তাদের একজন হয়ে যাবে। পাপী লোকদের থেকে দূরে সরে থাকো তাতে তুমি তাদের থেকে নিরাপদ থাকতে পারবে। হারাম খাদ্য নিকৃষ্টতম বস্তু। দুর্বলের প্রতি অত্যাচার নিকৃষ্টতম অত্যাচার। কোমলতা যেখানে অচল সেখানে কঠোরতাই কোমলতা। অনেক সময় চিকিৎসাই পীড়া আর পীড়াই চিকিৎসা। অনেক সময় অশুভাকাঙ্খী সঠিক উপদেশ দেয় এবং শুভাকাঙ্খীও প্রতারণা করে। আশার ওপর নির্ভরশীল হয়ো না, কারণা আশা হচ্ছে বোকাদের প্রধান অবলম্বন। কারো অভিজ্ঞতা সংরক্ষণ করা জ্ঞানের পরিচায়ক। তোমার সর্বোৎকৃষ্ট অভিজ্ঞতা হলো তা যা তোমাকে শিক্ষা দেয়। অবসর শোকে রূপান্তরিত হবার আগে এর সৎব্যবহার করো। প্রত্যেক যাচনাকারীই যা চায় তা পায় না এবং কোন প্রস্থানকারী আর ফিরে আসে না। বিচার দিনের ব্যবস্থা না করা এবং পাপ অর্জন করা মানেই হলো ধ্বংস প্রাপ্ত হওয়া। প্রত্যেক বিষয়ের একটা পরিণতি আছে। যা তোমার জন্য নির্ধারিত তা সহসাই তোমার কাছে আসবে। একজন ব্যবসায়ী ঝুঁকি গ্রহণ করবেই। অনেক সময় ক্ষুদ্র পরিমাণও বৃহৎ পরিমাণ অপেক্ষা উপকারী। ইতর লোকের সাহায্য ও সন্দিহান বন্ধুত্বে কোন মঙ্গল আশা করা যায় না। দুনিয়া যতক্ষণ তোমার মুষ্টিগত থাকে ততক্ষণ শুধু এর বিরুদ্ধে অভিযোগী হয়ো। কোন কিছু বেশীর আশায় নিজেকে ঝুঁকিতে ফেলো না। সাবধান থেকো, না হয় শত্রুতার অনুভূতি তোমাকে পরাভূত করবে।

তোমার ভ্রাতার সঙ্গে এমনভাবে থেকো, যখন সে তোমার জ্ঞাতিত্ব অস্বীকার করে তখন তুমি তার জ্ঞাতিত্ব স্বীকার করো। যখন সে ফিরে আসে তার প্রতি সদয় থেকো এবং তার কাছে গিয়ে বসো। যখন সে দিতে না চায় তখন তার জন্য ব্যয় করো। যখন সে বেরিয়ে যেতে চায় তখন তাকে থাকার জন্য অনুরোধ করো। যখন সে কঠোর হয় তখন তুমি কোমল হয়ে যেয়ো। যখন সে ভুল করে তখন উহার ওজর বের করার চিন্তা এমনভাবে করো যেন তুমি তার একজন দাস এবং সে তোমার সদাশয় প্রভু। কিন্তু এসব যেন অযথা না হয় সে দিকে যত্নবান হয়ো এবং কোন অবাঞ্চিত ব্যক্তির প্রতি এরূপ আচরণ করো না। তোমার বন্ধুর শত্রুকে কখনো বন্ধু মনে করো না। এটা তোমার বন্ধুকে ক্ষেপিয়ে তুলবে। তোমর ভাইকে সত্য ও সঠিক উপদেশ দিয়ো—এটা ভাল হোক আর তিক্তই হোক। ক্রোধকে গিলে ফেলো কারণ পরিণামে এর চেয়ে মধুর আর কোন কিছু আমি দেখিনি এবং এর চেয়ে আনন্দদায়ক ও ফলদায়ক আর কিছু নেই। যে তোমার প্রতি কঠোর তার প্রতি কোমল থেকো। কারণ এতে সে শীঘ্রই তোমার প্রতি কোমল হয়ে যেতে পারে। আনুকূল্যের সাথে তোমার শত্রুর প্রতি ব্যবহার করো। এতে দু'টো কৃতকার্যতার ফল তুমি পাবে—একটি হলো প্রতিশোধের কৃতকার্যতা এবং অপরটি হলো আনুকূল্য করার কৃতকার্যতা। যদি তুমি মনে কর কোন বন্ধুর সাথে বন্ধুত্ব ছিন্ন করবে তবে তোমার দিক হতে তাকে কিছু সুযোগ দিয়ো যাতে সে পুনরায় কখনো যেন বন্ধুত্ব পুনরুজ্জীবিত করতে পারে। যদি কেউ তোমার সম্পর্কে সুধারণা পোষণ করে তবে তা সত্যে প্রমাণ করো। তোমার ভাইয়ের সাথে তোমার সম্পর্ক বিবেচনা করে তার স্বার্থের প্রতি কোন অবজ্ঞা প্রদর্শন করো না। কারণ তার স্বার্থের প্রতি অবজ্ঞা করলে সে তোমার ভাই থাকবে না। তোমার ঘরের

লোকেরা যেন তোমার দ্বারা দুর্দশাগ্রস্থ না হয়। যে তোমার দিক হতে ফিরে চলে গেছে তার কাছেও যেয়ো না। তোমার ভ্রাতা যেন তোমার জ্ঞাতিত্ব অস্বীকারে ততটুকু দৃঢ় না হয় যতটুকু দৃঢ়তা তুমি তার জ্ঞাতিত্বে রাখবে। তুমি সর্বদা তার প্রতি মঙ্গলকর কাজে মন্দকে অতিক্রম করে চলবে। যে ব্যক্তি তোমাকে অত্যাচার করে তার অত্যাচার বড় একটা কিছু মনে করো না কারণ সে শুধুমাত্র নিজের ক্ষতি ও তোমার উপকারেই প্রবৃত্ত আছে। যে তোমাকে খুশী করে তার পুরস্কার যেন তাকে অখুশী করার মধ্যে না হয়।

বৎস, আমার! জেনে রাখো, জীবিকা দুই প্রকার - এক প্রকার জীবিকা যা তুমি অনুসন্ধান কর এবং অন্যপ্রকার জীবিকা যা তোমাকে অনুসন্ধান করে। শেষোক্তটা এমন যে, যদি তুমি উহার কাছে পৌছতে না পার তবে উহা তোমার কাছে পৌছবে। প্রয়োজনের সময় কুঁকড়ে পড়া এবং সম্পদ পেলে কঠোর হওয়া কতই না মন্দ। এ দুনিয়া হতে তোমার শুধু সেটুকু পাওয়া উচিত যা দিয়ে তুমি তোমার স্থায়ী আবাস সাজাতে পার। যা তোমার হাত ছাড়া হয়ে গেছে তার যদি তুমি জের টান তা হলে যা মোটেই তোমার কাছে আসেনি তার আশা করো। যা ঘটে গেছে এবং যা এখনো ঘটেনি এ দুটোর মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করো, কারণ ঘটনাপ্রবাহ প্রায় একই রকম। কষ্ট না দিলে উপদেশ যাদের কোন উপকারে আসে না তাদের মত হয়ো না, কারণ জ্ঞানীগণ শিক্ষা হতে উপদেশ গ্রহণ করে আর পশুরা আঘাত করলে শিখে। ইমানের পবিত্রতা ও ধৈর্যের দৃঢ়তা দ্বারা উদ্বিগ্নতা ও অস্থিরতার আক্রমণ হতে নিজকে রক্ষা করো। যে মধ্যপথ পরিহার করে সে সীমালজ্ঘন করে। সহচর আত্মীয়ের মত। সে ব্যক্তিই বন্ধু যার অনুপস্থিতি বন্ধুত্বের প্রমাণ করে। কামনা (খাহেশ) দুঃখের অংশীদার। অনেক সময় নিকটবর্তীগণ দূরবর্তীগণ অপেক্ষা দূরের হয়ে পড়ে আবার দূরবর্তী নিকটবর্তী অপেক্ষাও নিকটতর হয়। সেই ব্যক্তি আগন্তুক যার কোন বন্ধু নেই। যে ব্যক্তি অধিকার লঙ্ঘন করে সে নিজের পথ সংকীর্ণ করে। যে নিজের অবস্থায় স্থির থাকে সে তার পথেও স্থির। যা তোমরা নিজেদের ও মহিমান্বিত আল্লাহ্‌র মধ্যে গ্রহণ করেছো তা সর্বাপেক্ষা বিশ্বাসযোগ্য মধ্যস্থতাকারী। যে তোমার স্বার্থের বিষয়ে উদাসীন সে তোমার শত্রু। যখন লোভ ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায় তখন বঞ্চনা হয় অর্জন। প্রত্যেক ত্রুটি-বিচ্যুতি পুনরীক্ষণ করা যায় না এবং প্রত্যেক সুযোগ-সুবিধা বারবার আসে না। অনেক সময় চক্ষুস্মান লোকও পথ হারায়ে ফেলে আবার অন্ধলোক সঠিক পথের সন্ধান পায়। মন্দ কাজে সর্বদা বিলম্ব করো কারণ তোমার ইচ্ছানুযায়ী যে কোন সময় তুমি এর প্রতি ক্ষিপ্রগতিতে যেতে পারবে। অজ্ঞদের জ্ঞাতিত্বের প্রতি অবজ্ঞা জ্ঞানীদের জ্ঞাতিত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের সমান। যে কেউ দুনিয়াকে নিরাপদ মনে করবে তার সাথেই দুনিয়া বিশ্বাসঘাতকতা করবে। যে দুনিয়াকে মহৎ মনে করবে সে দুনিয়া দ্বারা অবনমিত হবে। যারা তীর ছোড়ে তাদের সকলেই লক্ষ্যভেদ করতে পারে না। যখন কর্তৃত্ব বদল হয় তখন সময়ও বদল হয়ে যায়। কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে বন্ধুদের সাথে আলোচনা করো এবং বাড়ী করার আগে প্রতিবেশীদের সাথে আলোচনা করো। সাবধান, তোমার বক্তব্যে এমন কিছু বলো না যাতে অন্যরা উপহাস করবে; এমনকি তা যদি অন্য কারো বক্তব্যও হয়। নারীর সাথে কোন বিষয়ে পরামর্শ করো না। কারণ তারা দূরদৃষ্টিতে দুর্বল এবং তাদের দৃঢ়চিত্ততা নেই। ঘোমটা দিয়ে তাদের চোখ বন্ধ করে দিয়ো, কারণ ঘোমটা দেয়ার বাধ্য বাধকতা তাদেরকে দীর্ঘদিন ধরে রাখবে। তাদের সাথে কোন অবিশ্বস্ত লোকের সাক্ষাত করতে দেয়া আর তাদের বাইরে আসতে দেয়া সমার্থবোধক। তোমাকে ছাড়া অন্য কাউকে না জানা যদি তুমি ব্যবস্থা করতে পার তবে তাই কর্‌রো, কারণ নারী হলো ফুল—প্রশাসক নয়। তার নিজের বাইরে তাকে সম্মান দিয়ো না। অন্যের জন্য মধ্যস্থতা করায় তাকে উৎসাহিত করো না। নারীর প্রতি অযথা সন্দেহ পোষণ করো না। এতে একজন সঠিক নারীও খারাপ হয়ে যায় এবং সতী নারীও বিপথগামী হয়ে যায়।

তোমার অধীনস্থ সকল কর্মচারীর কাজ নির্ধারিত করে দিয়ো যাতে তাদেরকে আলাদাভাবে দায়ী করা যায়। এ রকম করলে তারা একজনের কাজের দায়িত্ব অন্যের ওপর চাপিয়ে দিতে পারবে না। তোমার আত্মীয়স্বজন ও

জ্ঞাতিগণকে সম্মান প্রদর্শন করো; কারণ তারা হলো তোমার পাখা যা দিয়ে তুমি উড়বে, তোমার আসল ভিত্তি যে দিকে তুমি ফিরে যাবে এবং তোমার হাত যা দিয়ে তুমি আক্রমণ করবে। তোমার দ্বীন ও দুনিয়াকে আল্লাহ্‌র ওপর ছেড়ে দিয়ো এবং নিকটের ও দূরের— ইহকাল ও পরকালে যা তোমার জন্য সর্বোত্তম তা নির্ধারণ করার জন্য প্রার্থনা করো। এখানেই শেষ করলাম।

বাহারানী[১০১] (৫ম খন্ড, পৃঃ ২) লিখেছেন যে, আমিরুল মোমেনিন এ উপদেশাবলী তাঁর পুত্র ইবনে হানাফিয়াকে লিখেছেন। অপরপক্ষে শরীফ রাজী লিখেছেন যে, এ উপদেশাবলী ইমাম হাসানের জন্য লিখেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে আমিরুল মোমেনিন আরো একটা উপদেশ পত্র লিখেছিলেন যার কিয়দংশ এখানেও উল্লেখিত হয়েছে। সেটা ছিল ইমাম হাসানকে সম্বোধন করে (আশরাফ[১৪], পৃঃ ১৫৭-১৫৯, মজলিসী[১০৩], পৃঃ ১৯৬- ১৯৮)।

আমিরুল মোমেনিনের এ উপদেশাবলীর তাত্বিক দিক লক্ষ্য করলে প্রতিয়মান হয় যে, এটা মুহাম্মদ হানাফিয়াকেই লিখা হয়েছিল। ইমাম হাসানকে তিনি যেভাবে গড়ে তুলেছিলেন, তদুপরি রাসুলের (সঃ) সংস্পর্শের কারণে ইসলামের বাহ্যিক ও গুপ্ত বিষয়সমুহ তিনি অবহিত ছিলেন। তার প্রতি ইঙ্গিত মাওলা আলী বহুবার করেছেন যা এ গ্রন্থেও উল্লেখিত হয়েছে। তদুপরি সিফফিনের যুদ্ধের সময় ইমাম হাসান বয়ঃপ্রাপ্ত ছিলেন। কাজেই এ উপদেশাবলী হানাফিয়ার উদ্দেশ্যে দেয়া হয়েছে বলে দৃঢ় বিশ্বাস— বাংলা অনুবাদক।

আমরা একজন মহৎ পিতার উপদেশাবলী সম্বলিত পত্র দেখলাম। কিন্তু মুয়াবিয়া তার দুশ্চরিত্র পুত্র ইয়াজিদকে খলিফা বানানোর জন্য বিভিন্ন অপকৌশল ও মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে কতিপয় লোকের বায়াত ইয়াজিদের নামে গ্রহণ করতে বাধ্য করেছিলেন। তিনি মৃত্যুশর্যায় থাকাকালে ইয়াজিদ দামস্কের বাইরে মৃগয়ারত ছিল। সে কারণে তিনি ইয়াজিদের জন্য যে উপদেশনামা লিখে দিয়েছিলেন তা ১৯৯২ সনের ৪ জুলাই, দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল যা নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো ঃ

প্রিয় বৎস! আমি তোমার পথের সব কাঁটা অপসারণ করে পথ সম্পূর্ণ পরিষ্কার করে দিয়েছি; দুশমনদের পরাস্থ করে আরববাসীদের গর্দান তোমার কাছে নত করে দিয়েছি। তোমার জন্য অঢেল ধন-সম্পদ জমা করে রেখেছি। তোমার প্রতি আমার উপদেশ, আমার এসব উপকারের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তুমি হেজাজবাসীদের প্রতি দয়াপ্রবণ থাকবে, তারা তোমার আসল ভিত্তি। যারা তোমার কাছে আসবে তাদের প্রতি উত্তম ব্যবহার করবে। ইরাকবাসীদের প্রতিও অনুগ্রহ করবে। তারা প্রতিদিন নয়া শাসনকর্তা দাবী করলে তা-ই করবে। সিরীয়দেরকে তোমার উপদেষ্টা নিয়োগ করো। দুশমনের সাথে মোকাবেলা করতে হলে সিরীয়দের সাহায্য গ্রহণ করো। কামিয়াব হবার পর সিরীয়দেরকে তাদের শহরে ফেরত আনবে। কেননা অন্যস্থানে অধিক অবস্থানের ফলে তাদের নৈতিক পরিবর্তন হবার আশঙ্কা থাকে। তোমার চারজন প্রধান শত্রু এখনো রয়ে গেল। এরা হলো— হোসাইন ইবনে আলী, আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উমর, আবদুর রহমান ইবনে আবুবকর ও আবদুল্লাহ্‌ ইবনে জুবায়ের। এদের মধ্যে হোসাইন তোমার জন্য অধিক বিপদজ্জনক।

★★★★★

পত্র-৩২
মুয়াবিয়ার প্রতি

তুমি একটা বিরাট জন গোষ্ঠীকে ধ্বংস করে দিয়েছো যাদের তুমি তোমার বিভ্রান্তি দ্বারা প্রতারিত করেছো। তুমি তাদেরকে তোমার সমুদ্রের স্রোতে নিপতিত করেছো যেখানে অন্ধকার তাদের ঢেকে ফেলেছে এবং অমঙ্গলের আশঙ্কা তাদেরকে ঘিরে ধরেছে। ফলে তারা ন্যায় পথ থেকে সরে গিয়ে পথভ্রষ্ট হয়ে তাদের অতীতের দিকে ফিরে গেছে। তাদের মধ্যে কতিপয় জ্ঞানী লোক যারা তোমাকে বুঝতে পেরেছে তারা তোমাকে ত্যাগ করে সৎপথে রয়েছে এবং তারা তোমার সাহায্য ত্যাগ করে আল্লাহ্‌র দিকে ধাবিত হচ্ছে যদিও তুমি তাদের কষ্ট দিচ্ছ এবং

তাদের বিভ্রান্ত করতে চেষ্টা করছো। সুতরাং হে মুয়াবিয়া, আল্লাহ্‌কে তোমার নিজের জন্য ভয় কর এবং শয়তানের হাত হতে তোমার লাগাম খুলে নিয়ে আস। মনে রেখো, এ দুনিয়া সহসাই তোমা হতে কেটে পড়বে এবং পরকাল অতি সন্নিকটে। এখানেই শেষ করলাম।

★★★★★

পত্র-৩৩

মক্কার গভর্ণর কুছাম ইবনে আব্বাসের প্রতি

পশ্চিমে নিয়োজিত আমার গুপ্তচর আমাকে লিখে[১] পাঠিয়েছে যে, সিরিয়ার কিছু লোক হজ্বের জন্য প্রেরিত হয়েছে যাদের হৃদয় অন্ধকারাচ্ছন্ন, কর্ণ বধির এবং যারা দূরদৃষ্টি বিবর্জিত। তারা সত্যের সাথে মিথ্যার তালগোল পাকিয়ে ফেলে, আল্লাহ্ অবাধ্য ব্যক্তিকে মেনে চলে, দ্বীনের নামে দুনিয়ার ফয়দা লুট করে এবং ধার্মিক ও খোদাভীরুগণের পুরস্কার পরিত্যাগ করে দুনিয়ার সুখের ব্যবসায় করে। মঙ্গলের জন্য কাজ না করলে কেউ তা অর্জন করতে পারে না এবং পাপ না করলে কেউ পাপের শাস্তি পায় না। সুতরাং তোমার কর্তব্যে তুমি এমন একজন বুদ্ধিমান, অভিজ্ঞ, শুভাকাঙ্খী ও জ্ঞানবানের মত আচরণ করো যে তার উপরস্থকে মান্য করে এবং যে তার ইমামের অনুগত। তোমার ব্যাখ্যা দেয়ার মত যা আছে তা আমি এড়িয়ে যেতে চাই। সম্পদ বাড়িয়ে তুলো না এবং দুঃখ-কষ্টে সাহস হারিয়ে ফেলো না। এখানে বিষয়টি শেষ করলাম।

১। মুয়াবিয়া হজ্বের সময় মক্কায় কিছু লোক প্রেরণ করেছিল। তাহাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিল যেন তারা মক্কার শান্তিপূর্ণ অবস্থায় এ বলে একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে যে, আলী ইবনে আবি তালিব উসমানকে হত্যা করার জন্য জনগণকে প্ররোচিত করেছিল। এ উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য তাকওয়া ও খোদাভীরুতা প্রদর্শন করে জনগণের আস্থা অর্জন করতে তাদের নির্দেশ দিয়েছিল । এতে সেসব লোক মুয়াবিয়ার চরিত্র মহৎ বলে প্রচার করে এবং উসমানের মৃত্যুর জন্য আমিরুল মোমেনিনকে দায়ী করে প্রচার চালাতে থাকে। তারা মুয়াবিয়ার আচরণের মহত্ব, দানশীলতা ও দয়ার নানা প্রকার গল্প ছড়াতে লাগলো। এ সংবাদ আমিরুল মোমেনিন জানতে পেরে উপরোক্ত পত্র লিখেছেন।

★★★★★

পত্র-৩৪

মিশরের পথে মালিক আশতারের মৃত্যুর পর মুহাম্মদ ইবনে আবি বকর মিশরের গভর্ণরের দায়িত্বভার গ্রহণ করায় তাকে লিখেছিলেন

তোমার স্থলে আশতারকে পদায়ন করায় তোমার রাগের কথা আমি জানতে পেরেছি। তোমার কোন দোষ বা ক্রুটির জন্য অথবা তোমার কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি করার জন্য এমনটি আমি করিনি। কিন্তু আমি তোমার কর্তৃত্বাধীন হতে যা নিয়েছি তজ্জন্য তোমাকে এমন অবস্থায় দিতাম যা তোমার কাছে অনেক বেশী আর্কষণীয় হতো।

যাকে আমি মিশরের গভর্ণর করেছি সে আমার হিতাকাঙ্খী এবং শত্রুর প্রতি খুবই কঠোর ও সমুচিত প্রতিশোধপরায়ণ ছিল। তার প্রতি আল্লাহ্‌র দয়া বর্ষিত হোক, সে তার আয়ু শেষ করে মৃত্যু মুখে পতিত হয়েছে। আমি তার ওপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট। আল্লাহ্‌ও তার ওপর সন্তুষ্ট হোন এবং তার পুরস্কার বর্ধিত করুন। এখন তোমার শত্রুদের বিরুদ্ধে প্রস্তুত হও এবং নিজের বুদ্ধিমত্তা অনুযায়ী কাজ করো। যে তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে চায় তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হও এবং তাদেরকে আল্লাহ্‌র পথে আহ্বান করো। অত্যধিক পরিমাণ আল্লাহ্‌র

সাহায্য প্রার্থনা করো। ইনশাল্লাহ্, তিনি তোমার দুশ্চিন্তায় তোমাকে সাহায্য করবেন এবং তোমার ভাগ্যে যা ঘটে তাতে তিনি তোমাকে সাহায্য করবেন।

★★★★★

পত্র-৩৫

মুহাম্মদ ইবনে আবি বকরের হত্যার পর আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের প্রতি।

মুহাম্মদ ইবনে আবি বকর শহীদ হয়েছে (তার প্রতি আল্লাহ্র করুণা বর্ষিত হোক) এবং মিশর পরাজিত হয়ে গেল। আমরা আল্লাহ্র কাছে মুহাম্মদের পুরস্কার প্রার্থনা করি। সে এমন পুত্র ছিল যে অকৃত্রিম শুভাকাঙ্খী, কঠোর পরিশ্রমী, একটি তীক্ষ্ম তরবারি ও একটি রক্ষা-প্রাচীর। আমি জনগণকে বলেছিলাম তার সাথে যোগদান করতে এবং এ দুর্ঘটানার পূর্বেই তার সাহায্যার্থে তার কাছে পৌছার জন্য আদেশ দিয়েছিলাম। আমি পুনঃপুনঃ তাদেরকে প্রকাশ্যে ও গোপনে আহ্বান করেছিলাম। তাদের কতেক মন-মরা ভাবে এসেছিল, কেউ কেউ মিথ্যা ওজর দেখিয়েছিল এবং কেউ কেউ আমাকে ত্যাগ করে দূরে বসে রয়েছিল। আমি মহিমান্বিত আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করলাম যেন খুব তাড়াতাড়ি এদের থেকে মুক্তি পাই। কারণ আল্লাহ্র কসম, শাহাদাত বরণ করার জন্য যদি আমি শত্রুর মোকাবেলা করতে আকাঙ্খিত না হতাম এবং মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত না থাকতাম তবে আমি এসব লোকের সঙ্গে থাকতে পারতাম এবং এদের নিয়ে কখনো শত্রুর মোকবেলা করতে হতো না।

★★★★★

পত্র-৩৬

আমিরুল মোমেনিনের ভ্রাতা আকীলের[১] প্রতি

আমি মুসলিমদের একটা বিরাট বাহিনী তার প্রতি প্রেরণ করেছিলাম। যখন সে এটা জানতে পারলো সে অনুতপ্ত হয়ে পিছিয়ে গেল এবং শেষে পালিয়ে গেল। সূর্যাস্তের কিছুক্ষণ পূর্বে তারা পথিমধ্যে তার দেখা পেল । তারা সামান্য কিছুক্ষণ অযথা হাতাহাতি লড়াই করলো। এক ঘণ্টা ধরে এ লড়াই চলেছিল। তারপর সে নিজকে অর্ধমৃত অবস্থায় উদ্ধার করেছিল এবং তার শেষ নিশ্বাসটুকু অবশিষ্ট ছিল। এভাবে সে একটা আতঙ্ক হতে রক্ষা পেল।

কুরাইশগণ বিপথে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে—তাদের কথা ছেড়ে দাও। তারা অনৈক্যের দিকে ধাবমান এবং ধ্বংস তাদেরকে আঁকড়িয়ে ধরেছে। তারা আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে যেভাবে তারা আল্লাহ্র রাসুলের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করেছিল। আমি আশা করি আমার প্রতি যে ব্যবহার করেছে তজ্জন্য কুরাইশগণ প্রতিদান পাবে। কারণ তারা আমার জ্ঞাতিত্বকে অস্বীকার করেছে এবং আমার মায়ের পুত্রের (অর্থাৎ আল্লাহ্ রাসুল) কাছ থেকে পাওয়া আমার অধিকার হতে আমাকে বঞ্চিত করেছে।

মৃত্যু পর্যন্ত আমি যুদ্ধ করে যাব—আমার এ অভিমত সম্পর্কে তুমি জানতে চেয়েছো। তাই তোমাকে বলছি যারা যুদ্ধকে জায়েয মনে করে তাদের সাথে যুদ্ধ করার আমি পক্ষপাতি। আমার চারপাশে জনতার ভিড় আমার শক্তি যোগায় না, আবার আমার কাছ থেকে তারা সরে পড়লেও আমি একাকীত্ব বোধ করি না। তোমার পিতার পুত্রকে কখনো দুর্বল ও ভীত ভেবো না। এমনকি সকল লোক তাকে পরিত্যাগ করলেও সে অবিচারের কাছে মাথা নত করবে না অথবা তাকে তার পথ হতে কেউ টেনে নিয়ে যেতে পারবে না। সে বনি সলিমের লোকটির মত

বলবে "যদি তুমি জিজ্ঞেস কর আমি কেমন, তাহলে শুন, আমি ধৈর্যশীল এবং সময়ের পরিবর্তনের বিরুদ্ধে কঠোর। আমি কখনো নিজকে শোকাহত হতে দেই না পাছে শত্রু আনন্দ পায় এবং বন্ধু দুঃখ পায়।"

১। সালিশীর পর মুয়াবিয়া হত্যাকাণ্ড শুরু করেছিল। সে চার হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী জাহ্হাক ইবনে কায়েস ফিহ্রীর নেতৃত্বে আমিরুল মোমেনিনের নগরী আক্রমণ করার জন্য প্রেরণ করেছিল। আমিরুল মোমেনিন এ খবর জানতে পেরে প্রতিরক্ষা রচনার জন্য কুফার লোকদের ডাক দিয়েছিলেন, কিন্তু তারা নানা প্রকার ওজর দেখাতে লাগলো। অবশেষে হুজর ইবনে আদি আল কিন্দি চার হাজার সৈন্যর একটি বাহিনী নিয়ে মুয়াবিয়ার বাহিনীকে তাড়া করলো এবং তাদমুর নামক স্থানে তাদের ধরে ফেললো। সূর্যাস্তের সময় উভয় দলে সামান্য হাতাহাতি হয়েছিল এবং অন্ধকার নেমে এলে জাহ্হাক পালিয়ে গেল। এ সময় আকীল ইবনে আবি তালিব উমরাহ্ করার জন্য মক্কা এসেছিলেন। যখন তিনি জানতে পারলেন হিরা আক্রমণ করেও জাহ্হাক জীবিত ফিরে গেছে তখন তিনি আবদার রহমান ইবনে উবায়েদ আজদীর মাধ্যমে তার সাহায্যের কথা উল্লেখ করে পত্র লিখেছিলেন। প্রত্যুত্তরে আমিরুল মোমেনিন কুফাবাসীদের আচরণ সম্বন্ধে বর্ণনা করে জাহ্হাকের যুদ্ধের বিষয় লিখে এ পত্র লিখেছিলেন।

★★★★★

পত্র-৩৭
মুয়াবিয়ার প্রতি

সকল মহিমা আল্লাহ্র। তুমি কত সুন্দরভাবে নীতি বাক্য আঁওড়িয়ে, স্বউদ্ভাবিত আবেগ ও দুঃখজনক বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছো। অথচ প্রকৃত বিষয় চাপা দিয়ে আল্লাহ্র পছন্দনীয় জোরালো কারণ পরিত্যাগ করেছো এবং তার পরিবর্তে মানুষের জন্য নানা প্রকার ওজর দাঁড় করিয়েছো। উসমানের হত্যার ব্যাপারে তুমি যে সকল প্রশ্ন দীর্ঘায়িত করছো সে বিষয়ে প্রকৃত অবস্থা হলো তুমি শুধু তোমার নিজের সুবিধার জন্যই উসমানকে সাহায্য করেছো[১]। কিন্তু যখন প্রকৃত অর্থে উসমানের সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছিলো তখন তুমি তাকে পরিত্যাগ করেছো। বিষয়টি এখানে শেষ করলাম।

১। একথা অস্বীকার করার কোন জো নেই যে, উসমানের হত্যার পর মুয়াবিয়া তাকে সাহায্য করেছে বলে দাবী করেছিলো। কিন্তু উসমান যখন ঘেরাওতে পড়লো এবং পত্রের পর পত্র লিখে মুয়াবিয়ার সাহায্য চেয়েছিল তখন সে এক ইঞ্চিও এগিয়ে আসেনি। শুধুমাত্র লোক দেখানোর জন্য ইয়াজিদ ইবনে আসাদ কাসারীর নেতৃত্বে সে একটা ক্ষুদ্র বাহিনী প্রেরণ করে তাদের বলে দিয়েছিলো তারা যেন মদিনার উপকণ্ঠে জুখুশুব উপত্যকায় অপেক্ষা করে। পরিণামে উসমান নিহত হলো এবং সে তার বাহিনী নিয়ে ফিরে গেল। এতে কোন সন্দেহ নেই যে মুয়াবিয়া উসমানের হত্যা চেয়েছিল যাতে সে উসমানের রক্তের বদলা দাবী করে গোলযোগ সৃষ্টি করে তার খলিফা হবার পথ পরিস্কার করে নিতে পারে। সে কারণে সে ঘেরাও থাকাবস্থায় উসমানকে সাহায্য করেনি এবং ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পর উসমানের হত্যাকারীদের বের করার জন্যও কোন চেষ্টা করেনি।

★★★★★

পত্র-৩৮
মালিক আশতারকে মিশরের গভর্ণর নিয়োগ করার পর মিশরের জনগণের প্রতি

আল্লাহ্র বান্দা আলী ইবনে আবি তালিবের নিকট হতে সেসব জনগণের প্রতি যারা আল্লাহ্র খাতিরে ক্ষুব্ধ যখন দুনিয়াতে মানুষ তাঁর অবাধ্য হয়ে গিয়েছিল এবং তাঁর দায়িত্ব অবহেলিত হচ্ছিল এবং স্থানীয় ও বিদেশী

ধার্মিক ও দুঃখীগণের ওপর অত্যাচার ছড়িয়ে পড়েছিল। ফলে সমাজে কোন ভাল কাজ করা হতো না এবং কোন পাপ এড়িয়ে যেত না।

এখন আমি আল্লাহ্র বান্দাগণের মধ্য হতে একজনকে তোমাদের নিকট পাঠালাম যে বিপদের দিনে বিনিদ্র থাকে এবং দুঃসময়ে কখনো শত্রুর ভয়ে কুঁকড়ে যায় না। সে দুষ্টদের প্রতি অগ্নিচ্ছটা হতেও কঠোর। সে হলো মালিক ইবনে হারিছ। সে মাজহিজ গোত্রদ্ভুদ—আমাদের ভাই। সুতরাং তোমরা তাকে মেনে চলো এবং তার ন্যায় সঙ্গত আদেশ পালনে তৎপর থেকো। কারণ সে আল্লাহ্র তরবারিগুলোর মধ্যে একটি তরবারি। সে এমন তরবারি যা ভোতা নয় এবং যা শিকারকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করে না। যদি সে তোমাদেরকে এগিয়ে যেতে বলে, এগিয়ে যেয়ো। যদি সে তোমাদেরকে থেমে যেতে বলে, থেমে যেয়ো। কারণ নিশ্চয়ই, সে আমার আদেশ ছাড়া কাউকে এগিয়ে যেতে বা পিছিয়ে যেতে বা আক্রমণ করতে বলবে না। আমি আমা অপেক্ষা তোমাদের সুবিধার কথা বেশী চিন্তা করে তাকে পাঠিয়েছি। তোমাদের শুভাকাঙ্খী ও তোমাদের শত্রুর প্রতি তার সাংঘাতিক কঠোরতার কথা বিবেচনা করেই তাকে আমি পছন্দ করেছি।

★★★★★

পত্র-৩৯

আমর ইবনে আসের প্রতি

নিশ্চয়ই, তুমি তোমার দ্বীনকে এমন এক লোকের দুনিয়াদারীর কাজে ব্যবহার করছো যার বিপদগামীতা ও পথভ্রষ্টতা কোন গোপন বিষয় নয় এবং তার সকল কুকর্ম উন্মোচিত হয়ে পড়েছে। সে একজন সম্মানীলোককে সঙ্গ দিয়ে ধ্বংসের দিকে আকর্ষিত করে এবং সমাজের সবাইকে বোকা বানিয়ে দেয়। তুমি তার পদাঙ্ক অনুসরণ করছো। একটি কুকুর যেভাবে সিংহের পদচিহ্ন অনুসরণ করে এ আশায় যে সিংহ তার শিকারের কিছু যদি ফেলে যায় তবে সে খেতে পারবে। তদ্রুপ তুমিও তার (মুয়াবিয়ার) আনুকূল্যের জন্য তার পেছনে ঘুরছো। তুমি তোমার ইহকাল ও আখেরাত নষ্ট করে ফেলেছো। যদিও তুমি ন্যায় পথে ছিলে তবুও তুমি এখন সম্পূর্ণ ধ্বংসের পথে চলে গেছো।

যদি আল্লাহ্ আমাকে তোমার ও ইবনে আবি সুফিয়ানের (মুয়াবিয়া) ওপর কর্তৃত্ব প্রদান করেন তবে আমি তোমাদের উভয়কে তোমাদের কাজের জন্য সমুচিত বিনিময় দিয়ে দেব। কিন্তু যদি তোমরা রক্ষা পাও এবং বেঁচে থাকো তবে পরকালে তোমাদের উভয়ের পাপ আর অমঙ্গল ছাড়া কিছুই নেই। এখানে বিষয়টি শেষ করলাম।

★★★★★

পত্র-৪০

আমিরুল মোমেনিনের একজন অফিসারের প্রতি

আমি তোমার সম্পর্কে কিছু বিষয় জানতে পেরেছি। যদি তুমি এরূপ করে থাকো তবে নিশ্চয়ই তুমি তোমার প্রভুর অসন্তোষ অর্জন করেছো। তোমার ইমামকে অমান্য করেছো এবং তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছো।

আমি জানতে পেরেছি যে তুমি অনেক জমিন ধ্বংস করে দিয়েছো এবং পায়ের নীচে যা পেয়েছো তা নিয়ে এসেছো এবং হাতে যা ছিল তা আত্মসাৎ করেছো। তোমার হিসাব-নিকাশ আল্লাহ্র কাছে প্রেরণ কর এবং মনে রেখো, মানুষ অপেক্ষা আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে বড়ই কঠোর। এখানে বিষয়টি শেষ করলাম।

★★★★★

পত্র-৪১

আমিরুল মোমেনিনের একজন অফিসারের প্রতি

আমি তোমাকে আমার অছির অংশীদার করেছি এবং তোমাকে আমার অফিসারদের প্রধান করেছি। আমার প্রতি সহানুভূতিশীলতার ব্যাপারে আমার জ্ঞাতি গোষ্ঠীর মধ্যে তোমা অপেক্ষা বিশ্বাসযোগ্য আর কাউকে পাইনি যারা আমার অছির সহায়তা করবে ও এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে। কিন্তু যখন তুমি দেখেছো যে, তোমার চাচাতো ভাইকে সময় আক্রমণ করেছে, শত্রু তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে, মানুষের বিশ্বাস অবনমিত হয়েছে এবং পুরা সমাজ বিশৃঙ্খল ও বিপথু হয়ে গেছে তখন তুমি আমার প্রতি তোমার পেছন ফিরিয়েছো এবং অন্যদের সাথে তুমি আমাকে ত্যাগ করেছো, অন্যদের সাথে তুমি আমাকে ফেলে গেছো এবং অন্যদের সাথে তুমিও বিশ্বাসঘাতকতা করেছো। এভাবে তুমি তোমার চাচাতো ভাই-এর প্রতি কোন সহানুভূতি প্রদর্শন করনি এবং অছির দায়িত্ব পালন করনি।

এতে মনে হয় তুমি জিহাদের দ্বারা যেন আল্লাহ্র সন্তোষ চাও না এবং তুমি তোমার প্রভুর নিকট হতে প্রাপ্ত সুস্পষ্ট নিদর্শনের ওপর প্রতিষ্ঠিত নও এবং মনে হয় দুনিয়ার আনন্দ উপার্জনের জন্য তুমি এ উম্মার সাথে চালাকি করছো এবং তাদের সম্পদ অন্যায়ভাবে পরিগ্রহ করার জন্য তাদের গাফলতির অপেক্ষায় আছো। যখনই উম্মাহ্র আমানত আত্মসাৎ করার সুযোগ পেয়েছো তখনই তুমি দ্রুতগতিতে তা করেছো এবং দ্রুত লাফিয়ে পড়েছো তাদের বিধবাদের ও এতিমগণের সম্পদ কেড়ে নেয়ার জন্য যেমন করে নেকড়ে একটি আহত ও অসহায় ছাগলকে কেড়ে নিয়ে যায়। তৎপর তুমি মনের সুখে এসব সম্পদ হিজাজে নিয়ে গেছো এবং আত্মসাতের জন্য কোন প্রকার দোষ হয়েছেও মনে করনি। যারা তোমার এ অশুভ কর্মের সহায়ক তাদের প্রতি আল্লাহ্র লানত্। এটা এমন মনে করেছো যেন তোমার পৈত্রিক উত্তরাধিকার সম্পত্তির আয় তোমার পরিবার পরিজনদের প্রেরণ করেছো।

সকল গৌরব আল্লাহ্র। তুমি কি বিচার দিনে বিশ্বাস কর না অথবা হিসাব-নিকাশের ভয় কর না? ওহে, যাকে আমরা হৃদয় আছে বলে হিসাব করি তুমি তাদের একজন। কি করে তুমি খাদ্য-পানীয় গ্রহণ কর যখন তুমি জানতে পার যে, এ খাদ্য-পানীয় হারাম। তুমি ক্রীতদাসী খরিদ করছো, আর নারী বিয়ে করছো; অথচ সে অর্থ হলো এতিমের, দরিদ্রের, বিশ্বাসীদের এবং জিহাদে অংশগ্রহণকারীদের যাদেরকে আল্লাহ্ এ অর্থ ব্যবহারের অধিকার দিয়েছিলেন এবং তাদের মাধ্যমে আল্লাহ্ এসব নগরীকে শক্তিশালী করেছিলেন। আল্লাহ্কে ভয় কর এবং এসব লোককে তাদের সম্পদ ফিরিয়ে দাও। যদি তুমি তা না কর এবং আল্লাহ্ আমাকে তোমার ওপর ক্ষমতা দেন তা'হলে আমি আল্লাহ্র সম্মুখে নিজকে তোমার সম্পর্কে ক্ষমাপ্রাপ্ত করে নেব এবং দোযখে প্রেরণের জন্য অন্যদেরকে যে তরবারি দিয়ে আঘাত করতাম তা দিয়েই তোমাকে আঘাত করবো।

আল্লাহ্র কসম, তুমি যা করেছো তা যদি হাসান ও হুসাইন করতো তাহলে তাদের প্রতিও আমি কোন নমনীয়তা দেখাতাম না এবং তারা কোন পথ খুজে পেতো না যে পর্যন্ত আমি তাদের কাছে থেকে জনগণের অধিকার উদ্ধার না করতাম এবং তাদের অন্যায় কাজ ধ্বংস না করতাম। আমি আল্লাহ্র নামে শপথ করছি, যিনি সকল সৃষ্টির প্রভু, যে সম্পদ তুমি আত্মসাৎ করেছো তা আমি কখনো আমার জন্য হালাল মনে করতাম না এবং আমার উত্তরাধিকারীদের জন্য তা রেখে যেতাম না। তুমি জীবনের শেষ সীমায় এসে গেছো, মনে মনে একটু চিন্তা কর এবং একটুখানি বিবেচনা করে দেখ মাটির নীচে প্রোথিত করলে এসব তোমার সাথে যাবে না। তখন তোমার যা সামনে তুলে ধরা হবে তা দেখে অত্যাচারীগণ চিৎকার দিয়ে বলে, 'আহা, এ দুনিয়ার আকাঙ্খায় যারা সময় নষ্ট করেছে তাদেরকে এখন রক্ষা করার কেউ নেই।

★★★★★

পত্র-৪২

উমর ইবনে আবি সালামাহ্ মখজুমীর[১] প্রতি

আমি নুমান ইবনে আজলান জুরাকীকে তোমার স্থলে বাহ্‌রাইনের গভর্ণর হিসাবে নিয়োগ করলাম। এ নিয়োগ তোমার কোন খারাপ কিছুর জন্য করিনি অথবা তোমার প্রতি কোনরূপ কলঙ্কের কারণে নয়। তুমি গভর্ণরের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছো। সুতরাং আমার কাছে চলে আস। যেহেতু তোমাকে সন্দেহ করা হচ্ছে না, তিরস্কার করা হচ্ছে না, তোমার কোন দোষ বা অপরাধ নেই সেহেতু ভয় পেয়ো না। আমি সিরিয়ার অসন্তুষ্ট লোকদের কাছে যেতে মনস্থ করেছি এবং তোমাকে আমার সাথে নিয়ে যাবার ইচ্ছা পোষণ করেছি। কারণ তুমি হলে তাদের মধ্যে একজন যার ওপর শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধে এবং দ্বীনের স্তম্ভ নির্মানে আস্থা রাখা যায়, ইনশাল্লাহ্।

১। উমর ইবনে আবি সালামাহ্ ছিলেন উম্মুল মোমেনিন উম্মে সালমাহ্‌র গর্ভজাত রাসূল (সঃ)-এর পালক পুত্র। তিনি বাহ্‌রাইনে আমিরুল মোমেনিনের গভর্ণর ছিলেন এবং তার স্থলেই নুমান ইবনে আজলানকে নিয়োগ করেছিলেন।

★★★★★

পত্র-৪৩

আদ্রাশির খুররাহ (ইরান)-এর গভর্ণর মাসকালাহ্ ইবনে হুবায়রাহ্ শায়াবানীর প্রতি

তোমার ব্যাপারে আমি অনেক কিছু জানতে পেরেছি। যদি তুমি তা করে থাক তবে তোমার আল্লাহ্‌কে অসন্তুষ্ট করেছো এবং তোমার ইমামকে অমান্য করেছো। তুমি তোমার আত্মীয়-স্বজন আরব বেদুঈনদের মধ্যে মুসলিমদের সম্পদ বন্টন করে দিচ্ছ যা মুসলিমগণ তাদের তরবারি, ঘোড়া ও রক্তের বিনিময়ে অর্জন করেছিল। আল্লাহ্‌র কসম, যিনি বীজ থেকে অঙ্কুর গজান এবং জীবিত বস্তু নিচয় সৃষ্টি করেছেন, যদি একথা সত্য হয় তবে তুমি হীন-অপদস্থ হবে এবং সমাজে তুমি হালকা হয়ে যাবে। সুতরাং তোমার প্রভুর প্রতি তোমার দায়িত্ব পালন হালকাভাবে নিয়ো না এবং তোমার দ্বীনকে ধ্বংস করে দুনিয়াকে বর্ধিত করো না। এমনটি করলে আমলে ক্ষতিগ্রস্থদের মধ্যে তুমিও একজন হবে। মনে রেখো, যেসব মুসিলম তোমার চারপাশে রয়েছে এবং আমার চারপাশে রয়েছে এ সম্পদে তাদের সকলের অধিকার সমান। সেজন্য তারা আমার কাছে আসে এবং এটা হতে কিছু নিয়ে যায়।

★★★★★

পত্র-৪৪

জিয়াদ ইবনে আবিহ্‌র প্রতি

আমি জানতে পেরেছি যে, মুয়াবিয়া তোমার বুদ্ধিমত্তার দ্বারা প্রতারণা করার জন্য এবং তোমার তীক্ষ্ণতা ভোতা করার জন্য তোমাকে পত্র দিয়েছে। মুয়াবিয়া হতে সাবধান থেকো, কারণ সে প্রকাশ্য শয়তান যে ইমানদারগণের সম্মুখ ও পেছন, ডান ও বাম সকল দিক হতে সমীপবর্তী হয়। সে সর্বদা ওৎ পেতে থাকে যেন অসর্তক মূহুর্তে হঠাৎ করে একজন ইমানদারকে ধরে তার বুদ্ধিমত্তাকে পরাভূত করতে পারে।

উমর ইবনে খাত্তাবের সময়ে আবু সুফিয়ান[১] সর্বদা একটা কথা বলতো যা ছিল শয়তানের কুউপদেশ। তার সে কথায় কখনো জ্ঞাতিত্ব প্রতিষ্ঠিত হতো না এবং উত্তরাধিকারের প্রাপ্যতাও ঘটতো না। যে এতে নির্ভর করবে সে কোন জেয়াফতে আমন্ত্রিত মেহমানের মত, যে খাদ্যের কাছে ঘুর-ঘুর করে।

১। শত্রুকে প্রতিহত করার জন্য খলিফা উমর ইয়েমেনে জিয়াদকে প্রেরণ করেছিলেন। তার দায়িত্ব সমাপ্ত করে যখন সে ফিরে এসেছিল তখন জন সমক্ষে সে একটা বক্তব্য রেখেছিল। আমিরুল মোমেনিন, উমর, আমর ইবনে আস ও আবু সুফিয়ান সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তার বক্তব্যে খুশী হয়ে আমর ইবনে আস বললো, "লোকটি কি ভাল মানুষ! সে যদি কুরাইশ গোত্রের হতো তবে সে তার ছড়ি দ্বারা পুরো আরব দেশ চালাতে পারতো।" এতে আবু সুফিয়ান বললো, "সে কুরাইশ বংশদ্ভূত, কারণ আমি জানি কে তার পিতা।" আমর জিজ্ঞেস করলো, "কে সে ব্যক্তি"। আবু সুফিয়ান বললো, "আমি"। ইতিহাসেও একথা স্বীকৃত যে জিয়াদের মা সুমাইয়া হারিছ ইবনে কালদাহ্‌র ক্রীতদাসী ছিল। উবায়েদ নামক এক কৃতদাসের সাথে তার বিয়ে হয়েছিল। তায়েফের হারাতুল বাঘায়া নামক স্থানের একটি বাসায় সুমাইয়া পতিতার জীবন যাপন করতো। এক দিন আবু সুফিয়ান আবু মারয়াম সালুলির মাধ্যমে সুমাইয়ার সাথে রাত্রি যাপন করেছিল এবং তাতে জিয়াদ জন্ম গ্রহণ করেছিল। আমর এতে জিজ্ঞেস করলো, "তাহলে কেন তুমি তাকে ঘোষণা দিয়ে স্বীকৃতি দিচ্ছ না"? আবু সুফিয়ান উমরকে দেখিয়ে বললো, "উনার ভয়ে, না হয় অবশ্যই স্বীকৃতি দিতাম।" কিন্তু মুয়াবিয়া ক্ষমতা পাওয়ার পর জিয়াদের বুদ্ধিমত্তা ও ছল চাতুরীর প্রয়োজন অনুভব করে তাকে ভাই হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে পত্রালাপ শুরু করেছিল। আমিরুল মোমেনিন একথা জানতে পেরে মুয়াবিয়ার ফাঁদে না পড়ার জন্য তাকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। কিন্তু সে মুয়াবিয়ার ফাঁদে তবুও পড়েছিল এবং মুয়াবিয়া তাকে ভাই বলে ঘোষণা করেছিল। অথচ রাসুল (সঃ) বলেছেন ঃ "ছঙ্গে ছারের পর সন্তান হবে বিধি সম্মত স্বামীর।"

★★★★★

পত্র-৪৫

বসরার গভর্ণর উসমান ইবনে হুনায়েফ জনগণের আমন্ত্রণে ভোজোৎসবে যোগদান করায় তাকে লিখেছিলেন

হে ইবনে হুনায়েফ, আমি জানতে পেরেছি বসরার একজন যুবক তোমাকে একটি ভোজে নিমন্ত্রণ করেছিল এবং তুমি তাতে লাফিয়ে চলে গেছো। তোমার জন্য নানা রকম খাদ্যসামগ্রী তৈরী করা হয়েছিল এবং এসব খাদ্যসামগ্রী বড় বড় থালা ভরে তোমাকে দেয়া হয়েছিল। এ কথা আমি কখনো চিন্তা করিনি যে, তুমি এমন লোকের ভোজ গ্রহণ করবে যে ভিক্ষুকদের ফিরিয়ে দেয় এবং ধনীদের নিমন্ত্রণ করে। যে খাদ্য তুমি গ্রহণ কর তার প্রতি নজর করে দেখো, যাতে তোমার সংশয় হয় তা পরিত্যাগ করো এবং যা হালালভাবে অর্জিত হয়েছে বলে তুমি নিশ্চিত তা গ্রহণ করো।

মনে রেখো, প্রত্যেক অনুসরণকারীর একজন নেতা আছে যাকে সে অনুসরণ করে এবং যার জ্ঞানের ঔজ্জ্বল্য হতে সে আলোক প্রাপ্ত হয়। অনুধাবন করতে চেষ্টা কর, তোমার ইমাম এ দুনিয়াতে দু'টি জীর্ণ পোষাক ও দু'টি রুটিতে তৃপ্ত। নিশ্চয়ই তুমি এরূপ করতে পার না। অন্ততঃপক্ষে আমাকে তাকওয়ায়, প্রচেষ্টায়, সততায় ও ন্যায় পরায়ণতায় সাহায্য কর— সমর্থন কর। কারণ আল্লাহ্‌র কসম, আমি কোন স্বর্ণ সঞ্চয় করিনি, দুনিয়ার কোন সম্পদ স্তূপীকৃত করে রাখিনি এবং দু'টি জীর্ণ পোষাক ছাড়া কোন পোষাক রাখিনি।

অবশ্য, এ আকাশের নীচে আমাদের যা দখলে ছিল তা হলো ফদক। কিন্তু একদল লোক এর জন্য লোভী হয়ে পড়লো এবং অন্য দল তাদেরকে এর থেকে বিরত রাখলো। মোটের ওপর আল্লাহ্ই হলেন সর্বোত্তম

বিচারক। "ফদক"১ অথবা "ফদক নয়" দ্বারা আমি কি করবো। আগামীকাল যখন কবরে চলে যাব তখন এর অন্ধকারে সব হারিয়ে যাবে এবং এর খবরও সেখানে পৌছবে না। এটা একটা গর্ত যদিও এর প্রস্থ বর্ধিত করা হয় এবং খননকারীরা এটা বড় আকারেও যদি করে তবুও মাটি ভেঙ্গে পড়ে এটাকে সংকীর্ণ করে দেবে। আমি নিজকে তাকওয়ায় নিয়োজিত রাখতে চেষ্টা করি যাতে মহাভয়ের দিন শান্তিপূর্ণ হয় এবং পিচ্ছিল স্থানে স্থিরভাবে থাকতে পারি। যদি আমি চাইতাম তবে আমি দুনিয়ার আরাম-আয়েশের পথ বেছে নিতে পারতাম, যেমন— বিশুদ্ধ মধু, উন্নত ময়দা, রেশমী কাপড় ইত্যাদি। কিন্তু যখন আমি ভাবি যে হিজাজ অথবা ইয়ামামার জনগণ রীতিমত দু'টো রুটি পাচ্ছে না এবং পেট ভরে খেতে পাচ্ছে না তখন আমার ভাল খাবার খাওয়ার আর কোন ইচ্ছা বা লোভ থাকে না। যেখানে আমার চতুর্দিকে ক্ষুধার্ত লোক রয়ে গেছে সেখানে কি করে আমি উদরপূর্তি করে ঘুমোতে পারি? অথবা কবি যে কথা বলেছে আমি কি সে রকম হব?

কারো জন্য রোগাক্রান্ত হতে এটাই যথেষ্ট যে, সে তার পেট ভরে শুয়ে থাকে অথচ তার চারদিকে মানুষ শুকনা চামড়া চিবুচ্ছে।

আমি জনগণের দুঃখ-কষ্টের অংশীদার না হয়ে কি করে 'আমিরুল মোমেনিন' উপাধি গ্রহণ করতে পারি? অথবা জীবনের দুঃখ-কষ্টে আমি কি তাদের জন্য একটা উদাহরণ হয়ে থাকব না? আমার নিজকে খাওয়া-দাওয়ায় ব্যস্ত রাখার জন্য আমাকে সৃষ্টি করা হয়নি যেমন করে বাঁধা পশুরা জাবর কাটায় ব্যস্ত আর ছাড়া পশুরা গলাধঃকরণে ব্যস্ত। এরা খাদ্যে এদের উদর ভর্তি করে কিন্তু এর পেছনে কি উদ্দেশ্য তা জানে না। আমি কি মুক্তভাবে চরার জন্য নিয়ন্ত্রণহীন ভাবে থাকবো, অথবা বিপদগামীতার রশি ধরে চলবো অথবা হতবুদ্ধি হয়ে লক্ষ্যহীনভাবে পথে ঘুরে বেড়াবো?

আমি তোমাদের একজনকে বলতে শুনেছি যে, আবি তালিবের পুত্র যেভাবে নগণ্য খাবার গ্রহণ করে এতে সে দুর্বল হয়ে পড়বে এবং শত্রুর মোকাবেলা করতে পারবে না এবং বীরদের সামনে টিকতে পারবে না। মনে রেখো, বনের গাছ তক্তার উপযোগী হয় এবং ফেঁকড়িগুলোর বাকল নরম হয় আবার ঝোপগুলো জ্বালানির জন্য ভাল। আল্লাহ্‌ররাসূলের সাথে আমার সম্পর্ক হলো একটি শাখার সাথে অন্যটির অথবা হাতের সাথে কব্জির সম্পর্ক। আল্লাহ্‌র কসম, সমগ্র আরবদেশের লোক একজোট হয়ে যদি আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসে তবুও আমি পিছিয়ে যাব না এবং যদি আমি সুযোগ পাই তবে তাদের ঘাড়ে ধরে ফেলবো। এ বিকৃত মনের ও অদ্ভুদ দেহের লোকটির হাত হতে পৃথিবীকে মুক্ত করতে আমি নিশ্চয়ই সংগ্রাম করে যাবো। যতক্ষণ পর্যন্ত শস্যকণা হতে মাটি বিদূরিত না হয়।

ওহে দুনিয়া, আমার কাছ থেকে চলে যাও। তোমার রশি তোমার ঘাড়েই থাকুক। কারণ আমি তোমার ফাঁদ হতে নিজকে মুক্ত করে নিয়েছি, তোমার প্রলোভন হতে নিজকে দূরে রেখেছি এবং তোমার পিচ্ছিল পথে চলাফেরা পরিহার করেছি। তোমার কুহক দ্বারা যাদের প্রতারিত করেছো তারা আজ কোথায়? তোমার চাকচিক্য দ্বারা যে সব জনগোষ্ঠিকে প্রলোভিত করেছো তারা আজ কোথায়? তারা সকলেই কবরে বন্দী হয়ে কবরস্থানে গোপন হয়ে আছে। আল্লাহ্‌র কসম, যদি তুমি দৃশ্যমান ব্যক্তিত্ব হতে এবং শরীরি কোন কিছু হতে তবে আমি আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তি তোমাকে দিতাম। কারণ যাদের তুমি কামনা-বাসনার মাধ্যমে গ্রহণ করেছো এবং যে সব জনগোষ্ঠিকে তুমি ধ্বংস প্রাপ্ত করেছো ও দুঃখ-কষ্টের স্থানের দিকে বিতাড়িত করেছো যেখান থেকে তারা পালাতে পারছে না বা ফিরেও আসতে পারছে না। প্রকৃতপক্ষে তোমার পিচ্ছিল পথে যে পা বাড়ায় সে-ই চিৎ হয়ে আছাড় খায়। যে তোমার তরঙ্গে নামে সে ডুবে যায় এবং যে তোমার প্রলোভন এড়িয়ে চলতে পারে সে বাতেন হতে সমর্থন পায়। যে নিজকে তোমার কাছ থেকে নিরপদ রাখতে পারে সে কখনো দুশ্চিন্তা গ্রস্থ হয় না। এমন কি সে যদি মনে করে একদিনের মধ্যেই সে এ পৃথিবী হতে বিদায় নেবে তবুও কোন উদ্বিগ্নতা তাকে স্পর্শ করতে পারে না।

আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাও। কারণ আল্লাহ্র কসম, তুমি আমাকে যতই অপমানিত কর না কেন আমি তোমার কাছে মাথা নত করবো না অথবা আমি লাগাম এত ঢিলা করবো না যাতে তুমি আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে যেতে পার। আমি আল্লাহ্র কসম করে বলছি, আমি নিজকে এভাবে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত করেছি যাতে একটা রুটি, একটু লবণে তৃপ্তি পেয়ে থাকি, ইনশাল্লাহ্। আমি আমার চক্ষুকে অশ্রুশূন্য করে ফেলেছি সেই স্রোতস্বিনীর মত যা শুকিয়ে গেছে। আলীর যাকিছু আছে সবই কি সে খেয়ে ফেলবে এবং ঘুমিয়ে থাকবে যেমন করে গরুর পাল চারণভূমি দেখে উদরপূর্তি করে শুয়ে পড়ে অথবা ছাগলের পালের মত যারা সবুজ ঘাস চরে খেয়ে খোয়াড়ে ফিরে যায়। আলীর চক্ষুদ্বয় মরে যাবে যদি এ দীর্ঘদিন পর সে চরে খাওয়া পশুদের অনুসরণ করে।

সেব্যক্তি রহমত প্রাপ্ত যে আল্লাহ্র প্রতি তার দায়িত্ব পালন করে এবং দুঃখ-কষ্টে ধৈর্য ধারণ করে ও রাত্রিকালে নিদ্রাহীন অবস্থায় কাটায়। কিন্তু নিদ্রা যখন তাকে পরাভূত করে তখন সে মাটিতে শুয়ে পড়ে এবং তার বাহুকে বালিশ হিসাবে ব্যবহার করে। সে তাদের সঙ্গে থাকে যারা বিচার দিনের ভয়ে জাগরিতভাবে চক্ষুকে রাখে, যাদের দেহ বিছানা হতে দূরে থাকে, যাদের ঠোঁট আল্লাহ্র জেকেরে বিড়বিড় করে এবং যাদের পাপ ক্ষমার জন্য দীর্ঘকালের কাকুতি মিনতির ফলে মুছে ফেলা হয়েছে। "তারা আল্লাহ্র দল, এটা জানা থাকুক আর না থাকুক, নিশ্চয়ই, শুধুমাত্র আল্লাহ্র দলই কৃতকার্য হবে (কুরআন—৫৮ ঃ ২২)। সুতরাং হে ইবনে হুনায়েফ, আল্লাহ্কে ভয় কর এবং তোমার নিজের রুটিতে তৃপ্ত থাক যাতে দোযখ হতে রক্ষা পেতে পার।

১। ফদক মদিনার নিকটবর্তী হিজাজের একটি সবুজ উর্বর গ্রাম এবং ইহা শমরুখ নামক দুর্গ দ্বারা সংরক্ষিত স্থান ছিল (হামাবী[১৫৮], ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২৩৮; বুখারী[১০২], ৩য় খণ্ড , পৃঃ ১০১৫; সামহুদী[১৪২], ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১২৮০)। ফদক ইহুদীদের দখলে ছিল। ৭ম হিজরীতে এক শান্তিচুক্তির ফলে ফদকের মালিকানা রাসুলের (সঃ) নিকট চলে যায়। এ চুক্তির মূল কারণ হলো খায়বার দুর্গের পতনের পর ইহুদীগণ মুসলিম শক্তি অনুধাবন করতে পেরেছে এবং তাদের মনোবল ভেঙ্গে গিয়েছিল। তদুপরি কিছু সংখ্যক ইহুদী আশ্রয় প্রার্থনা করায় রাসুল (সঃ) তাদের ছেড়ে দিয়েছেন। তারা একটা শান্তি প্রস্তাব·পেশ করেছিল যে, ফদক নিয়ে গিয়ে তাদের অবশিষ্ট এলাকায় কোন যুদ্ধ না করার জন্য। ফলে রাসুল (সঃ) তাদের প্রস্তাব গ্রহণ করলেন এবং তাদের জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করলেন। এ ফদক তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হলো এবং এতে অন্য কারো কোন স্বার্থ-স্বামীত্ব ছিল না। এতে কারো কোন স্বার্থ থাকতেও পারে না। কারণ জিহাদে অর্জিত গণিমতের মালে মুসিলমদের অংশ ছিল। যেহেতু এ সম্পত্তি বিনা জিহাদে পাওয়া গেছে তাই এটাকে 'ফায়' বলা হতো এবং রাসুল (সঃ) একাই এর মালিক ছিলেন। এতে অন্য কারো কোন অংশ ছিল না। তাই আল্লাহ্ বলেন ঃ

> *আল্লাহ্ ইহুদীগণের নিকট হতে তাঁর রাসুলকে যে ফায় দিয়েছেন তার জন্য তোমারা অশ্ব কিংবা উটে আরোহণ করে যুদ্ধ করনি। আল্লাহ্ যার ওপর ইচ্ছা তাঁর রাসুলের কর্তৃত্ব দান করেন (কুরআন—৫৯ঃ৬)।*

কোন প্রকার যুদ্ধ ছাড়া ফদক অর্জিত হয়েছে এ বিষয়ে কারো কোন দ্বিমত নেই। সুতরাং এটা রাসুলের ব্যক্তিগত সম্পদ ছিল এবং এতে কারো কোন অধিকার ছিল না। ঐতিহাসিকগণ লিখেছন ঃ

> *যেহেতু মুসলিমগণ তাদের ঘোড়া ও উট ব্যবহার করে নাই সেহেতু ফদক রাসুলের ব্যক্তিগত সম্পদ ছিল (তাবারী[৭৫], ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৫৮২ - ১৫৮৩; আছীর[২], ২য় খন্ড, পৃঃ ২২৪-২২৫; হিশাম[১৬৯], ৩য় খন্ড, পৃঃ ৩৬৮; খালদুন[৫৪], ২য় খন্ড, পৃঃ ৪০; বাকরী [৯০], ২য় খন্ড, পৃঃ ৫৮; শাফী[১৩৩], ৩য় খন্ড, পৃঃ ৫০; বালাজুরী [৯৯], ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৩)।*

উমর ইবনে খাত্তাবও মনে করতেন যে ফদক রাসুলের (সঃ) অংশীদারবিহীন সম্পত্তি। তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে, আল্লাহ্ তাঁর রাসুলকে যা দিয়েছিলেন বনি নজিরের সম্পত্তিও উহার অন্তর্ভুক্ত। ইহাতে কারো ঘোড়া বা উট ব্যবহৃত হয়নি। তাই ইহা আল্লাহ্র রাসুলের ব্যক্তিগত সম্পদ (বুখারী[১০২], ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৪৬; ৭ম খন্ড, পৃঃ ৮২; ৯ম খণ্ড , পৃঃ ১২১- ১২২; নায়সাবুরী[৮২], ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১৫১; আশাছ[১৮], ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৩৯-১৪১; নাসাঈ[৮৫], ৭ম খণ্ড, পৃঃ ১৩২; হাম্বল[১৬০], ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৫, ৪৮, ৬০, ২০৮; শাফী[১২৫], ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২৯৬- ২৯৯)।

বিশ্বস্ত সূত্রে ইহা সর্ব সম্মতভাবে স্বীকৃত যে, রাসুল (সঃ) তাঁর জীবদ্দশাতেই উক্ত ফদক তাঁর প্রাণপ্রিয় কন্যা ফাতিমাকে দান করেছিলেন। আল-বাজ্জার, আবু ইয়ালা, ইবনে আবি হাতিম, ইবনে মারদুওয়াই ও অন্যান্য অনেকে আবু সায়েদ খুদরী ও আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের বরাত দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, যখন কুরআনের আয়াত- "নিকটবর্তী আত্মীয় পরিজনকে তাদের প্রাপ্য দিয়ে দাও" (১৭ঃ২৬)-নাজিল হয়েছিল তখন রাসুল (সঃ) ফাতিমাকে ডেকে এনে তাঁকে ফদক দান করে দিয়েছিলেন। (শাফী[১২১], ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১৭৭; শাফী[১২৮], ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৪৬; হিন্দি[১৬৭], ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪৯৩; শাফী[১৩২], ১৫শ খণ্ড, পৃঃ ৬২)।

আবু বকর যখন ক্ষমতা দখল করেছিল তখন ফাতিমাকে বঞ্চিত ও দখলচ্যুত করে তিনি ফদক রাষ্ট্রায়ত্ব করেছিলেন। ঐতিহাসিকগণ লিখেছে ঃ

নিশ্চয়ই, আবু বকর ফাতিমার কাছ থেকে ফদক কেড়ে নিয়েছেন (হাদীদ[১৫২], ১৬শ খণ্ড, পৃঃ ২১৯; সামহুদী [১৪২], ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১০০০; হায়তামী [১৬৬], পৃঃ ৩২)।

আবু বকরের এহেন কাজে ফাতিমা সোচ্চার হয়ে উঠলেন এবং তিনি প্রতিবাদ করে বললেন, "রাসুল (সঃ) তাঁর জীবদ্দশায় আমাকে ফদক দান করে গিয়েছিলেন অথচ আপনি উহার দখল নিয়ে নিয়েছেন।" এতে আবু বকর সাক্ষী উপস্থাপন করার জন্য বললেন। ফলে, আমিরুল মোমেনিন ও উম্মে আয়মন ফাতিমার পক্ষে সাক্ষ্য দিলেন। এখানে উল্লেখ্য যে, উম্মে আয়মন রাসুলের (সঃ) একজন মুক্তিপ্রাপ্ত দাসী ছিলেন। তিনি উসামা ইবনে জায়েদ ইবনে আল-হারিছাহ্‌র মাতা ছিলেন। রাসুল করিম (সঃ) প্রায়ই বলতেন, "আমার মাতার মৃত্যুর পরে উম্মে আয়মন আমার মাতা।" রাসুল (সঃ) তাঁকে বেহেশতবাসীদের একজন বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। (নায়সাবুরী[৮৪], ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৬৩; তাবারী[৭৫], ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৪৬০; বার[৯৭], ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১৭৯৩; আছীর[১], ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৫৬৭; সাদ[১৩৭], ৮ম খণ্ড, পৃঃ ১৯২ ; হাজর[১৫০], ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৪৩২)।

কিন্তু আবু বকর এ সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয় বলে ফাতিমার দাবী নাকচ করে দিয়েছিলেন। এ সম্বন্ধে বালাজুরী লিখেছেন ঃ

ফাতিমা আবু বকরকে বলেছিলেন, আল্লাহ্‌র রাসুল ফদক আলাদা করে আমাকে দিয়েছিলেন। সুতরাং আপনি আমাকে উহা ফেরত দিন। এতে আবু বকর তাঁকে বললেন তিনি যেন উম্মে আয়মন ছাড়া আরো একজন সাক্ষী হাজির করেন। আবু বকর আরো বললেন, হে রাসুলের কন্যা, আপনি জানেন যে, দু'জন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দুজন মহিলা ছাড়া সাক্ষ্য গ্রহণীয় হয় না।

এ সব ঘটনার পর একথা অস্বীকার করার কোন উপায় থাকে না যে, ফদক রাসুলের (সঃ) ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল এবং তাঁর জীবদ্দশায় তিনি উহার দখল ফাতিমার হাতে তুলে দিয়ে তাঁকে উহা দান করে দিয়েছিলেন। কিন্তু আবু বকর তাঁকে বেদখল করে ফদক নিয়ে নিয়েছিলেন। এ ব্যাপারে তিনি আলী ও উম্মে আয়মনের সাক্ষ্য বাতিল করে দিয়েছিলেন। এ বাতিলের ক্ষেত্র হিসাবে তিনি উল্লেখ করলেন যে, একজন পুরুষ ও একজন মহিলার সাক্ষ্য পরিপূর্ণ সাক্ষ্য হয় না। এছাড়াও ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইন ফাতিমার বক্তব্যের সপক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। কিন্তু পিতামাতার স্বপক্ষে সন্তানের সাক্ষ্য এবং নাবালকের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয় উল্লেখ করে আবু বকর তা বাতিল করে দিয়েছিলেন। তৎপর রাসুলের (সঃ) গোলাম রাবাহ্‌কে সাক্ষী হিসাবে উপস্থাপন করা হয়েছিল কিন্তু তাকেও প্রত্যাখান করা হলো (বালাজুরী[৯৯], ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৫; ইয়াকুবী[২৮], ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৯৫; মাসুদী[১০৯], ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৩৭; আশকারী[১৯]; পৃঃ ২০৯; সামহুদী[১৪২], ৩য় খন্ড, পৃঃ ৯৯৯-১০০১; হামাবী[১৫৮], ৪খন্ড, পৃঃ ২৩৯; হাদীদ[১৫২], ১৬শ খণ্ড, পৃঃ ২১৬-২২০ ও ২৭৪; হাজম[১৪৯], ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৫০৭; শাফী [১৩৩], ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৬১; রাজী[১১৭], ২৯তম খণ্ড, পৃঃ ২৮৪)।

এ পর্যায়ে একটি বিষয় বিবেচনার দাবী রাখে— তা হলো এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, ফদক ফাতিমার দখলে ছিল এবং আমিরুল মোমেনিন ও তাঁর পত্রে উল্লেখ করেছেন, "ফদক আমাদের দখলে ছিল।" এ ক্ষেত্রে সাক্ষী উপস্থাপন করতে বলাটা কোন অর্থবহ কথা নয়; এটা জুলুম করে অন্যের সম্পত্তি দখল করার তালবাহানা মাত্র। কারণ যার দখলে আছে তার সাক্ষী উপস্থাপন করার কোন প্রয়োজন নেই— বরং যে দখলকারীকে উচ্ছেদ করতে চায় তার দাবীর জন্যই সাক্ষীর প্রয়োজন। কাজেই ফাতিমার সম্পত্তি দখল করার জন্য আবু বকরের সাক্ষী উপস্থাপন করা আইন সিদ্ধ ছিল। যেহেতু আবু বকর এমন

কোন প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারেননি সেহেতু ফদকে ফাতিমার মালিকানাই আইনের দৃষ্টিতে সঠিক। কাজেই আরো সাক্ষী বা প্রমাণ হাজির করার জন্য তাকে বলাটা অন্যায় বই কিছু নয়।

এটা একটা অবাক করা বিষয় যে, আবু বকরের কাছে অনেকেই একই ধরণের অনেক দাবী পেশ করেছিল। তিনি কোন সাক্ষী প্রমাণের প্রশ্ন না তুলেই দাবীদারকে তাদের দাবীকৃত সম্পত্তি দিয়েছিলেন। অথচ ফাতিমার বেলায় তিনি এসব তালবাহানা করে তাঁদেরকে দুঃখ-কষ্টে নিপতিত করেছিলেন। এ বিষয়ে হাদীসবেত্তাগণ লিখেছেন ঃ

জাবির ইবনে আবদিল্লাহ্ আনসারী হতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্র রাসুল বলেছেন যে, যখন বাহরাইন হতে যুদ্ধ লব্ধ মাল পৌছবে তখন জাবির অমুক অমুক জিনিসগুলো পাবে। কিন্তু রাসুলের ওফাতের পূর্বে সে মাল এসে পৌছায়নি। আবু বকরের খেলাফত কালে উহা মদিনায় পৌছালে জাবির আবু বকরের কাছে গিয়েছিল। তখন আবু বকর ঘোষণা করলো যে, রাসুলের বিরুদ্ধে যাদের কোন দাবী-দাওয়া আছে অথবা রাসুল যদি কাউকে কোন প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকেন সে যেন তার দাবী নিয়ে আসে। এতে জাবির বললো, রাসুল (সঃ) আমাকে অমুক অমুক মালগুলো দেয়ার কথা বলেছিলেন। আবু বকর বাহরাইনের যুদ্ধলব্ধ মাল হতে জাবিরকে তা দিয়েছিলেন (বুখারী[১০২], ৩য় খন্ড, পৃঃ ১১৯, ২০৯, ২৩৬; ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১১০; ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২১৮; নায়সাবুরী[৮৩], ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৭৫-৭৬; তিরমিজী[৮০], ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১২৯; হাম্বল[১৬০], ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩০৭- ৩০৮; সাদ[১৩৭], ২য় খণ্ড, পৃঃ ৮৮-৮৯)।

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় আসকালানী (হিঃ ৭৭৩/ ১৩৭২ - ৮৫২/১৪৪৯) এবং হানাফী (৭৬২/ ১৩৬১ - ৮৮৫/ ১৪৫১) লিখেছেন ঃ

এ হাদীস হতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, শুধুমাত্র একজন সাহাবির সাক্ষ্য পূর্ণ সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করা জায়েজ—এমন কি যদি সে সাক্ষ্য তার নিজের স্বার্থ রক্ষা করার জন্যও হয়। কারণ আবু বকর জাবিরকে তার দাবীর স্বপক্ষে কোন সাক্ষী হাজির করতে বলেননি (আসকালানী[২২], ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩৮০; হানাফী[১৫৫], ১২শ খণ্ড, পৃঃ ১২১)।

এখন প্রশ্ন হলো কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত না করেই যখন জাবিরের দাবীকৃত সম্পদ তাকে দেয়া হয়েছে তখন ফাতিমার দাবীকৃত সম্পত্তি একইভাবে ফেরত দিতে কিসে আবু বকরকে বাধা দিয়েছিল? জাবিরের প্রতি তার যদি এমন ধারণা হয়ে থাকে যে, সে মিথ্যা বলে স্বীয় স্বার্থ উদ্ধার করবে না; তবে ফাতিমার প্রতি তার এ ধারণা হতে কিসে তাকে বাধাগ্রস্থ করেছে যে, ফাতিমা এক টুকরা জমির জন্য রাসুল করিম (সঃ) সম্বন্ধে মিথ্যা বলতে পারে না। ফাতিমার সর্বজন স্বীকৃত সত্যবাদীতা ও সততাই তো তাঁর দাবীর সত্যতা সম্পর্কে যথেষ্ট ছিল। তবু আবু বকরের সন্তুষ্টির জন্য তিনি আলী ও উম্মে আয়মনের মত সম্মানিত সাক্ষী উপস্থিত করেছিলেন। একথা বলা হয়ে থাকে কুরআনের নিম্নের আয়াতের নীতির অনুসরণে ফাতিমার দাবী প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল ঃ

দু'জন পুরুষ সাক্ষী রাখবে; দু'জন পুরুষ সাক্ষী পাওয়া না গেলে একজন পুরুষ ও দু'জন নারী সাক্ষী রাখবে। (কুরআন ২ঃ ২৮২)

কুরআনের উক্ত নীতি যদি সর্বক্ষেত্রে সার্বজনীন হয়ে থাকে তবে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই হইার প্রয়োগ থাকবে। কিন্তু একদিন একজন আরববাসী রাসুলের সাথে একটি উট নিয়ে বিরোধ করে। এতে খুজায়মা ইবনে ছাবিত আনসারী রাসুলের পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করলেন। এই একজনের সাক্ষকে দু'জন সাক্ষীর সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছিল। কারণ তার সততা ও সত্যবাদীতা সম্পর্কে কারো কোন প্রকার সংশয় ছিল না। এ কারণেই রাসুল (সঃ) তাকে "জুশ শাহাদাতাইন" (দু'জন সাক্ষীর সমান) উপাধীতে ভূষিত করেছিলেন (বুখারী,[১০২] ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ২৪; ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১৪৬; তায়ালিসী[৭৮], ৩য় খন্ড, পৃঃ ৩০৮; নাসাঈ[৮৫], ৭ম খন্ড, পৃঃ ৩০২; হাম্বল [১৬০], ৫ম খন্ড, পৃঃ ১৮৮, ১৮৯, ২১৬; বার [৯৭], ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৪৮; আছীর[১], ২য় খণ্ড, পৃঃ ১১৪; সানানী [১৩৯], ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৩৬৬-৩৬৮)।

ফলতঃ এ ব্যবস্থার কারণে আয়াতটির সাধারণত্ব প্রভাবিত হয়নি বা এটা সাক্ষ্য সংক্রান্ত বিধানের বিপরীত কিছু নয়। সুতরাং রাসুলের মতানুসারে সত্যবাদিতা গুণের জন্য একজন সাক্ষীকে দু'জন সাক্ষীর সমান ধরে নেয়া হয়ে থাকে। তাহলে ফাতিমার পক্ষে আলী ও উম্মে আয়মনের সাক্ষ কি তাদের নৈতিক মহত্ব ও সত্যবাদিতার জন্য যথেষ্ট ছিল না? এছাড়া, উক্ত

আয়াতে এ দু'পথ ছাড়া দাবী প্রতিষ্ঠিত করার আর কোন পথ উল্লেখ করা হয়নি। এ বিষয়ে কাজী নুরুল্লা মারআশী (৯৫৬/ ১৫৪৯ - ১০১৯ / ১৬১০) লিখেছেন ঃ

উম্মে আয়মনের সাক্ষ্য অসম্পূর্ণ বলে যারা প্রত্যাখ্যান করেছেন তারা প্রকৃত পক্ষে ভুল করেছেন। কারণ কোন কোন হাদীসে দেখা যায় একজন সাক্ষীর ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত প্রদান করা বৈধ এবং তাতে কুরআনের নির্দেশ ভঙ্গ হয়েছে বলে মনে করা হয়নি। কারণ এ আয়াতের গুঢ়ার্থ হলো দু'জন পুরুষ সাক্ষী অথবা একজন পুরুষ ও দু'জন নারী সাক্ষীর ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে এবং তাদের সাক্ষ্যই যথেষ্ট। এ কথা দ্বারা এটা বুঝায় না যে, যদি সাক্ষীর সাক্ষ্য ছাড়া অন্য কোন ক্ষেত্র থেকে থাকে তা গ্রহণীয় হবে না এবং সে ভিত্তিতে রায় দেয়া যাবে না - এটাই হচ্ছে আয়াতটির মূলভাব। কোন কিছুর ভাবার্থ চূড়ান্ত যুক্তি নয়। তাই এ ভাবার্থও গ্রাহ্য করা যায় না। বিশেষ করে হাদীস এর বিপরীত ভাব ব্যক্ত করেছে। এ ভাবার্থকে এড়িয়ে গেলে তা আয়াত অমান্য করা বুঝায় না। দ্বিতীয়ত ঃ আয়াতটি দুটি বিষয়ের যে কোনটি বেছে নেয়ার অনুমতি দিয়েছে। তা হলো দু'জন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দু'জন নারী। যদি হাদীস দ্বারা তৃতীয় একটি বিষয় বেছে নেয়ার জন্য যোগ করা হয় তবে তাতে কি করে কুরআনের আয়াত লঙ্ঘিত হয়েছে বলা যাবে? যাহোক এতে বুঝা যাচ্ছে যে, দাবীদার দু'জন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দু'জন নারী সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত করতে বাধ্য নয় কারণ যদি কোন দাবীতে কোন সাক্ষী না থেকে থাকে তাহলে আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বললেই তার দাবী আইনসিদ্ধ হবে এবং তার অনুকূলে সিদ্ধান্ত দেয়া যাবে। এতদসংক্রান্ত বিষয়ে ১২ জনের অধিক সাহাবা বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র রাসুল শপথ গ্রহণ পূর্বক একজন সাক্ষীর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন।

রাসুলের (সঃ) কতিপয় সাহাবা ও জুরিসপ্রুডেন্সের কতিপয় পণ্ডিত ব্যক্তি ব্যাখ্যা করেছেন যে, এ সিদ্ধান্ত বিশেষভাবে অধিকার, সম্পদ ও লেনদেনের সাথে সম্পৃক্ত এবং এ সিদ্ধান্ত আবু বকর, উমর, উসমান খলিফাত্রয়ও মেনে চলতেন (নায়সাবুরী [৮৩], ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১২৮; তায়ালিসী[৭৮], ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩০৮ - ৩০৯; তিরমিজী[৮০], ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৬২৭ -৬২৯; মাযাহ্ [১০৫], ২য় খণ্ড, পৃঃ ৭৯৩; হাম্বল [৬০], ১ম খণ্ড , পৃঃ ২৪৮, ৩১৫, ৩২৩; ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩০৫; ৫ম খণ্ড ২৮৫; আনাস [৬], ২য় খণ্ড, পৃঃ ৭২১-৭২৫; শাফী [১২৫], ১০ম খণ্ড, পৃঃ ১৬৭-১৭৬; কুত্নি[৪৯], ৪র্থ খণ্ড, পৃ ঃ ২১২-২১৫; শাফী [১২৮], ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২০২; হিন্দি[১৬৭], ৭ম খণ্ড, পৃঃ ১৩)।

যেখানে শপথ করে সাক্ষ্য দিলে একজন সাক্ষীর ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত দেয়ার বিধান রয়েছে সেক্ষেত্রে যেহেতু আবু বকরের দৃষ্টিতে ফাতিমার উপস্থাপিত সাক্ষী অসম্পূর্ণ ছিল সেহেতু তিনি ফাতিমার শপথ নিয়ে তাঁর অনুকূলে রায় দিতে পারতেন। কিন্তু এখানে মূল উদ্দেশ্যই ছিল ফাতিমাকে বঞ্চিত করে আলী পরিবারকে অভাব অনটনে নিপতিত করা এবং ফাতিমার সত্যবাদিতাকে কলঙ্কিত করা যাতে করে ভবিষ্যতে তাঁর প্রশংসা চাপা পড়ে যায়।

যাহোক যখন রাসুলের দানের ভিত্তিতে ফাতিমার দাবী এসব তালবাহানা করে বাতিল করে দেয়া হয়েছিল তখন তিনি দাবী করলেন যে, রাসুলের উত্তরাধিকারিণী হিসাবে তিনিই ফদকের মালিক। এ বিষয়ে ফাতিমা বলেছিলেন ঃ

যদিও আপনি রাসুলের দানকে অস্বীকার করছেন, কিন্তু ফদক ও খাইবারের রাজস্ব এবং মদিনার কাছে কিছু জমি যে রাসুলের ব্যক্তিগত সম্পত্তি একথা অস্বীকার করতে পারবেন না। কাজেই আমিই রাসুলের একমাত্র উত্তরাধিকারিণী। কিন্তু আবু বকর নিজেই একটি হাদীস ব্যক্ত করে ফাতিমার উত্তরাধিকারিত্ব অস্বীকার করলেন। তিনি বললেন রাসুল বলেছেন, "আমরা নবীগণের কোন উত্তরাধিকারী নেই; আমরা যা কিছু রেখে যাই উহার সবই যাকাত হিসাবে বায়তুল মাল"।

(বুখারী[১০২], ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৯৬; ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২৫, ২৬, ১১৫, ১১৭; ৮ম খণ্ড, পৃ ঃ ১৮৫; নায়সাবুরী [৮৩], ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১৫৩- ১৫৫; তিরমিজী [৮০], ৪র্থ খণ্ড পৃঃ ১৫৭- ১৫৮; তায়ালিসী [৭৮], ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৪২- ১৪৩; নাসাঈ [৮৫], ৭ম খণ্ড, পৃঃ ১৩২; হাম্বল [১৬০], ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৪, ৬, ৯, ১০; শাফী [১২৫], ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩০০; সাদ[১৩৭] ২য় খণ্ড, পৃঃ ৮৬-৮৭; তাবারী[৭৫], ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৮২৫; বাকরী [৯০], ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৭৩- ১৭৪)।

আবু বকর ছাড়া রাসুলের এহেন উক্তি আর কারো জানা ছিল না। এমন কি সাহাবাদের মধ্যে আর কেউ এমন কথা শুনেনি। জালালুদ্দিন আবদার রহমান সুয়ুতী (৮৪৯/ ১৪৪৫- ৯১১/ ১৫০৫) এবং শিহাবুদ্দিন ইবনে হাজর হায়তামী (৯০৯/ ১৫০৪- ৯৭৪/ ১৫৬৭) লিখেছেন ঃ

> *রাসুলের (সঃ) মৃত্যুর পর তাঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিয়ে মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল। আবু বকর বলেছিলেন যে, রাসুল (সঃ) নাকি তাকে বলেছিলেন, "আমরা নবীগণের কোন উত্তরাধিকারী নেই এবং আমরা যা কিছু রেখে যাই সবই যাকাত হয়ে যায়।" এ বিষয়ে অন্য কেউ কোন কিছুই জ্ঞাত ছিলেন না (সুয়ুতী[১৪৭], পৃঃ ৭৩; হায়তামী [১৬৬], পৃঃ ১৯১)।*

কোন বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন হৃদয় এ কথা বিশ্বাস করতে পারবে না যে, যারা রাসুলের ওয়ারিশ ছিলেন তাদের কাউকে কিছু না বলে তৃতীয় ব্যক্তির নিকট বলে গেছেন যে তাঁর কোন উত্তরাধিকারী নেই এবং সব চাইতে বিস্ময়কর হলো এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সম্বন্ধে সাহাবাগণ অবহিত ছিলেন না। আর এটা তখনই প্রকাশ করা হলো যখন ফাতিমা ফদক ফেরত দেয়ার জন্য দাবী করলেন যাতে আবু বকর ছিলেন বিরোধী পক্ষ। এ অবস্থায় তার নিজের অনুকূলে এমন এক হাদীস বর্ণনা করলেন যা আর কারো জানা ছিল না। কিভাবে এ হাদীসটি গ্রহণীয় হতে পারে। যদি একথা বলা হয় যে, আবু বকরের মহৎ মর্যাদার কারণে এ হাদীসটি নির্ভরযোগ্য তাহলে ফাতিমার সত্যবাদীতা, সততা ও মহৎ মর্যাদার কারণে কেন রাসুলের দান সংক্রান্ত তাঁর দাবী বিশ্বাস করা হলো না? তদুপরি আমিরুল মোমেনিন ও উম্মে আয়মনের সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। যদি ফাতিমার দাবীর জন্য আরো সাক্ষীর প্রয়োজনীয়তা থেকে থাকে তা হলে এ হাদীসটি প্রমাণের জন্যও অবশ্যই সাক্ষীর প্রয়োজন রয়েছে। কারণ এ হাদীস উত্তরাধিকার সংক্রান্ত কুরআনের সাধারণ নির্দেশের পরিপন্থী। নবীদের উত্তরাধিকার সম্বন্ধে কুরআনে বর্ণিত হয়েছেঃ

> *এবং সোলায়মান ছিল দাউদের উত্তরাধিকারী (২৭ ঃ ১৬)। সুতরাং তোমরা নিজের থেকে আমাকে একজন উত্তরাধিকারী দাও যে আমার উত্তরাধিকারী হবে এবং ইয়াকুবের পরিবারের উত্তরাধিকারী হবে- বললেন জাকারিয়া (১৯ঃ ৫ - ৬)।*

উপরোক্ত আয়তগুলোতে ভৌত সম্পদের উত্তরাধিকারকেই বুঝানো হয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন এসব আয়াতে নবুয়তের জ্ঞানের উত্তরাধিকারকে বুঝানো হয়েছে। এটা একটা অসাড় যুক্তি এবং বাস্তব বিবর্জিত কথা। কারণ নবীদের জ্ঞান উত্তরাধিকারের বস্তু হতে পারে না এবং এটা উত্তরাধিকারের মাধ্যমে হস্তান্তরযোগ্য নয়। এমনটি হলে সকল নবীর বংশধরগণ নবী হতেন। সেক্ষেত্রে কোন কোন নবীর পুত্র নবী হয়েছিলেন এবং অন্যরা এটা হতে বঞ্চিত হয়েছে— এরূপ ব্যবধানের কোন অর্থ থাকতো না। নূরুদ্দিন ইবনে ইব্রাহিম হালাবী (৯৭৫/ ১৫৬৭ - ১০৪৪/ ১৬৩৫) তাঁর গ্রন্থে শামসুদ্দিন ইউছুফ হানাফীর (৫৮১/ ১১৮৫- ৬৫৪/ ১২৫৬) উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন!

> *আবু বকর একদিন মিম্বারে বসা ছিলেন। এমন সময় ফাতিমা তার কাছে এসে বললেন, "হে আবু বকর, কুরআন আপনার কন্যাকে অপনার উত্তরাধিকারী করেছে অথচ আপনি আমাকে আমার পিতার উত্তরাধিকারী হতে বঞ্চিত করেছেন।" একথা শুনা মাত্রই আবু বকর কাঁদতে কাঁদতে মিম্বার হতে নেমে পড়লেন। তৎপর তিনি ফাতিমার অনুকূলে ফদক লিখে দিলেন। এ সময় উমর সেখানে উপস্থিত হয়ে উহা কি জানতে চাইলেন। প্রত্যুত্তরে আবু বকর বললেন, "এটা একটা দলিল যাতে আমি লিখে দিয়েছি যে, ফাতিমা তাঁর পিতার উত্তরাধিকারিণী।" উমর বললো, "তুমি দেখতেছো আরবগণ তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে যাচ্ছে, সেক্ষেত্রে এ দলিল দিলে মুসলিমদের জন্য কোথা হতে তুমি ব্যয় করবে।" তৎপর উমর ফাতিমার হাত হতে দলিল খানা নিয়ে ছিঁড়ে ফেললেন (শাফী [১৩৩], ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৬১- ৩৬২)।*

একটু চিন্তা করলেই বুঝা যায় হাদীসটি ছিল ভুল এবং ফাতিমাকে ফদক ও রাসুলের (সঃ) অন্যান্য সম্পত্তি হতে বঞ্চিত করার জন্যই এ হাদীস উদ্ভাবন করা হয়েছে। ফলে ফাতিমা এসব তালবাহানার জন্য আবু বকর ও উমরের উপর তাঁর রাগের বহিঃপ্রকাশ হিসাবে অছিয়ত করে দিলেন যে, এ দু'জন যেন তাঁর জানাযায় অংশ গ্রহণ না করে। আয়শা বর্ণনা করেছেন ঃ

রাসুলের (সঃ) দেহত্যাগের পর আবু বকর যখন খলিফা হলেন তখন ফাতিমা রাসুল (সঃ) কর্তৃক তাজ্যবৃত্ত—ফদক এবং মদীনা ও খাইবারের এক পঞ্চমাংশ বার্ষিক আয়ের উত্তরাধিকার দাবী করলেন। আবু বকর ফাতিমাকে এর কোন কিছু দিতে রাজী হলেন না। তখন হতে ফাতিমা আবু বকরের উপর রাগান্বিত ছিলেন এবং তাকে পরিত্যাগ করলেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত কখনো আবু বকরের সাথে কথা বলেন নি। যখন তিনি ইনতিকাল করলেন তখন তাঁর স্বামী আলী ইবনে আবি তালিব রাত্রিকালে তাঁকে দাফন করলেন। তিনি আবু বকরকে ফাতিমার মৃত্যুর খবর দেন নি এবং জানাযা করার জন্যও ডাকেননি (বুখারী [১০২], ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১৭৭; ৮ম খণ্ড, পৃঃ ১৮৫; নায়সাবুরী [৮৩], ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১৫৩- ১৫৫; শাফী[১২৫], ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২৯; ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩০০ - ৩০১; সাদ [১৩৭], ২য় খণ্ড , পৃঃ ৮৬; হাম্বল[১৬০], ১ম খণ্ড, পৃঃ ৯; তাবারী [৭৫], ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৮২৫; কাছীর [৩৯], ৫ম খণ্ড, ২৮৫- ২৮৬; হাদীদ [১৫২], ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৪৬; সামহুদী [১৪২], ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৯৯৫)।

এ সম্পর্কে মুহাম্মদ ইবনে জাফরের কন্যা উম্মে জাফর হতে বর্ণিত আছে যে, ফাতিমা আসমা বিনতে উমায়েসকে অনুরোধ করেছিলেন, "আমি মৃত্যুবরণ করলে তুমি ও আলী আমাকে গোসল করাবে এবং আমার ঘরে প্রবেশ করে কাউকে আমার কাছে যেতে দিয়ো না।" যখন ফাতিমা মৃত্যুবরণ করলেন তখন আয়শা তার ঘরে ঢুকতে চাইলো কিন্তু আসমা বললেন. "ঘরে ঢুকবেন না।" এতে আয়শা রাগান্বিত হয়ে তার পিতা আবু বকরের নিকট অভিযোগ করে বললেন, "এ খাছামিয়্যা (কাছাম গোত্রের মহিলা অর্থাৎ আসমা) আমাদের ও আল্লাহ্র রাসুলের কন্যার মধ্যে নাক গলায়।" এতে আবু বকর এসে দুয়ারে দাঁড়িয়ে বললেন, "হে আসমা, রাসুলের স্ত্রীকে তাঁর কন্যার ঘরে প্রবেশ করতে কি কারণে তুমি বাধা দিলে?" প্রত্যুত্তরে আসমা বললেন, "তিনি নিজেই আমাকে আদেশ দিয়েছিলেন যেন কাউকে তার কাছে যেতে না দেই।" তখন আবু বকর বললেন, "তিনি তোমাকে যা করতে বলেছেন তা-ই কর (ইসফাহানী [৩১], ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৩; শাফী [১২৫], ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৯৬; ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৩৩৪ ; বালাজুরী [১০০], ১ম খণ্ড, পৃ; ৪০৫; বার [৯৭], ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১৮৯৭ - ১৮৯৮; অছীর[১], ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৫২৪)।

ফাতিমা আমিরুল মোমেনিনকে আরো অনুরোধ করেছিলেন যে, তাঁকে যেন রাত্রিকালে দাফন করা হয়, কেউ যেন তাঁর কাছে না আসে, আবু বকর ও উমরকে তাঁর মৃত্যু ও দাফন সম্পর্কে কিছুই যেন অবহিত করা না হয় এবং আবু বকর যেন তাঁর জানাযায় না যায়। যখন তিনি মৃত্যুবরণ করলেন আলী তাকে গোসল করালেন, রাতের অন্ধকারে দাফন করলেন এবং আবু বকর ও উমরকে এ বিষয়ে কিছু জানালেন না। মুহাম্মদ ইবনে উমর ওয়াকিদি (১৩০/৭৪৭- ২০৭/৮২৩) বলেছেন ঃ

আমাদের কাছে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, আলী নিজেই ফাতিমার জানাজা করেছিলেন এবং আব্বাস ইবনে আবদাল মুত্তালিব ও তার পুত্র ফজলকে সঙ্গে করে রাত্রিকালে তাঁকে দাফন করেছিলেন। এ বিষয়ে তিনি কাউকে কিছু জানান নি।

এ কারণে ফাতিমার মাজার শরীফ অজ্ঞাত ও গুপ্ত রয়ে গেছে— তাঁর মাজার শরীফ সম্পর্কে কেউ কোন সুনিশ্চিত স্থান বলতে পারে না (নায়সাবুরী [৮৪], ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৬২ - ১৬৩; সানানী [১৩৯], ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২১৪১; বালাজুরী[১০০], ১ম খন্ড, পৃঃ ৪০২-৪০৫; বার [৯৭], ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ১৮৯৮; আছীর[১], ৫ম খন্ড, পৃঃ ৫২৪-৫২৫; হাজর[১৫০], ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ৩৭৯-৩৮০; তাবারী[৭৫], ৩য় খন্ড, পৃঃ ২৪৩৫-২৪৩৬; সাদ [১৩৭], ৮ম খণ্ড, পৃঃ ১৯-২০; সামহুদী [১৪২], ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৯০১ - ৯০৫; হাদীদ[১৫২], ১৬শ খন্ড, পৃঃ ২৭৯ - ২৮১)।

ফাতিমার এ অসন্তোষ নেহায়েত ব্যক্তিগত আবেগ বলে কেউ কেউ মনে করেন। তারা প্রকৃত পক্ষে এ অসন্তোষের গূঢ় রহস্য অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছে। যদি এটা ব্যক্তিগত আবেগ হতো তা হলে আমিরুল মোমেনিন এটা হতে তাঁকে নিবৃত্ত করতেন। কিন্তু কোন ইতিহাসে দেখা যায় না যে, আমিরুল মোমেনিন ফাতিমার অসন্তোষকে ব্যক্তিগত আবেগ বলে মনে করেছেন।

তদুপরি, কি করে ফাতিমার অসন্তোষ ব্যক্তিগত আবেগ প্রবণতা হতে পারে? তাঁর সকল সন্তোষ বা অসন্তোষই আল্লাহ্র ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত। রাসুলের নিম্নোক্ত বাণীই এর প্রমাণ ঃ

হে ফাতিমা, নিশ্চয়ই তোমার ক্রোধে আল্লাহ্ ক্রোধান্বিত হন এবং তোমার সন্তুষ্টিতে আল্লাহ্ সন্তুষ্ট (নায়সাবুরী [৮৪], ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৫৩; আছীর[১], ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৫২২; হাজর [১৫০], ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৩৬৬; ১২শ খণ্ড, পৃঃ ৪৪১; সূয়ুতী [১৪৬], ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৬৫; হিন্দি [১৬৭], ১৩শ খণ্ড, পৃঃ ৯৬; ১৬শ খণ্ড, পৃঃ ২৮০; শাফী [১২৮], ৯ম খণ্ড , পৃঃ ২০৩)।

ফাতিমার মৃত্যুর পর ফদকের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

ঐতিহাসিক গ্রন্থ হতে ফদকের তিনশত বছরের ইতিহাস বর্ণনা করার পেছনে মুলতঃ তিনটি প্রশ্নের ব্যাখ্যা প্রদান করাই উদ্দেশ্য ঃ

(ক) আবু বকর বলেছেন রাসুল (সঃ) নাকি তাকে বলেছেন, "নবীদের পরিত্যক্ত সম্পদ তাঁদের ওয়ারিশগণ প্রাপ্য হন না।" এহেন অযৌক্তিক উক্তি রাসুলের নামে চালিয়ে দিয়ে যে বিধির প্রচলন করতে চেয়েছেন তা বাতিল করা। আবু বকরের এ বক্তব্য তার পরবর্তী দু'জন খলিফা উমর ও উসমান কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়েছে এবং উমাইয়া ও আব্বাসীয় অন্য বাদশাগণ কর্তৃকও প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। একথা মনে রাখতে হবে যে, আবু বকরের খেলাফতের বৈধতা ও সঠিকতা এবং তার কর্মকাণ্ডের ওপরই পরবর্তীগণের খেলাফতের বৈধতা ও ন্যায্যতা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে।

(খ) আমিরুল মোমেনিন ও ফাতিমার বংশধরগণ কখনো তাদের দাবীর ন্যায্যতা, বৈধতা ও যৌক্তিকতা সম্পর্কে কোনরূপ দ্বিধাবোধ করেননি। তাঁরা সব সময়ই সুনিশ্চিত ছিলেন যে, ফাতিমার ন্যায়সঙ্গত অধিকার আবু বকর কেড়ে নিয়েছে এবং তাঁর বৈধ দাবী আবু বকর প্রত্যাখ্যান করেছে। কারণ ফাতিমা কখনো কোন কিছুর জন্যই মিথ্যা দাবী উত্থাপন করতে পারেন না। যদি কেউ এমনটি বলে যে, ফাতিমার দাবী মিথ্যা তবে নিশ্চয়ই মনে করতে হবে সে (যে এমন মনে করে) মিথ্যাবাদী।

(গ) যখনই কোন খলিফা আল্লাহ্র আদেশ কার্যকর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং ন্যায় বিচার করার চিন্তা করেছে এবং ইসলামিক বিধানকে সমুন্নত করার চিন্তা যারা করেছে তারা ফাতিমার বংশধরগণকে ফদক ফিরিয়ে দিয়েছিল।

১। উমর ইবনে খাত্তাব ছিলেন তাদের মধ্যে প্রথম সারির লোক যারা ফাতিমাকে তাঁর উত্তরাধিকার ও ফদক হতে বঞ্চিত করার কাজে লিপ্ত ছিলেন। উমর নিজেই স্বীকার করেছেন ঃ

> *যখন আল্লাহ্র রাসুল ইনতিকাল করলেন তখন আমি আবু বকরকে সঙ্গে করে আলীর কাছে গিয়ে বললাম, "আল্লাহ্র রাসুলের পরিত্যক্ত বিষয়-সম্পত্তি সম্বন্ধে আপনি কি করবেন বলে ভেবেছেন?" আলী বললেন, "রাসুলের সব কিছুরই একমাত্র উত্তরাধিকারী আমরা।" তখন আমি (উমর) বললাম, "খাইবারের সম্পত্তিতেও?" তিনি বললেন, "হাঁ, খাইবারের সম্পত্তিতেও।" আমি বললাম, "ফদকেও?" তিনি বললেন, "হাঁ, ফদকেও।" তখন আমি বললাম, "আল্লাহ্র কসম, আমরা তা হতে দেব না। আপনি যদি করাত দিয়েও আমাদের কেটে ফেলেন তবুও আমরা এসব আপনাকে দেব না" (শাফী [১২৮], ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৩৯-৪০)।*

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, আবু বকর কর্তৃক প্রদত্ত ফদকের দলিল উমর ফাতিমার হাত থেকে টেনে নিয়ে ছিঁড়ে ফেলেছিলেন। কিন্তু উমর যখন খলিফা হলেন (১৩/৬৩৪-২৩/ ৬৪৪) তখন তিনি রাসুলের উত্তরাধিকারীদেরকে ফদক ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক ইয়াকুত হামাবী (৫৭৪/ ১১৭৮ - ৬২৬/১২২৯) লিখেছেন ঃ

> *উমর ইবনে খাত্তাব খলিফা হবার পর যখন বিজয় লাভ করলেন এবং মুসলিমগণ মোটামুটি সম্পদশালী হয়ে উঠলো এবং বায়তুল মাল জনগণের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হলো তখন তিনি তাঁর পূর্ববর্তী খলিফা আবু বকরের সিদ্ধান্ত বাতিল করে রায় দিলেন যে, ফদক রাসুলের (সঃ) উত্তরাধিকারীদের হাতে ফেরত দেয়া হলো। এবার আলীর সঙ্গে আব্বাস ইবনে আবদাল মুত্তালিব ফদক নিয়ে বিরোধ করলো।*

আলী বললেন যে, রাসুল (সঃ) তাঁর জীবদ্দশাতেই ফাতিমাকে ফদক দান করে দিয়েছেন। আব্বাস তা অস্বীকার করে বললেন ফদক রাসুলের (সঃ) দখলে ছিল এবং আমি তাঁর উত্তরাধিকারীদের মধ্যে একজন। তাঁরা বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য উমরের শরনাপন্ন হলো। কিন্তু উমর বিচার করতে অপারগতা প্রকাশ করে বললেন "আপনারা উভয়েই আমা অপেক্ষা আপনাদের সমস্যা সম্পর্কে অনেক বেশী ওয়াকিফহাল। আমি শুধু আপনাদেরকে ফদক দিলাম। আপনাদের সমস্যা আপনারা নিষ্পত্তি করুন।" (হামাবী [১৫৮], ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২৩৮ - ২৩৯; সামহুদী [১৪২], ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৯৯৯; আজহারী [৫৪], ১০ম খণ্ড, পৃঃ ১২৪; মনজুর [১০৪], ১০ম খণ্ড, পৃঃ ৪৭৩; জাবিদী [৬৪], ৭ম খণ্ড, পৃঃ ১৬৬)।

ওপরের বর্ণিত ইতিহাস হতে বুঝা যায় যে, আবু বকর ও উমর কোন ধর্মীয় কারণে ফদক হতে ফাতিমাকে বঞ্চিত করে তা আত্মসাৎ করেননি। শুধুমাত্র রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার কারণে তাঁরা এটা করেছেন। যখন খেলাফতে তাদের আসন শক্তিশালী হয়েছে তখনই উমর তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে রায় দিয়েছিল। আমিরুল মোমেনিনকে অর্থনৈতিক অসচ্ছলতায় রাখতে পারলে খেলাফত দখল কিছুটা নির্বিঘ্ন থাকবে বলে তারা এমনটি করেছেন। প্রকৃত পক্ষে হয়েছেও তাই।

২। উমরের পর যখন উসমান ইবনে আফ্‌ফান (২৩/ ৬৪৪ - ৩৫/ ৬৫৬) খলিফা হলেন, তিনি তার চাচাত ভাই মারওয়ান ইবনে হাকামকে ফদক দিয়েছিলেন (শাফী[১২৫], ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩০১; সামহুদী[১৪২], ৩য় খণ্ড,পৃঃ ১০০০ ; হাদীদ[১৫২], ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৯৮)। উসমানের এহেন স্বজন প্রীতিই তার প্রতি জনগণের কঠোর মনোভাবের অন্যতম কারণ যা তাকে হত্যার মধ্য দিয়ে শেষ হয় (কুতায়বা [৪৮], পৃঃ ১৯৫; রাব্বিহ [১১৮], ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২৮৩ ও ৪৩৫; ফিদা [৮৯], ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৬৮; ওয়ারদী [৩৮], ১ম খণ্ড, পৃঃ ২০৪)। এভাবে ফদক মারওয়ানের দখলে চলে যায়। সে উহার ফসল ও উৎপন্ন দ্রব্য বার্ষিক দশ হাজার দিনার ঠিকা চুক্তিতে বিক্রি করতো। উমর ইবনে আবদাল আজিজের খেলাফতের (হিঃ ১০০/৭১৮ খৃঃ) পূর্ব পর্যন্ত এটাই ছিল ফদকের স্বাভাবিক আয় (সা'দ [১৩৭], ৫ম খণ্ড, ২৮৬ - ২৮৭; কালকাশন্দি [৪১], ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২৯৯)।

৩। যখন মুয়াবিয়া ইবনে আবি সুফিয়ান খেলাফত দখল করলো (৪১/ ৬৬১ - ৬০/ ৬৮০) তখন সে মারওয়ান ও অন্যান্যদের সাথে ফদকের অংশীদার হলো। সে এক তৃতীয়াংশ মারওয়ানকে দিতো, এক তৃতীয়াংশ আমর ইবনে উসমান ইবনে আফ্‌ফানকে দিতো এবং এক তৃতীয়াংশ তার পুত্র ইয়াজিদকে দিতো। হাসান ইবনে আলীকে হত্যা করানোর পর হতেই সে এ ব্যবস্থা নেয় (ইয়াকুবী [২৮], ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৯৯)। রাসুলের (সঃ) আহলুল বাইতের এ প্রধান তিন বিরোধীর দখলে মারওয়ান খলিফা হবার (৬৪/ ৬৮৪ - ৬৫ / ৬৮৫) পূর্ব পর্যন্ত ফদক ছিল। তৎপর মারওয়ান তার পুত্র আবদাল মালিক ও আবদাল আজিজকে ফদক দান করে দিয়েছিলো। আবদাল আজিজ তার অংশ তার পুত্র উমর ইবেন আবদাল আজিজকে দান করে দিয়েছিলো।

৪। যখন উমর ইবনে আবদাল আজিজ খলিফা হলেন (৯৯/ ৭১৭ - ১০১/ ৭২০) তিনি একটি বক্তৃতা দিয়ে বললেন, "নিশ্চয়ই, ফদক ঐ সব জিনিসের অন্তর্ভুক্ত যা আল্লাহ্ তাঁর রাসুলকে দান করেছিলেন। ফদকের জন্য কোন লোককে যুদ্ধ করতে হয়নি, কোন ঘোড়া বা উট পরিচালিত হয়নি।" তিনি ফদকের অতীত ইতিহাস বর্ণনা করলেন। তৎপর বললেন, মারওয়ান আমার পিতা ও আবদাল মালিককে ফদক দিয়েছে। ফলে এটা আমার এবং ওয়ালিদ ও সুলায়মানের হয়েছে। যখন ওয়ালিদ খলিফা হলো (৮৬/৭০৫ - ৯৬/ ৭১৫) তখন সে তার অংশ আমাকে দিয়েছিল এবং সুলায়মানও তার অংশ আমাকে দিয়েছে। ফলে আমি সম্পূর্ণ ফদকের মালিক হয়েছি। আমার কাছে ফদক অপেক্ষা পছন্দীয় আর কোন সম্পদ নেই। তবুও তোমারা সাক্ষী থাক, আমি প্রকৃত মালিকদেরকে ফদক ফিরিয়ে দিলাম।" অতঃপর তিনি মদিনার গভর্ণর আবু বকর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে হাজমকে লিখিতভাবে আদেশ দিলেন ফদক যেন ফাতিমার বংশধরগণকে হস্তান্তর করা হয়। এটাই ছিল আলীর সন্তানদের দখলে প্রথমবারের মত ফদক ছেড়ে দেয়া (আসকারী [২০], পৃঃ ২০৯)।

৫। যখন ইয়াজিদ ইবনে আবদাল মালিক খলিফা হলো (১০১/৭২০ - ১০৫/ ৭২৪) সে আলীর সন্তানদেরকে বেদখল করে পুনরায় ফদক আত্মসাৎ করলো। এরপর হতেই ফদক বনি মারওয়ানের দখলে রয়ে গেল যে পর্যন্ত না বনি আব্বাস ক্ষমতা দখল করলো।

৬। যখন আবুল আব্বাস আবদুল্লাহ্ সাফ্ফা প্রথম আব্বাসীয় খলিফা হলো (১৩২/ ৭৪৯ - ১৩৬ / ৭৫৪) তখন তিনি ফাতিমার বংশধরগণকে ফদক ফিরিয়ে দিলেন এবং আবদুল্লাহ্ ইবনে হাসান ইবনে হাসান ইবনে আলী ইবনে আবি তালিবের হাতে ফদক ন্যস্ত করলেন।

৭। যখন আবু জাফর আবদুল্লাহ্ আল-মনসুর আদ দাওয়ানিকি (১৩৬/৭৫৪-১৫৮/৭৭৫) খলিফা হলেন তিনি হাসানের সন্তানদের কাছ থেকে ফদক কেড়ে নিয়ে গেলেন।

৮। যখন মুহাম্মদ মাহদী ইবনে মনসুর খলিফা হলেন (১৫৮/ ৭৭৫ - ১৬৯/ ৭৮৫) তিনি ফাতিমার সন্তানদের কাছে ফদক ফেরত দিলেন।

৯। তৎপর মুসা হাদী ইবনে মাহদী (১৬৯/ ৭৮৬) এবং তার ভ্রাতা হারুন অর-রশিদ (১৭০/ ৭৮৬ - ১৯৩/ ৮০৯) ফাতিমার বংশধরগণের কাছ থেকে ফদক কেড়ে নিয়ে যায়। মামুন খলিফা হওয়া পর্যন্ত (১৯৩/ ৮০৩ - ২১৮ / ৮৩৩) ফদক আব্বাসীয়দের দখলে ছিল।

১০। মামুন খলিফা হবার পর ফাতিমার বংশধরগণের হাতে (২১০/ ৮২৬ সনে) ফদক ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। মাহদী ইবনে আস-সাবিক লিখেছেনঃ

> *একদিন মামুন জনগণের নালিশ শুনতে এবং মামলার রায় প্রদান করতে বসেছিলেন। তাঁর কাছে উপস্থাপিত প্রথম নালিশটির প্রতি তাকিয়ে তিনি কেঁদে ফেললেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন রাসুলের (সঃ) কন্যা ফাতিমার এ্যাটর্নি কোথায়? একজন বৃদ্ধ দাড়িয়ে এগিয়ে এলেন এবং ফদক সম্পর্কে যুক্তিতর্ক পেশ করলেন। মামুনও তাঁর যুক্তিতর্ক ব্যক্ত করলেন কিন্তু বৃদ্ধের যুক্তি অনেক জোরালো ছিল (আসকারী [১৯], পৃঃ২০৯)।*

মামুন তখন ইসলামিক ফকীদের তলব করলেন এবং ফাতিমী বংশের দাবী সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। তারা বর্ণনা দিল যে, রাসুল (সঃ) ফাতিমাকে ফদক দান করেছিলেন। রাসুলের দেহত্যাগের পর ফাতিমা ফদক ফিরিয়ে দেয়ার জন্য আবু বকরের কাছে দাবী করেছিলেন। আবু বকর তাঁর দাবীর স্বপক্ষে সাক্ষী হাজির করার জন্য বললে আলী, হাসান, হোসাইন ও উম্মে আয়মন ফাতিমার দাবীর সত্যতা স্বীকার করে সাক্ষ্য প্রদান করেছিলেন। আবু বকর তাদের সাক্ষ্য বাতিল করে দিয়েছিলেন। মামুন ফকীদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, "উম্মে আয়মন সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কি?" তারা সকলে এক বাক্যে বললো, "তিনি এমন মহিলা ছিলেন যাঁর বেহেশতবাসী হবার নিশ্চয়তার ঘোষাণা রাসুল (সঃ) দিয়েছিলেন।" তখন মামুন ফকীগণকে বললেন, "আলী, হাসান, হোসাইন ও উম্মে আয়মনের সাক্ষ্য শুধু সত্য ছাড়া অন্য কিছু এমন প্রমাণ কি তোমাদের মধ্যে কেউ উপস্থাপন করতে পারবে?" তারা সকলে সর্বসম্মতিক্রমে বললো "এমন কোন প্রমাণ উপস্থাপন করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়।" এরপর তিনি ফাতিমার বংশধরগণকে ফদক ফিরিয়ে দিলেন। (ইয়াকুবী[২৮], ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৯৫ - ১৯৬)।

অতঃপর মামুন ফাতিমার বংশধরগণকে ফদক রেজিষ্ট্রি করে দেয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন এবং তিনি নিজেই দলিলে স্বাক্ষর করলেন। এরপর তিনি মদিনার গভর্ণর কুছাম ইবনে জাফরকে লিখেলন ঃ

> *জেনে রাখো, আল্লাহ্র দ্বীনের খলিফা হিসাবে আমাকে যে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে সে ক্ষমতা বলে এবং রাসুলের স্বজন ও উত্তরাধিকারী হিসাবে সুন্নাতুন্নবী অনুসরণ করা ও তাঁর আদেশ বাস্তবায়ন করা আমার পরম দায়িত্ব। রাসুলের (সঃ) কোন দান প্রাপককে ফেরত দেয়া আমার পরম দায়িত্ব। আমার কৃতকার্যতা ও নিরাপত্তা আল্লাহ্র ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল এবং আমি সর্বদা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য উদ্বিগ্ন। আমি সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করি, নিশ্চয়ই, রাসুল (সঃ) তাঁর প্রাণপ্রিয় কন্যাকে ফদক দান*

করেছিলেন এবং ফদকের মালিকানা ফাতিমার নিকট হস্তান্তর করেছিলেন। এটা প্রতিষ্ঠিত সত্য। রাসুলের জ্ঞাতিবর্গের কেউ এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করে না। ফাতিমা সর্বদা ফদক দাবী করেছিলেন। তাঁর দাবী আবু বকরের বক্তব্য অপেক্ষা অধিক যুক্তিগ্রাহ্য। খলিফা হিসাবে আমি ফাতেমী বংশের হাতে ফদক ফিরিয়ে দেয়াই ন্যায় সঙ্গত ও যথাযথ মনে করি। ন্যায় বিচার ও সত্য প্রতিষ্ঠিত করে খলিফা আল্লাহ্র নৈকট্য পাবার আশা রাখে। রাসুলের আদেশ কার্যকর করে তাঁর প্রশংসা পাবার আশা রাখে। কাজেই আমি ফদক রেজিষ্ট্রি করে ফাতেমী বংশকে ফেরত দিলাম। আমার এ আদেশ সকল কর্মচারীকে জানিয়ে দিয়ো।

হজ্বের সময় জনগণ যখন মক্কায় জমায়েত হয় তখন প্রচার করে দিয়ো যদি রাসুল (সঃ) কাউকে কিছু দান অথবা উপহার দেয়ার কথা বলে থাকেন তবে সে যেন আমার কাছে আসে।তার বক্তব্য গ্রহণ করা হবে এবং তাকে প্রতিশ্রুত বস্তু দেয়া হবে।

নিশ্চয়ই, রাসুল (সঃ) কর্তৃক ফাতিমাকে ফদক দানের বিষয়ে ফাতিমার বক্তব্য সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য। নিশ্চয়ই, আমি ফাতিমার বংশধরকে ফদক বুঝিয়ে দেয়ার জন্য মুবারক আত-তাবারীকে আদেশসহ পাঠালাম। সে ফদকের সকল সীমানা, সকল স্বত্ব, সকল কর্মচারী, সকল শস্য ও অন্য সব কিছুসহ উহা মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহিয়া ইবনে হাসান ইবনে জায়েদ ইবনে আলী ইবনে হুসাইন ইবনে আলী ইবনে আবি তালিব ও মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে হাসান ইবনে আলী ইবনে হুসাইন ইবনে আলী ইবনে আবি তালিবকে বুঝিয়ে দেবে। আমি, খলিফা, এ দুজনকে ফাতিমার বংশধরের সকল স্বত্বাধিকারীগণের এজেন্ট নিয়োগ করলাম। জেনে রাখো, এটাই খলিফার আদেশ। আল্লাহ্র আদেশ পালন করে তাঁর ও রাসুলের (সঃ) সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আল্লাহ্ই তাকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তোমার অধিনস্থগণকেও একথা জানিয়ে দিয়ো। মুবারক আত-তাবারীর সাথে যেরূপ ব্যবহার করবে অনুরূপ ব্যবহার মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহিয়া ও মুহাম্মদ ইবনে আবদিল্লাহ্র সাথেও করবে। আল্লাহ্র ইচ্ছায় ফদকের সমৃদ্ধি ও শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য তাদের দু'জনকে সহায়তা করো। বিষয়টি এখানে শেষ করলাম। এ পত্রখানা ২১০হিজরির জুলকিদা মাসের ২৮ তারিখ বুধবার মোতাবেক ১৫-২-৮২৬ খৃষ্টাব্দে লিখা হয়েছিল।

১১। এভাবে মামুনের খিলাফত হতে মুনতাসিম (২১৮/৮৩৩-২২৭/৮৪২) ও ওয়াছিকের (২২৭/৮৪২-২৩২/৮৪৭) খেলাফত পর্যন্ত ফদক ফাতেমী বংশের দখলে ছিল।

১২। অতঃপর জাফর আল-মুতাওয়াক্কিল যখন খলিফা হলো (২৩২/৮৪৭-২৪৭/৮৬১) তখন সে ফাতিমার বংশধরগণ হতে ফদক ছিনিয়ে নিয়ে গেল। আহলুল বাইতের জীবিত ও মৃত শত্রুদের মধ্যে মুতাওয়াক্কিল ছিল সব চাইতে শয়তানি-ভরা শত্রু। সে হারমালাহ্ আল-হাজ্জামকে ফদক দিয়ে দিল এবং হাজ্জামের মৃত্যুর পর তাবারিস্থানের বাজায়রকে ফদক দিয়েছিল। আবু হিলাল আসকারী লিখেছেন যে, এলোকটির প্রকৃত নাম ছিল আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর বাজায়র। তিনি আরো লিখেছেন, "ফদকে ১১টি খেজুর গাছ ছিল যা রাসুল (সঃ) নিজ হাতে রোপণ করেছিলেন। এ ১১টি খেজুর গাছের খেজুর আবি তালিবের বংশধরগণ সংগ্রহ করে রাখতেন এবং হজ্বের সময় হাজীগণ মদিনা গেলে এ খেজুর তাদের দান করতেন। বিনিময়ে হাজীগণ-তাদেরকে অনেক কিছু দিতেন। মুতাওয়াক্কিল এ সংবাদ জানতে পেরে আবদুল্লাহ্ ইবনে উমরকে হুকুম করলো সে যেন উক্ত গাছগুলোর ফল কেটে উহার রস বের করে নেয়। ফলে আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর বিশর ইবনে উমাইয়া ছাকাফী নামক একজন লোককে উক্ত ১১টি গাছের খেজুরের রস বের করে মদ তৈরী করার জন্য নিয়োজিত করলো। কিন্তু এ মদ বসরার পথে থাকা কালেই মুতাওয়াক্কিল নিহত হলো।"

১৩। মুতাওয়াক্কিলের পর তার পুত্র মুনতাসির খলিফা হলো (২৪৭/৮৬১-২৪৮/৮৬২)। তিনি হাসান ও হুসাইনের বংশধরগণকে ফদক ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

(উপরের ক্রমিক ৩-১৩-এর সূত্র হলো— ইরবিলি[২৯], ২য় খন্ড, পৃঃ ১২১-১২২; মজলিসী[১০৩], ৮ম খন্ড, পৃঃ ১০৭-১০৮; কুমী[৫২], ২য় খন্ড, পৃঃ ৩৫১; আশকারী[১৯], পৃঃ ২০৯ বালাজুরী[৯৯], ১ম খন্ড, পৃ ৩৩-৩৮; হামাবী[১৫৯], ৪র্থ খন্ড, ২৩৩-২৪০; ইয়াকুবী[২৮], ২য় খন্ড, পৃঃ ১৯৯; ৩য় খন্ড; পৃঃ ৪৮, ১৯৫-১৯৬; আছীর[২], ২য় খন্ড, পৃঃ ২২৪-২২৫; ৩য় খন্ড, পৃঃ ৪৫৭, ৪৯৭; ৫ম খন্ড, পৃ. ৬৩; ৭ম খন্ড, পৃঃ ১১৬; রাব্বিহ[১১৮], ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ২১৬, ২৮৩, ৪৩৫; সামহুদী[১৪২], ৩য় খন্ড, পৃঃ ৯৯৯-১০০০; সাদ[১৩৭], ৫ম খন্ড, পৃঃ ২৮৬-২৮৭; সূয়ূতী[১৪৭], পৃঃ ২৩১-২৩২, ৩৫৬; মাসুদী[১০৯], ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ৮২; হাম্বলী[১৬৪], পৃঃ ১১০; কালকাশান্দি[৪৯], ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ২৯১; সাফাওয়াত[১৪১], ২য় খন্ড, পৃঃ ৩৩১-৩৩২; ৩য় খন্ড, পৃঃ ৫০৯- ৫১০; কাহ্‌হালাহ্[৪৪], ৩য় খন্ড, পৃঃ ১২১১-১২১২; হাদীদ[১৫২], ১৬শ খন্ড, পৃঃ ২৭৭-২৭৮)।

১৪। মুনতাসিরের করুণ মৃত্যুর পর ফদক ফাতিমার বংশধর হতে পুনরায় কেড়ে নেয়া হয়েছিল। কিন্তু আল-মুতাদিদ (২৭৯/৮৯২-২৮৯/৯০২) আবার তা ফাতেমী বংশকে ফিরিয়ে দিয়েছিল। তৎপর মুকতাফি (২৮৯/৯০২-২৯৫/৯০৮ আবার ফাতেমী বংশ হতে তা নিয়ে গেল। অতঃপর মুখতাদির (২৯৫/৯০৮-৩২০/৯৩) পুনরায় ফদক ফাতেমী বংশকে ফিরিয়ে দিয়েছিল। এরপর হতে ফদকের আর কোন উল্লেখ ইতিহাসে পাওয়া যায় না।

তবে কি তারা জাহেলী যুগের বিধিবিধান কামনা করে? বিশ্বাসীগণের জন্য বিধান দানে আল্লাহ্ অপেক্ষা কে শ্রেষ্ঠতর? (কুরআন, ৫ঃ ৫০)

★★★★★

পত্র-৪৬
একজন অফিসারের প্রতি

নিশ্চয়ই, তুমি তাদের মধ্যে একজন যাদের সহায়তায় আমি দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করতে এবং পাপীদের দম্ভ ভেঙ্গে দিতে ও দ্বীনের সংকটাকীর্ণ সীমানার প্রতিরক্ষা বিধান করতে চাই। যা কিছুই দুশ্চিন্তা ও উদ্বিগ্নতার কারণ হবে তদ্বিষয়ে তুমি আল্লাহ্‌র সাহায্য যাচনা করো। তোমারা কোমলতার সাথে একটু শক্তভাব মিশ্রিত করো এবং যেখানে কোমলতা যথোপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে সেখানে কোমল মনোভাব গ্রহণ করো; কঠোরতা যেখানে প্রযোজ্য হবে সেখানে তা প্রয়োগ করতে হবে। প্রজাদের সামনে তোমার পাখা বাঁকা করে দিয়ো (অর্থাৎ বিনম্র ব্যবহার করো), সহাস্য মুখে তাদের সাথে দেখা করো এবং তাদের সাথে কোমল ব্যবহার করো। সকলকে সমান চোখে দেখো এবং সকলের প্রতি সমান ব্যবহার করো। এতে বড় লোকেরা তোমা হতে কোন অবহেলা পেয়েছে বলে মনে করবে না এবং দুর্বলেরা তোমার ন্যায় বিচার হতে বঞ্চিত হয়েছে মনে করবে না। বিষয়টি এখানে শেষ করছি।

★★★★★

উইল-৪৭
ইমাম হাসান ও হুসাইনের প্রতি

[যখন আবদার রহমান ইবনে মুলজাম (তার ওপর আল্লাহ্‌র লানত) তাঁকে মারণাঘাত করেছিল তখন এ অছিয়ত করেছিলেন]

আল্লাহ্‌কে ভয় করার জন্য এবং দুনিয়ার প্রতি কোন লোভ না করার জন্য আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি। দুনিয়া যদি তোমাদের পেছনে দৌড়েও বেড়ায় তবু তা এড়িয়ে যেয়ো। এ দুনিয়ার কোন কিছুর জন্য কখনো দুঃখ

করো না। সত্য কথা বলো এবং আল্লাহ্র পুরস্কারের আশায় কাজ করো। অত্যাচারীর শত্রু হয়ো এবং অত্যাচারিতের সাহায্যকারী হয়ো।

আমি তোমাদের দু'জনকে, আমার সকল সন্তানকে, আমার পরিবারের সকল সদস্যকে এবং যাদের কাছে আমার এলেখা পৌছবে তাদের সকলকে উপদেশ দিচ্ছি আল্লাহ্কে ভয় করতে, তোমাদের কর্মকান্ড সুশৃঙ্খলভাবে করতে এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে। কারণ আমি তোমাদের নানাজানকে (রাসুলাল্লাহ্) বলতে শুনেছি," নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক মতানৈক্য দূর করা নফল ইবাদত ও সিয়াম অপেক্ষা উত্তম।"

আল্লাহ্কে ভয় কর এবং এতিমদের ব্যাপারে আল্লাহ্কে স্মরণ করো এবং তাদের বিষয়ে আল্লাহ্র আদেশ পালনে তৎপর থেকো। সুতরাং তারা যেন উপোস না থাকে এবং তোমাদের সম্মুখে ধ্বংস হয়ে না যায়।

আল্লাহ্কে ভয় করো এবং প্রতিবেশীদের বিষয়ে আল্লাহ্র আদেশ মেনে চলো। কারণ তারা রাসুলের (সঃ) উপদেশের বিষয়বস্তু ছিল। তিনি তাদের অনুকূলে এভাবে উপদেশ দিতেন কখনো কখনো আমরা মনে করতাম তিনি বুঝি তাদেরকে আমাদের উত্তরাধিকারী করে দিচ্ছেন।

আল্লাহ্কে ভয় করো এবং কুরআনের ব্যাপারে আল্লাহ্কে স্মরণ রেখো। কুরআনের আদেশ নিষেধ পালনে কেউ যেন তোমাদের অতিক্রম করে যেতে না পারে।

আল্লাহ্কে ভয় করো এবং সালাতের বিষয়ে আল্লাহ্কে স্মরণ রেখো। কারণ এটা দ্বীনের স্তম্ভ। আল্লাহ্কে ভয় করো এবং কাবার বিষয়ে তাঁকে স্মরণ করো এবং যতদিন বেঁচে থাক কাবাকে ভুলে যেয়ো না। কারণ কাবা পরিত্যক্ত হলে তোমরা রেহাই পাবে না।

আল্লাহ্কে ভয় করো এবং জিহাদের বিষয়ে আল্লাহ্কে স্মরণ করো। তোমাদের জান, মাল ও জিহ্বা দ্বারা আল্লাহ্র পথে জিহাদ করো।

জ্ঞাতিত্বের প্রতি তোমরা সম্মান দেখিয়ে চলো এবং তাদের জন্য ব্যয় করতে কুণ্ঠাবোধ করো না। পারস্পরিক সম্পর্ক ছিন্ন করে একজন অপরজন হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না। কল্যাণের পথে আহ্বান করা কখনো ত্যাগ করো না এবং পাপের জন্য কাউকে ক্ষমা করো না। তা করলে ফেতনা- ফ্যাসাদকারীগণ সুদৃঢ় অবস্থান পেয়ে যাবে। এমন করলে তোমাদের সালাত কবুল হবে না।

হে আবদাল মুত্তালিবের বংশধরগণ, নিশ্চয়ই, আমি আশা করি না যে "আমিরুল মোমেনিন নিহত হয়েছে" বলে তোমরা মুসলিমদের রক্তপাত করবে। সাবধান, আমার হত্যাকারী ছাড়া আর কাউকে তোমরা হত্যা করো না। ইবনে মুলজামের এ আঘাতে আমার মৃত্যু হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করো। তৎপর এ আঘাতের বদলা হিসাবে একটি আঘাত করো এবং তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে আলাদা করো না। কারণ আমি আল্লাহ্র রাসুলকে বলতে শুনেছি," কখনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটো না, যদি উহা একটি ক্ষিপ্ত কুকুরও হয়।"

★★★★★

পত্র-৪৮
মুয়াবিয়ার প্রতি

নিশ্চয়ই, বিদ্রোহ ও মিথ্যাচার মানুষকে দ্বীন ও দুনিয়ার ব্যাপারে হৃতমান করে দেয় এবং তার সমালোচকদের কাছে তার ত্রুটি বিচ্যুতি প্রকাশ করে দেয়। তুমি জেনে রাখো, যা তোমা হতে দূরে সরিয়ে রাখা নির্ধারিত হয়ে আছে তা তুমি ধরতে পারবে না। ন্যায় ছাড়া অন্য কিছুতেও মানুষের লক্ষ্য থাকে এবং সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্য আল্লাহ্র নামে শপথ করে, কিন্তু আল্লাহ্ তাদেরকে মিথ্যায় পরিণত করেন। সুতরাং সেদিনকে ভয় কর যেদিন ঐ

ব্যক্তি সুখী হবে যে সৎ আমল করে এবং ঐ ব্যক্তি অনুতাপানলে পুড়বে যে শয়তান দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। তুমি আমাদেরকে আহ্বান করেছো কুরআনের মাধ্যমে একটা সমঝোতা করতে অথচ তুমি কুরআন মান্যকারী লোক নও। আমরা কুরআনের রায়ের প্রতি সাড়া দিয়েছি। আমাদের সে সাড়া কোন অর্থেই তোমার প্রতি নয়। বিষয়টি এখানেই শেষ করছি।

★★★★★

পত্র-৪৯
মুয়াবিয়ার প্রতি

এ দুনিয়াবাসীগণ পরকাল হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। যে এ দুনিয়ার প্রতি আসক্ত সে দুনিয়া হতে কোন কিছুই অর্জন করতে পারে না। দুনিয়ার আসক্তি শুধু তার লোভ ও লালসা বৃদ্ধি করে। দুনিয়ার প্রতি আসক্ত ব্যক্তি যা পায় তাতে সন্তুষ্ট হয় না, কারণ যা পায় না তার জন্য সে উদগ্রীব হয়ে থাকে। মানুষ যে সম্পদ পুঞ্জীভূত করে তার সাথে বিচ্ছেদ অবধারিত এবং যে শক্তি সঞ্চার করে তার পতন সুনিশ্চিত। যদি অতীত হতে শিক্ষা গ্রহণ কর তবে ভবিষ্যতে নিরাপদ হতে পারবে। বিষয়টা এখানেই শেষ করছি।

★★★★★

পত্র-৫০
তাঁর সেনাবাহিনীর অফিসারদের প্রতি

আল্লাহ্‌র বান্দা আমিরুল মোমেনিন আলীর নিকট হতে সেনাবাহিনীর ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি ঃ

এটা একজন কর্মকর্তার জন্য অত্যাবশ্যকীয় যে, তার বিশেষ পদমর্যাদা ও যে সম্পদ সে অর্জন করেছে তজ্জন্য তার অধিনস্থদের প্রতি আচরণে কোন পরিবর্তন ঘটবে এবং মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ্ যে সম্পদ তাকে দান করেছেন সেজন্য নিজের লোকদের নৈকট্য বৃদ্ধি করতে হবে এবং সমাজের সকলের প্রতি দয়াদ্র আচরণ বৃদ্ধি করতে হবে।

সাবধান, তোমার প্রতি আমার দায়িত্ব হলো যুদ্ধ বিষয় ছাড়া আর কিছু তোমার নিকট গোপন রাখা আমার উচিত হবে না এবং দ্বীনের আদেশ ছাড়া অন্য সব কিছু তোমার সাথে পরামর্শ করতে হবে। অথবা আমি তোমার কোন অধিকারকে অবহেলা করতে পারি না এবং আমার কাছে অধিকারের দিক হতে তোমরা সকলেই সমান। যখন আমি এত সব করেছি তখন তোমাদের সকলের উচিত আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করা এবং আমাকে মান্য করে চলা এবং তোমাদের উচিত আমার আহ্বানে পিছু টান না দেয়া বা সৎ আমলে কার্পণ্য না করা এবং ন্যায় সমুন্নত করার জন্য তোমাদেরকে কষ্ট করতে হবে। আমার এ আদেশের প্রতি যদি তোমরা দৃঢ়চিত্ত না হও তবে তোমাদের চেয়ে অবনমিত আর কেউ থাকবে না এবং তোমাদের প্রতি আমার শাস্তি বৃদ্ধি করবো। মনে রেখো, শাস্তি প্রদানে আমি কখনো পক্ষপাতিত্ব করি না। তোমার অধিনস্থ কর্মকর্তাগণ হতে এ প্রতিশ্রুতি গ্রহণ কর এবং তাদের প্রতি তোমার দিক হতে এমন আচরণ কর যাতে আল্লাহ্ তোমার বিষয়াদিতে অবস্থার উন্নতি করেন। এখানেই বিষয়টা শেষ করছি।

★★★★★

পত্র-৫১

ভূমি কর আদায়কারীদের প্রতি

আল্লাহ্র বান্দা ও আমিরুল মোমেনিন আলীর নিকট হতে কর আদায়কারীদের প্রতি ঃ

যে লোক কোথায় যাচ্ছে তা মনে করে ভয় পায় না সে নিজের জন্য অগ্রীম কিছু প্রেরণ করতে পারে না, যা তাকে রক্ষা করবে। জেনে রাখো , তোমাদের ওপর অতি অল্প দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে কিন্তু এর পুরস্কার অত্যধিক। এতে বিদ্রোহ ও অবাধ্যতার জন্য কোন শাস্তি না থাকলেও আল্লাহ্ যা নিষিদ্ধ করেছেন তা হতে বিরত থাকার পুরস্কার অপরিসীম। মানুষের সাথে ন্যায় সঙ্গত আচরণ করো এবং ধৈর্য্য সহকারে মানুষের প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করে কাজ করো। কারণ তোমরা হলে জনগণের খাজাঞ্চি, সমাজের প্রতিনিধি এবং ইমামদের দূত।

কোন মানুষকে তার প্রয়োজন হতে বঞ্চিত করো না এবং তার চাহিদা হতে তাকে বাধাগ্রস্থ করো না। জনগণের কাছ থেকে খারাজ (কর) আদায় করার জন্য তাদের কাপড় চোপড় বিক্রি করতে বাধ্য করো না, তাদের কাজের উপযোগী পশু ও দাসদাসী বিক্রি করতে বাধ্য করো না। একটি দিরহামের জন্যও কাউকে বেত্রাঘাত করো না। কোন মুসলিম ও নিরাপত্তা প্রদত্ত অমুসলিমের সম্পত্তি স্পর্শ করো না। কিন্তু যদি তোমরা দেখ যে, তাদের অস্ত্র ও ঘোড়া মুসলিমদেরকে আক্রমণের জন্য প্রস্তুত করে তবে তা নিয়ে নিয়ো। কারণ ইসলামের শত্রুদের কাছে এসব রাখতে দেয়া মুসলিমদের উচিত হবে না-এতে শত্রু ইসলামের বিরুদ্ধে শক্তি সঞ্চার করতে পারে।

কোন সৎ পরামর্শ প্রদানে, সৈন্যবাহিনীর প্রতি ভাল ব্যবহার করাতে, প্রজাদের প্রতি দয়া দেখাতে এবং আল্লাহ্র দ্বীনে দৃঢ় থাকতে অমনোযোগী হয়ো না। আল্লাহ্র পথে সংগ্রাম কর; এটা তোমাদের অত্যাবশ্যকীয় কর্তব্য। মহিমান্বিত আল্লাহ্ চান আমরা এবং তোমরা যেন তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকি এবং আমাদের সর্বশক্তি দিয়ে যেন তাঁর দ্বীনের সহয়তা করি। আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান, চির সমুন্নত ও চির মহিমান্বিত।

★★★★★

পত্র-৫২

সালাত সম্পর্কে বিভিন্ন স্থানের গভর্ণরদের প্রতি

দেওয়ালের ছায়া যখন দেওয়ালের সমান হয়ে যায় তখন জনগণের সাথে জোহর সালাত আদায় করো। সূর্য অস্ত যাবার এমন সময় পূর্বে আছর আদায় করো যেন অস্ত যাবার পূর্বে একজন লোক দুই ফরসাখ (প্রায় ছয় মাইল) পথ অতিক্রম করতে পারে। হাজীগণ যখন আরাফাত হতে মিনার দিকে দৌড়াতে থাকে এবং সিয়ামকারীগণ সিয়াম শেষ করে তখন মাগরিবের সালাত করো। গোধূলী অদৃশ্য হবার পর হতে রাতের এক-তৃতীয়াংশের মধ্যে এশা আদায় করো। যখন একজন অপরজনকে স্পষ্ট দেখতে পায় তখন ফজর আদায় করো। জনগণের সাথে এভাবে সালাত আদায় করবে যেন তাদের মধ্যকার দুর্বল ব্যক্তিও কষ্ট না পায়।

★★★★★

নির্দেশনামা-৫৩

মালিক ইবনে হারিছ আশতারকে মিশরের গভর্ণর নিয়োগ করে নিয়োগ পত্রের সাথে এ দলিল[১] দিয়েছিলেন

বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম

আল্লাহ্র বান্দা ও আমিরুল মোমেনিন আলী এ আদেশ মালিক ইবনে হারিছ আশতারকে দিচ্ছে যখন তাকে রাজস্ব আদায়ের জন্য, শত্রুর সাথে যুদ্ধ করার জন্য, জনগণের মঙ্গল সাধনের জন্য ও নগরসমূহকে সম্পদশালী করার জন্য মিশরের গভর্ণর নিয়োগ করা হলো।

তাকে আদেশ করা হচ্ছে আল্লাহ্‌কে ভয় করার জন্য এবং তাঁর অনুগত হবার জন্য। আল্লাহ্ কুরআনে যা আদেশ করেছেন তা অনুসরণ করার জন্য তাকে আদেশ করা হচ্ছে। আল্লাহ্‌র আদেশ অনুসরণ না করে কেউ দ্বীনার্জন করতে পারে না। শয়তান ছাড়া কেউ আল্লাহ্‌র আদেশের বিরোধিতা ও অবহেলা করে না। তাকে আরো আদেশ করা হচ্ছে যেন সে তার হৃদয়-মন, হাত আর কণ্ঠ দিয়ে আল্লাহ্‌কে সাহায্য করে, কারণ মহিমান্বিত আল্লাহ্ তাকে সাহায্য করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। যে আল্লাহ্‌কে সাহায্য করে এবং যে তাঁকে সমর্থন করে তাকেই তিনি রক্ষা করেন।

তাকে আরো আদেশ করা হচ্ছে যেন সে তার হৃদয়কে কামনা-বাসনা হতে দূরে সরিয়ে রাখে এবং কামনা-বাসনা বৃদ্ধির সাথে সাথে হৃদয়কে নিয়ন্ত্রিত করে। কারণ আল্লাহ্‌র রহমত না হলে হৃদয় মানুষকে পাপের পথে নিয়ে যায়।

গভর্ণরের গুণাবলী ও দায়িত্ব

হে মালিক, মনে রেখো, আমি তোমাকে এমন এক এলাকায় পাঠাচ্ছি যেখানে তোমার পূর্বেও সরকার ছিল-তাদের কেউ কেউ ছিল ন্যায়পরায়ণ আবার কেউ কেউ ছিল অত্যাচারী। জনগণ এখন তোমার কর্মকান্ড নিরিখ করবে যেভাবে তুমি তোমার পূর্ববর্তী শাসকগণকে নিরিখ করতে এবং তারা তোমার সমালোচনা করবে যেভাবে তুমি পূর্ববর্তী শাসকগণের সমালোচনা করেছিলে। নিশ্চয়ই, দ্বীনদারগণের পরিচয় পাওয়া যায় তাদের খ্যাতির মাধ্যমে যা আল্লাহ্ তাঁর বান্দাগণের জিহ্বা দ্বারা ছড়িয়ে দেন। সুতরাং তোমার ভাল কর্মকান্ডই তোমার সর্বোত্তম সঞ্চয়। সেহেতু তোমার কামনা-বাসনা ও হৃদয়কে নিয়ন্ত্রণ করে প্রদমিত রেখো যাতে তোমার জন্য যা জায়েয নয় তা করা হতে বিরত থাকতে পার। কারণ হৃদয়কে নিয়ন্ত্রণ করাই হলো ইচ্ছা-অনিচ্ছার অর্ধেক প্রদমিত করা।

প্রজাদের প্রতি দয়া, মমতা ও সহৃদয়তা প্রদর্শন করা অভ্যাস করো। মনে রেখো, প্রজারা দু'প্রকারের—হয় তারা তোমার দ্বীনী ভাই না হয় তারা তোমার মতই সৃষ্ট বান্দা। সুতরাং তাদের মাথার ওপর লোভাতুর পশুর মত দাঁড়িয়ো না। পশু মনে করে গোগ্রাসে গেলাটাই যথেষ্ট। প্রজাগণের পদস্খলন হতে পারে—তারা ভুল করতে পারে। তারা ইচ্ছাকৃতভাবে অথবা অবহেলা বশে ভুল করতে পারে। সুতরাং তাদের প্রতি ক্ষমা ও অনুকম্পা প্রদর্শনে কার্পণ্য করো না। কারণ তুমিও তো চাও আল্লাহ্ যেন তাঁর সর্বোচ্চ ক্ষমা তোমার প্রতি প্রদর্শন করেন। মনে রেখো, তুমি তাদের ওপর আর তোমার ওপর হলেন দায়িত্বশীল ইমাম (আলী) এবং আল্লাহ্ হলেন তার ওপর যিনি তোমাকে নিয়োগদান করেছেন। আল্লাহ্ চান যে, তুমি তাদের কর্মকান্ডের ব্যবস্থাপনা কর এবং এ দায়িত্বের মাঝেই তিনি তোমার বিচার করবেন।

কখনো আল্লাহ্‌র সাথে যুদ্ধ করতে চেয়ো না, কারণ তাঁর ক্ষমতার কাছে তোমার কোন ক্ষমতাই নেই এবং তাঁর ক্ষমা ও রহমত ছাড়া তুমি কিছুই করতে পারবে না। কখনো ক্ষমা করতে অনুতাপ করো না এবং শাস্তি প্রদানে দয়া দেখায়ো না। ক্রোধের সময় কখনো তাড়াহুড়া করে কিছু করো না-ক্রোধ সম্বরণ করতে চেষ্টা করো। কখনো এ কথা বলো না, "আমাকে কর্তৃত্ব দেয়া হয়েছে-আমি যা আদেশ করি তাই মানতে হবে।" কারণ এটা হৃদয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের উদ্রেক করে, দ্বীনকে দুর্বল করে দেয় এবং ধ্বংস নিকটবর্তী করে দেয়। যে কর্তৃত্ব তোমাকে দেয়া হয়েছে তাতে যদি তোমার মনে কোন প্রগলভতা বা অহমবোধ আসে তবে আল্লাহ্‌র বিশাল রাজত্বের প্রতি এবং তাঁর মহাশক্তির প্রতি লক্ষ্য করে দেখো। তাতে তোমার নিজের ওপরই তোমার কর্তৃত্ব আছে বলে মনে হবে না। এটা তোমার মনের অহমকে কুঁকড়ে দেবে, তোমার উগ্র মেজাজের চিকিৎসা করে দেবে এবং যে প্রজ্ঞা তোমা হতে সরে গিয়েছিল তা ফিরিয়ে আনবে। সাবধান, আল্লাহ্‌র মহত্ত্বের সঙ্গে কখনো নিজকে তুলনা করো না অথবা তাঁর শক্তির মত নিজকে শক্তিধর মনে করো না। কারণ প্রত্যেক ক্ষমতার দাবীদারকে তিনি অবদমিত করেছেন এবং প্রত্যেক অহঙ্কারীকে তিনি অবমানিত করেছেন।

আল্লাহ্র জন্য ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করো এবং জনগণের প্রতি ন্যায় বিচার করো। তোমার নিজের প্রতি, আত্মীয়-স্বজনের প্রতিএবং প্রজাদের মধ্যে যাদেরকে তুমি পছন্দ কর তাদের প্রতি কোন স্বজন-প্রীতি প্রদর্শন করো না। যদি তুমি স্বজন-প্রীতি কর তবে তুমি অত্যাচারীদের মধ্যে পরিগণিত হবে। আর যখন কেউ আল্লাহ্র বান্দাদের উপর অত্যাচার ও নিপীড়ন করে তখন বান্দার পরিবর্তে আল্লাহ্ নিজেই জালেমের প্রতিপক্ষ হন। আর যখন আল্লাহ্ কারো প্রতিপক্ষ হন, তিনি তাকে অবজ্ঞাভরে পদদলিত করেন এবং যে পর্যন্ত সে অনুতপ্ত হয়ে তওবা না করে সে পর্যন্ত সে আল্লাহ্র সাথে যুদ্ধে লিপ্ত থাকে। আল্লাহ্র রহমত হতে বঞ্চিত হওয়া বা তাঁর মহাশাস্তি অত্যাচার ও নিপীড়ন ছাড়া অন্য কিছুতে এতবেশী ত্বরান্বিত হয় না। কারণ আল্লাহ্ মজলুমের আর্তনাদ শোনেন এবং জালিমদের প্রতি রোষাবিষ্ট দৃষ্টিতে তাকান।

সর্বসাধারণের স্বার্থে প্রশাসন

তোমার এমন পথ অবলম্বন করা উচিত হবে যা সাম্য ও ন্যায় ভিত্তিক, যা হবে ন্যায় বিচারকের দিক থেকে সর্বজনীন এবং যা তোমার অধীনস্থ সকলেই একবাক্যে গ্রহণ করবে। কারণ জনসাধারণের মধ্যে কোন ব্যবস্থা সম্পর্কে দ্বিধা দ্বন্দ্ব থাকলে তা নেতার যুক্তি-তর্ককে খর্ব করে দেয়। আবার নেতাদের মধ্যে কোন বিষয়ে অনৈক্য থাকলে তা গুরুত্ব সহকারে না দেখলেও চলে যদি ঐ বিষয়ে জনগণের মধ্যে ঐকমত্য থাকে। তোমার অধীনস্থ যত লোক আছে তাদের মধ্যে সমাজপতি কতিপয় ব্যক্তিই একজন শাসকের জীবনের সুখ-শান্তিতে অধিকতর বোঝা। সংকটের সময় এরা কম উপকারী। এরা সাম্য ও ন্যায়ের প্রতি অনীহা প্রদর্শনকারী। সুবিধা আদায়ে এরা সুচতুর। প্রদত্ত অনুগ্রহের জন্য এরা কম কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী। এদের দাবী পূরণে অপারগতার জন্য যুক্তি ও কারণ মেনে নিতে এরা সবচেয়ে নিস্পৃহ ও অনাগ্রহী। কোন প্রকার অসুবিধায় ধৈর্য ধারণে এরা সবচেয়ে দুর্বল। বস্তুতঃ সমাজের সাধারণ মানুষই দ্বীনের স্তম্ভ, তারা মুসলিম সমাজের আসল শক্তি এবং তারা শত্রুর বিরুদ্ধে প্ররক্ষা। তাদের প্রতি তোমার মনের দুয়ার খুলে দিয়ো এবং তাদের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন ও সহানুভূতিশীল হয়ো।

তোমার অধীনস্থ লোকদের মধ্যে তারা নিকৃষ্টতম যারা অন্যদের দোষত্রুটির বিষয়ে অত্যন্ত অনুসন্ধিৎসু। কারণ মানুষের দোষত্রুটি থাকতে পারে এবং তা ঢেকে রাখার জন্য শাসকই যথোপযুক্ত ব্যক্তি। যে সব দোষত্রুটি তোমার কাছে গোপন রয়েছে তা ফাঁস করে দিয়ো না, কারণ যা তোমার কাছে প্রকাশ পেয়েছে তা সংশোধন করাই তোমার দায়িত্ব। আর যা তোমার কাছে গোপন রয়েছে তা আল্লাহ্র ওপর ছেড়ে দাও। সুতরাং যতটুকু পারা যায় মানুষের দোষত্রুটি ঢেকে রেখো। তাহলে তোমার যে সব দোষত্রুটি প্রজাদের কাছে প্রকাশ না হয়ে পড়ার ইচ্ছা তুমি পোষণ কর আল্লাহ্ তা ঢেকে রাখবেন। মনের সকল বন্ধন মুক্ত করে মানুষের সঙ্গে চলো। এতে শত্রুতার কোন কারণ থাকবে না। যা তোমার কাছে স্পষ্ট নয় তাতে জানার ভান করো না। কুৎসা রটনাকারীদের সাথে পাল্লা দিয়ো না, কারণ কুৎসা রটনাকারী আপাতঃদৃষ্টিতে ভাল মানুষ মনে হলেও মূলতঃ সে প্রতারক।

উপদেষ্টা

কখনো কোন কৃপণ ও কাপুরুষকে উপদেষ্টা হিসেবে গ্রহণ করো না। কারণ কৃপণ তোমাকে ঔদার্যপূর্ণ কাজ থেকে বিরত রাখবে এবং আর্থিক অনটনের ভয় দেখাবে। আবার কাপুরুষ তোমার কর্মকান্ডে তোমাকে নিরুৎসাহীত করবে এবং আদেশ–নির্দেশ কার্যকরী করতে দুর্বল করে তুলবে। একইভাবে কোন লোভী ব্যক্তিকেও উপদেষ্ট করো না। তারা অন্যায়ভাবে কর আদায় করে সম্পদের প্রাচুর্য তোমাকে দেখাবে। কৃপণতা, কাপুরুষতা ও লোভ ভিন্ন ভিন্ন দোষ হলেও এরা কিন্তু আল্লাহ্র প্রতি ভুল ধারণা সম্পর্কে অভিন্ন।

যেসব লোক তোমার পূর্ববর্তী শোষক ও নিপীড়কদের মন্ত্রনাদাতা ছিল তারাই হবে তোমার নিকৃষ্টতম মন্ত্রী। কারণ তারা নিপীড়কদের পাপের সহযোগী ছিল। কাজেই এসব লোককে তোমার দলের প্রধান করো না। কারণ

তারা পাপী, দুষ্কর্মের সাহায্যকারী এবং অত্যাচারীদের দোসর ছিল। তুমি তাদের পরিবর্তে ভাল মানুষও পাবে— যারা প্রভাবশালী কিন্তু নিপীড়কদের কর্মকান্ড ও পাপের জন্য তাদের ঘৃণা করে। এরা তোমাকে সবচেয়ে কম জ্বালাতন করবে এবং তোমার সবচেয়ে বড় সহযোগী হবে। এরা তোমার প্রতি সবচেয়ে বেশী সহনশীল হবে এবং অন্যদের সাথে কম সম্পর্ক রাখবে। কাজেই এ ধরনের লোককে গোপনীয় ও প্রকাশ্য কাজে তোমার প্রধান সহচর করো।

যেসব লোক তোমার সমালোচনায় স্পষ্ট ও সত্য ভাষণ করে এবং যারা তোমার পদমর্যাদা ও ক্ষমতার তোয়াক্কা না করে আল্লাহ্ কর্তৃক অনুমোদিত বিষয়ে অপ্রিয় সত্য কথা বলবে তাদের প্রতি পূর্ণ আস্থা স্থাপন করো। সর্বদা খোদাভীরু ও সত্যবাদীদের সাথে মেলা মেশা করো। তাদেরকে এমনভাবে শিক্ষা দিয়ো যেন তারা কোন কাজে তোমার কর্তৃত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে তোষামুদে কথা না বলে। কারণ প্রশংসার আধিক্য মানুষের অহমবোধ সৃষ্টি করে তাকে ঔদ্ধত্যের দিকে ঠেলে নিয়ে যায়।

তোমার কাছে ধার্মিক ও পাপী যেন সমান মর্যাদা না পায়। এতে ধার্মিকগণ সৎকর্মের প্রতি অনীহা এবং পাপীগণ পাপের প্রতি আগ্রহান্বিত হবে। যে যে রকম মর্যাদার অধিকারী সে যেন তোমার কাছে সে রকম মর্যাদা পায়। মনে রেখো, শাসকের সুনাম অর্জনের সবচেয়ে বড় উপায় হলো তার প্রজাদের প্রতি সদারচণ করা, তাদের দুঃখ-দুর্দশা লাঘব করা এবং তাদের ওপর কোন অসহনীয় কর আরোপ না করা। কাজেই এ বিষয়ে তুমি এমন পথ অবলম্বন করবে যাতে করে প্রজাদের মাঝে তোমার সুনাম ছড়িয়ে পড়ে এবং এতে তারা তোমার অনুগত থাকবে। তাতে তোমার উদ্বেগ ও আশঙ্কা বহুলাংশে কমে যাবে।

যে সমাজ ব্যবস্থায় তুমি যাচ্ছ তাদের পুরাতন কল্যাণকর প্রথা–যদ্বারা সাধারণ ঐক্য ও প্রজাদের উন্নতি সাধিত হয় তা বন্ধ করে দিয়ো না। এমন কোন কর্মপদ্ধতি উদ্ভাবন করো না যা জনগণের প্রচলিত কল্যাণকর প্রথাকে ক্ষতিগ্রস্থ করে। এমনটি করলে যারা ঐ প্রথাগুলোর প্রবর্তন করেছিল তাদের সুনাম থেকে যাবে আর উহা বন্ধ করার দায়-দায়িত্ব তোমার ওপর বর্তাবে। যে এলাকার দায়িত্ব তোমাকে দেয়া হয়েছে সেখানকার পন্ডিত ব্যক্তি ও জ্ঞানী লোকদের সাথে তোমার আলাপ-আলোচনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করো। এতে এলাকার উন্নতি স্থিতিশীল হবে এবং জনগণ পূর্ববৎ দৃঢ়চিত্ত থাকবে।

বিভিন্ন শ্রেণীর লোক

জেনে রাখো, জনগণ বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হলেও একে অপরের সহায়তা ছাড়া উন্নতি লাভ করতে পারে না এবং তারা কেউ স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। তাদের মধ্যে আল্লাহ্র পথে নিয়োজিত সৈনিক রয়েছে, বিভাগীয় প্রধান ও জনগণের সচিবালয়ের কর্মচারী রয়েছে, ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য বিচারক রয়েছে, আশ্রিত অমুসলিম ও মুসলিমগণের মধ্য হতে জিজিয়া ও খারাজ প্রদানকারী অনেকেই রয়েছে, ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি রয়েছে এবং দুঃস্থ ও অভাবগ্রস্থ রয়েছে। আল্লাহ্ তাদের প্রত্যেকের হিস্যা ও সীমা তাঁর কুরআনে এবং তঁর রাসুলের সুন্নাহ্য় নির্ধারিত করে দিয়েছেন যা আমাদের কাছে সংরক্ষিত রয়েছে।

সেনাবাহনী, ইনশাল্লাহ্, জনগণের জন্য দুর্গ স্বরূপ, শাসকদের অলঙ্কার, দ্বীনের শক্তি এবং শান্তির উপায়। সেনাবাহিনী ছাড়া জনগণ টিকতে পারবে না। আবার রাজস্বের যে অংশ আল্লাহ্ তাদের জন্য নির্ধারিত করেছেন সে অংশ দ্বারা তারা শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করার শক্তি পাচ্ছে এবং তাদের প্রয়োজন মেটাচ্ছে। এ দু'শ্রেণীর লোক তৃতীয় শ্রেণী অর্থাৎ বিচারক, নির্বাহী ও সচিব ছাড়া চলতে পারে না। যারা চুক্তি সম্পর্কে রায় দেয়, রাজস্ব সংগ্রহ করে এবং সাধারণ কল্যাণ ও বিশেষ বিষয়াবলী পরিচালনা করে।

এসব শ্রেণীগুলো আবার ব্যবসায়ী ও শিল্প-কারখানা ছাড়া চলতে পারে না। কারণ এরা প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরবরাহ করে ও বাজার স্থাপন করে। ফলে অন্যদেরকে এগুলো নিজ হাতে করতে হয় না। এরপর থাকে

অভাবগ্রস্থ ও দুঃস্থগণ যাদেরকে সাহায্য করা আবশ্যকীয় এবং তারা সকলেই আল্লাহ্‌র নামে জীবিকা পায়। শাসকের উপর তাদের প্রত্যেকের অধিকার আছে যাতে তাদের উন্নতি সধিত হয়। শাসকের ওপর এ বিষয়ে আল্লাহ্ যে দায়িত্ব অর্পণ করেছেন তা কোন ক্রমেই পরিত্যাগ করা যাবে না।

১। সেনাবাহিনী

এমন লোককে তোমার সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব অর্পণ করো যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুল এবং তোমার ইমামের প্রতি সবচেয়ে বেশী আনুগত্য রাখে ও তাদের শুভাকাঙ্খী। সেনাবাহিনীর নেতাদের মধ্যে সেই সবচাইতে সৎ ও ধৈর্যশীল যে ওজর ছাড়া সহজে কাউকে আক্রমণ করে না, যে দুর্বলের প্রতি সদয় এবং সবলের প্রতি নমনীয় নয়। এরা কখনো অন্যের উচ্ছৃঙ্খলতায় উত্তেজিত হয়ে পড়ে না এবং দুর্বলতা এদের বসিয়ে রাখতে পারে না।

উচ্চ বংশমর্যাদা সম্পন্ন, ধার্মিক ও সুন্দর ঐতিহ্যের অধিকারী, সাহসী ও বীরত্বপূর্ণ এবং উদার ও দয়াদ্র লোকদের সঙ্গে মেলামেশা করো, কারণ তারা সম্মানের পাত্র এবং ধার্মিকতার ঝর্ণাধারা। তাদের বিষয়াদি নিয়ে এমনভাবে সংগ্রাম করবে যেন পিতামাতা সন্তানের জন্য সংগ্রাম করে। তাদের শক্তিশালী করতে তুমি যা কিছু কর তা অনেক বড় কিছু করেছো বলে মনে করো না অথবা তাদের জন্য যা কিছু করতে তুমি সম্মত হয়েছো তা ক্ষুদ্র মনে করে পরিত্যাগ করো না। এতে তারা তোমার শুভানুধ্যায়ী হবে এবং তোমার সম্পর্কে সুধারণা পোষণ করবে। তাদের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলীর প্রতি নিজকে অধিক ব্যস্ত রেখে ক্ষুদ্র বিষয়গুলোকে অবহেলা করো না। কারণ তোমার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আনুকূল্যগুলোও তাদের অনেক উপকারে আসতে পারে।

সেনাবাহিনীর কমান্ডারগণ তোমার কাছে এমন মর্যাদা সম্পন্ন হবে যেন তারা তাদের অধীনস্থগণকে ন্যায়ানুগ সাহায্য করে এবং তাদের পরিবারের দুঃখ-দুর্দশা মোচন করতে অর্থ ব্যয় করে। এতে সাধারণ সৈন্যদের নানাবিধ উদ্বিগ্নতা থাকবে না এবং তারা শুধু শত্রুর সাথে লড়াই করার জন্য একাগ্র থাকবে। তাদের প্রতি তোমার দয়াদ্রতা তাদের মনে তোমার প্রতি ভালবাসার উদ্রেক করবে। একজন শাসকের জন্য সব চাইতে আনন্দদায়ক বিষয় হলো ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও প্রজাদের ভালবাসা অর্জন করা। প্রজাদের মন পরিষ্কার হলেই তাদের ভালবসার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। তাদের শুভেচ্ছা কেবলমাত্র তখনই সঠিক হবে যখন তারা তাদেরকে রক্ষা করার জন্য কমান্ডারের চারপাশে ভিড় করে। তাদের পদমর্যাদাকে কখনো বোঝা মনে করো না এবং তাদের মেয়াদকাল সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত পর্যবেক্ষণে থেকো না। সুতরাং তাদের আশা-আকাঙ্খার প্রতি উদারমনা হয়ো, তাদের প্রশংসা করো এবং যারা ভাল কাজ করবে তাদের কাজের কথা বারবার বলো, কারণ ভাল কাজের প্রশংসা করলে বীরগণ আনন্দিত হবে এবং দুর্বলগণ সতেজ হয়ে উঠবে, ইনশাল্লাহ্।

তাদের প্রত্যেকের কৃতিত্বপূর্ণ কাজের জন্য প্রশংসা করো। এক জনের কৃতিত্ব অন্য জনের ওপর দিয়ো না এবং কর্মের তুলনায় কম পুরস্কার প্রদান করো না। উচ্চ পদমর্যাদার জন্য কারো ক্ষুদ্র কাজকে বড় করে প্রকাশ করো না এবং নিম্ন পদমর্যাদার বলে কারো বৃহৎ কাজকে ক্ষুদ্র বিবেচনা করো না।

যে সমস্ত ব্যাপার তোমাকে উদ্বিগ্ন করে এবং তোমার কাছে গোলমেলে মনে হয় সে বিষয়ে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের আশ্রয় গ্রহণ করো। কারণ যাদেরকে মহিমান্বিত আল্লাহ্ সঠিক পথ দেখাতে চান তাদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেছেন, "ওহে, তোমরা যারা বিশ্বাস কর! তারা আল্লাহ্ ও রাসুল এবং যাদের কর্তৃত্ব দেয়া হয়েছে তাদের আনুগত্য কর; আর তোমাদের মধ্যে কোন বিষয়ে বিবাদ উপস্থিত হলে তা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের হাতে ছেড়ে দাও, যদি তোমরা আল্লাহ্ ও শেষ বিচারে বিশ্বাস কর (কুরআনা ৪ঃ ৫৯)।

আল্লাহ্‌র হাতে ছেড়ে দেয়া মানেই কুরআনের স্পষ্ট বিধান অনুযায়ী কাজ করা এবং রাসুলের হাতে ছেড়ে দেয়া মানেই তাঁর সুন্নাহ্ অনুসরণ করা যাতে কোন মতদ্বৈধতা নেই।

২। বিচারপতি

জনগণের মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য তোমার মতে প্রজাগণের মধ্যে যে ব্যক্তি সব চাইতে সম্মানিত তাকে বিচারক মনোনীত করো। তার সামনে যেসব মামলা আসবে তাতে সে যেন ক্ষিপ্ত না হয় এবং বিরোধের বিষয়ে সে যেন উত্তেজিত না হয়। কোন ভুল বিষয়ে সে যেন জেদ না ধরে এবং যখন সে সত্য বিষয় বুঝতে পারে তখন যেন তা গ্রহণ করতে অসম্মত না হয়। সে যেন লোভের বশবর্তী না হয় এবং কোন বিষয়ের গভীরে না গিয়ে ভাসা-ভাসা জ্ঞান নিয়ে বিচার না করে। সন্দেহজনক বিষয়ে থেমে যাওয়া তার চলবে না—যুক্তিতর্কের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং বিরোধকারীদের ঝগড়া-তর্কে তার বিরক্ত হওয়া চলবে না। তাকে ধৈর্য্য সহকারে বিষয়ের গভীরে অনুপ্রবেশ করতে হবে এবং রায় প্রদান কালে চরম নির্ভিকতা প্রদর্শন করতে হবে। কোন পক্ষের প্রশংসা যেন তাকে উৎফুল্ল না করে তোলে। এ ধরনের লোক খুব কমই পাওয়া যায়।

তৎপর মাঝে মধ্যে তার রায় পরীক্ষা করে দেখো এবং তাকে সে পরিমাণ অর্থ পারিশ্রমিক দেবে যাতে সে অসৎ হবার জন্য কোন ওজর দেখাতে না পারে। এতে তার কোন প্রয়োজনে অন্যের কাছে হাত বাড়াবার প্রয়োজন থাকবে না। তাকে এমন পদবীতে ভূষিত করবে যাতে করে তোমার কোন অফিসার তার উপর কর্তৃত্ব করতে না পারে। এ বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখো, কারণ এ দ্বীন ইতোপূর্বে দুষ্ট ও দুর্নীতিপরায়ণদের হাতে বন্দি ছিল যখন আবেগের বশবর্তী হয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হতো এবং তাতে জাগতিক সম্পদ চাওয়া হতো।

৩। নির্বাহী অফিসার

এরপর নির্বাহী অফিসারদের কর্মকাণ্ডের প্রতি নজর দিয়ো। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তাদেরকে নিয়োগ করো। কখনো স্বজন-প্রীতি ও কাউকে আনুকূল্য প্রদর্শন করে তাদের নিয়োগ করো না, কারণ এ দুটি জিনিসই অবিচার ও অন্যায়ের উৎস। অভিজ্ঞ এবং বিনয়ী দেখে তাদের নিয়োগ করো। যারা ধার্মিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছে এবং পূর্বে ইসলাম ধর্মে ছিল তারা অকলঙ্কিত সম্মানের অধিকারী। তারা লোভের বশবর্তী হয় না এবং সর্বদা কোন বিষয়ের পরিণামের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখে।

তাদের বেতন এমনভাবে দেবে যাতে তারা স্বাচ্ছন্দে পর্যাপ্ত জীবিকা নির্বাহ করতে পারে। এতে তারা নিজেদেরকে সৎপথে রাখতে পারবে এবং তাদের তত্ত্বাবধানে রক্ষিত সম্পদের প্রতি নজর দেবে না। এতে যদি তারা কখনো তোমার আদেশ অমান্য করে এবং রাষ্ট্রীয় সম্পদ আত্মসাৎ করে তবে তাতে তাদের কোন যুক্তি চলবে না। তাদের কর্মকাণ্ডের প্রতি নজর রেখে তোমাকে রিপোর্ট দেয়ার জন্য কিছু সংখ্যক সত্যবাদী ও বিশ্বাসী লোক রেখো, কারণ তোমার গোপন সংবাদ রাখার কথা জানতে পারলে তারা সততা রক্ষা করতে ও জনগণের প্রতি সদয় হতে বাধ্য হবে। সহকারীগণ সম্পর্কে সতর্ক থেকো। যদি তাদের মধ্যে কেউ সরকারী সম্পদ আত্মসাৎ করতে সাহস করে এবং তোমার গোপন সংবাদদাতার সংবাদে তা সত্য বলে জানা যায় তবে তাই প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করো। তখন তুমি তাকে শারীরিক শাস্তি প্রদান করো এবং যা সে আত্মসাৎ করেছে তা উদ্ধার করে নিয়ো। এ রকম লোককে অমর্যাদাকর অবস্থানে নামিয়ে দিয়ো এবং আত্মসাতের অপরাধে তাকে ব্ল্যাকলিষ্ট করে দিয়ো এবং তার অপরাধের জন্য অপমানের মালা তাকে পরিয়ে দিয়ো।

৪। রাজস্ব প্রশাসন

রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে যে, রাজস্ব (খারাজ) প্রদানকারীগণ যেন তাদের সম্পদে ক্ষতিগ্রস্থ না হয়। কারণ রাজস্ব দাতাদের উন্নতির ওপরই সমাজের অন্য সকলের উন্নতি নির্ভরশীল। রাজস্ব দাতাগণ ছাড়া অন্যরা উন্নতি লাভ করিতে পারে না, কারণ জনগণ রাজস্ব ও রাজস্ব দাতাদের ওপর নির্ভরশীল। রাজস্ব আদায়

অপেক্ষা চাষাবাদের প্রতি তোমাকে বেশী নজর দিতে হবে। কারণ চাষাবাদ ছাড়া রাজস্ব আদায় করা সম্ভব নয় এবং চাষাবাদ ছাড় রাজস্ব দাবী করা মানেই জনগণকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়া। এ রকম শাসন বেশীক্ষণ টেকে না।

যদি তারা আরোপিত কর সহনীয় নয় বলে অভিযোগ করে অথবা রোগব্যাধি অথবা পানির অভাব অথবা পানির আধিক্য অথবা জমির অবস্থা পরিবর্তন অথবা বন্যা অথবা খরার কবলে পড়ে তবে তাদের কষ্টের কথা বিবেচনা করে কর মওকুফ করো যাতে তাদের কষ্ট লাঘব হয়ে অবস্থার উন্নতি হয়। প্রজাদের দুঃখ-দুর্দশা লাঘব করার জন্য রাজস্ব হার কমিয়ে দেয়াতে কখনো বিচলিত বা অসম্মত হয়ো না, কারণ এটা শাসকের জন্য এমন বিনিয়োগ যা প্রশংসা ছাড়াও দেশের সুখ-সমৃদ্ধি এবং শাসনকালকে সুখ-সমৃদ্ধি ও শান্তি-শৃংখলার মধ্যে রাখবে। এ বিনিয়োগের কারণে তুমি তাদের শক্তির উপর আস্থা রাখতে পারবে এবং তাদের প্রতি দয়া দেখায়ে যে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করবে তজ্জন্য তারা তোমার প্রতি আস্থাশীল থাকবে। এরপর অবস্থা এমনও হতে পারে যে তাদের সাহায্য তোমার প্রয়োজন হয়ে পড়বে। তখন তারা সানন্দে তা বহন করবে, কারণ সমৃদ্ধ হলে তারা যে কোন বোঝা বহন করতে সক্ষম হবে। কৃষকের দারিদ্র যে কোন দেশের ধ্বংস নিয়ে আসে। যখন কৃষকেরা দরিদ্র হয়ে পড়ে আর অফিসারগণ চাকুরী বাঁচানোর জন্য কর আদায়ে তৎপর থাকে তখনই দেশে অসন্তোষ ও গোলযোগ দেখা দেয়।

৫। কর্মচারীদের সংস্থাপন

তৎপর কর্মচারীদের প্রতি যত্নবান হয়ো। তাদের মধ্যে যে সর্বোত্তম তাকে তোমার কাজকর্ম চালাবার ভার দিয়ে দিয়ো। তাদের মধ্যে যে উত্তম চরিত্রের এবং সম্মানের কারণে গর্বিত নয় এমন লোককে তোমার পলিসি ও গোপন বিষয় সংক্রান্ত পত্রের দায়িত্ব অর্পণ করো। তোমার অফিসারদের চিঠি-পত্র তোমার সামনে তুলে ধরতে সে যেন কখনো গাফলতি না করে এবং ঐ সব পত্রের সঠিক জবাব যেন তোমার পক্ষ থেকে পাঠায়। সে যেন তোমার পক্ষ থেকে ক্ষতিকারক কোন চুক্তি সম্পাদন না করে এবং তোমার বিরুদ্ধে যায় এমন চুক্তি প্রত্যাখ্যান করতে সে যেন ব্যর্থ না হয়। কোন বিষয়ে সে যেন তার নিজের মর্যদার বিষয়ে বেমালুম না হয়, কারণ যে নিজের মর্যাদা বুঝতে পারে না সে অন্যের মর্যাদা মোটেই বুঝতে পারে না।

এসব লোক নিয়োগ করতে শুধুমাত্র তোমার জানাশোনা, আস্থাবান ও তাদের প্রতি তোমার ভাল ধারণার উপর নির্ভর করো না, কারণ তুমি মুষ্টিমেয় ক্ষেত্রে তাদের দেখতে পেয়েছো। তাদের অনেকেই কৃত্রিম ভাল আচার-আচরণ দ্বারা তোমার মন জয় করতে পারে। কাজেই তোমার পূর্ববর্তী শাসন আমলে তাদের কর্মকাণ্ডের রেকর্ড দেখে তাদের নিয়োগ করো। জন সাধারণের কাছে যার সুনাম ও বিশ্বাসযোগ্যতার খ্যাতি রয়েছে তার অনুকূলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করো। এতে আল্লাহ্‌র প্রতি তোমার দৃঢ় প্রত্যয় প্রকাশ পাবে এবং তোমার ইমামের প্রতিও শ্রদ্ধা প্রদর্শিত হবে। সরকারী কর্মকাণ্ডকে কয়েকটি ভাগ করে প্রত্যেক বিভাগের জন্য একজন প্রধান নিয়োগ করো। তাকে এমন হতে হবে যেন বড় বড় বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সে অযোগ্য না হয় এবং কাজের চাপে যেন সে হতবুদ্ধি হয়ে না পড়ে। সচিবদের ত্রুটি-বিচ্যুতি যদি তুমি এড়িয়ে যাও তবে সেজন্য তোমাকে দায়ী করা হবে।

৬। ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিগণ

এখন ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিগণ সম্পর্কে কিছু উপদেশ নাও। তারা দোকানদার হোক, ব্যবসায়ী হোক আর কায়িক শ্রমিক হোক তাদেরকে ভাল উপদেশ দিয়ো, কারণ তারা লাভের উৎস এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস পত্রের যোগানদার। সুদূর এলাকা, পাহাড়-পর্বত-সমুদ্র যেখানে মানুষ যেতে সাহস পায় না সেখান থেকে এরা দ্রব্য সামগ্রী নিয়ে আসে। এরা শান্তি প্রিয় এবং এদের কাছ থেকে বিদ্রোহের কোন ভয় নেই। এরা কখনো দেশদ্রোহী হয় না।

তোমার সামনে এদের কোন বিষয় উত্থাপিত হলে তা সমাধান করে দিয়ো এবং তোমার সীমানার যে কোন স্থানে তাদের যেতে দিয়ো। এর সাথে মনে রেখো, তাদের অধিকাংশই হীনমনা ও ধনলোভী। তারা বেশী মুনাফা অর্জনের লোভে মালপত্র মওজুদ করে রাখে এবং অধিক মূল্যে পরে বিক্রি করে। এটা জনগণের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর এবং ভারপ্রাপ্ত অফিসারদের জন্য কলঙ্ক। মালামালের মজুদদারী বন্ধ করে দিয়ো, কারণ আল্লাহ্‌র রাসুল এটা নিষিদ্ধ করেছেন। সঠিক দামে ও ওজনে রীতিমত মালামাল বিক্রি করতে হবে। এতে ক্রেতা ও বিক্রেতা কেহই ক্ষতিগ্রস্থ হয় না। তোমার শাসনকালে যারা মজুদদারী করবে তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়ো, কিন্তু কঠোর শাস্তি নয়।

৭। নিম্ন শ্রেণীর লোক

নিম্ন শ্রেণী লোকদের ব্যাপারে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করো এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করো। এরা হলো সেই শ্রেণী যারা গরীব, দুঃস্থ, কপর্দকহীন ও আঁতুর। এশ্রেণী দু'ভাগে বিভক্ত—একদল অতৃপ্ত—অন্যদল ভিক্ষুক। এদের প্রতি আল্লাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব পালন করতে যত্নবান হয়ো। তা না করলে আল্লাহ্‌র কাছে তুমি দায়ী হবে। তাদের জন্য সরকারী কোষাগার হতে ভাতা নির্ধারণ করে দিয়ো এবং প্রত্যেক এলাকার শস্য হতে ভাতা নির্ধারণ করে দিয়ো এবং যা যুদ্ধলব্ধ হয় তার একটা অংশ নির্ধারণ করো দিয়ো। কারণ এতে নিকটর্বর্তীগণ ও দূরবর্তীগণ সমান অংশ পাবে। সব লোকের দায়িত্ব তোমার হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে। সুতরাং জাকজমকে গা এলিয়ে দিয়ে এদের কথা ভুলে যেয়ো না এবং এদের থেকে দূরে সরে থেকো না। এটা ক্ষুদ্র বিষয় হলেও এড়িয়ে গিয়ে ক্ষমা পাবে না, করণ এর চাইতে অনেক বড় সমস্যার সিদ্ধান্ত তুমি গ্রহণ করবে। ফলে তাদের প্রতি কখনো অমনোযোগী হয়ো না অথবা অহম বশতঃ তাদের প্রতি মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না।

যারা সহজে তোমার কাছে আসতে পারে না অথবা মানুষ যাদের নীচ বলে মনে করে তাদের ব্যাপারে যত্নবান হয়ো। তাদের অবস্থা দেখা-শুনার জন্য এমন কিছু লোক নিয়োগ করো যারা বিনয়ী ও খোদাভীরু। এ সব লোক তাদের প্রকৃত অবস্থা সঠিকভাবে তোমাকে অবহিত রাখবে। তাদের বিষয়াবলী নিষ্পত্তি করতে আল্লাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্বের কথা মনে রেখো। কারণ এ দায়িত্বের জন্য তোমাকে জবাবদিহি করতে হবে যখন তুমি তাঁর সাক্ষাতে যাবে। মনে রেখো, প্রজাদের মধ্যে এরা সব চাইতে বেশী ন্যায়াচরণ পাবার দাবী রাখে। একই সাথে অন্যদের অধিকারও পূর্ণ করে দিয়ো যাতে আল্লাহ্‌র কাছে হিসাব দিতে পার।

এতিম ও বৃদ্ধ যাদের জীবিকার্জনের কোন উপায় নেই অথচ তারা ভিক্ষাবৃত্তিও গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয় এদের প্রতি বিশেষ যত্নবান হয়ো। এ দায়িত্ব অফিসারদের ওপর গুরুভার; বস্তুতঃ প্রত্যেক অধিকার ও দয়িত্ব এক একটি গুরুভার। যারা পরকালের পুরস্কার চায় তাদের জন্য আল্লাহ্ এ দায়িত্ব হালকা করেছেন এবং তাদের প্রতি আল্লাহ্ যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন উহার সত্যতা সম্বন্ধে আস্থা রেখো। প্রজাদের নালিশ শুনার জন্য একটা সময় নির্ধারণ করে নিয়ো। ঐ সময়ে মনোযোগ সহকারে এবং সর্বসাধারণের সামনে প্রকাশ্যে তাদের অভিযোগ শ্রবণ করো। এ সময়ে তোমার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌র কথা স্মরণ করে বিনয়ী অবস্থায় থেকো। যখন তুমি প্রজাদের অভিযোগ শুনবে তখন তোমার কোন সৈন্যবাহিনীর সদস্যকে ধারে কাছে রেখো না। এতে করে মানুষ যা বলতে এসেছে তা নির্দ্বিধায় ও নিঃশঙ্ক চিত্তে বলতে পারবে। আমি একাধিক স্থানে আল্লাহ্‌র রাসুলকে বলতে শুনেছি, যে জনগোষ্ঠিতে দুর্বলের অধিকারে সবলেরা নিরাপত্তা প্রদান করে না এবং দুর্বলদের শঙ্কাহীন করে না সে জনগোষ্ঠী কখনো পবিত্রতা অর্জন করতে পারবে না। কোন কিছু বলতে তাদরে অক্ষমতা ও প্রতিবন্ধকতা সহ্য করে নিয়ো। এজন্য আল্লাহ্ তার রহমতের ছায়া তোমার ওপর ছড়িয়ে দেবেন এবং তাঁর অনুগত্যের জন্য মহাপুরস্কার তোমার জন্য নির্ধারণ করে দেবেন। যাকিছু তুমি দান কর না কেন, প্রফুল্ল মনে দান করো। কিন্তু যখন তুমি দান করতে পারবে না এবং যাচনাকারীকে ফিরিয়ে দাও তখন ভালভাবে তার কাছে ক্ষমা চেয়ে ফিরিয়ে দিয়ো।

এরপর আরো কিছু কাজ থেকে যাবে যা তুমি নিজ হাতে সম্পাদন করতে হবে। উদহারণ স্বরূপ, তোমার অফিসারদের পত্রের জবাব, যদি তোমার সচিবগণ তা করতে সক্ষম না হয়, অথবা জনগণের অভিযোগ নিষ্পত্তি-করণ যা তোমার সহাকারীগণ করতে শঙ্কিত হয়। দিনের কাজ দিনেই শেষ করো কারণ প্রতিদিনই নির্ধারিত কাজ আছে। দিনের উত্তম ও বেশীর ভাগ ইবাদতের জন্য নির্ধারিত রেখো যদিও প্রতিটি কাজই আল্লাহ্‌র কাজ যদি উহার নিয়্যত পবিত্র হয় এবং প্রজাদের মঙ্গলের জন্য হয়।

আল্লাহ্‌র ধ্যান

যেসব বিশেষ কাজ দ্বারা তুমি তোমার দ্বীনের পবিত্রতা অর্জন করতে পারবে তা হলো আল্লাহ্‌র প্রতি তোমার বিশেষ দায়িত্বগুলো পালন ও পূর্ণ করা। সুতরাং দিনে ও রাতে কিছু শারীরিক কসরত দ্বারা আল্লাহ্‌র ধ্যানে মগ্ন হয়ো। তুমি আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের জন্য যা কিছু কর না কেন তা হতে হবে পরিপূর্ণ, ত্রুটিবিহীন ও ঘাটতিবিহীন। এটা করতে যতই শারীরিক কষ্ট হোক না কেন তাতে পিছ পা হয়ো না। যখন তুমি নামাজে ইমামতী করবে তখন মনে রাখবে, তা যেন এত লম্বা না হয় যাতে মানুষ অস্বস্তি অনুভব করে। আবার এমন খাট যেন না হয় যাতে উহা পণ্ড হয়ে পড়ে। কারণ তোমার পেছনে এমন লোকও থাকতে পারে যে রুগ্ন অথবা যার নিজের কিছু জরুরী প্রয়োজন রয়েছে। যখন আল্লাহ্‌র রাসুল আমাকে ইয়েমেন প্রেরণ করেছিলেন আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম কিভাবে তাদের সাথে নামাজ আদায় করবো। তিনি বলেছিলেন, "এমনভাবে সালাত কায়েম করো যাতে তাদের মধ্যকার সবচাইতে দুর্বল ব্যক্তিও তা করতে পারে এবং ইমানদারগণের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ো।'

শাসকের আচরণ ও কর্ম সম্পর্কে

দীর্ঘ সময় ব্যাপী নিজকে জনগণ হতে দূরে সরিয়ে রেখো না। কারণ যারা প্রশাসনের কর্তৃত্ব প্রাপ্ত তারা জনগণ হতে সরে থাকা অদূরদর্শীতার পরিচায়ক এবং এতে জনগণ তাদের কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে অনবহিত থেকে যায়।

জনগণ হতে দূরে সরে থাকলে তারা যা জানে না সে বিষয়ে জ্ঞানার্জন করতে পারে না। ফলে তারা ছোট ছোট বিষয়গুলোকে বড় এবং বড় বড় বিষয়গুলিকে ছোট মনে করে ভুল পথে চলতে থাকে। তারা ভালকে মন্দ এবং মন্দকে ভাল মনে করে ভুল করতে পারে। এ সবের ফলে সত্য বিষয়ে মতদ্বৈধতা দেখা দেয় এবং অসত্য প্রচলিত হয়ে পড়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। মোটের উপর একজন শাসক মানুষ বটে। কাজেই জনগণ যা তার কাছে গোপন রাখে তা সে জানতেও পারে না।

সত্যের বিভিন্নরূপ প্রকাশকে মিথ্যা হতে আলাদা করার জন্য কোন সুস্পষ্ট রং বা আলেখ্য নেই। এতে দু'প্রকার মানুষের মধ্যে তুমি এক প্রকার হতে পার। হয় তুমি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় উদার হতে পার, সে ক্ষেত্রে তোমার দায়িত্ব ও কর্ম সঠিকভাবে সম্পাদন করে কেন তুমি জনগণ হতে আত্মগোপন করে থাকবে? অথবা তুমি জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় কার্পণ্য প্রদর্শন করতে পার, সেক্ষেত্রে জনগণ হতাশ হয়ে পড়বে যেহেতু তোমার কাছে থেকে উদার ব্যবহার পাওয়ার আর কোন আশা তাদের থাকবে না। এতদসত্ত্বেও তোমার কাছে জনগণের এমন সব প্রয়োজন রয়ে গেছে যা তোমাকে কোন প্রকার অভাব-অনটন বা কষ্টে ফেলবে না; যেমন —অত্যচারের বিরুদ্ধে অভিযোগ বা কোন বিষয়ে ন্যায় বিচারের আবেদন।

একজন শাসকের কিছু প্রিয় লোক থাকে যারা সহজে তার কাছে যেতে পারে। এরাই সচরাচর জনগণের সম্পদ আত্মসাৎ করে। এরা উদ্ধত ও স্বেচ্ছাচারী হয় এবং এরা কোন বিষয়ে ন্যায়ের তোয়াক্কা করে না। এসব পাপাচারের মূলোৎপাটন তোমাকে করতে হবে এবং এ ধরনের লোকদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করতে হবে। তোমার

সমর্থক অথবা যারা তোমার পেছনে পেছনে ঘুরে তাদের কখনো জমি মঞ্জুর করো না। তারা যেন তোমার কাছে থেকে জমির দখল আশা করতে না পারে যা পার্শ্ববর্তী লোকদের চাষাবাদ, সেচ ও অন্যান্য কাজে ক্ষতি সাধন করতে পারে। এসব লোকদের জমি দিলে তোমার কোন উপকার হবে না এবং যারা অসুবিধায় পড়বে তারা তোমাকে দোষারোপ করবে এবং পরকালেও তোমাকে জবাবদিহি হতে হবে।

প্রত্যেককে তার প্রাপ্যতা অনুসারে প্রাপ্য পরিশোধ করো সে যে কেউ হোক না কেন—হোক সে তোমার নিকট আত্মীয় অথবা দূরবর্তী কোন লোক। এ কাজে তোমাকে সহিষ্ণু ও সর্তক হতে হবে যদিও এতে তোমার আত্মীয় অথবা কোন প্রিয় ব্যক্তির সংশ্লিষ্টতা তোমার জন্য বেদনাদায়ক হতে পারে। কিন্তু এর ফলে তোমার জন্য যা বিনিময় আসবে তা অতি সুন্দর (সুনাম ও আল্লাহ্‌র পুরস্কার)। যদি প্রজারা তোমাকে উদ্ধত ও স্বেচ্ছাচারী মনে করে তবে খোলাখুলিভাবে তাদের কাছে তোমার অবস্থা বর্ণনা করো এবং তোমার ব্যাখ্যা দ্বারা তাদের সন্দেহ দূর করার চেষ্টা করো। কারণ এ ব্যাখ্যা তোমার আত্মার প্রশান্তি আনবে এবং প্রজগণকে সত্য উপলব্ধি করতে সহায়তা করবে।

যদি তোমার শত্রু শান্তি স্থাপনের আহবান জানায় তবে তাতে সাড়া দিয়ো —আহবান বাতিল করে দিয়ো না। শান্তি স্থাপনে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি পাওয়া যায়। শান্তি স্থাপিত হলে তোমার সৈন্যবাহিনী বিশ্রাম পাবে, তুমি উদ্বিগ্নতা হতে নিস্তার পাবে এবং তোমার দেশ নিরাপদ থাকবে। একটা বিষয় মনে রেখো, শান্তি স্থাপনের পর শত্রুর আক্রমণের ভয় বেশী। কারণ শত্রু অনেক সময় অবহেলার সুযোগ গ্রহণ করার জন্য শান্তির প্রস্তাব দিয়ে থাকে। কাজেই এদিকে সতর্ক থেকো এবং এ ব্যাপারে গা এলিয়ে দিয়ো না। যদি কখনো শত্রুর সংগে কোন ব্যাপারে চুক্তিবদ্ধ হও তবে চুক্তির শর্ত মেনে চলো এবং বিশ্বস্ততার সাথে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করো। তোমার প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য নিজকে বর্ম করে রেখো। কারণ মানুষের মধ্যে ধ্যান-ধারণা, আদর্শ ও মতের পার্থক্য থাকতে পারে। কিন্তু প্রতিশ্রুতি পালনকারীর প্রতি সকলেরই সম্মানবোধ থাকে এবং আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ। শুধু মুসলিম নয়, কাফেরগণ পর্যন্ত চুক্তির শর্ত মেনে চলে, কারণ চুক্তিভঙ্গের মারত্মক পরিণতি তারা অনুধাবন করতে পেরেছিল। সুতরাং শত্রুকে প্রতারণা করো না, কারণ অজ্ঞ ও পাপাচারী ছাড়া কেউ আল্লাহ্‌কে অসন্তুষ্ট করে না। আল্লাহ্ তাঁর চুক্তি ও প্রতিশ্রুতিকে তার বান্দাদের ওপর দয়া ও ক্ষমার মাধ্যমে ছড়িয়ে দিয়ে নিরাপত্তা দান করেছেন যার মধ্যে তারা নিরাপদে বাস করে এবং তাঁর নৈকট্যের সুফল অনুসন্ধান করে। সুতরাং প্রতিশ্রুতিতে কোন প্রকার প্রবঞ্চনা, চাতুর্য বা কুটবুদ্ধি থাকতে পারবে না।

এমন কোন চুক্তি করো না যার অন্য কোন ব্যাখ্যা হতে পারে অর্থাৎ চুক্তিতে দ্ব্যর্থক কথা ব্যবহার করো না। চুক্তি সম্পাদন সমাপ্ত হবার পর এর অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা পরিবর্তন করো না। যদি আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে করা কোন চুক্তিতে তুমি কোন দুর্দশাগ্রস্থ হও তবুও যথেষ্ট যৌক্তিকতা ব্যতীত উহা বাতিল করো না। কারণ গোলযোগ অপেক্ষা কষ্ট সহ্য করা অধিকতর ভাল। গোলযোগের পরিণতি ভয়াবহ, এজন্য আল্লাহ্‌র কাছে জবাবদিহি হতে হবে এবং ইহকাল ও পরকালে এর জন্য ক্ষমা পাবে না।

যথেষ্ট যৌক্তিকতা ছাড়া রক্তপাত এড়িয়ে যেয়ো। কারণ আল্লাহ্‌র মহাশাস্তি আমন্ত্রণে, কুপরিণতি আনয়নে সমৃদ্ধির পথে বাধা দিতে ও জীবন পথকে খাট করে দিতে অহেতুক রক্তপাতের কোন জুড়ি নেই। শেষ বিচারের দিনে মহিমান্বিত আল্লাহ্ রক্তপাতের ঘটনা দিয়ে তাঁর বিচার কার্য শুরু করবেন। সুতরাং তোমার সরকারকে শক্তিশালী এবং ক্ষমতাকে সুসংহত করার জন্য নিষিদ্ধ রক্তপাত ঘটায়ো না। কারণ অহেতুক রক্তপাত কর্তৃত্ব দুর্বল ও ক্ষীণ করে ধ্বংসের দিকে নিয়ে ক্ষমতার বদল ঘটায়। ইচ্ছাকৃত হত্যার জন্য তুমি আল্লাহ্‌র অথবা আমার সম্মুখে কোন কৈফিয়ত দিতে পারবে না। কারণ এ ধরনের কাজে অবশ্যই প্রশ্ন বা প্রতিশোধ নেয়ার বিষয় থাকে। যদি তুমি ভুলবশতঃ অথবা তোমার তরবারি সম্বরণ করতে না পেরে অথবা শাস্তি প্রদানে কঠোর হয়ে কাউকে হত্যা কর তবে তোমার ক্ষমতার দম্ভ যেন তার উত্তরাধিকারীদেরকে ক্ষতিপূরণ প্রদান হতে বিরত না করে।

তোমার মধ্যে যেসব ভাল গুণ আছে তা ভেবে কখনো আত্মগৌরব ও আত্মপ্রশংসা অনুভব করো না এবং মানুষের অতিরঞ্জিত প্রশংসায় আত্মপ্রসাদ লাভ করো না। কারণ ধার্মিকদের ভাল কাজগুলো পণ্ড করে দেয়ার জন্য এটা হচ্ছে শয়তানের একটা মোক্ষম সুযোগ। প্রজাদের প্রতি দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যেসব কল্যাণকর কাজ তুমি করেছো তা তাদরেকে দেখিয়ে দেয়া অথবা নিজের কাজের প্রশংসা অথবা প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভঙ্গ করা এড়িয়ে যেয়ো। কারণ দায়িত্ব পালন করে অন্যকে মনে করিয়ে দেয়া ভাল কাজের সুফল নষ্ট করে দেয়; আত্মপ্রসংশা সত্যের আলো কেড়ে নিয়ে যায় এবং প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী আল্লাহ্ ও মানুষের ঘৃণা অর্জন করে। মহিমান্বিত আল্লাহ্ বলেন, তোমরা যখন যা বল তা না করাটাই আল্লাহ্র কাছে সব চাইতে অপছন্দনীয়।"

সময় হবার আগেই কোন ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণে তড়িঘড়ি করো না। আবার সময় হয়ে গেলে সিদ্ধান্ত গ্রহণে শৈথিল্য করো না। কোন কাজের পরিণাম অনুধান করতে না পারলে তা করতে জেদ ধরো না। আবার পরিণাম অনুধাবন করতে পারলে দুর্বল হয়ে পড়ো না। প্রত্যেক কাজ যথাসময়ে যথাযথ প্রক্রিয়ায় ও যথাস্থানে করতে যত্নবান হয়ো।

যেসব বিষয়ে সবার সমান অংশ রয়েছে তা নিজের জন্য সংরক্ষিত করে রেখো না। অন্যের জন্য তোমাকে জবাবদিহি হতে হবে, এ অজুহাতেও সবার প্রকাশ্য বিষয় নিজের জন্য সংরক্ষিত করো না। সহসাই তোমার দৃষ্টি হতে সকল বিষয়ের পর্দা উন্মোচিত হবে এবং মজলুমের দুঃখ দূর করার জন্য তোমার দরকার হবে। আত্মসম্মান বোধ, ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ, বাহুবল ও জিহ্বার তীক্ষ্ণতার উপর নিয়ন্ত্রণ রেখো। কোনো কিছুতে তাড়াহুড়া করো না, ক্রোধ প্রশমিত না হওয়া পর্যন্ত কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণে বিলম্ব করো এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ শক্তি অর্জন করো। যে পর্যন্ত আল্লাহ্র কাছে প্রত্যাবর্তন বিষয়টি সর্বদা তোমার মনে জাগরুক না হবে সে পর্যন্ত তুমি এসব গুণ অর্জন করতে পারবে না।

তোমার স্মরণ করতে হবে যে, তোমার পূর্ববর্তীগণ তাদের কর্মকাণ্ড কিভাবে চালিয়েছে। এটা একটা সরকার হতে পারে, অথবা একটা মহৎ ঐতিহ্য হতে পারে অথবা আমাদের রাসুলের (সঃ) নজির হতে পারে অথবা আল্লাহ্র পবিত্র গ্রন্থে বিধৃত কোন অবশ্যপালনীয় আদেশ হতে পারে। তুমি সেগুলোকে এমনভাবে মানবে যেমন করে আমরা সেগুলোকে মেনে চলেছি। একইভাবে এ দলিলে আমি তোমাকে যা আদেশ করেছি তা তুমি পালন করো। যদি তোমার হৃদয় কামনা-বাসনার দিকে ঝুঁকে পড়ে তবে এ দলির তোমায় ফিরিয়ে রাখতে সহায়তা করবে। তুমি যেন সত্যের পথে সুদৃঢ় থাকতে পার সে জন্য আমি তোমার প্রতি আমার কর্তব্য পালন করলাম।

আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন তোমাকে ও আমাকে তাঁর হেদায়েতর পথে সুদৃঢ় থাকার তৌফিক দান করেন। তাঁর সন্তুষ্টি ও তাঁর বান্দাদের কল্যাণ সাধন এবং দেশের সমৃদ্ধি সাধনই যেন আমাদের সকলের কাজের লক্ষ্য হয়। তিনি যেন তোমাকে ও আমাকে শাহাদাত বরণ করার সৌভাগ্য দান করেন। নিশ্চয়ই, আমরা তাঁর কাছেই প্রত্যাবর্তন করবো। আল্লাহ্র রাসুল ও তাঁর বংশধরগণের উপর দরূদ ও সালাম। এখানেই শেষ করলাম।

১। এ দলিলখানাকে ইসলামী সমাজের গঠনতন্ত্র বলা যেতে পারে। এ দলিলখানা এমন এক ব্যক্তি লিখেছিলেন যিনি ঐশী বিধান পালন করতেন। আমিরুল মোমেনিনের এ দলিল থেকে তাঁর দেশ শাসনের প্রকৃতি সহজেই অনুমান করা যায় এবং তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল আল্লাহ্র দ্বীন কায়েম করা ও সমাজের উন্নতি সাধন করা। তিনি জনগণের নিরপত্তা বিঘ্নিত করা, লুটপাট করে রাজকোষ ভরে তোলা অথবা ন্যায়-অন্যায় বিবেচনা না করে রাষ্ট্রের সীমানা বদ্ধিত করার পক্ষপাতি ছিলেন না। যে সব সরকার জাগতিক বিষয়ে লোলুপ, তারা তাদের সুবিধা অর্জনের মত করে গঠনতন্ত্র তৈরী করে এবং তাদের জাগতিক স্বার্থ হাসিলের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে এমন সব আইন-কানুন বদল করে ফেলে। কিন্তু আমিরুল মোমেনিনের এ দলিল সর্বসাধারণের স্বার্থ রক্ষার জিম্মাদার এবং সমষ্টিগত সংগঠনের রক্ষক। এর নির্বাহণে স্বার্থপরতার কোন ছোঁয়াচ নেই। আল্লাহ্র প্রতি দায়িত্ব পালনের মৌলনীতি এতে বিধৃত রয়েছে। কোন ধর্ম বা গোত্র আলাদা না করে

মানুষের অধিকার সংরক্ষণের নীতি এতে রয়েছে। এতে রয়েছে দরিদ্র ও দুঃস্থের প্রতি যত্ন নেয়ার বিধান, নীচ ও অবহেলিতদের বাঁচার উপায়, শান্তি ও নিরাপত্তা এবং সমৃদ্ধি ও মানুষের কল্যাণ। এক কথায় অধিকার ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার পূর্ণ দেশনা এতে রয়েছে।

৩৮ হিজরী সনে যখন মালিক ইবনে হারিছ আশতারকে মিশরের গভর্ণর নিয়োগ করা হয়েছিল তখন আমিরুল মোমেনিন তাকে এটা লিখেছিলেন। আমিরুল মোমেনিনের প্রধান সহচরদের মধ্যে মালিক আশতার ছিল অন্যতম। তিনি আমিরুল মোমেনিনের প্রতি পরিপূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস এবং ধৈর্য ও দৃঢ়তা দেখিয়েছিলেন। আমিরুল মোমেনিনের আচরণ ও প্রকৃতি অনুসরণ করে তিনি তাঁর নৈকট্য ও সংশ্রব লাভ করেছিলেন এবং একজন পরিপূর্ণ মানবে পরিণত হয়েছিলেন। আমিরুল মোমেনিনের এ কথা হতে তার অবস্থান সহজে নির্ণয় করা যায়- "আমি আল্লাহ্র রাসুলের কাছে যেরূপ ছিলাম মালিক আমার কাছে তদ্রূপ" (হাদীদ[১৫২], ১৫শ খণ্ড, পৃঃ ৯৮; খায়াত[৫৭], ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃঃ ১৩১)। মালিকও স্বার্থহীনভাবে আমিরুল মোমেনিনের পক্ষে সকল যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে আমিরুল মোমেনিনের বাহু হিসাবে নিজকে প্রমাণ করেছেন। তিনি এরূপ সাহস ও বীরত্ব দেখিয়েছিলেন যে, সারা আরবে তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। এ বীরত্বের সাথে তিনি ছিলেন অসীম ধৈর্য ও ক্ষমার মূর্তপ্রতীক। ওয়াররাম ইবনে আবি ফিরাছ আন-নাখাই লিখেছেন যে, একদিন মালিক কুফার বাজার দিয়ে যাচ্ছিলেন। তার গায়ের কাপড় ও মাথার পাগড়ী ছিল চটের। একজন দোকানদার তাকে দেখে তার গায়ে পঁচা পাতা নিক্ষেপ করেছিল। এ নোংরা ব্যবহারে তিনি কিছু মনে করেননি। এমনকি লোকটির দিকে ফিরেও না তাকিয়ে তাড়াতাড়ি চলে গেলেন। এক ব্যক্তি দোকানদারকে বললো, "কাকে তুমি অপমান করলে তা কি জান?" দোকানদার বললো, "না, আমি চিনি না।" লোকটি বললো, 'ইনিই আমিরুল মোমেনিনের সহচর—মালিক আশতার।" এ কথা শুনা মাত্রই লোকটি পিছুপিছু দৌড়াতে লাগলো। ততক্ষণে মালিক মসজিদে প্রবেশ করে সালাত আদায় করতে শুরু করেছেন। সালাত শেষে লোকটি মালিকের পায়ে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে তার অপরাধের জন্য ক্ষমা চাইতে লাগলো। মালিক লোকটিকে তুলে ধরে বললেন, আল্লাহ্র কসম, তোমার জন্য ক্ষমা চাইতেই আমি মসজিদে প্রবেশ করেছি। আমি তোমাকে সেই মুহুর্তেই ক্ষমা করে দিয়েছি এবং আশা করি আল্লাহ্ও তোমাকে ক্ষমা করবেন (ফিরাস[৮৮], ১ম খণ্ড, পৃঃ ২; মজলিসী[১০৩], ৪২ তম খণ্ড, পৃঃ ১৫৭) আরবের বিখ্যাত একজন বীর যার নামে শত্রুর বুক কেঁপে উঠতো তার আচরণ ও ধের্য এমন ছিল। এ বিষয়ে আমিরুল মোমেনিন বলেছিলেন, 'সে ব্যক্তিই সব চাইতে বীর যে নিজের কামনা-বাসনা, ক্রোধ ও অহমবোধকে পরাভূত করতে পেরেছে।

এসব চরিত্র বৈশিষ্ট্য এবং গুণাবলী ছাড়াও প্রশাসন এবং সংগঠনে তার যথার্থ বুৎপত্তি ছিল। যখন উসমানী পার্টি (উসমানিয়া) মিশরে ফেতনা-ফাসাদ ও বিদ্রোহ করে আইন শৃংখলা বিনষ্ট করে এবং দেশটাকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছিলো আমিরুল মোমেনিন তখন মুহাম্মদ ইবনে আবি বকরকে শাসনকর্তার পদ থেকে সরিয়ে মালিক আশতারকে তার স্থলে নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। এ সময় মালিক নাসিবিনের গভর্ণর ছিলেন। যাহোক, আমিরুল মোমেনিন মালিককে নির্দেশ দিলেন তিনি যেন কাউকে তার স্থলে ডেপুটি হিসাবে পছন্দ করে আমিরুল মোমিনের কাছে চলে আসেন। আদেশ পাওয়া মাত্র মালিক শাহবিব ইবনে আমির আজদীকে নাসিবিনের দায়িত্ব দিয়ে আমিরুল মোমেনিনের কাছে চলে এসেছেন। আমিরুল মোমেনিন তাকে নিয়োগ পত্র প্রদান করে মিশরের দিকে যাত্রা করতে আদেশ দিলেন এবং মিশরবাসীদের উদ্দেশ্যেও একটি নির্দেশ লিখে দিলেন যেন তারা মালিককে মান্য করে চলে। এ দিকে মুয়াবিয়া তার গুপ্তচরদের মাধ্যমে এ খবর পেয়ে হতবুদ্ধি হয়ে গেল, কারণ সে আমর ইবনে আসকে মিশরের গভর্ণর করার আশা দিয়েছিলো এবং সেজন্য ইবনে আস তার সেবাদাসে পরিণত হয়েছিল। মুয়াবিয়া ভেবেছিল মুহাম্মদ ইবনে আবি ববরকে পরাভুত করে মিশর দখল করা তার জন্য সহজ হবে। কিন্তু মালিকের নিয়োগের কথা শুনে তার অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেল। কারণ মালিককে পরাস্থ করা মুয়াবিয়ার পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠবে না। ফলে মিশর জয় করা দূরাশায় পর্যবসিত হবে। মুয়াবিয়া তার চিরাচরিত গুপ্ত হত্যার আশ্রয় গ্রহণ করতে মনস্থ করলো এবং মিশরের ক্ষমতা গ্রহণের পূর্বেই মালিককে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়ণের জন্য আরিশ (কুলজুম) শহরের এক জমিদারের দ্বারস্থ হয়ে সমস্ত খাজনা মওকুফ করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাকে বললো মালিক আরিশ দিয়ে যাবার কালে সে যেন মালিককে হত্যা করে। ফলে মালিক যখন সৈন্য-সামন্ত নিয়ে আরিশ পৌছলো তখন আরিশের প্রধান তাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে তার মেহমান হবার অনুরোধ

করলো। মালিক তার আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। খাবার পর মেজবান তাকে মধু মিশ্রিত শরবত পান করতে দিল যাতে বিষ মিশ্রিত ছিল। এ শরবত খাবার পরই বিষক্রিয়া দেখা দিল এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই এ মহাবীর মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন।

যখন মুয়াবিয়া জানতে পারলো যে তার চাতুর্যপূর্ণ কৌশল কৃতকার্য হয়েছে তখন সে আনন্দে ফেটে পড়লো এবং উল্লাসে বলতে লাগলো, "ওহে, মধুও আল্লাহ্‌র সৈনিক।" তৎপর সে বর্ক্তৃতায় বললো, "আলী ইবনে আবি তালিবের দুই দক্ষিণ হস্তস্বরূপ দু'টি লোক ছিল। এর একটি হলো আম্মার ইবনে ইয়াসির যাকে সিফফিনে হত্যা করা হয়েছে এবং অপরটি হলো মালিক আশতার যাকে এখন হত্যা করা হলো।"

কিন্তু মালিক নিহত হবার সংবাদ পেয়ে আমিরুল মোমেনিন নিদারুণভাবে মর্মাহত হয়েছেন এবং দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তিনি বললেন, "মালিক! কে মালিক? যদি মালিক পাথর হতো তবে সে সুকঠিন ও প্রকৃত পাথর; যদি সে পাহাড় হতো তবে সে সাদৃশ্যবিহীন মহৎ পাহাড়। মনে হয় তার মৃত্যু আমাকে জীবনহীন করে দিয়েছে। আমি আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলছি, তার মৃত্যু সিরিয়ানদের জন্য আনন্দের হলেও ইরাকীদের জন্য অপমান জনক। এ রকম আরেকটি মালিক প্রসব করতে মহিলারা বন্ধ্যা হয়ে গেছে" (তাবারী[৭৫], ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৩৯২-৯৫; আছীর [২], ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৫২-৫৩; ইয়াকুবী[২৮], ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৯৪; বার[৯৭], ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৩৬৬; হাদীদ[১৫২], ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৭৪-৭৭; কাছীর[৩৯], ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৩১৩-৩১৪; ফিদা[৮৯], ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৭৯)।

★★★★★

পত্র-৫৪

তালহা ও জুবায়রের প্রতি (ইমরান ইবনে হুসাইন খুজাই[১]এর মাধ্যমে) আবু জাফর ইসকাফি তার "কিতাব আল-মাকামত"-এ আমিরুল মোমেনিনের উত্তম গুণাবলী লিখতে গিয়ে এ পত্রের কথা উল্লেখ করেছেন

যদিও তোমরা এখন গোপন করে যাচ্ছ, তোমরা উভয়ে ভালভাবে জান যে, আমি মানুষের কাছে অভিগমন (খেলাফতের জন্য) করিনি বরং মানুষ আমার কাছে এসে চাপ প্রয়োগ করেছে এবং আমার আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করার জন্য আমি কাউকে বলিনি এবং তারা নিজেরাই আমার বায়াত গ্রহণ করেছে। তোমরা উভয়েই তাদের সঙ্গে ছিলে যারা আমাকে অনুরোধ করেছিল এবং বায়াত গ্রহণ করেছিল। নিশ্চয়ই, সাধারণ মানুষ কোন চাপের মুখে আমার বায়াত গ্রহণ করেনি বা আমার অর্থের লোভেও তা করেনি। যদি তোমরা বিশ্বস্ততার সাথে বায়াত গ্রহণ করে থাক তবে তা রক্ষা করে আল্লাহ্‌র কাছে তওবা কর। আর যদি তোমারা দু'জন অনিচ্ছাকৃতভাবে বায়াত গ্রহণ করে থাক তবে নিশ্চয়ই, তোমাদের বায়াত গ্রহণ আমাকে দেখানো ও অবাধ্যতা গোপন রাখার জন্য এবং সেক্ষেত্রে তোমাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যকীয়। আমার জীবনের শপথ, কোন বিষয় গোপন করার ব্যাপারে তোমরা অন্য মুহাজিরদের চেয়ে অধিক হকদার ছিলে না[২]। বায়াত গ্রহণ করার আগে তা অস্বীকার করা তোমাদের জন্য অনেকটা সহজতর ছিল।

তোমরা বলছো আমি উসমানকে হত্যা করেছি। এ বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য মদিনার এমন ক'জন লোককে ঠিক কর যারা তোমাদের সমর্থক নয় আমারও নয়। তৎপর আমাদের মাঝে যে যতটুকু দায়ী আইন অনুযায়ী সে ততটুকু শাস্তি ভোগ করবে। তোমরা বর্তমানে যে পথ ধরেছো তা পরিহার কর। মনে রেখো, আল্লাহ্‌র কাছে জবাবদিহি হতে হবে; সে দিন লজ্জাবনত হয়ে পড়বে এবং দোযখের আগুনের জ্বালা পোহাতে হবে। এখানে শেষ করলাম।

১। ইমরান ইবনে আল-হুসাইন আল-খুজাই সাহাবাদের মধ্যে খুবই মর্যদাশীল ও শিক্ষিত ছিলেন। তিনি অত্যন্ত সতর্ক হাদীস বিশারদ ছিলেন। খায়বার বিজয়ের বছর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি কুফায় কাজী হিসাবে নিয়োজিত

ছিলেন এবং ৫২ হিজরী সনে বসরায় ইন্তিকাল করেন। আমিরুল মোমেনিন সম্পর্কে তাঁর বর্ণনা করা একটি বিখ্যাত হাদীস হচ্ছে—

আল্লাহ্র রাসুল আলী ইবনে আবি তালিবের নেতৃত্বে একটি সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেছিলেন। আলী তার প্রাপ্য খুমস এর (এক পঞ্চমাংশ) পরিবর্তে একটি ক্রীতদাসী নিলেন। তাঁর লোকদের মধ্যে কেউ কেউ এতে খুশী হলো না। তাদের মধ্যে চারজন রাসুল (সঃ) এর কাছে নালিশ করবে বলে স্থির করলো। ফিরে আসার পর তারা রাসুলের (সঃ) কাছে গেলেন এবং তাদের মধ্যে একজন বললো, "হে আল্লাহ্র রাসুল! আপনি কি দেখেন নি যে, আলী অমুক অমুক কাজ করেছিল?" রাসুল (সঃ) তার দিক হতে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তখন অপর একজন দাঁড়িয়ে একই নালিশ করলো এবং রাসুল (সঃ) তার দিক হতেও মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এরপর অপর এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে একই কথা বললো। রাসুলও একই ভাবে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এভাবে চতুর্থ ব্যক্তির বেলায়ও একই অবস্থা হলো। রাসুল (সঃ) অতঃপর রাগত স্বরে বললেন, "আলী আমা হতে এবং আমি আলী হতে"—একথা তিনবার পুনরাবৃত্তি করলেন। "আমার পরে সে-ই মোমিনগণের মাওলা" (তিরমিজী[৮০], ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৬৩২; হাম্বল [১৬০], ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৪৩৭-৪৩৮; তায়ালিসী[৭৮], ১ম খণ্ড, পৃঃ ১১১; নায়সাবুরী[৮৪], ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১১০-১১১; ইসফাহানী[৩১], ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২৯৪; জাহাবী[৬৮], ২য় খণ্ড , পৃঃ ১৯৬; কাছীর[৩৯], ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৩৪৫; আছীর [১], ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২৭; হাজর[১৫০], ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫০৯)।

২। এ কথা দ্বারা বুঝাতে চেয়েছেন যে, তোমরা ধনী লোক এবং সগোত্রীয়—দলের দিক হতে বড় গোত্র। মনের কথা গোপন রেখে অনিচ্ছাকৃতভাবে আনুগত্যের শপথ করা তোমাদের কোন প্রয়োজন ছিল না। যদি কোন দুর্বল বা সহায় সম্বলহীন লোক এমন কথা বলতো তবে তা গ্রহণযোগ্য হতো। যেহেতু এমন কথা কেউ বলতে পারেনি সেহেতু বাধ্য হয়ে বায়াত গ্রহণ করেছো বলে তোমাদের মত সমাজের উপরের স্তরের লোকের মুখে শোভা পায় না বা তা কেউ বিশ্বাসও করবে না।

★★★★★

পত্র-৫৫

মুয়াবিয়ার প্রতি

মহিমান্বিত আল্লাহ্ পরকালের জন্যই এ পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং এর অধিবাসীগণকে এক মহাপরীক্ষায় রেখেছেন যে, তাদের কে কর্মে ও ইমানে উত্তম। আমাদেরকে এ দুনিয়ার জন্য সৃষ্টি করেননি এবং এর জন্য সংগ্রাম করতেও আদেশ দেননি। কিন্তু পরীক্ষার সম্মুখীন হবার জন্য আমাদেরকে এখানে থাকতে দিয়েছেন। সুতরাং আল্লাহ্ আমাকে দিয়ে তোমাকে এবং তোমাকে দিয়ে আমাকে পরীক্ষা করছেন। যেহেতু তিনি আমাদের একজনকে অপরজনের ওজর হিসাবে তৈরী করেছেন।

কুরআনের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে তুমি দুনিয়াতে লম্ফ দিয়ে চলছো এবং যে জন্য আমার হাত বা জিহবা আদৌ দায়ী নহে সে বিষয়ে তুমি আমার হিসাব চেয়েছো। কিন্তু তুমি ও সিরিয়ানগণ আমাকে দোষারোপ করছো এবং অজ্ঞ জনগণকে তোমার ভাড়া করা শিক্ষিত লোক দ্বারা আমার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলছো। এতে মনে হচ্ছে, যে বসে আছে তার প্রতি দন্ডায়মান ব্যক্তি অন্যদের উত্তেজিত করছে। তোমার নিজের জন্য আল্লাহ্কে ভয় কর এবং শয়তানের বশবর্তী হয়ো না। পরকালের দিকে মুখ ফেরাও কারণ সেটাই তোমার ও আমার সকলের পথ। আল্লাহ্কে ভয় কর যেন তিনি তোমাকে এমন আকস্মিক শাস্তি প্রদান না করেন যাতে তিনি শাখা ও কাণ্ড ধ্বংস করে দেন। আল্লাহ্র নামে আমি শপথ করছি, যদি ভাগ্য তোমাকে ও আমাকে একত্রিত করে তবে আমি দৃঢ় ভাবেই তোমার সামনে দাঁড়াবো "যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ আমাদের বিচার না করেন এবং তিনিই সর্বোত্তম বিচারক" (কুরআন, ৭ ঃ ৮৭)।

★★★★★

পত্র-৫৬

শুরাইয়া ইবনে হানীকে একটি বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে যখন আমিরুল মোমেনিন সিরিয়া প্রেরণ করলেন তখন এ নির্দেশনামা দিয়েছিলেন

সকাল ও সন্ধ্যায় আল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং দুনিয়াকে কখনো নিরাপদ ভেবো না। মনে রেখো, ক্ষুদ্র একটি পাপের ভয়ে যদি তুমি এমন কিছু থেকে বিরত থাকতে না পার যা তুমি ভালবাস তাহলে কামনা-বাসনা তোমাকে অনেক ক্ষতিকর অবস্থায় ঠেলে নিয়ে যাবে। সুতরাং নিজেই নিজের বাধাদানকারী ও রক্ষাকারী হয়ো এবং নিজের ক্রোধের প্রদমনকারী ও প্রশমনকারী নিজেই হয়ো।

★★★★★

পত্র-৫৭

মদিনা ও বসরাভিমুখে যুদ্ধযাত্রাকালে কুফাবাসীদের প্রতি

আমি আমার নগরী ছেড়ে বেরিয়ে এসেছি। হয় অত্যাচারী না হয় মজলুম, হয় বিদ্রোহী না হয় এমন ব্যক্তি যার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা হয়েছে। যা হোক, যার কাছেই আমার এ পত্র পৌছবে আমি তাকেই আল্লাহ্‌র নামে আহ্বান করছি সে যেন আমার কাছে এসে আমাকে সাহায্য করে, যদি আমি সঠিক ও ন্যায় পথে থেকে থাকি এবং যদি আমি ভ্রান্ত পথে থেকে থাকি তবে সে যেন আমাকে সঠিক পথে নিয়ে যায়।

★★★★★

পত্র-৫৮

সিফফিনে তাঁর সাথে যা ঘটেছিল তা বর্ণনা করে বিভিন্ন এলাকার লোকদের কাছে লিখেছিলেন

সমগ্র বিষয়টি এই যে, আমরা সিরিয়ানদের সঙ্গে একটা যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলাম যদিও আমরা উভয় পক্ষ একই আল্লাহ্ ও রাসুলে বিশ্বাসী এবং ইসলামে আমাদের বাণী একই। আমরা চেয়েছিলাম আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাসে এবং রাসুলের প্রতি স্বীকৃতিতে তারা যেন কোন বেদা'ত না করে এবং তারাও চেয়েছিল আমরা যেন এমনটি না করি। বস্তুতঃ উভয় পক্ষেরই এসব বিষয়ে ঐকমত্য ছিল। কিন্তু উসমানের রক্তপাতের সাথে আমাদের কোন সংশ্রব ছিল না। আমরা তাদের উপদেশ দিয়েছিলাম তারা যেন অস্থায়ী গোলযোগ বন্ধ করে অবস্থা শান্ত রাখে এবং সব কিছু ঠিকঠাক ও স্থিতিস্থাপক হওয়া পর্যন্ত জনগণকে শান্ত রাখে। আমরা যখন শক্তি সঞ্চার করবো তখন সঠিক ব্যবস্থা নেব।

তারা আমাদের আহবানে সাড়া না দিয়ে যুদ্ধের মাধ্যমে ফয়সালা করার জন্য উঠে পড়ে লেগে গেল। ফলে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়লো এবং এর শিখা প্রজ্বলিত হলো। যখন যুদ্ধ-নখর তাদের ও আমাদের উভয়কে বিদ্ধ করে পীড়া দিল তখন আমরা পূর্বে তাদের যা বলেছিলাম তা তারা প্রস্তাব করলো। সুতরাং আমরা তাদের প্রস্তাবে রাজী হলাম; এভাবে তাদের কাছে ওজর সুস্পষ্ট হয়ে গেল। এখন তাদের যে কেউ এটা মেনে চলবে আল্লাহ্ তাকে ধ্বংস হতে রক্ষা করবেন এবং আল্লাহ্ যার হৃদয়কে কালিমা লিপ্ত করেছেন সে এটা পাল্টিয়ে এর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করবে এবং সে মাথা পর্যন্ত পাপে ডুবে যাবে।

★★★★★

পত্র-৫৯
হালওয়ানের গভর্ণর আল-আসওয়াদ ইবনে কুতবাহ্‌র প্রতি

যদি শাসনকর্তার কর্মকাণ্ড আবেগতাড়িত হয় তাহলে সে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। তোমার চোখে সকল মানুষের অধিকার সমান হতে হবে। নিজের জন্য যা তুমি পছন্দ কর না অন্যের জন্যও সেসব জিনিস পরিহার করো। আল্লাহ্ তোমার উপর যা অবশ্যকরণীয় করেছেন তা তুমি করতে দ্বিধা করো না। আল্লাহ্‌র পুরস্কারের আশা রেখো এবং তার শাস্তিকে ভয় করো।

মনে রেখো, এ পৃথিবী একটি পরীক্ষাগার। এখানে যে কেউ একটি মুহূর্ত নষ্ট করে তাকে শেষ বিচারে পস্তাতে হবে। নিজেকে পাপ কাজ হতে রক্ষা করা এবং তোমার সাধ্যমত প্রজাদের দেখা-শুনা করা তোমার দায়িত্ব। এতে তুমি নিজে যতটুকু উপকৃত হবে তা প্রজাদের উপকারের তুলনায় অনেক বেশী। এখানেই শেষ করছি।

★★★★★

পত্র-৬০
যেসব অফিসারের এখতিয়ারে সৈন্যবাহিনী দেয়া হয়েছে তাদের প্রতি

আল্লাহ্‌র বান্দা আমিরুল মোমেনিন আলীর নিকিট হতে সকল রাজস্ব আদায়কারী ও রাজ্যের সকল অফিসারদের প্রতি যাদের এলাকা দিয়ে সৈন্যবাহিনী অতিক্রম করবে।

আমি একটি সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেছি যা তোমার এলাকার মধ্য দিয়ে যাবে, ইনশাল্লাহ্। তাদের জন্য আল্লাহ্ যা অবশ্যকরণীয় করেছেন সে বিষয়ে তাদের আমি যথাযথ নির্দেশ দিয়েছি। তারা যেন অন্যের প্রতি উৎপীড়ন ও ক্ষতি পরিহার করে চলে সে বিষয়ে তাদের যথাযথ নির্দেশ দিয়েছি। আমি তোমাদের কাছে এবং তোমাদের নিরাপত্তাধীন অবিশ্বাসীগণের কাছে পরিষ্কারভাবে বলে দিচ্ছি যে, ক্ষুধায় কাতর হয়ে উহা নিবৃত্ত করার অন্য কোন উপায় থাকা পর্যন্ত যেন তারা কাউকে বিরক্ত না করে। যদি সৈন্যদের কেউ জোর পূর্বক কারো কাছ থেকে কিছু নেয় তবে তোমরা তাকে শাস্তি দিয়ো। ব্যতিক্রম হিসাবে যা তাদেরকে মঞ্জুর করা হয়েছে তাতে তোমরা কেউ বাধা বা হস্তক্ষেপ করো না। আমি নিজেই সেনাবাহিনীর মধ্যে রয়েছি। সুতরাং তাদের কেউ যদি ঔদ্ধত্য দেখায় অথবা তাদের দ্বারা যদি অন্যের কোন ক্ষতি হয়, যা তোমরা মনে কর যে, আল্লাহ্ অথবা আমার মাধ্যম ছাড়া প্রতিহত করতে পারবে না তা আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়ো। ইনশাল্লাহ, আমি তা প্রতিহত করবো।

★★★★★

পত্র-৬১
হিত-এর গভর্ণর কুমায়েল ইবনে জিয়াদ আন-নাখাই এর প্রতি

কোন ব্যক্তিকে কোন বিষয়ে দায়িত্ব অর্পণ করা হলে সে দায়িত্বের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করা প্রকাশ্য দুর্বলতা ছাড়া আর কিছুই নয় এবং এমন দৃষ্টিভঙ্গি ধ্বংসাত্মক। নিশ্চয়ই, কারকিসিয়ার জনগণের দিকে তোমার এগিয়ে যাওয়া এবং যেসব অস্ত্রাগার রক্ষার জন্য তোমাকে প্রেরণ করা হয়েছে তা অরক্ষিত রাখা বা শত্রুকে বাধা দেয়ার মত কাউকে সেখানে না রাখাটা একটা বাতুল চিন্তা-ভাবনা ছাড়া আর কিছুই নয়। এভাবে যে শত্রু তোমার মিত্রদের সম্পদ লুটপাট করতে এসেছিল তুমি তাদরে মধ্যে একটা ব্রীজের মত কার করেছো অথচ তোমার বাহু ছিল দুর্বল এবং চারিদিকে তোমার কোন সজাগ দৃষ্টি ছিল না। তুমি শত্রুদের অগ্রগতি প্রতিহত করতে পারনি এবং

শক্রুর শক্তি বিনষ্ট করতে পারনি। তুমি নিজের এলাকার জনগণের প্রতিরক্ষা বিধান করতে পারনি এবং তুমি তোমার ইমামের পক্ষ থেকে দায়িত্ব পরিপালন করতে পারনি।

★★★★★

পত্র-৬২

মালিক আশতারকে মিশরের গভর্ণর নিয়োগ করে তার মাধ্যমে মিশরের জনগণকে লিখেছিলেন।

মহিমান্বিত আল্লাহ্ মুহাম্মদকে (সঃ) জগতসমূহের জন্য সতর্ককারী এবং সকল নবীর সাক্ষী হিসাবে প্রেরণ করেছিলেন। যখন তিনি মহামিলন প্রাপ্ত হলেন তখন মুসলিমগণ তাঁর পরবর্তী ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব নিয়ে বিবাদে লিপ্ত হলো। আল্লাহ্র কসম, আমি কখনো এ নিয়ে চিন্তা করিনি। আমি কল্পনাও করতে পারিনি যে, রাসুলের (সঃ) পরে আরবগণ তাঁর আহলুল বাইত হতে খেলাফত কেড়ে নিয়ে যাবে অথবা তাঁর অবর্তমানে তারা আমার কাছ হতে খেলাফত ছিনিয়ে নেবে। আমি হঠাৎ দেখলাম মানুষ একজন লোকের আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করার জন্য তার চারপাশে ভিড় জমিয়েছে।[১]

আমি সে পর্যন্ত হাত গুটিয়ে রাখলাম যে পর্যন্ত আমি দেখলাম যে, অনেক মানুষ ইসলাম থেকে সরে পড়ছে এবং মুহাম্মদের (সঃ) দ্বীন ধ্বংস করার চেষ্টা করছে। তখন আমি ভয় পেলাম যে, যদি আমি ইসলামকে ও এর মানুষকে রক্ষা না করি এবং যদি ইসলামে কোন ব্যত্যয় বা ধ্বংস সংঘটিত হয় তাহলে এটা আমার জন্য একটা বজ্রাঘাত হবে যা তোমাদের ওপর ক্ষমতা না পাওয়ার চেয়েও হৃদয় বিদারক হবে। ক্ষমতা ক্ষণস্থায়ী—আসবে—যাবে—মেঘের মত। কিন্তু ইসলামের ব্যত্যয় স্থায়ী হয়ে যাবে। সুতরাং এ অবস্থায় অন্যায় ও ভ্রান্তি ধ্বংস ও অপনোদন হওয়া পর্যন্ত আমি যুদ্ধ করলাম এবং দ্বীন শান্তি ও নিরাপত্তা পেলো।

আল্লাহ্র কসম, যদি আমাকে একা তাদের মোকাবেলা করতে হতো এবং তারা সংখ্যায় অগণন হতো তবুও আমি পিছ পা হতাম না অথবা হতবুদ্ধি হয়ে পড়তাম না। আমি নিজের মধ্যে স্বচ্ছ এবং তাদের বিপদগামীতা সম্পর্কে ও আমার পথ সম্পর্কে আল্লাহ্র কাছ থেকে দৃঢ় প্রত্যয় পেয়েছি। আমি আশাবাদী যে, আল্লাহ্র কাছ থেকে তাঁর উত্তম পুরস্কার পাব। কিন্তু নির্বোধ আর দুষ্ট লোক সমগ্র উম্মার কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করে—এটা আমার চিন্তার কারণ। তারা আল্লাহ্র তহবিলকে নিজের তহবিলের মত আঁকড়ে ধরে এবং তাঁর মানুষকে কৃতদাস[২] বানায়। তারা ধার্মিকদের সাথে যুদ্ধ করে এবং পাপীদের সাথে মিত্রতা করে। বস্তুতঃ তাদের মধ্যে এমন লোক রয়েছে যে অবৈধ[৩] পানীয় পান করে এবং ইসলামের বিধান অনুযায়ী বেত্রাঘাতের শাস্তি পেয়েছিল। তাদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যে ইসলামের দ্বারা আর্থিক লাভবান[৪] না হওয়া পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করেনি। যদি অবস্থা এমন না হতো তাহলে আমি তোমাদের একত্রিত করতে চাপ দিতাম না—তোমাদের জন্য কোন আশংকা করতাম না—তোমাদেরকে জিহাদের জন্য আহ্বান করতাম না। যদি তোমরা অস্বীকার কর এবং দুর্বলতা দেখাও তাহলে আমি তোমাদের পরিত্যাগ করবো।

তোমরা কি দেখ না যে, তোমাদের নগরীর সীমানা সঙ্কুচিত হয়ে আসছে, তোমাদের জনবসতিপূর্ণ এলাকা জয় করে নিয়ে যাচ্ছে, তোমাদের দখল কেড়ে নেয়া হচ্ছে এবং তোমাদের নগরী ও দেশ আক্রান্ত হচ্ছে? আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি সদয় হউন—তোমাদের শক্রুর সঙ্গে লড়বার জন্য উঠে দাঁড়াও, নিশ্চুপভাবে মাটিতে বসে থেকো না। তাহলে তোমরা অত্যাচারের শিকার হবে এবং গ্লানিময় অবস্থায় পড়বে—তোমাদের ভাগ্য নিকৃষ্টতম হবে। যোদ্ধাদেরকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হয়। কারণ সে ঘুমালেও শক্রু না ঘুমাতে পারে। এখানেই শেষ করলাম।

১। আমিরুল মোমেনিন সম্পর্কে রাসুলের (সঃ) ঘোষণা, "আলী আমার ভাই, আমার স্থলাভিষিক্ত ও তোমাদের মাঝে আমার খলিফা" এবং বিদায় হজ্ব হতে ফেরার পথে গাদিরে খুমের ঘোষণা," আমি যার মাওলা আলী তার মাওলা"—

রাসুলের পরবর্তী উত্তরাধিকার বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য এটাই যথেষ্ট। এরপর আর কোন নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা থাকতে পারে না অথবা মদিনার জনগণ আর কোন নির্বাচনের কথা অনুভবও করতে পারে না। রাসুলের (সঃ) এ সুস্পষ্ট নির্দেশ কিছু সংখ্যক ক্ষমতালোভী লোক এমনভাবে বেমালুম অবেহ্লা করেছে যেন তারা এসব কথা কোন দিন শুনেও নি। তারা রাসুলের (সঃ) দাফন-কাফনের বিষয় ছেড়ে দিয়ে নির্বাচনকে এত অত্যাবশ্যকীয় মনে করলো যে তারা বনি সাইদার সকিফায় গিয়ে জড়ো হলো এবং গণতন্ত্রের ভান করে আবু বকরকে খলিফা মনোনীত করলো। এ সময়টা আমিরুল মোমেনিনের খুবই সন্ধিক্ষণ ছিল। এক দিকে কতিপয় স্বার্থান্বেষী বলতে লাগল তিনি যেন অস্ত্র ধারণ করেন। অপরদিকে তিনি দেখলেন সামরিক শক্তি প্রয়োগে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে তারা ইসলাম ত্যাগ করছে এবং মুসায়লিমাহ ইবনে ছুমাসাহ্ আল-হানাফী ও তুলায়হা ইবনে খুওয়ালিদ আল-আসাদীর মত মিথ্যাবাদীগণ গোত্রের পর গোত্রকে বিপথে নিয়ে যাচ্ছে। এ অবস্থায় যদি গৃহযুদ্ধ বাধে তবে মুসলিমগণ একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করবে। তখন ধর্মত্যাগী ও মোনেফকগণ একত্রিত হয়ে পৃথিবীর বুক থেকে ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলবে। সুতরাং আমিরুল মোমেনিন যুদ্ধ না করে নিশ্চুপ থাকার পথ বেছে নিলেন এবং ইসলামের স্বার্থে অস্ত্র না ধরে তিনি শান্তিপূর্ণভাবে তাঁর আপত্তি উত্থাপন করে যাচ্ছিলেন। উম্মাহ্র কল্যাণ ও সমৃদ্ধি ক্ষমতার চেয়ে তাঁর কাছে অনেক বড় ছিল বলেই তিনি কোন প্রকার উগ্র ও অশান্তির পথ গ্রহণ করেননি। মোনাফেকদের অপকৌশল ঠেকাতে এবং ফেতনাবাজগণকে পরাজিত করার মত আর কোন পথ তাঁর খোলা ছিল না, একমাত্র তাঁর ন্যায়সঙ্গত দাবী পরিত্যাগ করা ছাড়া। তাঁর এ মহৎ অবদান ইসলামে দলমত নির্বিশেষ সকলে স্বীকার করে।

২। উমাইয়া ও আবি আল-আস ইবনে উমাইয়ার (উসমানের দাদা) সন্তানদের প্রতি রাসুল (সঃ) যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন এখানে সে বিষয়ে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। আবুজর গিফারী হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুল (সঃ) বলেছেন,

> *বনি উমাইয়াগণ যখন সংখ্যায় চল্লিশ জন হবে তখন তারা আল্লাহ্র প্রিয় বান্দাগণকে তাদের দাসে পরিণত করবে, আল্লাহ্র অর্থ-সম্পদকে নিজের সম্পদের মত আত্মসাৎ করবে এবং আল্লাহ্র কুরআনকে দুর্নীতির হাতিয়ার হিসাবে দাঁড় করাবে (নায়সাবুরী[৮৪], ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৪৭৯; হিন্দি[১৬৭], ১১শ খণ্ড, পৃঃ ১৪৯)।*

আবুজর গিফারী, আবু সায়েদ খুদরী, ইবনে আব্বাস, আবু হোরায়রা ও অন্যান্য হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুল (সঃ) বলেছেন,

> *বনি আবি আল-আসের গোত্র সংখ্যা যখন ত্রিশ জন হবে তখন তারা নিজের সম্পদের মত আল্লাহ্র সম্পদ আত্মসাৎ করবে; আল্লাহ্র প্রিয় বান্দাগণকে দাসে পরিণত করবে এবং আল্লাহ্র দ্বীনকে দুর্নীতির হাতিয়ার করবে (হাম্বল[১৬০], ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৮০; নায়সাবুরী[৮৪], ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৪৮০; আসকালানী[২৪], ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৩৩২; শাফী[১২৮], ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২৪১-২৪৩; হিন্দি[১৬৭], ১১শ খণ্ড, পৃঃ ১৪৮, ১৪৯, ৩৫১, ৩৫৪)।*

রাসুলের (সঃ) মহামিলনোত্তরকালীন ইসলামের ইতিহাস হতে যথেষ্টভাবে তাঁর এ ভবিষ্যদ্বাণী প্রমাণিত হয়েছে এবং এ কারণেই আমিরুল মোমেনিন মুসলিম উম্মার জন্য ভীত ছিলেন।

৩। যে লোকটি মদ পান করেছিল সে ছিল ওয়ালিদ ইবনে আবি মুয়াত। সে উসমানের মায়ের দিক হতে ভাই এবং কুফার গভর্ণর ছিল। ওয়ালিদ একদিন মদাসক্ত হয়ে কুফার কেন্দ্রীয় মসজিদে ফজরের নামাজে ইমামতী করছিলো। সে দু'রাকাআতের পরিবর্তে চার রাকাআত ফরজ নামাজ পড়লো। এতে বিশিষ্ট ধার্মিকগণ স্তম্ভিত হলেন। কারণ ফজরের ফরজ দু'রাকাআত নামাজ রাসুল (সঃ) কর্তৃক নির্ধারিত। ইবনে মাসুদের মত ধার্মিকগণ আরো বেশী ক্ষেপে গেলেন যখন ওয়ালিদ বললো ঃ

> *আহা! কি সুন্দর সকাল, যদি তোমরা রাজী হও তবে আমি আরো কয়েক রাকাআত নামাজ বাড়িয়ে পড়তে পারি।*

ওয়ালিদের নীতিভ্রষ্টতা ও লাম্পট্যের জন্য কয়েকবার খলিফার কাছে নালিশ করা হয়েছিল। কিন্তু খলিফা মানুষের নালিশের প্রতি কর্ণপাত করেননি। এতে কুফাবাসীগণ বলাবলি করতে শুরু করেছে যে, খলিফা তাদের দুঃখ-দুর্দশার প্রতি

অমনোযোগী এবং ওয়ালিদের মত দুর্বৃত্তকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন। একদিন ঘটনাক্রমে তার গর্হিত কাজের সময় যখন ওয়ালিদ অজ্ঞান হয়েছিল তখন কয়েকজন লোক মোহরাঙ্কিত আংটি তার হাত থেকে খুলে মদিনায় নিয়ে গেল। কিন্তু তবুও খলিফা তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিতে ইতস্ততঃ করছিলেন। অবশ্য শেষ পর্যন্ত জনগণের চাপের মুখে তিনি ওয়ালিদকে চল্লিশ বেত্রাঘাত দিয়েছিলেন এবং তাকে গভর্ণরের পদ হতে সরিয়ে তার স্থলে উসমানের চাচাত ভাই সায়েদ ইবনে আল-আসকে গভর্ণর নিয়োগ করেছিলেন এবং উসমানের বিরুদ্ধে উত্থানের জন্য এটাও একটা কারণ ছিল (বালাজুরী[১০০], ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩৩-৩৫; ইসফাহানী[৩৪], ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১৭৪-১৮৭৫; বার[৯৭], ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১৫৫৪-১৫৫৭; আছীর[১] ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৯১-৯২; তাবারী[৭৫], পৃঃ ২৮৪৩-২৮৫০; আছীর[২], ৩য় খণ্ড, ১০৫-১০৭; হাদীদ[১৫২], ১৭শ খণ্ড, পৃঃ ২২৭-২৫৪)।

৪। যে লোকটি আর্থিক সুবিধা অর্জনের জন্য ইসলাম গ্রহণ করেছিল সে হলো মুয়াবিয়া। এ লোকটি দুনিয়ার স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ইসলামকে ব্যবহার করতো।

★★★★★

পত্র-৬৩

কুফার গভর্ণর আবু মুসা (আবদুল্লাহ্ ইবনে কায়েস) আশআরীর কাছে লিখেছিলেন যখন আমিরুল মোমেনিন জানতে পারলেন যে, তাঁর আহ্বানে জামাল যুদ্ধে যোগদান না করার জন্য সে জনগণকে প্ররোচিত করছিল।

আল্লাহ্র বান্দা আমিরুল মোমেনিনের কাছ থেকে আবদুল্লাহ্ ইবনে কায়েসের প্রতি ঃ

তুমি যে সব কথা বলছো আমি তা জানতে পেরেছি। এগুলো তোমার অনুকূলেও যায় আবার তোমার বিরুদ্ধেও যায়।[১] সুতরাং আমার বার্তাবাহক তোমার কাছে পৌছা মাত্রই নিজে প্রস্তুত হয়ে তোমার আড্ডা হতে বেরিয়ে এসো এবং তোমার সাথে যারা আছে তাদের আহ্বান করো। তৎপর যদি তুমি সত্য বিষয়ে দৃঢ় প্রত্যয়ী হও তবে রুখে দাঁড়াও আর যদি কাপুরুষতায় আচ্ছন্ন হও তবে ফিরে যেয়ো। আল্লাহ্র কসম, তুমি যেখানেই থাক না কেন তোমাকে ধরা হবে এবং তোমার গদিসহ তোমাকে সম্পূর্ণরূপে উল্টে না দেয়া পর্যন্ত ছাড়া হবে না। তখন তুমি পেছন থেকে যেরূপ ভয় পাও সম্মুখ থেকেও সেরূপ ভয় পাবে।

যা তুমি আশা করছো তা কিন্তু সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। বরং তা মারাত্মক দুর্যোগ। আমাদেরকে এ দুর্যোগের উটে চড়তে হয়েছে, দুর্যোগ উৎরিয়ে যেতে হয়েছে এবং এর পাহাড়-পর্বতকে সমতল করতে হয়েছে। তোমার মনকে স্থির কর, নিজের কর্মকাণ্ডকে সঠিকভাবে আঁকড়ে ধর এবং তোমার ভাগ্যের অংশ অর্জন কর। যদি তুমি এটা পছন্দ না কর তবে সেখানে চলে যাও যেখানে তোমাকে স্বাগতম জানানো হবে এবং তুমি তোমার কর্মকাণ্ডের ফল হতে নিস্তার পাবে। একাকী ঘুমিয়ে পড়ে থাকা অনেক ভাল। সে ক্ষেত্রে কেউ জানতে চাইবে না অমুক কোথায়। আল্লাহ্র কসম, সঠিক ব্যক্তির কাছে এটাই সঠিক বিষয় এবং ধর্মত্যাগীগণ কি করে তা আমরা পরোয়া করি না। এখানেই শেষ করলাম।

১। আবু মুসা আশআরী উসমান কর্তৃক নিয়োগকৃত কুফার গভর্ণর ছিল। বসরার বিদ্রোহ দমনের জন্য আমিরুল মোমেনিন যখন মনস্থ করলেন তখন আশআরী এক দিকে বলতে লাগল যে তিনিই সত্যিকার ইমাম এবং তার বায়াত গ্রহণ করা সঠিক পদক্ষেপ। অপরদিকে সে ছড়াতে লাগল যে, আমিরুল মোমেনিনের সমর্থনে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ন্যায়-সঙ্গত নয়। তার এ দ্বিমুখী আচরণ ও কুটকৌশলের কথা জানতে পেরে আমিরুল মোমেনিন ইমাম হাসানের মাধ্যমে তাকে এ পত্র দিয়েছিলেন। সে ফেতনা সৃষ্টি করতে চেয়েছিল এবং তা বন্ধ করে দেয়া অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। বিষয়টা এমন ছিল যে, আমিরুল মোমেনিন সঠিক ইমাম হলে তাঁর শত্রুর সাথে লড়াই করা কিভাবে অন্যায় কাজ হবে? আবার তার পক্ষালম্বন করে যুদ্ধ করলে যদি অন্যায় হয় তবে তিনি কিভাবে সঠিক ইমাম হতে পারেন?

যাহোক, তার প্ররোচনা সত্ত্বেও কুফার বিপুল সংখ্যক লোক আমিরুল মোমেনিনের পক্ষে যুদ্ধে যোগদান করেছিল এবং বসরাবাসীকে চিরতরে শিক্ষা দিয়েছিল।

★★★★★

পত্র-৬৪
মুয়াবিয়ার পত্রের জবাবে

নিশ্চয়ই, আমরা ও তোমরা সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের মধ্যে ছিলাম যা তুমি নিজেই বলে থাক। কিন্তু ক'দিন হতেই তোমাদের সাথে আমাদের সে সম্পর্কে ছিঁড় ধরেছে। কারণ আমরা ঈমান এনেছি আর তোমরা তা প্রত্যাখ্যান করেছো। আজ অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, আমরা ইমানে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ আর তোমরা ফেতনা সৃষ্টিকারী। তোমাদের মধ্যে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে তারা অনিচ্ছাসত্ত্বেই তা করেছে। তাও আবার যখন সকল গোত্রের নেতাগণ ইসলাম গ্রহণ করে আল্লাহ্‌র নবীর সঙ্গে যোগদান করেছে তারপর তোমরা ইসলাম গ্রহণ করেছো।

তোমার পত্রে তুমি উল্লেখ করেছো যে, আমি তালহা ও জুবায়রকে হত্যা করেছি এবং আয়শাকে জোরপূর্বক তার ঘর হতে বের করে দিয়ে কুফা ও বসরার মধ্যবর্তী স্থলে আশ্রয় নিতে বাধ্য করেছি[১]। এসব বিষয়ে তোমার মাথা ঘামাবার কিছুই নেই। তারাও তোমার বিরুদ্ধে কোন কিছু বলেনি। সুতরাং তাদের ব্যাপারে কোন ব্যাখ্যা পাওয়ার অধিকার তোমার নেই।

তুমি আরো লিখেছো যে, তুমি একদল মুজাহির ও আনসার নিয়ে অমার কাছে আসতেছো। তোমার মনে রাখা উচিত যে, যেদিন তোমার ভাই বন্দি হয়েছিল সেদিন হতেই হিজরত সমাপ্ত হয়ে গেছে। কাজই মুহাজির ও আনসার আর কেউ নেই। যদি তুমি ব্যতিব্যস্ত হয়ে থাক তবে একটু অপেক্ষা কর যাতে আমি তোমার মোকাবেলা করতে আসতে পারি এবং সেটা খুব মানান সই হবে। কারণ তাতে বুঝা যাবে তোমাকে শাস্তি দেয়ার জন্য আল্লাহ্ আমাকে মনোনীত করেছেন। কিন্তু তুমি আমার কাছে যদি আস তা হবে আমাদের কবির কবিতার মন্তব্য ঃ

তারা গ্রীষ্ম বাতাসের উল্টো দিকে অগ্রসর হচ্ছে, যে বাতাস তাদের ওপর পাথর নিক্ষেপ করেতেছে এবং কি নীচু ভূমি আর উঁচু ভূমি তারা পাথরের আঘাত পাচ্ছে।

মনে রেখো, যে তরবারি দিয়ে আমি তোমার দাদা, মামা ও ভ্রাতাদেরকে দ্বিখণ্ডিত করেছি তা আজো আমার কাছে আছে। আল্লাহ্‌র কসম, তুমি যে কি প্রকৃতির তা আমি ভালভাবে জানি। তোমার হৃদয় নীচ এবং সুবুদ্ধিতে তুমি দুর্বল। একথা বলা ভাল যে, তুমি যে স্থানে আরোহণ করেছো তথা হতে শুধুমাত্র মন্দ দৃশ্য দেখতে পাচ্ছ যা তোমার বিরুদ্ধে— পক্ষে নয়। কারণ অন্যের হারানো বস্তু তুমি খুঁজছো। অন্যের পশুর পাল খুঁজতে তুমি ঝুঁকে পড়েছো। তুমি এমন জিনিসের প্রতি লোভাতুর হয়ে পড়েছো যা তোমার নয় এবং যাতে তোমার কোন সম্পর্ক নেই। তোমার কাজে আর কথায় কতই না ব্যবধান এবং এ বিষয়ে তুমি তোমার বাপ-চাচা ও মামাদের কতই না কাছের যারা অসৎ প্রকৃতি দ্বারা তাড়িত ছিল এবং মুহাম্মদের (সঃ) বিরোধিতার পাপের প্রতি কতই আকৃষ্ট ছিল। ফলশ্রুতিতে তাদের হত্যা করা হয়েছিল যা তুমি নিজেই প্রত্যক্ষ করেছো। তাদের ওপর যখন ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম তখন তারা আত্মরক্ষার কোন পথ খুঁজে পায়নি এবং আমার তরবারির আঘাত হতে নিরাপদ স্থানে পালাতে পারেনি। সে তরবারি আজো দুর্বল হয়ে পড়েনি।

উসমানের হত্যা সম্বন্ধে তুমি অনেক কিছু লিখেছো। তুমি প্রথমে অন্যান্য মানুষের মত বায়াত গ্রহণ কর। তারপর অভিযুক্ত ব্যক্তিদের সম্পর্কে আমার কাছে রায় চাও এবং তখন আমি মহামহিম আল্লাহ্‌র কুরআন মতে তোমার ও তাদের মধ্যে ফয়সলা করে দেব। কিন্তু যা তুমি লক্ষ্যস্থির করেছো তা এমন যে, মায়ের দুধ খাওয়ানো

বন্ধ করার পর প্রথম ক'দিন শিশুকে যেরূপ আল্গা নিপল মুখে দিয়ে রাখা হয় তদ্রুপ; যারা শাস্তি পাওয়ার যোগ্য তাদের ওপর শাস্তি বর্ষিত হোক।

১। মুয়াবিয়া আমিরুল মোমেনিনের কাছে একটি পত্র লিখেছিল। তাতে সে পারস্পরিক ঐক্য ও সমঝোতার কথা উল্লেখ করে তালহা ও জুবায়রের হত্যা, আয়শাকে ঘর হতে বহিষ্কার করা এবং মদিনা হতে কুফায় রাজধানী স্থানান্তর করার বিষয়ে আমিরুল মোমেনিনকে দোষারোপ করে। সর্বশেষে মুহাজির ও আনসার নিয়ে সে যুদ্ধের হুমকি দেয়। প্রত্যুত্তরে আমিরুল মোমেনিন এ পত্র লিখেন। এতে উভয়ের ঐক্য ও সমঝোতার বিষয়ে তিনি লিখেছেন যে, ইসলাম প্রচারের সাথে সাথে তারা (উমাইয়গণ) রাসুলের (সঃ) ঘোর বিরোধিতা শুরু করেছিল। অপরপক্ষে হাশেমীগণ ইসলাম গ্রহণ করে রাসুলকে (সঃ) তার মিশনে সহায়তা করেছে। আরবের দলপতি যখন তাদের দলবলসহ রাসুলের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল তখনও উমাইয়াগণ তাঁর বিরোধিতায় তৎপর ছিল। মক্কা বিজয়ের পর তারা অনন্যোপায় হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছে। মূল ব্যবধানটা এখানেই যে, হাশেমীগণ স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছে আর উমাইয়াগণ প্রাণ বাঁচানোর জন্য ইসলাম গ্রহণ করেছে। এ নৈতিক ব্যবধান কখনো দূর হবার নয়। কারণ উমাইয়াগণ কখনো হৃদয় দিয়ে ইসলামকে বা রাসুল (সঃ) ও তাঁর আহলুল বাইতকে ভালবাসেনি।

তালহা ও জুবায়রের হত্যার জন্য মুয়াবিয়া আমিরুল মোমেনিনের বিরুদ্ধে যা উদ্ভাবন করেছে তা যদি সত্য বলেও ধরা হয় তা হলে কি একথা বাস্তব ভিত্তিক নয় যে, তারা উভয়ে বায়াত ভঙ্গ করে আমিরুল মোমেনিনের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করে যুদ্ধ করেছিল? সুতরাং বিদ্রোহ দমন করতে তারা নিহত হলেও হত্যাকারীদের দোষারোপ করা যায় না। কারণ ন্যায়সঙ্গত ইমামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের শাস্তি হলো মৃত্যু। এতদসত্ত্বেও আমিরুল মোমেনিনের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ বাস্তব ভিত্তিক নয় কারণ তালহা ও জুবায়রকে তার নিজের লোকেরাই হত্যা করেছে। ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন ঃ

> *মারওয়ান ইবনে হাকাম তালহাকে তীর বিদ্ধ করে এবং আবান ইবনে উসমানের দিকে ফিরে বলেছিল, "আমরা তোমার পিতার হত্যাকারীকে নিহত করেছি এবং তোমাকে প্রতিশোধ নেয়ার দায় হতে মুক্ত করেছি" (সাঁদ[১৩৭], ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৫৯; আছীর[২], ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৪৪; বার[৯৪], ২য় খণ্ড, পৃঃ ৭৬৬-৭৬৯; হাজর[১৫০], ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৩০; আসকালানী[২৫], ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২১; আছীর[১], ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৬০-৬১)।*

আমর ইবনে জুরমুজ নামক একজন লোক বসরা হতে ফিরে যাবার পথে জুবায়রকে হত্যা করেছিল। এতে আমিরুল মোমেনিনের কোন প্রকার নির্দেশ বা ইঙ্গিত ছিল না। একইভাবে আয়শা নিজেই বিদ্রোহী দলের নেত্রী হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছেন। আমিরুল মোমেনিন বহুবার তাকে তার মর্যদার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে উপদেশ দিয়েছিলেন যেন তিনি তার সীমানা ছেড়ে না যান। কিন্তু তিনি সে উপদেশে কর্ণপাত করেননি।

মুয়াবিয়া তার পত্রে সমালোচনা করে বলেছিল আমিরুল মোমেনিনের রাজধানী কুফায় স্থানান্তরের ফলে মদিনা হতে মন্দ লোক ও ময়লা আবর্জনা দূরীভুত হয়েছে। এর একমাত্র জবাব হলো মুয়াবিয়া সর্বদা মদিনা হতে সরে রয়েছে এবং সিরিয়ায় রয়েছিল। প্রকৃত অবস্থা হলো জামাল যুদ্ধে বহু সংখ্যক লোক কুফা হতে আমিরুল মোমেনিনের পক্ষে যোগদান করেছিল। এতে তিনি অনুভব করলেন যে, চারিদিকের বিদ্রোহ দমনের জন্য সামরিক দৃষ্টিকোণ হতে কুফায় তাঁর অবস্থান অধিকতর ভাল হবে। তাই তিনি মদিনা হতে কুফায় রাজধানী স্থানান্তর করেছিলেন।

সর্বশেষে, আনসার ও মুহাজির নিয়ে আক্রমণের হুমকির প্রেক্ষিতে আমিরুল মোমেনিন বললেন যে, মক্কা বিজয়ের কালে মুয়াবিয়ার ভাই ইয়াজিদ ইবনে আবি সুফিয়ান বন্দী হয়েছিল। কাজেই সে দিন হতেই হিজরতের ধারা বন্ধ হয়ে গেছে। রাসুল (সঃ) বলেছেন যে, "মক্কা বিজয়ের পর আর কোন হিজরত থাকবে না। হিজরত বন্ধ হবার পর মুহাজির আর আনসারের প্রশ্ন উঠে না।

★★★★★

পত্র-৬৫
মুয়াবিয়ার প্রতি

এ সময়[১] মূল বিষয়ে সুস্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি সঠিক রেখে তুমি সুবিধা অর্জন করতে পারতে। কারণ তোমার পূর্বপুরুষদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তুমিও মিথ্যা দাবী করছো এবং মিথ্যা ও অসত্য ছড়াচ্ছো। তুমি এমন কিছু দাবী করছো যা তোমা হতে অনেক উর্দ্ধে এবং যা তোমার জন্য নয়। কারণ তুমি ন্যায় থেকে পালিয়ে যেতে চাও। তুমি এমন কিছুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছো যা তোমার কর্ণকুহরে ভালভাবে প্রবেশ করেছে এবং তোমার বক্ষ পূর্ণ করেছে। ন্যায় ও সত্য বিস্মৃত হবার পর বিপথগামীতা ছাড়া আর কিছুই থাকে না এবং সুস্পষ্ট ঘোষণার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করলে বিভ্রান্তি ছাড়া আর কিছু থাকে না। সংশয় ও বিভ্রান্তির কুফল থেকে তোমার নিজকে রক্ষা করা উচিত, কারণ দীর্ঘদিন হতে ফেতনা-ফ্যাসাদ তোমার চোখকে অন্ধ করে রেখেছে।

আমি তোমার পত্র পেয়েছি। তোমার পত্র অমার্জিত ভাষায় পরিপূর্ণ যা শান্তির পথকে দুর্বল করে দেয় এবং তোমার নির্বুদ্ধিতা পূর্ণ উক্তি ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে দেয়। এসব কারণে মনে হয় যেন তুমি পচা ডোবায় ডুব দিচ্ছো আর অন্ধের মত হাতড়িয়ে বেড়াচ্ছো। তুমি নিজকে এত উঁচুতে তুলে ধরেছো মনে হয় যেন তোমার কাছে পৌছা দুঃসাধ্য এবং তুমি তুলনাহীন। রাজকীয় ঘুড়িও যেন এত উঁচুতে উড়তে পারে না। এটা যেন উচ্চতায় 'আয়ুক' (তারকার নাম)-এর সমান।

আল্লাহ্ মাফ করেছেন যে, আমি খলিফা হবার পর তোমাকে মানুষের ওপর কোন কর্তৃত্ব অর্পণ করিনি বা এমন কোন নির্দেশ জারী করিনি। সুতরাং এখন হতে নিজের প্রতি সতর্ক হও এবং নিজকে ঠিক কর। কারণ যদি তুমি অবাধ্য হও তবে আল্লাহ্র প্রিয় বান্দাগণ তোমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লে তওবা করার সুযোগ পাবে না। যা আজ গ্রহণ করা হবে তখন তা করা হবে না। এখানেই শেষ করছি।

১। খারিজীদের সাথে যুদ্ধের শেষ দিকে মুয়াবিয়া আমিরুল মোমেনিনকে একখানা পত্র লিখেছিল যাতে সে তার চিরাচরিত স্বভাব অনুযায়ী কাদা ছোড়াছুড়ি করেছে। প্রত্যুত্তরে আমিরুল মোমেনিন এ পত্র লিখেছিলেন যাতে তিনি খারিজীদের সাথে যুদ্ধের স্পষ্ট ঘটনার প্রতি মুয়াবিয়ার দৃষ্টি আর্কষণ করেছেন। কারণ এ যুদ্ধ রাসুলের (সঃ) ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী সংঘটিত হয়েছে। এমন কি আমিরুল মোমেনিনও এ যুদ্ধের অনেক আগেই বলেছেন যে, জামাল ও সিফফিন ব্যতীত আরো একটি ধর্মত্যাগী দলের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ করতে হবে। এ যুদ্ধে জুছছুদাইয়ার হত্যার মাধ্যমে প্রমাণিত হলো যে, আমিরুল মোমেনিন সঠিক পথে ছিলেন। মুয়াবিয়া যদি তার পূর্বপুরুষদের মত ন্যায় ও পুণ্যের প্রতি চোখ বন্ধ করে না রাখতো এবং আত্মপ্রশংসা ও ক্ষমতার লোভে বিভোর না হতো তাহলে সে ন্যায়ের পথে চলতে পারতো। কিন্তু বংশগত স্বভাবের প্রভাবে সে নিজে শুনা সত্ত্বেও রাসুল (সঃ) এ সব বাণীর প্রতি কোন মর্যাদা প্রদান করেনি, যেমন- "আমি যার মাওলা, আলী তার মাওলা" এবং "হে আলী, মুসার কাছে হারুন যেমন আমার কাছে তুমি তেমন।"

★★★★★

পত্র-৬৬
আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের প্রতি

মানুষ কখনো কখনো এমন কিছু নিয়ে আনন্দ অনুভব করে যা সে কোনক্রমেই হারাবে না। আবার এমন কিছু নিয়ে শোকাহত হয় যা কখনো পাবার সম্ভাবনা থাকে না। সুতরাং প্রতিশোধ নেয়ার আশঙ্কা যেন তোমাকে আশা-নিরাশা আর আনন্দ-বেদনায় দোলা না দেয়। বরং অন্যায়কে প্রতিহত করে ন্যায়কে পুনরুজ্জীবিত করার মাঝে যেন তোমার আনন্দ-নিরানন্দ প্রতিফলিত হয়। যে সব সৎ আমল তুমি অগ্রে প্রেরণ করতে পেরেছো সে জন্য তুমি

আনন্দিত হতে পার; যা তুমি প্রেরণ করতে পারনি সে জন্য শোকাভিভূত হতে হবে এবং মৃত্যুর পর তোমার ওপর যা আপতিত হবে সে বিষয়ে উদ্বিগ্ন থাকা উচিত।

★★★★★

পত্র-৬৭

মক্কার গভর্ণর কুছাম ইবনে আল-আব্বাসের প্রতি

মানুষের হজ্ব সম্পাদনের ব্যবস্থা সম্পন্ন কর এবং তাদেরকে এ দিনে আল্লাহ্‌র প্রতি ধ্যানমগ্নতার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ো। প্রতি সকাল ও সন্ধ্যায় তাদের কাছে বসে বক্তব্য রেখো এবং তাদেরকে বুঝিয়ে দিয়ো। যারা আইন জানতে চায় তাদেরকে আইন বুঝিয়ে দিয়ো, অজ্ঞগণকে শিক্ষা দিয়ো এবং শিক্ষিতগণের সাথে আলোচনা করো। তোমার ও জনগণের মধ্যে তোমার জিহ্বা ছাড়া যেন অন্য কোন মধ্যস্থতাকারী না থাকে এবং নিজের মুখমণ্ডল ছাড়া যেন আর কোন প্রহরী না থাকে। তোমার কাছে যার প্রয়োজন আছে সে যেন তোমার কাছে আসতে বারিত না হয়। কারণ প্রথমেই সে ফিরে গেলে পরে যদি তুমি তার প্রয়োজন মিটিয়েও দাও তবু তার মনে দুঃখ থেকে যাবে এবং তখন উক্ত প্রয়োজন মিটানোর জন্য তোমার সুনাম করবে না।

সরকারী কোষাগারে কি পরিমাণ অর্থ-সম্পদ সংগৃহীত হয়েছে তার দেখাশুনা করো এবং সে সম্পদ হতে নিজের তদারকীতে যারা সপরিবারে আছে, যারা দুঃস্থ, যারা অন্নহীন ও বস্ত্রহীন তাদের জন্য ব্যয় করো। তৎপর যা থাকে তা আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়ো যেন এদিকের লোককে আমরা বণ্টন করে দিতে পারি। মক্কার লোকদেরকে নির্দেশ দিয়ো যেন তারা অস্থায়ী বাসিন্দাদের কাছ থেকে ভাগ আদায় না করে কারণ মহিমান্বিত আল্লাহ্‌ বলেন, "তথাকার স্থায়ী বাসিন্দা ও আগন্তুকগণ একই রকম" (কুরআন, ২২ঃ ২৫)। "এখানে" আল আকিফ" অর্থ হচ্ছে যারা সেখানে বসবাস করে এবং "আল-বাদি" অর্থ হচ্ছে যারা মক্কার স্থায়ী বাসিন্দা নয়— অন্যস্থান হতে হজ্বের জন্য আসে। আল্লাহ্‌ আমাদেরকে ও তোমাকে তাঁর ভালবাসা পাওয়ার তৌফিক দান করুন। এখানেই শেষ করছি।

★★★★★

পত্র-৬৮

খেলাফত লাভের পূর্বে সালমান আল-ফারিসীর প্রতি

দুনিয়ার উদাহরণ হলো সাপের মত যা ধরতে কোমল অথচ যার বিষ মৃত্যু ডেকে আনে। সুতরাং যা তোমার কাছে আরামদায়ক ও সুখকর মনে হবে তা হতে দূরে থেকো কারণ তোমার সাথে এটার স্থায়ীত্ব অতি অল্প সময়ের। এটা তোমাকে ছেড়ে যাবে এ ধারণায় কখনো উদ্বিগ্ন হয়ো না। যখন দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করবে তখন তা পরিহার করতে চেষ্টা করবে কারণ যখন কেউ দুনিয়ার মধ্যে সুখের আশ্বাস পায় তখন দুনিয়া তাকে বিপদে নিক্ষেপ করে। অথবা যখন সে দুনিয়াতে নিজেকে নিরাপদ মনে করে তখন দুনিয়া তার নিরাপত্তাকে ভীতিতে রূপান্তর করে। এখানেই শেষ করছি।

★★★★★

পত্র-৬৯

আল-হারিছ (ইবনে আবদুল্লাহ্‌ আল-আওয়ার) আল-হামদানীর প্রতি

কুরআনের রজ্জুকে শক্ত করে ধরো এবং এর আদেশ-নিষেধ মেনে চলো। কুরআন যা অবৈধ করেছে তা অবৈধ মনে করো এবং যা বৈধ করেছে তা বৈধ মনে করো। অতীতে যা ন্যায় ছিল তা পরীক্ষা করে নিয়ো।

অতীত হতে বর্তমানের জন্য শিক্ষা গ্রহণ করো। কারণ দুনিয়ার এক পর্যায় অন্য পর্যায়ের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ এবং এর সমাপ্তি হলো প্রারম্ভ থেকে শুরু করা। এর সব কিছু হলো শুধু প্রস্থান আর পরিবর্তন। আল্লাহ্‌র নামকে কল্পনাতীত মহৎ মনে করো। সর্বদা মৃত্যুকে স্মরণ করো এবং মৃত্যুর পরের অবস্থা চিন্তা করো। নিজকে একটা সুন্দর অবস্থায় উন্নীত করার আগে মৃত্যুর প্রত্যাশা করো না।

সে কাজগুলো পরিহার করে চলো যা কেউ নিজের জন্য পছন্দ করে অথচ সাধারণ মুসলিমের জন্য অপছন্দ করে। সেসব কাজ এড়িয়ে চলো যা গোপনে সম্পাদিত হলেও প্রকাশ পেলে লজ্জা পেতে হয়। সেসব কাজও এড়িয়ে চলো যে জন্য নিজেই নিজকে প্রশ্ন করলে তা মন্দ মনে হয় অথবা ওজর দাঁড় করাতে হয়। তোমার সম্মান জনগণের আলোচনার বিষয় বস্তু হয়ে পড়ে এভাবে নিজকে প্রকাশ করো না। যা কিছু তুমি শুনতে পাও তার সব কিছু জনগণের কাছে বলে দিয়ো না- কারণ তাতে মিথ্যা থাকতে পারে। মানুষ তোমার কাছে যা বলে তার সব কিছুতে প্রতিযোগিতা করতে যেয়ো না, কারণ এতে অজ্ঞতা প্রকাশ পাবে। ক্রোধকে দমন করে রেখো এবং যখন শাস্তি দেয়ার ক্ষমতা থাকবে তখন ক্ষমা করো। প্রবল ক্রোধে ধৈর্যধারণ করো এবং ক্ষমতার পরিবর্তে ক্ষমা প্রদর্শন করো; ফলশ্রুতিতে পরিণাম তোমার অনুকূলে আসবে। আল্লাহ্‌ তোমাকে যেসব নিয়ামত দান করেছেন উহার সবকিছুতে কল্যাণ অনুসন্ধান করো এবং কোন নেয়ামত অপচয় করো না। তোমার ওপর আল্লাহ্‌র নেয়ামতের ফলাফল যেন দৃশ্যমান হয়।

জেনে রাখো, ইমানদারদের মধ্যে সেই সব চাইতে বেশী বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত যে নিজের ধনসম্পদ হতে দান করে। কারণ কল্যাণকর যা কিছু তুমি অগ্রে প্রেরণ করবে তা তোমার জন্য জমা হয়ে থাকবে। আর যাকিছু তুমি ফেলে যাবে তা অন্যরা প্রাপ্ত হবে। এমন লোকের সঙ্গ এড়িয়ে চলো যার মতামত সারগর্ভ নয় এবং যার আমল বিস্বাদপূর্ণ। কারণ একজন লোককে তার সঙ্গী-সাথী দ্বারাই বিচার করা হয়।

বড় শহরে বসবাস করো, কারণ বড় নগরী মুসলিমদের সম্মেলন কেন্দ্র। সেসব স্থান এড়িয়ে চলো যেখানে গাফেল ও দুষ্ট লোকের সংখ্যা বেশী এবং সেসব এলাকাও এড়িয়ে চলো যেখানে আল্লাহ্‌র অনুগত্য করার কথা বললে সমর্থক কম পাওয়া যায়। তোমার চিন্তা-ভাবনাকে সেসব বিষয়ে সীমাবদ্ধ রেখো যা তোমার জন্য সহায়তা পূর্ণ হবে। কখনো বাজারে বসো না, কারণ বাজার হলো মিলনস্থল ও ফেতনা-ফ্যাসাদের লক্ষ্যস্থল। যাদের ওপর তুমি কর্তৃত্ব করছো তাদের সঙ্গে ঘন ঘন দেখা করো, কারণ এটা হলো ধন্যবাদ প্রকাশের উৎকৃষ্ট পথ।

শুক্রবার দিন নামাজ আদায় না করে ভ্রমণে বের হয়ো না। যদি তুমি আল্লাহ্‌র পথে বের হও অথবা এমন কোন ব্যাপারে বের হও যার জন্য পর্যাপ্ত কারণ রয়েছে তবে তুমি তা করতে পার। তোমার সকল কর্মকাণ্ডে আল্লাহ্‌কে মেনে চলো, কারণ সব কিছুর চেয়ে আল্লাহ্‌র আনুগত্যের গুরত্ববেশী। হৃদয়কে আল্লাহ্‌র ইবাদতে নিমগ্ন রেখো। ইবাদতে নিমগ্ন থাকার বিষয়ে হৃদয়ে প্রত্যয় রেখো। হৃদয় যখন ঝামেলা মুক্ত ও আনন্দে থাকে তখনই ইবাদতে নিমগ্ন থেকো। কিন্তু নির্ধারিত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ অবশ্যই আদায় করো। দুনিয়ার আরাম-আয়েশে ডুবে প্রভু হতে সরে থাকাকালে যদি তোমার মৃত্যু এসে পড়ে সে বিষয়ে সাবধান থেকো। দুষ্টলোকের সংসর্গ পরিহার করো, কারণ পাপ পাপকে আনয়ন করে। আল্লাহ্‌কে সর্বমহৎ জেনো এবং আল্লাহ্‌-প্রেমিকগণকে ভালবেসো। ক্রোধ পরিহার করো, কারণ ক্রোধ হলো শয়তানের সৈনিক। এখানেই শেষ করছি।

★★★★★

পত্র-৭০

মদিনার গভর্ণর শহ্‌ল ইবনে হুনায়েফ আনসারীকে লিখেছেন যখন আমিরুল মোমেনিন জানতে পারলেন যে, মদিনা হতে কতিপয় ব্যক্তি মুয়াবিয়ার নিকট গিয়েছিল

আমি জানতে পেরেছি যে, তোমার এলাকা হতে কতিপয় ব্যক্তি চুরি করে মুয়াবিয়ার কাছে যাচ্ছে। তাদের সংখ্যার কথা ভেবে দুঃখ পেয়ো না অথবা তাদের সহায়তা তুমি হারাচ্ছো বলে ভয় পেয়ো না। এটাই যথেষ্ট যে,

তারা বিপথে চলে গেছে এবং তুমি তাদের থেকে মুক্তি পেয়েছো। তারা সত্য ও হেদায়েতের পথ থেকে দৌড়ে পালাচ্ছে এবং অন্ধকার ও অজ্ঞতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তারা দুনিয়া অন্বেষণকারী এবং উহার দিকে এগিয়ে গিয়ে এতে জড়িয়ে পড়েছে। তারা ন্যায় বিচার দেখেছে, শুনেছে এবং এর প্রশংসাও করেছে। তারা অনুধাবন করেছে যে, অধিকার বিষয়ে আমাদের কাছে সকল মানুষ সমান। সে কারণেই তারা স্বার্থপরতা ও স্বজনপ্রীতির দিকে দৌড়ে গেছে। তাদেরকে অন্যায়ের মাঝে ডুবে থাকতে দাও। আল্লাহ্‌র কসম, নিশ্চয়ই তারা অত্যাচার হতে সরে যায়নি এবং ন্যায়ের পক্ষে যোগদান করেনি। এ ব্যাপারে আমরা শুধু আশা করবো আল্লাহ্‌ আমাদেরকে বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করবেন এবং অসমতলকে আমাদের জন্য সমতল করে দেবেন, ইনশাল্লাহ। এখানেই শেষ করছি।

★★★★★

পত্র-৭১

কিছু জিনিস আত্মসাতের কারণে মনছুর ইবনে জারুদ আল-আবদীর প্রতি

তোমার পিতার সদাচরণের কারণে আমি তোমার সম্বন্ধে প্রতারিত হয়েছি। আমি ভেবেছিলাম তুমি তোমার পিতাকে অনুসরণ করবে এবং তার পথেই চলবে। কিন্তু আমি যা জানতে পারলাম তাতে মনে হয় তুমি তোমার কামনা-বাসনার বশবর্তী হয়ে আছো এবং পরকালের জন্য কোন রসদের ব্যবস্থা রাখনি। পরকালকে খুইয়ে তুমি দুনিয়া অর্জন করছো এবং নিজকে দ্বীনের বন্ধন হতে ছিন্ন করে আত্মীয়-স্বজনের মঙ্গল করতেছো।

আমি যা জানতে পেরেছি তা যদি সঠিক হয়ে থাকে তবে তোমার পরিবারের উট অথবা তোমার জুতার ফিতাও তোমার চেয়ে অধিক ভাল। তোমার মত লোক মাটির একটি গর্তও বন্ধ করার যোগ্য নও। তোমার দ্বারা কোন ভাল কাজ সম্পন্ন হতে পারে না। নিজের পদমর্যদার উন্নতি বা কোন বিশ্বস্ততার অংশীদার বা আত্মসাতের ব্যাপারে তোমাকে বিশ্বাস করা যায় না। কাজেই আমার এ পত্র পাওয়া মাত্র আমার কাছে রওয়ানা করো, ইনশাল্লাহ্‌।

★★★★★

পত্র-৭২

আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাসের প্রতি

তুমি তোমার জীবন-সীমার বাইরে যেতে পারবে না এবং তোমার জন্য নির্ধারিত জীবিকার বেশী তুমি পাবে না। মনে রেখো, এ জীবন দু'দিনের সমন্বয়ে— এক দিন তোমার পক্ষে আরেকদিন তোমার বিরুদ্ধে এবং এ পৃথিবী ক্ষমতা রদ-বদলের নিকেতন। এর যা কিছু তোমার জন্য রয়েছে তা তোমার কাছে আসবেই— তুমি যতই দুর্বল হওনা কেন এবং যা কিছু তোমার বিরুদ্ধে যাবার তা তুমি রুখতে পারবে না— যতই শক্তিশালী তুমি হওনা কেন।

★★★★★

পত্র-৭৩

মুয়াবিয়ার প্রতি

তোমার পত্র শুনে এবং এসবের জবাব দিয়ে আমার অভিমত দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং আমার বুদ্ধিমত্তা ভুল করছে। যখন তুমি আমার কাছে তোমার দাবীসমূহ তুলে ধর এবং আশা কর যে, আমি যেন তোমাকে লিখিত

উত্তর দেই তখন মনে হয় তুমি সেব্যক্তির মত যে গভীর ঘুমে অথচ স্বপ্ন তার সঙ্গে বিরোধ বাঁধাচ্ছে অথবা সেব্যক্তির মত যে আনন্দ-উচ্ছ্বাসে হতবুদ্ধি হয়ে আছে অথচ সে জানে না যা আসছে তা তার পক্ষে কি বিপক্ষে। তুমি সেব্যক্তির মত নও কিন্তু সেব্যক্তি কতকটা তোমার মত। তুমি তার চেয়েও নিকৃষ্ট। আমি আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলছি, যদি আমি তোমাকে সময় দিতে মনস্থ না করতাম তবে আমি তোমাকে এমন আঘাত করতাম যাতে তোমার হাড় হতে মাংস আলাদা হয়ে হাড় চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যেত। জেনে রাখো, ভাল আমল করতে এবং ভাল উপদেশ শুনতে শয়তান তোমাকে বারিত করে রেখেছে। যারা শান্তি পাবার যোগ্য তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

★★★★★

পত্র-৭৪

রাবিয়াহ্ গোত্র ও ইয়েমেনবাসীদের মধ্যে প্রটোকল হিসাবে এ দলিল আমিরুল মোমেনিন লিখেছেন (হিশাম ইবনে আল-কালবীর লেখা থেকে এটা সংগৃহীত হয়েছে)।

এ লিখিত দলিলে যা রয়েছে তা হলো ইয়েমেনবাসীগণ তাদের শহরবাসী ও যাবারগণসহ এবং রাবিয়াহ গোত্র, তাদের শহরবাসী ও যাযাবরগণসহ যাতে ঐকমত্য হয়েছে যে, তারা আল্লাহর কুরআন মেনে চলবে, কুরআনের প্রতি মানুষকে আহবান করবে এবং কুরআন অনুযায়ী আদেশ-নির্দেশ দেবে এবং যে কেউ কুরআনের প্রতি আহ্বান ও নির্দেশ করলে তাতে সাড়া দেবে। কোন মূল্যেই তারা এটা বিক্রি করবে না এবং এর বিকল্প কোন কিছু গ্রহণ করবে না। যে কেউ কুরআনের বিরোধিতা করবে অথবা কুরআন পরিত্যাগ করবে তার বিরুদ্ধে তারা একে অপরের সাথে হাত মেলাবে। তারা একে অপরকে সাহায্য করবে। তারা একে অপরের সাথে কণ্ঠ মেলাবে। নিন্দাকারীদের নিন্দা রাগান্বিত ব্যক্তির রোষে একে অপরকে অপমানকর ব্যবহার বা গালমন্দ করলেও তারা এ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবে না।

উপস্থিত-অনুপস্থিত, চতুর-বোকা, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলের জন্য এ প্রতিশ্রুতি পালনীয়। এর সাথে আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতিও পালনীয় এবং আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতির হিসাব-নিকাশ হবে। লেখক ঃ ইবনে আবি তালিব

★★★★★

পত্র-৭৫

আমিরুল মোমেনিন খেলাফতের শপথ গ্রহণের পরপরই মুয়াবিয়াকে এ পত্র লিখেছিলেন (মুহাম্মদ ইবনে উমর আল-ওয়াকিদীর লিখিত 'কিতাব আল-জামাল' হতে এটা নেয়া হয়েছে)।

আল্লাহ্‌র বান্দা আমিরুল মোমেনিন আলীর নিকট হতে আবু সুফিয়ানের পুত্র মুয়াবিয়ার প্রতি ঃ

আমার খেলাফত গ্রহণের কারণ বা এটা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা অজানা নয়—তা তোমরা সবিশেষ অবহিত আছো। খেলাফত গ্রহণ বিষয়ে যা ঘটেছিল তা অবশ্যম্ভাবী এবং তা প্রতিহত করার কোন উপায় ছিল না। সে কাহিনী অনেক লম্বা এবং বলতে গেলে অনেক কথা বলতে হয়। যা গত হয়ে গেছে তা গত এবং যা ঘটবার তা ঘটেছে। সুতরাং আমার বায়াত গ্রহণ কর এবং একটি প্রতিনিধি দল নিয়ে আমার কাছে এসো। এখানে শেষ করলাম।

★★★★★

নির্দেশনামা-৭৬

আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসকে বসরার গভর্ণর নিয়োগ করার সময় এ নির্দেশনামা দিয়েছিলেন

সানন্দ বদনে জনগণের সাথে সাক্ষাত করো। তাদেরকে খোলাখুলি কথা বলার সুযোগ দিয়ো এবং তাদের প্রতি উদার আদেশ করো। সব সময় ক্রোধ পরিহার করে চলো, কারণ এটা হলো শয়তানের শাকুনতত্ব। মনে রেখো, যা তোমাকে আল্লাহ্র নৈকট্যে নিয়ে যাবে তা তোমাকে আগুন থেকে দূরে রাখবে। আর যা তোমাকে আল্লাহ্ হতে সরিয়ে রাখবে তা তোমাকে আগুনে নিয়ে যাবে।

★★★★★

নির্দেশনামা-৭৭

খারিজীদের সাথে যুদ্ধের জন্য মনোনীত করার সময় আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসকে দিয়েছিলেন

তাদের সাথে কুরআন দ্বারা যুক্তি-তর্ক করো না, কারণ কুরআনের মুখ বিবিধ অর্থাৎ বিভিন্নভাবে কুরআনের ব্যাখ্যা করা যায়। তুমি তোমার নিজের জ্ঞানবুদ্ধি মতে কথা বলো; তারাও তাদের জ্ঞানবুদ্ধি মতে বলবে। কিন্তু সুন্নাহ্ দ্বারা তাদের সঙ্গে যুক্তি-তর্ক দেখিয়ো, কারণ তারা সুন্নাহ্ হতে রক্ষা পাবে না।

★★★★★

নির্দেশনামা-৭৮

দু'জন সালিশ সম্পর্কে আবু মুসা আশারীর পত্রের জবাবে লিখেছিলেন (সাঈদ ইবনে ইয়াহিয়া উমাবীর 'কিতাব আল-মঘাজী' হতে এটা সংগৃহীত হয়েছে)।

পরকালের স্থায়ী উপকার পাওয়ার পথ হতে অনেক লোক ফিরে চলে গেছে; কারণ তারা দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকে পড়েছে এবং কামনা-বাসনার কথাই বলে। মানুষ যে সব ব্যাপারে আত্মগর্ব করে তা ভেবে আমি আশ্চর্যান্বিত হয়ে পড়ি। আমি তাদের ক্ষত শুকাবার জন্য ঔষধ দিচ্ছি, কিন্তু আমার ভয় হয় পাছে এটা রক্তক্ষরণ বৃদ্ধি করে দুরারোগ্য হয়ে পড়ে। মনে রেখো, মুহাম্মদের (সঃ) উম্মাহ্র স্বার্থ সংরক্ষণ ও ঐক্যের জন্য আমা অপেক্ষা বেশী লালায়িত আর কেউ নেই। এর মাধ্যমে আমি উত্তম পুরস্কার ও সম্মানিত স্থানে ফিরে যেতে চাই।

যদি তোমরা সুঠাম অবস্থান থেকে ফিরেও যাও, যা হয়েছিল অতীতে যখন আমাকে ত্যাগ করেছ, তবুও আমি আমার প্রতিশ্রুতি পরিপূর্ণ করবো; কারণ সেই হচ্ছে ক্ষতিগ্রস্থ যে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সুফলকে অস্বীকার করে। যখন কেউ মিথ্যা কথা বলে তখন আমার মেজাজ ঠিক থাকে না। অথবা আল্লাহ্ যা সঠিক রেখেছেন তা নষ্ট করতে আমি পারি না। সুতরাং যা তুমি বুঝ না তা পরিত্যাগ করো; কারণ দুষ্ট লোকেরা পাপপূর্ণ বিষয়ই তোমার কাছে নিয়ে আসবে। এখানেই শেষ করলাম।

★★★★★

নির্দেশনামা-৭৯

আমিরুল মোমেনিন খালিফা হবার পর সেনাবাহিনীর অফিসারদের প্রতি

তোমাদের পূর্ববর্তীগণের ধ্বংসের কারণ হলো তারা জনগণের অধিকার অস্বীকার করেছে। তৎপর জনগণকে ঘুষের বিনিময়ে কিনতে হয়েছিল। এতে তারা জনগণকে ভ্রান্তপথে পরিচালিত করেছিল এবং জনগণও উহা অনুসরণ করেছিল।

★★★★★

তৃতীয় অধ্যায়

আমিরুল মোমেনিনের
উক্তি, উপদেশ ও প্রবাদ

১। গৃহ যুদ্ধের (Civil disturbance) সময় উষ্ট্র শাবকের (labun) মত হয়ে যেয়ো, যার পিঠ এমন শক্ত নয় যাতে চড়া যায় অথবা বাট এমন নয় যা দোহন করা যায়[১]।

(১) এর অর্থ হলো গৃহযুদ্ধ বা অভ্যন্তরীণ কোন্দলের সময় মানুষকে এমন ভাবে আচরণ করতে হয় যাতে করে তার কোন গুরুত্ব আছে বলে মনে না হয়। তখন সকলে তাকে উপেক্ষা করে যাবে। কোন পক্ষে তার যোগদান করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হবে না। কারণ ফেতনার সময় এরূপ নির্লিপ্ততা উৎপীড়ন হতে রক্ষা করতে পারে। কিন্তু ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যে যখন দ্বন্দ্ব বাধে তখন নির্লিপ্ত থাকা অন্যায়। অবশ্য ন্যায় আর অন্যায়ের দ্বন্দ্বকে গৃহ কোন্দল বলা যায় না। এ অবস্থায় ন্যায়ের সমর্থনে রুখে দাঁড়ানো এবং অন্যায় অবনমিত করা অবশ্য কর্তব্য। উদাহরণ স্বরূপ—জামাল ও সিফফিনের যুদ্ধে ন্যায়কে সমর্থন করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ফরজ ছিল।

২। যে কেউ লোভে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে সে নিজকে অবমূল্যায়ন করে; যে নিজের অভাব অনটনের কথা প্রকাশ করে সে নিজকে অবমানিত করে; আর যার জিহবা আত্মাকে পরাভূত করে তার আত্মা দুষিত হয়ে পড়ে।

৩। কৃপণতা লজ্জা, কাপুরুষতা ত্রুটি; দারিদ্র একজন বুদ্ধিমান লোককেও তার নিজের বেলায় যুক্তি প্রদর্শন করতে ব্যর্থ করে এবং দুঃস্থ ব্যক্তি তার নিজের শহরেও আগন্তুকের মত।

৪। অযোগ্যতা বজ্রাঘাত, ধৈর্য সাহসিকতা, মিতাচার ধন-সম্পদ, আত্ম-প্রত্যয় বর্ম এবং সর্বোত্তম সাথী হলো আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় সমর্পিত হওয়া।

৫। জ্ঞান শ্রদ্ধার্হ সম্পত্তি, সদাচরণ নতুন পোষাক এবং চিন্তা স্বচ্ছ আয়না।

৬। জ্ঞানীদের বক্ষ তার গুপ্ত বিষয়ের সিন্দুক; প্রফুল্লতা বন্ধুত্বের বন্ধন; কার্যকর ধৈর্য সকল দোষ-ত্রুটির কবর।

৭। বদান্যতা কার্যকর চিকিৎসা; এ জীবনের আমল পরকালে চোখের সামনে দেখতে পাবে।

৮। মানুষ কি আশ্চর্যজনক যে, সে চর্বি আর এক টুকরা মাংস দ্বারা কথা বলে, একটি হাড় দ্বারা শুনে এবং একটি ছিদ্র দ্বারা শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়।

৯। কারো ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে পৃথিবী যখন অনুকূলে আসে তখন অন্যের ভাল কাজের সুকীর্তি তার নামে হয়; আর পৃথিবী প্রতিকূলে গেলে নিজের ভাল কাজের সুনাম হতে সে বঞ্চিত হয়।

১০। মানুষের সাথে দেখা হলে এমন আচরণ করবে যেন তোমার মৃত্যুতে তারা কাঁদে এবং তুমি বেঁচে থাকলে তারা তোমার দীর্ঘায়ু কামনা করে।

১১। প্রতিপক্ষের ওপর জয়ী হলে তাকে ক্ষমা করো।

১২। সব চাইতে অসহায় সেই ব্যক্তি যার কিছু ভ্রাতৃ-প্রতিম বন্ধু নেই; কিন্তু আরো অসহায় সেই ব্যক্তি যে এহেন বন্ধুত্ব হারায়।

১৩। অকৃতজ্ঞতা বশতঃ ছোট-খাট আনুকূল্যকেও ঠেলে ফেলে দিয়ো না।

১৪। আপনজন যাকে পরিত্যাগ করে দূরবর্তীগণের সে প্রিয় হয়।

১৫। ফেতনাবাজদেরকে পুনঃ প্রমাণ করতে হয় না— একবারেই ধরা পড়ে।

১৬। সকল বিষয় অদৃষ্টের নিয়ন্ত্রণাধীন; বিষয়টি এতদূর যে, কখনো কখনো চেষ্টার ফলশ্রুতিতে মৃত্যু হয়।

১৭। "বৃদ্ধ বয়স ঢেকে ফেল এবং ইহুদীদের অনুকরণ করো না" রাসুলের (সঃ) এ উক্তির বিষয়ে কেউ একজন জিজ্ঞেস করলে আমিরুল মোমেনিন বলেন রাসুল (সঃ) যখন একথা বলেছিলেন তখন মুষ্টিমেয় কয়েকজন দ্বীনের অনুসারী ছিল, এখন এর বিস্তৃতি বেড়েছে এবং প্রত্যেকে তার ইচ্ছামত স্বাধীনভাবে চলতে পারে।

১৮। ন্যায়কে ত্যাগ করলেও অন্যায়ের সমর্থন করো না।

১৯। যে ব্যক্তি লাগাম কষে ধরে ঘোড়া দৌড়ায় সে মৃত্যুর মুখোমুখী হয়।

২০। বিবেচক লোকের দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করো, কারণ তারা ভ্রমে নিপতিত হলে আল্লাহ্ তাদের তুলে আনেন।

২১। ভয়ের ফলাফল হলো হতাশা এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা হলো নৈরাশ্য। সুযোগ মেঘের মত বয়ে যায়। কাজেই উত্তম সুযোগের সদ্ব্যবহার করো।

২২। আমাদের অধিকার আছে। যদি তা দেয়া হয় তবেই ভাল, অন্যথায় আমরা উটের পেছনের অংশে চড়ার মত হব। তাতে আমরা হাল ছেড়ে দেব না—রাতের ভ্রমণ যতই লম্বা হউক (যতই কষ্টকর অবস্থা হোক না কেন)।

২৩। যার কর্ম তৎপরতা নিম্নমানের তার বংশ মর্যাদার জন্য তাকে উচ্চ মর্যদা দেয়া যায় না।

২৪। শোকাহতের শোক উপশম করা ও দুঃখ দুর্দশা বিমোচন করা মানেই পাপ স্খলন।

২৫। হে আদম সন্তান, তোমাদের মহিমান্বিত প্রভু তাঁর নেয়ামত তোমাদের দান করে যাচ্ছেন অথচ তোমরা তার নাফরমানি করছো। তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর।

২৬। যখন কোন লোক হৃদয়ে কোন কিছু গোপন করে, এটা তার অনিচ্ছাকৃত কথা ও মুখ মন্ডলের ভাষায় প্রকাশ হয়ে পড়ে।

২৭। অসুস্থতার সময় যতটুকু পার হাটা-চলা করো।

২৮। সব চাইতে সংযমী সে যে এটা গোপন রাখে।

২৯। যখন তুমি পৃথিবী হতে চলে যাবে এবং মৃত্যু উপস্থিত হবে তখন এটা মোকাবেলা করার বিলম্বের কোন প্রশ্ন উঠে না।

৩০। আল্লাহ্‌কে ভয় কর! আল্লাহ্‌কে ভয় কর! আল্লাহ্‌র কসম, তিনি তোমাদের পাপ ততটুকু গোপন করবেন যতটুকু ক্ষমা করেছেন।

৩১। ঈমান চারটি খুটির ওপর স্থাপিত ঃ এটা হলো, ধৈর্য, দৃঢ়-প্রত্যয়, ন্যায় বিচার ও জিহাদ।

ধৈর্যের আবার চারটি দিক আছে ঃ একাগ্রতা, ভীতি, দুনিয়া বর্জন ও বাসনা পরিত্যাগ; যে দোযখের আগুনকে ভয় করবে সে অবৈধ কাজ হতে বিরত থাকবে; যে দুনিয়াকে বর্জন করবে সে দুঃখ-দুর্দশাকে তুচ্ছ মনে করবে এবং যে মৃত্যুর কথা চিন্তা করে সে সৎ আমলের দিকে দ্রুত এগিয়ে যাবে।

দৃঢ়-প্রত্যয়েরও চারটি দিক আছে ঃ বিচক্ষণ উপলব্ধি, বুদ্ধিমত্তা ও বোধগম্যতা, আদর্শ কিছু হতে শিক্ষা গ্রহণ এবং অতীতের নজির অনুসরণ। সুতরাং যে বিচক্ষণতার সাথে উপলব্ধি করে স্বজ্ঞাপূর্ণ জ্ঞান তার কাছে পরিস্ফুট হয়ে উঠে। যার কাছে স্বজ্ঞাপূর্ণ জ্ঞান পরিস্ফুট হয় সে ইন্দ্রিয় গোচর সকল বস্তু হতে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। শিক্ষাপূর্ণ বস্তু যার ইন্দ্রিয় গোচর হয় সে অতীতকালের লোকদের মত।

ন্যায় বিচারেরও চারটি দিক আছে ঃ তীক্ষ্ম বোধি, গভীর জ্ঞান, সিদ্ধান্ত নেয়ার উত্তম ক্ষমতা এবং দৃঢ়-ধৈর্য; সুতরাং যে বুঝতে পারে সে গভীর জ্ঞান অর্জন করতে পারে; যার সারগর্ভ জ্ঞান থাকে সে বিচার করতে পারে এবং যে ধৈর্যের অভ্যাস করে সে অসৎ আমল করে না এবং জনগণের মধ্যে প্রশংসনীয় জীবন যাপন করে। জিহাদেরও চারিটি দিক আছে ঃ ভালো কাজ করার জন্য অন্যকে বলা, পাপ কাজ থেকে অন্যকে বিরত রাখা, আল্লাহ্‌র পথে সর্বান্তকরণে যুদ্ধ করা ও পাপীদের ঘৃণা করা। সুতরাং যে অন্যকে ভাল কাজ করার কথা বলে সে ঈমানদারদের শক্তি জোগায়; যে অন্যদের পাপ কাজে বাধা দেয় সে অবিশ্বাসীকে অবনমিত করে; যে সর্বান্তকরণে যুদ্ধ করে সে তার সকল দায়িত্ব পালন করে এবং যে পাপপূর্ণ কাজকে ঘৃণা করে ও রাগান্বিত হয় আল্লাহ্ তার ওপর সন্তুষ্ট থাকেন এবং শেষ বিচারে তাকে আনন্দিত করবেন।

ইমানহীনতাও চারটি খুটির ওপর স্থাপিত ঃ খেয়ালের বশবর্তী হওয়া, পারস্পরিক বিবাদ, সত্য পথ হতে ভ্রষ্ট হওয়া, মতদ্বৈধতা ও বিরোধ। সুতরাং যে খামখেয়ালীভাবে চলে সে ন্যায়ের প্রতি ঝুঁকতে পারে না; অজ্ঞতার কারণে যে বিবাদে লিপ্ত হয় সে ন্যায় হতে স্থায়ীভাবে অন্ধ হয়ে থাকে; যে সত্য থেকে সরে

যায় তার কাছে ভাল মন্দ হয়ে যায় এবং মন্দ ভাল হয়ে যায়। এতে সে বিপথগামীতায় নেশাগ্রস্থ হয়ে থাকে এবং যে আল্লাহ্ ও রাসুলের সাথে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে তার পথ বিপদসঙ্কুল হয়ে পড়ে, তার কর্মকান্ড জটিল হয়ে পড়ে এবং তার উদ্ধার পাবার পথ ক্ষীণ হয়ে পড়ে।

সংশয়েরও চারটি দিক আছে ঃ অযৌক্তিকতা, ভয়, অস্থিরতা ও সবকিছুতে অযাচিত সমর্পণ। সুতরাং যে অযৌক্তিকতার পথ বেছে নেয় তার রাত্রি কখনো প্রভাত হয় না, যে কোন কিছু আপতিত হবার ভয়ে ভীত সে দৌড়ে পালায়, যে অস্থির স্বভাব সম্পন্ন সে শয়তানের পায়ে দলিত হয় এবং যে ধ্বংসের প্রতি সমর্পণ করে সে তাতে নিমজ্জিত হয়।

৩২। কল্যাণকর কাজ যে করে সে কল্যাণ হতে অধিকতর ভাল এবং পাপী পাপ হতে নিকৃষ্ট।

৩৩। উদার হয়ো কিন্তু অপচয়কারী হয়ো না; মিতব্যয়ী হয়ো কিন্তু কৃপণ হয়ো না।

৩৪। আকাঙ্খা পরিত্যাগ করাই সর্বোকৃষ্ট সম্পদ।

৩৫। মানুষ যা পছন্দ করে না কেউ তা বলতে তাড়াহুড়া করলে মানুষ সে ব্যক্তি সম্পর্কে এমন কিছু রটিয়ে দেয় যা তারা জানে না।

৩৬। যে আকাঙ্খাকে প্রসারিত করে সে নিজের আমল ধ্বংস করে।

৩৭। একদা আমিরুল মোমেনিন সিরিয়া যাবার কালে আল-আনবার এলাকার অধিবাসীগণ তাঁর সাক্ষাত পেল। তাঁকে দেখেই তারা পায়ে হেটে চলতে শুরু করলো এবং কিছুক্ষণ পর তারা তাঁর আগে আগে দৌড়াতে শুরু করলো। তিনি এরূপ করার কারণ জিজ্ঞেস করলে তারা বললো যে, এভাবে তারা তাদের প্রধানদের সম্মান প্রদর্শন করে থাকেন। এতে আমিরুল মোমেনিন বললেন, আল্লাহ্র কসম, এতে তোমাদের নেতার কোন উপকার হবে না। এতে তোমরা নিজেদেরকে কষ্ট দিচ্ছ এবং পরকালের জন্য কৃপণতা অর্জন করছো। যার পিছে পিছে শাস্তি ঘুরছে তার জন্য এ শ্রম কতই না ক্ষতিকর। দোযখের আগুন থেকে মুক্তি পাবার যে পথ তা কতই না লাভজনক।

৩৮। আমিরুল মোমেনিন তাঁর পুত্র হাসানকে বললেন ঃ

হে আমার পুত্র, আমার কাছ থেকে চারটি জিনিস এবং আরো চারটি জিনিস লিখে নাও। এগুলো চর্চা করলে তোমার কোন ক্ষতি হবে না। বিষয়গুলো হলো, বুদ্ধিমত্তা সর্বোত্তম সম্পদ, মূর্খতা সব চাইতে বড় দুঃস্থতা, আত্মগর্ব সব চাইতে বড় বর্বরতা এবং নৈতিক চরিত্র সর্বোত্তম অবদান। হে আমার পুত্র, মূর্খ লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব করো না, কারণ সে তোমার উপকার করতে গিয়ে অপকার করে ফেলবে। কৃপণের সাথে বন্ধুত্ব করো না, কারণ যখন তুমি তার প্রয়োজন অনুভব করবে তখন সে দৌড়ে পালাবে। পাপী লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব করো না, কারণ সে তোমাকে স্বল্প মূল্যে বিক্রি করে দেবে। মিথ্যাবাদীর সঙ্গে বন্ধুত্ব করো না, কারণ সে তোমাকে দূরের জিনিস কাছের ও কাছের জিনিস দূরের বলবে।

৩৯। প্রয়োজনাতিরিক্ত ইবাদত আল্লাহ্র নৈকট্য দিতে পারে না যদি তা আবশ্যকীয় ইবাদতের ব্যাঘাত ঘটায়।

৪০। জ্ঞানী লোকের জিহবা হৃদয়ের পেছনে, আর মূর্খ লোকের হৃদয় জিহ্বার পেছনে।

৪১। মূর্খের হৃদয় মুখে আর জ্ঞানীর জিহ্বা হৃদয়ে।

৪২। একজন সহচরের অসুস্থতার সময় আমিরুল মোমেনিন বলেছিলেন, আল্লাহ্ তোমার রোগকে পাপ খণ্ডনের উপায় করে দিন, কারণ পাপ মুছে ফেলা ও শুকনো পাতার মত ঝরিয়ে দেয়া ছাড়া অসুস্থতার আর কোন পুরস্কার হতে পারে না। মুখে কিছু বলা ও হাতে-পায়ে কিছু করাতেই পুরস্কার সীমাবদ্ধ। নিশ্চয়ই, মহিমান্বিত আল্লাহ্ তার বান্দাদের মধ্য হতে হৃদয়ের নিয়্যতের সততা ও পবিত্রতার গুণে যাকে ইচ্ছা বেহেশতে প্রবেশের অনুমতি দেবেন।

৪৩। খাব্বার ইবনে আল-আরাতের[১] প্রতি আল্লাহ্র রহমত বর্ষিত হোক, যেহেতু সে স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছে, অনুগতভাবে মক্কা হতে হিজরত করেছে, যা আছে তাতেই তৃপ্ত, আল্লাহ্তে সন্তুষ্ট এবং একজন মুহাজিরের জীবন যাপন করেছে।

---

(১) খাব্বার ইবনে আরাত একজন বিশিষ্ট সাহাবী ছিলেন এবং তিনি প্রথম সারির একজন মুহাজির। তিনি কুরাইশদের হাতে নানাভাবে নিগৃহীত হয়েছিলেন। তাকে খর রৌদ্রে দাঁড় করিয়ে রাখা হতো এবং আগুনের উত্তাপে শুইয়ে রাখা হতো কিন্তু কিছুতেই তিনি রাসুলের (সঃ) পক্ষ ত্যাগ করেননি। তিনি বদর ও অন্যান্য যুদ্ধে রাসুলের পক্ষে যুদ্ধ করেছিলেন। সিফফিন ও নাহরাওয়ানের যুদ্ধে তিনি আমিরুল মোমেনিনের পক্ষে ছিলেন। তিনি মদিনা ছেড়ে কুফায় বসতি স্থাপন করেছিলেন। ৩৯ হিজরী সনে ৭৩ বৎসর বয়সে তিনি কুফায় ইন্তেকাল করেন। কুফায় তাকে দাফন করা হয়। আমিরুল মোমেনিন তার জানাজা পরিচালনা করেন এবং তার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে এ কথাগুলো বলেছিলেন।

৪৪। যে ব্যক্তি পরকালের কথা মনে রেখে ও জবাবদিহি করতে হবে মনে রেখে কাজ করে এবং যা আছে তাতে তৃপ্ত থেকে আল্লাহ্তে সন্তুষ্ট থাকে সে-ই ব্যক্তি সব চাইতে আশীর্বাদপুষ্ট।

৪৫। আমার এ তরবারি দ্বারা কোন ইমানদারের নাকে যদি আমি আঘাতও করি তবু সে আমাকে ঘৃণা করবে না। আবার আমাকে ভালবাসার জন্য যদি আমি মোনাফেকের সামনে দুনিয়ার সকল সম্পদ স্তূপীকৃত করে দেই তবুও সে আমাকে ভালবাসবে না। এর কারণ হলো পরম প্রিয় রাসুল (সঃ) তাঁর নিজ মুখে বলেছেন,

> *"হে আলী, ইমানদারগণ কখনো তোমাকে ঘৃণা করবেন না এবং মোনাফেকগণ কখনো তোমাকে ভালবাসবে না।"*[১]

---

(১) এ হাদীসটি সহী বলে সর্বসমক্ষে গৃহীত এবং এতে কেউ কোন দিন কোন সংশয় প্রকাশ করেনি। এ হাদীসটি আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস, ইমরান ইবনে হুসাইন, উম্মোল মোমেনিন উম্মে সালমা ও অন্যান্য অনেক হতে বর্ণিত হয়েছে। আমিরুল মোমেনিন নিজেই বর্ণনা করেছেন ঃ

> *যিনি বীজ হতে চারা গজান ও আত্মা সৃষ্টি করেন, সেই আল্লাহ্র কসম, নিশ্চয়ই আল্লাহ্র রাসুল (সঃ) আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে প্রকৃত মোমিন ছাড়া আমাকে কেউ ভালবাসবে না এবং মোনাফেকগণ ছাড়া কেউ আমার প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করবে না। (নায়সাবুরী[৮৩], ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬০; তিরমিজী[৮০], ৫ম খন্ড, পৃঃ ৬৩৫, ৬৪৩; মাজাহ[১০৫], ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৫; নাসাঈ[৮৫], ৮ম খণ্ড, পৃঃ ১১৫-১১৭; হাম্বল[১৬০], ১ম খন্ড, পৃঃ ৮৪, ৯৫, ১২৮; ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২৯২; হাতিম[১৫১], ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪০০; ইসফাহানী[৩১], ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১৮৫; আছীর[৩], ৯ম খন্ড, পৃঃ ৪৭৩; শাফী[১২৮], ৯ম, খন্ড, পৃঃ ১৩৩; শাফী[১২৯], পৃঃ ১৯০-১৯৫; বার[৯৭], ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১১০০; আছীর[১], ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২৬; বাগদাদী[৯৪], ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৫৫; ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৪১৭; ১৪শ খন্ড, পৃঃ ৪২৬; কাছীর[৩৯], ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৩৫৪)।*

রাসুলের (সঃ) সাহাবাগণ আমিরুল মোমেনিনের প্রতি ভালবাসা অথবা ঘৃণা দ্বারা কোন লোকের ইমান ও নিফাক পরখ করতেন। আবু জর গিফারী, আবু সাঈদ খুদরী, আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ ও জাবীর ইবনে আবদুল্লাহ্ হতে বর্ণিত আছে যে—

> *আমরা সাহাবাগণ আলী ইবেন আবি তালিবের প্রতি ঘৃণা দ্বারা মোনাফেকদের খুঁজে বের করতাম (তিরমিজী[৮০], ৫ম খন্ড, পৃঃ ৬৩৫; নায়সাবুরী[৮৪], ৩য় খন্ড, পৃঃ ১২৯; ইসফাহানী[৩১], ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২৯৪; শাফী[১২৮], ৯ম খণ্ড, পৃঃ ১৩২-১৩৩; আছীর[৩], ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৪৭৩; শাফী[১২১], ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৬৬-৬৭; বাগদাদী[৯৪], ১৩শ খন্ড, পৃঃ ১৫৩; শাফী[১২৪], ২য় খণ্ড, পৃঃ ২১৪-২১৫; বার[৯৭], ৩য় খন্ড, পৃঃ ১১১০; আছীর[৪], ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২৯-৩০)।*

৪৬। (আল্লাহ্র দৃষ্টিতে) যে পাপ তোমাকে নিরানন্দ করে তা ঐ নেক হতে অনেক ভাল যা তোমাকে গর্বিত করে।

৪৭। সাহস অনুসারে মানুষের মূল্যায়ন হয়, মেজাজের ভারসাম্য অনুসারে সত্যবাদিতা মূল্যায়ন হয়, আত্ম সম্মানবোধ অনুসারে শৌর্য এবং লজ্জাবোধ অনুসারে সততা মূল্যায়ন হয়।

৪৮। সংকল্পের ফলে বিজয়, বিচারবুদ্ধির ফলে সংকল্প এবং গোপনীয়তা রক্ষায় বিচারবুদ্ধি গড়ে উঠে।

৪৯। সম্মানী লোক যখন ক্ষুধার্ত হয় এবং হীন লোক যখন পেটভরে খায় তখন তাদের আক্রমণকে ভয় করো।

৫০। মানুষের হৃদয় বন্য পশুর মত; যে তাদের পোষে তার ওপর তারা ঝাপিয়ে পড়ে।

৫১। যে পর্যন্ত তোমার পদমর্যাদা উচ্চ থাকবে সে পর্যন্ত তোমার ক্রটি বিচ্যুতি ঢাকা থাকবে।

৫২। যে শাস্তি প্রদানে ক্ষমতাবান সে-ই ক্ষমা করতে সমর্থ।

৫৩। আপনা হতে প্রদান করাকেই উদারতা বলে, কারণ যাচ্না করলে প্রদান করা মানেই হলো হয় আত্ম-সম্মান বৃদ্ধি, না হয় বদনাম ঘুচাবার জন্য।

৫৪। প্রজ্ঞার মত সম্পদ নেই, অজ্ঞতার মত দুরাবস্থা নেই, বিশোধনের মত উত্তরাধিকারত্ব নেই এবং আলোচনার মত খুটি নেই।

৫৫। ধৈর্য দু'রকম—যা তোমাকে পীড়াদেয় তাতে ধৈর্য এবং যা তোমার লালসা সৃষ্টি করে তার বিরুদ্ধে ধৈর্য।

৫৬। সম্পদ থাকলে বিদেশও স্বদেশ বলে মনে হয় আর দুর্দশাগ্রস্থ হলে স্বদেশও বিদেশ বলে মনে হয়।

৫৭। তৃপ্তি এমন সম্পদ যা কখনো কমে না।

৫৮। সম্পদ কামনা-বাসনার ঝর্ণাধারা।

৫৯। যে তোমাকে সতর্ক করে সে ঐ ব্যক্তির মত যে তোমাকে সুসংবাদ দেয়।

৬০। জিহ্বা পশুর মত একে ঢিলা দিলেই গোগ্রাসে গিলে।

৬১। নারী কাঁকড়ার মত যার আঁকড়িয়ে ধরা মধুর।

৬২। যদি তুমি অভিবাদন পাও তবে বিনিময়ে আরো বেশী অভিবাদন দিয়ো। যদি তোমার দিকে সাহায্যের হাত বাড়ায় তবে বিনিময়ে আরো ভালো আনুকূল্য দিয়ো, যদিও যে প্রথম করবে কৃতিত্ব তারই থাকবে।

৬৩। মধ্যস্থতাকারী অনুসন্ধানীর পাখা।

৬৪। পৃথিবীর বাসিন্দা সেসব ভ্রমনকারীদের মত যাদের ঘুমন্ত অবস্থায় বহন করা হয়।

৬৫। যার বন্ধুর অভাব তাকে আগন্তুক মনে হয়।

৬৬। অপাত্রে কোন কিছু চাওয়া অপেক্ষা প্রয়োজনীয় জিনিস হারানো সহজতর।

৬৭। সামান্য হলেও দান করতে লজ্জাবোধ করো না, কারণ ফিরিয়ে দেয়া তদাপেক্ষাও ক্ষুদ্র।

৬৮। দান দুঃস্থতার অলঙ্কার আর কৃতজ্ঞতা (আল্লাহ্র কাছে) সম্পদের অলঙ্কার।

৬৯। যা সংঘটিত হবার কথা ভেবেছো তা না ঘটলে উদ্বিগ্ন হয়ো না।

৭০। চরমভাবে অবজ্ঞা অথবা অতিরঞ্জিত করা ছাড়া কোন অজ্ঞ লোক দেখবে না।

৭১। জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা যত বাড়বে বক্তব্য তত কমবে।

৭২। সময় আমাদের দেহ পরিধান করে, আকাঙ্খাকে নবায়ন করে, মৃত্যুকে নিকটবর্তী করে এবং সকল ব্যাকুল বাসনা কেড়ে নিয়ে যায়। এতে যে কৃতকার্য হয় সে শোকের মোকাবেলা করে এবং যে এর আনুকূল্য হারায় সে দুর্দশাগ্রস্থ হয়।

৭৩। যে নিজকে মানুষের নেতা বলে দাবী করে তার উচিত অপরকে শিক্ষা দেয়ার পূর্বে নিজে শিক্ষা গ্রহণ করা এবং মুখের বদলে সে যেন নিজের আচরণ দিয়ে অন্যকে শিক্ষা দেয়। যে ব্যক্তি নিজকে শিক্ষা দেয় সে অন্যকে শিক্ষাদানকারী অপেক্ষা অধিক সুনামের দাবিদার।

৭৪। মানুষের প্রতিটি নিশ্বাস মৃত্যুর দিকে পদক্ষেপ মাত্র।

৭৫। প্রত্যেক হিসাবযোগ্য বস্তুকে চলে যেতে হবে এবং প্রত্যেক প্রত্যাশিত বিষয় ঘটবে।

৭৬। যদি কোন ব্যাপার মিশ্রিত হয়ে পড়ে তবে পূর্ববর্তীগুলো অনুসারে শেষটির প্রশংসা করতে হবে।

৭৭। জীরার ইবনে হামজাহ আদ-দিবাবী[১] মুয়াবিয়ার কাছে বলেছিলেন, "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আলী ইবনে আবি তালিবকে আমি বহুবার দেখেছি গভীর রাতে তিনি মসজিদের মধ্যে নিজের দাড়ি ধরে দাঁড়িয়ে দাড়িঁয়ে এমনভাবে আর্তনাদ করতেন যেন সাপে কামড়ানো মানুষ এবং তিনি শোকাহত লোকের মত রোদন করে বলতেন ঃ

হে দুনিয়া, ওহে দুনিয়া! আমার কাছ থেকে দূর হও। কেন তুমি নিজকে আমার কাছে ব্যদন করছো? তুমি কি আমাকে পাবার জন্য লালায়িত? আমাকে অভিভূত করার মত সুযোগ তুমি পাবে না। অন্য কাউকে প্রতারিত করার চেষ্টা করো। তোমার সাথে আমার কোন কাজ নেই। আমি তোমাকে তিন তালাক দিয়েছি; কাজেই আর কোন সম্পর্ক হবার জো নেই। তোমার স্থায়ীত্ব অতি অল্প, তোমার গুরুত্ব নগণ্য এবং তোমার পছন্দ অতি হীন। আহা! রসদ আতি অল্প পথ খুবই দীর্ঘ—ভ্রমন দীর্ঘ সময়ের—লক্ষ্যস্থলে পৌঁছা কষ্টসাধ্য।

---

(১) জীরার ইবনে হামজাহ্‌ আমিরুল মোমেনিনের একজন অনুচর ছিলেন। আমিরুল মোমেনিনের ইনতিকালের পর তিনি সিরিয়া গিয়েছিলেন এবং সেখানে তিনি মুয়াবিয়ার সাথে দেখা করেছিলেন। মুয়াবিয়া তাকে বললো "আমার কাছে আলীর বর্ণনা দাও।" জীরার বললো, "আপনি অভয় দিলে আমি জবাব দিতে পারবো।" মুয়াবিয়া বললো, "তুমি নির্ভয়ে বলো" তৎপর জীরার বলতে লাগলেন ঃ

> *যদি আপনি আমার কথা বিশ্বাস করেন তবে জেনে রাখুন, আলীর ব্যক্তিত্ব ছিল সীমাহীন, তিনি ক্ষমতায় ছিলেন দোর্দন্ড, তাঁর বক্তব্য ছিল সিদ্ধান্তমূলক, তাঁর বিচার ছিল ন্যায়ভিত্তিক, সর্ব বিষয়ে তাঁর জ্ঞান ছিল, তাঁর প্রতিটি আচরণে প্রজ্ঞা প্রকাশিত হতো। তিনি মোটা খাদ্য পছন্দ করতেন এবং অল্প দামের পোষাক পছন্দ করতেন। আল্লাহ্‌র কসম, তিনি আমাদের একজন হিসাবে আমাদের মাঝে ছিলেন। তিনি আমাদের সকল প্রশ্নের উত্তর দিতেন এবং আমাদের সকল অনুরোধ রক্ষা করতেন। আল্লাহ্‌র কসম, যদিও তিনি আমাদেরকে তাঁর কাছে যেতে দিতেন প্রকৃতপক্ষে তিনি আমাদের কাছেই ছিলেন। তাঁর প্রতি আমাদের সশ্রদ্ধ অনুভূতি থাকা সত্ত্বেও তাকে সম্বোধন করে কিছু বলতে আমরা ভয় পেতাম না। আমাদের হৃদয়ে তার মহত্ব অনুভূত থাকা সত্ত্বেও আমরা প্রথম কথা বলতে ভয় পেতাম না। তাঁর হাসিতে মুক্তা ছড়িয়ে পড়তো। তিনি ধার্মিকগণকে খুব সম্মান করতেন। অভাবগ্রস্তের প্রতি খুবই দয়ালু ছিলেন। তিনি এতিম, নিকট আত্মীয় ও অন্নহীনকে খাওয়াতেন। তিনি বস্ত্রহীনে বস্ত্র দিতেন ও অক্ষম ব্যক্তিকে সাহায্য করতেন। তিনি দুনিয়া ও ইহার চাকচিক্যকে ঘৃণা করতেন। (তৎপর ওপরের ৭৭ নং এ বর্ণিত কথাগুলি বললেন)।*

জীরারের মুখ থেকে এসব কথা শুনে মুয়াবিয়ার চোখে পানি এসেছিল এবং সে বললো, "আবুল হাসানের ওপর আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হোক। তিনি প্রকৃতপক্ষে এরূপ ছিলেন।" তারপর জীরারের দিকে ফিরে বললো, তাঁর অনুপস্থিতি তুমি কেমন অনুভব কর, হে জীরার।" জীরার বললো, "আমি সেই মহিলার মত শোকহত যার সন্তানকে তার কোলে রেখে কেটে ফেলা হয়েছে" (বার [৯৭], ৩য় খন্ড, পৃঃ ১১০৭-১১০৮; ইসফাহানী [৩১], ২য় খন্ড, পৃঃ ৮৪; হাম্বলী [১৬৩], ১ম খণ্ড, পৃঃ ১২১; কালী [৪২], ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৪৭, হুসরী [১৭০], ১ম খন্ড, পৃঃ ৪০-৪১ ; মাসুদী [১০৯], ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪২১; শাফী [১২৪], ২য় খণ্ড, পৃঃ ২১২; হাদীদ [১৫২], ১৮শ খণ্ড, পৃঃ ২২৫-২২৬)।

৭৮। এক ব্যক্তি আমিরুল মোমেনিনকে জিজ্ঞেস করেছিল, "সিরিয়ানদের বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধ কি আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত ছিল? তিনি বললেন ঃ

তোমার ওপর লানত। তুমি এটাকে চূড়ান্ত ও অপরিহার্য ভাগ্য বলে মনে কর (যা আমল করতে আমরা বাধ্য)। যদি বিষয়টা সে রকম হয় তবে পুরস্কার অথবা শাস্তির প্রশ্ন উঠে না এবং আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি ও সতর্কাদেশ অর্থবহ হয় না। অপরপক্ষে, মহিমান্বিত আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদেরকে স্বাধীন ইচ্ছায় আমাল করতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং পাপ সম্পর্কে সতর্ক করে বিরত থাকতে বলেছেন। তিনি তাদের ওপর সহজ সাধ্য দায়িত্ব অর্পণ করেছেন এবং কোন ভারী দায়িত্ব অর্পণ করেননি। তিনি তাদেরকে ক্ষুদ্র আমলের জন্য অধিক পুরস্কার দিয়ে থাকেন। তাকে পরাভূত করার কারণে কেউ অমান্য করে না। তাকে মান্য করতে কাউকে বল প্রয়োগ করা হয় না। শুধুমাত্র কৌতুক করার জন্য তিনি নবী প্রেরণ করেননি। কোন উদ্দেশ্যে ছাড়াই তিনি মানুষের জন্য কুরআন নাজেল করেননি। তিনি আকাশমন্ডলী, পৃথিবী ও এ দু'য়ের মধ্যবর্তী সব কিছু বৃথা সৃষ্টি করেননি। "যারা অবিশ্বাস করে তারা এরূপই কল্পনা করে; অতঃপর যারা অবিশ্বাস করে তাদের ওপর লানত—আগুনের কারণে*" (কুরআন, ৩৮ ঃ ২৭)।*

৭৯। তারা যা বলে তা হতে প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় গ্রহণ করো, কারণ জ্ঞানগর্ভ কোন কিছু যদি মোনাফেকদের বক্ষে থাকে তবে তা বেরিয়ে এসে মোমেনের বক্ষে আশ্রয় নেয়ার জন্য অস্থির হয়ে পড়ে।

৮০। জ্ঞানগর্ভ বাণী মোমেনের কাছে হারানো বস্তুর মত। কাজেই মোনাফেক হতেও জ্ঞানগর্ভ বাণী পেলে গ্রহণ করো।

৮১। মানুষকে তার সাফল্য ও সিদ্ধি অনুযায়ী মুল্যায়ন করা হয়।

৮২। আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয় বলে দিচ্ছি। যদি তোমরা উটে চড়ে দ্রুত তা খুজে নাও (অর্থাৎ মানতে চেষ্টা করো) তবে এর সুফল পাবে।

আল্লাহ্ ছাড়া আর কিছুতে আশা স্থাপন না করা; নিজের পাপ ছাড়া আর কোন কিছু ভয় না করা; যা নিজে জানোনা সে বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হলে "আমি জানি না" বলতে লজ্জাবোধ না করা; যা নিজে জানো না তা অন্যের কাছ থেকে শিক্ষা করতে লজ্জা না করা; এবং ধৈর্য ধারণ করার অভ্যাস করা, কারণ দেহের জন্য মাথা যেরূপ ইমানের জন্য ধৈর্য তদ্রূপ।

৮৩। এক ব্যক্তি আমিরুল মোমেনিনকে খুশী করার জন্য তাঁর প্রশংসা করলে তিনি বললেন, যতটুকু তুমি প্রকাশ করেছো আমি ততটুকু নই, কিন্তু যা তোমার অন্তরে রয়েছে তা হতে আমি অনেক উর্দ্ধে।

৮৪। তরবারি হতে বেঁচে যাওয়া লোকের সংখ্যা ও তাদের বংশধরের সংখ্যা বিরাট।

৮৫। 'আমি জানি না' বলা যে পরিত্যাগ করে সে ধ্বংসের মুখোমুখী হয়।

৮৬। বয়ঃজ্যেষ্ঠ লোকের মতামত যুবকদের সংকল্প (ভিন্নমতে শাহাদাত) হতেও আমি অনেক বেশী ভালবাসি।

৮৭। ক্ষমা প্রার্থনার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি নিরাশায় ভোগে তার সম্বন্ধে আমার আশ্চর্য লাগে।

৮৮। ইমাম বাকির হতে বর্ণিত আছে যে, আমিরুল মোমেনিন বলেছেন ঃ

আল্লাহ্‌র শাস্তি হতে রক্ষা পাবার দু'টি উপায় ছিল— একটি তুলে নেয়া হয়েছে অপরটি তোমাদের সম্মুখে রয়েছে। সুতরাং তোমরা এটাকে (যেটা সামনে আছে) মানতে হবে। রক্ষা পাবার যে উপায়টি তুলে নেয়া হয়েছে তা হলো আল্লাহ্‌র রাসুল এবং যেটি এখনো আছে তা হলো ক্ষমা প্রার্থনা করা। মহিমান্বিত আল্লাহ্ বলেন, "এবং আল্লাহ্ তোমাদের শাস্তি দেবেন না যদি তোমরা তাদের মধ্যকার হও এবং আল্লাহ্ তাদেরও শাস্তি দেবে না যারা ক্ষমা প্রার্থনা করে" (কুরআন, ৮ ঃ ৩৩)।

৮৯। যদি কোন মানুষ আল্লাহ্ ও তার নিজের মধ্যকার ব্যাপারে যথাযথ আচরণ করে তবে আল্লাহ্ তার ও অন্যের মধ্যকার বিষয়াবলী যথাযথ রাখেন। যদি কেউ পরকালের জন্য যথাযথ কর্মকান্ড করে তবে আল্লাহ্ তার ইহকালের কর্মকান্ড যথাযথ রাখেন। যদি কেউ নিজেই নিজের ধর্মোপদেষ্টা হয় তবে আল্লাহ্ তাঁকে রক্ষা করেন।

৯০। ইসলামের যথার্থ ফেকাহ্‌বিদ সে যে আল্লাহ্‌র রহমত হতে মানুষকে নিরাশ করে না, আল্লাহ্‌র দয়ার প্রতি হতাশ করে না এবং আল্লাহ্‌র শাস্তি হতে নিরাপদ বলে মনে করিয়ে দেয় না।

৯১। দেহের বিরক্তিকর অবস্থা হলে হৃদয়ও বিরক্ত হয়ে পড়ে; সুতরাং সৌন্দর্যপূর্ণ জিনিস দেখা বুদ্ধিমানের কাজ।

৯২। হীনতম জ্ঞান জিহ্বায় থাকে এবং উচ্চমানের জ্ঞান কর্মের মাঝে প্রকাশ পায়।

৯৩। কেউ একথা বলা উচিত নয় "হে আল্লাহ্ বিপদাপদ হতে আমি তোমার ফানা চাই", কারণ বিপদাপদ ছাড়া কাউকে পাওয়া যাবে না। যদি কেউ আল্লাহ্‌র নিরাপত্তা চায় তবে বিদপগামীতা হতে নিরাপত্তা চাওয়া উচিত। কারণ মহিমান্বিত আল্লাহ্ বলেন, "এবং জেনে রাখো যে, তোমাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি পরীক্ষা মাত্র" (কুরআন, ৮ ঃ ১২)। এ আয়াতের অর্থ হলো আল্লাহ্ সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা এজন্য মানুষকে পরীক্ষা করেন যাতে যে ব্যক্তি তার জীবিকা নিয়ে অসন্তুষ্ট তার থেকে ঐ ব্যক্তিকে আলাদা করা যায় যে প্রাপ্ত জীবিকায় খুশী। মহিমান্বিত আল্লাহ্ তাদের সম্বন্ধে জানেন যা তারা নিজেরাও তাদের সম্বন্ধে জানে না। তবুও তিনি এমনভাবে কর্মসাধন করতে দেন যদ্দারা পুরস্কার অথবা শাস্তি অর্জন করতে পারে। কারণ তাদের কেউ পুরুষ সন্তান পছন্দ করে ও নারী সন্তান অপছন্দ করে এবং কেউ সম্পদ স্তূপীকৃত করতে চায় আবার কেউ দারিদ্র অপছন্দ করে।

৯৪। এক ব্যক্তি আমিরুল মোমেনিনকে জিজ্ঞেস করেছিল ভাল কি। উত্তরে তিনি বললেন ঃ

ভাল মানে এ নয় যে তোমার অনেক সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি থাকবে; ভাল মানে তোমার অনেক জ্ঞান থাকবে; তোমার ধৈর্য থাকবে অসীম এবং তুমি আল্লাহ্‌র ইবাদতে অন্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করবে। যদি তুমি ভাল কাজ কর তবে আল্লাহ্‌র কাছে শোকরিয়া আদায় করো, যদি তুমি পাপ কর তবে আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। এ পৃথিবীতে ভাল শুধু দু'ব্যক্তির জন্য যে পাপ করার পর তওবা করে এবং যে ব্যক্তি দ্রুত ভাল কাজের দিকে এগিয়ে যায়।

৯৫। যে কাজে আল্লাহ্‌র ভীতি থাকে তা ব্যর্থ হয় না; যা মকবুল তা কি করে ব্যর্থ হতে পারে।

৯৬। রাসুল (সঃ) কি এনেছেন তা যে যত বেশী জানে সে রাসুলের তত নিকটের। নিশ্চয়ই, ইব্রাহীমের তারাই বেশী নিকটতম যারা তাঁকে ও এ নবীকে অনুসরণ করে এবং যারা বিশ্বাস করে" (কুরআন, ৩ ঃ ৬৮)। সেই মুহাম্মদের বন্ধু যে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করে যদিও তার কোন রক্তের সম্পর্ক না থাকে। আর আল্লাহ্‌কে যে অমান্য করে সে মুহাম্মদের শত্রু থাকুক না কেন তার নিকট জ্ঞাতিত্ব।

৯৭। দৃঢ় ইমানে ঘুমানো সংশয়পূর্ণ ইবাদত হতে অধিকতর ভাল।

৯৮। যখন তুমি কোন হাদীস শুন তখন বুদ্ধিমত্তার সাথে তা পরীক্ষা করো, কারণ হাদীস বর্ণনাকারী জ্ঞানী লোকের সংখ্যা অনেক কিন্তু হাদীসের সঠিকতা রক্ষাকারীর সংখ্যা খুবই কম।

৯৯। এক ব্যক্তিকে "ইন্নানিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন" (কুরআন, ২ ঃ ১৫৬) পড়তে শুনে আমিরুল মোমেনিন বললেন, আমরা "ইন্নানিল্লাহি" বলে আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্বকে এবং 'ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন" বলে আমাদের মরণশীলতাকে স্বীকার করছি।

১০০। কতিপয় ব্যক্তি আমিরুল মোমেনিনের সামনে তাঁর প্রশংসা করলে তিনি বললেন, হে আমার আল্লাহ্ , তুমি আমাকে আমা অপেক্ষা অধিক বেশী জান এবং আমি আমার নিজকে তাদের চেয়ে বেশী জানি। হে আমার

আল্লাহ্‌, তারা যতটুকু চিন্তা করে তার চেয়ে অধিক ভাল তুমি অমাদের করে দাও এবং তারা যা জানে না সে বিষয়ে আমাদের ক্ষমা করে দাও।

১০১। অন্যের প্রয়োজন মিটানো তিনভাবে দীর্ঘস্থায়ী গুণ ঃ একে ক্ষুদ্র মনে করতে হবে তাতে এটা বড়ত্ব অর্জন করবে; একে গোপন করতে হবে তাতে এটা আত্মপ্রকাশ করবে এবং একে তাড়াতাড়ি সম্পাদন করতে হবে তাতে এটা আনন্দদায়ক হবে।

১০২। সহসাই এমন এক সময় আসবে যখন এমন লোককে উচ্চ মর্যাদা দেয়া হবে যারা অন্যের বদনাম করে বেড়ায়, যখন দুষ্ট প্রকৃতির লোককে বুদ্ধিমান বলা হবে এবং ন্যায়পরায়ণগণকে দুর্বল মনে করা হবে। মানুষ দানকে ক্ষতি বা লোকসান বলে মনে করবে, জ্ঞাতিত্বের বিবেচনা দায়িত্ব বলে মনে করবে এবং ইবাদতের স্থান সমূহ অন্যের ওপর মহত্ব দাবীর স্থান হবে। এ সময় নারীর পরামর্শে কর্তৃত্ব প্রয়োগ করা হবে। অল্প বয়স্ক বালককে উচ্চ মর্যদায় আসীন করা হবে এবং নপুংসক লোক দ্বারা প্রশাসন চালানো হবে।

১০৩। একদিন আমিরুল মোমেনিনকে ছিন্ন ও তালি দেয়া পোষাক পরিহিত অবস্থায় দেখে কেউ একজন এর কারণ জানতে চাইলে তিনি বললেন ঃ

এতে অন্তর ভয়ে থাকে, মনে অহমবোধ আসে না এবং ইমানদারগণ সমকক্ষ হবার চেষ্টা করবে। নিশ্চয়ই ইহকাল ও পরকাল পরস্পর পরস্পরের শত্রু এবং ভিন্নমুখী দু'টি পথ। যে এ দুনিয়াকে পছন্দ করে ও ভালবাসে সে পরকালের তোয়াক্কা করে না। এ দু'টি হলো পূর্ব পশ্চিমের মত। এর একটির দিকে এগিয়ে গেলে অন্যটি হতে দূরে সরে যেতে হয়। মোটের ওপর এ দু'টি হলো দু'সতীনের মত।

১০৪। নাউফ আল-বিকালী হতে বর্ণিত আছে যে, আমি দেখেছিলাম একরাতে আমিরুল মোমেনিন তাঁর বিছানা ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলেন এবং তারকাপুঞ্জের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন। তৎপর তিনি আমাকে বললেন,

"হে নাউফ, তুমি কি জেগে আছো না ঘুমিয়ে আছো?" আমি বললাম, "হে আমিরুল মোমেনিন, আমি জেগে আছি।" তৎপর তিনি বললেন ঃ হে নাউফ, তাদের ওপর রহমত বর্ষিত হোক যারা এ দুনিয়া হতে বিরত রয়েছে এবং পরকালের জন্য ব্যাকুল হয়ে আছে। তারা ঐ লোক যারা এ মাটিকে তাদের মেঝে, এর ধুলিকণাকে তাদের রাত্রিকালীন পোষাক এবং এর পানিকে তাদের সুগন্ধি মনে করে। তারা নিম্ন স্বরে কুরআন তেলাওয়াত করে এবং মিনতি করে উচ্চস্বরে। তৎপর তারা ঈশার মত এ পৃথিবী হতে কেটে পড়ে। হে নাউফ, এ রকম এক রাতে দাউদ একই সময়ে জেগেছিলেন এবং বললেন, "এ সময়টা এমন যখন যা প্রার্থনা করা হয় তাই কবুল করা হয় যদি না সে কর আদায়কারী, গোয়েন্দা ব্যক্তি, পুলিশ অফিসার, বাদ্যযন্ত্র (বীণা জাতীয় তারের বাদ্য) বাদক ও ঢক্কাবাদক হয়।"

১০৫। আল্লাহ্‌ তোমাদের ওপর কতিপয় দায়িত্ব অর্পণ করেছেন যা অবহেলা করা উচিত নয়, কতিপয় সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন যা লজ্মন করা উচিত নয়, কতিপয় জিনিস হারাম করেছেন যা ভঙ্গ করা উচিত নয় আবার কতিপয় বিষয়ে নীরব রয়েছেন; তাতে তোমরা মনে করো না যে, তিনি ভুলে গিয়ে এগুলো সম্বন্ধে কিছু বলেননি।

১০৬। জাগতিক কোন কর্মকাভকে যথাযথ করার জন্য যদি কেউ দ্বীন সম্পর্কীয় কিছু পরিত্যাগ করে তবে আল্লাহ্‌ তার ওপর এমন কিছু আপতিত করবেন যা অধিক ক্ষতিকর হবে।

১০৭। কখনো কখনো শিক্ষিত লোকের অজ্ঞতা তাকে ধ্বংস করে দেয়; তখন তাঁর যে জ্ঞান আছে তা লোপ পায়।

১০৮। মানুষের মধ্যে এক টুকরা মাংস একটি শিরার সঙ্গে সংযুক্ত অবস্থায় রয়েছে এবং এটা এক অদ্ভুত জিনিস। এটাকে 'কাল্ব' বলে। এটাই জ্ঞান ও জ্ঞানের সাথে দ্বান্দ্বিক জিনিসের ভান্ড। যদি এটা কোন আশার রশ্মি দেখে, উদ্বিগ্নতা এটাকে কলুষিত করে এবং যখন উদ্বিগ্নতা বেড়ে যায় তখন লোভ এটাকে ধ্বংস করে। যদি হতাশা এটাকে ছেয়ে ফেলে তবে শোক এটাকে হত্যা করে। যদি এর ভেতর ক্রোধ জেগে ওঠে তাহলে একটা মারাত্মক ক্ষিপ্ততা জন্ম নেয়। যদি এতে আনন্দ বিরাজ করে তবে এটা সতর্ক হওয়ার বিষয় ভুলে যায়। যদি এটা ভয়ে ভীত হয় তবে অমনোযোগী হয়ে পড়ে। যদি চারদিকে শান্তি বিরাজ করে তবে এটা গাফেল হয়ে পড়ে। যদি এটা সম্পদ অর্জন করে তবে বেপরোয়া মনোভাব এটাকে ভুল পথে নিয়ে যায়। যদি এতে বিপদ আপতিত হয় তবে অধৈর্য এটাকে হীন করে দেয়। যদি এটা উপোস করে তবে দুঃস্থাবস্থা এটাকে পরাভূত করে। যদি ক্ষুধা এটাকে আক্রমণ করে তবে দুর্বলতা এটাকে স্থবির করে দেয়। যদি এর খাওয়ার পরিমাণ বেড়ে যায় তবে শরীরের ওজন এটাকে ব্যাথা দেয়। এভাবে প্রতিটি কমতি এবং প্রতিটি বাড়তি এর জন্য ক্ষতিকর।

১০৯। আমরা (আহলুল বাইত) মাঝখানের বালিশের মত। যে পেছনে পড়ে আছে তাকে এটা পেতে হলে এগিয়ে আসতে হবে এবং যে অতিক্রম করে গেছে তাকে এর কাছে ফিরে আসতে হবে।

১১০। মহিমান্বিত আল্লাহ্‌র বিধান সে ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না যে ন্যায়ের ব্যাপারে কোমলতা প্রদর্শন করে, যে অন্যায়কারীর মত আচরণ করে না এবং যে লোভের বস্তুর দিকে দৌড়ে যায় না।

১১১। সহল ইবনে হুনায়েফ আল-আনসারী সিফফিনের যুদ্ধ হতে ফিরে এসে কুফায় মৃত্যুবরণ করেন। আমিরুল মোমেনিন তাকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। তার মৃত্যুতে তিনি বললেন ঃ
যদি একটা পর্বতও আমাকে ভালবাসত তবে তা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে ধুলিসাৎ হয়ে যেত (এ কথার অর্থ হলো তাকে ভালবাসলে অসহ্য দুঃখ-কষ্ট-দুর্দশা-যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়)। কিন্তু তাতেও সহল অটল ছিল। (এর পরবর্তী বাণীটিও অনুরূপ)

১১২। আমরা, আহলুল বাইতদেরকে যারা ভালবাসে তাদেরকে দুঃখ-দুর্দশা-লাঞ্চনা-বঞ্চনা-উৎপীড়ন -যন্ত্রনা পোহাবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

১১৩। প্রজ্ঞার চেয়ে লাভজনক সম্পদ আর নেই। আত্মশ্লাঘা অপেক্ষা বড় বিচ্ছিন্নকারী ও একাকীত্বে নিক্ষেপকারী আর কিছু নেই। কৌশলের মত উত্তম প্রজ্ঞা আর নেই। খোদাভীতির মত সম্মান আর নেই। নৈতিক চরিত্রের মত উত্তম সাথী আর নেই। ভদ্রতার মত উত্তরাধিকারিত্ব আর কিছু নেই। তৎপরতার মত দেশনা আর কিছু নেই। সৎ কর্মের মত ব্যবসায় আর কিছু নেই। ঐশী পুরস্কারের মত লাভজনক আর কিছু নেই। সংশয়ে মিথষ্ক্রিয়ার মত আত্মনিয়ন্ত্রণ আর কিছু নেই। নিষিদ্ধ বিষয় হতে বিরত থাকার মত সংযম আর কিছু নেই। চিন্তা বা গবেষণার মত জ্ঞান আর কিছু নেই। দায়িত্ব পালনের মত ইবাদত আর কিছু নেই। বিনম্রতা ও ধৈর্যের মত ইমান আর কিছুই নেই। নিরহঙ্কার হওয়ার মত সাফল্য আর কিছু নেই। জ্ঞানের মত সম্মান আর কিছু নেই। ক্ষমার মত শক্তি আর কিছু নেই। আলাপ-আলোচনার মত বিশ্বস্ত স্তম্ভ আর কিছু নেই।

১১৪। এমন সময় আসবে যখন নৈতিক উৎকর্ষ পৃথিবীতে ও মানুষের মধ্যে জনপ্রিয়তা অর্জন করবে। তখন যদি কেউ অন্য কারো সম্পর্কে মন্দ ধারণা পোষণ করে যাকে মন্দ স্পর্শ করেনি তবে সে অন্যায়কারী হবে। এবং এমন সময় হবে যখন পাপ পৃথিবীতে ও মানুষের মধ্যে জনপ্রিয়তা অর্জন করবে। তখন যদি কেউ অন্য কারো সম্পর্কে ভাল ধারণা পোষণ করে তবে সে নিজকে বিপদ সঙ্কুল অবস্থায় নিক্ষেপ করবে।

১১৫। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেছিলো, "হে আমিরুল মোমেনিন, আপনি কেমন আছেন।" প্রত্যুত্তরে তিনি বললেনঃ

যে প্রতিটি নিঃশ্বাসে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, যার সুস্বাস্থ্য যে কোন মুহূর্তে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়তে পারে এবং যে ব্যক্তি যেকোন নিরাপদ স্থানেই থাকুক না কেন মৃত্যু দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে সে কেমন থাকতে পারে?

১১৬। অনেককে আল্লাহ্ উত্তম ব্যবহার দ্বারা সময় দিয়ে থাকেন এবং অনেককে বঞ্চিত করেন, কারণ তাদের পাপপূর্ণ কর্মকান্ড আল্লাহ্ ঢেকে রাখেন এবং অনেকে নিজের সম্পর্কে ভাল কথায় মুগ্ধ হয়। আল্লাহ্ কারো বিচার ঐ ব্যক্তির মত কঠোরভাবে করেন না যাকে তিনি সময় দিয়েছিলেন।

১১৭। দু'শ্রেণীর লোক আমাকে নিয়ে ধ্বংসের সম্মুখীন হবে—এক শ্রেণী হলো, যারা আমাকে অতিরঞ্জনের সাথে ভালবাসে এবং অপর শ্রেণী হলো, যারা আমাকে চরমভাবে ঘৃণা করে।

১১৮। সুযোগ হারালে দুঃখ পেতে হয়।

১১৯। দুনিয়ার উদাহরণ হলো সর্প। এটা স্পর্শ করতে কোমল কিন্তু এর ভেতর বিষে ভরপুর। যে অজ্ঞ ও প্রতারণায় পড়ে সে এর প্রতি আকৃষ্ট হয়। কিন্তু জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান লোক এর থেকে নিজের প্ররক্ষা বিধান করে।

১২০। কুরাইশদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে আমিরুল মোমেনিন বললেন ঃ বনি মখজুম হলো কুরাইশদের বক্ষ। তাদের পুরুষদের সঙ্গে কথা বলা এবং নারীকে বিয়ে করা আনন্দদায়ক। বনি আবদ শামসের লোকেরা গুপ্ত বিষয়ে দূরদর্শী ও সতর্ক। আমরা বিন হাশিমগণ যা পাই তা ব্যয় করি এবং আমরা আমাদেরকে উদারভাবে মৃত্যুর কোলে সপে দেই। ফলে তারা সংখ্যায় অনেক, তারা ফন্দি-ফিকিরকারী ও কুৎসিত। অপরপক্ষে আমরা অত্যধিক সুভাষী, শুভাকাঙ্খী ও সুন্দর।

১২১। দু'টি আমলের মধ্যে কতই না পার্থক্য— একটি আমল হলো, যার আনন্দ গত হয়ে গেছে কিন্তু কুফল এখনো বিরাজমান; অপরটি হলো, যার দুঃখ-দুর্দশা গত হয়ে গেছে কিন্তু পুরস্কার বহমান।

১২২। একজন মৃত লোকের লাশ দাফন করতে গিয়ে কাউকে হাসতে দেখে আমিরুল মোমেনিন বললেন ঃ

ব্যাপারটি কি এমন যে, মৃত্যু শুধুমাত্র অন্যের জন্য নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে? বিষয়টি কি এমন যে, ন্যায় শুধুমাত্র অন্যের জন্য বাধ্যতামূলক? এটা কি এমন যে, যাদের আমরা মৃত্যু-ভ্রমণে প্রস্থান করতে দেখি তারা কখনো আমাদের মাঝে আবার ফিরে আসবে? আমরা তাদেরকে কবরে শায়িত করে তাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি উপভোগ করি। আমরা সকল উপদেশদানকারীকে (মৃত ব্যক্তিগণ) অবজ্ঞা করছি এবং নিজেরেদকে মারাত্মক ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছি।

১২৩। যে নিজকে বিনম্র করে সে আশীর্বাদপুষ্ট। তার জীবিকা পবিত্র, হৃদয় পবিত্র ও আভ্যাসাবলী ধার্মিকতাপূর্ণ। সে তার সঞ্চয়কে আল্লাহ্‌র নামে খরচ করে। সে খারাপ কথা বলা হতে তার জিহ্বাকে বারিত রাখে। সে মানুষকে পাপ হতে নিরাপদে রাখে। সে রাসুলের (সঃ) সুন্নাহ্‌তে সন্তুষ্ট এবং দ্বীনের কোন বেদাআতের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই।

১২৪। নারীর মাৎসর্যহলো উৎপথগামিতা আর পুরুষের মাৎসর্য বিশ্বাসের অঙ্গ।

১২৫। আমি ইসলামকে এমনভাবে সজ্ঞায়িত করছি যা পূর্বে আর কেউ করেনি; ইসলাম হলো সমর্পণ, সমর্পণ হলো প্রত্যয়-উৎপাদন, প্রত্যয় হলো সত্যতা সমর্থন, সত্যতা সমর্থন হলো স্বীকৃতি প্রদান, স্বীকৃতি প্রদান হলো দায়িত্বপালন এবং দায়িত্বপালন হলো আমল।

১২৬। কৃপণদের দেখে আমার আশ্চর্য লাগে যারা দুর্দশার দিকে বেগে ধাবিত হচ্ছে; অথচ তারা দুর্দশা হতে দৌড়ে পালাতে চায়। জীবনের আরাম-আয়েশ হারিয়ে ফেলছে; অথচ তারা ব্যাকুলভাবে তা কামনা করে।

অহঙ্কারী লোকদের দেখে আমার আশ্চর্য লাগে, যে ক'দিন আগেও বীর্যের ফোটা ছিল এবং আগামীকাল লাশে পরিণত হবে। যে লোক আল্লাহ্‌তে সন্দেহ করে তাকে দেখে আমার আশ্চর্য লাগে, কারণ সে তো আল্লাহ্‌র সৃষ্টি দেখেছে। মানুষকে মরতে দেখেও যেসব লোক মৃত্যুকে ভুলে থাকে তাদের কথা ভেবে আমার আশ্চর্য লাগে। সেসব লোকের কথা ভেবে আমার আশ্চর্য লাগে যারা দ্বিতীয় জীবনকে অস্বীকার করে যদিও তারা প্রথম জীবন দেখেছে। তাদের কথা ভেবেও আশ্চর্য লাগে যারা চিরস্থায়ী আবাসকে ভুলে ক্ষণস্থায়ী আবাস নিয়ে ব্যস্ত।

১২৭। কর্মবিমুখ লোক দুঃখে নিপতিত হয়। যে আল্লাহ্‌র নামে তার সম্পদ হতে কিছুই ব্যয় করে না তার বিষয়ে আল্লাহ্‌র করণীয় কিছু নেই।

১২৮। শীতের প্রারম্ভে সাবধান থেকো এবং শীতের শেষ দিককে অভিনন্দন জানিয়ো কারণ ইহা বৃক্ষকে যেরূপ প্রভাবিত করে শরীরকে তদ্রূপ প্রভাবিত করে। প্রারম্ভে ইহা বৃক্ষকে পত্রবিহীন করে এবং শেষ দিকে নতুন পাতা গজায়।

১২৯। স্রষ্টার মহত্ত্বের প্রশংসা সৃষ্টিকে ক্ষুদ্র করে দেয়।

১৩০। আমিরুল মোমেনিন সিফফিনের যুদ্ধ হতে ফিরে এসে কুফার বাহিরে কতগুলো কবর দেখতে পেয়ে বললেনঃ

হে জনবসতিশূন্য এলাকার একাকীত্বের ঘরের বাসিন্দাগণ; হে ধূলি কণার মানুষ সকল, হে অদ্ভুত অবস্থার শিকারগণ, হে একাকীত্বের মানুষ সকল, হে নিঃসঙ্গ মানুষ সকল! তোমরা আগে গিয়ে আমাদের অগ্রবর্তী হয়েছো। আমরা তোমাদের অনুসরণ করছি এবং তোমাদের সাথে সাক্ষাৎ হবে। তোমরা যে ঘর ছেড়ে গেছো তাতে অন্যরা বসবাস করছে। তোমরা যেসব স্ত্রী রেখে গেছো তাদেরকে অন্যরা বিয়ে করছে এবং যে সম্পদ রেখে গেছো তা ওয়ারিশগণ বন্টন করে নিয়েছে। আমাদের চারদিকে যারা আছে তাদের সংবাদ হলো এটাই; এখন তোমাদের চারদিকে যারা আছে তাদের সংবাদ কি?

তৎপর আমিরুল মোমেনিন সাথীদের দিকে ফিরে বললেন ঃ যদি তাদের কথা বলার ক্ষমতা থাকতো তাহলে তারা বলতো, 'নিশ্চয়ই, আল্লাহ্‌র ভয় উত্তম রসদ" (কুরআন, ২ ঃ ১৯৭)

১৩১। একজন লোক দুনিয়াকে গালিগালাজ করছিল। আমিরুল মোমেনিন তা শুনে বললেন ঃ

হে ব্যক্তি যে দুনিয়াকে গালিগালাজ করছো, হে ব্যক্তি যে দুনিয়ার ছলনায় পড়ে প্রতারিত হয়েছো, তুমি কি দুনিয়াকে ব্যগ্রভাবে কামনা করে তৎপর গালিগালাজ করছো? তুমি কি দুনিয়াকে দোষারোপ করছো, নাকি দুনিয়ার উচিত তোমাকে দোষারোপ করা? কখন দুনিয়া তোমাকে হতবিহ্বল বা প্রতারণা করেছিল? তোমার পূর্বপুরুষদের পতন ও ধ্বংসের পর? নাকি মাটির নীচে তোমাদের মায়েরা ঘুমিয়ে পড়ার পর? পীড়ার সময় তোমরা তাদেরকে কতই না দেখাশুনা করেছো এবং অসুস্থতার সময় তাদের কতই না সেবা যত্ন করেছো। তোমরা আশা করেছিলে তারা যেন আরোগ্য লাভ করে। তাদের জন্য চিকিৎসকের সাথে পরামর্শ করেছো। তোমাদের ঔষধ তাদের কোন কাজে আসেনি। তোমাদের দুঃখ প্রকাশ তাদের কোন উপকারে আসেনি। তোমাদের শোকের কান্না বৃথা হয়ে গেছে এবং তোমরা লক্ষ্য অর্জন করতে পারনি। তোমাদের সর্বশক্তি দিয়েও তাদের মৃত্যুকে দাবিয়ে রাখতে পারনি। বস্তুতঃ মৃত ব্যক্তির মাধ্যমে দুনিয়া একটা উদাহরণ দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে, কিভাবে পতন ঘটে এবং একইভাবে তোমাদেরও পতন ঘটবে।

নিশ্চয়ই এ পৃথিবী তার জন্য সত্যাগার যে সত্যের পূজারী, তার জন্য নিরাপদ স্থল যে বুঝতে পারে, তার জন্য ধনাগার যে (পরকালের জন্য) উহা সংগ্রহ করতে পারে, তার জন্য শিক্ষালয় যে উহা হতে শিক্ষা গ্রহণ করে। আল্লাহ্ প্রেমিকদের জন্য এটা ইবাদতের স্থান, আল্লাহ্র ফেরেশাতাদের জন্য এটা প্রার্থনার স্থান, এটা আল্লাহ্র প্রত্যাদেশ নাজেলের স্থান এবং যারা আল্লাহ্তে আসক্ত তাদের জন্য কেনাকাটার স্থান। এখানে তারা রহমত অর্জন করে এবং লাভ হিসাবে বেহেশত পায়।

সুতরাং যেখানে দুনিয়া তার প্রস্থান ঘোষণা করছে এবং স্পষ্টভাবে জানান দিচ্ছে যে, সে সব কিছু ত্যাগ করবে সেখানে উহাকে গালিগালাজ করা অর্থহীন। দুনিয়া পূর্বাহ্নেই নিজের ধ্বংসের সংবাদ দিয়েছে এবং সকলকে মৃত্যুর সংবাদও দিয়েছে। নিজের দুর্দশা দ্বারা দুনিয়া অন্যের দুর্দশার একটা উদাহরণ স্থাপন করেছে। ইহার আনন্দ দ্বারা পরকালের আনন্দের আগ্রহ সৃষ্টি করেছে। রাতে ইহা আরাম আয়েশ আনয়ন করে, আবার প্রাতে ইহা প্ররোচনা ও প্রতারণা করে শোকাহত করে।

মানুষ তওবা করে রোদন করার সময় একে গালমন্দ করে, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই এতে প্রলুব্ধ হয়ে এর প্রশংসা শুরু করে। দুনিয়া প্রতিনিয়ত যে শিক্ষা দিয়ে যাচ্ছে তা স্মরণ রাখা, স্বীকার করা ও মেনে চলা উচিত।

১৩২। আল্লাহ্র একজন ফেরেশতা আছে যে প্রতিদিন ডেকে বলছে "মৃত্যুর জন্য সন্তান-সন্ততি জন্ম দাও এবং ধন-সম্পদ ও দালান-কোঠা ধ্বংসের জন্য কর।"

১৩৩। এ পৃথিবী থাকার জন্য নয়—যাত্রাপথের বিশ্রাম স্থল। এখানে দু'ধরণের মানুষ আছে। এক হলো, যারা কামনা-বাসনার দাস হয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে; আর হলো যারা কামান-বাসনাকে নিয়ন্ত্রণ করে মুক্তিপ্রাপ্ত হয়েছে।

১৩৪। যে ব্যক্তি বন্ধুদের তিন সময়ে রক্ষা করার চেষ্টা করে না সে বন্ধু নয়। এ সময়গুলি হলো —তার অভাবের সময়, তার অনুপস্থিতিতে এবং তার মৃত্যুকালে।

১৩৫। যাকে চারটি জিনিস দান করা হয় সে চারটি জিনিস হতে বঞ্চিত হয় না। যাকে প্রার্থনা করতে দেয়া হয় তাকে সাড়া হতে বঞ্চিত করা হয় না। যাকে তওবা করার সুযোগ দেয়া হয় তাকে কবুল হতে বঞ্চিত করা হয় না। যাকে ক্ষমা চাইতে দেয়া হয় তাকে ক্ষমা হতে বঞ্চিত করা হয় না। যাকে শোকরিয়া আদায় করতে দেয়া হয় তাকে অধিক আনুকূল্য হতে বঞ্চিত করা হয় না (এ চারটি বিষয় কুরআন সমর্থিত যথা- ৪ঃ ৬০, ৪ঃ ১১০, ১৪ঃ ৭ ও ৪ ঃ ১৭)।

১৩৬। খোদাভীরুদের জন্য সালাত হলো আল্লাহ্র নৈকট্য পাওয়ার একটা উপায়, দুর্বলদের জন্য হজ্ব জিহাদ সমতুল্য। সব কিছুরই খাজনা আছে ; দেহের খাজনা হলো সিয়াম। স্বামীকে আনন্দদায়ক সঙ্গ দেয়াই নারীর জিহাদ।

১৩৭। ভিক্ষা দিয়ে জীবিকার আন্বেষণ করো।

১৩৮। যে উত্তম প্রতিদান পাওয়ার বিষয়ে নিশ্চিত সে দানে উদার।

১৩৯। প্রয়োজন অনুযায়ী সহায়তা দেয়া হয়।

১৪০। যে মধ্যপথাবলম্বী সে কখনো দুর্দশাগ্রস্থ হয় না।

১৪১। ছোট পরিবার আরামদায়ক জীবন যাপনের অন্যতম উপায়।

১৪২। একের প্রতি অন্যের ভালবাসা প্রজ্ঞার অর্ধাংশ।

১৪৩। শোক বৃদ্ধ বয়সের অর্ধেক।

১৪৪। যন্ত্রণা-উৎপীড়ন-দুঃখ-দুর্দশা হতে ধৈর্যের উৎপত্তি। যে ব্যক্তি দুঃখ-দুর্দশায় নিজের উরু চাপড়ায় সে আমল নষ্ট করে ফেলে।

১৪৫। এমন অনেক লোক সিয়াম পালন করে যাদের সিয়াম উপোস থাকা ও তৃষ্ণার্ত হওয়া বই কিছু নয় এবং এমন অনেক সালাতী আছে যাদের সালাত জাগরণ ও কষ্ট করা বই কিছু নয়। তাদের ইবাদত অপেক্ষা আল্লাহ্‌র তত্ত্বজ্ঞানীদের খাওয়া, পান করা ও ঘুম অনেক বেশী ভাল।

১৪৬। সাদকা দ্বারা ইমান রক্ষা কর, আল্লাহ্‌র অংশ (জাকাত) দান করে সম্পদ রক্ষা কর এবং সালাত দ্বারা দুর্যোগের ঘনঘটা দূরীভূত কর।

১৪৭। কুমায়েল ইবেন জিয়াদ আন-নাখাই[১] হতে বর্ণিত আছে যে, আমিরুল মোমেনিন আমার হাত ধরে আমাকে কবরস্থানে নিয়ে গেলেন। যখন তিনি করবস্থানের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন ঃ

হে কুমায়েল, এ হৃদয়গুলো হলো ধারক। ইহার মধ্যে সর্বোত্তম হলো যেটা ধারণ করে রাখতে পারে। সুতরাং আমি যা বলি তা হৃদয়ে সংরক্ষণ করে রেখো। মানুষ তিন প্রকারের— এক প্রকার হলো যারা পণ্ডিত ব্যক্তি ও ঐশী জ্ঞান সম্পন্ন ; দ্বিতীয় প্রকার হলো যারা জ্ঞানের অন্বেষণ করে তারা মুক্তিপথের পথিক; সর্বশেষ হলো সাধারণ অপদার্থ লোক যারা প্রত্যেক আহ্বানকারীর পেছনে দৌড়ায় এবং বাতাসের যে কোন দিকে ঝুঁকে পড়ে। তারা জ্ঞানের ঔজ্জ্বল্য হতে কোন আলো গ্রহণ করতে পারে না এবং কোন বিশ্বস্ত আশ্রয়ে আত্মরক্ষা করে না। হে কুমায়েল, জ্ঞান পার্থিব সম্পদ হতে অনেক ভাল। জ্ঞান তোমাকে রক্ষা করবে অথচ সম্পদকে তুমি রক্ষা করতে হবে। ব্যয় করলে সম্পদ কমে যায় অথচ দান করলে জ্ঞান বহুগুণ বেড়ে যায় এবং সম্পদের পরিণাম মৃত্যু যেহেতু সম্পদ বিনষ্ট হয়।

হে কুমায়েল, জ্ঞান হলো বিশ্বাস যা আমল করা হয়। এর দ্বারা মানুষ জীবদ্দশায় আনুগত্য অর্জন করে এবং মৃত্যুর পরে সুখ্যাতি থেকে যায়। জ্ঞান হলো শাসক আর সম্পদ হলো শাসিত। হে কুমায়েল, যারা সম্পদ স্তূপীকৃত করে তারা মৃত যদিও তারা সর্ব সমক্ষে জীবিত। আবার যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে যতদিন পৃথিবী থাকবে ততদিন তারা থাকবে। তাদের দেহ পাওয়া যাবে না কিন্তু তাদের আকৃতি হৃদয়ে স্থাপিত থাকবে। আমার বক্ষের দিকে তাকাও। এখানে জ্ঞান স্তূপীকৃত হয়ে আছে। আমি আশা করি আমার এ জ্ঞান বনহকারী কাউকে পেয়ে যাবো। হ্যাঁ, আমি এ রকম একজনকে পেয়েছিলাম কিন্তু সে এমন ব্যক্তি ছিল যাকে বিশ্বাস করা যায় না। সে দুনিয়ার লোভে দ্বীনকে ব্যবহার করবে এবং তার ওপর আল্লাহ্‌র আনুকূল্যের প্রভাবে সে মানুষের ওপর উদ্ধত শাসক হবে এবং আল্লাহ্‌র ওজর দেখিয়ে সে ভক্তদের ওপর প্রভু হয়ে বসবে। অথবা সে এমন ব্যক্তি হবে যে সত্যের শ্রোতাদের অনুগত হবে কিন্তু তার বক্ষে কোন বুদ্ধিমত্তা নেই। প্রথম সংশয়েই সে তার হৃদয়ে আশঙ্কা স্থান দেবে।

সুতরাং এটা কি ওটা কোনটাই আশানুরূপ ভাল নয়। হয় মানুষ আনন্দের জন্য ব্যগ্র থাকবে, সহজেই কামনা-বাসনা দ্বারা পরিচালিত হবে অথবা সম্পদ সংগ্রহ ও জমা করতে আকুলভাবে চেষ্টা করবে। তাদের কারো দ্বীনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নেই। এদের উদাহরণ হলো ছাড়া-পাওয়া গরুর পালের মত। এভাবেই জ্ঞান উহার বাহকের সাথে মরে যায়।

হে আমার আল্লাহ্! হ্যাঁ, পৃথিবী যেন কখনো এমন লোক শূন্য হয়ে না যায় যারা আল্লাহ্‌র ওজর প্রকাশ্যে অথবা গোপনে রক্ষণাবেক্ষণ করে অথবা যারা সব সময় শঙ্কিত থাকে এ জন্য যে,

আল্লাহ্র গুপ্ত ওজর ও প্রমাণ যেন প্রতিহত না হয়ে পড়ে। এমন লোকের সংখ্যা অতি অল্প কিন্তু আল্লাহ্র কাছে তারা মহামর্যাদাশালী। তাদের মাধ্যমে আল্লাহ্ তাঁর ওজর ও প্রমাণ রক্ষা করে থাকেন। তারা তাদের মত কাউকে বিশ্বাস করে এবং তাদের মত কারো হৃদয়ে বীজ বপন করে থাকেন।

জ্ঞান তাদেরকে প্রকৃত বোধগম্যতা এনে দেয়। সুতরাং তারা দৃঢ়-প্রত্যয় সম্পন্ন আত্মার সাথে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করে। অন্যরা যেটাকে কঠিন বলে মনে করে তা তারা সহজ বলে মনে করে। অজ্ঞদের কাছে যা অদ্ভুত মনে হয় তারা তা সোহাগ ভরে গ্রহণ করে। তাদের দেহটা শুধু পৃথিবীতে বিরাজ করে কিন্তু তাদের আত্মা অনেক উর্ধে থাকে। আল্লাহ্র জমিনে তারা আল্লাহ্র প্রতিনিধি এবং তাঁর দ্বীনের প্রতি আহ্বানকারী। আহা! তাদের দেখার জন্য আমার কত আকুল আকাঙ্খা। হে কুমায়েল, এখন তুমি যেখানে ইচ্ছা চলে যেতে পার।

---

(১) কুমায়েল ইবনে জিয়াদ আন-নাখাই ইমামতের গুপ্তভেদ সম্পর্কে জানতেন এবং তিনি আমিরুল মোমেনিনের অন্যতম প্রধান অনুচর ছিলেন। জ্ঞানে ও সাফল্যে তার মর্যাদা ছিল সমুন্নত এবং মিতাচারিতা ও খোদাভীরুতায় তার স্থান ছিল প্রধান। তিনি কিছু দিনের জন্য হিতে আমিরুল মোমেনিনের গভর্ণর ছিলেন। হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ আছ-ছাকাফী ৮৩ হিজরিতে ৯০ বৎসর বয়সে তাকে হত্যা করে। কুফার শহরতলীতে তাকে দাফন করা হয়েছিল।

১৪৮। মানুষ তার জিহ্বার নীচে গুপ্ত থাকে অর্থাৎ কথা দ্বারা মানুষ চেনা যায়।

১৪৯। যে নিজের মূল্য জানে না সে রসাতলে যায়।

১৫০। একজন লোক আমিরুল মোমেনিনকে ধর্মোপদেশ দেয়ার অনুরোধ করলে তিনি বললেন ঃ

কখনো সে লোকের মত হয়ো না যে আমল ছাড়া পরকালের পরম সুখের আশা করে, আশা-আকাঙ্খা দীর্ঘায়িত করে, তওবা করতে বিলম্ব করে এবং দরবেশের মত কথা বলে কিন্তু দুনিয়া লোভীর মত কাজ করে। সে অল্পতে তুষ্ট ও তৃপ্ত হয় না, তাকে যা দেয়া হয়েছে সেজন্য শুকরিয়া আদায় করে না। সে অন্যকে বঞ্চিত করে দুনিয়ার সম্পদ বৃদ্ধি করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে। সে যা করে না অন্যদের তা করার জন্য আদেশ করে। সে ধার্মিকগণকে ভালবাসে কিন্তু নিজে তাদের মত হয় না। সে পাপীদেরকে ঘৃণা করে অথচ নিজেই তাদের মধ্যে একজন। পাপাধিক্য হেতু সে মৃত্যুকে অপছন্দ করে; কিন্তু যে জন্য সে মৃত্যু ভয়ে ভীত সে বিষয়ে অমনোযোগী।

সে পীড়িত হলে লজ্জাবোধ করে, সুস্থ থাকলে নিরাপদ অনুভব করে এবং আনন্দ-উৎসবে সবকিছু ভুলে থাকে। যখন সে পীড়া হতে আরোগ্য লাভ করে তখন নিজের সম্পর্কে দাম্ভিক হয়ে পড়ে আবার যখন দুর্দশাগ্রস্থ হয় তখন নিরাশ হয়ে পড়ে। বিপদ আপতিত হলে সে হতভম্বের মত প্রার্থনা করে আবার বিপদ কেটে গেলে সে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তার হৃদয় কাল্পনিক জিনিস দ্বারা পরাভূত হয়। কোন কিছুতেই তার হৃদয়ে দৃঢ় প্রত্যয় থাকে না। অন্যদের ছোটখাট পাপের জন্য সে দুশ্চিন্তা করে কিন্তু নিজের বেলায় কৃতকর্মের চেয়ে অধিক পুরস্কার আশা করে। যদি সে সম্পদশালী হয়ে পড়ে তবে সে আত্ম-কেন্দ্রিক হয়ে পড়ে এবং পাপে লিপ্ত হয়ে পড়ে। যদি সে দরিদ্র হয়ে পড়ে তবে সে দুর্বল ও হতাশ হয়ে পড়ে। কল্যাণকর কাজে সে স্বল্প সময় ব্যয় করে অথচ যাচনা করতে সে দীর্ঘসময় ব্যয় করে। কামনা-বাসনা যখন তাকে ঘিরে ধরে তখন সে তড়িঘড়ি করে পাপে লিপ্ত হয় অথচ তওবা করতে বিলম্ব ঘটায়। তার ওপর দুর্দশা নিপতিত হলে সে ইসলামের উম্মার সকল নিয়ম-কানুন অমান্য করে। সে উপদেশ নেয়ার মত ঘটনাবলী

বর্ণনা করে কিন্তু নিজে উপদেশ গ্রহণ করে না। সে অন্যদের উপদেশ দিয়ে বেড়ায় কিন্তু নিজে তা মান্য করে না। সে বাগাড়ম্বরে পটু কিন্তু আমলে খাট। যা ধ্বংস হয়ে যাবে এমন জিনিসের জন্য সে আকাঙ্খী কিন্তু যা চিরস্থায়ী তাতে উদাসীন। সে লাভকে লোকসান আর লোকসানকে লাভ মনে করে। সে মৃত্যুকে ভয় করে কিন্তু মৃত্যুর বিরুদ্ধে তার করণীয় কিছু নেই।

সে অন্যের পাপকে অনেক বড় করে দেখে অথচ নিজের পাপকে অতিক্ষুদ্র করে দেখে। সে একটু খানিক আল্লাহ্‌র বাধ্যতা করলে মনে করে অনেক করেছে কিন্তু অন্য কেউ অনেক আনুগত্য করলেও সে তা অতিক্ষুদ্র মনে করে। এভাবে সে অন্যকে ভর্ৎসনা করে নিজের প্রতি তোষামদে হয়। সে ধনশালীদের সঙ্গ পেতে ভালবাসে। কিন্তু দরিদ্রদের সাথে আল্লাহ্‌র জেকের করতেও পছন্দ করে না। সে নিজের স্বার্থে অন্যের বিরুদ্ধে রায় দেয় কিন্তু অন্যের স্বার্থ রক্ষার জন্য নিজের বিরুদ্ধে রায় দেয় না। সে অন্যকে হেদায়েত করে কিন্তু নিজকে গোমরাহীতে ডুবিয়ে রাখে। অন্যরা তাকে মান্য করে কিন্তু সে আল্লাহ্‌কে অমান্য করে। সে ব্যগ্র থাকে যাতে অন্যরা তার প্রতি তাদের দায়িত্ব পালন করে কিন্তু অন্যদের প্রতি তার দায়িত্ব সে পালন করে না। সে লোক ভয়ে আমল করে কিন্তু তার কাজ কর্মে সে প্রভুকে ভয় করে না।

১৫১। প্রত্যেক মানুষই জীবনের অবসানের সাক্ষাৎ লাভ করবে তা সুমিষ্টই হোক আর তিক্তই হোক।

১৫২। প্রত্যেক আগন্তুককে ফিরে যেতে হবে এবং ফিরে যাবার পর এমন মনে হবে যে, সে কখনো ছিল না।

১৫৩। ধৈর্যশীলগণ কখনো অকৃতকার্য হয় না; হতে পারে, তাতে দীর্ঘ সময় লাগতে পারে।

১৫৪। কেউ যদি কোন দলের কর্মকান্ডকে সম্মতি জানায় তবে সে যেন ঐ দলের সাথে যোগদান করলো এবং যে কেউ অন্যায়ে যোগদান করে সে দু'টি পাপ করে একটি হলো নিজের পাপ আর অপরটি হলো অন্যের পাপে সম্মতি জ্ঞাপন।

১৫৫। চুক্তি মেনে চলো এবং দৃঢ়প্রত্যয় সম্পন্ন লোকদের প্রতি তা পরিপূরণ করতে যত্নবান হয়ো।

১৫৬। যাদের প্রতি তোমরা অজ্ঞতার ওজর দেখাতে পারবে না তাদের অনুগত থাকার দায় দায়িত্ব তোমাদের ওপর বার্তাবে[১]।

১। আল্লাহ্ তাঁর ন্যায় বিচার ও দয়ার কারণে মানুষকে দ্বীনের পথে পরিচালনার জন্যই নবীগণকে দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন। একইভাবে তিনি ইমামত প্রতিষ্ঠিত করেছেন যাতে তাঁরা দ্বীনকে পরিবর্তন ও বেদআত হতে রক্ষা করেন এবং যাতে করে প্রত্যেক ইমাম তাঁর আমলে ঐশী বিধানকে ব্যক্তিগত কামনা-বাসনা ও স্বার্থের জন্য আক্রমণ হতে রক্ষা করতে পারেন এবং ইসলামের সঠিক দিকদর্শন যেন তারা দিতে পারে। তারা যে ভাবে জানা দরকার সেভাবে যেন দ্বীনের মৌলিক উদ্ভাবক রাসুলকে (সঃ) জানতে পারে ও ইমামকে জানাতে পারে। যে তার সময়কার ইমাম সম্পর্কে অনবহিত থাকবে তাকে ক্ষমা করা হবে না। ইমামত ইস্যুটা এত অধিক দলিল পত্র দ্বারা প্রমাণিত যে, কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি ইমামতকে অস্বীকার করার কোন পথ নেই। রাসুল করিম (সঃ) বলেছেন ঃ

> *যে ব্যক্তি নিজের সময়কালের ইমামকে না চিনে মৃত্যুবরণ করে সে প্রাক-ইসলামী জাহিলিয়া যুগের মৃত্যুর মতই মরলো। (তাফতাজানী[৭৩], ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৭৫; হানাফী[১৫৬], ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৫৭, ৫০৯)।*

আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর, মুয়াবিয়া ইবেন আবি সুফিয়ান ও আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুল (সঃ) বলেছেন ঃ

> *নিজের জমানার ইমামকে না চিনে এবং তাঁর কাছে বায়াত গ্রহণ না করে যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে সে জাহিলিয়া যুগের লোকের মতই মরলো। আর যে ব্যক্তি ইমামের সঙ্গে বায়াত ভঙ্গ করবে সে*

শেষ বিচারের দিনে আল্লাহ্র সম্মুখে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন যুক্তি দাঁড় করাতে পারবে না। (তায়ালিসী[৭৮], পৃঃ ২৫৯; নায়সাবুরী[৮৩], ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২২; হাম্বল[১৬০], ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৯৬; শাফী[১২৫], ৮ম খণ্ড, পৃঃ ১৫৬; কাছীর[৪০], ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫১৭; শাফী[১২৮], ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২১৮, ২২৪, ২২৫)।

ইবনে আবিল হাদীদও এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন যে, যাঁর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে অনবহিত হবার কারণে কাউকে ক্ষমা করা হবে না তিনি হলেন আমিরুল মোমেনিন। তিনিও স্বীকার করেছেন যে, তাঁকে মান্য করা সকলের জন্য অত্যাবশ্যকীয় দায়িত্ব। তিনি আরো বলেন যে, যে ব্যক্তি ইমামতে বিশ্বাস করবে না সে কখনো নির্বাণ প্রাপ্ত হবে না। তিনি লিখেছেন ঃ

ইমাম হিসাবে আলীর অবস্থান সম্পর্কে যে ব্যক্তি অনবহিত এবং যে ইমামের সত্যতা অস্বীকার করে সে জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে। তার সালাত ও সিয়াম তার কোন উপকারে আসবে না। কারণ এ বিষয়ের জ্ঞান হলো মৌলিক বিষয় যার ওপর দ্বীনের ভিত্তি নির্ভর করে। যা হোক, যারা জামানার ইমামকে অস্বীকার করে তাদেরকে আমরা কাফের বলতে চাইনা তবে তারা পাপী, সীমা লঙ্ঘনকারী ও ধর্মত্যাগী (হাদীদ[১৫২], ১৮ শ খণ্ড, পৃঃ ৩৭৮)।

১৫৭। নিশ্চয়ই, তোমরা দেখতে পাবে যদি তোমরা দেখার জন্য যত্নবান হও। নিশ্চয়ই, তোমরা সৎপথের সন্ধান পাবে যদি তোমরা হেদায়েত গ্রহণ কর। নিশ্চয়ই, তোমরা শুনতে পাবে যদি তোমাদের কানকে শুনার জন্য আগ্রাহান্বিত কর।

১৫৮। তোমার সদাচরণ দ্বারা তোমার সাথীদের সতর্ক কর এবং তাদের প্রতি আনুকূল্য দেখিয়ে তাদের মন্দ দূরীভূত কর।[১]

১। যদি মন্দের পরিবর্তে মন্দ করা হয়, গালির পরিবর্তে গালি দেয়া হয় তবে শত্রুতা ও বিবাদের দরজাই খুলে দেয়া হয়। কিন্তু একজন মন্দ স্বভাবের লোকের প্রতি যদি দয়া দেখানো হয় এবং যদি ভদ্রোচিত ব্যবহার করা হয় তবে সেও তার আচরণ পরিবর্তন করতে বাধ্য হবে। একদিন ইমাম হাসান মদিনার একটি বাজারের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় একজন সিরিয়ান তাঁর মহান ব্যক্তিত্ব দেখে তাঁর পরিচয় জানতে চাইলে লোকেরা বললো, "ইনি হাসান ইবনে আলী।" এতে লোকটি উত্তেজিত হয়ে গেল এবং তাঁর কাছে এসে তাকে গালাগালি করতে লাগলো। ইমাম শান্তভাবে তার গালমন্দ শুনলেন। যখন সে থামলো তখন ইমাম বললেন মনে হয় তুমি এখানে একজন আগন্তুক। সে স্বীকার করলো। তখন ইমাম বললেন তাহলে তুমি আমার সঙ্গে আস এবং আমার সঙ্গেই থাক। তোমার কোন অভাব থাকলে আমি তা পূর্ণ করে দেব। আর যদি তুমি আর্থিক সহায়তা চাও তাও আমি পূরণ করে দেব। লোকটি এ দয়াদ্র কথা ও চমৎকার ব্যবহার দেখে ভীষণ লজ্জিত হয়ে গেল এবং নিজের অপরাধ স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করলো। এরপর হতে সে লোকটি জীবনে ইমামের চেয়ে বেশী শ্রদ্ধাবোধ আর কারো জন্য করেনি (মুবাররদ[১১২], ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৩৫; ২য় খণ্ড পৃঃ ৬৩; শাফী[১৩১], ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৫২; আশরাফ[১৫], ২য় খণ্ড, পৃঃ ১১-১২; শাহরাসুব[১৩৫], ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১৯; মজলিসী[১০৩], ৪৩তম খণ্ড, পৃঃ ৩৪৪)।

১৫৯। যে ব্যক্তি নিজকে বদনামপূর্ণ অবস্থায় রাখে তার সম্পর্কে মানুষের মন্দ ধারণা হলে সেজন্য কাউকে দায়ী করা যায় না।

১৬০। যে কেউ কর্তৃত্বের অধিকারী হয় সে-ই সাধারণতঃ পক্ষপাতিত্ব করে।

১৬১। যে ব্যক্তি শুধুমাত্র নিজের মতামতের উপর নির্ভর করে কাজ করে সে সহজেই ধ্বংস প্রাপ্ত হয় এবং যে অন্যদের সাথে পরামর্শ করে সে অন্যদের বুদ্ধি-বিবেচনার সুফল প্রাপ্ত হয়।

১৬২। যে নিজের গুপ্ত বিষয় রক্ষা করে সে নিজের হাতেই নিয়ন্ত্রণ সংরক্ষণ করে।

১৬৩। নিঃসঙ্গতা হলো বড় মৃত্যু।

১৬৪। যে ব্যক্তি নিজের অধিকার পরিপূর্ণ করে না অথচ অন্য লোকের অধিকার পরিপূরণ করে সে যেন তার পূজা করলো।

১৬৫। যে আল্লাহ্‌র আদেশের বিরুদ্ধে চলে তাকে মান্য করার কোন কারণ থাকতে পারে না।

১৬৬। নিজের অধিকার আদায়ে বিলম্বের জন্য কাউকে দোষারোপ করা যায় না কিন্তু যা সে প্রাপ্য নয় তা গ্রহণ করলে দোষারোপ করা যায়।

১৬৭। আত্মশ্লাঘা প্রগতির পথ রোধক।

১৬৮। শেষ বিচারের দিন সন্নিকটে এবং আমাদের পারস্পরিক সহচর্য অত্যাল্প সময়ের জন্য।

১৬৯। চক্ষুস্মানগণ দেখতে পায় প্রভাত হয়ে গেছে।

১৭০। পাপ করে তওবা করার চেয়ে পাপ হতে বিরত থাকা সহজতর।

১৭১। অধিক ভোজন বিভিন্ন ভোজন বিনষ্ট করে (আরবী প্রবাদ)

১৭২। মানুষ সে বিষয়ের শত্রু যা সে জানে না।

১৭৩। যে ব্যক্তি বিভিন্ন লোকের মতামত গ্রহণ করে সে চোরা-গর্তের ফাঁদ বুঝতে পারে।

১৭৪। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র খাতিরে ক্রোধের দাঁতে ধার দেয় সে অন্যায়ের পলোয়ানকেও হত্যা করার শক্তি অর্জন করে।

১৭৫। যখন কোন কিছুতে ভয় পাবে সোজা উহার গভীরে প্রবেশ করবে কারণ তুমি যতটুকু ভয় পাও তার অনেক বেশী হলো উহা হতে দূরে থাকার প্রবণতা।

১৭৬। উচ্চ কর্তৃত্ব লাভ করার উপায় হলো বুকের প্রশস্ততা (অর্থাৎ উদারতা)।

১৭৭। যারা ভাল কাজ করে তাদেরকে পুরস্কৃত করে কুকর্মকারীকে তিরস্কার কর।

১৭৮। নিজের হৃদয়ের মন্দকে তাড়িয়ে দিয়ে অন্যের হৃদয়ের মন্দ কেটে ফেল।

১৭৯। একগুঁয়েমী উপদেশ বিফল করে।

১৮০। লোভ হলো স্থায়ী দাসত্ব।

১৮১। অবহেলা করার ফল হলো লজ্জা আর দূরদর্শীতার ফল হলো নিরাপত্তা।

১৮২। জ্ঞানের বিষয়ে নীরব থাকার কোন সুফল নেই যেমন নির্বুদ্ধিতার বিষয়ে কথা বলে কোন কল্যাণ হয় না।

১৮৩। যদি দু'টি বিপরীত ডাক আসে তবে অবশ্যই একটি বিপদগামিতার।

১৮৪। ন্যায়ের ব্যাপারে আমি কখনো সন্দেহের বশীভূত হইনি কারণ আমাকে তা দেখিয়ে দেয়া হতো।

১৮৫। আমি কখনো মিথ্যা বলিনি এবং আমাকেও মিথ্যা বলা হয়নি। আমি কখনো পথভ্রষ্ট হইনি এবং কাউকে পথভ্রষ্ট করিনি।

১৮৬। অত্যাচারে যে নেতৃত্ব দেয় পরে সে অনুশোচনায় নিজের হাত কামড়ায়।

১৮৭। মনে রেখো, এ পৃথিবী হতে প্রস্থানের সময় অত্যাসন্ন।

১৮৮। ন্যায়ের পথ হতে মুখ ফেরালেই ধ্বংস অনিবার্য।

১৮৯। ধৈর্য যদি কাউকে নিবৃত্তি দিতে না পারে তবে অধৈর্য তাকে হত্যা করে।

১৯০। কি আশ্চর্য! খেলাফত কি রাসুলের (সঃ) সাহাবা ও জ্ঞাতিদের মাঝে না গিয়ে শুধু সাহাবাদরে মধ্যে যেতে পারে? এ বিষয়ে অন্য একটি বক্তব্যও রয়েছে, "যদি তোমরা দাবী কর যে পরামর্শের মাধ্যমে খেলাফতের কর্তৃত্ব লাভ করা যায় তা হলে কি করে এটা ঘটলো যে, যাদের সঙ্গে পরামর্শ করা প্রয়োজন ছিল তারা সবাই অনুপস্থিত। আর যখন তোমরা রাসুলের (সঃ) জ্ঞাতিত্বের দোহাই দিয়ে বিরুদ্ধ পক্ষকে নিবৃত্ত করলে তখন তোমাদের চেয়ে রাসুলের নিকটতম আত্মীয়ের অধিকার কি ভাবে কেড়ে নিলে।[১]

১। আইজুদ্দিন আবদাল হামিদ ইবনে হিবতুল্লাহ্ (৫৮৬/১১৯০ - ৬৫৫/১২৫৭) এর উদ্ধৃতি দিয়ে ইবনে আবিল হাদীদ লিখেছেন ঃ

আমিরুল মোমেনিন তাঁর এ বক্তব্যে আবু বকর ও উমরকে বুঝিয়েছেন। সকিফার দিনে আবু বকর উমরকে বললেন," তোমার হাত বাড়াও আমি আনুগত্যের শপথ করি" উমর উত্তর দিলেন "সর্ব অবস্থায় আপনি আল্লাহ্র রাসুলের সাহাবা—তাঁর আরাম-আয়েশে—তার দুঃখ দুর্দিনে। সুতরাং আপনার হাত বাড়ান।" উমরের এ উক্তির প্রেক্ষিতেই আলী বলেন "রাসুলের (সঃ) সাহাবা হবার যুক্তি দেখিয়ে যদি তুমি খেলাফতের জন্য আবু বকরকে উপযুক্ত মনে কর তবে তা আমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মনে করনি কেন? অথচ আমি আবু বকর হতে অনেক বেশী রাসুলের সুখ-দুঃখে সাথী ছিলাম এবং আবু বকর হতে রাসুলের অনেক বেশী ঘনিষ্ঠ আত্মীয়।" আবু বকর সকিফার দিনে আনসারদেরকে বলেছিলেন, "আমরা কুরেশরা আল্লাহ্র রাসুলের জ্ঞাতি এবং একই বংশোদ্ভূত। কাজেই আমরাই খেলাফতের জন্য প্রকৃত উত্তরাধিকারী। একটি ক্ষুদ্র দল কর্তৃক অনুগত্যের শপথের পর আবু বকর মুসলিমদের বলতেন যে, তার খেলাফতকে সকলেই খুশী মনে মেনে নিতে হবে। কারণ 'আহলুল হাল্লি ওয়াল অকদ' (সে দল যারা কোন বিষয়ে বন্ধন দিতে ও বন্ধন খুলতে ক্ষমতাবান অর্থাৎ বৃহত্তর দল বা যারা সকিফায় উপস্থিত ছিল) দ্বারা এটা স্বীকৃত। আবু বকরের এ দাবীর প্রেক্ষিতে আলী বললেন," তুমি বংশোদ্ভূত বলে খেলাফত দাবী করছো অথচ রাসুলের নিকটতম আত্মীয়কে বঞ্চিত করছো এবং যেক্ষেত্রে সকিফায় অধিকাংশ সাহাবা অনুপস্থিত ছিলেন ও তোমার প্রতি অনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেনি। সেক্ষেত্রে তুমি 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ' কিভাবে দাবী করছো?" (হাদীদ [১৫২], ১৮শ খণ্ড, পৃঃ ৫১৬)।

১৯১। এ পৃথিবীতে মানুষ মৃত্যু–তীরের লক্ষ্যস্থল এবং সম্পদ ধ্বংস হয়ে দুঃখ-দুর্দশার দিকে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। এখানে প্রতি ঢোক পানীয় শ্বাসরুদ্ধকর এবং প্রতি গ্রাস খাদ্য গলায় আটকে পড়ার মত। এখানে একটা না হারালে কেউ আরেকটা পায় না এবং কারো একটি দিন জীবন থেকে খসে না পড়লে আরেকটি দিন এগিয়ে যায় না। আমরা মৃত্যুর সহায়তাকারী এবং আমরা মরণশীলতার লক্ষ্যবস্তু। তাহলে কি করে আমরা চিরস্থায়ী জীবন আশা করতে পারি। দিবা-রাত্র এতে যা নির্মিত হচ্ছে তা ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এবং যা তারা জোড়া লাগাচ্ছে তা বিভক্ত হয়ে পড়ছে।

১৯২। হে আদম সন্তান, মৌলিক চাহিদার বেশী যা কিছু তোমরা অর্জন কর তাতে তোমরা শুধুমাত্র অন্যের জন্য সতর্ক প্রহরী মাত্র।

১৯৩। হৃদয় কামনা-বাসনায় রঞ্জিত হয়ে থাকে এবং আগুপিছু করার ক্ষমতা রাখে। সুতরাং আবেগ প্রবণ অবস্থায় এবং এগুনোর মনোভাব হলেই তাকে আমলে প্রবৃত্ত কর, কারণ যদি কিছু করতে হৃদয়কে বাধ্য কর তবে হৃদয়কে অন্ধ করা হবে।

১৯৪। যখন আমি আমার ক্রোধ প্রকাশ করবো তখন আমাকে রাগান্বিত বলা যাবে। যখন আমি প্রতিশোধ নিতে অসমর্থ হবো তখন একথা বলা যাবে "সহ্য করা অনেক ভাল" অথবা যখন আমার প্রতিশোধ নেয়ার ক্ষমতা থাকবে তখন বলা যাবে "ক্ষমা করা অধিক ভাল।"

১৯৫। একটা ময়লার ড্রামের পাশ দিয়ে যেতে আমিরুল মোমেনিন মন্তব্য করলেন, "এটা হচ্ছে তা যা কৃপণদের দানকুণ্ঠতা।" অন্য এক বর্ণনায় বলা হয়েছে "এটা হচ্ছে তা যা নিয়ে তোমরা একে অপরের সাথে গতকাল পর্যন্ত বিরোধ করেছো।"

১৯৬। যে সম্পদ থেকে তুমি শিক্ষা লাভ কর তা কখনো নষ্ট হয় না।

১৯৭। শরীর ক্লান্ত হয়ে পড়লে হৃদয় ক্লান্ত হয়ে যায়। সুতরাং হৃদয়ের জন্য মধুর বক্তব্যের সন্ধান করো এবং তা উপভোগ করে হৃদয়কে তাজা করে তুলো।

১৯৮। খারিজীরা যখন শ্লোগান দিতে লাগলো, "আল্লাহ্ ছাড়া কারো কোন হুকমত নেই", তখন আমিরুল মোমেনিন বললেন, "বাক্যটা খুবই সঠিক কিন্তু তারা এর ভুল ব্যাখ্যা করছে।"

১৯৯। জনতার জটলা দেখে তিনি বললেন, "এরা সেই লোক যারা একত্রিত হলে ঔৎসুক্য দেখায় কিন্তু চলে গেলে আর তাদের চেনা যায় না।" অন্য এক বর্ণনায় আছে, "এরা সেসব লোক যারা একত্রিত হলে ক্ষতি সাধন করে কিন্তু তারা বিভক্ত হয়ে পড়লে উপকার হয়।" কেউ একজন বললো, "একত্রিত হলে তাদের দ্বারা ক্ষতির কথা আমাদের জানা আছে কিন্তু তারা ছড়িয়ে পড়লে তাদের কি উপকার হয়?" আমিরুল মোমেনিন বললেন, "শ্রমিকগণ তাদের কাজে ফিরে যায় তাতে মানুষের উপকার হয়-যেমন রাজমিস্ত্রি ইমারতের কাজে ফিরে গেলে, তাঁতী তার তাঁতে ফিরে গেলে এবং রুটি প্রস্তুতকারক তার কারখানায় ফিরে গেলে মানুষের উপকার হয়।"

২০০। একজন অপরাধীকে আমিরুল মোমেনিনের কাছে নিয়ে আসা হলে তার সাথে একদল লোক এসেছিল। তাতে আমিরুল মোমেনিন মন্তব্য করলেন "সেসব মুখে লানত যাদেরকে এসব ভ্রান্ত সময়ে দেখা যায়।"

২০১। প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে দু'জন ফেরেশতা রয়েছে যারা তাকে রক্ষা করে। যখন নির্ধারিত ভাগ্যলিপি এসে পড়ে তখন তা নিজের গতিতে তারা ঘটতে দেয়। নিশ্চয়ই, নির্ধারিত সময় হলো রক্ষা-বর্ম যা কোন কিছু নির্ধারিত সময়ের আগে ঘটতে দেয় না।

২০২। যখন তালহা ও জুবায়র আমিরুল মোমেনিনকে বললেন, "আমরা আপনার আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছি তবে শর্ত হলো আমাদেরকে খেলাফতের অংশীদার করতে হবে।" আমিরুল মোমেনিন বললেন, না, বরং খেলাফতকে শক্তিশালী করা ও সহায়তা করায় তোমাদের অংশ থাকবে এবং আমার প্রয়োজনে ও বিপদের সময়ে আমাকে সহায়তা করবে।

২০৩। হে জনমন্ডলী, আল্লাহ্‌কে ভয় কর। কারণ তিনি এমন যে, যা তোমরা বল তিনি শোনেন এবং যে সব গুপ্ত বিষয় তোমরা গোপন কর তা তিনি জানেন। মৃত্যুর জন্য নিজকে প্রস্তুত কর। যদিও তুমি দৌড়ে পালাতে চাও তবুও মৃত্যু তোমাকে পাকড়াও করবে। তুমি থাকতে চাইলেও মৃত্যু তোমাকে ধরে নিয়ে যাবে। তুমি ভুলে থাকলেও মৃত্যু তোমাকে ভুলবে না।

২০৪। কেউ তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করলে তা যেন তোমার সৎ আমলে বাধার সৃষ্টি না করে, কারণ তোমার সৎকাজের জন্য এমন লোকও তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে, যে তোমা হতে কোন উপকার পায়নি এবং অস্বীকারকারীর অকৃতজ্ঞতা হতে তার কৃতজ্ঞতা অনেক বেশী হতে পারে। আল্লাহ্ তাদের ভালবাসেন যারা সৎ আমল করে (কুরআন- ৩ ঃ ১৩৪, ১৪৮; ৫ ঃ ৯৩)

২০৫। প্রত্যেক পাত্রেরই ধারণ ক্ষমতা কমে আসে যতই তাতে কোন কিছু রাখা হয়। কিন্তু জ্ঞান হলো এর বিপরীত যার ধারণ ক্ষমতা ক্রমেই বেড়ে যায়।

২০৬। যে ধৈর্য ধারণ করা অভ্যাস করে তার প্রথম পুরস্কার হলো মানুষ তার সাহায্যকারী হয়।

২০৭। যদি তুমি ধৈর্য ধারণ করতে না পার তবে ধৈর্যের ভান করো কারণ এতে ধৈর্য ধারণের অভ্যাস আস্তে আস্তে তোমাতে জন্মাতে পারে।

২০৮। যে নিজের কর্মকাণ্ডের হিসাব-নিকাশ করে সে উপকৃত হয়; আর যে বেমালুম থাকে তার ভোগান্তি হয়। যে ভয় করে সে নিরাপদ থাকে। যে উপদেশ গ্রহণ করে (চারপাশের বস্তু থেকে) সে আলোর সন্ধান পায়। যে আলোর সন্ধান পায় তার বোধগম্যতা হয়; যার বোধগম্যতা হয় সে জ্ঞান অর্জন করতে পারে।

২০৯। এ দুনিয়া আমাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে না পেরে আমাদের প্রতি এমনভাবে বেঁকে পড়েছে যেমন করে উষ্ট্রী তার শাবকের প্রতি বেঁকে পড়ে কামড়াতে আসে। তৎপর আমিরুল মোমেনিন তেলওয়াত করলেন "এবং পৃথিবীতে যাদের দুর্বল মনে করা হচ্ছে তাদের ওপর আমাদের নেয়ামত দান করি এবং তাদেরকে ইমাম করি এবং তাদেরকে দেশের অধিকারী করি" (কুরআন ২৮ঃ ৫)।

২১০। আল্লাহ্‌কে সে লোকের মত ভয় কর যে জাগতিক কর্মকান্ড হতে নিজকে তুলে নিয়ে প্রস্তুত হচ্ছে এবং এ পথে প্রস্তুত হয়ে চেষ্টা করছে এবং তৎপর জীবনের অবশিষ্ট সময়ে দ্রুত আমল করছে, বিপদের আশঙ্কায় তাড়াহুড়া করছে এবং তার দৃষ্টি লক্ষ্যস্থলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, যাত্রার শেষের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এবং প্রত্যাবর্তন স্থলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

২১১। উদারতা সম্মানের রক্ষক, ধৈর্য বোকার লাগাম; ক্ষমা কৃতকার্যতার ধার্যকৃত কর। অসম্মান বিশ্বাসঘাতকের শাস্তি; এবং আলাপ-পরামর্শ হেদায়তের প্রধান পথ। যে নিজের মতামতে তৃপ্ত হয় সে বিপদে পড়ে। সহিষ্ণুতা বিপদে সাহস যোগায়। সবচেয়ে বড় তৃপ্তি হলো আকাঙ্খা পরিত্যাগ করা। আকাঙ্খাকে পরাভূত করে অনেক দাসতুল্য ব্যক্তিও উন্নতি লাভ করেছে। ক্ষমতা অভিজ্ঞতা সংরক্ষণ করে। ভালবাসা মানে হলো সুদৃঢ় আত্মীয়তা। শোকাহতকে বিশ্বাস করো না।

২১২। মানুষের আত্মশ্লাঘা তার বুদ্ধিমত্তার শত্রু।

২১৩। বেদনা উপেক্ষা করে চলো; তা না হলে কখনও সুখী হতে পারবে না। (অন্য বর্ণনায় : শোক-দুঃখ- বেদনা উপেক্ষা করলে তুমি সর্বদা সুখী হতে পারবে)।

২১৪। যে গাছের গুঁড়ি নরম উহার শাখা ঘন হয়।[১]

১। ইহা একটি আরবী প্রবাদ। এর অর্থ হলো কোন উদ্ধত ও বদমেজাজি লোক তার চারপাশের কাউকে খুশী করতে পারে না, অপরপক্ষে সুভাষী ও নরম মেজাজের লোকের সান্নিধ্যে অনেকেই এসে তার বন্ধু হয়ে যায়।

২১৫। বিরোধিতা সৎপরামর্শকে বিনষ্ট করে।

২১৬। যে উদারভাবে দান করে সে প্রতিপত্তি লাভ করে (অন্য বর্ণনায় ঃ যে প্রতিপত্তি লাভ করে সে ইহার অপব্যবহার শুরু করে)।

২১৭। পরিবর্তিত অবস্থায় মানুষের মেজাজ জানা যায়।

২১৮। বন্ধুর হিংসাবৃত্তি তার ভালবাসার ত্রুটিই প্রকাশ করে।

২১৯। লোভের কারণে বুদ্ধিমত্তার ঘাটতি দেখা দেয়।

২২০। সম্ভাব্যতার উপর নির্ভর করে রায় দিলে তাতে ন্যায় বিচার হয় না।

২২১। বিচার দিনের নিকৃষ্টতম রসদ হলো মানুষের প্রতি স্বেচ্ছাচারিতা।

২২২। মহৎ লোকের উচ্চতম কাজ হলো সে যা জানে তা উপেক্ষা করে চলা।

২২৩। বিনম্রতার পোষাক যে পরেছে (অর্থাৎ বিনীয় হয়েছে) তার কোন ত্রুটি মানুষ দেখতে পায় না।

২২৪। নীরবতার আধিক্য সশঙ্ক মনোভাবের সঞ্চার করে; ন্যায় বিচার গাঢ় বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে; উদারতা মর্যাদা উন্নত করে; নম্রতা অনেক আর্শীবাদ বয়ে আনে, দুঃখ-দুর্দশার মোকাবেলা করে নেতৃত্ব অর্জন করতে হয়; ন্যায়-সঙ্গত আচরণ করে বিরোধীদের পরাভূত করা যায় এবং মূর্খদের কর্মকাণ্ডে ধৈর্য ধারণ করলে নিজের সমর্থকগণ বিরুদ্ধে যায়।

২২৫। এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার যে, হিংসুকগণ অন্যের স্থুল স্বাস্থ্য নিয়ে হিংসা করে না।

২২৬। লোভী লোক অপমানের শিকল গলায় পরে।

২২৭। কেউ একজন ইমান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে আমিরুল মোমেনিন বলেন, ইমান হলো হৃদয়ের প্রশংসা, কথায় স্বীকৃতি ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা আমল।

২২৮। এ দুনিয়ার জন্য যারা দুঃখ করে তারা মূলতঃ আল্লাহ্‌র বন্টনে নাখোশ। যে আপতিত বিপদ সম্পর্কে বলে বেড়ায় সে তার প্রভুর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। যে ধনী লোকদের কাছে গিয়ে তার ধনের কারণে তার প্রতি ঝুঁকে পড়ে সে তার দ্বীনের দুই-তৃতীয়াংশ হারিয়ে ফেলে। যদি কেউ কুরআন পড়ে এবং মরে গেলে দোযখে যায় তাতে বুঝা যাবে সে আল্লাহ্‌র বাণী নিয়ে রসিকতা করেছে। কারো হৃদয় যদি দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে তাহলে সেহৃদয় তিনটি জিনিস ধারণ করে, যথা- উদ্বিগ্নতা তাকে ত্যাগ করে না, লোভ তাকে ছেড়ে যায় না এবং তার আকাঙ্খা কখনও পরিপূর্ণ হয় না।

২২৯। তৃপ্তি জমিদারী স্বরূপ এবং উত্তম নৈতিক চরিত্র আর্শীবাদ স্বরূপ।

২৩০। কেউ একজন আল্লাহ্‌র বাণী তেলওয়াত করে বললেন, যে কেউ উত্তম কাজ করে (নারী হোক আর পুরুষ হোক এবং সে বিশ্বাসী হলে) আমরা অবশ্যই তাদের উত্তম ও পবিত্র জীবন যাপন করতে দেই" (কুরআন, ১৬ ঃ ৯৭)। এতে আমিরুল মোমেনিন বললেন, এটা দ্বারা তৃপ্তি বুঝানো হয়েছে।

২৩১। যার প্রচুর জীবিকার সংস্থান আছে তার অংশীদার হয়ো কারণ তার ধন-সম্পদ আরো বেড়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে যাতে তোমার অংশও বেড়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে।

২৩২। "নিশ্চয়ই, আল্লাহ্ ন্যায় বিচার (আদল) ও বদান্যতার (ইহসান) নির্দেশ দিয়েছেন" (কুরআন ১৬ ঃ ৯০)। আমিরুল মোমেনিন আল্লাহ্‌র এ বানী সম্পর্কে বললেন যে, এখানে 'আদল' অর্থ সুষম বন্টন এবং ইহসান অর্থ হলো আনুকূল্য।

২৩৩। ক্ষুদ্র দানের জন্য অনেক বড় পুরস্কার পাওয়া যায়।

২৩৪। আমিরুল মোমেনিন তাঁর পুত্র হাসানকে বললেন, "কখনো কাউকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করো না, কিন্তু কেউ তোমাকে যুদ্ধে আহ্বান করলে সাড়া দিয়ো, কারণ যুদ্ধে আহ্বানকারী বিদ্রোহী এবং বিদ্রোহী ধ্বংস হবার যোগ্য।[১]

১। ইবনে আবিল হাদীদ লিখেছেন, "আমরা কখনো শোনিনি যে, আমিরুল মোমেনিন কোন দিন কাউকে চ্যালেঞ্জ করেছেন বা যুদ্ধে লিপ্ত হবার অহ্বান করেছেন। বরঞ্চ শত্রু দ্বারা বিশেষভাবে অথবা সাধারণভাবে চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করার জন্যই তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে যেতেন" (হাদীদ[১৫২], ১৯তম খণ্ড, পৃ ঃ ৬)

২৩৫। নারীর উৎকৃষ্টতম বৈশিষ্ট্য পুরুষের নিকৃষ্টতম বৈশিষ্ট ; যথা-আত্মশ্লাঘা, কাপুরুষতা ও কৃপণতা। কাজেই নারী ব্যর্থ হলেও কাউকে তার কাজে প্রবেশ করতে দেয় না; যেহেতু সে কৃপণ সে নিজের স্বামীর সম্পদ সংরক্ষণ করে এবং যেহেতু সে দুর্বল-মনা সে কারণে যে কোন বিপদে সে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে।

২৩৬। কেউ একজন জ্ঞানীদের সম্পর্কে কিছু বলতে অনুরোধ করলে আমিরুল মোমেনিন বললেন যে, সে ব্যক্তি হলো জ্ঞানী যে সবকিছুকে যথাযোগ্য অবস্থানে রাখতে পারে। তৎপর অজ্ঞ সম্পর্কে বলতে অনুরোধ করলে আমিরুল মোমেনিন বললেন যে, তাও আমি বলেই ফেলেছি।

২৩৭। আল্লাহ্‌র কসম, তোমাদের এ দুনিয়া আমার দৃষ্টিতে কুষ্ঠরোগীর হাতে থাকা শূকরের হাড় অপেক্ষা নিকৃষ্ট।

২৩৮। কিছু লোক আছে যারা পুরস্কারের আশায় আল্লাহ্‌র ইবাদত করে। নিশ্চয়ই, এটা ব্যবসায়ীদের ইবাদত। আবার কিছু লোক ভয়ে আল্লাহ্‌র ইবাদত করে-এটা দাসদের ইবাদত। এরপরও কিছু লোক কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য আল্লাহ্‌র ইবাদত করে-এটা স্বাধীন মানুষের ইবাদত।

২৩৯। সব কিছু বিচার করে বলা যায় নারী মন্দ; কিন্তু এর নিকৃষ্টতম অবস্থা হলো কেউ তাকে ছাড়া চলতে পারে না।

২৪০। যে ব্যক্তি কুঁড়ে স্বভাবের সে নিজের অধিকার হারিয়ে ফেলে আর যে ব্যক্তি পরনিন্দাকারীকে বিশ্বাস করে যে বন্ধু হারায়।

২৪১। অসৎ উপায়ে প্রাপ্ত একটি পাথরও যদি কোন ঘরে থাকে তবে তা সে ঘরের ধ্বংস নিশ্চিতভাবে ডেকে আনবে।

২৪২। জালেমের ওপর মজলুমের দিন মজলুমের ওপর জালেমের দিন অপেক্ষা অধিক কঠোর হবে।

২৪৩। আল্লাহ্‌কে কিছু না কিছু ভয় করো যদিও তা ক্ষুদ্র হয় এবং আল্লাহ্ ও তোমার মাঝে কিছুটা পর্দা রেখো যদিও তা পাতলা হয়।

২৪৪। এক প্রশ্নের বিভিন্নমুখী জবাব দিতে গেলে আসল পয়েন্ট থেকে যায়।

২৪৫। নিশ্চয়ই প্রত্যেক আশীর্বাদে আল্লাহ্‌র অধিকার রয়েছে। যদি কেউ সে অধিকার পূরণ করে তবে আল্লাহ্ তাঁর নেয়ামত বাড়িয়ে দেন। কেউ যদি আল্লাহ্‌র অধিকার পালন না করে তবে সে নেয়ামত হারাবার বিপজ্জনক অবস্থায় পড়তে পারে।

২৪৬। যখন সামর্থ্য বেড়ে যায় তখন আকাঙ্খা কমে যায়।

২৪৭। আল্লাহ্‌র নেয়ামত যাতে ফসকে না যায় সে দিকে সতর্ক প্রহরা থাকা উচিত কারণ এমন অনেক জিনিস আছে যা হারালে আর ফিরে পাওয়া যায় না।

২৪৮। ঔদার্য এমনভাবে কল্যাণের দিকে নিয়ে যায় যা জ্ঞাতিত্বের প্রতি সম্মানবোধও দিতে পারে না।

২৪৯। তোমার সম্পর্কে যদি কারো সুধারণা থাকে তবে তা সত্যে পরিণত করার চেষ্টা করো।

২৫০। সবচেয়ে উত্তম আমল তা যা করার জন্য তোমার নিজকে বল প্রয়োগে বাধ্য করতে হয়।

২৫১। সংকল্প ভঙ্গ করে, নিয়্যত পরিবর্তন করে এবং সাহস হারিয়ে আমি মহিমান্বিত আল্লাহ্‌কে জানতে পেরেছিলাম।

২৫২। এ দুনিয়ার তিক্ততাই পরকালের মিষ্টতা এবং দুনিয়ার মিষ্টতা পরকালের তিক্ততা।

২৫৩। আল্লাহ্ বহু-ঈশ্বরবাদ হতে পবিত্র করার জন্য ইমান প্রতিষ্ঠিত করেছেন, আত্মশ্লাঘা হতে পবিত্র থাকার জন্য সালাত; জীবিকার উপায় হিসাবে যাকাত; মানুষের পরীক্ষা হিসাবে সিয়াম; দ্বীনের খুঁটি হিসাবে হজ্জ; ইসলামের সম্মান হিসাবে জিহাদ; সাধারণ মানুষের কল্যাণের জন্য আমর বিল মা'রুফ; ফেতনা-ফ্যাসাদ নিয়ন্ত্রণের জন্য নাহি আনিল মুন্‌কার; সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য জ্ঞাতিত্বের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ; রক্তপাত বন্ধ করার জন্য কিসাস; হারামের গুরুত্ব অনুধাবনের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা; বুদ্ধিমত্তা রক্ষা করার জন্য মদ্যপান নিষিদ্ধ; সততা জাগিয়ে দেয়ার জন্য চৌর্য বৃত্তি বাতিল; মনোরম অবস্থা বজায় রাখার জন্য ব্যভিচার নিষিদ্ধ; বংশবৃদ্ধির জন্য সমকামিতা নিষিদ্ধ; কোন বিষয় প্রমাণ করার জন্য সাক্ষী; সত্যের মর্যদা বৃদ্ধির জন্য মিথ্যা প্রতিহত; বিপজ্জনক অবস্থা হতে রক্ষা করার জন্য শান্তি রক্ষা; উম্মাহ্‌র শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য ইমামত এবং ইমামতের প্রতি সম্মান হিসাবে ইমামদের মান্য করা নির্ধারণ করেছেন।[১]

১। শরিয়তের আদেশের কতিপয় উদ্দেশ্য ও কল্যাণকর বিষয়ে বর্ণনা করার আগে আমিরুল মোমেনিন ইমানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন। কারণ ইমান হলো দ্বীনের ভীত্তি এবং ইমান ব্যতীত দ্বীনের বিধান ও জুরিসপ্রুডেন্স এর কোন প্রয়োজনীয়তা থাকতে পারে না। ইমান হলো সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব এবং তাঁর একত্বে স্বীকৃতি। যখন মানুষের মনে ইমান বদ্ধমুল হয় তখন সে অন্যকোন সত্তার কাছে মাথা নোয়াবে না এবং তখন কোন শক্তি বা কর্তৃত্ব তাকে আর ভয় দেখিয়ে বাগে আনতে পারে না। বরং সকল বন্ধন হতে মানসিকভাবে মুক্ত হয়ে সে আল্লাহ্‌র প্রতি অনুরক্ত হতে পারে এবং একত্বের প্রতি এহেন আনুগত্য তাকে বহু-ঈশ্বরবাদের অপবিত্রতা হতে রক্ষা করে।

সকল ইবাদতের মধ্যে সালাত হলো সর্বোত্তম। দাঁড়ানো, বসা, বক্র হওয়া ও সেজদার সমন্বয়ে হলো সালাত এবং অঙ্গগুলোর আত্মগর্ব, আত্মশ্লাঘা ও অহমবোধ বিনষ্ট করে নম্রতা ও বিনয়বনতা সৃষ্টি করে। কারণ উদ্ধত কর্মকান্ড গর্ব ও ঔদ্ধত্য সৃষ্টি করে এবং বিনয় মিশ্রিত কর্মকান্ড মনে নম্রতা ও বিনয়াবতা সৃষ্টি করে। এসব অভ্যাস করে একজন লোক স্বাভাবিকভাবেই বিনম্র স্বভাবের.হয়ে উঠে। এভাবে উদ্ধত আরব জাতি—যারা উটে চড়ার সময় ছড়ি পড়ে গেলে বক্র হয়ে তা তুলতো না—তারা তাদের মুখ ও কপাল মাটিতে ঠেকাতে বাধ্য হলো।

জাকাত হলো—কোন সমর্থ লোক তার অর্থ-সম্পদ হতে বার্ষিক একটা নির্ধারিত অংশ দুঃস্থ ও দরিদ্রদের দেয়া যা ইসলাম বাধ্যতামূলক করেছে। এর উদ্দেশ্য হলো সমাজে যেন কোন লোক দারিদ্রের প্রভাবে নিরাপত্তাহীন না থাকে। এর আরো একটি উদ্দেশ্য হলো সম্পদ যেন ব্যক্তি বিশেষের হাতে না থাকে।

সিয়াম হচ্ছে এমন ইবাদত যাতে রিয়ার বিন্দু বিসর্গও নেই। পবিত্র নিয়্যত ছাড়া এতে অন্য কোন উদ্দেশ্যও নেই। ফলতঃ একাকী অবস্থায় কেউ দেখার না থাকলেও ক্ষুধা এবং তৃষ্ণায় কাতর হয়েও কেউ খাবার বা পান করার চেষ্টা করে না। শুধুমাত্র বিবেকের পবিত্রতা তাকে নিয়ন্ত্রণ করে। এটাই সিয়ামের মহান আদর্শ যে, ইহা ইচ্ছার পবিত্রতা কার্যে পরিণত করে।

হজ্বের উদ্দেশ্য হলো পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান হতে মুসলিমগণ একত্রিত হয়ে ইসলামের মহত্ব প্রকাশ করা, ইবাদতের আগ্রহ আবেগ নবায়ন করা এবং উম্মাহ্র মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন বৃদ্ধি করা।

জিহাদের উদ্দেশ্য হলো সর্বশক্তি দিয়ে ইসলাম বিরোধী শক্তির মোকাবেলা করা যাতে ইসলাম প্রগতি ও স্থিতিশীল অবস্থা লাভ করতে পারে। যদিও এ পথে জীবনের ঝুঁকি ও পদে পদে বিপদের সম্ভাবনা তবুও অবিনশ্বর জীবন ও নৈসর্গিক শান্তির আশা এ বিপদ বুক পেতে নেয়ার সাহস যোগায়।

ভাল কাজে প্রলুব্ধ করা আর মন্দ কাজ হতে বিরত থাকার উপদেশ দান করা হলো অন্যকে সঠিক পথ দেখানো ও ভ্রমাত্মক কাজ হতে বিরত রাখার প্রকৃষ্ট উপায়। যদি কোন সমাজে এহেন লোকের অভাব দেখা দেয় তা হলে সে সমাজকে ধ্বংস হতে কোন কিছুই রক্ষা করতে পারে না। সেসমাজ নৈতিক ও সামাজিকভাবে অন্ধকারে তলিয়ে যায়। সে জন্যই ইসলাম দেশনা দানের ওপর সব চাইতে বেশী জোর দিয়েছে এবং সমাজকে দেশনা দান না করলে তা অমার্জনীয় পাপ হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

জ্ঞাতি-গোষ্ঠির কল্যাণ করা মানে তাদের প্রতি বৈধ আনুকূল্য প্রদর্শন করা। অন্ততঃপক্ষে তাদের সম্বোধন করা এবং তাদের সঙ্গে আলাপচারিতা করা যাতে হৃদয় পরিস্কার হয় ও পারিবারিক বন্ধন বৃদ্ধি পায়। এতে বিচ্ছিন্ন লোক সকল একে অপরের শক্তিতে পরিণত হতে পারে।

নিহত লোকের আত্মীয়-স্বজন হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার অধিকার আছে। তারা জীবনের পরিবর্তে জীবন দাবী করতে পারে। এর উদ্দেশ্য হলো মানুষ যেন শাস্তির ভয়ে কাউকে হত্যা না করে এবং জীবিতগণ যেন এক জনের পরিবর্তে বহুলোক হত্যার জেদ না করে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ক্ষমা ক্ষমার স্থলে সর্বোত্তম। তার মানে এ নয় যে, ক্ষমার নামে মানুষের অধিকার ক্ষুণ্ন হবে—বিশ্ব শান্তি বিঘ্নিত হবে। বরং এ ক্ষেত্রে কিসাস-ই রক্তপাত বন্ধ করে মানুষের জীবনের নিরাপত্তা বিধান করতে পারে। আল্লাহ্ বলেন ঃ "হে মানুষ যদি তোমরা বুঝ, তোমাদের জন্য রয়েছে কিসাস যাতে তোমরা নিজেদের রক্ষা করতে পার" (কুরআন ২ঃ১৭৯)। এসব শাস্তির উদ্দেশ্য হলো অপরাধী যেন বুঝতে পারে আল্লাহ্র নিষেধ অমান্য করার পরিণতি কি এবং শাস্তির ভয়ে অপরাধ হতে বিরত থাকে।

মদ চিন্তার তালগোল পাকায়, বোধগম্যতা দুর্বল করে ফেলে এবং জ্ঞানের বিচ্ছিন্নতা ঘটায়। ফলে একজন লোক হতে যা আশা করা যায় না মদাসক্ত অবস্থায় সে তা করে ফেলে। তদুপরি ইহা রোগাক্রান্ত করে ফেলে এবং স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটায়। সে কারণে শরিয়ত মদকে হারাম ঘোষণা করেছে।

২৫৪। যদি তুমি কোন অত্যাচারীকে শপথ গ্রহণ করাতে চাও তবে তাকে এভাবে শপথ করতে বলো, "আমি আল্লাহ্র শক্তি ও কুদরতের বহির্ভূত।" এরূপ মিথ্যা শপথের জন্য তাঁর শাস্তি দ্রুত নেমে আসবে। আর

যদি সে আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে যিনি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই তাহলে তার শাস্তি দ্রুত হবে না। কারণ সে মহিমন্বিত আল্লাহ্‌র একত্ব প্রকাশ করেছে।[১]

১। বর্ণিত আছে যে, আব্বাসীয় খলিফা আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মুহাম্মদ আল-মনসুরের নিকট ইমাম জাফর আস-সাদিকের বিরুদ্ধে কতিপয় অভিযোগ করেছিল। মনসুর ইমামকে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন অমুক ব্যক্তি আপনার বিরুদ্ধে অমুক অমুক কথা বলেছে। ইমাম বললেন যে, এতে বিন্দু মাত্রও সত্যের লেশ নেই এবং লোকটিকে ডেকে আনার জন্য অনুরোধ করলেন। লোকটিকে সামনে আনলে সে বললো যে, সে যা বলেছে তার সবই সত্য। ইমাম তাকে বললেন, "যদি তুমি সত্য কথা বল তাহলে আমি যে শপথ করতে বলি সে শপথ কর।" তৎপর ইমাম তাকে বলতে বললেন, "আমি আল্লাহ্‌র শক্তি ও ক্ষমতা বহির্ভূত; আমি নিজের শক্তি ও ক্ষমতায় নির্ভর করি।" যেইমাত্র এ শপথ করলো অমনি লোকটি পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়ে চলতশক্তিহীন হয়ে গেল। ইমাম সসম্মানে সেখান থেকে চলে গেলেন (কুলায়নী [৫৩], ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৪৪৫-৪৪৬; মজলিসী [১০৩], ৪৭ তম খণ্ড, পৃঃ ১৬৪-১৬৫, ১৭২-১৭৫ ও ২০৩ - ২০৪; আশরাফ ১৩, পৃঃ ২২৫-২২৬; হায়তামী [১৬৬], ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪)।

আল-মনসুরের দৌহিত্র হারুন অর-রশিদের রাজত্বকালে (১৪৯/৭৬৬— ১৯৩/৮০৯) অনুরূপ একটি ঘটনা ঘটেছিল। আহ্‌লুল বাইতের সুচিহ্নিত শত্রু আবদুল্লাহ্‌ ইবেন জুবায়রের দৌহিত্র আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মুসাব হারুন-অর-রশিদের কাছে বললো যে, ইয়াহিয়া ইবনে আবদিল্লাহ্‌ ইবনে হাসন ইবনে (ইমাম) হাসান ইবনে আলী ইবনে আবি তালিব তার (হারুন) বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। হারুন ইয়াহিয়াকে ডেকে পাঠালেন। ইয়াহিয়া আবদুল্লাহ্‌কে ওপরে বর্ণিতভাবে শপথ করে তার কথার সত্যতা প্রমাণের জন্য বললেন। আবদুল্লাহ্‌ এই শপথ করার সঙ্গে সঙ্গে তার গায়ে কুষ্ঠরোগ ফুটে উঠলো এবং তার সারা শরীর ফেটে গেল। তিন দিন পর সে মারা গেল। এ অবস্থা দেখে হারুন বললো, "আশ্চর্য, আল্লাহ্‌ কত দ্রুত ইয়াহিয়াঁর জন্য আবদুল্লাহ্‌র ওপর প্রতিশোধ নিলেন" (ইসফাহানী [৩৩], পৃঃ ৪৭২-৪৭৮; মাসুদী [১০৯], ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৪০-৩৪২; বাগদাদী [৯৪], ১৪শ খণ্ড, পৃঃ ১১০-১১২; হাদীদ [১৫২], ১৯তম খণ্ড, পৃঃ ৯১-৯৪; কাছীর [৩৯], ১০ম খণ্ড, পৃঃ ১৬৭-১৬৮; সুয়ূতী [১৪৭], পৃঃ২৮৭)।

২৫৫। হে আদম সন্তানগণ, তোমাদের সম্পদ বিষয়ে তোমরা নিজেরাই প্রতিনিধি হও এবং মৃত্যুর পর তোমার সম্পত্তি কি করবে তা জীবিত থাকতেই করে যেয়ো।

২৫৬। ক্রোধ এক প্রকারের উম্মত্ততা কারণ ক্রোধান্বিত ব্যক্তি পরবর্তীতে অনুশোচনা করে। যদি সে অনুশোচনা না করে তবে তার উম্মত্ততা সুনিশ্চিত হয়ে দাঁড়ায়।

২৫৭। ঈর্ষা না থাকলে শারীরিক সুস্থতা অর্জিত হয়।

২৫৮। আমিরুল মোমেনিন কুমায়েল ইবনে জায়েদ আন-নাখাইকে বলেছিলেন, "হে কুমায়েল, তোমার লোকজনকে আদেশ কর যেন তারা মহৎ বৈশিষ্ট্য অর্জনের জন্য দিনে বের হয়ে যায় এবং অভাবের তাড়নায় যারা রাতে ঘুমাতে পারে না তাদের দেখার জন্য রাতে বের হয়। কারণ সর্বশ্রোতা আল্লাহ্‌র নামে আমি শপথ করে বলছি, যদি কখনো কেউ অন্যের হৃদয়কে খুশী করতে পারে তবে আল্লাহ্‌ তার জন্য এমন বিশেষ নেয়ামত নির্ধারণ করে রেখেছেন যা দুঃখের দিনে প্রবাহিত পানির মত এসে বিতাড়িত বন্য উটের মত দুঃখকে তাড়িয়ে দেবে।

২৫৯। যখন তুমি বিপদ বা দুরবস্থায় পড়বে তখন দান-সদকার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সঙ্গে ব্যবসা করো।

২৬০। বেঈমান লোকের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা মানে আল্লাহ্‌র ওপর বিশ্বাস হারানো আর বেঈমানকে অবিশ্বাস করা মানে আল্লাহ্‌র ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা।

২৬১। অনেক লোক আছে যাদেরকে ভাল ব্যবহার দ্বারা ক্রমান্বয়ে শাস্তির দিক নিয়ে যাওয়া হচ্ছে; অনেক লোক আছে যারা ছলনায় পড়ে আছে, কারণ তাদের মন্দ কাজগুলো ঢাকা পড়ে রয়েছে এবং অনেকে মোহাচ্ছন্ন

হয়ে আছে কারণ তাদের সম্পর্কে ভাল কথা বলা হচ্ছে। অথচ সময় দেয়ার চেয়ে কঠোর পরীক্ষা মহিমান্বিত আল্লাহ্ আর কিছুই করেননি।

২৬২। আমিরুল মোমেনিন হতে বর্ণিত একটি হাদিস হলো, অবস্থা যখন এমন হয় তখন ধর্মীয় নেতা রুখে দাঁড়াবে এবং জনগণ শরৎকালের বৃষ্টিবিহীন মেঘের মত তাঁর চারপাশে ভিড় জমাবে।

এ হাদিসে 'ইয়াসুব' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যার আভিধানিক অর্থ রাণী মৌমাছি এবং 'কুযা' শব্দের অর্থ হলো বৃষ্টিবিহীন মেঘ। আমিরুল মোমেনিনের বাণী হলো 'ফাইজা কানা যালিকা দারাবা ইয়াসুবুদ্দীন বি যানাবিহি।" দারাবা অর্থ হলো আঘাত করা, মারা, ব্যথা দেওয়া; ইয়াসুবুদ্দীন অর্থ হলো দ্বীন ও শরিয়তের প্রধান, যানাব অর্থ হলো লেজ, শেষ, যে মান্য করে, ফুল। এবাক্যে ইয়াসুবুদ্দীন হলো যুগের ইমাম। এ উপাধী রাসুল (সঃ) আমিরুল মোমেনিনকে দিয়েছিলেন যেমন-

(ক) হে আলী, তুমি মোমিনগণের 'ইয়াসুব' আর সম্পদ মোনাফেকগণের ইয়াসুব (বার[৯৭], ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১৭৪৪; আছীর [১], ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২৮৭; হাজর [১৫০], ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১৭১; শাফী [১২৪], ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৫৫; হাদীদ[১৫২], ১ম খণ্ড, পৃঃ ১২; ১৯ তম খণ্ড, পৃঃ ২২৪; শাফী[১২৮], ৯ম খণ্ড, পৃঃ ১০২)।

(খ) তুমি দ্বীনের 'ইয়াসুব' (শাফী[১২৪], ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৭৭; জাবিদী[৬৪], ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৮১; হাদীদ [১৫২], ১ম খণ্ড, পৃঃ ১২; ১৯তম খণ্ড, পৃঃ ২২৪)।

(গ) তুমি মুসলিমগণের 'ইয়াসুব' (কুন্দুজী[৫০], পৃঃ ৬২)।

(ঘ) তুমি কুরাইশদের 'ইয়াসুব' (সাখাবী[১৩৬], পৃঃ ৯৪)।

সুতরাং রাণী মক্ষিকা যেমন মক্ষিকাকূলে পবিত্রতম এবং সে সকল দোষত্রুটি মুক্ত অবস্থায় ফুলের বক্ষ হতে সুধা আহরণ করে তদ্রুপ যুগের ইমামও মানবকূলে সত্য সঠিক পথের দিশারী ও পবিত্রতম।

২৬৩। সে হলো বহুমুখী প্রতিভাধারী বক্তা।[১]

১। আমিরুল মোমেনিন তার অন্যতম প্রধান সহচর ছা-ছা আহ্ ইবনে সুহান আল আবদী সম্পর্কে এ উক্তি করেছিলেন। হাদীদ লিখেছিন, "আলীর মত ব্যক্তির প্রশংসাই ছা-ছা আহ্র মহত্ব ও ব্যক্তিত্ব এবং তার জ্ঞানের বহুমুখীতা সম্পর্কে যথেষ্ট" (হাদীদ [১৫২], ১৯তম খণ্ড, পৃঃ ১০৬)।

২৬৪। আমিরুল মোমেনিন হতে একটি হাদিস বর্ণিত আছে যে, ঝগড়া-ফ্যাসাদ ধ্বংস বয়ে আনে।

২৬৫। মেয়েরা যখন বাস্তবতাকে বুঝার বয়সে উপনীত হয় তখন পিতৃপক্ষীয় আত্মীয়গণই তুলনামূলকভাবে মনোনয়নের যোগ্য।

২৬৬। ইমান হৃদয়ে 'লুমাজাহ' সৃষ্টি করে। ইমান যত উন্নতি লাভ করে 'লুমাজাহ' তত বৃদ্ধি পায় (লুমাজাহ অর্থ হলো এক প্রকার উজ্জ্বল সাদা দাগ)

২৬৭। যদি কোন লোকের কুঋণ (অদ দায়ানুজ জানুন অর্থাৎ যে ঋণ ফেরত পাওয়ার বিষয়ে সন্দেহ আছে) থাকে তবে তা আদায়ের পর অতীতের জাকাত প্রদান করা অবশ্যকর্তব্য।

২৬৮। জিহাদে সৈন্য পরিচালনাকালে আমিরুল মোমেনিন বলতেন, "যতদূর সম্ভব নারীর চিন্তা-ভাবনা হতে এবং তাদের কথা মনে না করতে চেষ্টা করো।"

২৬৯। একজন কৃতকার্য তীরন্দাজের মত হয়ো যে প্রথম নিক্ষেপেই কৃতকার্য হবার জন্য সম্মুখ পানে মনোনিবেশ করে তাকিয়ে থাকে।

২৭০। যখন যুদ্ধ চরমে পৌছলো তখন আমরা আল্লাহ্র রাসুলের মাধ্যমে আশ্রয় চাইলাম এবং আমাদের মধ্যে তিনিই ছিলেন শত্রুর সব চাইতে নিকটবর্তী।

২৭১। মুয়াবিয়ার সৈন্য আল-আনবার আক্রমণ করেছে শুনামাত্র আমিরুল মোমেনির উম্মুক্ত তরবারি হাতে বেরিয়ে পড়লেন এবং নুখায়লাহ্ এর কাছে লোকেরা তাঁকে থামিয়ে ফেলে বললেন, "হে আমিরুল মোমেনিন, তাদের শায়েস্তা করতে আমরাই যথেষ্ট।" আমিরুল মোমেনিন তখন বললেন ঃ

'তোমাদের নিজেদের বিরুদ্ধেই তোমরা আমার জন্য যথেষ্ট নও। কাজেই কি করে অন্যের বিরুদ্ধে তোমরা আমার জন্য যথেষ্ট হবে (২৭ নং খোৎবায় এ বাণীটি ভিন্ন প্রেক্ষিতে বর্ণিত)

২৭২। একদিন হারিছ ইবনে হাওত আমিরুল মোমেনিনের কাছে এসে বললো, "আপনি কি বিশ্বাস করেন আমি এ কথা কল্পনা করতে পারিনি যে, জামালের লোকেরা ভ্রান্ত পথে ছিল।"আমিরুল মোমেনিন বললেন, "হে হারিছ, তুমি তোমার নীচে দেখেছো তার উর্ধে কিছু দেখনি কাজেই তুমি সব তালগোল পাকিয়ে ফেলেছো। নিশ্চয়ই, তুমি ন্যায়কে জানতে না, সেকারণেই তুমি ন্যায়পরায়ণকে স্বীকৃতি দিতে পারনি। তুমি ভ্রান্ত পথকে চিনতে না। ফলে ভ্রান্ত পথের অনুসারীগণকে তুমি চিনতে পারনি।" হারিছ বললো, "তা হলে আমি সাদ ইবনে মালিক ও আবদুল্লাহ্ ইবনে উমরের পর্যায়ভুক্ত হবো।" আমিরুল মোমেনিন বললেন, "নিশ্চয়ই, সাদ ও আবদুল্লাহ্ ন্যায়ের পক্ষে আসেনি অন্যায়কেও পরিত্যাগ করেনি।"[১]

১। সাদ ইবনে মালিক ছিল সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস অর্থাৎ সেই পাষণ্ড উমর ইবনে সাদের পিতা যে ইমাম হুসাইনকে হত্যা করেছিল। আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর তাদের মধ্যে অন্যতম যারা আমিরুল মোমেনিনকে সাহায্য-সহায়তা ও সমর্থন করা হতে বিরত ছিল।

উসমান নিহত হবার পর সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস বনে-জঙ্গলে ও নির্জনে আত্মগোপন করে জীবন কাটাচ্ছিল। তবুও সে আমিরুল মোমেনিনের বায়াত গ্রহন করেনি। কিন্তু আমিরুল মোমেনিনের মৃত্যুর পর সে প্রায়শই এই বলে অনুতাপ করতো, "আমি এমন এক অভিমত পোষণ করতাম যা ছিল সম্পূর্ণ ভ্রান্ত" (নায়সাবুরী[৮৪], পৃঃ ১১৬)। আমিরুল মোমেনিনের বিরুদ্ধে মুয়াবিয়ার পক্ষাবলম্বন করে যুদ্ধ না করার জন্য যখন মুয়াবিয়া তাকে দোষারোপ করতে লাগলো তখন সাদ বলতো, "বিদ্রোহী মুয়াবিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করার জন্য আমি দারুণভাবে অনুতপ্ত" (হানাফী [১৫৪], ২য় খণ্ড, পৃঃ ২২৪-২২৫; হাম্বলী [১৬১], ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৫৪২)।

আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করা সত্ত্বেও যুদ্ধে আমিরুল মোমেনিনকে সাহায্য করতে অস্বীকার করেছিলেন। তিনি ওজর দেখিয়েছিলেন যে, "আমি নির্জনে ইবাদত বন্দেগী করা স্থির করেছি; কাজেই আমি যুদ্ধ-বিগ্রহে যেতে চাই না।" আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর তার জীবনসায়াহ্ন পর্যন্ত এ বলে অনুতাপ করেছেন, "আমার জীবনে এ পৃথিবীতে এর চেয়ে দুঃখজনক আর কোন কিছু নেই যে, আল্লাহ্ আমাকে যা আদেশ করেছিলেন তা অমান্য করে আলী ইবেন আবি তালিবের পক্ষাবলম্বন করে বিদ্রোহী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিনি" নায়সাবুরী [৮৪], ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১১৫-১১৬; শাফী [১২৫], ৮ম খণ্ড, পৃঃ ১৭২; সাদ [১৩৭], ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১৩৬-১৩৭; বার [৯৭], ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৯৫৩; আছীর [১], ৩য় খন্ড, পৃঃ ২২৯; হাম্বলী [১৬১], ৩য় খন্ড, পৃঃ ৫৪৩; শাফী [১৩২], ২৬তম খণ্ড , পৃঃ ১৫১)।

২৭৩। ক্ষমতার অধিকারীগণ যেন সিংহ সওয়ার— পদমর্যাদার জন্য যে ব্যক্তি ঈর্ষাকাতর তার অবস্থা শুধু তিনিই জানেন।

২৭৪। অন্যদের মধ্যে যারা শোকাহত তাদের কল্যাণ করো তাহলে তোমরা শোকহত হলে তারাও কল্যাণকর কাজ করবে।

২৭৫। জ্ঞানীদের কথা যদি যথার্থ হয় তবে তা সমাজের ব্যাধির ঔষধ স্বরূপ কিন্তু তাতে যদি ভ্রান্তি থাকে তবে সমাজ রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে।

২৭৬। কেউ একজন দ্বীনের সংজ্ঞা বলার জন্য আমিরুল মোমেনিনকে অনুরোধ করলে তিনি বললেন ঃ

আগামীকাল আমার কাছে এসো যাতে আমি অন্যসকল লোকের উপস্থিতিতে তোমাকে বুঝিয়ে দিতে পারি। এতে আমি যা বলব তা তুমি ভুলে গেলেও অন্যদের মনে থাকতে

পারে। কারণ উপদেশ হচ্ছে পলায়নরত শিকারের মত। একজন তা হারালেও অন্য কেউ তা ধরতে সক্ষম হতে পারে। (উক্ত লোকটিকে যে উপদেশ দেয়া হয়েছিল তা ৩১ নং বাণীতে উল্লিখিত হয়েছে)

২৭৭। হে আদম সন্তানগণ, যেদিন এখনো আসেনি সেদিনের জন্য আজকের দিনে উদ্বিগ্ন হয়ো না। কারণ সে দিনটি যদি তোমার জীবনে আসে তবে আল্লাহ্ সেদিনের জীবিকাও তোমার জন্য দান করবেন।

২৭৮। বন্ধুকে একটা সীমা অবধি ভালবেসো, কারণ সে যেকোন সময় শত্রু হয়ে যেতে পারে। আবার শত্রুকে একটা সীমা অবধি ঘৃণা করো, কারণ যে কোন সময় সে তোমার বন্ধু হয়ে যেতে পারে।

২৭৯। এ পৃথিবীতে দু'প্রকারের কর্মী আছে। এক প্রকার হলো তারা যারা শুধু দুনিয়ার জন্য কাজ করে আখেরাতের কথা বেমালুম ভুলে থাকে। সে যাদেরকে ফেলে যাবে তাদের দুঃখ-কষ্টের বিষয়ে সে সর্বদা ভীত থাকে। সুতরাং সে অন্যের সুখ শান্তির কাজে নিজের জীবন কাটায়; আরেক প্রকার হলো তারা যারা এ পৃথিবীতে পরকালের জন্য কাজ করে যায়। এসব লোক দুনিয়াতে বিনা প্রচেষ্টায় তাদের হিস্যা পেয়ে থাকে। ফলে তারা ইহকাল ও পরকাল উভয়টার সুবিধা ভোগ করতে পারে এবং উভয় ঘরের মালিক হয়ে পড়ে। এসব লোক আল্লাহ্র দরবারে সম্মানের অধিকারী হয়। যদি সে আল্লাহ্র কাছে কিছু চায় তবে বিফল মনোরথ হয় না।

২৮০। বর্ণিত আছে যে, উমর ইবনে খাত্তাবের খেলাফতকালে কাবার উদ্বৃত্ত অলঙ্কারের বিষয়ে প্রশ্ন উঠেছিল এবং কেউ কেউ প্রস্তাব করেছিল "এসব অলঙ্কার দিয়ে কাবার কি হবে? তার চাইতে সেগুলো দিয়ে একটা মুসলিম বাহিনী গঠন করলে ভাল হতো।" এ যুক্তি উমরের পছন্দ হলো। তবুও তিনি বিষয়টি সম্পর্কে আমিরুল মোমেনিনকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, "যখন কুরআন নাজেল হয়েছিল তখন চার প্রকারের সম্পদ ছিল। এক, মুসলিম ব্যক্তি মালিকানাধীন সম্পত্তি যা সে নির্দিষ্ট হারে উত্তরাধিকারীদেরকে বন্টন করে দিতো। দুই, কর (ফায়) যারা প্রাপ্য ছিল তাদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হতো। তিন, এক-পঞ্চমাংশ (খুমস) খাজনা যা বন্টনের পথ আল্লাহ্ নিজেই নির্ধারণ করে দিয়েছেন। চার, দান-খয়রাত (সদকাহ্) যার বন্টন আল্লাহ্ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এ আদেশাবলী নাজেলের সময় কাবার অলঙ্কারগুলো তথায় ছিল এবং আল্লাহ্ সেগুলোকে সেভাবেই রেখেছেন। আল্লাহ্ ভুল বশতঃ বা অজানার কারণে সেগুলোকে সেখানে রাখেননি। সুতরাং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুল সেগুলোকে যেখানে রেখেছেন তুমিও তা সেখানে থাকতে দাও।" আমিরুল মোমেনিনের কথা শুনে উমর বললেন, "আপনি না থাকলে নিশ্চয়ই আমরা অবমানিত হতাম।" তিনি অলঙ্কারগুলো যেভাবে ছিল সেভাবে রেখে দিলেন।[১]

১। প্রথম তিন খলিফার মধ্যে উমর ইবনে খাত্তাব কঠিন সমস্যা সমধান করতে না পারলে আমিরুল মোমেনিনের পরামর্শ চাইতেন এবং তাঁর অগাধ জ্ঞান হতে উপকৃত হতেন। কিন্তু আবুবকর তার খেলাফতের স্বল্প সময়ের কারণে এবং উসমান তার কুপ্রবৃত্তিসম্পন্ন চেলা-চামুন্ডার কারণে আমিরুল মোমেনিনের উপদেশ গ্রহণ করে কদাচিত উপকৃত হয়েছে।

আমিরুল মোমেনিন সম্পর্কে উমর নিজেই বলতেন, "আলী হলেন আমদের মধ্যে সব চাইতে জ্ঞানী— বিশেষ করে জুয়িসপ্রুডেন্স ও বিচারকার্যে" (বুখারী [১০২], ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২৩; হাম্বল [১৬০], ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১১৩; নায়সাবুরী [৮৪], পৃঃ ৩০৫; সাদ [১৩৭], ২য় খণ্ড, পৃঃ ১০২; বার [৯৭], ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১১০২)।

আমিরুল মোমেনিনের জ্ঞানের উচ্চমার্গ সম্পর্কে উমর বা অন্য কারো সাক্ষ গ্রহণের প্রয়োজন হয় না। কারণ উমর ও অন্যান্য অনেকেই এতদসংক্রান্ত বিষয়ে রাসুলের (সঃ) অনেক বাণী বর্ণনা করেছেন। রাসুল (সঃ) বলেছেন,

আমার উম্মাহ্‌র মধ্যে আলী জুরিসপ্রুডেন্স ও ন্যায় বিচারে সব চাইতে জ্ঞান সম্পন্ন (ওয়াকী[৩৬], ১ম খণ্ড, পৃঃ ৭৮; শাফী[১৩০], ২য় খণ্ড, পৃঃ ২০৩; বার[৯৭], ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৬-১৭; শাফী[১২৮], ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১১০২; শাফী[১২৪], ২য় খণ্ড, পৃঃ ১০৮; মাজাহ্[১৫৫], ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৫)।

এ বিষয়ে আহমাদ ইবনে হাম্বল আবু হাজিম হতে বর্ণনা করেছেন যে, কোন ব্যক্তি মুয়াবিয়ার নিকট গিয়ে ধর্ম বিষয়ে তাকে ক'টি প্রশ্ন করেছিল। উত্তরে মুয়াবিয়া বললো, "এসব প্রশ্ন আলীকে জিজ্ঞেস করো। তিনি এসব বিষয়ে অধিক জ্ঞানের অধিকারী।" লোকটি বললো, "আমি আলী অপেক্ষা আপনার নিকট হতে উত্তর পেতে অধিক আগ্রহী।" মুয়াবিয়া তাকে ধমক দিয়ে বললো, তোমার কাছ থেকে যত কথা শুনলাম তম্মধ্যে একথাটা নিকৃষ্টতম। তোমার এহেন উক্তিতে এমন এক ব্যক্তির প্রতি তুমি অবজ্ঞার মনোভাব দেখালে যাঁকে আল্লাহ্‌র রাসুল নিজে শিক্ষাদান করেছেন যেমন করে পাখী তার শাবকের মুখে একটির পর একটি খাদ্য দানা পুরিয়ে দেয়। আল্লাহ্‌র রাসুল বলেছেন ঃ

মুসার কাছে হারুন যেমন ছিল আমার কাছে আলীও তদ্রুপ; শুধু ব্যবধান হলো, এটা সুনিশ্চিত যে আমার পরে আর কোন নবী থাকবে না। তৎপর মুয়াবিয়া বললেন তুমি কি জানতে না যে, উমর কঠিন সমস্যার সমাধানের জন্য আলীর কাছে যেতেন। (শাফী[১২৬], ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪৬; শাফী[১২৪], ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৯৫; হায়তামী[১৬৬], পৃঃ ১০৭; আসকালানী[২৪], ১৭ তম খণ্ড, পৃঃ ১০৫)।

উমর অনেক সময় বলতেন ঃ

আলী ইবেন আবি তালিবের মত আরেক জনকে গর্ভে ধারণ ও প্রসব করার ক্ষমতা নারীকূলের কারো নেই। আলী না থাকলে উমর ধ্বংস হয়ে যেতো। (কুতায়বাহ[৪৬], ১ম খণ্ড, পৃঃ ২০২, বার[৯৭], ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১১০৩; শাফী[১২৪], ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৯৪; হানাফী[১৫৭], পৃঃ ৩৯; কুন্দুজী[৫০], পৃঃ ৭৫, ৩৭৩; শাফী[১২৬], ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৩৫৬)।

অনেক বিশ্বস্ত সূত্র হতে বর্ণিত আছে যে, উমর বলতেনঃ

যে সব সমস্যা সমাধানে আবুল হাসান (আলী) উপস্থিত থাকতেন না উহার সমাধানে আমি আল্লাহ্‌র আশ্রয় ও সাহায্য প্রার্থনা করতাম। (বার[৯৭], ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১১০২, ১১০৩; সাদ[১৩৭], ২য় খণ্ড, পৃঃ ১০২; হাম্বলী[১৬৩], ১ম খণ্ড, পৃঃ ১২১; আছীর[১], ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২২-২৩; হাজর[১৫০], ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫০৯; কাছীর[৩৯], ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৩৬০)।

উমর কোন সমস্যা সমাধানে আমিরুল মোমেনিনের পরামর্শ চাইলে তাঁকে নিম্নরূপভাবে আহ্বান করতেন ঃ

হে আবুল হাসান, আমি সেই সমাজ ব্যবস্থা হতে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করি যে সমাজে আপনি নেই (নায়সাবুরী[৮৪], ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৫৭-৪৫৮; রাজী[১১৭], ৩২ তম খন্ড, পৃঃ ১৯৭; হায়তামী[১৬৬], পৃঃ ১০৭; শাফী[১২৬], ৩য় খণ্ড পৃঃ ৪৬)।

এসব উক্তি ছাড়াও উমর ইবনে খাত্তাব, আবু সায়েদ খুদরী ও মুআজ ইবনে জাবাল হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুল (সঃ) বলেছেন ঃ হে আলী আমি সকল গুণে তোমাকে অতিক্রম করেছি; এবং তুমি মহৎগুণে সকলকে অতিক্রম করেছো। তুমি হলে—

(১) প্রথম ব্যক্তি যে আল্লাহ্‌তে ঈমান এনেছে;

(২) আল্লাহ্‌র কাছে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির সর্বোত্তম পালনকারী

(৩) আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধ সর্বোত্তম পালনকারী।

(৪) জনগণের মধ্যে সর্বোত্তম সুষম বন্টনকারী;

(৫) সর্বোত্তম ন্যায়বিচারকারী এবং মুসলিমদের মধ্যে সব চাইতে বিনম্র ও বিনয়ী;

(৬) মতবিরোধ সম্বলিত বিষয়ে গভীর অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন সর্বোত্তম ব্যক্তি;
(৭) ধর্ম বিষয়ে সর্বোত্তম চিত্তাকর্ষক ব্যক্তি এবং আল্লাহ্‌র দরবারে সর্বোত্তম সম্মানিত ব্যক্তি;
(ইসফাহানী[৩১], ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬৫-৬৬, শাফী[১২৪], ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৯৮; হানাফী[১৫৭], পৃঃ ৬১; হিন্দি[১৬৭], ১২শ খণ্ড, পৃঃ ২১৪; হাদীদ[১৫২], ১৩শ খণ্ড, পৃঃ ২৩০)।

আমিরুল মোমেনিন নিজে, আবু আইউব আনসারী, সাকিল ইবনে ইয়াছির, বুরায়দাহ্ ইবনে হুসায়েব হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুল (সঃ) খাতুনে জান্নাত ফাতিমাকে বলেছেন ঃ

তুমি কি সন্তুষ্ট নও? নিশ্চয়ই, আমার উম্মাহ্‌র মধ্যে যে সব চাইতে অগ্রণী তার সাথে তোমার বিয়ে দিয়েছি। সে ইমানে, জ্ঞানে আর বিনম্রতায় অগ্রণী ও সর্বোত্তম (হাম্বল[১৬০], ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২৬; সানানী[১৩৯], ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৪৯০; বার[৯৭], ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১০৯৯; আছীর[১], ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৫২০; হিন্দি[১৬৭], ১২শ খণ্ড, পৃঃ ২০৫; ১৫শ খণ্ড, পৃঃ ৯৯; শাফী[১২৮], ৯ম খণ্ড, পৃঃ ১০১, ১১৪; শাফী[১৩৩], ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৮৫)।

আমিরুল মোমেনিনের অগাধ জ্ঞান সম্পর্কে রাসুলের (সঃ) নিম্নের বাণীই যথেষ্ট ঃ

আমি জ্ঞানের মহানগরী এবং আলী তার দরজা; যে কেউ আমার জ্ঞানের মহানগরীতে প্রবেশ করতে চায় তাকেই এ দরজা দিয়ে আসতে হবে (নায়সাবুরী[৮৪], ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১২৬-১২৭; বার[৯৭], ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১০৯৯; আছীর[১], ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২২; আসকালানী[২৫], ৬ষ্ঠ খণ্ড পৃঃ ৩২০-৩২১; ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৩৩৭; শাফী[১২৮], ৯ম খন্ড পৃঃ ১১৪; হিন্দি[১৬৭], ১২শ খণ্ড, পৃঃ ২০১, ২১২, ১৫শ খণ্ড পৃঃ ১২৯-১৩০; তিরমিযী[৮০], ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৬৩৭-৬৩৮; ইসফাহানী[৩১], ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬৪; শাফী[১৩০], ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৭৫; শাফী[১২৫], ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৯৩)।

২৮১। বর্ণিত আছে যে, দু'ব্যক্তিকে আমিরুল মোমেনিনের নিকট আনা হয়েছিল। তারা উভয়েই সরকারী সম্পদ চুরি করেছিল। তাদের একজন সরকারী অর্থে ক্রীতদাস এবং অপরজন কোন এক ব্যক্তির ব্যক্তিগত অর্থে ক্রীতদাস। আমিরুল মোমেনিন বললেন, "সরকারী অর্থে যে ক্রীতদাস তার জন্য কোন শাস্তি নেই; কারণ, আল্লাহ্‌র এক সম্পদ আরেক সম্পদ নিয়েছে। কিন্তু অপরজনকে বিধি অনুযায়ী শাস্তি দিতে হবে।" ফলে ব্যক্তিগত ক্রীতদাসটির হাত কেটে ফেলা হয়েছিল।

২৮২। এ পিচ্ছিল পথে (খেলাফত) যদি আমি দৃঢ় পদে দাঁড়াতে পারি তবে আমাকে অনেক কিছু পরিবর্তন করতে হবে।[১]

১। একথা অস্বীকার করা যাবে না যে, রাসুলের (সঃ) পরে কিছু সংখ্যক লোক নিজেদের অনুমান ও খামখেয়ালীপনার ভিত্তিতে আমল করতে গিয়ে শরিয়তের আদেশ-নিষেধ অমান্য করে দ্বীনে অনেক বিদআত ও বিকৃতির উদ্ভব ঘটায়। অথচ কুরআন ও সুন্নাহ্‌র সুস্পষ্ট আদেশ অমান্য করে নিজের কল্পনা প্রসূত আমল দ্বারা শরিয়তের পরিবর্তন ও বিকৃতি ঘটানোর কোন অধিকার কারো নেই। কুরআনে বিধৃত আছে যে, দু'বার তালাক দেয়ার পরও অন্য কোন লোকের কাছে বিয়ে না দিয়ে স্ত্রীর সাথে পুনরায় দাম্পত্য জীবন যাপন করা যায় (কুরআন, ২ ঃ ২২৯)। কিন্তু খলিফা উমর আদেশ করলেন তিনবার তালাক একই সময়ে বলতে হবে। একইভাবে তিনি উত্তরাধিকারে 'আউল' এর সূত্রপাত করেন এবং জানাজায় চার তকবীরের সূচনা করেন। খলিফা উসমান জুমাআর সালাতে আজান যোগ করলেন, কসর সালাতের পরিবর্তে পূর্ণ সালাতের আদেশ প্রদান করেন এবং ঈদ সালাতের পূর্বে খুৎবা যোগ করে দেন। বস্তুতঃ এহেন শত শত বিদআত, পরিবর্তন ও বিকৃতি এমনভাবে প্রকৃত বিধানের সাথে মিশে গেছে যে, আসল আদেশ-নিষেধ এর মাঝে হারিয়ে গেছে। এ বিষয়ে অধিক জানার জন্য শায়েখ আবুল হুসাইন আমিনি[১২] বিরচিত আল গাদির গ্রন্থের ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৮৩-৩২৫ (উমার কর্তৃক পরিবর্তন); ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৭৪-২৩৬ (আবুবকর কর্তৃক পরিবর্তন); ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৯৮-

২৩৬ (উসমান কর্তৃক পরিবর্তন) এবং সায়েদ আবুল হুসাইন শরাফুদ্দিন[১২০] বিরচিত আন-নাস ওয়াল ইজাতিহাদ গ্রন্থের পৃঃ ৭৬-১৫৪ (আবু বকরের পরিবর্তন); পৃঃ ১৫৫-২৭৬ (উমরের পরিবর্তন); পৃঃ ২৭৭ - ২৮৯ (উসমানের পরিবর্তন) এবং সৈয়দ মুরতাজা আসকারী[২১] বিরচিত মুকাদ্দামা মির আতুল উকুল ১ম ও ২য় খণ্ড দ্রষ্টব্য।

আমিরুল মোমেনিন সঠিক শরিয়তের ধারক ও বাহক হিসাবে সাহাবাদের বিদআতের প্রতিবাদ করেছিলেন। কিন্তু সরকারী ক্ষমতার ছত্রছায়ায় এসব বিদা'ত প্রচলিত হয়ে পড়ে। এ বিষয়ে ইবনে আবিল হাদীদ লিখেছেন,

আমাদের অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে, আমিরুল মোমেনিন শরিয়তের ওপর সুদৃঢ় ছিলেন এবং অন্যান্য সাহাবাদের বিকৃতির ওপর অনেক ভিন্ন মত পোষণ করতেন (হাদীদ[১৫২], ১৯তম খণ্ড, পৃঃ ১৬১)।

যখন আমিরুল মোমেনিন খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন তখন সবদিক হতে বিদ্রোহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠে এবং শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি এসব বিদ্রোহীদের জ্বালাতন হতে মুক্ত হতে পারেননি। ফলে উদ্ভুত বিদা'তগুলোর তিনি মুলোৎপাটন করতে পারেননি। এতে কেন্দ্র হতে দূর দূরান্তরের অঞ্চলগুলোতে বিদা'ত ক্রমেই বেড়ে গেল। বিশেষ করে মুয়াবিয়ার শরিয়তের অজ্ঞতা এবং তার সুবিধার জন্য সে অসংখ্য বিদা'তের সূচনা ও প্রচলন করেছিল। এতদসত্ত্বেও আমিরুল মোমেনিনের কতিপয় অনুচর শরিয়তের আদেশ-নিষেধ আমিরুল মোমেনিনের কাছ থেকে জেনে নিয়ে লিখে রেখেছিলেন বলে প্রকৃত বিষয়গুলি একেবারে হারিয়ে যায়নি এবং বাতিল বিষয়াবলী সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়নি।

২৮৩। দৃঢ় প্রত্যয় সহকারে জেনে রাখো, অদৃষ্ট লিপিতে যা লিখা আছে তার অধিক জীবিকা আল্লাহ্ নির্ধারণ করেন না। যতই উপায় অবলম্বন করা হোক, যতই কঠোর প্রচেষ্টা করা হোক আর যতই কসরত করা হোক না কেন নির্ধারিত জীবিকার বেশী পাবে না। কোন লোকের দুর্বল অবস্থা বা উপায়-উপকরণের অভাব নির্ধারিত জীবিকার পথে অন্তরায় হতে পারে না। যারা এটা অনুধাবন করে এবং সে মতে আমল করে তারাই সব চাইতে আরাম-আয়েশে থাকে; আর যারা এতে সন্দেহ পোষণ করে এবং এর প্রতি অবহেলা করে তারা সকলের চেয়ে বেশী অসুবিধা ভোগ করে। আনুকূল্য প্রাপ্ত ব্যক্তিকে ধীরে ধীরে আনুকূল্যের মাধ্যমে শাস্তির দিকে তাড়িত করা হচ্ছে এবং শাস্তি প্রাপ্ত ব্যক্তিকে শাস্তির মাধ্যমে কল্যাণ করা হচ্ছে। সুতরাং হে শ্রোতৃমণ্ডলী, তোমাদের কৃতজ্ঞতা বর্ধিত কর, লোভ-লালসা কমিয়ে ফেল এবং তোমাদের জীবিকার সীমার মধ্যে তৃপ্ত থাক।

২৮৪। তোমাদের জ্ঞানকে অজ্ঞতায় এবং দৃঢ় প্রত্যয়কে সংশয়ে পরিণত করো না। জ্ঞান লাভ করলে তদানুযায়ী আমল কর এবং দৃঢ় প্রত্যয় অর্জিত হলে তার উপর ভিত্তি করে অগ্রসর হও।

২৮৫। লোভ মানুষকে জলাশয়ের কাছে টেনে নিয়ে যায় কিন্তু পানি পান করা ছাড়াই আবার টেনে ফেরত নিয়ে আসে। লোভ দায়িত্ব গ্রহণ করে কিন্তু তা পরিপূর্ণ করে না। লোভাতুর ব্যক্তি তৃষ্ণা মেটার আগেই অনেক সময় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে পড়ে। কোন কিছু পাবার আকুল আকাঙ্খা যত বেশী হবে তা না পেলে দুঃখও তত বেশী হবে। লোভ-লালসা বোধগম্যতার চক্ষু অন্ধ করে দেয়। যা ভাগ্যে নির্ধারিত আছে তা না চাইলেও পৌঁছে যাবে।

২৮৬। হে আমার আল্লাহ্, আমি তোমার কাছে সেই অবস্থা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করি, যে অবস্থায় মানুষ বাহ্যিকভাবে আমাকে ভাল বলে দেখবে অথচ আমার বাতেন তোমার দরবারে পাপপূর্ণ থাকবে। আমি সেই অবস্থা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করি, যে অবস্থায় একজন রিয়াকার হিসাবে লোক দেখানোর জন্য পাপ হতে নিজকে মুক্ত রাখার কাজ করি অথচ আমার বাতেন সম্পর্কে তুমিই ভাল জান। সেই অবস্থা হতে আশ্রয় চাই যাতে মানুষের কাছে ভাল সেজে থাকি আর তোমার কাছে সব পাপ প্রকাশ পায় এবং এতে করে তোমার বান্দাদের নৈকট্য লাভ করি অথচ তোমার সন্তুষ্টি হতে দূরে সরে থাকি।

২৮৭। আমি তাঁর শপথ করে বলছি, যিনি আমাদেরকে রাতের অন্ধকারের পর দিনের আলোতে অতিক্রম করতে দেন, যে অমুক অমুক[১] বিষয় ঘটেনি।

১। আশ-শরীফ আর-রাজী বিষয়গুলো কি তা উল্লেখ না করে চিরতরে গোপন রেখে গেছেন যা আজ তাঁর জানা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না।

২৮৮। নিয়মিত পালিত ক্ষুদ্র আমল বিরাগপূর্ণ দীর্ঘ আমাল হতে অনেক ভাল ও উপকারী।

২৮৯। যখন ঐচ্ছিক বিষয়াদি অবশ্যকরণীয় বিষয়ের বাধা হয়ে দাড়ায় তখন তা পরিত্যাগ করো।

২৯০। যে কেউ ভ্রমণের দূরত্ব সম্পর্কে সজাগ হয় সে প্রস্তুত থাকে।

২৯১। চোখের প্রত্যক্ষণ প্রকৃত পর্যবেক্ষণ নয় কারণ চোখ অনেক সময় ধোকা দেয়; কিন্তু জ্ঞান যাকে পরামর্শ দেয় তাকে প্রতারণা করে না।

২৯২। সদোপদেশ আর তোমাদের মাঝখানে একটি প্রবঞ্চনার পর্দা রয়েছে।

২৯৩। তোমাদের মধ্যকার অজ্ঞগণ অনেক বেশী পায় আবার শিক্ষিতগণও বঞ্চিত হয়।

২৯৪। যারা ওজর দেখায় জ্ঞান তাদের ওজরকে দূরীভূত করে দেয়।

২৯৫। কারো মৃতবৎ অবস্থা হলে সে কেবল সময় চায়, কিন্তু মৃত্যু থেকে সেরে গেলে ভাল কাজ স্থগিত রাখার নানা ওজর দেখায়।

২৯৬। মানুষ যত কিছুতে বলে থাকে 'কতই না ভাল' তার সব কিছুতেই মন্দ নিহিত আছে।

২৯৭। কেউ একজন অদৃষ্ট সম্পর্কে আমিরুল মোমেনিনকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, "এটা অন্ধকারাচ্ছন্ন পথ এদিকে পা বাড়িয়ো না, এটা গভীর সমুদ্র—এতে ডুব দিয়ো না; এটা আল্লাহ্র বিষয়—এটা জানতে অযথা চেষ্টা করো না।"

২৯৮। আল্লাহ্ যখন কাউকে অবমানিত করতে চান তখন তার কাছ থেকে জ্ঞান তুলে নিয়ে যান।

২৯৯। আমার একজন ইমানী ভাই[১] ছিলেন। আমার দৃষ্টিতে তিনি সম্মানী ব্যক্তি ছিলেন, কারণ তার কাছে দুনিয়া ছিল খুব হীন, তার পেটের তাড়না তাকে নিয়ন্ত্রণ করেনি, সে যা পায়নি তজ্জন্য কোন লালসা করেনি, সে যা পেত তার অধিক যাচনা করেনি; বেশীর ভাগ সময় সে নিশ্চুপ থাকতো, যদি সে কথা বলতো তবে অন্যদের নিশ্চুপ করে দিত, সে প্রশ্নকারীদের তৃষ্ণা মিটিয়ে দিত, সে দুর্বল ও কৃশকায় ছিল কিন্তু জেহাদে সে সিংহের মত ছিল, সিদ্ধান্তমূলক ছাড়া সে কোন যুক্তি দেখাতো না।

ক্ষমাযোগ্য কোন বিষয়ে ওজর না শুনে সে কখনো কাউকে গালি দিত না, বিপদ চলে যাবার পূর্ব পর্যন্ত কাউকে কোন বিপদের কথা বলতো না, সে যা করতে পারতো তাই বলতো, যা করতে পারতো না তা বলতো না, এমনকি কথার চেয়ে বেশী সে নিশ্চুপ থাকতো, কথার চেয়ে নীরবতা রক্ষা করাতে তার বেশী আগ্রহ ছিল, দু'টি জিনিস তার কাছে এলে সে পরখ করে দেখতো কোনটির প্রতি তার হৃদয়ে লালসা বেশী—তখনই সে উহা পরিত্যাগ করতো।

এসব গুণাবলী অর্জন করা তোমাদের দরকার। সুতরাং তোমরা এগুলোতে একে অপরকে অতিক্রম করার চেষ্টা করবে। এমন কি এগুলোর সব ক'টি অর্জন করতে না পারলেও আংশিক অর্জন সম্পূর্ণটুকু পরিত্যাগ অপেক্ষা অনেক ভাল।

১। এ বাণীতে আমিরুল মোমেনিন যে ব্যক্তির গুণাবলীর কথা উল্লেখ করেছেন তার নাম সম্পর্কে টীকাকারকগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন তিনি হলেন আবু-জর-গিফারী। কেউ মনে করেন তিনি হলেন উসমান ইবনে মাজুন আল-জুমাহী, কেউ বলেন মিকদাল ইবনে আসওয়াদ আল-

কিন্দি। এমনও হতে পারে যে, আমিরুল মোমেনিন ইমানী ভ্রাতা বলতে কাউকেই বুঝাননি, কারণ আরবী বাচন ভঙ্গীতে আরবগণ ভাই অথবা সাথী বলে কথা বলতো যদিও তাতে কোন ব্যক্তি বিশেষকে বুঝানো হতো না।

৩০০। আল্লাহ্ যদি শাস্তির জন্য সতর্ক নাও করতেন তবুও তাঁর নেয়ামতের জন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও তাঁর অনুগত হওয়া অবশ্যকর্তব্য হতো।

৩০১। আশআছ ইবনে কায়েসের পুত্রের মৃত্যুতে আমিরুল মোমেনিন তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন ঃ "হে আশআছ যদি তুমি তোমার পুত্রের জন্য শোক প্রকাশ কর তবে নিশ্চয়ই তা রক্তের টানে করা হবে; আর যদি তুমি সবুর কর তবে মনে রেখো, প্রতিটি দুঃখের জন্য আল্লাহ্ তুল্য বিনিময় দিয়ে থাকেন। হে আশআছ, তুমি সবুর করলেও সব কিছুই আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিতভাবে চলবে; কিন্তু সবুরের ক্ষেত্রে তুমি পুরস্কার পাবার যোগ্য হবে। আবার তুমি সবুর না করলেও একইভাবে আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিতভাবে সব কিছু চলবে, কিন্তু সেক্ষেত্রে পুরস্কারের পরিবর্তে তোমাকে পাপের বোঝা বইতে হবে। হে আশআছ, তোমার পুত্র জীবিত থাকতে তোমাকে আনন্দ দিয়েছে কিন্তু তখন সে ছিল তোমার জন্য পরীক্ষা ও দুঃখের কারণ। এখন সে মারা গেছে—এটা তোমাকে শোকাহত করেছে কিন্তু তা তোমার জন্য পুরস্কার ও রহমতের উৎস প্রমাণিত হয়েছে।

৩০২। রাসুলের (সঃ) দাফন শেষে রওজা মোবারকের পাশে দাঁড়িয়ে আমিরুল মোমেনিন বলেন "নিশ্চয়, আপনার অভাব ব্যতীত অন্য সব কিছুতে সবুর করা ভাল এবং আপনার অভাব ব্যতীত অন্য সব কিছুতে ব্যাকুল (অস্থির) হওয়া মন্দ এবং আপনাকে হারানোর যন্ত্রণা অতীত ও ভবিষ্যতের সকল যন্ত্রণা অপেক্ষা তীক্ষ্ম।"

৩০৩। মূর্খের সঙ্গে মেলামেশা করো না কারণ সে তার আমলসমূহ তোমার সামনে সুন্দর করে তুলে ধরবে এবং আশা করবে তুমি যেন তার মত হও।

৩০৪। এক ব্যক্তি পূর্ব ও পশ্চিমের দূরত্ব জানতে চেয়ে আমিরুল মোমেনিনকে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, "সূর্যের অহ্নিকগতির সমান বা সূর্যের এক দিনের ভ্রমণের সমান।"

৩০৫। তোমার বন্ধু হলো ৩ জন আর শত্রু হলো ৩ জন। বন্ধু ৩ জন হলো ঃ তোমার বন্ধু, বন্ধুর বন্ধু এবং শত্রুর শত্রু। আর শত্রু ৩ জন হলোঃ তোমার শত্রু, তোমার বন্ধুর শত্রু এবং তোমার শত্রুর বন্ধু।

৩০৬। এক ব্যক্তিকে তার শত্রুর বিরুদ্ধে অত্যন্ত তৎপর (যা তার নিজের জন্যও ক্ষতিকর) দেখে আমিরুল মোমেনিন বললেন, "তোমার কর্ম তৎপরতা এমন যে, নিজের পেছনে উপবিষ্ট শত্রুকে হত্যা করার জন্য নিজের বক্ষ বিদীর্ণ করে বর্শাবিদ্ধ করার মত।"

৩০৭। শিক্ষা প্রদানের উদ্দিষ্ট ব্যক্তি অনেক কিন্তু শিক্ষা গ্রহণকারীর[১] সংখ্যা অত্যাল্প।

৩০৮। যে বেশী ঝগড়া-বিবাদ করে সে পাপী; যে করে না সে অত্যাচারিত হয়। ঝগড়া-বিবাদকারীর পক্ষে আল্লাহ্‌কে ভয় করা কষ্টকর।

৩০৯। আমি সে ভুলের জন্য উদ্বিগ্ন নই যে ভুলের পর দু'রাকাত সালাত আদায় করে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনার সময় পাই।

৩১০। কেউ একজন আমিরুল মোমেনিনকে জিজ্ঞেস করলো, "এত বিপুল সংখ্যক লোকের হিসাব-নিকাশ আল্লাহ্ কিভাবে নেবেন।" প্রত্যুত্তরে বললেন, "বিপুল সংখ্যক হওয়া সত্ত্বেও যেভাবে তাদের জীবিকার ব্যবস্থা করেছেন।" আবার জিজ্ঞেস করা হলো, "তারা তো আল্লাহ্‌কে দেখতে পায় না সেক্ষেত্রে কিভাবে

তিনি হিসাব-নিকাশ নেবেন।" উত্তরে বললেন, "তিনি অদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও যেভাবে জীবিকার ব্যবস্থা করেন।"

৩১১। তোমার দূত তোমার বুদ্ধিমত্তার ব্যাখ্যাকারক কিন্তু তোমার পত্রের বাগ্মীতা তোমার প্রকৃত অবস্থা প্রকাশে যথেষ্ট।

৩১২। যে ব্যক্তিকে অভাব অনটনে দুর্দশাগ্রস্ত করা হয়েছে সে ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক ইবাদত করার প্রয়োজন নেই যে দুর্দশাগ্রস্ত নয় এবং ইবাদত হতে রেহাই প্রাপ্ত নয়।

৩১৩। মানুষ পৃথিবীর বংশধর এবং মাকে ভালবাসার জন্য কাউকে দোষারোপ করা যায় না।

৩১৪। আল্লাহ্‌র রাসুল হলেন মিসকিন। যে কেউ তাঁকে ফিরিয়ে দেবে সে আল্লাহ্‌কে ফিরিয়ে দেবে। যে তাঁকে দান করবে সে আল্লাহ্‌কে দান করবে।

৩১৫। আত্ম-সম্মানবোধ সম্পন্ন লোক কখনো ব্যভিচার করতে পারে না।

৩১৬। জীবনের নির্ধারিত সময়সীমা সতর্ক থাকার জন্য যথেষ্ট।

৩১৭। মানুষ সন্তানের মৃত্যুতেও ঘুমাতে পারে কিন্তু সম্পদ হারালে ঘুমাতে পারে না।

৩১৮। পিতাদের মধ্যে পারস্পরিক মমত্ববোধ সন্তানদের মধ্যে আত্মীয়তার সৃষ্টি করে। মমত্ববোধ হতে আত্মীয়তা অপেক্ষা আত্মীয়তা হতে মমতা অধিক প্রয়োজনীয়।

৩১৯। ইমানদারদের ধ্যান-ধারণাকে ভয় করো কারণ মহিমান্বিত আল্লাহ্ তাদের কথায় সত্য নিহিত করেছেন।

৩২০। কোন ব্যক্তির বিশ্বাসকে ততক্ষণ পর্যন্ত সত্য বলে ধরে নেয়া যায় না যতক্ষণ তার নিজের যা আছে তদাপেক্ষা আল্লাহ্‌তে যা আছে তৎপ্রতি অধিক বিশ্বাস না করে।

৩২১। আমিরুল মোমেনিন যখন জামাল যুদ্ধের জন্য বসরায় এসেছিলেন তখন তিনি আনাস ইবনে মালিককে তালহা ও জুবায়রের নিকট প্রেরণ করে বলেছিলেন, এ দু'ব্যক্তি সম্পর্কে আনাস রাসুলের (সঃ) নিকট যা শুনেছিল তা যেন তাদেরকে মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু আনাস তা করেনি। সে ফিরে এসে আমিরুল মোমেনিনকে বললো, রাসুল (সঃ) যা বলেছিলেন তা বলতে সে ভুলে গেছে। এতে আমিরুল মোমেনিন বললেন "যদি তুমি মিথ্যা বলে থাক তবে আল্লাহ্ তোমাকে শ্বেতীরোগ দিন যা পাগড়ী দ্বারা ঢাকা না যায়।"[১]

১। এটা সর্বজন স্বীকৃত যে রাসুল (সঃ) একদিন তালহা ও জুবায়রকে বলেছিলেন , "তোমরা দু'জন আলীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে এবং তার সাথে বাড়াবাড়ি করবে।" রাসুলের (সঃ) এ বাণী তালহা ও জুবায়রকে স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য আনাসকে প্রেরণ করা হয়েছিল। কারো কারো মতে রাসুলের (সঃ) যে বাণী তালহা ও জুবায়রকে স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য আনাসকে প্রেরণ করা হয়েছিল তা হলো, "আমি যার মাওলা আলী তার মাওলা। হে আল্লাহ্, আলীকে যে ভালবাসে তুমি তাকে ভালবেসো এবং আলীকে যে ঘৃণা করে তুমি তাকে ঘৃণা করো।" আমিরুল মোমেনিন বললেন, "তুমি নিজেই তো গাদিরে খুমে উপস্থিত ছিলে। তবুও কেন এ কথাটি বললে না।" আনাস উত্তর দিল, "আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি তাই স্মৃতিশক্তি তেমন কাজ করে না"। এতে আমিরুল মোমেনিন তাকে উপরোক্ত অভিশাপ দেন (বালাজুরী[১০০], পৃঃ ১৫৬-১৫৭; রুসতাহ্[১১৯], পৃঃ ২২১; ছাআলিবী[৬০], পৃঃ ১০৫-১০৬; ইসফাহানী[৩২], ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৯৩; হাদীদ[১৫২], ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৭৪; হানাফী[১৫৩], পৃঃ ৫৭৮; কুতায়বাহ[৭৮], পৃঃ ৫৮০)।

৩২২। মানুষের মন (ইবাদতের দিকে) কখনো ঝুঁকে পড়ে আবার কখনো ইবাদতে অনীহা হয়। যখন মন ঝুঁকে পড়ে তখন নফল ইবাদতও করা দরকার। আবার যখন অনীহা এসে যায় তখন শুধু আবশ্যিক ইবাদতে সীমাবদ্ধ থাকা ভাল।

৩২৩। কুরআনে রয়েছে অতীতের খবর, ভবিষ্যতের পূর্বাভাস এবং বর্তমানের জন্য আদেশ।

৩২৪। তোমার কাছে কেউ মন্দ পরামর্শ চাইতে এলে পাথর নিক্ষেপ করো (শয়তানকে যে ভাবে নিক্ষেপ করে) কারণ শয়তানই শুধু শয়তানি কর্ম নিয়ে চিন্তা করে।

৩২৫। আমিরুল মোমেনি তাঁর সচিব উবায়দুল্লাহ্ ইবনে্ রাফিকে বলেন, তোমার দোয়াতে তুলার টুকরা দিয়ে দিয়ো, তোমার কলমের নিব লম্বা রেখো, দু'লাইনের মধ্যে ফাঁক রেখো এবং অক্ষরগুলোর একটা অপরটার সঙ্গে লাগিয়ে দিয়ো কারণ এটাই লেখার সৌন্দর্য।

৩২৬। আমি মোমেনের 'ইয়াসুব' আর সম্পদ দুষ্টদের 'ইয়াসুব'।[১]

১। ২৬২ নং বাণীতে 'ইয়াসুব' শব্দের ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। উহা ছাড়াও আবু লায়লা গিফারী, আবুজর, সালমান, ইবনে আব্বাস ও হুজায়ফা ইবনে ইয়ামান হ'তে একটি হাদীস বর্ণিত আছে যে, রাসুল (সঃ) বলেছেন ঃ

আমার মৃত্যুর পরপরই বিভিন্ন বিষয়ে মতভেদ দেখা দেবে। এ সময় তোমরা আলী ইবনে আবি তালিবকে অনুসরণ করো। কারণ শেষ বিচারের দিন সে হবে প্রথম ব্যক্তি যে আমাকে দেখবে এবং আমার সাথে করমর্দন করবে। সে হলো সাদিক আল-আকবর (সত্যের মাহপূজারী), আমার উম্মতের মধ্যে সে সর্বশ্রেষ্ঠ ফারুক (সত্য-মিথ্যার প্রভেদকারী) এবং সে হলো মোমেনগণের 'ইয়াসুব' আর সম্পদ হলো মোনাফেকগণের 'ইয়াসুব'। (শাফী[১২৬], ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৩৫৮; হিন্দি[১৬৭], ১২শ খণ্ড, পৃঃ ২১৪; ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩৩; হাদীদ[১৫২], ১৩শ খণ্ড, ২২৮; আসাকীর[২৬], ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৭৪-৭৮; শাফী[১৩৩], ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৮০; শাফী[১২৩], পৃঃ ৫৬; কুন্দুজী[৫০], পৃঃ ৬২, ৮২, ২০১, ২৫১)।

৩২৭। কয়েকজন ইহুদী আমিরুল মোমেনিনকে বললো, "তোমাদের নবীকে কবরস্থ করতে না করতেই তোমরা তার সম্পর্কে মতভেদ করেছো। আমিরুল মোমেনিন প্রত্যুত্তরে বললেন, তাঁর সম্পর্কে আমাদের কোন মতদ্বৈধতা নেই। মতদ্বৈধতা সৃষ্টি হয়েছে তাঁর পরে তাঁর উত্তরাধিকার ও স্থলাভিসিক্তের ব্যাপারে। অপরপক্ষে নীলনদ পার হয়ে পায়ের পানি না শুকাতেই তোমরা তোমাদের নবীকে বলেছো, "এদের যেমন ঈশ্বর আছে আমাদের জন্য সেরূপ একটি ঈশ্বর তৈয়ার কর। তিনি বললেন নিশ্চয়ই তোমরা অজ্ঞ লোকের মত আচরণ কর" (কুরআন ৭; ১৩৮)

৩২৮। এক ব্যক্তি আমিরুল মোমেনিনকে বললো, কিসের দ্বারা আপনি আপনার প্রতিপক্ষকে পরাভূত করেন। তিনি বললেন, যখনই আমি শত্রুর মোকাবেলা করি তখন সে নিজেই তার বিরুদ্ধে আমাকে সহায়তা করে।

১। ইহা একটি সুন্দর আরবী বাচনভঙ্গী। শত্রু নিজের বিরুদ্ধে সহায়তা করা হচ্ছে আমিরুল মোমেনিনের মোকাবেলা হলেই তাঁর সুনাম ও খ্যাতির কারণে মনোবল ও দৃঢ়তা হারিয়ে ফেলে। ফলে সে সহজে পরাভূত হয়।

৩২৯। আমিরুল মোমেনিন তাঁর পুত্র মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়াকে বলেছিলেন, "হে আমার পুত্র, আমার ভয় হয় পাছে দারিদ্র তোমাকে পাকড়াও করে কিনা। সুতরাং এর থেকে রক্ষা পাবার জন্য আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করো। কারণ দারিদ্র হলো দ্বীনি ইমানের স্বল্পতা, বুদ্ধির বিহ্বলতা এবং ইহা একগুঁয়ে লোকের ঘৃণার উদ্রেক করে।

৩৩০। এক ব্যক্তি আমিরুল মোমেনিনকে নানা ধরণের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, বুঝার জন্য আমাকে কোন কিছু জিজ্ঞেস করো—সংশয় সৃষ্টির জন্য নয়। মনে রেখো, যে অজ্ঞ ব্যক্তি শিখতে চায় সে শিক্ষিত লোকের মত। অপরপক্ষে যে শিক্ষিত ব্যক্তি সংশয় সৃষ্টি করতে চায় সে অজ্ঞের চেয়েও অধম।

৩৩১। একবার আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস আমিরুল মোমেনিনের অভিমতের বিরুদ্ধে তাঁকে উপদেশ দিলে তিনি বললেন, "তুমি শুধু আমাকে উপদেশ দিতে পার আমি ভেবে দেখবো কি করা যায়। যদি আমি তোমার উপদেশ অনুযায়ী কাজ না করি তবে তোমার উচিত হবে আমাকে অনুসরণ করা।

৩৩২। সিফফিন হতে কুফায় ফেরার পথে আমিরুল মোমেনিন যখন শিবাম গোত্রের এলাকা দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন সিফফিনে নিহতদের জন্য নারীর ক্রন্দন শুনতে পেলেন। এ সময় শিবাম গোত্রের নেতা হারব ইবনে সুরাহ্বিল আশ-শিবামী আমিরুল মোমেনিনের কাছে এলে তিনি বললেন, "তোমাদের নারীরা কি তোমাদের নিয়ন্ত্রণ করে? এভাবে চিৎকার করা হতে তোমরা কি তাদের নিবৃত্ত কর না?" আমিরুল মোমেনিন ঘোড়ায় সওয়ার ছিলেন। হারব তাঁর সাথে হাটতেছিল। আমিরুল মোমেনিন বললেন, "তুমি ফিরে যাও; কারণ তোমার মত লোক আমার মত লোকের সঙ্গে হাঁটলে এটা শাসকের জন্য অমঙ্গল আর ইমানদারের জন্য অমর্যাদাকর।

৩৩৩। নাহরাওয়ানের যুদ্ধের পর আমিরুল মোমেনিন খারিজীদের মৃতদেহের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন তিনি বললেন "তোমাদের ওপর আল্লাহ্র লানত, তোমরা সেলোক দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছো যে তোমাদের প্রতারণা করেছে"। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, "হে আমিরুল মোমেনিন, "কে তাদের প্রতারণা করেছে?" তিনি বললেন, "শয়তান সেই প্রতারক। তাদের রিপু তাদেরকে কুপথে পরিচালনা করে কামনা-বাসনার মাধ্যমে এবং পাপে নিমজ্জিত হওয়াকে সহজ করে দেয়; তাদেরকে বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দেয় কিন্তু পরিণামে আগুনে নিক্ষেপ করে"।

৩৩৪। একাকীত্বে আল্লাহ্র অবাধ্য হওয়া সম্পর্কে সাবধান থেকো; কারণ যিনি একাকীত্বের সাক্ষী তিনিই বিচারক।

৩৩৫। যখন মুহাম্মদ ইবনে আবি বকরের[১] নিহত হওয়ার সংবাদ আমিরুল মোমেনিনের কাছে পৌঁছলো তখন তিনি বললেন, "তার মৃত্যুতে শত্রুরা যতটুকু আনন্দিত হয়েছে আমরা তার বহুগুণ বেশী শোকাহত হয়েছি। তাদের একজন শত্রু চলে গেল আর আমরা একজন বিশেষ বন্ধু হারালাম।

১। ৩৮ হিঃ সনে মুয়াবিয়া বিশাল বাহিনীসহ অমর ইবনে আল-আসকে মিশরে প্রেরণ করেছিল। ইবনুল আস তাকে সহায়তা করার জন্য মুয়াবিয়া ইবনে হুদায়েজকে আহ্বান করেছিল। তারা মিলিতভাবে মুহাম্মদ ইবনে আবি বকরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল। যুদ্ধে মুহাম্মদ ইবনে আবি বকর নিহত হলেন। মুয়াবিয়া ইবনে হুদায়েজ তাঁর মৃতদেহ একটি মৃত গাধার পেটে ঢুকিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছিল। তখন মুহাম্মদের বয়স ছিল ২৮ বছর। বর্ণিত আছে যে, মুহাম্মদের নিহত হবার খবর যখন তাঁর মায়ের কাছে পৌঁছলো তখন তিনি ক্ষোভে-দুঃখে পাগল প্রায় হয়ে গিয়েছিলেন। মুহাম্মদের বৈমাত্রেয় বোন আয়শা তাঁর দুঃখে জীবতকালে আর কখনো মাংশ খাননি। তিনি (আয়শা) মুয়াবিয়া ইবনে আবি সুফিয়ান, আমর ইবনুল আস ও মুয়াবিয়া ইবনে হুদায়েজকে প্রতি ওয়াক্ত নামাজের পর অভিশাপ দিতেন।

মুহাম্মদের মৃত্যুতে আমিরুল মোমেনিন অত্যন্ত শোকাহত হয়েছিলেন। বসরায় অবস্থানকারী ইবনে আব্বাসকে অত্যন্ত শোকময় ভাষায় তিনি পত্র লিখেছিলেন। ইবেন আব্বাস আমিরুল মোমেনিনকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য কুফায় চলে এসেছিলেন। আমিরুল মোমেনিনের একজন গুপ্তচর সিরিয়া হতে ফিরে এসে বললো, "হে আমিরুল

মোমেনিন, মুয়াবিয়া যখন মুহাম্মদের মৃত্যু সংবাদ শুনতে পেয়েছে তখন সে মিনারে গিয়ে হত্যাকারীদের অনেক প্রশংসা করেছে এবং সিরিয়ার লোকেরা এত বেশী আনন্দ উল্লাসে ফেটে পড়েছে যা এর আগে কখনো দেখা যায়নি। একথা শুনে আমিরুল মোমেনিন উপরোক্ত মন্তব্য করেন। মুহাম্মদ ইবনে আবি বকর সম্পর্কে আমিরুল মোমেনিনের অনেক বাণী ৬৭ নং খুৎবায় বর্ণনা করা হয়েছে (তাবারী[৭৫], ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৪০০-৩৪১৪; আছীর[২], ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৫২-৩৫৯; কাছীর[৩৯], ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৩১৩-৩১৭; ফিদা[৮৯], ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৭৯; হাদীদ[১৫২], ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৮২-১০০; খালদুন[৫৪], ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৮১-১৮২৭; বার[৯৭], ৩য় খণ্ড, পৃঃ১৩৬৬-১৩৬৭; হাজর[১৫০], পৃঃ ৪৭২-৪৭৩; ছাকাফী[৬১], ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৭৬-৩২২; বাকরী[৯০], ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৩৮-২৩৯)।

৩৩৬। ষাট বছর বয়স পর্যন্ত আল্লাহ্ মানুষের ওজর গ্রহণ করেন।

৩৩৭। পাপ যাকে পরাভূত করেছে সে বিজয়ী নয় এবং পাপের মাধ্যমে বিজয় অর্জন করা প্রকৃতপক্ষে পরাভূত হওয়া।

৩৩৮। আল্লাহ্ দুঃখীজনের জীবিকা ধনীদের সম্পদের মাঝে রেখেছেন। ফলে, যখন কোন অভাবগ্রস্তলোক উপোস থাকে তখন বুঝতে হবে কোন ধনী ব্যক্তি তার সম্পদে অভাবগ্রস্ত লোকটির হিস্যা অস্বীকার করেছে। মহিমান্বিত আল্লাহ্ ধনী লোকদের এজন্য একদিন জিজ্ঞেস করবেন।

৩৩৯। দায়িত্ব পালনে সত্য-সঠিক ওজর দেখানো অপেক্ষা ওজর না দেখানোর অবস্থা অনেক ভাল।

৩৪০। তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র ন্যূনতম অধিকার হলো তোমরা তাঁর নেয়ামতকে পাপ কাজে ব্যবহার করবে না।

৩৪১। কোন অসমর্থ ব্যক্তি যখন মহিমান্বিত আল্লাহ্র আনুগত্যের আমলসমূহ করতে না পারে তখন এটা পালন করা বুদ্ধিমানের একটা ভাল সুযোগ।

৩৪২। এ পৃথিবীতে আল্লাহ্র প্রহরীগণই সার্বভৌম।

৩৪৩। সে ব্যক্তি ইমানদার যার মুখমণ্ডল আনন্দোৎফুল্ল, হৃদয় দুঃখ ভারাক্রান্ত, প্রশস্ত বক্ষ (উদারতা পূর্ণ) এবং বিনয়াবনত মন। সে উচ্চ মর্যদাকে ঘৃণা করে এবং সুনাম পছন্দ করে না। তার শোক স্থায়ী, তার সাহস সুদূর প্রসারী, তার নীরবতা অধিক, অধিক সময় সে ব্যস্ত (আল্লাহ্র কাজে)। সে কৃতজ্ঞ, সহিষ্ণু, চিন্তায় মগ্ন, বন্ধুত্বে সংযমী, আচরণে মধুর ও মেজাজে কোমল। সে পাথরের চেয়ে শক্ত কিন্তু ক্রীতদাস অপেক্ষাও বিনয়ী।

৩৪৪। যদি কোন ব্যক্তি জীবনের শেষ এবং তার শেষভাগ্য দেখতে পায় তখন সে কামনা-বাসনা ও এর বঞ্চনাকে ঘৃণা করতে শুরু করে।

৩৪৫। প্রত্যেক ব্যক্তির সম্পদে দু'ধরণের অংশীদার রয়েছে—উত্তরাধিকারী ও আকস্মিক।

৩৪৬। কোন ব্যক্তিকে কোন বিষয়ে অনুরোধ করা হলে যে পর্যন্ত সে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ না হয় সে পর্যন্ত ঐ বিষয়ে সে মুক্ত।

৩৪৭। যে ব্যক্তি প্রার্থনা করে অথচ তাতে গভীর মনোনিবেশ করে না সে ঐ ব্যক্তির মত যে ছিলাবিহীন ধনুকে শর যোজনা করে।

৩৪৮। জ্ঞান দু'রকমের—আত্মভূত জ্ঞান ও শ্রুত-জ্ঞান। শ্রুত জ্ঞান আত্মভূত না হলে কোন উপকারে আসে না।

৩৪৯। সিদ্ধান্তের সঠিকতা কর্তৃত্বের ওপর নির্ভরশীল। কর্তৃত্ব থাকলে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা থাকে। কর্তৃত্ব না থাকলে সিদ্ধান্ত নেয়া যায় না।

৩৫০। দুঃস্থের শোভা হলো সততা আর ধনীর শোভা হলো কৃতজ্ঞতা।

৩৫১। অত্যাচারীর বিচারের দিন এত কঠিন হবে যা তার অত্যাচার অপেক্ষা অনেক অনেক বেশী।

৩৫২। অন্যের কি আছে সে দিকে নজর না দেয়াই বড় সম্পদ।

৩৫৩। কথা হতে হবে সংযত এবং আমল হতে হবে পরীক্ষিত। "প্রত্যেক আত্মা যা অর্জন করে সেজন্য দায়বদ্ধ" (কুরআন, ৭৪; ৩৮)। শারীরিকভাবে মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং মানসিকভাবে দ্বান্দ্বিক করা হয়েছে, তাদের ছাড়া যাদের আল্লাহ্ রক্ষা করেন। তাদের মধ্যে যারা প্রশ্ন করে তারা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে এবং যারা জবাব দেয় তারা বিপন্ন হয়ে পড়ে। এটা এজন্য সম্ভব হয় যে, তাদের মধ্যে যে ব্যক্তির অভিমত উৎকৃষ্ট সে তার স্বচ্ছ চিন্তা-চেতনা হতে আনন্দে হোক আর নিরানন্দে হোক সরে পড়ে। এটা সম্ভব এজন্য যে, তাদের মধ্যে সব চাইতে জ্ঞানী ব্যক্তিটি এক নজরেই প্রভাবান্বিত হতে পারে এবং একটি কথাতেই সে ভাল মানুষে রূপান্তরিত হতে পারে।

৩৫৪। হে জনমণ্ডলী, আল্লাহ্কে ভয় কর। কারণ এমন অনেক লোক আছে যাদের অনেক আকাঙ্খা পূর্ণ হয় নি, অনেকে দালানকোঠা করেছে যাতে তারা বাস করতে পারেনি। অনেকে সম্পদ স্তূপীকৃত করেছে যা তাদের ফেলে যেতে হয়েছে। সম্ভবতঃ সে ন্যায়কে পদাবনত করে অন্যায় পথ অবলম্বন পূর্বক এ সম্পদ সংগ্রহ করেছে। অবৈধভাবে অর্জিত এ সম্পদের পাপের ভার তাকে একাই বহন করতে হবে। ফলে এ পাপের ভার নিয়ে সে পৃথিবী হতে বিদায় নিয়ে লজ্জা-শোক সম্বল করে আল্লাহ্র সম্মুখে হাজির হতে হবে। "সে ইহকাল পরকাল উভয়দিকে নষ্ট করেছে—এটা একটা প্রকাশ্য ক্ষতি" (কুরআন, ২২ ঃ ১১)।

৩৫৫। পাপে জড়িয়ে পড়ার সুযোগ না থাকা এক প্রকার সততা।

৩৫৬। তোমার মুখমন্ডলে প্রকাশিত মর্যাদা প্রকৃত, কিন্তু ভিক্ষাবৃত্তি তা নষ্ট করে দেয়। সুতরাং সাবধানে চিন্তা করে দেখো কার কাছে তুমি সে মর্যাদা নষ্ট করবে।

৩৫৭। যতটুকু প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য তার অধিক প্রশংসা করাই মোসাহেবি আর যতটুকু প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য তার কম করা হয় প্রকাশ ক্ষমতার অভাব না হয় শত্রুতা বশতঃ।

৩৫৮। সব চাইতে বড় পাপ হল সেটি যেটি করে পাপী তা নগণ্য মনে করে।

৩৫৯। যে ব্যক্তি নিজের দোষত্রুটির প্রতি লক্ষ্য রাখে সে অন্যের দোষত্রুটি খুঁজে বেড়ায় না। আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবিকায় যে সন্তুষ্ট থাকে সে যা পায়নি সেজন্য দুঃখ করে না। যে বিদ্রোহের জন্য তরবারি বের করে সে তরবারিতেই মারা যায়। যে সহায় সম্বল ছাড়া সংগ্রাম করে সে ধ্বংস হয়ে যায়। যে গভীরে প্রবেশ করে সে ডুবে থাকে। যে কুখ্যাত স্থানে যায় তার বদনাম হয়।

যে বেশী কথা বলে সে বেশী ভুল করে। যে বেশী ভুল করে সে নির্লজ্জ হয়ে পড়ে। যে নির্লজ্জ হয় সে আল্লাহ্কে কম ভয় করে। যে আল্লাহ্কে কম ভয় করে তার হৃদয় মরে যায়। যার হৃদয় মৃত সে আগুনে প্রবেশ করে। যে অন্যের দোষত্রুটি দেখেও নিজেই তা করে থাকে নিঃসন্দেহে সে মূর্খ। তৃপ্তি একটা পুঁজি যা ক্রমান্বয়ে হ্রাস (অবচয়) হয় না। যে ব্যক্তি মৃত্যুকে স্মরণ করে সে এ পৃথিবীতে অল্পে তুষ্ট থাকে। যে ব্যক্তি জানে যে, তার কথা তার আমলের একটা অংশ সে বিশেষ লক্ষ্য ছাড়া কথা বলে না।

৩৬০। অত্যাচারী তিন ধরনের পাপ করে—জ্যেষ্ঠদের অমান্য করে অত্যাচার, কনিষ্ঠদের ওপর কর্তৃত্ব আরোপ করে অত্যাচার এবং অন্য অত্যাচারীদের প্রতি সমর্থন দিয়ে অত্যাচার।

৩৬১। অভাব চরম হলে ত্রাণ আসে, শান্তি চরম হলে আরাম আসে।

৩৬২। আমিরুল মোমেনিন তাঁর এক অনুচরকে বলেছেন যে, তোমার স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের জন্য তোমার সীমিত সময়ের বেশীরভাগ ব্যয় করো না। কারণ তারা যদি আল্লাহ্ প্রেমিক হয়ে থাকে তবে আল্লাহ্ কখনো তাঁর প্রেমিকদের অযত্নে রাখেন না। আর তারা যদি আল্লাহ্র শত্রু হয়ে থাকে তবে আল্লাহ্র শত্রুদের জন্য উদ্বিগ্ন ও ব্যস্ত থাকা তোমার উচিত হবে না।

৩৬৩। তোমার মধ্যে যে সব দোষত্রুটি রয়েছে তা সব চাইতে বড় দোষত্রুটি মনে করো।

৩৬৪। এক ব্যক্তির পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করলে অন্য এক ব্যক্তি আমিরুল মোমেনিনের সামনে ঐ ব্যক্তিকে অভিনন্দন জানিয়ে বললো, "একজন ঘোড়-সওয়ার পাওয়াতে তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।" এতে আমিরুল মোমেনিন বললেন, "এরূপ কথা বলো না; বলো পরমদাতা আল্লাহ্‌র কাছে তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উপলক্ষ হয়েছে এবং আল্লাহ্ তোমাকে যা দিয়েছেন তাতে আশীবার্দ পুষ্ট হও। সে পরিপূর্ণ জীবন লাভ করুক এবং তার পূণ্য কাজে আল্লাহ্ তোমাকে আশীবার্দ পুষ্ট করুন।"

৩৬৫। আমিরুল মোমেনিনের একজন আফিসার একটি রাজকীয় বাড়ী নির্মাণ করেছিল। এতে আমিরুল মোমেনিন বললেন, "এটা হলো রূপার মুদ্রার মত যা নিজের মুখ প্রকাশ করে। নিশ্চয়ই, এ বাড়ী হতে তোমার কুক্ষিগত সম্পদ সম্পর্কে ধারণা করা যায়।"

৩৬৬। একব্যক্তি আমিরুল মোমেনিনকে জিজ্ঞেস করলো, "যদি কোন লোককে ঘরে আটক করে দরজা বন্ধ করে দেয়া হয় তবে সে কোথা হতে জীবিকা পাবে।" আমিরুল মোমেনিন বললেন, "বদ্ধ ঘরে যেখান থেকে যে উপায়ে মৃত্যু তার কাছে পৌঁছে।"

৩৬৭। এক ব্যক্তির মৃত্যুতে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে আমিরুল মোমেনিন বললেন, "এ বিষয়টি (মৃত্যু) তোমার লোকটি হতে শুরুও হয়নি শেষও হয়নি। তোমার লোকটি পূর্বেই পরিভ্রমণ শুরু করেছে, কাজেই এখনো সে পরিভ্রমণে আছে একথা ভাবাই উত্তম। হয় সে পুনরায় তোমাদের মাঝে যোগ দেবে, না হয় তোমরা গিয়ে তার সঙ্গে যোগ দবে।

৩৬৮। হে লোক সকল, তোমাদের দুঃখের সময় তোমরা যেভাবে আল্লাহ্‌কে ভয় কর সুখের সময়ও তোমরা সেভাবে ভয় কর এটা তিনি দেখতে চান। নিশ্চয়ই, যাকে জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দেয়া হয়েছে সে যদি এটাকে ধীর-শাস্তি মনে না করে নিজকে নিরাপদ মনে করে তবে সে প্রতিশ্রুত পুরস্কার হতে বঞ্চিত হবে।

৩৬৯। হে কামনা-বাসনার দাস, কামনা-বাসনা পরিত্যাগ কর। যে এতে নিজকে বিলীন করে দিয়েছে সে দুঃখ-বেদনা ছাড়া কিছুই পায় না। হে জনমন্ডলী, নিজেদের প্রশিক্ষণ নিজেরা গ্রহণ কর এবং তোমাদের স্বাভাবিক অনুরাগের (দুনিয়ার প্রতি) নির্দেশনা হতে মুখ ফিরিয়ে নাও।

৩৭০। কোন লোকের কথায় সামান্যতম মঙ্গল নিহিত থাকলেও উহাকে মন্দ কথা মনে করো না।

৩৭১। মহিমান্বিত আল্লাহ্‌র নিকট কিছু চাইতে হলে তোমরা প্রথমে রাসুল (সঃ) ও তাঁর আহলুল বাইতের প্রতি দরুদ ও সালাম পেশ করো, তৎপর যা যাচনা করার তা করো। কারণ পরম দয়ালু আল্লাহ্ দু'টি অনুরোধের মধ্যে যেটি রাসুল (সঃ) ও তাঁর আহলুল বাইতের প্রতি দরুদ ও সালাম সংলাগকৃত সেটি রক্ষা করেন এবং অন্য সব যাচনা বাতিল করে দেন।

৩৭২। যে ব্যক্তি অন্যের সুখ্যাতিতে ঈর্ষান্বিত তার উচিত ঝগড়া-বিবাদ হতে বিরত থাকা।

৩৭৩। কোন বিষয়ে যথাযথ সময়ের পূর্বে তড়িঘড়ি করা এবং যথাযথ সুযোগ উপেক্ষা করে বিলম্ব করা বোকামি ছাড়া কিছুই নয়।

৩৭৪। যা ঘটতে পারে না সে বিষয় জিজ্ঞেস করে সময় নষ্ট করো না, কারণ যা ঘটেছে তা নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকার যথেষ্ট সুযোগ আছে।

৩৭৫। কল্পনা একটি স্বচ্ছ আয়না এবং পারিপার্শ্বিক সবকিছু হতে শিক্ষা গ্রহণ করলে উপদেশ পাবে ও সতর্ক হতে পারবে। নিজের উন্নতি সাধনের জন্য এটাই যথেষ্ট যে, অন্যের মধ্যে যে সব মন্দ দেখতে পাও তা নিজের মধ্য হতে দূর করে দাও।

৩৭৬। জ্ঞান আমলের সহিত সম্পৃক্ত। সুতরাং যে জ্ঞানী তাকে আমল করতে হবে। জ্ঞানের সঙ্গে আমল না করলে জ্ঞান বিদূরিত হয়ে পড়ে।

৩৭৭। হে মানুষ, এ দুনিয়ার সম্পদ উচ্ছিষ্টের মত যা মহামারির সৃষ্টি করে। সুতরাং এ চারণ ভূমি হতে দূরে সরে থাক। এতে শান্তিতে থাকা অপেক্ষা এটাকে ত্যাগ করা অনেক ভাল এবং এর সম্পদরাজী অপেক্ষা পারিতোষিক অংশ অনেক বেশী সুখকর।

এখানে যারা সম্পদশালী পরকালে তারা হবে দুর্দশাগ্রস্ত। তাদের জন্যই রয়েছে পরকালের সুখ-শান্তি যারা দুনিয়া থেকে দুরে সরে থাকতে পেরেছে। এর চাকচিক্যে কোন লোক আকৃষ্ট হলে তার দু'চোখ ধেঁধে যায়। যদি কেউ এর প্রতি আগ্রাহান্বিত হয়ে পড়ে তবে তার হৃদয় দুঃখপূর্ণ হয় এবং ক্রমেই কালিমালিপ্ত হয়ে পড়ে। এর কিছু তাকে উদ্বিগ্ন করে আর কিছু তাকে বেদনা দেয়। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত সে এ অবস্থায় থাকে। সে শূন্যে নিক্ষিপ্ত হয় এবং তার হৃদয়ের ঔজ্জ্বল্য বিনষ্ট হয়ে পড়ে। তার মৃত্যু ঘটানো ও তার সহচরগণ দ্বারা তাকে কবরে শায়িত করা আল্লাহ্র পক্ষে বড় সহজ কাজ।

মোমেনগণ এ দুনিয়াকে এমন চোখে দেখে যাতে শিক্ষা গ্রহণ করা যায় এবং নিতান্ত প্রয়োজন পরিমাণ খাদ্য এ দুনিয়া হতে গ্রহণ করে। সে ঘৃণা আর শত্রুতার কান দিয়ে দুনিয়ার কথা শুনে। কারো সম্পর্কে যদি বলা হয় যে, সে ধনী হয়ে গেছে তখন একথা বলা যায় সে দুর্দশাগ্রস্ত হয়েছে। জীবনে যে আনন্দে কাটায় মৃত্যুতে সে শোকাভিভূত হয়। যদিও সে দিনটি এখনো আসেনি যেদিন তারা দারুণভাবে হতাশাগ্রস্ত হবে তবুও প্রকৃত অবস্থা এমনই।

৩৭৮। মহিমান্বিত আল্লাহ্ আনুগত্যের জন্য পুরস্কার আর পাপের জন্য শাস্তি নির্ধারণ করেছেন যেন মানুষ শাস্তি হতে রক্ষা পেতে পারে এবং বেহেশতে যেতে পারে।

৩৭৯। এমন সময় আসবে যখন লেখা ছাড়া কুরআনের আর কিছুই থাকবে না; নাম ছাড়া ইসলামের আর কিছুই থাকবে না। সে সময় মানুষ মসজিদগুলোকে বড় বড় ইমারতে পরিণত করায় ব্যস্ত থাকবে, কিন্তু তাতে কোন হেদায়েত থাকবে না। যারা এর মধ্যে থাকবে এবং যারা এতে যাবে তারা পৃথিবীতে নিকৃষ্টতম হবে। তাদের থেকে ফেতনা ছড়িয়ে পড়বে এবং সকল বিভ্রান্তি তাদের দিকেই ফিরে যাবে। যদি কেউ তাদের থেকে দূরে সরে থাকে তবে তাকে টেনে নিয়ে আসবে এবং যদি কেউ তাদের থেকে ফিরে যায় তবে তাকে ধাক্কা দিয়ে পুনরায় সামিল করা হবে। হাদীসে কুদসীতে মহিমান্বিত আল্লাহ্ বলেন, "আমি আমার সত্তার শপথ করে বলছি, এমন অমঙ্গল আমি তাদের ওপর আপতিত করবো যাতে ধৈর্যশীলগণও হতভম্ব হয়ে যাবে।" অবহেলার মাধ্যমে এহেনভাবে পতন হতে রক্ষা পাবার জন্য আমরা আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি।

[এহেন একটি হাদীস দীর্ঘদিন পূর্বে পড়েছিলাম। রাসুল (সঃ) বলেছেন, ইয়াতি জমানুন আলা উম্মাতি লা ইয়াবকা মিনাল ইমানি ইল্লা ইসমি; ওয়া ইয়াবকা মিনাল কুরআনি ইল্লা রাছমুহু; মাছাজিদুহুম ইমারাতুন ওয়া ইয়া খারাবুন মিনাল হুদা; উলমাও সাররুন তাহাতা আর্দিমুস সামা।" (হাদীসটির সূত্র উল্লেখ করা গেল না এবং আরবী ভাষা না জানার কারণে উচ্চারণ লিখায় ভুল থাকতে পারে-সে জন্য ক্ষমাপ্রার্থী) হাদীসটির অর্থ হলোঃ

আমার উম্মতের ওপর এমন এক সময় আসবে যখন নামমাত্র ছাড়া ইমানের আর কিছুই থাকবে না; শুধুমাত্র রুসুম (দেশাচার) হিসাবে কুরআন থাকবে; মসজিদ হবে বড় বড় ইমারত এবং এর ভেতরে হেদায়েত ব্যতীত সকল মন্দ বিষয় থাকবে; আসমান ও জমিনের মধ্যে আলেমগণ নিকৃষ্টতম হবে — বাংলা অনুবাদক।]

৩৮০। বর্ণিত আছে যে, আমিরুল মোমেনিন সর্বদা মেরাবে উঠেই খোৎবা প্রদানের পূর্বে এ বাণী প্রদান করতেনঃ হে জনমন্ডলী, আল্লাহ্কে ভয় কর। মানুষকে তিনি অকারণে সৃষ্টি করেননি যে, সে নিজকে যেনতেন ভাবে

কাটিয়ে দেবে। তিনি মানুষকে এমন অযত্ন-রক্ষিত রাখেনি যে, সে কান্ডজ্ঞানহীন বাজে কাজ করে যাবে। এ দুনিয়া তার কাছে যতই মনোমুগ্ধকর মনে হোক না কেন তা কখনো পরকালের স্থানাপন্ন হতে পারে না। সাহসিকতার মাধ্যমে যে এ জগতে কৃতকার্য হয়েছে সে পরকালের কৃতকার্যতার তুলনায় সামান্যতমও অর্জন করতে পারেনি।

৩৮১। ইসলামের চেয়ে উচ্চ মর্যদাশালী আর কিছু নেই; আল্লাহ্‌র ভয়ের চেয়ে সম্মানজনক আর কিছু নেই; আত্ম সংযম অপেক্ষা বড় আশ্রয় আর কিছু নেই; তওবার চেয়ে বড় উকিল আর কিছু নেই; তৃপ্তির চেয়ে বড় মূল্যবান সম্পদ আর কিছু নেই; ন্যূনতম জীবনোপকরণে তৃপ্ত হওয়ার চেয়ে বড় দুঃখনাশক আর কিছু নেই। কামনা-বাসনা হলো দুঃখের চাবিকাঠি এবং দুর্দশার বাহন। লোভ, অহংকার আর ঈর্ষা হলো পাপের পথের আলো এবং ফেতনাবাজি হলো সব চাইতে বড় কুঅভ্যাস।

৩৮২। জাবির ইবনে আবদিল্লাহ্ আল-আনসারীকে আমিরুল মোমেনিন বলেছিলেন ঃ হে জাবির, দ্বীন ও দুনিয়ার রজ্জু হলো চার ব্যক্তি; যে পণ্ডিত ব্যক্তি বিবেক বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ করে; যে অজ্ঞ শিক্ষা গ্রহণ করতে লজ্জাবোধ করে না; যে উদার ব্যক্তি কৃপণতা প্রদর্শন করে না এবং যে দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তি জাগতিক সুবিধা অর্জনের জন্য পরকালকে বিক্রি করে দেয় না। একইভাবে, যখন জ্ঞানী তার বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ করে না; অজ্ঞ শিক্ষা গ্রহণ করতে লজ্জাবোধ করে; উদার ব্যক্তি কৃপণতা প্রদর্শন করে এবং দুর্দশাগ্রস্তগণ ইহকালের জন্য পরকালকে বিক্রি করে তখন তারা দুনিয়ার রজ্জু হয়ে পড়ে।

হে জাবির, যেখানে মানুষের ওপর আল্লাহ্‌র নেয়ামত অপরিসীম সেখানে তাঁর প্রতি মানুষের বাধ্যতা অপরিসীম হওয়া বাঞ্ছনীয়। সুতরাং আল্লাহ্‌র প্রতি যারা দায়িত্ব পরিপূর্ণ করে তাদের প্রতি আল্লাহ্‌র নেয়ামত অব্যাহত থাকে এবং তাঁর রহমত স্থায়ীত্ব লাভ করে। আর যারা এ দায়িত্ব পালন করে না তারা ধ্বংস হয়ে যায়।

৩৮৩। ইবনে আবি লায়লা হতে বর্ণিত আছে যে, সিরিয়ানদের সাথে যুদ্ধের সময় আমিরুল মোমেনিন বলেছেন ঃ হে ইমানদারগণ, তোমরা যে কেউ বাড়াবাড়ি ও মানুষকে পাপের দিকে আহ্বান করতে দেখতে পাও এবং আন্তরিকভাবে এহেন কাজকে বাতিল করে দাও তারা এ অপরাধের দায় দায়িত্ব হতে মুক্ত; আর যারা কথার দ্বারা বাতিল করে দেয় সে পুরস্কৃত হবে এবং পূর্ববর্তী ব্যক্তি অপেক্ষা সে অধিক মর্যদাশীল ; আর যে আল্লাহ্‌র বাণীকে উর্দ্ধে তুলে ধরা ও অত্যাচারীর কথা তরবারির সাহায্যে বাতিল করে দেয় সে হেদায়েতের পথের সন্ধান পায় এবং ন্যায় পথে প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং তার হৃদয় দৃঢ় প্রত্যয়ের নূরে আলোকিত থাকে (তাবারী[৭৫], ২য় খণ্ড, পৃঃ ১০৮৬; আছীর[২], ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৪৭৮)।

৩৮৪। উপরোক্ত বাণীটি অন্যভাবে বর্ণিত আছে যে, সুতরাং মুসলিম উম্মাহ্‌র মধ্যে যারা পাপাচার আর মিথ্যাকে হাত, মুখ ও হৃদয় দ্বারা বাতিল করে দেয় তারা যথার্থভাবেই ধার্মিকতায় অভ্যস্ত হয়েছে। যারা শুধু মুখ আর হৃদয় দ্বারা পাপকে বাতিল করে তারা দু'টি ধার্মিকতায় অভ্যস্থ হয়েছে, একটি বাদ পড়েছে। যারা শুধু অন্তর দ্বারা পাপকে বাতিল করেছে তারা একটি সদগুণ অর্জন করেছে অপর দু'টি হতে বঞ্চিত হয়েছে। আর যারা পাপকে বাতিল করেনি তারা জীবিতদের মধ্যে মৃতের মতই।

মোত্তাকীদের সকল কাজ, এমন কি জিহাদও ন্যায়ের প্রতিপালনের জন্য, প্রলুব্ধকরণও পাপের প্রতিরোধের তুলনায় সমুদ্রে এক ফোটা থুথু ফেলার মত। কাউকে পূণ্যের প্রতি প্রলুব্ধ করলে এবং পাপ হতে বিরত থাকার জন্য বাধা সৃষ্টি করলে মৃত্যু (নির্ধারিত সময় অপেক্ষা) এগিয়ে আসে না অথবা ইহাতে জীবিকাও কমে যায় না। এসব কিছু অপেক্ষা স্বৈরাচারী শাসকের সামনে একটি ন্যায় কথা বলা অনেক ভাল।

৩৮৫। আবু জুহায়ফাহ্ হতে বর্ণিত আছে যে, আমিরুল মোমেনিনকে তিনি বলতে শুনেছেন ঃ

অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রথমেই তোমাদেরকে হস্তদ্বারা জেহাদ করতে হবে, তাতে পরাভূত হলে কথার দ্বারা জিহাদ করবে, তাতেও পরাভূত হলে হৃদয় দ্বারা জিহাদ করবে। ফলে যে ব্যক্তি অন্তর দ্বারা ধর্মকে স্বীকার করে না অথবা পাপকে বাতিল করে না তার ওপরের দিক নীচের দিকে এবং নীচের দিক ওপরের দিকে করা হবে।

৩৮৬। নিশ্চয়ই, ন্যায় ভারী ও সম্পূর্ণ এবং অন্যায় হালকা ও মহামারী স্বরূপ।

৩৮৭। সমগ্র জনগোষ্ঠির সর্বোৎকৃষ্ট ব্যক্তি সম্পর্কেও আল্লাহ্র শাস্তি হতে নিরাপদ মনে করো না, কারণ মহিমান্বিত আল্লাহ্ বলেন, "ক্ষতিগ্রস্তগণ ছাড়া আর কেউ আল্লাহ্র পরিকল্পনা হতে নিজকে নিরাপত্তা প্রাপ্ত মনে করে না" (কুরআন— ৭ঃ ৯৯)। আবার, জনগোষ্ঠির নিকৃষ্টতম ব্যক্তিও আল্লাহ্র ক্ষমা সম্পর্কে নিরাশ হয়ো না, কারণ মহিমান্বিত আল্লাহ্ বলেন, "অবিশ্বাসীগণ ছাড়া আর কেউ নিশ্চয়ই, আল্লাহ্র রহমত সম্পর্কে নিরাশ হয় না" (কুরআন—১২ ঃ ৮৭)।

৩৮৮। কৃপণতার মধ্যে সকল পাপ নিহিত আছে এবং কৃপণতা হলো পাপের পথে পরিচালিত হবার লাগাম।

৩৮৯। হে আদম সন্তানগণ, জীবিকা দু'প্রকার ঃ (১) যে জীবিকা তোমরা অনুসন্ধান কর; (২) যে জীবিকা তোমাদেরকে অনুসন্ধান করে। দ্বিতীয় প্রকারের জীবিকার কাছে তোমরা পৌছতে না পারলেও উহা তোমাদের কাছে আসবে। সুতরাং তোমাদের একদিনের উদ্বিগ্নতাকে এক বছরের উদ্বিগ্নতায় পরিণত করো না। প্রতিদিন তুমি যা পাও উহাই তোমার এক দিনের জন্য যথেষ্ট। যদি তুমি তোমার জীবনে একটি বছরও পাও তবুও মহিমান্বিত আল্লাহ্ তোমার জন্য যে অংশ নির্ধারণ করে রেখেছেন তা তুমি প্রতিদিন পেয়ে যাবে। যদি তুমি জীবনে একটি বছরও না পাও তবে কেন তুমি তা নিয়ে উদ্বিগ্ন হবে যা তোমার জন্য নয়। কেউ তোমার জীবিকা তোমার সামনে উপস্থিত করতে পারবে না আবার জীবিকার ব্যাপারে কেউ তোমাকে পরাভূত করতেও পারবে না। একইভাবে, যেটুকু তোমার অংশ হিসাবে নির্ধারিত করা হয়েছে তা পেতে কখনও বিলম্ব ঘটবে না।

৩৯০। অনেকে একদিনের সম্মুখীন হয় যারপর আর কোন দিন দেখে না। অনেকে রাতের প্রথমাংশে অতীব বাঞ্চনীয় অবস্থায় থাকে এবং শেষাংশে স্বামীহারা নারীর মত ক্রন্দনরত থাকে।

৩৯১। যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি উচ্চারণ করবে না ততক্ষণ পর্যন্ত কথা তোমার নিয়ন্ত্রণে। আর বলে ফেললেই তুমি কথার নিয়ন্ত্রণে চলে গেলে। সুতরাং স্বর্ণ-রৌপ্যকে যে ভাবে পাহারা দাও সেভাবে তোমার জিহ্বাকেও পাহারা দিয়ো, কারণ একটি কথাই তোমার আশীর্বাদ কেড়ে নিয়ে তোমার জন্য শাস্তি আনয়ন করতে পারে।

৩৯২। যা জান না তা বলো না এবং যা জান তার সব কিছু বলো না; কারণ আল্লাহ্ তোমার সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দায়িত্ব নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং শেষ বিচারের দিনে এ সব নিয়েই তোমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

৩৯৩। আল্লাহ্কে ভয় কর—পাছে তিনি তোমাদের পাপাচার দেখে ফেলেন। যদি তোমরা শক্তিশালী হতে চাও তবে আল্লাহ্র আনুগত্যে শক্তিশালী হয়ো। আর যদি দুর্বল হতে চাও তবে পাপ কাজ করাতে দুর্বল হয়ো।

৩৯৪। এ দুনিয়ার যা তুমি দেখতে পাচ্ছ তার প্রতি কুকঁড়ে পড়া বোকামি ছাড়া আর কিছু নয় এবং ভাল কাজে পুরস্কার থাকা সম্পর্কে অবহিত হওয়া সত্ত্বেও তা না করা ক্ষতি ছাড়া কিছু নায়। পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়া সকলকে বিশ্বাস করাই দুর্বলতা।

৩৯৫। আল্লাহ্র কাছে দুনিয়ার দীনতার এটাই প্রমাণ যে, এখানেই তার অবাধ্য হয় এবং দুনিয়াকে পরিত্যাগ না করলে আল্লাহ্র রহমত লাভ করা যায় না।

৩৯৬। কোন ব্যক্তি যা খোঁজে তার অংশ হলেও পায়।

৩৯৭। সে ভাল ভাল নয় যার পেছনে রয়েছে আগুন, সে দুর্দশা দুর্দশা নয় যার পেছনে রয়েছে বেহেশত। বেহেশত ছাড়া সকল আশীর্বাদ নিকৃষ্ট এবং দোযখ ছাড়া সকল বিপদাপদ আরামপ্রদ।

৩৯৮। সাবধান, দুরবস্থা একটা বিপদ কিন্তু শারীরিক পীড়া সব চাইতে বড় দুর্দশা। আবার শারীরিক পীড়া হতে হৃদয়ের পীড়া আরো খারাপ। সাবধান, সম্পদের প্রাচুর্য একটা আশীর্বাদ কিন্তু শারীরিক সুস্থতা সম্পদ হতেও উত্তম। আবার হৃদয়ের পবিত্রতা শারীরিক সুস্থতা হতেও উত্তম।

৩৯৯। যে ব্যক্তি তার কর্মকান্ড পেছনে ফেলে দেয় তার বংশ মর্যাদা তাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে না। অন্য ভাবে বর্ণিত আছে, যে নিজে কিছু অবদান রাখতে পারে না তার পূর্ব পুরুষের অবদান তার কোন উপকারে আসে না।

৪০০। মোমেনদের সময় তিনটি ঃ (১) যে সময় সে আল্লাহ্র ধ্যানে মগ্ন থাকে, (২) যে সময় সে জীবিকা অর্জনে ব্যয় করে, (৩) যে সময় বৈধ ও মনোরম ভাবে উপভোগ করে। তিনটি বিষয় ছাড়া জ্ঞানী লোকের জন্য ঘরের বাহির হওয়া শোভনীয় নয়—রুটি-রুজির জন্য, পরকালের কোন কিছুর জন্য এবং নিষিদ্ধ নয় এমন কিছু উপভোগ করতে যাওয়া।

৪০১। দুনিয়া হতে বিরত থেকো যাতে আল্লাহ্ এর প্রকৃত কুফল তোমাকে দেখাতে পারেন। এ বিষয়ে অবহেলা করো না, কারণ তোমার কোন কর্মকান্ড অবহেলার দৃষ্টিতে দেখা হবে না।

৪০২। এমনভাবে কথা বলো যেন মানুষ তোমাকে জানতে পারে, কারণ মানুষের স্বরূপ জিহ্বার নীচে লুক্কায়িত।

৪০৩। এ দুনিয়ার যেটুকু আনুকূল্য তোমার কাছে আসে তা অপসৃত কর এবং তোমার কাছ থেকে যা দূরে থাকে তা হতে বিরত থাক। যদি তা করতে না পার তবে তোমার চাহিদায় মধ্যপথ অবলম্বন কর।

৪০৪। এমন অনেক কথা আছে যা আক্রমণ হতেও বেশী কার্যকর।

৪০৫। যাতে তৃপ্তি পাওয়া যায় তা ক্ষুদ্র হলেও যথেষ্ট।

৪০৬। অবমানিত হবার চেয়ে মৃত্যু শ্রেয়। অন্যের মাধ্যম ব্যতীত ক্ষুদ্র জিনিসও উত্তম। যে বসে পায় না সে দাঁড়িয়েও পাবে না। এ পৃথিবীতে তোমাদের দু'টি সময় হবে—একটি তোমার পক্ষে অপরটি তোমার বিরুদ্ধে। সময় তোমার অনুকূলে থাকলে আত্মম্বরী হয়ো না, আবার তোমার প্রতিকূলে গেলে ধৈর্য ধারণ করো।

৪০৭। সব চাইতে ভাল সুগন্ধি হলো কস্তুরী; এটা ওজনে হালকা ও সুগন্ধিতে ভরপুর।

৪০৮। দম্ভোক্তি পরিহার কর; আত্ম-প্রবঞ্চনা পরিত্যাগ করো এবং কবরকে স্মরণ কর।

৪০৯। পিতার ওপর পুত্রের যেরূপ অধিকার আছে পুত্রের ওপরও পিতার তদ্রূপ অধিকার আছে। পিতার অধিকার হলো পুত্র শুধুমাত্র আল্লাহ্কে অমান্য করার আদেশ ব্যতীত তাঁর সকল আদেশ মেনে চলবে এবং পুত্রের অধিকার হলো পিতা তার একটি সুন্দর নাম রাখবে, তাকে উত্তম প্রশিক্ষণ দেবে এবং কুরআন শিক্ষা দেবে।

৪১০। দৃষ্টির কুপ্রভাব সঠিক; যাদুমন্ত্র সঠিক; মায়াবিদ্যা সঠিক এবং ফাল (মঙ্গল সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী) সঠিক; কিন্তু 'তিয়ারাহ' (মন্দ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী) সঠিক নয় এবং কারো রোগ অন্যের মধ্যে ছড়ানো সঠিক নয়। সুগন্ধি আনন্দ দেয়, মধু আনন্দ দেয়; ঘোড় সওয়ার আনন্দ দেয় এবং সবুজ প্রান্তরের দিকে দৃষ্টি আনন্দ দেয়।

৪১১। জনগণের রীতিনীতিতে তাদের নৈকট্য তাদেরকে পাপ হতে নিরাপত্তা প্রদান করে।

৪১২। আমিরুল মোমেনিনের মর্যাদা সম্পর্কে কেউ একজন উক্তি করলে তিনি বললেন, "পলক গজাবার সাথে সাথে তুমি উড়তে শুরু করেছো এবং বয়ঃপ্রাপ্ত হবার আগেই বিড়বিড় শুরু করেছো।"

৪১৩। যে কেউ অসঙ্গত কিছুর জন্য লালায়িত হয় সে কৃতকার্য হবার পথ খুজে পায় না।

৪১৪। কেউ একজন "লা হাওলা ওয়ালা কুয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্"-এর অর্থ জিজ্ঞেস করলে আমিরুল মোমেনিন বললেন, "আমরা কোন কিছুতে আল্লাহ্র সমকক্ষ কর্তৃত্বশীল নই এবং আল্লাহ্ কর্তৃত্ব না দিলে আমরা কোন কিছুতেই কর্তৃত্বশীল নই। সুতরাং যখন তিনি কোন কিছুতে আমাদেরকে কর্তৃত্ব প্রদান করেন তখন তিনি আমাদের ওপরও উর্ধ্বতন কর্তৃত্বশীল থাকেন; এ সময় তিনি আমাদেরকে কিছু দায়িত্বও দিয়ে থাকেন। যখন তিনি কর্তৃত্ব প্রত্যহার করেন তখন তিনি দায়িত্বও প্রত্যাহার করেন।

৪১৫। আম্মার ইবনে ইয়াসিরকে মুঘিরা ইবনে শুবাহ্-এর সাথে তর্ক-বিতর্ক করতে দেখে আমিরুল মোমেনিন বললেন, "হে আম্মার, উহাকে ছেড়ে দাও; উহার সঙ্গে তর্ক করো না; কারণ এ দুনিয়ার সুযোগ-সুবিধা লাভের জন্য সে ইসলামে প্রবেশ করেছে এবং সে স্বেচ্ছায় নিজেকে সংশয়ে নিপতিত করেছে যাতে সে নিজের দোষ ঢাকতে পারে।"

৪১৬। আল্লাহ্ কর্তৃক পুরস্কৃত হবার জন্য দরিদ্রের সম্মুখে ধনীদের নম্রতা প্রদর্শন করাই উত্তম; কিন্তু আল্লাহ্তে বিশ্বাসের বিষয়ে ধনীদের প্রতি দরিদ্রের প্রগলভতা তদাপেক্ষাও ভাল।

৪১৭। আল্লাহ্ ততক্ষণ পর্যন্ত কাউকে প্রজ্ঞা প্রদান করেন না যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি তাকে প্রজ্ঞা দ্বারা ধ্বংস হতে রক্ষা না করেন।

৪১৮। যে কেউ সত্যের সাথে বিরোধ করে সে সত্য দ্বারাই পরাভূত হয়।

৪১৯। হৃদয় হলো চোখের গ্রন্থ।

৪২০। আল্লাহ্র ভয় মানুষের চরিত্রের সব চেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য।

৪২১। যিনি তোমাকে কথা বলার ক্ষমতা প্রদান করেছেন তাঁর বিরুদ্ধে কথা বলে তোমার বাকপটুতা দেখিয়ো না, অথবা যিনি তোমাকে সত্য পথে রেখেছেন তার বিরুদ্ধে বাগ্মীতা ঝেড়ো না।

৪২২। নিজের শৃঙ্খলা বিধানের জন্য এটাই যথেষ্ট যে, তুমি অন্যের যা অপছন্দ কর তা হতে নিজকে বিরত রাখ।

৪২৩। বিজ্ঞদের মত ধৈর্য ধারণ করতে হবে, না হয় অজ্ঞদের মত চুপ করে থাকতে হবে।

৪২৪। আমিরুল মোমেনিন দুনিয়া সম্পর্কে বলেন, "ইহা প্রতারণা করে, ইহা ক্ষতি করে এবং ইহার পরিসমাপ্তি ঘটে। মহিমান্বিত আল্লাহ্ তাঁর প্রেমিকদের জন্য পুরস্কার হিসাবে এটাকে অনুমোদন করেন না। বস্তুতঃ দুনিয়াবাসীগণ সওয়ারীর মত যত শীঘ্র সম্ভব নামিয়ে দিয়ে বাহন চলে যায়।

৪২৫। আমিরুল মোমেনিন তাঁর পুত্র হাসানকে বলেছিলেন, "হে পুত্র, তোমার পরে এ পৃথিবীতে কোন কিছু জমিয়ে রেখে যেয়ো না। কারণ তোমার জমানো জিনিস দু'ধরণের লোক ভোগ করতে পারে (১) আল্লাহ্কে মান্যকারী কেউ তা ভোগ করতে পারে; সেক্ষেত্রে উহা দ্বারা ধার্মিকতা অর্জন করতে পারে যদিও সম্পদ তোমার জন্য মন্দ ছিল; অথবা (২) উহা আল্লাহ্কে অমান্যকারী কেউ ভোগ করতে পারে; সেক্ষেত্রে পাপ অর্জন করবে এবং তুমি তাতে সহায়তা করেছো বলে ধরা হবে। সুতরাং যারা মরে গেছে তাদের জন্য আল্লাহ্র রহমত কামনা কর আর যারা বেঁচে আছে তাদের জন্য আল্লাহ্র রেজেক কামনা কর।"

৪২৬। কোন একজন আমিরুল মোমেনিনের সম্মুখে "আস্তাগফিরুল্লাহ্' বলাতে তিনি বললেন, "তোমার মাতা পুত্রহারা হোক; তুমি কি জান ইস্তিগফার কি? উচ্চ মর্যাদাশীল ব্যক্তিদের জন্যই 'ইস্তিগফার' এ শব্দটি ৬টি খুঁটির উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথম, অতীত বিষয়ে অনুতাপ, দ্বিতীয়, সেদিকে আর প্রত্যাবর্তন না করার বিষয়ে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, তৃতীয়, মানুষের সকল অধিকার পূরণ করা যাতে আল্লাহ্র কাছে পরিস্কার ভাবে যেতে পারে

এবং কোন জবাবদিহি করতে না হয়; চতুর্থ, সকল দায়িত্ব পালন করা যাতে ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হয়, পঞ্চম, হারাম রোজগার দ্বারা যে মাংস শরীরে হয়েছে অনুতাপে তা গলিয়ে দেয়া যেন চামড়া হাড়ের সঙ্গে লেগে যায় এবং আবার নতুন মাংস গজায়; ষষ্ঠ, আল্লাহ্‌র আনুগত্যের বেদনা সহ্য করার জন্য দেহকে গড়ে তোলা। এ অবস্থায় তুমি "আস্তাগফিরুল্লাহ্‌" বলতে পার।

৪২৭। ক্ষমাশীলতা জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর মত আত্মীয়।

৪২৮। আদম সন্তানগণ কতই না দুর্বল! তার মৃত্যু গুপ্ত, তার রোগ-ব্যাধি অজানা, তার আমল সংরক্ষিত, একটি মশার কামড় তাকে ব্যথা দেয়, শ্বাসরুদ্ধ হয়ে তার মৃত্যু হয় এবং ঘর্মাক্ত হলে তার শরীর হতে দুর্গন্ধ বের হয়।

৪২৯। বর্ণিত আছে যে, একদিন আমিরুল মোমেনিন তাঁর সহচরদের মাঝে বসেছিলেন। এমন সময় তাদের পাশ দিয়ে একজন সুন্দরী মহিলা যাচ্ছিলেন। সহচরগণ ঐ মহিলার দিকে তাকাতে শুরু করলো। আমিরুল মোমেনিন বললেন, 'এ লোকগুলোর চক্ষু লোলুপ; তাদের লোলুপ হবার কারণ হলো তাকানো। যদি কোন নারীর সৌন্দর্যে তোমরা আকর্ষিত হও তবে তোমাদের স্ত্রীর কাছে চলে যেয়ো, কারণ এ মহিলাও তোমাদের স্ত্রীর মত।" একজন খারেজী একথা শুনে বললো "প্রচলিত মতবিরোধী এ লোকটিকে আল্লাহ্‌ নিধণ করুন। সে কতইনা যুক্তিবাদী।" এ কথা শুনামাত্র আমিরুল মোমেনিনের অনুচরগণ লোকটিকে হত্যা করতে উদ্ধত হলো। কিন্তু আমিরুল মোমেনিন বললেন, "তোমরা থামো। গালির বদলে তোমরা গালি দিতে পার। অন্যথায় অপরাধ ক্ষমা করে দেয়াই ভাল।"

৪৩০। তোমার জ্ঞান দ্বারা যদি ধ্বংসের পথ ও হেদায়েতের পথ পরখ করতে পার তবে তা তোমার জন্য যথেষ্ট।

৪৩১। মানুষের কল্যাণ করো। কল্যাণকর কাজের কোন অংশকে ক্ষুদ্র মনে করো না কারণ এর ক্ষুদ্রাংশও অনেক বড়। কল্যাণকর কাজের বেলায় কখনো একথা বলো না যে "আমা অপেক্ষা অন্য ব্যক্তি এ কাজের জন্য অধিক উপযুক্ত।" যদি এরূপ কথা বলো তবে মনে রেখো, আল্লাহ্‌র কসম, বাস্তবে তাই ঘটবে। সমাজে ভাল ও মন্দ উভয় ধরণের লোক আছে। তুমি যেটাই ফেলে রাখবে অন্যরা সেটা করে ফেলবে।

৪৩২। যে নিজের বাতেনকে সঠিক পথে রাখে আল্লাহ্‌ তার বাহ্যিক দিক সঠিক পথে রাখেন। যে দ্বীনের খেদমত করে আল্লাহ্‌ তার দুনিয়ার কর্মকাণ্ড সম্পাদন করে দেন। যে আল্লাহ্‌ ও তার নিজের মধ্যকার কর্মকান্ড সৎভাবে করে আল্লাহ্‌ ঐ ব্যক্তির ও অন্য লোকদের মধ্যকার কর্মকাণ্ড কল্যাণকর করে দেন।

৪৩৩। ধৈর্য এক প্রকার দুর্বলতা ঢাকার পর্দা এবং জ্ঞান তীক্ষ্ম তরবারি। সুতরাং তোমার স্বভাবের দুর্বলতা ধৈর্য দ্বারা ঢেকে রেখো এবং জ্ঞান দ্বারা কামনা-বাসনাকে হত্যা করো।

৪৩৪। আল্লাহ্‌র এমন কিছু বান্দা আছেন যাদেরকে আল্লাহ্‌ তাঁর নেয়ামত দ্বারা অভিষিক্ত করে রেখেছেন যেন তারা অন্যদের উপকারে আসে। সুতরাং তিনি তাঁর নেয়ামত ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের হাতে রাখেন যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তা অন্যকে প্রদান করে। যখন তারা নেয়ামত অন্যকে প্রদানে অস্বীকৃতি জানায় তখন আল্লাহ্‌ তা তুলে নিয়ে যান এবং অন্যকে প্রদান করেন।

৪৩৫। সম্পদ আর স্বাস্থ্য নিয়ে গর্ব করার কিছু নেই। কারণ এখন যাকে স্বাস্থ্যবান দেখছো একটু পরেই সে রুগ্ন হয়ে পড়তে পারে এবং এখন যাকে ধনবান দেখছো একটু পরেই সে দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে যেতে পারে।

৪৩৬। যে ব্যক্তি অভাব-অভিযোগের বিষয় কোন মোমিনের নিকট বলে যে যেন তা আল্লাহ্‌র নিকট বললো। আর যদি কোন কাফেরের নিকট বলে তবে সে যেন আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে অভিযোগ করলো।

৪৩৭। এক ঈদের দিনে আমিরুল মোমেনিন বলেছিলেন, সে ব্যক্তির জন্য ঈদ যার সিয়াম আল্লাহ্‌ গ্রহণ করেন এবং যার সালাতে তিনি সন্তুষ্ট। বস্তুতঃ যেদিন মানুষ কোন পাপ করে না সেদিনই তার জন্য ঈদ।

৪৩৮। বিচার দিবসে সে ব্যক্তিই সর্বাপেক্ষা বেশী অনুতপ্ত হবে যে অন্যায় পথ অবলম্বন করে সম্পদ উপার্জন করেছে। এহেন সম্পদের উত্তরাধিকারী যদি মহিমান্বিত আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে তবে সে (উত্তরাধিকারী) বেহেশতবাসী হবে; কিন্তু প্রথম উপার্জনকারী তার অপরাধের জন্য দোযখবাসী হবে।

৪৩৯। যে ব্যক্তির ভাগ্যে ধনসম্পদ না থাকা সত্ত্বেও উহার জন্য প্রাণপণ প্রচেষ্টা চালায় সে ব্যক্তি জীবনে অকৃতকার্যতার গ্লানি নিয়ে বেঁচে থাকে। সে ব্যক্তি এ পৃথিবী হতে দুঃখপূর্ণ অবস্থায় চলে যায়। আবার পরকালেও ধন লোলুপতার ফল ভোগ করবে।

৪৪০। জীবিকা দু'প্রকারের ঃ অনুসন্ধাকারী ও যা অনুসন্ধান করা হয়েছে। সুতরাং যে এ দুনিয়ার প্রতি লালায়িত হয় মৃত্যু তাকে সন্ধান করে নেয় দুনিয়া হতে মুখ ফেরানোর পূর্বেই। আর যে ব্যক্তি পরকালের প্রতি লালায়িত থাকে জাগতিক আরাম-আয়েশ তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত চায় যতক্ষণ পর্যন্ত সে দুনিয়া হতে জীবিকা গ্রহণ না করে।

৪৪১। আল্লাহ্ প্রেমিকগণ এ দুনিয়ার অন্তর্দিকে দৃকপাত করে। আর অন্যরা বর্হির্দিকে দৃকপাত করে। আল্লাহ্ প্রেমিকগণ সুদূর প্রসারী লাভের দিকে ঝুঁকে পড়ে। আর অন্যরা আপাতঃ লাভের জন্য ব্যস্ত থাকে। আল্লাহ্ প্রেমিকগণ সেসব জিনিসকে হত্যা করে যা তাদের হত্যা করবে বলে ভয় করে এবং এ পৃথিবীতে সেসব জিনিস ত্যাগ করে যা তাদের ত্যাগ করবে বলে মনে করে। অন্যদের ধন-সম্পদ স্তূপীকরণকে তারা অতি নগণ্য বিষয় বলে মনে করে। অন্যরা যেটা ভালবাসে আল্লাহ্ প্রেমিকগণ সেটাকে শত্রু বলে মনে করে। আবার তারা যেটাকে ভালবাসে অন্যরা তা ঘৃণা করে। আল্লাহ্ প্রেমিকগণের মাধ্যমে কুরআনের শিক্ষা প্রসারিত হয় এবং কুরআনের মাধ্যমেই তারা জ্ঞান লাভ করে। তাদের সাথেই কুরআন থাকে এবং তারা কুরআনে প্রতিষ্ঠিত। তারা কোন আশাতীত আশা পোষণ করে না এবং যা ভয়ের কারণ তাছাড়া অন্য কিছুকে ভয় করে না।

৪৪২। মনে রেখো, আনন্দ চলে যাবে কিন্তু তার ফলাফল থেকে যাবে।

৪৪৩। কোন ব্যক্তিকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ঘৃণা করো।[১]

১। আশ-শরীফ আর-রাজী উল্লেখ করেছেন যে, কারো কারো মতে এ উক্তি রাসুলের (সঃ)। কিন্তু ইবনুল আরাবী লিখেছেন যে, খলিফা আল-মামুন বলেছেন "আলী যদি 'উকবার তাকলিহি' না বলতেন তবে আমি 'আকলিহি তাকবুর' বলতাম।" উকবার তাকলিহি অর্থ কাউকে পরীক্ষা করে ঘৃণা করো আর আকলিহি তাকবুর অর্থ পরীক্ষার জন্য কাউকে ঘৃণা করো।

৪৪৪। বিষয়টি এমন নয় যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ কারো জন্য শুকরিয়ার দ্বার খোলা রেখেছেন এবং নেয়ামত ও প্রাচুর্যের দ্বার বন্ধ করে দিয়েছেন; কারো জন্য সালাতের দ্বার খুলে দিয়েছেন আর তা কবুলের দ্বার বন্ধ করে দিয়েছেন অথবা কারো জন্য তওবার দ্বার খুলে দিয়েছেন এবং তাকে ক্ষমা করার দ্বার বন্ধ করে দিয়েছেন।

৪৪৫। সম্মানজনক পদমর্যাদার জন্য সেই ব্যক্তি অধিক উপযোগী যে সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভূত।

৪৪৬। কোন এক ব্যক্তি আমিরুল মোমেনিনকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "ন্যায় বিচার ও উদারতা এ দুটির কোনটি অধিক ভাল।" উত্তরে তিনি বললেন যে, ন্যায় বিচার কোন বিষয়কে যথাযোগ্য স্থানে প্রতিষ্ঠিত করে; আর উদারতা সেসব বিষয়কে যথাযোগ্য দিক হতে সরিয়ে নিতে পারে। ন্যায় বিচার হলো সার্বিক তত্ত্বাবধায়ক আর উদারতা হলো নির্দিষ্ট বিশেষ সুবিধা। ফলতঃ ন্যায় বিচার উদারতা অপেক্ষা বড় ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত।

৪৪৭। মানুষ যা জানে না সে বিষয়ের সে শত্রু।

৪৪৮। দরবেশী কুরআনের দু'টি বক্তব্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ। মহিমান্বিত আল্লাহ্ বলেন, "পাছে তোমরা যা পাওনি তার জন্য নিজে নিজে দুঃখ কর এবং তিনি তোমাদের যা দিয়েছেন সে জন্য অতি উল্লসিত হয়ে পড়" (কুআন ৫৭ ঃ ৩২)। যে ব্যক্তি হারানো বিষয়ে দুঃখ করে না এবং যা পায় তাতে বিদ্রোহ করে না সেই প্রকৃত দরবেশী অর্জন করেছে।

৪৪৯। নিদ্রা দিনের সংকল্পের কতই না ভঙ্গকারী।

৪৫০। শাসন ক্ষমতা মানুষের প্রমাণ-ক্ষেত্র।

৪৫১। তোমাদের ওপর তোমাদের নিজেদের শহর অপেক্ষা অন্য কোন শহরের বেশী অধিকার নেই। সে শহর তোমার জন্য সর্বোত্তম যেটিতে তুমি বাস কর।

৫৫২। আমিরুল মোমেনিন মালিক আশতারের শাহাদাতের সংবাদ শুনে বললেন, "হায় মালিক! কতো বড়ো মানুষ ছিল মালিক! আল্লাহ্র কসম, যদি সে পর্বত হতো, তাহলে হতো এক মহাপর্বতমালা; সে যদি পাথর হতো তাহলে সে এতোটা কঠিন ও বিশাল হতো যে, কোন অশ্বারোহী তার ওপর উঠতে পারতো না, কোন পাখী পারতো না তার ওপর দিয়ে উড়তে।"

৪৫৩। যা স্থায়ী হয় তার সামান্যও উহার অনেকটা হতে ভাল যা দুঃখ বয়ে আনে।

৪৫৪। যদি কোন ব্যক্তির অতি প্রাকৃত একটি গুণ প্রকাশ পায় তবে তার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে তার অন্যান্য গুণাবলী দেখে নিয়ো।

৪৫৫। আমিরুল মোমেনিন গালিব ইবেন মাসাআহ্ (কবি ফারাজদাকের পিতা) এর সাথে কথোপকথন কালে বললেন, "আপনার বিপুল সংখ্যক উটের কি অবস্থা?" গালিব উত্তর দিলেন, হে আমিরুল মোমেনিন, দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে উট নিঃশেষ হয়ে গেছে।" আমিরুল মোমেনিন বললেন, "উটগুলো হারানোর প্রশংসিত পথ উহাই।"

৪৫৬। দ্বীনের আইন-কানুন না জেনে যে ব্যবসায় করে সে কুসীদ ব্যবসায়ে জড়িয়ে পড়ে।

৪৫৭। ছোট-খাট বিপদাপদকে যে বড় কিছু মনে করবে আল্লাহ্ তাকে বড় দুঃখ কষ্টে ফেলেন।

৪৫৮। যে ব্যক্তি আত্মসম্মানের দিকে খেয়াল রাখে তার কামনা-বাসনা তার কাছে হালকা হয়ে যায়।

৪৫৯। যখনই মানুষ হাসি-তামাশায় লিপ্ত হয় তখনই সে তার প্রজ্ঞা হতে কিছুটা সরে পড়ে।

৪৬০। যে ব্যক্তি তোমার দিকে ঝুঁকে পড়েছে তার দিক হতে মুখ ফেরানো তোমারই সুবিধার অংশ হারানো। অপর দিকে তুমি কারো প্রতি ঝুঁকে পড়লে সে তোমার দিক হতে মুখ ফেরানো তোমার জন্য অবমাননা কর।

৪৬১। ধনসম্পদ ও দুঃখ-দুর্দশা আল্লাহ্র সম্মুখে উপস্থাপনার অন্তর্ভুক্ত হবে।

৪৬২। জুবায়রের দুরাচার পুত্র আবদুল্লাহ্ জন্মাবার পূর্ব পর্যন্ত জুবায়র আমাদের একজন ছিল।[১]

১। আবদুল্লাহ্ ইবনে জুবায়র ইবনে আওয়ান (১/৬২২-৭৩/৬৯২) এর মাতা ছিল আসমা বিনতে আবু বকর (আয়শার বোন)। বয়ঃপ্রাপ্ত হবার পর হতেই আবদুল্লাহ্ বনি হাশিমের প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হয়ে উঠে; বিশেষ করে, আমিরুল মোমেনিনের প্রতি তার চমর বিদ্বেষ ছিল। তার পিতা জুবায়রের মনোভাব আমিরুল মোমেনিনের বিরুদ্ধে নিতেও সে কুণ্ঠা বোধ করেনি। অথচ আমিরুল মোমেনিন ছিলেন জুবায়রের পিতার খালার ছেলে। এ জন্যই আমিরুল মোমেনিন বলেছিলেন,

জুবায়রের অসৎ ছেলে আবদুল্লাহ্ বড় হবার পূর্ব পর্যন্ত জুবায়র আমাদের একজন ছিল (বার[৯৭], ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৯০৬; আছীর[১], ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৬২-১৬৩; আসাকীর[২৬], ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৩৬৩; হাদীদ[১৫২], ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৬৭; ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৭৯; ২০তম খণ্ড, পৃঃ ১০৪)।

জামাল যুদ্ধের ইন্ধন যোগানদানকারীদের মধ্যে আবদুল্লাহ্ ছিল অন্যতম। তার খালা আয়শা, তার পিতা জুবায়র ও তার মায়ের চাচাত ভাই তালহা আমিরুল মোমেনিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। ইবনে আবিল হাদীদ লিখেছেন ঃ

আবদুল্লাহ্ তার পিতা জুবায়রকে জামাল যুদ্ধে অবতীর্ণ হবার জন্য বাধ্য করেছিল এবং বসরার দিকে সৈন্য পরিচালনা করেছিল। আবদুল্লাহ্র এ কাজ আয়শার মনঃপুত হয়েছিল (হাদীদ[১৫২], ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৭৯)।

আয়শা তার বোনের ছেলে আবদুল্লাহ্কে অত্যন্ত ভালবাসতেন। আবদুল্লাহ্ ছিল তার কাছে মায়ের একমাত্র পুত্রের মত আদরের এবং আয়শার কাছে আবদুল্লাহ্ অপেক্ষা অধিক প্রিয় আর কেউ ছিল না। (ইসফাহানী[৩৪], পৃঃ ১৪২; হাদীদ[১৫২], ২০তম খণ্ড, পৃঃ ১২০; কাছীর[১], ৮ম খণ্ড, পৃঃ৩৩৬)।

হিশাম ইবনে উরওয়া বলেছেন ঃ

আবদুল্লাহ্র জন্য আয়শা যত দোয়া করতো সেরূপ দোয়া আর কারো জন্য করতে আমি শুনিনি। জামাল যুদ্ধে আবদুল্লাহ্ নিহত হয়নি— এ খবর যে দিয়েছিল তাকে আয়শা দশ হাজার দিরহাম পুরস্কার দিয়েছিল এবং আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায়ের জন্য সিজদা করেছিল (আসাকীর[২৬], ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৪০২; হাদীদ[১৫২], ২০ তম কণ্ড, পৃঃ ১১৯)

আয়শার এ ভালবাসাই তাঁর ওপর আবদুল্লাহ্র কর্তৃত্বের মূল কারণ। আবদুল্লাহ্ তার ইচ্ছমত আয়শাকে পরিচালনা করতো। যাহোক বনি হাশিমের প্রতি আবদুল্লাহ্র বিদ্বেষ এমন পর্যায়ে পৌছেছিল যা বিভিন্ন ঐতিহাসিক নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

মক্কায় আবদুল্লাহ্র খেলাফত কালে চল্লিশ জুমআতে সে খোৎবা প্রদানকালে রাসুলের (সঃ) ওপর দরুদ পেশ করে নি। সে বলতো, "রাসুলের ওপর দরুদ পেশ করতে কোন কিছুই বাধা দেয়নি শুধু বনি হাশিমের এ কয়টি লোক রাসুলের নাম নিলে গর্বিত হবে এজন্য আমি দরুদ পেশ করি না।" অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, আবদুল্লাহ্ বলেছে, "রাসুলের আহলুল বাইত ছাড়া অন্য কিছু তাঁর প্রতি দরুদ প্রেরণে আমাকে প্রতিহত করেনি। কারণ রাসুলের নাম নিলেই এ লোকগুলি মাথা নাড়বে" (ইসফাহানী[৩৩], পৃঃ ৪৭৪; মাসুদী[১০৯], ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪১৩, ইয়াকুবী[২৮], ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৬১; রাব্বিহ[১১৮], ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৪১৩; হাদীদ[১৫২], ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৬২; ১৯তম খণ্ড, পৃঃ ৯১-৯২, ২০তম খণ্ড, পৃঃ ১২৭-১২৯)।

আবদুল্লাহ্ ইবনে জুবায়র আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসকে বলেছিল,

আমি চল্লিশ বছর ধরে আহলুল বাইতের প্রতি আমার পুঞ্জীভূত ঘৃণা গোপন করে রেখেছি (মাসুদী[১০৯], ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৮০; হাদীদ[১৫২], ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৬২, ২০ তম খণ্ড, পৃঃ ১৪৮)।

আবুদল্লাহ্ আমিরুল মোমেনিনের প্রতি ঘোর বিদ্বেষ পোষণ করতো। সে তাঁর সম্মানহানীকর ও অবমাননাকর উক্তি করতো, তাঁকে গালি দিত এবং তাঁর প্রতি অভিশাপ দিত (ইয়াকুবী[২৮], ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৬১-২৬২; মাসুদী [১০৯], ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৮০ ; হাদীদ[১৫২], ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৬১-৬৩, ৭৯)।

আবদুল্লাহ্ আমিরুল মোমেনিনের পুত্র মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়া, আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস ও হাসান ইবনে হাসান ইবনে আলী ইবনে আবি তালিবসহ হাশিম বংশের সত্তর জনকে বন্দি করে আরিমের শিবে (ছোট একটি পাহাড়ী উপত্যকা) আটক করে রাখে। তাদের সকলকে পুড়িয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে উক্ত উপত্যকার প্রবেশ দ্বারে সে অনেক কাঠ স্তূপীকৃত করেছিল। এ সময় মুখতার ইবনে আবি উবায়েদ আছ-ছাকাফী মক্কায় চার হাজার সৈন্য প্রেরণ করেছিলেন। তারা মক্কায় পৌছেই আবদুল্লাহ্ ইবনে জুবায়রকে আক্রমণ করলো এবং অপ্রত্যাশিতভাবে বনি হাশিমের বন্দিগণকে আরিম-শিব হতে উদ্ধার করলো। আবদুল্লাহ্ ইবনে জুবায়রের ভ্রাতা উরওয়া আবদুল্লাহ্র এহেন কাজের জন্য ওজর পেশ করলো যে, বনি হাশিম আবদুল্লাহ্র আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেনি বলেই সে এ

কাজ করতেছিল। তার কাজটি মূলতঃ উমর ইবনে খাত্তাবের অনুকরণ মাত্র। কারণ বনি হাশিম আবু বকরের বায়াত গ্রহণ করেনি বলে তাদেরকে ফাতিমার ঘরে একত্রিত করে পুড়িয়ে দেয়ার জন্য উমর অনেক কাঠ স্তূপীকৃত করেছিলেন (ইসফাহানী[৩৩], পৃঃ ৪৭৪; হাদীদ[১৫২], ১৯তম খণ্ড, পৃঃ ৯১; ২০ তম খণ্ড, পৃঃ ১২৩-১২৬, ১৪৬-১৪৮; আসাকীর[২৬], ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৪০৮, রাব্বিহ[১১৮], ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৪১৩; সাদ[১৩৭], ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৭৩-৮১; তাবারী[৭৫], ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬৯৩-৬৯৫; আছীর[২], ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২৪৯-২৫৪; খালদুন[৫৪], ৩য় খন্ড, পৃঃ ২৬-২৮)।

এ বিষয়ে আবুল ফারাজ ইসফাহানী লিখেছেনঃ

> *আবদুল্লাহ্ ইবনে জুবায়র সদা-সর্বদা বনি হাশিমের বিরুদ্ধে অন্যান্য লোকদের উস্কানি দিতো এবং এ কাজে সে যেকোন মন্দ পন্থা অবলম্বনেও কুণ্ঠা বোধ করতো না। সে মিম্বারে বসেও বনি হাশিমের কুৎসা রটনা করতো এবং তাদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়াতো। এ সময় বনি হাশিমের কোন একজন তার এসব কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করলো। ফলে সে তার পথ পরিবর্তন করে ইবনে হানাফিয়াকে আরিমের শিবে বন্দী করলো। তারপর সে মক্কায় বনি হাশিমের যেসব লোককে পেল তাদের বন্দি করে হানাফিয়ার সাথে আরিমের শিবে রাখলো এবং তাদেরকে পুড়িয়ে হত্যা করার জন্য অনেক কাঠ সংগ্রহ করে আরিমের শিবে জমালো। এ খবর পেয়ে হানাফিয়ার অনুচরগণ আবু আবদিল্লাহ্ আল জাদালীর নেতৃত্বে আবদুল্লাহ্ ইবনে জুবায়রের সাথে যুদ্ধ করার জন্য মক্কায় উপস্থিত হয়ে গেল। আল-জাদালীর উপস্থিতি টের পেয়েই আবদুল্লাহ্ ইবনে জুবায়র পরিকল্পনা অনুযায়ী আগুন লাগিয়ে দিল। আল-জাদালী সরাসরি আরিমের শিবে উপস্থিত হয়ে আগুন নিভিয়ে ফেললো এবং বন্দিদেরকে উদ্ধার করলো (ইসফাহানী[৩৪], পৃঃ ১৫)*

৪৬৩। মানুষ কিসে দম্ভ করে যেখানে তার উৎপত্তি হলো বীর্য আর পরিণতি হলো লাশ এবং সে নিজেকে খাওয়াতে পারে না বা মৃত্যুকে ঠেকাতে পারে না।

৪৬৪। কেউ একজন আমিরুল মোমেনিনকে জিজ্ঞেস করলেন, সব চাইতে বড় কবি কে? উত্তরে তিনি বললেন, কবিরা সকলে একই লাইনে তাদের চিন্তাভাবনা ব্যক্ত করে না। ফলে আমরা তাদের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণয় করতে সক্ষম হই না। এতদসত্ত্বেও আল-মালিক অদ-দিল্লিল (পথভ্রষ্ট রাজা) অর্থাৎ ইমরিউল কায়েস শ্রেষ্ঠ।

৪৬৫। এমন কোন মুক্ত লোক কি নেই, যে দুনিয়ার উচ্ছিষ্টকে যারা পছন্দ করে তাদের জন্য উহা রেখে যায়। নিশ্চয়ই, তোমার জন্য একমাত্র মূল্য হলো বেহেশত। সুতরাং বেহেশত ছাড়া অন্য কিছুর জন্য নিজকে বিক্রি করো না।

৪৬৬। দু'ধরনের লোভী ব্যক্তি কখনো তৃপ্ত হয় না। এদের একজন হলো জ্ঞান অন্বেষণকারী আর অপরজন হলো দুনিয়া অন্বেষণকারী।

৪৬৭। ইমান হলো এই যে, তুমি সত্যকে আঁকড়ে ধরবে যদি তাতে তোমার ক্ষতিও হয় এবং মিথ্যাকে বর্জন করবে যদি মিথ্যা দ্বারা তোমার লাভও হয়। তোমার কথা যেন কাজের চেয়ে বেশী না হয় এবং অন্যদের সম্পর্কে কথা বলতে আল্লাহ্‌কে ভয় করো।

৪৬৮। ভাগ্য আমাদের পূর্ব-স্থিরীকৃত বিষয়েরও নিয়ন্ত্রণকারী যতক্ষণ পর্যন্ত না চেষ্টা ধ্বংস সংঘটিত করে।

৪৬৯। ক্ষমা আর ধৈর্য জমজ এবং দু'টি উচ্চ স্তরের সাহসের ফল।

৪৭০। সহায়হীনের অস্ত্র হলো গীবত করা।

৪৭১। অনেকেই কুকর্মে জড়িয়ে পড়ে এজন্য যে, তা সম্পর্কে তাকে ভাল ধারণা দেয়া হয়।

৪৭২। এ দুনিয়া তার নিজের জন্য সৃষ্টি করা হয়নি—অন্যের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে।

৪৭৩। বনি উমাইয়াদের নির্ধারিত সময় (মিরওয়াদ) আছে যার মধ্যেই তারা শেষ হয়ে যাবে। সময় আসবে যখন তাদের মধ্যে মতদ্বৈধতা দেখা দেবে এবং তখন হায়েনাও তাদেরকে আক্রমণ করে ক্ষমতাচ্যুত করবে[১]।

১। উমাইয়াদের পতন সম্পর্কে আমিরুল মোমেনিনের এ ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান উমাইয়া শাসনের প্রতিষ্ঠা করেছিল এবং ১৩২ হিজরীতে মারওয়ান ইবনে মুহাম্মদ আল-হিমারের সময় ৯০ বৎসর ১১ মাস ১৩ তিন পর উহার পরিসমাপ্তি ঘটে। উমাইয়া রাজত্ব ছিল স্বৈরাচার, অত্যাচার আর জুলুমের প্রতীক। উমাইয়া শাসকগণ ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য ইসলামকে কালিমালিপ্ত করেছে। তারা মক্কায় সৈন্য পাঠিয়ে কাবায় আগুন লাগিয়েছে, মদিনা তাদের পৈশাচিকতার শিকার হয়েছে এবং মুসলিমদের রক্তের স্রোত বয়ে গেছে। এ রক্তপাত অবশেষে ধ্বংসাত্মক বিদ্রোহে রূপ নিয়েছিল। এ সময় বনি আব্বাস "আল-খিলাফাহ্ আল-ইলাহিয়া" (আল্লাহ্‌র খেলাফত) নামক আন্দোলন শুরু করেছিল। তাদের আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য তারা আবু মুসলিম আল-খোরাসানী নামক একজন তুখোড় বক্তা ও নেতা পেয়েছিল। খোরাসানকে সদরদপ্তর করে আন্দোলন পরিচালিত হয় এবং উমাইয়াদেরকে ক্ষমতাচ্যুত করে আব্বাসীয়গণ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে সমর্থ হয়।

৪৭৪। আনসারদের প্রশংসা করে আমিরুল মোমেনিন বলেছিলেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম, তারা তাদের উদারতা ও মধুর কথা দ্বারা ইসলামকে এমনভাবে লালন-পালন করেছে যেমন করে একটি উষ্ট্র শাবককে লালন করা হয়।

৪৭৫। চক্ষু হলো পেছনের ফিতা।

৪৭৬। তাদের একজন শাসক এসেছিল। সে ন্যায়পরায়ণ ছিল এবং তাদেরকে ন্যায়পরায়ণ করেছিল যতক্ষণ পর্যন্ত সম্পূর্ণ দ্বীন প্রস্ফুটিত না হয়েছিল।

৪৭৭। এমন এক দুঃসময় আসবে যখন ধনবানগণ তাদের ধনসম্পদ দাঁতে কামড়িয়ে ধরে রাখবে (কৃপনতার রূপক) অথচ এমন স্বভাব তাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মহিমান্বিত আল্লাহ্ বলেন, "তোমরা নিজেদের মধ্যে উদারতার কথা ভুলে যেয়ো না" (কুরআনঃ ২ ঃ ২৩৭)। এসময় দুষ্ট লোকেরা ওপরে উঠে যাবে এবং ধার্মিকগণের হীনাবস্থা হবে। এ সময় অসহায়গণের সহায় সম্বল ক্রয় করা হবে অথচ রাসুল (সঃ) অসহায়দের সহায় সম্বল ক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

৪৭৮। আমাকে নিয়ে দু'ধরণের লোক ধ্বংসের পথে যাবে—(১) যারা আমাকে ভালবাসে অথচ অতিরঞ্জিত করে; (২) যারা আমাকে ঘৃণা করে ও মিথ্যা দোষারোপ করে[১]।

১। রাসুল (সঃ) বারবার তাঁর উম্মতকে আদেশ করেছেন যেন তারা আলীকে ভালবাসে এবং তিনি আলী সম্পর্কে কোন ঘৃণা বা বিদ্বেষ পোষণ নিষিদ্ধ করেছেন। অধিকন্তু রাসুল (সঃ) আলীর প্রতি ভালবাসাকে ইমান ও তার প্রতি ঘৃণাকে মোনাফেকী (নিফাক) বলে আখ্যায়িত করেছেন (বাণী নং ৪৫ এর টীকা)

রাসুলের (সঃ) চৌদ্দজন সাহাবী হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন ঃ

যে আলীকে ভালবাসলো সে আমাকে ভালোবাসলো, যে আমাকে ভালোবসালো সে আল্লাহ্‌কে ভালোবসলো, যে আল্লাহ্‌কে ভালবাসলো তিনি তাকে বেহেশতে স্থান দিবেন।

যে আলীকে ঘৃণা করলো সে আমাকে ঘৃণা করলো, যে আমাকে ঘৃণা করলো সে নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌কে ঘৃণা করলো, যে আল্লাহ্‌কে ঘৃণা করলো সে অবশ্যই দোযখবাসী হলো।

যে আলীকে আঘাত দিলো সে আমাকেই আঘাত দিলো, যে আমাকে আঘাত দিলো নিশ্চয়ই সে আল্লাহ্‌কে আঘাত দিল। "নিশ্চয়ই, যে আল্লাহ্ ও রাসুলকে আঘাত দেয় আল্লাহ্ তাকে ইহকালে ও

পরকালে অভিসম্পাত দেন এবং তার জন্য কঠোর শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন" (কুরআন—৩৩:৫৭); (নায়সাবুরী[৮৪], ৩য় খন্ড পৃঃ ১২৭-১২৮ ও ১৩০; ইসফাহানী[৩১], ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬৬-৬৭, বার[৯৭], ৩য় খন্ড, পৃঃ ৪৯৬-৪৯৭; আছীর[১], ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ৩৮৩; হাজর[১৫০], ৩য় খন্ড, পৃঃ ৪৯৬-৪৯৭; শাফী[১২৮], ৯ম খণ্ড, পৃঃ ১০৮, ১০৯, ১২৯, ১৩১, ১৩২, ও ১৩৩ হিন্দি[১৬৭], ১২শ খণ্ড, পৃঃ ২০২, ২০৯, ২১৮, ২১৯; ১৫ শ খণ্ড, পৃঃ ৯৫; ১৭ শ খণ্ড, পৃঃ ৭০; শাফী[১২৪], ২য় খণ্ড পৃঃ ১৬৬, ১৬৭, ২০৯, ২১৪; শাফী[১২৯], পৃঃ ১০৩, ১৯৬, ৩৮২)।

রাসুল (সঃ) তাঁর উম্মতকে সাবধান করে দিয়েছিলেন যেন তারা আলীর বিষয় অতিরঞ্জিত না করে। এ কারণে অনেক সময় তিনি আলীর অনেক গুণাবলীর প্রশংসা হতেও বিরত থাকেন। জাবির ইবনে আবদিল্লাহ্ আল-আনসারী হতে বর্ণিত আছে ঃ

যখন আমিরুল মোমেনিন খায়বার দুর্গ জয় করে রাসুলের সম্মুখে উপস্থিত হলেন তখন রাসুল (সঃ) বললেন "হে আলী, আমার উম্মতের একদল কি এমন হবে না যারা তোমার সম্পর্কে সেরূপ কথা বলবে যা নাছারাগণ মরিয়মপুত্র ঈশা সম্পর্কে বলে। আমি যদি তোমার সম্পর্কে একটু কিছু বলি তাহলে তুমি কোন্ মুসলিমের সম্মুখ দিয়ে যেতে পারবে না। কারণ তারা তোমাকে পথরোধ করে তোমার পায়ের ধুলা নিতে থাকবে বরকত ও আশীবার্দ পাওয়ার জন্য। আমি এটুকু বলা যথেষ্ট মনে করি যে, মুসার কাছে হারুনের মর্যাদা যেরূপ ছিল আমার কাছেও তুমি তদ্রুপ। শুধু ব্যতিক্রম হলো আমার পরে আর কোন নবী আসবে না (শাফী[১২৮], ৯ম খণ্ড, পৃঃ ১৩১; হাদীদ[১৫২], ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৪; ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৬৮; ১৮ শ খণ্ড, পৃঃ ২৮২; শাফী[১২৯], পৃঃ ২৩৭-২৩৯; হানাফী[১৫৭], পৃঃ ৭৫, ৭৬, ৯৬, ২২০; আশরাফ[১৬], পৃঃ ২৬৪- ২৬৫; হানাফী[১৫৩], পৃঃ ৪৪৮-৪৫৪; কুন্দুজী[৫০], পৃঃ ৬৩-৬৪ ও ১৩০-১৩১)।

আমিরুল মোমেনিন নিজেই বলেছেন ঃ

রাসুল (সঃ) আমাকে ডেকে বললেন "হে আলী, তোমার ও মরিয়ম পুত্র ঈশার মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে। ঈশাকে ইহুদীগণ ঘৃণা করে এবং তার মায়ের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দেয়। অপরপক্ষে, খৃষ্টানগণ তাকে অধিক ভালবেসে অতিরঞ্জিত করে এমন মর্যাদা তাকে দেয় যা তিনি নন।"

অতঃপর আমিরুল মোমেনিন বলেন, সাবধান, আমাকে নিয়ে দু'প্রকার লোক ধ্বংস প্রাপ্ত হবে। এক প্রকার লোক আমাকে ভালবাসবে এবং এমন উচ্চকিত প্রশংসা করবে যা আমি নই; অপর প্রকার লোক যারা আমাকে ঘৃণা করবে এবং আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন অপবাদ দেবে। সাবধান, আমি নবী নই এবং আমার কাছে কোন কিছু প্রত্যাদিষ্ট হয়নি, কিন্তু আমি যতটুকু সম্ভব আল্লাহ্র কিতাব ও রাসুলের সুন্নাহ্ অনুযায়ী আমল করি (হাম্বল[১৬০], ১ম খন্ড, পৃঃ ১৬০, নায় সাবুরী[৮৪], ৩য় খণ্ড , পৃঃ ১২৩; তাব্রীজী[৭৯], ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৪৫-২৪৬; শাফী[১২৮], ৯ম খণ্ড, পৃঃ ১৩৩; হিন্দি[১৬৭], ১২শ খণ্ড, পৃঃ ২১৯; ১৫শ খণ্ড, পৃঃ ১১০; কাছীর[৩৯], ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৩৫৬)।

বিখ্যাত হদীসবেত্তা আমির ইবনে শারাহিল আশ-শাবি (১৯/৬৪০-১০৩/৭২১) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুল (সঃ) আলীকে ডেকে বলেছেন, "হে আলী, তোমাকে নিয়ে দু'ধরনের লোক ধ্বংস প্রাপ্ত হবে। এক, যারা তোমাকে ভালবাসতে গিয়ে অতিরিঞ্জত কথা বলবে; দুই, যারা তোমার সম্পর্কে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন অপবাদ দেবে" (বার [৯৭], ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১১০১ ও ১১৩০ ; হাদীদ[১৫২], ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৬; রাব্বি[১১৮], ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৩১২)।

৪৭৯। কেউ একজন আমিরুল মোমেনিনকে আল্লাহ্র একত্ব ও ন্যায়বিচার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে প্রত্যুত্তরে তিনি বলেন, একত্ব অর্থ হলো তুমি তাঁকে তোমার কল্পনা দ্বারা সীমাবদ্ধ করতে পারবে না এবং ন্যায় বিচার অর্থ হলো তুমি তাঁকে কোন প্রকার দোষারোপ করতে পারবে না।

৪৮০। জ্ঞান সংক্রান্ত বিষয়ে জ্ঞানীদের নীরবতায় কোন মঙ্গল নেই যেমন মঙ্গল নেই অজ্ঞদের কথা বলাতে।

৪৮১। বৃষ্টির জন্য প্রার্থনায় আমিরুল মোমেনিন বলেন, হে আল্লাহ্, আমাদের জন্য বৃষ্টি দিন বাধ্য মেঘ হতে, অবাধ্য মেঘ হতে নয়।

৪৮২। কেউ একজন বলেছিল, "হে আমিরুল মোমেনিন, যদি আপনি আপনার পাকা চুলে কলপ দিতেন।" তখন তিনি বললেন, "চুলে রং করা এক প্রকার সাজসজ্জা। কিন্তু এখন আমরা শোকাহত অবস্থায় আছি।"

৪৮৩। সে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে জিহাদে শহীদ অপেক্ষাও বেশী পুরস্কৃত হবে যে অসৎ হবার উপায় উপকরণের মাঝে সৎ থাকে। সৎ ব্যক্তির পক্ষে ফেরেশতাদের একজন হওয়াও সম্ভব।

৪৮৪। পরিতৃপ্তি এমন এক সম্পদ যা কখনো শেষ হয় না।

৪৮৫। আমিরুল মোমেনিন জিয়াদ ইবনে আবিহ্কে আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের স্থলে পারস্যের ফারস নামক স্থানে প্রেরণকালে আগাম রাজস্ব আদায় নিষিদ্ধ করে দীর্ঘক্ষণ আলাপ করেন। তখন তিনি বলেন ঃ ন্যায়ের সাথে কাজ করো এবং উগ্রতা, জবরদস্তি ও অবিচার পরিহার করে চলো, কারণ জবরদস্তি করলে তারা তাদের বাসস্থান ফেলে চলে যাবে এবং অবিচার তাদেরকে অস্ত্রধারণ করতে বাধ্য করবে।

৪৮৬। সবচেয়ে নিকৃষ্ট পাপ সেটি যেটিকে পাপী হালকাভাবে গ্রহণ করে।

৪৮৭। শিক্ষাগ্রহণ করা অজ্ঞদের জন্য আল্লাহ্ বাধ্যতামূলক করেননি কিন্তু শিক্ষা দেয়া জ্ঞানীদের জন্য তিনি বাধ্যতামূলক করেছেন।

৪৮৮। সবচেয়ে নিকৃষ্টতম সহচর সে যার জন্য আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে হয়।

৪৮৯। যদি কোন ইমানদার তার ভাইকে ক্রুদ্ধ করান, এতে বুঝা যায় তিনি তাকে পরিত্যাগ করেছেন।

৪০০ হিজরী সনের রজব মাসে এ বই সমাপ্ত হয়েছিল।

গ্রন্থপঞ্জী

১। আছীর, ইবনে আল-, উসদ আল-ঘাবাহ্ ফি মারিফাতিস্ সাহাবা, (মিশর, ৫ খন্ড)
২। আছীর, ইবনে আল-, আল-কামিল ফিত-তারিখ, (লেবানন, ৭ খন্ড)
৩। আছীর, ইবনে আল-, জামি আল-উসুল, (মিশর, ১১ খন্ড)
৪। আছীর, ইবনে আল-, আন-নিহায়াহ্ ফি ঘারিবিল হাদীস, (মিশর, ৪ খন্ড)
৫। আজহারী আল-, তাহ্যিব আল-লুঘাহ্, (মিশর, ১৬ খন্ড)
৬। আনাস, মালিক ইবনে, মুয়াত্তা, (মিশর, ২ খন্ড)
৭। আবদুহ্, শায়েখ মুহাম্মদ, শারহ্ নাহজ আলা- বালাঘা, (মিশর, ৫ খন্ড)
৮। আবাদী, কাজী আবদাল জব্বার আল-আসাদ, আল- মুঘনী, (মিশর)
৯। আবাদী, আল-ফিরুজ, আল-কামুস, (মিশর, ৪ খন্ড)
১০। আমিলী, আল হুর আল-, ওয়াসাইল আশ-শিয়াহ্, (ইরান, ২০ খন্ড)
১১। আমিলী, আল-বাহাই আল-, আল-কাশফুল, (ইরান)
১২। আমিনী, আশ-শায়েখ আবুল হুসাইন আল-, আল-গাদির, (লেবানন, ২২ খন্ড)
১৩। আশরাফ, ইবনে আস-সাব্বাগ আল- মালিকী আন- নাজাফ আল- আল-ফুসুল আল-মুহিম্মাহ্ ফি মা'রিফাতিল আইম্মাহ্
১৪। আশরাফ, ইবনে তাউস আন- নাজাফ আল-, কাশফ আল- মাহাজ্জাহ্
১৫। আশরাফ, ইবনে তালহা আশ-শাফী আন-নাজাফ আল-, মাতালিব আস-সাউল ফি মানাকিব আর-রাসুল
১৬। আশরাফ, আল-গানজী আশ-শাফী আন-নাজাফ আল-, কিফায়াহ আত-তালিব ফি মানাকিব আলী ইবনে আবি তালিব
১৭। আশরাফ, আল-মামাকানী আন-নাজাফ আল-, তানকিহ্ আল- মাকাল, (৩ খন্ড)
১৮। আশআছ আবু দাউদ সুলায়মান ইবনে আল-, আস-সুনান, (মিশর, ৪ খন্ড)
১৯। আসকারী, আবু হিলাল আল-, আল-আওয়া'ইল, (মদীনা)
২০। আসকারী, আস-সাঈদ মুরতাজা আল-, খামসুন ওয়া মিআহ্ সাহাবী মুখতালাক, (লেবানন, ২ খন্ড)
২১। আসকারী, আস-সাঈদ মুরতাজা আল-, মুকাদ্দামাহ্ মির'আতুল উকুল, (তেহরান, ২ খন্ড)
২২। আসকালানী, ইবনে হাজর আল-, ফাছআল বারী ফি শারহ্ সহীহ্ আল-বুখারী, (মিশর)
২৩। আসকালানী, ইবনে হাজর আল-, লিসান আল-মিজান, (হায়দেরাবাদ, ৭ খন্ড)
২৪। আসকালানী, ইবনে হাজর আল-, মাতালিব আল- আ'লিয়া, (লেবানন, ৪ খন্ড)
২৫। আসকালানী, ইবনে হাজর আল-, তাহজিব আত-তাহজিব, (হায়দেরাবাদ, ১২ খন্ড)
২৬। আসাকীর, ইবনে, তারিখ আশ-শ্যাম
২৭। ইজি, কাজী অদুদ আদ্দিন আল-, শারহ্ আল- মাওয়াকিফ, (ইস্তাম্বুল)
২৮। ইয়াকুবী, আল-, আত-তারিখ, (লেবানন, ৩ খন্ড)
২৯। ইরবিলি, আল-, কাশফ আল- ঘুম্মাহ্ ফি ম'রিফাতিল আ'ইম্মা, (ইরান, ৩ খন্ড)

৩০। ইসকাফী, আবু জাফর আল-, কিতাব আল-মাকামাত
৩১। ইসফাহানী, আবু নু'য়ম আল-, হিলায়াহ্ আল- আওলিয়া, (মিশর ১০ খণ্ড)
৩২। ইসফাহানী, আর-রাঘিব আল-, মুহাদারাত আল-উদাবা, (লেবানন, ৪ খন্ড)
৩৩। ইসফাহানী, আবুল ফারাজ আল-, মাকাতিল আত-তালিবিন, (মিশর)
৩৪। ইসফাহানী, আবুল ফারাজ আল-, আল- আঘানী, (মিশর, ২৪ খন্ড)
৩৫। উমাবী, সায়েদ ইবনে ইয়াহিয়া আল-, কিতাব আল-মঘাজী
৩৬। ওয়াকী, আল-, আকবর আল-কুযাত, (মিশর)
৩৭। ওয়াকিদী, আল-, কিতাব আল-জামাল
৩৮। ওয়ার্‌দী, ইবনে আল-, আত-তারিখ (তাতিম্মাতুল মুখতাছার ফি আকবর আল- বাশার), (লেবানন, ২ খন্ড)
৩৯। কাছীর, ইবনে, আল-বিদায়াহ্ ওয়ান-নিহায়া, (আত-তারিখ) (মিশর, ১৪ খন্ড)
৪০। কাছীর, ইবনে, আত-তাফসীর, (মিশর, ৪ খন্ড)
৪১। কালকাশান্দী, আল-, সুবহ্ আল- আ'শা, (মিশর, ১৪ খন্ড)
৪২। কালী, আবু আলী আল-, আল-আমা'লী, (মিশর, ২খন্ড)
৪৩। কাস্তালানী, আলা- ইরশাদ আস-সারী ফি শারহ সহীহ আল-বুখারী, (মিশর, ১০ খন্ড)
৪৪। কাহ্‌হালাহ্, উমর রিজা, আ'লম আন- নিসা, (দামেস্ক, ৫ খন্ড)
৪৫। কিবাহ্, আবু জাফর ইবনে, আল- ইনসাফ
৪৬। কুতায়বাহ্, ইবনে, তাওয়িল মুখতালাফ আল-হাদীস, (মিশর)
৪৭। কুতায়বাহ, ইবনে, আল-ইমামাহ্ ওয়াস-সিয়াসাহ্, (মিশর, ২ খন্ড)
৪৮। কুতায়বাহ, ইবনে, আল- মা আ'রিফ, (মিশর)
৪৯। কুন্তি, আলী ইবনে উমর আয-যর, আস-সুনান, (মিশর, ৪ খন্ড)
৫০। কুন্দুজী, আল-, ইয়ানবী আল-মাওয়াজ্জাহ্, (ইস্তাম্বুল)
৫১। কুফী, আবুল কাসিম আল-, আল-ইস্‌তিগাছাহ্, (ইরাক)
৫২। কুম্মী, আল-,সফিনাহ্ আল- বিহার, (ইরান, ২ খন্ড)
৫৩। কুলায়নী, আল-, আল- কাফী, (তেহরান, ৮ খন্ড)
৫৪। খালদুন, ইবনে, আত-তারিখ, (মিশর, ৭ খন্ড)
৫৫। খালদুন, ইবনে, আল- মুকাদ্দামাহ্, (মিশর)
৫৬। খাল্লিকান, ইবনে, ওয়াফায়াত আল-আ'য়ান, (লেবানন, ৮ খন্ড)
৫৭। খায়াত, খলিফা ইবনে, আত-তারিখ, (দামেস্ক, ২ খন্ড)
৫৮। খুই, আল-মীর্জা ইব্রাহীম আয-যুন্‌বুলী আল-, আদ-দুর্‌রাহ আন- নাজাফিয়া ফি শারহ নাহজ আল-বালাঘা আল- হায়দারিয়া, (ইরান)
৫৯। খুই, আলহাজ্ব মীর্জা হাবিবুল্লাহ্ আল- মিনহাজ আল- বারাআহ্ ফি শারহ নাহজ আল- বালাঘা, (ইরান, ২২ খন্ড)
৬০। ছা'আলিবী, আছ-, লাতাইফ আল- মা'আরিফ, (মিশর)

৬১। ছাকাফী, ইব্রাহীম ইবনে মুহাম্মদ আছ-, আল- ঘারাত, (তেহরান, ২ খন্ড)
৬২। জাওজী, সিব্‌ত ইবনে আল- তাযকিরাত খাওয়াছ আল- উম্মাহ, (ইরান)
৬৩। জাজাইরী, আস-সাঈদ নি'মাতুল্লাহ্‌ আল-, আল- আনওয়ার আন- নুমানিয়াহ্‌, (ইরান)
৬৪। জাবিদী, আজ-, তাজ আল- আরুস, (মিশর, ১০ খন্ড)
৬৫। জামাখশারী, আজ-, রবিউল আবরার
৬৬। জাহাবী, আজ-, মিজান আল- ইতিদাল, (মিশর, ৪ খন্ড)
৬৭। জাহাবী, আজ-, তাবাকাত আল- হুফ্‌ফাজ (তাযকিরাহ আল হুফফাজ নামে পরিচিত), (হায়দেরাবাদ, ৪ খন্ড)
৬৮। জাহাবী, আজ-, তারিখ আল- ইসলাম, (মিশর, ৬ খন্ড)
৬৯। জাহীজ, আমর ইবনে বাহ্‌র আল-, আল- বয়ান ওয়াত তাবেয়ীন, (মিশর)
৭০। জিরিক্‌লী, খায়রুদ্দিন আজ-, আল-আ'লম, (মিশর, ১০ খন্ড)
৭১। জুরকানী, আজ-, শারহ আল- মাওয়াহিব আল- লাদুন্নিয়াহ, (মিশর, ৮ খন্ড)
৭২। তাউস, ইবনে, আত-তারাইফ
৭৩। তাফতাজানী, সাদুদ্দিন আত-, শারহ আল-মাকাসিদ, (ইস্তাম্বুল, ২ খন্ড)
৭৪। তাবারী, আত-, তাফসীর (জামিউল বয়ান), (মিশর, ৩০ খন্ড)
৭৫। তাবারী, আত-, আত-তারিখ, (লেডেন, ৩ খন্ড)
৭৬। তাবারী, ইমাদুদ্দিন আল- হাসান ইবনে আলী আত-, কামিল আল- বাহাই
৭৭। তাবারসী, আবু মনসুর আত-, আল- ইহতিজাজ, (ইরান)
৭৮। তায়ালিসী, আবু দাউদ আত-, আল-মুসনাদ, (ভারত)
৭৯। তাব্রিজী, আল-খতিব আর-উমারী আত-, মিশকাত আল- মাসাবিহ্‌, (দামেস্ক, ৩ খন্ড)
৮০। তিরমিযী, আত-, আল-জামী আস-সহীহ, (মিশর, ৫ খন্ড)
৮১। তুসী, শায়েখ আত-তা'য়ফা মুহাম্মদ ইবনে আল- হাসান আত-,আল-আমা'লী, (ইরান, ২ খন্ড)
৮২। নাওয়াবী, আবু জাকারিয়া ইবনে শারফ আন-, শাহর সহীহ মুসলিম, (মিশর)
৮৩। নায়সাবুরী, মুসলিম ইবনে আল-হাজ্জাজ আন-, সহীহ মুসলিম, (মিশর, ৮ খন্ড)
৮৪। নায়সাবুরী, আল-হাকিম ইবনে আল- বায়াই আন-, আল-মুস্তাদ্রাক আলা আস-সাহিয়ান (হায়দেরাবাদ, ৪ খন্ড)
৮৫। নাসাঈ, আন-, আস- সুনান, (মিশর, ৮ খন্ড)
৮৬। নাসির, আলী ইবনে, আ'লম নাহজ আল-বালাঘা
৮৭। পাটনী, শায়েখ মুহাম্মদ তাহির, মাজমা বিহার আল- আনওয়ার, (ভারত, ৪ খন্ড)
৮৮। ফিরাস, আল-ওয়ার্‌রাম ইবনে আবি, তানবিহুল খাওয়াতির ওয়া নুজহাতুন নাওয়াযির, (ইরান, ২ খন্ড)
৮৯। ফিদা, আবুল, আত-তারিখ, (মিশর, ৪ খন্ড)
৯০। বাকরী, আয-যিয়ার, তারিখ আল-খামিস, (মিশর, ২ খন্ড)
৯১। বাকিলানী, আল-, আত-তামহীদ
৯২। বাগদাদী, ইবনে তায়ফুর আল-, বালাঘাত আন-নিসা

৯৩। বাগদাদী, আল-খতিব আল-, **মুওয়াদ্দিহ্ আওহাম আল-জাম ওয়াত-তাফরিক,** (হায়দেরাবাদ, ২ খন্ড)
৯৪। বাগদাদী, আল-খতিব আল-, **তারিখ-ই- বাগদাদ,** (মিশর, ১৪ খন্ড)
৯৫। বাবাওয়াহ্, আশ-শায়েখ আস-সাদুক ইবনে, **মা'আনি আল- আকবর,** (ইরান)
৯৬। বাবাওয়াহ্, আশ-শায়েখ আস-সাদুক ইবনে, **ইলাল আশ-শারা'ই,** (ইরান, ২খন্ড)
৯৭। বার, ইবনে আবদআল-, **আল-ইসতিআব ফি মা'রিফাতিল আসহাব,** (মিশর, ৪ খন্ড)
৯৮। বার, ইবনে আবদআল, **জামি বয়ান আল-ইলম ওয়া ফাজলিহি,** (মিশর)
৯৯। বালাজুরী, আহমাদ ইবনে ইয়াহিয়া আল-, **ফুতুহ্ আল-বুলদান,** (মিশর, ৩ খন্ড)
১০০। বালাজুরী, আহমাদ ইবনে ইয়াহিয়া আল-, **আনসাব আল-আশরাফ,** (মিশর)
১০১। বাহ্রানী, ইবনে মীছাম আল-, **শারহ্ নাহ্জ আল-বালাঘা,** (ইরান, ৫ খন্ড)
১০২। বুখারী, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল-, **সহীহ্ বুখারী,** (মিশর, ৯ খন্ড)
১০৩। মজলিসী, আল-আল্লামা মুহাম্মদ বাকির আল-, **বিহার আল- আনওয়ার,** (ইরান, ১১০ খন্ড)
১০৪। মন্‌জুর, আবুল ফজল ইবনে, **লিসান আল- আরব,** (মিশর)
১০৫। মাযাহ্, ইবনে, **আস-সুনান,** (মিশর, ২ খন্ড)
১০৬। মাদানী, আবুল হাসান আল-, **কিতাব আল- আহ্দাছ**
১০৭। মারআশী, কাজী নুরুল্লাহ্ আল-, **ইহ্কাক আল-হক,** (ইরান, ১৫ খন্ড)
১০৮। মায়দানী, আবুল ফজল আহমদ ইবনে মুহাম্মদ আল-, **মাজমা আল- আমছাল,** (মিশর, ২ খন্ড)
১০৯। মাসুদী, আল-, **মুরুজ আয্-যাহাব,** (মিশর, ৪ খন্ড)
১১০। মিনকারী, নসর ইবনে মুজাহিম আল-, **সিফ্ফিন,** (মিশর)
১১১। মুফিদ, আশ- শায়েখ আল-, **আল- ইরশাদ**
১১২। মুবার্‌রাদ, আল-, **আল- কামিল ফিল আদাব,** (মিশর)
১১৩। মুরার্‌রাদ, আল-, **আল- মুকতাদাব,** (মিশর)
১১৪। মুরতাজা, আলম আল- হুদা আস-সাঈদ আল-, **আশ-শাফি,** (ইরান)
১১৫। রাজী, আস-সাঈদ আর-, **আল-খাসাইস**
১১৬। রাজী, আস-সাঈদ আর-, **মাযাজাত আল- আছর আন- নাবাইয়্যা**
১১৭। রাজী, ফখরুদ্দিন আর্-, **আত- তাফসীর,** (মিশর, ৩২ খন্ড)
১১৮। রাব্বিহ, ইবনে আবদ, **আল- ইকদ আল- ফরিদ,** (মিশর, ৭ খন্ড)
১১৯। রুস্তাহ্, ইবনে, **আল- আ'লাক আন-নাফিসাহ্**
১২০। শরাফুদ্দিন, আস-সাঈদ আবদুল হুসাইন, **আন-নাস ওয়াল ইজতিহাদ,** (লেবানন, ৪ খন্ড)
১২১। শাফী, আস্- সুয়ূতি আশ-, **আদ-দুর্‌র আল- মনছুর ফিত-তাফসীর বিল মা'ছুর,** (মিশর, ৬ খন্ড)
১২২। শাফী, মুহাম্মদ ইবনে ইদ্রিস আশ-, **ইখতিলাফুল হাদীস,** (মিশর)
১২৩। শাফী, মুহিবুদ্দিন আত-তাবারী আশ-, **যাখায়ের আল- উকবা ফি মানাকিব যাওয়াইল কুরবা,** (মিশর)
১২৪। শাফী, মুহিবুদ্দিন আত-তাবারী আশ-, **রিয়াজ আন-নাদিরা,** (মিশর, ২ খন্ড)
১২৫। শাফী, আল- বায়হাকী আশ-, **আস-সুনান আল-কুবরা,** (হায়দেরাবাদ, ১০ খন্ড)
১২৬। শাফী, আল- মুনাবী আশ-, **ফয়েজ আল- কাদির ফি শারহ আল-জামি আস-সগির,** (মিশর, ৬ খন্ড)